

বাক্য

মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন।

চতুর্থ খণ্ড।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্তৃক

সম্পাদিত।

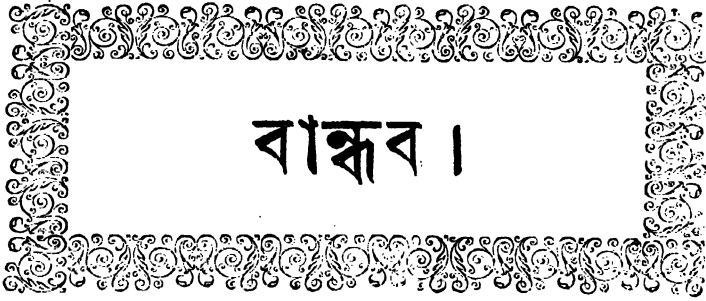
ঢাকা-গিরিশম্ভর।

মুদ্রিত মণলাবঙ্গ প্রিন্টার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৮৫।

মূল্য ৪১ চারি টাকা।

বাগিছোত্র।	৪৯
বাঙ্গাল।	১
বিজ্ঞাপনী।	৪৫৮
নিবন্ধ।	৪৭৪
বিষকন্যা ও বিধবা রমণী।	২৭২
ভারতবর্ষীয় ভাষা।	১৭
ভারতে আর্থাভ্যাস।	৩২৮
ভারতের প্রজ্ঞানীতি।	৭০
ভারবি।	২১১
ভাণমানুষ।	২৪২, ৪৯৫
মহম্মদের উত্তরাধিকারীগণ।	৪১৯
মহামায়ার চিত্রপট।	৩২৪
মৌক্তিক।	১২৯
যবন।	২৬৬
যমুনা তটে (পদ্য)	৯৭
রসিকতা ও রসের কথা।	৭৬৩
সুকিসিমা (পদ্য)	৫১৬
শিক্ষা ও মানসিক পরিবর্তন।	২৬৬
শিশুশিক্ষা।	৫২৯
শুকর।	৫৪৯
সংকিশ্ত সমালোচন।	৯৩, ১৯২, ২৮৬, ৩৮১
সমালোচন।	৪৬৪, ৫৭১
সায়নবাদ।	১২
সাহিত্য ও জাতীয় বিকাশ।	২
স্প্যানিস্ সভ্যতা।	৫৪৮
সোমরস ও তাহার সেবন বিধি।	৩২১
স্রীকবি ও তদনুযায়ী উপদেশ।	৫৫৭
হস্তী।	৫০১
হিন্দুভূগোল।	২৭৮



বান্ধব ।

মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন ।

৪র্থ খণ্ড ।

১২৮৫ ।

[১ম সংখ্যা ।

বান্ধব ।

আজি চারি বৎসর হইল বঙ্গীয় পাঠক-বর্গের সহিত বান্ধবের পরিচয় ও প্রণয় । পাঠকবর্গ বান্ধবের প্রণয়কাজক্ষী কি না, তাহা আমরা ঠিক জানিতে না পারিলেও, ইহা আমরা বিশিষ্টরূপে অবগত আছি যে, বান্ধব সর্বস্বাস্থ্যকরণে পাঠকবর্গের প্রণয়কাজক্ষী । সুতরাং ঐ অতিমধুর প্রণয় শব্দটি ব্যবহারে আমাদের ভয় কি লজ্জা নাই ।

এই চারি বৎসরে বান্ধব কাহাকে কোন বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে সমর্থ না হইয়া থাকিলেও, স্বয়ং অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে । এই চারি বৎসরে আমরা শিখিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষা ইদানীং অতি-দরিদ্রা, অতিদীনহীনা হুর্বলা হইলেও ই-

হার ভবিষ্যৎ নিতান্ত তিমিরাক্ত নহে । যে ভাষায় যমুনা-লহরী লুতা করে, মোহন লালের গর্জন, মোহনসালের বিলাপ তরল বহির মত উদ্দীপিত হয়, সুত্রান্তরের বিকট সিংহনাদের মধ্যেও অমৃতরস-নিমান্দিনী মধুময়ী কথা অতিক্রম্যে প্রবেশপথ-পায়,—যে ভাষায় প্রতাপের দেবচুল্লভি পবিত্র চরিত অঙ্কিত হইতে পারে, এবং ভাষার প্রাণরূপিনী উদ্দীপনা অবলীলায় প্রবাহিত হয়, সে ভাষার ভরসা আছে । আমরা এই সঙ্গে ইহাও শিখিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষার যেমন ভরসা আছে, বাঙ্গালিরও তেমন ভরসা আছে । যে দেশে প্রমোদ-নিদ্রা-মগ্ন ধনীর নিকট আদর নাই, পদস্থের নিকট সম্মান নাই,—দক্ষিণে

বামে কোন দিকেই অবলম্ব্য নাই, সম্মুখে ও পশ্চাৎ কোন দিকেই তিষ্ঠিবার স্থান নাই;—যে দেশে পাঠ্য বলিয়া নির্দাচিত না হইলে প্রবাল মুক্তার ন্যায় অমূল্য রত্নও বিক্রয় না, উপরিষ্বেহ অনুরোধ কি স্বেচ্ছীত না হইলে ভারতের তীর্থরাজস্বরূপ রাজস্থানের ইতিহাস-পাঠে, ঐতিহাসিক কি বিজ্ঞান রহস্যের রসাস্বাদনে, হেমচন্দ্রের অলোক-সাধারণ তেজোরশির অনুধ্যানে কিংবা হাস্যকুসুমময় কণ্ঠস্বর ছায়াসেবনেও লোকের প্রবৃত্তি জন্মে না;—যে দেশে কাঁচ আর কাঞ্চন সমান পদার্থ, অন্ন-গুঞ্জন আর ভেদধনিত্যে সমান তৃপ্তি;—যে দেশে এক শ্রেণির লোক অর্থের দুর্ভবতরে উপীড়িত হইয়া পক্ষে পতিত, আর এক শ্রেণির লোক হা অন্ন বলিয়া অহোরাত্র ব্যতিব্যস্ত;—যে দেশে মুখের নাম রসিক, অন্দের নাম সর্বজ্ঞ তট্টাচর্য, মাতৃভাষায় মুখতার নাম পাণ্ডিত্য, পর-মুখ-প্রেক্ষিতার নাম পৌকষ; যখন সেই দেশেও একটি নিরাশ্রয় এবং সর্বপ্রকারে

নির্গৃহীতা ভাষা পরিপূর্ণি লাভ করিয়াছে, এবং সামান্য একটি সলিল-রেখার ন্যায় প্রথমতঃ প্রবাহিত হইয়া এইক্ষণ তরঙ্গসংকুল মেঘনাদ-নদের ন্যায় ভয়ঙ্কর নিনাদে গর্জন করিতেছে, তখন বুঝিয়াছি যে দুঃখিনী বঙ্গভূমির প্রতি অমৃতময়ী সারস্বতী শক্তির অর্কুণা নাই। আমরা আমাদের এই শিক্ষালব্ধ উৎসাহের উপর দৃঢ়নির্ভরে কিয়ৎকালের বিশ্বাসের পর, পুনরপি প্রীতির ভিখারী হইয়া পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত হইলাম। আমাদের অবসাদ-জন্য নিত্যা যে মৃত্যুর প্রতিকৃতি নহে, এবং বান্ধব যে প্রাণসত্ত্বে কখনও প্রতিশ্রুতি এবং পরিগৃহীত ব্রতধর্মহইতে স্থলিত হইবে না, তাঁহারা এইটুকু বিশ্বাস করিলেই আমরা কৃতার্থ হইব। আর যে সকল সুশিক্ষিত ও সহৃদয় ব্যক্তি এত কাল বান্ধবকে হস্তাবলম্ব দিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা পূর্বের মত ইহার প্রতি সদয় রহিলেই আমরা অক্লান্তপদে চলিতে পারিব।

✓ সাহিত্য ও জাতীয় বিকাশ।

প্রথম প্রস্তাব।

✓ সাহিত্য জাতীয় হৃদয়ের আদর্শ,— জাতীয় হৃদয়ের ইতিহাস। যে জাতির হৃদয় যে সময়ে যে ভাবে পরিপূর্ণ কি পরিপ্লুত থাকে, সেই জাতির সেই সময়ের সাহিত্যও সেইভাবে সম্পূর্ণরূপে বিলসিত

রহে। মনুষ্যের মন যখন শোকে আকুল, ক্রোধে উদ্দীপ্ত, অথবা দুঃখে কি দুঃখিত্যায় অবসন্ন রহে, তাহার মুখচ্ছবি তখন তম-সাপ্চন্দ্র এবং কণ্ঠধ্বনি বিরুদ্ধ হয়,—এবং যখন তাহার হৃদয় আনন্দভরে হতা করে,

চিত্র নৃতন স্বথের সুরধাময় স্পর্শে প্রফুল্ল হইয়া উঠে, তাহার চক্ষু তখন সেই আনন্দ ও সেই স্বখে হাসিতে থাকে, তাহার কণ্ঠস্বর বসন্ত-মদ-মত্ত কোকিল-কণ্ঠের মাধুরীতে মিশিয়া যায়। মনুষ্যসম্বন্ধে প্রকৃতির এই নিয়ম অনুমলজনীয়, এবং জাতীয় সাহিত্যও সর্বপ্রকারে এই নিয়মের অধীন। উহাতে কখনও ক্রোধের ভয়ঙ্কর গর্জন, কখনও অবকঙ্ক ক্রোধের ততোধিক ভয়ঙ্কর স্তম্ভিত ভাব। কখনও প্রেমের উচ্ছ্বাস, কখনও শোক ও পরিতাপের হৃদয়বিদারী করুণা-নিশ্বস, কখনও বীর-গর্ভ ও বাহুবল-দর্পের সিংহনাদ, কখনও স্বার্থপরতা ও ব-নিষ্ঠু স্তির সংকোচ ও সাবধানতা। কখনও বিলাসের আলসা ও আবেশ, কখনও ভয়ের বিরূত ভক্তি এবং ভক্তির বিভৎস বিকার। ফলতঃ, সাহিত্যকে ইতিহাস না বলিয়া জাতীয় হৃদয়ের চিত্রপট বলাই অধিকতর সঙ্গত। কারণ, ইতিহাসে যাহা না থাকে, অথবা ইতিহাসে যাহা থাকা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে, তাহার সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধমূলক নিয়মানুসারে, সাহিত্যে তাহা আলিখিত হয়,—এবং সাহিত্য, পরিমার্জিত দর্পণের ন্যায়, জাতীয় পরিবর্তনের স্বক্ষ্মাদপি স্বক্ষ্ম বর্ণভেদও আনাদিগের সম্মুখে আনিয়া প্রদর্শন করে। ইতিহাস প্রায়শঃই বাহিরের কথা লইয়া ব্যাপ্ত রহে;—সাহিত্যে অন্তরের অন্তরতম কথাও পরিষ্কৃত না হইয়া যায় না, এবং জাতিবিশেষের উদয় ও বিলয় সম্পর্কিত

যে সকল প্রশ্নের উত্তর করা নিতান্ত কঠিন, সাহিত্য তাহার সহস্র দেয়।

ভারতবাসী আর্ষাদিগের শৈশব সময়ের সাহিত্য বেদ। বেদে শিশুর সারলা, বেদে শিশিরসিক্ত প্রভাতপদ্মের পবিত্র শোভা এবং পবিত্র মাধুর্য। বেদ ষাঁহাদিগের হৃদয়ের ভাষা ছিল, তাঁহার। মনু কি যাজ্ঞবল্কের ন্যায়, সমাজের অভ্যন্তরীণ ভেদ এবং পরিণামচিন্তা লইয়া বুদ্ধি বিলোড়ন করিতেন না,—কণাদ কি কপিলের ন্যায় তত্ত্বশাস্ত্রের বীজস্বত্র লইয়া পদার্থতত্ত্বের অন্তস্তলে নিমজ্জিত রহিতেন না, এরং কালিদাস প্রমুখ কবিসম্প্রদায়ের ন্যায় কামিনীর বিভ্রম-বিলাস ও লাবণ্যালীলা লইয়াও প্রমত্ত থাকিতেন না। তাঁহার, প্রাতঃসূর্যের উদয়ানুধী প্রতিভা দেখিয়া, ষাঁহাকে কেহ জানে না, ষাঁহাকে কেহ জানিবে না, সেই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় শক্তির আনন্দময় অনুভবে, কাননস্থিত বিহঙ্গনিবহের মত, কলকল নাদে প্রকৃতির প্রভাতবন্দনা গান করিতেন;—জলভারপূর্ণ শ্যামল মেঘমালার নবীন-সৌন্দর্য-দর্শনে পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া রুতজতা উপহার দিতেন;—বায়ুর বেগ প্রশমনের জন্য স্তোত্র পাঠ করিতে প্ররুত হইতেন;—এবং তাঁহাদিগের ক্ষেত্রে যেন শম্য হয়, গাভী যেন দুগ্ধবতী রহে, তরুরাজি যেন ফলে ও ফুলে সুরশোভিত হইয়া চক্ষু বিনোদন করে, এই জন্য তাঁহার। দেবতার আরাধনা করিতেন।

তখন রাজা কি রাজকীয় অভ্যাস ছিল না। সাহিত্যে কিরূপে রাজনীতির আ-বিলম্ব থাকিবে? নূতন-প্রথিত সমাজ-সংস্থাপনে সর্বপ্রকার অপূর্ণতা থাকিলেও, কোন রূপ অস্বাস্থ্য ছিল না। সাহিত্যে কিরূপে সমাজভেদের ভয় এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিকার থাকিবে? আর মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের কৃত্রিম ভক্তি এবং কৃত্রিম আসক্তিরও কোন সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং তদানীন্তন সাহিত্যেও কিরূপে কৃত্রিম ভক্তি কিংবা কৃত্রিম আসক্তির কপট স্ততি স্থান পাইবে?)

আজি সমগ্র ইয়ুরোপ এবং আমেরিকা যাঁহাকে ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং জগদগুরু বলিয়া পূজা করিতেছে, এবং যাঁহার হৃদয়-কন্দর-নিঃসৃত নির্মল নীতিসুধ। আজি প্রায় সমস্ত পৃথিবীতেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেই নাজরীণ যোগী মহাত্মা খ্রীষ্ট, একটি নরকুমারমতি মহাস্যা শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া নিয়া, সম্মুখস্থিত শিষ্য-বর্গকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে,— “যাহাদিগের চিত্ত শিশুর মত সরল নহে, স্বর্গরাজ্যে তাহাদিগের অধিকার নাই।” আমরাও বলি, যাহারা সেই বেদভাষী আর্ধ্যশিশুর ন্যায়, আধ আধ কথায় ঈশ্বরকে ডাকিতে পারে না, এবং প্রকৃতির রূপরাশিতে মোহিত হইয়া প্রকৃতির প্রাণ-দেবতার ক্রোড়ে শিশুর মত ঝাঁপ দিয়া পড়িতে সমর্থ হয় না, তাহাদিগের জন্যও ধর্মরাজ্যে প্রবেশ-পথ নাই। ধর্মবিষয়ে

সেই পুরাতন বৈদিক সাহিত্য এবং এখনকার মুনাজ্জিত ধর্মশাস্ত্রীয় সাহিত্যে কি প্রভেদ! এখনকার ধর্মবিষয়ক সাহিত্যের একাধি আশ্রয়ত্ব এবং অপরাধিও হয়! অন্য এক প্রকারের আশ্রয়ত্ব। ইহার কোথাও স্বাস্থ্যের লক্ষণ, প্রকৃতির সমীর-সঞ্চার এবং প্রকৃত আনন্দের সংস্পর্শ নাই। ইহাতে ধর্মের সাধনা, ক্রেশনকর ঔষধ-সেবন; এবং পরোপদেশ বার পর নাট কটুকষায়-ঔষধ-বিতরণ। ইহার প্রার্থনায় প্রচ্ছন্ন শ্লেষ, কিন্নরী বাসিতত্ত্বা, এবং ইহার সকলই অনুতাপ অথবা অভিসম্পাত, অন্তর্দাহ অথবা পরের প্রতি দ্বেষ। পড়িলে বোধ হয় যে, ‘দার্শনিক’ মনুষ্য বুঝির অগম্য এক সৃষ্টি-ছাড়া জীব। সে কাহারও মুখে মুখী নহে, কাহারও হৃৎখেও সে হৃৎখী নহে। তাহার সহিত কাহারও কোন বিষয়ে সহানুভূতি নাই। তাহার মুখমণ্ডলে চিরস্তনী অমাবস্যা; অবোধ বালক বালিকাও ভয়ে মেদিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস পায় না। সে সকল বিষয়েই গভত সঙ্কুচিত। সে সঙ্কোচে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারে না, এবং সঙ্কোচে কাহারও সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতেও ইচ্ছুক হয় না। তাহার হৃদয় এক অচিন্তনীয় ব্যাধির অধিকরণ। সেখানে আনন্দ নাই, উৎসাহ নাই এবং হর্ষের তরল তরঙ্গ নাই। কবিতার কলকণ্ঠ সেখানে পরাজিত হয়, এবং সৌন্দর্যের পবিত্র প্রতিমাও পাংপের প্রতিকৃতি বলিয়া সেখানে প্রত্যাখ্যাত হয়।

দৈনিক সাহিত্য সর্ব্বাংশেই ইহার বি-
পরীত। উহার সর্ব্বত্রই নবোদ্যোগে হৃদয়ের
আয়োগ, অ-কাজ্জকা, উল্লাস ও উৎসব।
উহার ধ্যানধারণা গম্ভীর ও মধুর; প্রা-
র্থনা স্বভাবশুদ্ধ, সরল ও অমায়িক; উ-
পদেশ অভিসম্পাত-শূন্য এবং সাধনা
ঋামপন্থাসের মত স্বাভাবিক ও মুখপ্রদ।
ধর্ম্মশাস্ত্রে এইক্ষণ যে বিষ প্রবিষ্ট হইয়াছে,
দৈনিক সাহিত্যের কুত্রাপি তাহা পরিল-
ক্ষিত হয় না। তখন ধর্ম্মও লোকের গল-
গ্রেহ স্বরূপ ছিল না, এবং ষাঁহারাই পার্থিক,
তঁাহারাই মুক্তিমান্ রোগ এবং জনসমা-
জের গলগ্রেহ ছিলেন না।

বেদের পর রামায়ণ আর মহাভার-
তের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমরা ক-
ণিকসূত্রের অর্পবিস্তৃতিতে প্রীতি আর রা-
জনীতিতে যে পার্থক্য দেখাইয়াছি, রামা-
য়ণ ও মহাভারতেও সেই পার্থক্য। রামা-
য়ণের সময়ে ভারতীয় সভ্যতার প্রেমো-
চ্ছ্বাস-পরিপ্লাবিত হূতন যৌবন, মহাভা-
রতের সময়ে ভারতীয় সভ্যতার ক্ষতিলা-
ভগণনা-তৎপর প্রৌঢ় বার্দ্ধক্য। রামায়ণে
হৃদয়ের আবেশ, হৃদয়ের আবেগ, এবং
রামায়ণের প্রধান-পুরুষ রাম। মহাভা-
রতে বুদ্ধির ধর-ধারণ, বুদ্ধির গাম্ভীর্য এবং
মহাভারতের প্রধান-পুরুষ কুট-যুদ্ধ-প্রসিদ্ধ
বান্দেব, অথবা বান্দেবের করপ্ত পুত্র
রাজা যুধিষ্ঠির। আর প্রকৃতিরই বা কি
আশ্চর্য্য সহানুভূতি! রামায়ণের কবি,
বাল্মীকি; এবং মহাভারতের কবি, বাস।

ইতিহাসের দুইটি বিভিন্ন সময়ের ছবি রা-
মায়েণে ও মহাভারতে যেরূপ বিভেদম-
হকারে চিত্রিত হইয়াছে, শুদ্ধ তাহা তুলনা
করিলেই সাহিত্য এবং জাতীয় হৃদয়ের
সাময়িক অবস্থাটিত পরস্পর সম্বন্ধ স্পষ্ট
প্রতীতমান হইতে পারে।

রামায়ণ এবং মহাভারত এই উভয়
কাব্যেই জাত্যার সহিত জাত্যার রাজ্য ল-
ইয়া বিরোধ। রামায়ণের বিরোধ রাম
ও ভরতে, মহাভারতের বিরোধ কোরব
ও পাণ্ডবে। কিন্তু বিরোধের বিস্ত্র
পার্থক্য একবার চিন্তা কর। রামায়ণের
দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জাত্য এই বলিয়া বিবাদ
করিতেছেন যে,—“এই রাজ্য, এই রাজ-
পদ, এই অতুল রাজসম্মান আমার নহে,
ইহা তোমার”। মহাভারতের জাত্য
স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বলিতেছেন যে,—“যত
টুকু ভূমি স্থীর সূতীক্স অগ্রভাগে সংলগ্ন
রহিতে পারে, তাহাও বিনা যুদ্ধে প্রদান
করিব না”। রামচন্দ্র জাত্যকে বিরোধে
পরাভব করিয়া তঁাহার হস্তে সমস্ত সা-
ত্রাজ্য তুলিয়া দিলেন, এবং স্বয়ং হৃদয়ের
আনন্দভরে ভার্য্যাসহ বনবাসী হইলেন।
মহাভারতের জাত্য বিরোধে জয়লাভ ক-
রিয়া, জাত্যার উকতে গদাঘাত, মস্তকে
পদাঘাত এবং অন্তরে ততোধিক ক্লে কর
নিবাক্ষণ বাকের আঘাত করিলেন, এবং
জাত্যসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া যজ্ঞ ও দ-
নাদি সংকর্ষ করিতে প্রুত হইলেন।
সত্য বটে, বাস যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মের পুত্র,

ধর্মের অবতার এবং সাক্ষাৎ ধর্ম-পুঙ্খ ব-
লিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । সত্য বটে, তিনি
বুদ্ধিষ্ঠিরকে নিয়ত বেদ পাঠ এবং বিপ্রসে-
বায় নিযুক্ত রাখিয়া, এবং তাঁহাকে আ-
সিধারত্রেতে বিজয়ী দেখাইয়া সাধারণের
মনে তাঁহার প্রতি এক অসাধারণ ভক্তি
জন্মাইয়াছেন । ইহাও সত্য যে বুদ্ধিষ্ঠির
অকারণ পরজ্যোহ, অকারণ পরপীড়ন,
এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও দত্তমাৎসর্য প্র-
ভৃতি বহুবিধ দোষহইতে নিখুঁত রাখিয়া
জগতে ধার্মিক নাম পাঁইবার জন্য বহুল
পরিমাণে যোগা হইয়াছেন । কিন্তু ত-
থাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, রাম-
চন্দ্র ও বুদ্ধিষ্ঠির এক প্রকৃতির ধার্মিক ন-
হেন, এবং এই উভয় সময়ের ধর্মগত
আদর্শও এক ছিল না । ইহাদিগের এক
জনের ধর্মে কুম্বমের সৌরভ, বসন্তের ক-
মনীয় কান্তি, সত্যের স্বচ্ছশোভা, এবং
প্রথম বয়সের প্রমত্ত প্রবাহ ;—আর এক
জনের ধর্মে শীতের সঙ্কোচ, স্বার্থের হ্র-
শ্চিন্তা, কৌশল, কাপটা, কলির প্রারম্ভ-
কালীন প্রদর্শন-প্রিয়তা, এবং বিবিধ কা-
কর্ষ্যের বিচিত্রঘটা । একজনের ধর্মে
শক্তি এবং স্বভাবের অপ্রতিহত বিকাশ,
—আর একজনের ধর্মে অকালবাক্কোর
অকৃতি এবং অনিচ্ছাকৃত গতি ।

ধন্য বাল্মীকি ! ধন্য ভারতবর্ষ ! আর
আজি হতভাগ্য হইলেও ধন্য আমরা যে,
যে দেশ রামচন্দ্রের পদচরণে স্পর্শ করি-
য়াছে, আমরা সেই দেশে জন্ম গ্রহণ করি-

য়াছি, এবং যে গঙ্গা ও গোদাবরী আর্ধ্য-
বর্তের সেই সময়ের সেই আদর্শ-পুঙ্খ,
সেই জাতীয় প্রতিনিধির পাদপ্রান্তে প্রবা-
হিত হইয়াছে, আমরা আজি সেই পুরা-
তন গঙ্গা ও গোদাবরীর তরঙ্গমালা দর্শন
করিয়া পুরাতন আর্ধ্য জাতির কীর্তি ও ম-
হিমার তরঙ্গ ধ্যান করিতে পারিতেছি ।
প্রকৃত মহত্বের ছায়াপথে কিংবা স্মরণ-
পথে অবস্থানও সামান্য সৌভাগ্যের বি-
ষয় নহে ।

পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশে বাল্মীকির
সমান, কিংবা কোন কোন বিষয়ে বাল্মীকি
হইতেও শ্রেষ্ঠতর কবি জন্মগ্রহণ না করি-
য়াছেন, এমন নহে । গ্রীকদিগের হোমার,
রোমাণদিগের বার্জিল, ফরাশিদিগের ক-
ণেল এবং ব্রিটিশদিগের মিল্টন, ইহার
সকলেই মানব জাতির গৌরব-স্থল এবং
কবি-সমাজের গুরু বলিয়া পরিচিত । যদি
কম্পনার বৈচিত্র্য এবং সৃষ্টি-নৈপুণ্য লইয়া
বিচার কর, তাহা হইলে বৃদ্ধ বাল্মীকিকে
সেক্সপীরের সহিত তুলনা-স্থলে আনয়ন
করা যায় কিনা, তাহাও সন্দেহের কথা ।
বাল্মীকির হৃদয়ের স্রোত নিরন্তর একধাতে
প্রবাহিত হইয়াছে ; সেক্সপীরের দিব্য-
শক্তি স্বর্গও নরক, শৈল-শৃঙ্গ ও গভীর
তমসাক্ষর গিরিগুহা, কৈশর ও কেমিসস,
ক্রিওপেটা ও দেশদিমোনা প্রভৃতি অসংখ্য
পাদার্থ যুগপৎ দর্শন এবং যুগপৎ চিত্র
করিয়া জগতের বিস্ময় জন্মাইয়াছে । কিন্তু
যে রূপ ভারতের আর্ধ্যজাতি ভিন্ন আর

কোন জাতির প্রকৃতিতেই রাম চরিত্র বি-
কশিত হয় নাই, সেইরূপ কি হোমার কি
বর্জিল, কি কর্ণেল, কি মিল্টন অথবা কি
শেঙ্কপীর, বাঙ্গালীকি ভিন্ন কোন দেশের
কোন কবিই রাম চরিত্র স্ফুট করিতে স-
মর্থ হন নাই।

রামচন্দ্র প্রাচীন আৰ্য্যজাতির প্রাণ,—
দয়ার অমৃত প্রস্রবণ, অথচ পৌকষদর্পের
সজীব প্রতিকৃতি। প্রণয়ে তিনি চণ্ডালকেও
আলিঙ্গন করিতে পারেন, প্রতিদ্বন্দ্বীতার
লক্ষ্যশ্বরকেও তিনি ভূগ বলিয়া গণনা ক-
রেন না। স্বর্ণমণ্ডিত সিংহাসনেও তাঁ-
হার যে স্থখ, তপোবনের পর্ণকুটারেও তাঁ-
হার সেই শান্তি। বিশ্বামিত্র প্রভৃতি স-
র্বশাস্ত্রদর্শী তপস্বীরাও তাঁহার সহিত
আলাপ করিতে উৎসুক রহেন; এবং দা-
ক্ষিণাত্যের অসভ্য, আরণ্য মনুষ্যরাও তাঁ-
হার কথার মাদুরীতে মুগ্ধ হইয়া আপনা
হইতে তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করে। তাঁ-
হার আঘাতে বজ্রের কঠিন দেহ বিদীর্ণ,
এবং ক্রোধে বহ্নি-শিখাও ভীত হয়; আ-
বার রাবণের মত ভার্যাপহারী ও সন্দ-
নাশকারী শত্রুও যখন কাতরকণ্ঠে তাঁহার
শরণ লয়, তিনি তখন করুণরসে স্রবীভূত
হইয়া ধারায় অশ্রুপাত করেন। তাঁহার
চিত্ত কৈকেয়ীর প্রতিও ক্রুরভাব পোষণ
করিতে পারে না, অথচ কৌশল্যার ক্রন্দন
এবং ভরতের অনুনয় বাক্যেও বিগলিত
কিংবা সত্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয় না। যখন
রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য

বাহুপ্রসারণে উদাত, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ
পুঞ্জীকৃত পুষ্পরাশির ন্যায় তাঁহার সম্মুখে
সমাকীর্ণ, পৃথিবীর সমস্ত রাজমুকুট তাঁ-
হার পদতলে বিলুপ্ত, তাঁহার প্রশান্ত
চিত্তে তখনও অর্ধৈর্ষ্য কি উদ্বেলতা নাই,—
এবং যখন জটাতীর তাঁহার রাজত্বা, দু-
র্ভাগ্য তাঁহার ক্রীড়াসংচর এবং রক্ষ লতা
মাত্র তাঁহার পরিচারক, তখনও তাঁহার
দৃকপাত কি হৃৎখ-বোধ নাই। অহো
কি মনুষ্য! কি অলৌকিক মাহাত্ম্য!
ভারতীয় কল্পনা সরসীর স্বর্ণ কমল,—কি
সুন্দর,—কি কঠিন! সর্বাধরের স্বচ্ছ স-
লিলে প্রতিভাত প্রদীপ্ত ভাস্কর! কি উ-
জ্জ্বল! কি মনোহর।

ব্যাসও অসামান্য কবি, এবং স-
র্বাংশে আৰ্য্যনামের উপযুক্ত;—পা-
ণ্ডিত্যে অনুপম, মনস্বীতার অদ্বিতীয় এবং
স্বকি বৈচিত্র্যে ও স্বকি-কৌশলে শেঙ্ক-
পীরের সমান। তদীয় তীক্ষ্ণ হিমান্দ্রির
অভ্রভেদী শৃঙ্খের ন্যায় ভারত-সাহিত্য-
রূপ মহাক্ষেত্রের এক প্রান্তে জভঙ্গিশূন্য
দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। যতকাল ইচ্ছা নি-
রীক্ষণ কর, সেই পাবাগময়ী মূর্তিতে কখনও
প্রতিজ্ঞা পালনে ভয় কিংবা পৌকষ-ধর্মে
অবহেলার লক্ষণ দেখিতে পাইবে না।
তাঁহার দ্রোণকর্ণাদি বীরবন্দ অদ্যাপি শ-
রীরবন্ধ বীররসের ন্যায় সকলের মানস-
নেত্রের সম্মুখীন হইতেছেন। যতকাল
ইচ্ছা দেখিতে থাক, হৃদয় কখনও অবসন্ন
হইবে না। তাঁহার অভিমত্যা অদ্যাপি র-

পের ছটা বিকীরণ করিয়া, এবং রূপের সঙ্গে সৌন্দর্যে বিভূষিত হইয়া, বিস্ময়-বিমুগ্ধ দ্রষ্টৃবর্গের সন্নিধানে বজ্রহস্ত চন্দ্র-মার ন্যায় মূহ মধুর সলীলহাস্যে মৃত্যু করিতেছেন,—যতকাল ইচ্ছা চাহিয়া থাক, চক্ষু কখনও ফিরিয়া আসিতে চাহিবে না। কিন্তু কবিগুল চূড়ামণি শেফপীর ত্রিলোকের উপাদেয় সামগ্ৰী একত্র সংগ্রহ করিয়াও যে কারণে রাম স্থষ্টি করিতে পারেন নাই, ব্যাসের বহু যত্নের ধন যুধিষ্ঠির-ও সেই কারণেই রামচন্দ্র নছেন।

যুধিষ্ঠির চিররুদ্ধ। তাঁহার প্রকৃতিতে কখনও আবেগ কি আবেগ দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহার গতি জলৌকার মত; তিনি পরস্থান না দেখিয়া কখনও পূর্বস্থান পরিত্যাগ করেন না। তিনি সময় পাইলে বিরাটকেও শ্লেষ করিতে পারেন, কিন্তু অসময়ে দুঃশাসনকেও কিছু বলিতে চাহেন না। তাঁহার সত্যপারায়ণতা বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে 'হত ইতি গজ,' অথচ আত্মদৈন্য-জ্ঞাপন এবং অনুতাপ-পারায়ণতার তিনি ভগবন্তুক্ত সাধু। তাঁহার সাহস ও বীর্য প্রায়ই বীর সান্নিধ্যে ও বিয়-বিপত্তির সম্মুখে অবগন্ন হইয়া পড়ে; অথচ সাহস ও বীর্যের অভাব প্রদর্শন করিয়া অনাকে তিরস্কার করিতে তাঁহার চিত্ত কাতর হয় না, এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটি সুকুমার শিশুকে বলিস্বরূপ উৎসর্গ করিতেও তাঁহার মনে ম্যানি জন্মে না। অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় তাঁহারও ক্রোধ

আছে। কিন্তু তাঁহার ক্রোধ মেঘের ন্যায় গর্জনা, অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠে না, এবং অশনির ন্যায় কাহারও মস্তকে সহসা আপতিত হয় না। উহা বিবেক ন্যায় ধীরে ধীরে প্রসৃত হয়, ধীরে ধীরে কার্য করিতে রহে, এবং যাহার প্রতি ক্রোধ, ধীরে ধীরে তাহার সর্বনাশ করে। দুর্ঘোষনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ ছিল। কিন্তু যখন যুধিষ্ঠির দুর্ঘোষনের অত্যাচারে বারণাবতের অভিমুখে পলায়ন করেন, সে ক্রোধ তখন পরিস্ফুট হয় নাই। যখন দুর্ঘোষনের ইজিতে কুরুসভার দৌপদীর নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা হয়, সে ক্রোধ তখনও প্রকাশিত হয় নাই। বহুলোক তখন অশ্রুপাত করিয়াছিল, বহুলোক তখন আত্মদান করিয়াছিল, কেবল যুধিষ্ঠিরই প্রস্তরবৎ নিঃশব্দ ও নিশ্চল। কিন্তু বহুদিনান্তে, বহু বর্ষান্তে, যুধিষ্ঠিরের পরিণাম-চিন্তাপারায়ণা, ধীরপদবিক্ষেপিনী, স্থিরা নীতি যখন ফলোন্মুখী হইয়া আসিল, যখন কুরুকুলের সমস্ত সম্পদ বিনষ্ট এবং ক্ষুদ্র ও মহান্ সমস্ত সহায় একে একে সময় শা-যায় শয়ান হইল, সংক্ষেপতঃ শত্রুবল যখন সম্মুখে উৎপাটিত এবং ভাবী বিপদের সম্ভাবনা পর্যাস্ত তিরোহিত হইয়া গেল, তিনি তখন কূপ-জল-মগ্ন দুর্ঘোষনের প্রতি ক্রোধ করিলেন এবং ক্রোধোদ্গীর্ণ বাক্যে তাঁহার মর্মভেদ করিয়া জ্বরের চিরপো-ষিত বৈর-বহ্নিতে আন্ততি দিলেন। আর প্রেম? যুধিষ্ঠিরের মত রাজনীতিনিপুণ,

রাজ্য-চিন্তা-নিমজ্জিত, রাজ-পদ-লোলুপ, পরিপক্ব ব্যক্তিতে কি কখনও প্রেমের স্বর্গীয় সুধার ভিখারী হয়, এবং প্রেম কাহাকে বলে তাহা হৃদয়ে অনুভব করিতে পারে?

প্রভুত্ববাসনা এবং প্রেম নিত্যবিরোধি।

প্রেমের অঙ্কুরে পরার্থলালসা, পল্লবোৎপাদনে পরাদীনতা এবং পুষ্পিত মৌরভে পরকীয় উপাসনা। প্রভুত্ববাসনার অঙ্কুরে ও পল্লবে, ফুলে ও ফলে সর্বত্রই পরাভিভবচেষ্টা, পরমর্দন, পরনিগ্রহ। প্রেমিক অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও অন্তরে প্রামত্তগুণ, পরকীর মত বসীরান্ হইলেও প্রীতির বসন্তোচ্ছ্বাসে বাতুলিত বস্রী এবং মধ্যাহ্ন মার্ভণ্ডের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ হইলেও প্রাণের অভ্যন্তরে ছোৎস্বার ন্যায় শীতল ও আনন্দভরে ঢল ঢল। প্রভুত্বপ্রিয় কঠোর, নির্ঘম, স্বার্থমাত্র-পরায়ণ, এবং যৌবনেও জরাজীর্ণ। ব্যাসের মহাত্ম্যেতে এবং ব্যাসের সমসাময়িক ভারতে প্রভুত্ব-বাসনার সর্বদিক প্রতিনির্ভীই প্রত্যক্ষ করিতে পাইবে, রাজনীতির অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত দেখিবে, শক্রসংহার এবং কার্যোদ্ধারের জন্য যে সকল উপদেশ দিতে বর্তমান কালের বিবমার্ক প্রভূতি রাজপুরুষেরাও ভীত অথবা কুণ্ঠিত হন, ব্যাসাসনের সন্নিহিত হইলে তাহা হইতেও ভয়ঙ্কর ও বিষয়জনক উপদেশ শুনিয়া স্তম্ভিত ও কটকিত হইবে;— তথায় কোন সময়ে কণিকের সহিত আলাপ করিবে, কোন সময়ে ভারত-বিগ্রহের বী-

জমন্ত্র মহাগতি বাসুদেবের কুটিলীনা দেখিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় রহিবে; কখনও কণিকনির মন্ত্রণা শুনিয়া স্বংকল্পে চমকিয়া উঠিবে, এবং কখনও বা মঙ্গলগীর অর্ধদম যুদ্ধ অথবা পাণ্ডবশিবিরে অশ্বখামার নৈশ আক্রমণ দেখিয়া অশ্রুপাত করিতে থাকিবে। কিন্তু আদি হইতে অন্ত সমগ্র মহাভারতে কোথাও প্রেমের কুসুমশোভা দেখিতে পাইবে না। প্রভুত্ব ও পদবৈভবলব্ধ ভারতবর্ষ তখন প্রীতিকে নীরস নির্মাল্য পুষ্প জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়াছিল, ভারতের তদানীন্তন সাহিত্যেও স্রুতরাং ইহা উপেক্ষিত হইয়াছে।

প্রেমের বিকাশ রামায়ণে অন্যরূপ।

যদি কেহ সংসারের দুঃখ-দাহে দগ্ধ হইয়া এবং মনুষ্য চরিত্রে অচরিত বিশ্বাস-বাতকতা ও নির্ঘম নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া শান্তির জন্য লালসিত হন, তিনি বাসীকির কল্পকাননে প্রবেশ ককন। যদি কেহ পৃথিবীর কুটিল ব্যবহারে ক্লিষ্ট এবং প্রিয় পরিজনের ছলনা ও বঞ্চনার অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিষয়ে নিরাশ হন, তিনি লোক-পাবনী রামায়ণী গঙ্গায় অবগাহন ককন। ফলতঃ, বাৎসল্য, ভক্তি এবং দাম্পত্যপ্রীতি প্রভূতি প্রেমের যত প্রকারের মুক্তি অদ্য পর্য্যন্ত মনুষ্য-কম্পনার প্রতিভাত হইয়াছে, রামায়ণে তাহা স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণে লিখিত রহিয়াছে, এবং জগতের সমস্ত সাহিত্য মধ্যে একমাত্র রামায়ণেই তাহা পূর্ণতা পাইয়াছে।

রামায়ণে অপভ্রাতা বাৎসল্য দশরথের, অলৌকিক ও অপূৰ্ণ । রাজা দশরথ বহু-বিছাহ প্রভৃতি বহুদোষে লিপ্ত এবং ত্রৈণ-তার জন্ত নিন্দনীয় হইয়াও পুত্রের প্রতি ভক্তি এবং পুত্র-বৎসলতার জন্য মনুষ্য-জগতে চিরস্মরণীয় ও ভক্তিভাজন হইয়া-ছেন । যেমন সূৰ্য্য-বিরহে সংসার অন্ধ-কারে রহে, তিনিও রাম-বিরহে সেইরূপ অন্ধকারে রহিতেন । রামকে তিনি শুধু ভাল বাসিতেন না, রামচন্দ্রেই তিনি প্র-কৃত জীবিত থাকিতেন । যখন রাম বিশ্বা-মিত্রের সহিত মিথিলায় গেলেন, তিনি সেই কণিক বিরহে জীবন্ত রহিলেন ; এবং যখন রাম কৈকেয়ীর সভ্য-পাশে বদ্ধ হইয়া বনবাসী হইলেন, তখন তিনি, যেন কোন অলঙ্কিত নিয়মের শাসনে, জীব-নীলা সংবরণ করিলেন । এই চিত্র দর্শ-নীয় । যে জগতে শোকের পরই সুখ-স্পৃহা, এবং সুখস্পৃহার সঙ্গে সঙ্গেই বি-শ্রুতি ও বিষয়-তৃষ্ণা,—যে জগতে এক-চক্ষু অশ্রুধারা বর্ষণ করে, আর এক চক্ষু ভোগ্য বস্তুর প্রতি প্রদানিত হয়, এক হস্ত কপালে আঘাত করে, আর এক হস্ত লাভালাভের অক্ষপাতে ব্যাপ্ত হয়, অধিক আর কি, যে জগতে জনক-জননী-কৃত অপভ্রাতািগ্রহ এবং অপত্যের প্রতি বঞ্চনারও সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত নিয়ত স-ম্মুখে পড়ে, সেই জগতে দশরথের এই কবি-জনস্পৃহণীয় আলেখ্য খানি নয়ন ভরিয়া পান করিলেও হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়না ।

রামায়ণে বাঁচার নাম ভরত, মহাভা-রতে তাঁহার নাম দুৰ্য্যোধন ; এবং রামা-য়ণে বাঁচার নাম লক্ষ্মণ, মহাভারতে তাঁ-হার নাম অভয়ানু । ভরত আর দুৰ্য্যোধনের ভ্রাতৃ-প্রেম-গত পার্থক্য সামান্যতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে । যে নিতান্ত অন্ধ সেও হই বুদ্ধিত পারিবে যে, ভরত সৰ্ব্বাংশে রাম-সদৃশ না হইলেও প্রায় দ্বিতীয় এক রাম ; এবং রামচন্দ্রের মত ভারতীয় সাহিত্যের আর এক বিশাল কীর্ত্তি-স্রষ্টা ;—শৈর্ষ্য ও সাহসে অপ্রমেয়, অথচ শ্রীতিতে নবনীত-সম, ভ্যাগে অকুণ্ঠিত । এই মহাপুরুষ পি-তৃসত্তাপ্রাণ্যে সাগরাস্বরা ভারত ভূমির সাম্রাজ্য পদ পাঁইয়াও ভ্রাতৃশ্রদ্ধের নিকট তাহা তৃণ হইতে ছীনজ্ঞান করিয়াছেন, এবং যৌবনে যোগী সাজিয়া, মাথায় জটা বা-ন্ধিয়া, ভ্রাতৃর অশ্রুধরণে বনে বনে ভিখারীর মত বেড়াইয়াছেন । মহাভারতে ইহঁদের সাদৃশ্য কোথায় ? যেখানে ভরত ভ্রাতৃকে সৰ্ব্বশ্রম সমর্পণ করিয়াও অতৃপ্ত, মহাভা-রতে প্রতিরোধী দীর ভ্রাতৃর সৰ্ব্বশ্রম আত্ম-সাহ্য করিয়াও সেখানে অপরিতৃপ্ত । কিন্তু ভরতের ভ্রাতৃভাব যদি পূজনীয়, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভাব যেমন পূজনীয়, তেমনই শ্রীতি-জনক । আমাদের বিবেচনার মনুষ্য-লোকে ইহার তুলনাস্থল নাই । এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা পৃথিবীর এই চারি প্রদেশে শুদ্ধ ভারত ক্ষেত্রে এবং বায়ী-কর সময়েই ইহঁরা সা সাগরে প্রদর্শিত ও সাহিত্যে অঙ্কিত হইয়াছে । অন্য কোথাও

ইহার ছায়াপাত হয় নাই। সুতরাং হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতি যে, এইরূপ অ-লোক-সামান্য ভ্রাতৃত্ববোধের সমর্থ পাঠ এবং মাহাত্ম্য অনুভব করিতে সমর্থ হইবে, এমন আমরা প্রত্যাশা করি না।

প্রীতির প্রাণ আত্মোৎসর্গ। লক্ষ্মণ সেই আত্মোৎসর্গের সজীব প্রতিমূর্তি। লক্ষ্মণ স্ত্রী জানিতেন না, পুত্র জ্ঞাতিতেন না, বিষয় বৈভব, মান আপমান, এবং সংসারের মূখ দুঃখ কিছুই জানিতেন না; তিনি জানিতেন একমাত্র ভ্রাতা;—ভ্রাতাই তাঁহার জীবনের ধ্রুব নক্ষর ছিলেন। যখন সত্যের অনুরোধে রাম ও লক্ষ্মণ এই দুই ভ্রাতার বিচ্ছেদ হইল, তাঁহারা উভয়েই তখন সরসুর জলে প্রাণত্যাগ করিলেন। দুই দেহে একপ্রাণ; সেই প্রাণ-রজ্জ্বর যখন প্রান্তে স্বেদন হইল, দুইটি দেহই তখন ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। বীরত্বে লক্ষ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী কে? বুদ্ধির প্রখরতা, প্রকৃতির মহত্ব এবং চরিত্রগৌরবে লক্ষ্মণ কাহার নিকট হীনপ্রভ? কিন্তু ভ্রাতৃত্ব-প্রেম তাঁহার সমস্ত আত্মাকে এমন গ্রাস করিয়া রাখিয়া ছিল যে, তাঁহার আর পৃথগস্তিত্ব ছিল না। তিনি পৃথগস্তিত্ব ভাল বাসিতেন না। তিনি ভক্তিতে আনত এবং প্রীতিতে তগদত হইয়া একবারে ভ্রাতৃজীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং শৈশব হইতে বার্কাক্য পর্যন্ত যতকাল জী-

বিত ছিলেন, ততকাল ঐ এক ভাবেই অটল রহিয়াছিলেন।

মহাভারতে এই ভ্রাতৃত্ববোধের অনুকরণ চেষ্টা আছে, কিন্তু অনুকৃতি নাই। কালের পরিবর্ত্তে তখন লোকের প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং তখন সকলেই আপনার মান, আপনার গৌরব, আপনার শ্রুত ও পদমর্যাদা অক্ষত রাখিয়া ভাগবাসিত এবং ভ্রাতৃত্বপ্রেমেও বহুল পরিমাণে রাজনীতির প্রয়োগ করিত। ইহার দংশ প্রমাণের মধ্যে প্রধান এক প্রমাণ যাতুরের নিন্দায় যুধিষ্ঠিরের নিগ্রহ। কর্ণভয়ভীত যুধিষ্ঠির কর্ণকে যুদ্ধে অজিত জানিয়া, সেই যাতুরের নিন্দা করিলেন, যাতুরধারী অর্জুন অমনি অশেষ প্রকারে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া তাঁহার প্রাণনাশে উদ্যত হইলেন। যুধিষ্ঠির যে তাঁহাকে শিশুকাল হইতে সন্তানের ন্যায় লালন পালন করিয়াছেন, ইহা তখন তাঁহার মনে রহিল না। তখন শুধু আত্মগৌরবেই তাঁহার মনে রহিল, এবং স্বার্থ-বুদ্ধিই তাঁহার চিত্তকে পরিপ্লুত করিল। পুরাতন সমস্ত কথা ছদ্ম হইতে প্রক্ষালিত হইয়া গেল। ব্যাস লিখিয়া গিয়াছেন যে, অর্জুন ক্ষণকাল পরেই ঐ পাদপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত প্রায়শ্চিত্তও সর্বথা সেই স্বার্থ-চিন্তার কুটিল কালের উপযুক্ত। ভ্রাতৃত্বজন্য পাদপের প্রায়শ্চিত্ত কি?—না, আত্মপ্রশংসা)

সায়নবাদ

প্রথম প্রস্তাব।



সায়নবাদ কি ? বোধ হয় তাহা অনেকেরই অজ্ঞাত আছে ; এজন্য বলিয়া দিতেছি, “সায়নবাদ” জ্যোতিষের একটি অঙ্গ। প্রাচীন জ্যোতিষের মধ্যে গ্রহরাজ সূর্যের দ্বিবিধ সঞ্চারের কথা লিখিত আছে। সায়ন ও নিরয়ন। এই প্রস্তাবে আমরা পুরাতন জ্যোতিষের সঙ্গে ইন্ডুরো-রোপীয় ও দেশীয় নবীন জ্যোতিষিক সিদ্ধান্তের প্রভেদ দেখাইব বলিয়া প্রস্তাবটির মন্তকে “সায়নবাদ” মুকুট প্রদান করিলাম।

জ্যোতিঃশাস্ত্র অতি গহন ; তন্মধ্যে সঙ্কন্দ-বিচরণ অনেকের ভাগ্যে ঘটে না। চূতন জ্যোতিষের প্রচারাবধি পুরাতন জ্যোতিষের প্রতি নব্য সম্প্রদায় হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, বুদ্ধেরা অতি অজ্ঞ ছিল। কিন্তু প্রভেদের কারণ কি ? ভ্রমক্রমেও একবার চিন্তা করেন না ; চিন্তা করা আবশ্যিকও মনে করেন না। পরন্তু দেশীয় জ্যোতিষের পুনরুজ্জ্বলিত নিমিত্ত যে চিন্তাকর আবশ্যিক, তাহা সকলেরই স্বীকার করা কর্তব্য। ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষের পূর্সাবস্থা ও মূলতত্ত্ব—মধ্যাবস্থা ও তাহার মূলতত্ত্ব,—বর্তমান অবস্থা

ও ইহার মূলতত্ত্ব ;—চিন্তাশীল ব্যক্তির। যদি আর কিছুকাল এই সকল বিষয়ের চিন্তা না করেন ; তাহা হইলে নিশ্চয়ই এদেশের মহা অনিষ্ট ঘটবে। তাঁহারা ভ্রম-বিলসিত গণনার কুহকে পড়িয়া গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতুকালের বিপর্যয় করিয়া ফেলিবেন, আর বলিবেন “ হায় ! কলিকালের কি প্রভাব ! শীতের সময় শীত নাই, গ্রীষ্মের সময় গ্রীষ্ম নাই, বর্ষার সময় বর্ষা নাই। অকালে বর্ষা, অকালে গ্রীষ্ম ! হ-বেইত ! না হওয়াই দোষ। হইলে শাস্ত্র সত্য হয়, ইত্যাদি—” অতএব পুরাতন জ্যোতিষের সঙ্গে নূতন জ্যোতিষের যে প্রভেদ ঘটিয়াছে, তাহা এবং তাহার মূলানুসন্ধান করা অতীব কর্তব্য।

প্রভেদ আছে, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু কোন্ কোন্ অংশে কি কি প্রকারের প্রভেদ ঘটিয়াছে, তাহা হয়ত সকলে জ্ঞাত নহেন। সাধারণের অস্বপ্নিত নিমিত্ত সর্বাণ্ড্রে একটি তালিকা প্রদান করিতেছি। এতদ্বারা জানিতে পারিবেন যে, প্রাচীন সিদ্ধান্তের সহিত নবীন সিদ্ধান্তের কত প্রভেদ।

প্রাচীন সিদ্ধান্ত।

তালিকা

নবীন সিদ্ধান্ত

- ১। পৃথিবী স্থির, সূর্য্যাদি গ্রহমণ্ডল তা-
হাকে বেষ্টিত করিতেছে।
- ২। পৃথিবীর ব্যাস ১৬০০ যোজন।
- ৩। চন্দ্র বিশ্ব ব্যাস ৪৮০ যোজন।
- ৪। সূর্য্য বিশ্ব ব্যাস ৬৪০০ যোজন
- ৫। চন্দ্র, ভূ-কেন্দ্র হইতে ৫১৫৬৬ পরি-
মিত যোজনান্তরে আছেন।
- ৬। সূর্য্য ভূ-কেন্দ্র হইতে ৬১৯৩৭৭ যো-
জনান্তরে আছেন।

- ১। সূর্য্য স্থির; পৃথিবী স্বকেন্দ্রক ভ্রমণ
দ্বারা তাহাকে পরিক্রমণ করিতেছে।
- ২। পৃথিবীর ব্যাস ৮৭০ যোজন।
- ৩। চন্দ্র বিশ্ব ব্যাস ২৩৮ যোজন।
- ৪। সূর্য্য বিশ্ব ব্যাস ৯৭০০০ যোজন।
- ৫। চন্দ্র ভূকেন্দ্র হইতে ২৬১৩৪ যোজন-
নান্তরে আছেন।
- ৬। সূর্য্য ভূকেন্দ্র হইতে ১০৪৩২১৫৪
যোজনান্তরে আছেন।

৭। মঙ্গলাদি গ্রহগণের বিশ্বমান।

গ্রহ	কলা	বিকলা
মঙ্গল	৪	৪৫
বুধ	৬	১৫
রহস্পতি	৭	২০
শুক্র	৯	০
শনি	৫	২০

গ্রহ	কলা	বিকলা
মঙ্গল	৬	২৯
বুধ	৬	৪৯
রহস্পতি	৩৬	৭৪
শুক্র	১৬	১
শনি	১৬	২

- ৮। ভূকেন্দ্র হইতে সূর্য্য যত দূরে, নক্ষত্র
সকল তাহার ৬০ গুণ দূরে; এবং
তাহার সূর্য্যতেজে প্রকাশ পায়।
- ৯। সকল গ্রহেরই যোজনাস্বক গতি
তুল্য এবং তাহাদের কক্ষাকৃত
স্বরূপ।
- ১০। এক নিরয়ন সৌর বৎসরে ৩৬৫
দিন, ১৫ ঘটিকা, ৩০ পল।
- ১১। চন্দ্রের চক্রভোগ কাল ২৭ দিন,
৭ হোরা ৪৩। ১১. ৩। ১২। সূর্য্যের
পরম ক্রান্তি ২৪ অংশ।

- ৮। ভূকেন্দ্র হইতে অসীম অন্তরে, এবং
ইহাও নির্ণীত হইয়াছে যে, উহার
ভূকেন্দ্র হইতে সমান অন্তরে নহে
ও আপন তেজেই প্রকাশ হয়।
- ৯। গ্রহদিগের যোজনাস্বক গতি বিষম
অর্থাৎ সকলের সমান নহে এবং
তাহাদের পথ বৃত্তাকার।
- ১০। একনিরয়ন সৌরবর্ষে ৩৬৫।১৫।২২।পল
- ১১। চন্দ্রের চক্রভোগ কাল ২৭ দিন, ৭
হোরা ১৩।১১-৫৪।১২।সূর্য্যের পরম
ক্রান্তি ২৭ অংশ, ২৭ কলা।

ইত্যাদি।

ইত্যাদি।*

* ইংরেজী মান বাঙ্গলায় হিসাব করিয়া দেওয়া হইল

নবীন সিদ্ধান্তের সহিত প্রাচীন সিদ্ধান্তের এত প্রভেদ। নিদর্শনের জন্য অতীত পুস্তক সংখ্যক বিষয় প্রদর্শিত হইল। পরন্তু এইরূপ বিষয়ের ভারতম্য বা প্রভেদ আছে। প্রভেদ ঘটনার কারণ নানাবিধ। কতক গজ্জতা নিবন্ধন ভ্রম, কতক বা রূপক কল্পনা, কতক বা গাণিতিক পরিভাষার বিশেষার্থ। ঘটনা এবং কতক কালপরিবর্তনের ধর্ম। হয়ত পূর্বকালে কথিত প্রকারই ছিল, পরিবর্তিত বর্তমান কালে নব্য সিদ্ধান্তের অনুরূপ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।

জ্যোতির্বিদ্যা কেবল বেধ-মূলক। বেধই জ্যোতির্বিদ্যার জীবন। যদি এখনও চেষ্টা করা যায়, কোন নিপুণ ব্যক্তি যদি এক্ষণ হইতে নানাবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে বেধ নির্ণয় করিয়া প্রাচীন জ্যোতিষের সংস্কার সাধনে প্ররত্ত হইতেন, তাহা হইলেও অনন্ততঃ অনেকাংশের বৈশিষ্ট্য সাধন হইতে পারে। “বেধ-করণ” ক্রিয়ার চর্চা বহুকাল যাবৎ ভারত হইতে উঠিয়া গিয়াছে। তাহাতেই এত ক্ষতি। কিন্তু সর্বপ্রথমে যখন এদেশে জ্যোতির্বিদ্যার সঞ্চারণ হয়, তখন যে বেধক্রিয়া অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে কিনা প্রথমকার বেধক্রিয়া কতকটা আনুমানিক, এজন্য সম্পূর্ণ সূক্ষ্ম না হইতেও পারে।

প্রাগুক্ত প্রভেদ সমূহের মধ্যে কতকগুলি কেবল কাল-পরিবর্তনের সাহায্যেই

ঘটিয়াছে, বলা হইতে পারে। বিশেষ, সিদ্ধান্ত নামক জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থ আছে, “ইখং মাণ্ডব্য! সংকেপাঙ্কুং শাস্ত্রং ময়োদিতব্।

বিভ্রস্তো রবিচন্দ্রদৈর্ভবিষ্যতি যুগে যুগে ॥”

হে মাণ্ডব্য! এবজ্জুত জ্যোতির্বিদ্যাটি আমি তোমায় সংক্ষেপে বলিলাম। পরন্তু চন্দ্রসূর্য্যাদির দ্বারা যুগে যুগে ইহার ব্যতিক্রম ঘটনা হইয়া থাকে।

অতএব কত কাল-কালান্ত অতীত হইয়া গিয়াছে, অথচ তাহার বেধ সংস্কার হয় নাই এরূপ হইলে গণনার ব্যতিক্রম না হইবে কেন? সূর্য্যের পরমক্রান্তি, তাহার চক্রভোগ কাল, ইত্যাদি পদার্থত ঠিক না হইবারই কথা। মধ্যে মধ্যে যদি বেধক্রিয়ার দ্বারা নির্ণয় করিয়া পুরাতন গ্রন্থের সংশোধন ও নব নব গ্রন্থের রচনা করা হইত, তাহা হইলে কখনই এত ভারতম্য ঘটত না। ভারতবর্ষে যখন জ্যোতির্বিদ্যার সমুহ উন্নতি, তখন তাঁহার যে উপদেশটি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, পরভাবী গণক মহাশয়েরা যদি তাহা পালন করিতেন, তাহা হইলে কদাচ বিন্দু-বিসর্গেরও ত্রুটি হইত না। সেই উপদেশটি এই,—

“যস্মিন্ পক্ষে যত্র কালে যেন দুর্গাগিতৈক্যকম্।
দৃশ্যতে যেন পক্ষেণ সূর্য্যাং তিথ্যাং নি-
র্গমম্ ॥”

(এটি স্রুতি নামে প্রসিদ্ধ।)

বে পক্ষে যে সময়ে যদ্বারা দৃষ্টি ও

গণিতের ঐক্য সাধিত হয়, সেই পক্ষে সেই সময় অনুসারে তিথি আদির নির্ণয় করিবেনক।

পরভাবী আচার্যেরা যদি পূর্ব ঋষিদিগের এই উপদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের গ্রন্থ নির্মাণ কালে তৎসাময়িক জ্যোতিঃপদার্থের বৈধিক্রিয়া, অনুমান ও প্রত্যক্ষ পরীক্ষা একত্র বা ঐক্য করিয়া তত্তৎগ্রন্থ নির্মাণ করাই কর্তব্য ছিল। কিন্তু অনেকে তাহা করেন নাই, কেবল কতকগুলি বাক্য সংগ্রহ করিয়া বাগ্গিচর দ্বারা গ্রন্থ গুলিকে কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

যে সময়টিতে দিব্যমান ও রাত্রিমান তুল্য হয়, তাহাকে বিহুবপাত বলে। সূর্যের বিহুব রেখা স্পর্শই এই দিব্যরাত্রির তুল্যতা ঘটনার কারণ। বিহুব-সঞ্চার অনুসারেই “মহাবিহুব সংক্রান্তি” ও “জলবিহুব সংক্রান্তি” নাম হইয়াছে। অতি পুরাতন কালের কোন এক সময়ে বসন্ত ঋতুর প্রথমার্দ্ধ সমাপ্তি কালে সূর্যের বিহুব সঞ্চার হইয়াছিল। দিব্যমান ও রাত্রিমান তুল্য হইয়াছিল। তদনুসারে তাহার “মহাবিহুব সংক্রান্তি” নাম হয়। কিন্তু এখন তাঁহার অনেক পূর্বে অর্থাৎ চৈত্রমাসের ১০ই তারিখে দিব্যরাত্রি সম্ভব হইতেছে, তথাপি আমরা সেই বৈশাখ মাসের মহাবিহুব সংক্রান্তিই ধরিয়া আছি। যদিও লম্বাদি নির্ণয় কালে তাহার শোধন করিয়া লওয়া হইয়া থাকে অর্থাৎ অয়-

নাংশ করিয়া তাহার সম্যক সঙ্গীতন করা হয়, তথাপি তাহাকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ রূপে বলা যাইতে পারে না। এতদপেক্ষাও শোধনের কোন বিশেষ নিয়ম করা উচিত।

অনেকে বলিতে পারেন, যে এহংগত ও ক্রান্তি প্রভৃতি যেন লড়িয়া গিয়াছে, শোধন করিয়া লইলেই হইল; কিন্তু এমন কতক গুলি বিষয় আছে, যাহা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা বা ভ্রমের ফল ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। যথা—“পৃথিবী স্থির, সূর্যই তৎকেন্দ্রক পরিভ্রম করেন, নক্ষত্র সকল স্মরণ্য তেজস্বী নহে, সূর্যের তেজেই প্রকাশ পায়।” ইত্যাদি।

সত্য বটে, নবীন সিদ্ধান্তটি অনেকাংশে যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু এই সত্য তৎকালীয় কাহারও হৃদয়ে উদ্ভিত হয় নাই, এরূপ নির্ধারণ করা যায় না। হি সহস্রাব্দিক বর্ষ পূর্বে আর্থাভট্ট ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। পরন্তু আমাদের বিবেচনা হয়, তৎপূর্ববর্তী ঋষিদিগের মনেও এই সত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। কারণ এসমস্ত কথা এরূপ গভীর ভাবে উল্লিখিত আছে যে, তাহা চলৎপৃথ্বীপক্ষে লইয়া গেলেও যাওয়া যায়। তবে যে তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া পৃথিবী স্থির বলিয়াছিলেন, তাহার অভিপ্রায় বোধ হয় এই এবং ইহা সাধু অভিপ্রায় বলিয়াই বোধ হয়। যথা,—

পৃথিবী সচলা, ইহা ব্যক্ত না করিলেও কতি নাই। বরং পৃথিবীর চলবস্থা বর্ণন করাতে ক্ষতি আছে। একটাকে ঘুরাইতে

হইবে, নচেৎ গণনাসিদ্ধি হয় না। সূর্য্য কি পৃথিবী একের ঘূর্ণন কল্পনা করিলেই যখন সমস্ত গণনাসিদ্ধি হয়, তখন অনুমান-গম্য পৃথিবী ঘূর্ণন অপেক্ষা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সূর্য্য ঘূর্ণনের বর্ণনা করাই ভাল। ইহাতে গণনার কোন ইতি কৰ্ত্তব্যতার ক্ষতি নাই, অগচ সাধারণ লোকের সহজ বোধ্য। ইত্যাদি।

ঋষিদিগের অভিপ্রায় যে এইরূপ ছিল, মহাভারতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

“ইমাং মহীং ঠৈলবনোপপন্নান্

সসাগরপ্রোমবিহারযুক্তান্।

ত্বং শেষ ! * * * চলিতাং যথাবৎ,

সংগৃহ্য তিষ্ঠস্ব যথাহুচলা স্যাৎ । ”

আদিপর্কের আন্তীক পর্ব্বায় এই স্লোকটির ভঙ্গী দেখিয়া অনুমান হয় যে, ব্যাসের সময়ের ঋষিরা এবং তৎপূর্ব্ববর্তী ঋষিগণ, পৃথিবীর চলবন্ধ বুঝিতে পারিয়াও লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হন নাই। এই সময়েই পৃথিবীর “অচলা” নাম এবং পৃথিবী স্থির, সূর্য্যাদি গ্রহগণ ভ্রমণ-শীল, এই প্রকার মতের প্রাবল্য হয়। বহু কালের পর আবার আর্ধ্যভট্ট বিলুপ্ত মতের পুনঃ প্রচার করেন।

অনেকে বলিতে পারেন, ব্রহ্মা যে শেষ নাগকে সচল পৃথিবী নিশ্চল করার জন্য আদেশ করেন, সে নিশ্চলতা অন্যবিধ। পূর্বে বোধ হয় সর্ব্বদাই ভূ-কল্প হইত, পৃথিবী তাহাতে অস্থির হইতেন। সেই চাঞ্চল্য নিবারণের জন্যই

ব্রহ্মা, শেষ নাগকে আদেশ করেন। অদ্যাপি এদেশে ঐরূপ জন প্রবাদ প্রচলিত আছে। এবং এক্ষণ পর্ব্বন্তুও এদেশীয় অজ্ঞলোকেরা ভূকল্পের সময় বলিয়া থাকে যে, “বান্দুকী মাথা বদল করিতেছেন।” অতএব পৃথিবীর প্রকৃত চলবন্ধ-জ্ঞান ঋষিদিগের ছিল কিনা সন্দেহ।

যদিও এই আপত্তির প্রকৃত উত্তর করিতে না পারি, তথাপি ইহা নির্দেশ করা যাইতে পারে যে, এ সময়ে ঋষিদিগের একেবারেই কিছু জ্ঞান ছিল না এমন নহে। অন্ততঃ চলবন্ধ জ্ঞানটি সংশয়ের আকারে ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। কেন না প্রদর্শিত স্লোকের উত্তরে এবং অন্যান্য স্থলে দেখা গিয়াছে, “চলিত” শব্দের পৃষ্ঠে “নিয়ত” “সদা” প্রভৃতি এক একটি বিশেষণ আছে। কোথাও “আবর্তন” শব্দ আছে। স্মরণ্যং “নিয়ত-চলন” এইরূপ শব্দ দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঘূর্ণনরূপ চলন লক্ষ্য করিয়াই তাহার। ঐ সকল কথা লিখিয়াছিলেন। যাহা হউক এ সকল বিষয়ের বহু আন্দোলন নিশ্চয়োজন। পৃথিবীই ঘূর্ণন, আর গ্রহেরাই ঘূর্ণন, একটি ঘুরিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। কেন্দ্রী মত্যা তাহা না দেখিলেও হানি নাই। কিন্তু অন্যান্য গণনার অংশগুলি অসত্য হইলেই এদেশের ভয়ানক ক্ষতি।

“গ্রাহল্যাবব” নামে একখানা জ্যোতিষ্ম আছে, ইহা অনাধিক ৪০০ শত বৎসর পূর্বে গণেশ ঠৈবজ্ঞ কর্তৃক রচিত।

নাগেশ দৈবজ্ঞ বর্ধন এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তখন তিনি বেদজ্ঞানার সহিত প্রত্যক্ষ দর্শনের একা রাখিয়াই করিয়াছিলেন। সুতরাং উক্ত পুস্তকখানি অদ্যপি নির্দোষ আছে।

রাজা জয়সিংহ বারাণসীতে একটি বেদ্যালয় নির্মাণ করিয়াছিলেন। দুঃখের

বিষয় তিনি পুরাতন জ্যোতির্গ্ৰন্থ গুলির সংস্কৃতি করিবার অভিপ্রায় করিয়াই পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। বারাণসীতে বেদ্যালয় বা মন্দিরের বর্ণনা দ্বারা পাঠকবর্গের চিত্তরঞ্জনের অভিলাষ রহিল।

শ্রীকালীবর বেদান্ত বাগীশ।

ভারতবর্ষীয় ভাষা।

বৈজ্ঞানিকগণ ভারতবর্ষের যাবতীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া ইহাকে একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। ভারতে ভূমণ্ডলের প্রত্যেক প্রকৃতি অল্প বা অধিক পরিমাণে পরিমল্লিত হয়। তদ্বিবয়ের সম্যক আলোচনা জামাদের বিষয় ও উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। ভারতবর্ষে প্রায় বিংশতি কোটি মানব বাস করে। এই মানবসমূহ অসংখ্য সংখ্যক স্বতন্ত্র জাতিতে বিভক্ত। ইহাদের সামাজিক ব্যবহারাদি পরস্পর অনৈক্য। ভারতবর্ষের বিংশতি কোটি মানব বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র ভাষায় কথোপকথন করে। সেই ভাষা সমূহের উৎপত্তি নির্ণয় করাই উপস্থিত প্রস্তুতাবের উদ্দেশ্য।

ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, আর্যেরা ভারতের আদিম অধিবাসী নহেন। আর্যদিগের আগমনের পূর্বে এদেশে নিতান্ত অসভ্যজাতি সমূহ বাস

করিত। আর্যেরা ভারতভূমে প্রবেশ করিয়া ইহার অসভ্য অধিবাসিনীচরকে বিদূরিত করেন। তাঁহাদের উৎপাতে উৎপীড়িত হইয়া প্রাচীন অধিবাসিগণ অধিকাংশ দাক্ষিণাত্য নামক জনহীন অরণ্য মধ্যে, অবশিষ্টেরা দুর্গম হিমাচল আশ্রয়ে প্রস্থান করে। এই অসভ্যজাতিদিগের ভাষা তাহাদের স্বভাবানুগত ছিল। আর্যেরা পবিত্র-সলিলা গঙ্গা ও যমুনা নদী-ঘরের অন্তর্ভূমে আবাস সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ভূবনবিখ্যাত সংস্কৃত ভাষা আর্যদিগের সহিত ভারতভূমে প্রবেশ করে। দেব-ভাষা সংস্কৃতমধ্যে বেদ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা এতই প্রাচীন যে, ইহার প্রণেতা কে, তাহা অধুনা নির্ণয় করা অসাধ্য। ইহার প্রাচীনত্ব হেতুই হটক, বা ইহার পবিত্রতা রক্ষা করিবার নিমিত্তই হটক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হটক, হিন্দুগণ বেদকে অপৌকবেয় ব-

লিঙ্গা থাকেন। বথা ;—

ঐজমিনী—১।১।৩২ সূত্রের অষ্টমাধিকরণ

“ পৌকষেরং নবা বেদ-
বাক্যং স্যাৎ পৌকষেরতা ।
কাঠকাদি সমাখ্যানাৎ
বাক্যভাট্যান্যবাক্যবৎ ॥

- সামাখ্যাখ্যাপকভেদ
- বাক্যভুক্ত পরাহতম্ ।
- তৎ কর্ণনুপলভ্তম
- স্যাত্ততোঃপৌকষেরতা ॥ ”

বেদের ভাষা প্রচলিত : সংস্কৃতের স-
হিত সমান নহে। এই জন্য প্রচলিত সং-
স্কৃত ব্যাকরণ অভ্যাস করিলে বেদশাস্ত্রে
প্রবেশ করা যায় না। সংস্কৃতের পরেই
বা সমকালে প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি
হয় * । সংস্কৃত যেরূপ সুসম্পন্ন, সর্ব্বাঙ্গ

* কোন কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত বি-
বেচনা করেন যে, প্রাকৃত ভাষাই অর্থাৎ
দিগের অতি প্রাচীন ভাষা। আমরা এ-
স্থলে তাঁহাদিগের যুক্তিনিচয় একটন ক-
রিতেছি।

তাঁহারা বলেন সংস্কৃতের ন্যায় কঠিন
ভাষা, কদাচ কথোপকথনের উপযোগী
নহে। ইহা কস্মিন্ কালে কথিত হইয়াছিল
কিনা সন্দেহ। কথিত ভাষা স্বতন্ত্র ছিল।
সেই ভাষার নাম প্রাকৃত। সেই প্রাকৃত
ভাষাকে ‘সংস্কৃত’ অর্থাৎ বিশুদ্ধ করিয়া
কাব্য দর্শনাদি লিখিবার নিমিত্ত যে ভাষা
সৃষ্ট হয় তাহার নাম সংস্কৃত। তাঁহারা
প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষাঘরের প্রকৃতি প-

সুন্দর ও কঠিন ভাষা, তাহাতে সত্ত ক-
থোপকথনে সংস্কৃত ব্যবহার করা সহজ
নহে। বোধ হয় এই জন্যই কথোপখন
কার্য সুনির্বাহিত করিবার নিমিত্ত অল্প
ভাষার প্রয়োজন হইয়া উঠে। প্রাকৃতের
উদ্ভব হইয়া সেই প্রয়োজন সংকুলান
করে।

সংস্কৃত ভাষা হইতে যে প্রাকৃতের
উৎপত্তি, এ সম্বন্ধে বিস্তর অকাটা প্রমাণ
আছে। বরকচি সংস্কৃত ভাষার অতি প্রা-
র্য্যালোচনা করিয়া তাহাদের প্রসূতী ও
প্রসূতা সম্বন্ধ অনুমান করেন। আমরা পা-
ঠকবৃন্দের গোচরার্থ করেকটি প্রাকৃত ও
তাহার সংস্কৃত শব্দ নিম্নে লিখিতেছি।

প্রাকৃত	সংস্কৃত
গদ	গত
হত	হন্ত
পচ্চিম	পশ্চিম
লোনম্	লবণম্
শ্বান	স্থান
গাম	গ্রাম
হলদ্রা	হরিদ্রা
মাদরম্	মাতরম্
অগ্নিম্	অগ্নিম্
বাক্সান	ব্রাহ্মণ
চয়ুমি	চতুর্থী
চয়ুম্শী	চতুর্দশী
ছত্ৰী	বর্তী
ছণ	ক্ষণ
একণ্ধ	একস্থ

তীক্ষ্ণ বৈয়াকরণ। তিনি প্রাকৃতকে সংস্কৃত-
সম্ভূতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। স্থান-
ভেদে ও ব্যবহার-ভেদে প্রাকৃতের বিস্তার
রূপান্তর হয়। “প্রাকৃত-প্রকাশে” প্রাকৃ-
তের চারি ভাগ উক্ত হইয়াছে। যথা;—
(১) মহারাষ্ট্রীয়, (২) পৈশাচী, (৩) মা-
গধী, (৪) শৌরসেনী। এই ভাষানিচয়
মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় ভাষা প্রধান প্রাকৃত
বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। প্রাকৃতের দ্বি-
তীয় রূপান্তর পৈশাচী ভাষা, শৌরসেনী
ভাষা হইতে সমুদ্ভূত। বরফচি প্রণীত

মশ্বক	মস্তক
পবিদা	প্রপিতা
অস্তি	অস্তি
	ইত্যাদি

এই তালিকাদৃষ্টে আমাদের বিবেচ-
নায় প্রাকৃত সংস্কৃত-মূলক বলাই যুক্তি-
যুক্ত। তাঁহার আরও কছেন, ‘প্রকৃতিস্ত
চাপরে জনাঃ’ এরূপ বিবেচনা না করিয়া
“প্রকৃতি” অর্থাৎ স্বভাব “প্রাকৃত” অ-
র্থাৎ চিরাগত বিবেচনা করিলে, প্রাকৃতের
প্রাচীনত্ব সমর্থিত হয়। ইত্যাদি রূপ কত-
কগুলি যুক্তি অবলম্বন করিয়া কোন কোন
পণ্ডিত প্রাকৃতকে সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাচীন
বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু আমরা
এ কথার কোন সামঞ্জস্য করিতে পারি
না। আমাদের মতে এ সকল যুক্তি অতি
সামান্য বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং পণ্ডিত
মণ্ডলীকে ইহার মীমাংসা করিবার ভার
দিতেছি।

“প্রাকৃত-প্রকাশ” গ্রন্থের মনোরমাখ্যাত
টীকাকার লিখিয়াছেন যে,—

“পিশাচানাম্ ভাষা পৈশাচী। অসা
পৈশাচাঃ প্রকৃতিঃ শৌরসেনী।”

পিশাচদিগের ভাষা পৈশাচী। এই
পৈশাচীর প্রকৃতি শৌরসেনী।

বরফচির কথা প্রমাণে মাগধী ভা-
ষাও পৈশাচীর ন্যায় শৌরসেনীর প্রকার-
ভেদ এবং শৌরসেনী ভাষা সংস্কৃত হইতে
সমুৎপন্ন। বরফচি এই সকল প্রাকৃত মধ্যে
মহারাষ্ট্রীয়কে প্রধান প্রাকৃত এবং তাহাও
সংস্কৃত-মূলক বলিয়াছেন। এতাবত প্র-
মাণ হইতেছে যে, মহারাষ্ট্রীয় বা প্রধান
প্রাকৃত ও শৌরসেনী এই ভাষাগুলি সা-
ক্ষ্য সংস্কৃত-মূলক। মাগধী ভাষাকে
সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা শৌরসেনী-মূলক
বলিয়া নির্দেশ করেন। ভাষা-তত্ত্ব-বিৎ
লাসেন বলেন, মাগধী ভাষা আলোচনা
করিলে উপলব্ধ হয় যে, ইহাও মহারাষ্ট্রীয়
এবং শৌরসেনীর ন্যায় সংস্কৃত-মূলক।
লাসেন বলেন পৈশাচী ভাষাও সংস্কৃত
সম্ভূত। তিনি সংস্কৃত বৈয়াকরণগণকে
এ সম্বন্ধে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন।
ফলতঃ এ সম্বন্ধে পণ্ডিতবর লাসেনের
যুক্তি সমধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।
সংস্কৃতের পতন সময়ে বা সমকালে উক্ত
ভাষা চতুর্দশ ক্রম গ্রহণ করে। তাহাদের
সকলই এক মূল-ভাষা সংস্কৃত হইতে স-
ম্ভূত, ইহা মনে করা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত।
এই চারি ভাষা কথোপকথনের সুবিধা

সাধনার্থ সৃষ্ট হয়। ইহারা যে এককালে বিলক্ষণ চলিত ভাষা হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই। মহারাষ্ট্রীয়, মাগধী ও শৌরসেনী এই ভাষাত্রয়ের নাম প্রমাণ করিতেছে যে, উহারা উক্ত নামধেয় প্রদেশ-জন্মে প্রচলিত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মের আবিষ্কর্তা শাক্যসিংহের মাতৃভাষা মাগধী। এ নিমিত্ত মাগধীভাষা বৌদ্ধধর্মের উন্নতিসহ বিশেষ উন্নত হইয়া উঠে। মাগধী ভাষায় বৌদ্ধদিগের ধর্মগ্রন্থ বিরচিত হয়। যখন বৌদ্ধ ধর্ম ভারতময় প্রচলিত হইয়াছিল, মাগধী ভাষাও তৎকালে বহু-বিস্তৃত হইয়াছিল। সিংহলে গিয়া মাগধী ভাষা পালি নাম গ্রহণ করে। শৌরসেনী ভাষাও মাগধীর স্মার জৈনদিগের ধর্ম-ভাষা।

“ প্রাকৃত কণ্ঠক ” গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত চারি ভাষা এবং অর্ধমাগধী ও দাক্ষিণাত্য ভাষা, এই ছয় ভাষার সাধারণ নাম ভাষা। এই ভাষা সমস্তের অপর শ্রেণীর নাম বি-ভাষা। যথা,—

সকারী বা চণ্ডালিকা
সাবরী
আভীরী
ছাবিড়ী
উৎকলী।

এই কয় ভাষাও নাটকাদিতে প্রযুক্ত হইয়াছে। এ নিমিত্ত ইহাদিগকে অপভ্রংশ নাম দেওয়া হয় নাই। বিভাষার পরাগত শ্রেণীর নাম অপভ্রংশ। বাঙ্গালা, গুজ-

রাঢ়ী প্রভৃতি যে সকল চলিত ভাষা নাটকাদিতে ব্যবহৃত হয় নাই তাহাদের নাম অপভ্রংশ।

পশুতবর বীম্‌স সাহেব নিম্নলিখিত চলিত ভাষাগুলির মূল উল্লিখিতব্য স্থির করিয়াছেন। যথা,—

- ১। হিন্দি
- ২। বাঙ্গালা
- ৩। পঞ্জাবী
- ৪। সিন্ধি
- ৫। মহারাষ্ট্র
- ৬। গুজরাটী
- ৭। নেপালী
- ৮। উড়িয়া
- ৯। আসামী।
- ১০। কাশ্মীরী

এই একাদশ ভাষার সকল গুলিই অধুনা ভারতবর্ষের স্থান বিশেষে চলিত আছে। উক্ত ভাষা সমস্তের ব্যবহারভেদে ও স্থানভেদে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রূপান্তর হইয়াছে। প্রত্ন-তত্ত্বানুসন্ধায়ী বীম্‌স সাহেব গুরুতর পরিশ্রম সহকারে তৎসমস্ত নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি হিন্দি ভাষার নিম্নলিখিত কয় শ্রেণী স্থির করিয়াছেন। যথা ;—

মৈথিলী—(পূর্নিগা ও ত্রিহুতের ভাষা)

মগধ—(দক্ষিণ বিহারের ভাষা)

ভোজপুরি—(সাহাবাদ, সারণ, চাম্পারণ, নোয়াকপুর, প্রাচ্য অযোধ্যা এবং বারাণসীর ভাষা)

কোশলী—(অযোধ্যা এবং যোহিল
খণ্ডের ভাষা।)

ব্রজভাষা—(উত্তর দোয়াব, আগ্রা
এবং দিল্লীর ভাষা।)

কনোজী—(দক্ষিণ দোয়াবের ভাষা।)

রাজপুত ভাষা—(রাজপুতানার ভাষা।)

বুদেলখণ্ড-ভাষা—(চম্বল হইতে
শোন নদী পর্য্যন্ত প্রদেশের ভাষা।)

বীম্‌স-সাহেব বাঙ্গালা ভাষার কো-
নও প্রকারভেদ লেখেন নাই। তিনি
উড়িয়া ও আগামী ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষা
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বিবেচনা
করিয়া দেখিলে ঐ দুই ভাষাকে বাঙ্গা-
লার রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই বলা যায়
না। এ সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তি আছে
তাহা বিবৃত করিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রস্তাব
লিখিতে হয়।

পঞ্জাবীর অনেক প্রশাখা। পঞ্জা-
বের প্রত্যেক প্রদেশের ভাষার অল্প বা
অধিক পরিমাণে বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়।

সিন্ধীয় ভাষার নিম্ন-লিখিত প্রভেদ
আছে।

সিরাই—(উত্তর সিন্ধের ভাষা।)

বিচোলি—(দক্ষিণ সিন্ধের ভাষা।)

লারি—(নিম্ন সিন্ধের ভাষা।)

উছ—(মুলতানের ভাষা।)

কচ্ছি—(কচ্ছের ভাষা।)

মহারাজীয়া ভাষার নিম্নলিখিত চারি
প্রকার বিভিন্নতা আছে।

কনুকানি—(রত্নগিরি এবং সমুদ্র স-

লিখিত স্থানের ভাষা।)

দাক্ষিণা—

গোমস্তকী বা কুদালি—(সাবস্ত বা-
ডীর নিকটের ভাষা।)

খান্দেশী—

গুজরাটের তিন স্বতন্ত্র প্রদেশে ত্রিবিধ
ভাষা কথিত হয়। ঐ তিন ভাষাই মূল গু-
জরাটীর প্রশাখা মাত্র। যে তিন স্থানে
ভাষার স্বতন্ত্রতা আছে, তাহাদের নাম ;—

সুরত এবং বরোচ

অমেদাবাদ

কাটিওয়ার

বিশুদ্ধ নেপালীকে পার্বত্য বা পা-
হাড়ী বলে। তাহার যে কয় শাখা আছে,
মূলের সহিত তাহাদের প্রভেদ সামান্য।
নিম্ন-লিখিত স্থান সমূহের ভাষার সামান্য
বিভিন্নতা আছে।

পাংপা

কমায়ুন

গাডওয়ার

খাক

মহাস্বা বীম্‌স্ পূর্ব-লিখিত ভাষা-
গুলিকে সংস্কৃত-মূলক বলিয়া স্বীকার ক-
রিয়াছেন। ভারতবর্ষ প্রচলিত অপর যে
সমস্ত ভাষা আছে, তৎসমুদয়কে তিনি
জেন্দ, অর্থাৎ প্রাচীন পারস্য-মূলক বলিয়া
স্থির করিয়াছেন। বীম্‌স্ সাহেব যে যে
রূপান্তরে উক্ত জেন্দ-মূলক ভাষা সমস্ত
ভারতবর্ষে চলিত আছে বলিয়াছেন,
তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১। ভোটিয়া বা ভোটিস্তা (ভোটে-
রাজ্যে)

২। লেপ্‌চা (সিকিম রাজ্যে)

৩। চিবু } (সোন, কোশী

৪। কিরন্তি } ও অকণ নদী-
মধ্যস্থ স্থানে)

৫। মুর্খি (পূর্ব নেপাল)

৬। গরজ (ঐ)

৭। নেওয়ার (মধ্য নেপাল)

৮। মগর (ঐ)

৯। ব্রাহ্ম (ঐ)

১০। চিপজ } (অযোধ্যা।

১১। কুম্বু } বায়ু—পূর্ব

১২। বায়ু } নেপালেও চলিত)

১৩। সনওয়ার (পশ্চিম নেপাল)

১৪। সর্প (ঐ)

১৫। কনওয়ারি বা মিলচান

১৬। ভিবারকদ } (কুম্বাও

১৭। হুন্দেদী } নের উত্তরে)

১৮। দারাহি বা দোহি

১৯। নেওয়ার

২০। পাহাড়ী)

২১। কাশওয়ার (মধ্য নেপাল)

২২। পাক

২৩। তক্ষ

২৪। ধীমল (নেপাল ও ভোটে
কিরদংশ)

২৫। মেচী (ঐ)

২৬। বেরো (কাছাড়)

২৭। গারো (গারোপাহাড়)

২৮। অক

২৯। আবর

৩০। মিসমি } (আসাম সারিখে)

৩১। মিরি

৩২। দফলা }

৩৩। খসিয়া (আসামের দক্ষিণ)

৩৪। মিকির (ঐ)

৩৫। নাগা

ক। বেঙ্গমা } ঐ / নাগার

খ। অজামি } প্রশাখা)

গ। লোটা

৩৬। সিজফো (ঐ)

৩৭। কুকি (চট্টগ্রামের উত্তর)

৩৮। মনিপুরি ভাষা।

৩৯। কোরেজ ভাষা

৪০। কারেণ ভাষা

৪১। সাঁওতাল

৪২। কোল (চয়বাসা)

৪৩। ভূমিজা (পুঞ্জিয়া)

৪৪। মণ্ডালি (ছোট নাগপুর)

৪৫। কোলেহান

৪৬। খন্দ (সম্ভলপুর)

৪৭। গন্দ

৪৮। উয়ারম (সরগুজা)

৪৯। তেলুগু

৫০। তামিল

৫১। কর্ণাটক

৫২। মলয়ালম্

৫৩। তুলুচু

৫৪। কুর্গ

৫৫। তুহ

৫৬। বুদগড়

৫৭। ইকলার } নীলগিরিপাহার

৫৮। কোহতর }

৫৯। সিংহলীয়

বীম্‌ সাহেব-প্রদত্ত জেন্দমূলক ভা-

বাসমুহের তালিকা উল্লিখিত হইল। “শব্দভাষা চন্দ্রিকা” প্রণেতা লক্ষ্মীধর, পৈশাচী ভাষার যে সমস্ত স্থান নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা যত্নস্বা বীমস্ কর্তৃক নিরূপিত জৈন্মমূলক ভাষা সমূহের স্থানের সহিত প্রায় মিলিতেছে। লক্ষ্মীধর যে সকল স্থানের কথা বলিয়াছেন, অধন্য সে সকল স্থানের নাম ও সীমা পরিবর্তিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে লক্ষ্মীধরোক্ত পৈশাচী ভাষার স্থান সকলের নাম উল্লেখ করিতেছি।

পাণ্ডা
কেকয়
বাল্লীক
সহ্য
নেপাল
কুণ্ডল
সুদেশ
ভোট
গাঁঙ্গার
হৈব
কনোজানা

পাঠকগণ প্রাচীন ভূগোল অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে, লক্ষ্মীধর কথিত পৈশাচী ভাষার এই প্রাচীন স্থান সমূহ ও বীমস্ সাহেব কর্তৃক নির্ণীত জৈন্ম-মূলক ভাষা সমূহের স্থান অধিকাংশই এক। সুতরাং এই দুই তালিকা পর্যালোচনা করিয়া উপলব্ধ হইতেছে যে, বীমস্ সাহেব যে সকল ভাষাকে জৈন্ম-মূলক বলিয়া

উল্লেখ করিয়াছেন, সংস্কৃত ব্যাকরণে তাহা পৈশাচী নামে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা পৈশাচিক ভাষাকে জৈন্মমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছি না। কারণ সংস্কৃত বৈরাগরণেরা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন যে, পৈশাচী ভাষা সংস্কৃতমূলক। তাঁহারা পৈশাচীকে প্রাকৃতের অঙ্গ বিশেষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রাকৃত যে সংস্কৃতমূলক তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। যথা;—হেমচন্দ্র—

“প্রাকৃতঃ সংস্কৃতঃ, তত্র ভবন্ ততঃ
আগতন্ বা প্রাকৃতম্।”

“প্রাকৃত সংস্কৃতমূলক, প্রাকৃত সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন বা আগত।”

এ সম্বন্ধে অন্য প্রমাণ সংকলনের প্রয়োজন নাই।

ভাষা-তত্ত্ব-বিৎ লাসেন সাহেব বলিয়াছেন যে, পৈশাচী সংস্কৃত হইতে সাক্ষাৎ সমুদ্ভূত। কিন্তু আমরা যতদূর দেখিতেছি তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বীমস্ সাহেবের জৈন্মমূলক ভাষা ও সংস্কৃতমূলক পৈশাচী ভাষা এক। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, বীমস্ মহোদয় পৈশাচী ভাষাকেই জৈন্মমূলক বলিয়াছেন; কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ আলোড়ন করিয়া ইহা নিঃশংসরে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পৈশাচী সংস্কৃত-মূলক। তবে বীমস্ সাহেব এ কথা কেন বলিতেছেন? স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে ইহার কারণ অনুমান করা

বাইতে পারে। পৈশাচী ভাষা মখন প্রথমে সংস্কৃত হইতে জন্ম গ্রহণ করে, তখন তাহার প্রকৃতি অবিকল সংস্কৃতের ত্রার ছিল, তখন শুনিলে তাহা যে সংস্কৃতমূলক একথা নিসংশয়ে বলা যাইত। কিন্তু কালচক্রে সকলেরই পরিবর্তন হয়। কালচক্রে পৈশাচী-ভাষাও পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হইল। যে যে স্থানে পৈশাচী ভাষা প্রচলিত হয়, তাহার অধিকাংশ ভারতের সীমান্ত প্রদেশ। সেই সীমা অতিক্রম করিলেই যে যে স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, তথায় জৈন্দমূলক ভাষা প্রচলিত। অসম্ভব নয় যে, ভারতের সীমান্তবর্তী প্রদেশস্থ ব্যক্তিগণ উক্ত বৈদেশিক ব্যক্তিগণের সহিত বহুবিধ সম্বন্ধ বদ্ধ হয়। ক্রমে ঐ জৈন্দমূলক ভাষা পৈশাচী ভাষার সহিত বিমিশ্রিত হইতে থাকে। এবং কালক্রমে পৈশাচীভাষা এরূপ আকার ধারণ করিয়াছে যে, এক্ষণে তাহাকে দেখিলে সংস্কৃতমূলক বলিয়া বোধনা হইয়া জৈন্দমূলক বলিয়াই অনুমান হয়। দেখা বাইতেছে যে, মুসলমানদিগের সহিত যখন বঙ্গদেশের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তখন মুসলমানীয় ভাষা এত অধিক পরিমাণে বঙ্গভাষার সহিত বিমিশ্রিত হইয়াছিল যে, বঙ্গভাষাকে প্রায় এক স্বতন্ত্র ভাষার স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। সেইরূপে সংস্কৃতমূলক পৈশাচীর সহিত, জৈন্দমূলক অপর ভাষা মিশিয়া যে ভাষাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিবে তাহাতে বিচিৎ কি!

এ সম্বন্ধে আরও এক কারণ অনুমিত হইতে পারে। সামাজিক ব্যবহার বিষয়ে পৈশাচিকগণ, হিন্দুগণের নিকট হইতে কদাপি সহানুভূতি প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদিগের আনুগত্যও জন্মে নাই। তাহাদের শাস্ত্রভ্রষ্ট আচার ব্যবহার হিন্দুচক্রে নিতান্ত দৃষণীয় হইলেও ভারতের সীমা বহির্ভূত প্রদেশস্থ স্নেহগণ কর্তৃক প্রতিপোষিত হইয়াছিল। এমন কি, পৈশাচদিগের কোন কোন ব্যবহার, তাহাদিগের নিকট বিশেষ সমাদরে পরিগৃহীত হয়। এই সকল কারণ বশতঃ তাহাদের সহিত পৈশাচদিগের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ঐদৃশ স্থলে একের ভাষা অপরের সহিত বিশিষ্টরূপে বিমিশ্রিত হওয়া নিতান্তই সম্ভবপর।

এতাবতী স্পষ্ট উপসঙ্গ হইতেছে যে, দেবভাষা সংস্কৃতই ভারতবর্ষের বাবতীয় মৃত বা জীবিত ভাষার মূল-প্রভাবণ। ভাষা ও ধর্মের ঐক্য মানবসমাজের একতা সংস্থাপনের সর্বপ্রধান কারণ। অধুনা ভারতবর্ষীয় নানাবিধ ভাষা ও আর্ধ্য হিন্দুধর্মের বহুবিধ প্রকার ভেদ নিবন্ধন আমরা ভারতবাসিগণের এতাদৃশ মানসিক বিভিন্নতা লক্ষ্য করিয়া থাকি। অধিক কি, ভাষাগত অতি সামান্য প্রভেদ বশতঃ পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গবাসিগণের মধ্যে খাদ্য খাদক সম্বন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কথাটি বড় ভাল নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা দক্ষিণ লজ্জা ও ঘৃণার কথা। বঙ্গদেশ মধ্যে ভাষার ত প্র-

ভেদ নাই বলিলেই হয়, একটুকু ঈর্ষ্যা ও উদারতা সহকারে বিবেচনা করিলে নোদুইবে, যখন ভাষ্যেতে সমস্ত ভাষ্যই এক সাধারণ মূল হইতে সমুৎপন্ন, তখন ভারতবর্ষীয় কোন কাহিনী অপরাধ কাহিনী হইতে ভাষ্যের বিভিন্নতা হেতু ক্রান্তান্তরূপে পরিচিত হইতে পারে না। প্রত্যাহ কি অগ্ৰগণ্য (সেতুগণ্যবাদী) কি মহাঙ্গীর্ণ (বীরী) কেহই স্বতন্ত্র কাহিনী নহেন। যদি আমরা তাহা মনে করি, তাহা হইলে অগ্ৰগণ্যের লক্ষ্যচিত্ততারই পরিচয় প্রদান

করা হয়। আর তা'দৃশ সংস্কারের প্রাবল্য হেতুই অন্য অপরাধ সমস্ত কাহিনীর সহিত অগ্ৰগণ্যের এক পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ভবিষ্যতে উহা আরও বিস্তৃত হইয়া আমাদের বাবতীর আশা ভরসা একেবারে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিবে এবং কালে ভারতের এমন বিষম ব্যাপ্তি উৎপত্তি হইবে যে, কোন স্বতন্ত্র কাহিনী তখন উহার প্রকৃত ঐশ্বর্য ব্যবস্থা করিয়া জীবনদানে সমর্থ হইবেন না।

ত্রীদাঃ—

জীবন প্রভাত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জীবন উষা।

“ দেও করতালি, জয় জয় বলি,
পূরিয়া অঞ্জলি কুশুম লহি।

ঐ যে প্রাচীতে, ভাসিতে ভাসিতে
উদয় অরুণ উষার গহু ॥”

চৈতন্য বন্দোপাধ্যায়।

খ্রীষ্টের একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গাজনির অধিপতি মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, ও সেই শতাব্দী শেষ না হইতেই অর্ধাবর্তের অধিকাংশ হুসমান-দাগের হস্তগত হয়। সেই বিপুল ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য অধিকার করিয়া হুসমান-দাগেরা এক শতাব্দী ক্ষান্ত থাকিলেন,

বিজ্ঞানচল ও নর্দনায়রূপে বিশাল প্রাচীর ও পরিখা পার হইবার সহসা কোন উদ্রম করেন নাই। অবশেষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে দিল্লীর সুবরাক আল-উদ্দীন খিলজী অষ্ট সহস্র অর্ধাবর্তী সেনা সহিত নর্দনা নদী পার হইলেন ও খন্দেশ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সহসা হিন্দু-রাজধানী দেবগড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেবগড়ের রাজা সন্ধির প্রস্তাব করিতে ছিলেন, এবং সময়ে রাজপুত্র বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আল-উদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন। তুমুল সংগ্রামে হিন্দুসেনা পরাস্ত হইল এবং হিন্দু রাজা বহু অর্থ ও ইচ্ছাপূর প্রদেশ দান করিয়া সন্ধি করিলেন। পরে আল-উদ্দীন দিল্লীর সম্রাট হইলে, তাঁহার সেনা-

পতি মালীক কাফুর তিন বার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন ও নর্মদা তীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করেন । তথাপি আলাউদ্দীনের যত্নের পর কেবল দেবগড় ভিন্ন আর সমুদায় প্রদেশ পুনরায় হিন্দুদিগের হস্তগত হইল ।

চতুর্দশ খ্রীঃ শতাব্দীতে যখন টোগলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহার পুত্র য়ুনাস পুনরায় দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিয়া সমুদায় তৈলঙ্গ প্রদেশ অধিকার করেন (১৩২৩ খ্রীঃ), পরে মহম্মদ টোগলক নাম ধারণ করিয়া স্বয়ং দিল্লীর সম্রাট হইয়া রাজধানী দিল্লী হইতে দেবগড়ে আনিবার প্রয়াস পান । দেবগড়ের নাম পরিবর্তিত করিয়া দৌলতাবাদ রাখিলেন এবং সমস্ত দিল্লীবাসিদিগকে তথায় বাইবার আদেশ দিলেন । সীড়া ও নানা স্থানে বিদ্রোহ নিবন্ধন যখন এই প্রয়াস নিষ্ফল হইল, তখনও সম্রাট দাক্ষিণাত্য বিজয়ের বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিলেন না । সুতরাং দক্ষিণের হিন্দু ও মুসলমান সকলে বিরক্ত হইয়া সম্রাটের বিকঙ্কাতরণ করিতে লাগিল । তৈলঙ্গ প্রদেশ জয়ের পর সেই স্থানের কতকগুলি হিন্দুনিবাসী বিজয়নগরে নূতন রাজধানী নির্মাণ করিয়া একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন (খ্রীঃ ১৩৩৫); এবং জফীর খাঁ নামক একজন মুসলমান তৈলঙ্গের রাজার সহায়তায় দিল্লীর সেনাপতি উয়াদউলমুলককে

তুমুল সংগ্রামে পরাভূত করিয়া দৌলতাবাদে একটি স্বতন্ত্র মুসলমানরাজ্য স্থাপন করিলেন (খ্রীঃ ১৩৪৭) । কালক্রমে বিজয়নগর ও দৌলতাবাদ দাক্ষিণাত্যের মধ্যে দুইটি প্রধান রাজ্য হইয়া উঠিল এবং প্রায় তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর সম্রাটগণ দাক্ষিণাত্য হস্তগত করিবার আর কোনও চেষ্টা করেন নাই ।

কিন্তু এই বিপদ হইতে নিস্তার পাইলেও দক্ষিণে হিন্দু-সাম্রাজ্য বিপৎশূন্য ছিল না । হিন্দুগণ গৃহের মধ্যে দৌলতাবাদস্বরূপ মুসলমান রাজ্যকে স্থান দিয়া ছিলেন । সে সময়ে হিন্দুদিগের জাতীয় জীবন ক্ষীণ ও অবনতিশীল, বিজয়ী মুসলমানদিগের জাতীয়জীবন উন্নতিশীল ও প্রবল, সুতরাং একে অন্যের ধ্বংস সাধন করিল । কথিত আছে দৌলতাবাদের প্রথম রাজা জফীর খাঁ পূর্বে এক ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস ছিলেন, ব্রাহ্মণ বালকের বুদ্ধিবল দেখিয়া তাহাকে স্বাধীন করিয়া দেন । পরে যখন জফীর খাঁ রাজা হইলেন, তখন তিনি সেই ব্রাহ্মণকে আপন কোষাধ্যক্ষ করেন ও সেই কারণে জফীরের বংশ বাহ্মিনী (ব্রাহ্মণীয়) বংশ বলিয়া খ্যাত । কালক্রমে দৌলতাবাদ রাজ্য বর্দ্ধিতায়তন হইয়া খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইল, এবং একটির স্থানে বিজয়পুর, গলখন্দ ও আহম্মদ নগর নামক তিনটি মুসলমান-রাজ্য হইয়া উঠিল । ১৫২৬ খ্রীঃ অব্দে বাহ্মিনী বংশ ও দৌলতাবাদ

রাজা লোপাংশু হইল, এবং মুসলমান রাজগণ একত্র হইয়া ১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দে টেলিকোটা বা রক্ষিত গাভীর যুদ্ধে বিজয়নগরের সৈন্য পরাস্ত করিয়া সেই হিন্দু-রাজ্যের লোপ সাধন করিলেন। দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-স্বাধীনতা এক প্রকার বিলুপ্ত হইল ও বিজয়পুর, গলখন্দ ও আহমদনগর নামক তিনটি মুসলমান-রাজ্য প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। কর্ণাট ও ত্রাবিড়ের হিন্দুরাজগণও ক্রমে বিজয়পুর ও গলখন্দের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

১৫৯০ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট আকবর পুনরায় সমগ্র দাক্ষিণাত্য দিল্লীর অধীনে আনিবার চেষ্টা করেন, ও তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই সমস্ত খন্দেশ ও আহমদনগর রাজ্যের অধিকাংশ দিল্লী সৈন্যের হস্তগত হয়। তাঁহার পৌত্র শাহজিহান ১৬৩৬ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে সমগ্র আহমদনগর রাজ্য অধিকৃত করেন, হুতরাং আখ্যায়িকা বিরতকালে দাক্ষিণাত্যে কেবল বিজয়পুর ও গলখন্দ এই দুইটি পরাক্রান্ত স্বাধীন মুসলমান রাজ্য ছিল।

এই সমস্ত রাজবিশ্ববের মধ্যে দেশীয় লোকদিগের অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমাদের জানা আবশ্যিক। মুসলমান রাজ্যের অধীনে অর্থাৎ প্রথমে দৌলতাবাদের, পরে আহমদনগর, বিজয়পুর ও গলখন্দের অধীনে হিন্দুদিগের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। বস্তুতঃ মুসলমানদিগের দেশশাসন-কার্য্য অ-

নেকটা মহারাষ্ট্রীয় বুদ্ধিবলেই পরিচালিত হইত। প্রত্যেক রাজ্য কতকগুলি সরকারে, ও প্রত্যেক সরকার কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত ছিল, এবং সেই সমস্ত সরকার ও পরগণায় কখন কখন মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু অধিক সময়ে মহারাষ্ট্রীয় কার্য্যকারিগণই কর আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। মহারাষ্ট্র-দেশ পর্ব্বত-সঙ্কুল, ও সেই সমস্ত পর্ব্বতচূড়ার অসংখ্য দুর্গ নির্মিত ছিল। মুসলমান স্থলতামগণ সেই সকল পর্ব্বত-দুর্গ-ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে ন্যস্ত রাখিতে সক্ষম হইতেন না; কিল্লাদারগণ কখন কখন রাজকোষ হইতে বেতন পাঠিতেন, কখন বা চতুষ্পাশ্বস্থ ভূমির জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তাহারই আয় হইতে দুর্গরক্ষার জন্য আবশ্যকীয় ব্যয় করিতেন। এই সমস্ত কিল্লাদার ও দেশমুখ ভিন্ন মুসলমান স্থলতানদিগের অধীনে অনেক হিন্দু মনসবদার ছিলেন। তাঁহারা শত কি দ্বিশত কি পঞ্চাশত কি সহস্র কি তদধিক অশ্বারোহীর সেনাপতি, স্থলতানের আদেশমতে সেই সেই পরিমাণ সৈন্য লইয়া যুদ্ধ সময়ে উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিলেন, এবং সৈন্যের বেতন ও আবশ্যকীয় ব্যয়ের জন্য এক একটী জায়গীর ভোগ করিতেন। মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী সেনা শীঘ্রগতিতে ও ত্বরিত যুদ্ধে অধিতীয়, এবং নিজ নিজ স্থলতানদিগকে যুদ্ধসময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন; সময়ে সময়ে তাঁহারা আপনামধ্যেও

ঘোরতর বিবাদে লিপ্ত হইতেন । বিজয়পুরের মূলতানের অধীনে চন্দ্ররাজ খোঁসের স্বাদশ সহস্র পদাতিকের সেনাপতি ছিলেন এবং মূলতানের আদেশনৌরা ও বাণানদীর মধ্যবর্তী সমস্ত প্রদেশ জয় করিয়া ছিলেন । মূলতান পরিত্যক্ত হইয়া সেই দেশ চন্দ্ররাজকে অর্পণ করিয়া করিয়া জাগরণস্বরূপ দান করেন ও চন্দ্ররাজের সমুত্তিগণ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত রাজা হইয়া সেই দেশ শাসন করেন । এইরূপে বংশীয় বংশ মলওয়ারী প্রদেশে, মনর বংশ মুখব প্রদেশে, ধরপুরীয় বংশ কাপাসী ও মধোল দেশে, চুফে বংশ ঝট প্রদেশে ও শবনু বংশ ওয়ারীপ্রদেশে অবস্থিতি করিয়া পুরুষানুক্রমে বিজয়পুরের মূলতানের কার্য সাধন করিতে থাকেন, ও সময়ে সময়ে বা আপনাদিগের মধ্যেই তুমুল সংগ্রাম করিতেন । জাতি বিরোধের ন্যায় আর বিরোধ নাই ; পার্শ্বত-সম্মুল কঙ্কণ ও মহারাজী প্রদেশ সর্বস্থানে ও সর্বকালেই স্থানীয় বড় বড় বংশে আত্মবিরোধ দৃষ্ট হইত, ও পার্শ্বতকন্ডের ও উর্করা উপত্যকায়, সর্বদাই মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইত । এই শোণিতপাত হইলেও সেগুলি মূলকণ নহে, সেগুলি মূলকণ ; পরিচালনা দ্বারা আমাদের শরীরের মত রূপ হ্রবৎ ও দৃঢ়ীকৃত হয়, সর্বদা কার্য ও উপায় ও বিপর্যয়

দ্বারা জাতীয় বল ও জাতীয় জীবন সেইরূপ রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয় । এইরূপে মহারাজী জীবন-উষার প্রথম রক্ষিত-স্বচ্ছটা শিবজীর আনির্ভাবের অনেক পূর্বেই ভারত-আক্রমণ রক্ষিত করিয়াছিল ।

আহম্মদনগরের মূলতানের অধীনে যাদব-বংশ ও ভন্সলে নামক দুইটি পরাক্রান্ত বংশ ছিল । মিলুকীরের যাদববংশের আশ্রয় পরাক্রান্ত মহারাজীবংশ সমস্ত মহারাজী প্রদেশে আর কোথাও ছিল না, এবং অনেক বিবেচনা করেন দেবভৈরব প্রাচীন হিন্দুবাহু বংশ হইতেই এই পরাক্রান্ত বংশ উদ্ভূত । যোড়শ খ্রীঃ শতাব্দীতে লক্ষ্মী যাদববংশ আহম্মদনগরের মূলতানের অধীনস্থ একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন ; তিনি দশ সহস্র অধারে হীর সেনাপতি ছিলেন ও প্রশস্ত জায়গীর ভোগ করিতেন । ভন্সলেবংশ যাদববংশের ন্যায় উন্নত না হইলেও একটি প্রধান ক্ষমতাশালী বংশ ছিল তাহার সন্দেহ নাই । এই স্থানে এইমাত্র বলা আবশ্যিক যে, যাদববংশের বংশ হইতে শিবজীর মাতা ও ভন্সলে বংশ হইতে তাঁহার পিতা সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন ।

উপন্যাসের প্রারম্ভে দেশের উত্তম ও লোকের অবস্থা সংক্ষেপে বিবৃত হইল । বোধ হয় পাঠক ইহাতে বিরক্ত হইবেন না ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রঘুনাথজী হাবিলদার।

১৯০০

কাম্বোজ জিনিয়া তাঁর অঙ্গের বরণ।

প্রবণ তাঁহার দিবা পঙ্কজ নগন ॥

প্রবণে কুণ্ডলযুগ্ম দীপ্ত দিনকর।

অভেদ্য কবচ আবরিল কলেবর ॥

দুইদিকে দুই তুণ বামে ধরে ধনু।

অক্ষানুস্থিত ভুজ আনন্দিত হনু ॥

কাশীরাম দাস।

কল্পণ পদদেশ বর্ষাকালে প্রকৃতি অপ-
রূপ ভীষণ মূর্ধ্বি ধারণ করে; ১৬৬৩ খ্রীঃ
অঙ্কে বসন্তকালেই এক দিন সংগ্রামসময়ে
সেই ঘোব ঘটা ও ভীষণ মৌসুমি যেন
দশ গুণ রক্ত প্রাপ্ত হইয়াছিল। সূর্য্য ত-
খনও অস্ত যাস নাই অথচ সমস্ত আকাশ
দির্ঘ বলদ্বী অতি-রুক্ষ মেঘরাশিতে আচ্ছন্ন
ও চারিদিকে পার্বতশ্রেণী ও অন্তর অরণ্য
দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। প-
র্কতে, উপত্যকার, অরণ্যমণ্ড, প্রান্তরে,
আকাশ বা মে দনীতে শব্দমাত্র নাই, যেন
স্রগৎ অচিরে প্রচণ্ড বাত্যা আসিবে জ-
নিয়া ভয়ে হুঙ্কার হইয়া রহিয়াছে, নিকটত
পার্বতের উপর দিয়া গমনাগমনের পথ-
গুলি স্বেৎ দেখা যাইতেছে, দূরস্থ বি-
শাল পাদপার্বত পার্বতগুলি কেবল গা-
ত্রতর রুক্ষাণ স্বরূপ দেখা যাইতেছে, আর
বহু নীচে উপত্যকা একেবারে অন্ধকারে
আচ্ছন্ন রহিয়াছে। পার্বত-প্রবাহী জ-

লপ্রপাতগুলি কোথাও রৌপ্যগুচ্ছের ন্যায়
দেখা যাইতেছে, কোথাও অন্ধকারে লীন
হইয়া কেবল শব্দমাত্রে আপন পরিচয়
দিতেছে।

সেই পার্বতপথেব উপর দিয়া একমাত্র
অস্থিরোত্তী বেগে অস্থচালন করিয়া যা-
ইতেছিলেন। অস্থের সমস্ত শরীর ফেণ-
পূর্ণ ও স্বর্ষাক্ত, ও অস্থিরোত্তীর বেশ ধূল্য
ও কন্দময়, দেখিলেই বোধহয় তিনি অ-
নেক দূর হইতে আসিতেছেন। তাঁহার
হস্তে বর্ষা, কোষে অসি; বামহস্তে বলা
ও বাম বাস্ততে ঢাল, শরীরে বজ্জ্বল লৌহ-
বর্ষাক্তাদিত। পরিচ্ছদ ও সৌম্য মচার্দী-
দেশীর। অস্থিরোত্তীর বঃ কম অক্ষাদশ
বর্ষ হইলে, সচর চর মচার্দী প্রীর দগের অ-
পেক্ষা তাঁহার অববব টম্ব ও বর্ণ গৌর,
কিন্তু পরিষ্কমে বা রৌদ্রে তাপে এই বয়-
সেই তাঁহার মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলবর্ণ ক্রমে
রুক্ষ হইয়াছে ও শরীরে স্ববন্ধ ও দুর্ভীকৃত
হইয়াছে। যুবকের ললাট উন্নত, চক্ষু স্ব
জ্যোতিঃপরিপূর্ণ, মুখমণ্ডল ও দর্ষাবাজুক
ও অতিশয় তেজঃপূর্ণ। যুবক অস্থিকে অপ্প
বিশ্রাম দিবার জন্য লক্ষদিয়া ভূমিতে অ-
বতীর্ণ হইলেন, বলায় বুদ্ধোপ র নিষ্কপ
করিলেন, বর্ষা বুদ্ধশাখার হেলাইয়া রাখি-
লেন, ও হস্তদ্বারা ললাটের স্বর্ষ্য মোচন
করিয়া ও নিবিড় রুক্ষ কেশগুচ্ছ উন্নত প্র-
শস্ত ললাট হইতে পশ্চাৎদিকে সরাইয়া
ক্ষণেক আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিতে
লাগিলেন।

আকাশের আকৃতি অতি ভয়ানক, অচিরে তুমুল বাত্যা আসিবে তাহার সংশয় নাই। মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে আরম্ভ হইয়াছে এবং অনন্ত পর্বত ও পাদপশ্চেনী হইতে গভীর শব্দ উত্থিত হইতেছে, আর দুই একটি স্তিমিত মেঘগর্জনে শূন্য ঘাই-তেছে। যুবকের শব্দ ওঠে দুই এক বিম্বু রুক্তিজনন পতিত হইল। এ ঘাইবার সময় নহে, আকাশ পরিষ্কার হওয়া পর্য্যন্ত কোথাও অপেক্ষা করা উচিত। যুবকের চিন্তা করিবার সময় ছিল না; তিনি যে কার্ষ্যে আসিয়াছিলেন তাহাতে বিলম্ব মনে না, তিনি যে প্রজুর কার্য্য করিতেছেন তিনি কোন আপত্তি শুনে ন, যুবকেরও বিলম্ব বা আপত্তি করার অভ্যাস নাই। পুনরায় বর্ষা হস্তে লইয়া লক্ষদিয়া অশ্বপুঠে উঠিলেন। তাঁহার অসি অশ্বপুঠে ঝন ঝন করিয়া উঠিল; আর এক মুহূর্ত্ত আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, পরে পুনরায় তীরবেগে অশ্বচালন করিয়া সেই নিঃশব্দ পর্বত-প্রদেশের নুপু প্রতিধ্বনি জাগরিত করিয়া চলিলেন।

অস্পক্ষণমধ্যেই ভয়ানক বাত্যা আসিল-হইল। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যমাত্র চমকিত হইল, ও মেলের গর্জনে সেই অনন্ত পর্বত-প্রদেশ যেন শত বার শব্দিত হইল। অচিরে কোটীরাক্ষস-বল বিক্রম করিয়া ভীষণ গর্জনে পবন প্রাবাহিত হইল, ও যেন সেই অনন্ত পর্বতকেও সমূলে আলোড়িত ক-

রিতে লাগিল। এক কালে শত পর্বতের অসংখ্য পাদপশ্চেনী হইতে কর্ণভেদী শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল, জলপ্রপাত ও পর্বত-তরঙ্গিণীর জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, ঘন ঘন বিদ্রাতালোকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই ঘোর বিপ্লব দৃশ্য হইতে লাগিল; এবং মধ্যে মধ্যে দূরপ্রতিঘাতী বজ্র শব্দে জগৎ কম্পিত ও স্তব্ধ হইতে লাগিল। তরায় মূলধারায় রুষ্টি পড়িয়া পর্বত অরণ্য ও উপত্যকা প্লাবিত করিল এবং জলপ্রপাত ও তরঙ্গিণী সমুদয়কে ক্ষীতকার্য ও উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল।

অশ্বারোহী কিছুতেই প্রতিকল্প না হইয়া বেগে চলিতে লাগিলেন; সময়ে সময়ে বোধ হইল যেন অশ্ব ও অশ্বারোহী বায়ুবেগে পর্বত হইতে সজোর নীচে নিক্ষিপ্ত হইবেন; সময়ে সময়ে অঙ্গকারে লক্ষ দিয়া জলপ্রপাত পার হইবার সময়ে উভয়েই সেই কঠিন প্রস্তরের উপর পতিত হইলেন, এবং এক স্থানে বায়ুপীড়িত রক্ষশাখার সজোর আঘাতে অশ্বারোহীর টকীষ ছিন্ন ভিন্ন হইল ও তাঁহার ললাট হইতে দুই এক বিম্বু কধির পড়িতে লাগিল। তথাপি যে কার্ষ্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে অপেক্ষা করা দুঃসাপ, নুতরাং যুবক মুহূর্ত্ত মাত্রও চিন্তা না করিয়া যত দূর সাধ্য সতর্কভাবে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিন চারি দণ্ড মূলধারায় রুষ্টি হওয়াতে আকাশ পরিষ্কার

হইতে লাগিল, ও অচিরেই রুষ্টি খামিয়া গেল, এবং অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্যের আলোকে সেই পর্বতরাশি ও নবস্নাত রক্ষ সযুহের চমৎকার শোভা দৃষ্ট হইল। যুবক দুর্গে উপস্থিত হইয়া একবার অশ্ব থামাইলেন ও সিন্ধু কেশগুচ্ছ পুনরায় স্নন্দর প্রশস্ত ললাট হইতে অপসৃত করিয়া নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে শোভা অনির্বচনীয়! পর্বতশ্রেণীর পর পর্বতশ্রেণী, যত দূর দেখা যায় দুই তিন সহস্র হস্ত উন্নত শিখরগুলি ক্রমাগত দেখা যাইতেছে ও সেই পর্বতশ্রেণীর পাশ্বে, মস্তকে, চারিদিকে, নবস্নাত নিবিড় হরিষর্গ অনন্ত পাদপশ্রেণী সূর্যালোকে চিক্ চিক্ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে জলপ্রপাত শত গুণ স্ফীতিকার হইয়া বর্জিত গৌরবে শূঙ্গ হইতে শৃঙ্খান্তরে নৃত্য করিতেছে, ও সূর্যের সুরবর্ণ রশ্মিতে বড় স্নন্দর ক্রীড়া করিতেছে। প্রতি পর্বত ও শিখরের উপর সূর্যরশ্মি নানারূপ বর্ণধারণ করিয়াছে, স্থানে স্থানে জলপ্রপাতের উপর রামধনু খেলা করিতেছে; আকাশে প্রকাণ্ড ধনু নানাবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে ও বহুদূরে বায়ুঘারা মেঘ তাড়িত হইয়া রুষ্টিরূপে গলিত হইতেছে তাহাও দেখা যাইতেছে।

যুবক ক্ষণমাত্র এই শোভায় মুগ্ধ রহিলেন; পরে সূর্যের দিকে অবলোকন করিয়া শীঘ্র দুর্গের উপর উঠিতে লাগিলেন। অচিরে আপন পরিচয় দিয়া দুর্গপ্রবেশ করিলেন; ঘরের ভিতর যাইলেন ও প-

শ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন সূর্য্য অস্ত হইতেছে। অমনি স্বনানা শব্দে দুর্গরক্ষক হইল।

দ্বাররক্ষকগণ দ্বার বন্ধ করিয়া যুবকের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—

“অধিক সকালে পহুছেন নাই; আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে অদ্য রাত্রি প্রাচীরের বাহিরে অতিবাহিত করিতে হইত।”

যুবক মহাসমো উত্তর করিলেন “সেই এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় নাই; ভবানীর প্রমাদে প্রভুর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা রাখিব, অদ্যই কিল্লাদারের নিকট প্রভুর আদেশ জানাইতে পারিব।”

দ্বাররক্ষক। “কিল্লাদারও আপনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন।”

“তবে চলিলাম” বলিয়া যুবক রাজপুত্রের দিকে প্রস্থান করিলেন।

অনুমতি পাইয়া যুবক কিল্লাদারের প্রাসাদে যাইলেন এবং সম্যক্ অভিবাদন করিয়া ও নিজ কটিদেশ হইতে বন্ধন খুলিয়া, কতকগুলি লিপি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। কিল্লাদার মাউলীজাতীয় একজন শিবজীর বিশ্বস্ত যোদ্ধা; তিনি লিপিগুলি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, দূতের দিকে না চাহিয়াই মনোনিবেশ পূর্বক সেইগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন।

দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধারম্ভ। যুদ্ধের আধুনিক অবস্থা, কিরূপে কিল্লাদার শিবজীর বিশেষরূপে সহায়তা করিতে

পাঠেন ও কোন বিষয়ে শিবজীর কি কি আদেশ, লিপি পাঠ সমস্ত অগত হইলেন। অনেকক্ষণ সেই লিপি পাঠ করিয়া কিল্লাদার অবশেষে পত্রবাহকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অষ্টাদশবর্ষীয় যুবকের বালকোচিত সরল ও টেদার মুখ-মণ্ডল, ও আনন্দবিলম্বী গুচ্ছ গুচ্ছ নিবিড় কৃষ্ণ কেশ, অগত নৃদ্যুত স্নেহ অস্বাভাব ও প্রশস্ত ললাটে দেখিয়া কিল্লাদার একবার চকিত হইলেন, লিপির দিকে দেখিলেন আবার বালক বা যুবকের দিকে মর্মেভেদি তাক্ক নহনহয় উঠাইলেন। অবশেষে বলিলেন “ হাবিলদার ! তোমার নাম রঘুনাথজী ? তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ ? ”

রঘুনাথজী দ্বিধিতভাবে শির নমাইয়া প্রশ্নের উত্তর করিলেন।

কিল্লাদার। “ তুমি আক্রান্ত ও বয়সে বালকমাত্র। ” (ঈষৎ ক্রোধে রঘুনাথজীর নহন ঈষৎ উজ্জ্বল হইল ; দেখিয়া কিল্লাদার ধীরে ধীরে বলিলেন) “ কিন্তু বিবেচনা করি কার্বাকালে পরাধুখ নহ। ”

রঘুনাথজী ঈষৎ ক্রোধকম্পিতস্বরে অগত মস্তভাবে বলিলেন “ যত্ন ও চেটা মাত্র মনুষ্যসংখ্যা, বোধ হয় তাহাতে প্রভু আমার জ্ঞাতি দেখেন নাই ; সিকি ভবানীর ইচ্ছা দীনা। ”

কিল্লাদার। “ তুমি সিংহগড় হইতে তোরণ দুর্গে এত শীঘ্র আসিলে কিরূপে ? ”

স্বিবন্দরে যুবক উত্তর করিলেন “ পল্লব নিকট এইরূপ প্রতিকা করিয়াছিলাম। ”

কিল্লাদার এই উত্তরে পরিতুষ্ট হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন “ জিজ্ঞাসা অনাবশ্যক, তোমার আক্রান্তেই কার্বাসাধনে তোমার যেকপ যত্ন তাহার পারচয় দিতেছে। ” রঘুনাথজীর সমস্ত বস্ত্র ও শরীর এখনও সিক্ত ও ললাটের ঈষৎ ক্ষত দেখা যাইতেছিল।

পরে কিল্লাদার সিংহগড়ের ও পুনায় সমস্ত অবস্থা এবং মহারাষ্ট্রীয়, মোগল ও রাজপুতসেনার অবস্থা ও সংখ্যা তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথজী যতদূর পারিলেন উত্তর দিলেন।

কিল্লাদার বলিলেন “ তবে কল্যা প্রাতে আমার নিকট আসিও, আমার পত্রাদি প্রস্তুত থাকিলে ; আর শিবজীকে আমার নাম করিয়া জানাইও যে তিনি যে তরুণ হাবিলদারকে এই বিষম কার্বো নিহত করিয়াছেন, সে হাবিলদার কার্বোর অনুপযুক্ত নহে। ” এই প্রশংসা বাক্যে রঘুনাথ মস্তক নত করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন।

রঘুনাথজী বিদায় পাইয়া চলিয়া গেলেন। রঘুনাথকে এরূপ পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য এই যে, কিল্লাদার শিবজীকে অতঃপর গুট রাজকীয় সংবাদ ও কতকগুলি গুট মন্ত্রণা পাঠ করার মানস করিতেছিলেন। সে গুলি সমস্ত লিপিবাহার ব্যক্ত করা যার না, লিপি শত্রুভক্তে পড়িতে পারে। রঘুনাথজীকে সে গুলি বাচনিক বলা যাইতে পারে কি না, অর্পনলে বা

কোন উপায়ে শত্রুর বশবর্তী হইয়া গৃঢ় মন্ত্রণা শত্রুর নিকট প্রকাশ করা রঘুনাথের পক্ষে সম্ভব কি না, কিল্লাদার তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলেন, পরীক্ষা শেষ হইল। রঘুনাথ নয়নপথের বহিভূত হইলে পর কিল্লাদার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “শিবজী এ বিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত, উপযুক্ত কার্যে যথার্থই উপযুক্ত লোক পাঠাইয়াছেন।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সরযুবালা।

“—সজনি! ভাল করি পেখন না ভেল।

মেঘমালা সঙ্গে, তড়িতলতা জন্ম,

হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥

আধ আঁচল খসি, আধ বদনে হাসি,

আধই নয়ন তরঙ্গ।

আধ উরজ হেরি, আধ আঁচর ভরি,

তব ধরি দগাধে অনঙ্গ ॥

একে তনু গোঁরা, কনয় কটোঁরা,

অতনু কাঁচল উপান।

হরি হরি কহ মন, জন্ম বুঝি এঁছন,

ফাস পসারল কাম ॥

দশন মুকুতা পাঁতি, অধর মিলায়ত,

মুহু মুহু কহ তাহি ভাষা।

বিদ্যাপতি কহ, অতবে সে হুঃখ রহ,

হেরি হেরি না পুরাল আশা ॥

বিদ্যাপতি।

রঘুনাথ কিল্লাদারের নিকট বিদায় পাইয়া ভবানীবেদীর মন্দিরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। এই হুর্গজয়ের অস্পন্দিন পরই শিবজী ভবানীর একটি মুষ্টি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ও অস্তর দেশীয় অতি উচ্চ কুলোস্তব এক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া দেবসেবার নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে এই দেবীর পূজা না দিয়া কোনও কার্যে লিপ্ত হইতেন না। দেবীকে পূজা দেওয়া ও পুরোহিতের নিকট যুদ্ধের ফলাফল জানাই রঘুনাথকে পাঠাইবার অন্যতম উদ্দেশ্য।

রঘুনাথ যৌবনোচিত উল্লাসের সহিত সাপন কৃষ্ণকেশগুলি নাচাইতে নাচাইতে একটি যুদ্ধগীত মৃদুস্বরে গাইতে গাইতে মন্দিরাভিমুখে আসিতেছিলেন, মন্দিরের নিকটে আসিলে, মন্দিরপার্শ্বস্থ ছাদে সহসা তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি দণ্ডায়মান হইলেন, সহসা তাঁহার শরীর কটকিত হইল! দেখিলেন সেই ছাদে একজন অনুপম লাবণ্যময়ী চতুর্দশ বর্ষীয়া বালিকা একাকী আসীনা রহিয়াছেন, হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া অস্ত্রাচলের রক্ষিমা শোভা অনিমেঘে দৃষ্টি করিতেছেন। কনার রেশম-বিনিম্বি সুরমার্জিত অতিকৃষ্ণ কেশপাশ গণ্ডস্থলে, হস্তোপরি, ও পৃষ্ঠদেশে লম্বিত রহিয়াছে এবং উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও ভ্রমরনিম্বি চক্ষুর্দ্বয় কিঞ্চিৎ আঁরত করিয়াছে। জায়গাল যেন তুলিঘারা লিখিত, কি সূন্দর বক্রভাবে ললাটের

শোভা সাধন করিতেছে। ওষ্ঠধর স্বক্ষম ও রক্তবর্ণ, উন্নতপ্রায় হইয়া রঘুনাথ সেই ওষ্ঠধরের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। হস্ত ও বাহু সুরগোল ও অতিশয় গৌরবর্ণ, ও সুরবর্ণের বলয় ও কঙ্কণদ্বারা সুরশোভিত। কন্যার ললাটে আকাশের রক্তিমস্ফটা পতিত হইয়া সেই তপ্তকাক্ষণ বর্ণকে সমধিক উজ্জ্বলতর করিতেছে। কণ্ঠ ও ঈষৎস্নত বক্ষস্থলের উপর একটি কণ্ঠমালা দোহলামান রহিয়াছে। রঘুনাথ! রঘুনাথ! সাবধান! তুমি রাজকার্যে আসিয়াছ, তুমি দরিদ্র, একজন সৈন্যমাত্র ও দিকে চাহিও না, ওপথে যাইও না। রঘুনাথ এ সকল বিবেচনা করিতেছিলেন না, তিনি মুগ্ধর ন্যায় অনিমেষ লোচনে সেই সায়ংকালের আকাশপটে অঙ্কিত অনুপম ছবির দিকে চাহিয়াছিলেন; তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইতেছিল, পূর্বে যে ভাব কখনও জানেন নাই, অদ্য সহসা সেই নব ভাবের উদ্বেগে হৃদয় মুলমূল সবলে আঁহত হইতেছিল; সময়ে সময়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইতেছিল। যৌবনপ্রারম্ভের প্রথম প্রেমের উর্দম বেগে তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, রঘুনাথ উন্মত্তপ্রায়!

যতক্ষণ দেখা গেল, রঘুনাথ প্রস্তুতবৎ অচল হইয়া সেই স্নানপ্রতিমূর্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সায়ন্তন আকাশের শোভা ক্রমে লীন হইয়া গেল, সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া সেই প্রতিমূর্তির

উপর পড়িতে লাগিল, রঘুনাথ তখনও দণ্ডায়মান!

সন্ধ্যার সময় কন্যা গৃহে যাইবার জন্য উঠিলেন,—দেখিলেন অনতিদূরে একজন দীর্ঘকায় অগ্নি সুরগঠন যুবক দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার দিকে অনিমেষ লোচনে দেখিতেছেন। ঈষৎ লজ্জায় কন্যার মুখ রঞ্জিত হইল, তিনি মুখ অবনত করিলেন। আবার চাহিয়া দেখিলেন, যুবক সেইরূপ বক্ষের উপর বামহস্ত স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ যুবকের উন্নত ললাট ও জ্যোতিঃপূর্ণ নয়নদ্বয় আরত করিয়াছে, কে'বে খজা, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ-বর্ষা, ও অনিমেষ লোচনে তখনও তাঁহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। মুহূর্তের জন্য রমণীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার মুখমণ্ডল লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ মস্তকে অবগুণ্ঠন দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তখন রঘুনাথ যেন টেঁচতন্য প্রাপ্ত হইলেন, ললাট হইতে দুই এক বিন্দু শ্বেদ মোচন করিলেন, মন্দিরের পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ধীরে ধীরে চিন্তিতভাবে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ও পুরোহিতের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে আমরা পুরোহিতের পরিচয় দিব।

পূর্বেই বলিয়াছি, পুরোহিত অশ্বরদেশীয় উচ্চ কুলোদ্ভব রাজপুত্র ব্রাহ্মণ, তাঁহার নাম জনার্দন দেব। তিনি অশ্ব-

রের রাজা প্রসিদ্ধ জয়সিংহের একজন সভাসদ ছিলেন, ও শিবজীর বহু অনু-
রোধে, জয়সিংহের অনুমতানুসারে শিব-
জীর সর্বপ্রথম বিজিত তোরণদ্বর্গে আগ-
মন করেন। তাঁহার পুত্র কন্যা কেহই
ছিল না, সুতরাং সস্ত্রীক এই দ্বর্গে আসিয়া
বহু যত্নে ভবানীর উপাসনা করিতেন ও
একটি অপত্য মানসে অনেক যাগযজ্ঞও
করিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে এই দ্বর্গে আ-
সিবার দুই তিন বৎসর পরই তাঁহার স্ত্রী
একটি কন্যা প্রসব করেন; কিন্তু কন্যা প্র-
সব করিয়াই তিনি কালক্রমে পতিতহন।

জনার্দন কন্যার নাম সরযুবাদা রা-
খিলেন ও একমাত্র অপত্যকে অতি যত্নে
লালন পালন করিতে লাগিলেন। কাল-
ক্রমে সরযুবাদা নিকম্প রূপবতী হইলেন,
ও যৌবন-প্রারম্ভে তাঁহার অপূর্ব লাভণা
ও নব নব সৌন্দর্য্যবিকাশ দেখিয়া দ্বর্গের
সকলেই বিস্মিত হইলেন। সকলেই বলি-
তেন যে, ভবানী উপাসকের পূজায় পরি-
তুষ্ট হইয়া, তাঁহার কন্যাকে এইরূপ দেব-
তুল্য সৌন্দর্য্য ও লাভণ্যে বিভূষিত করিয়া-
ছেন। জনার্দনও কন্যার সৌন্দর্য্য ও স্নেহে
পরিতুষ্ট হইয়া রাজস্থান হইতে নির্বাস-
নের দ্রুতও বিস্মৃত হইলেন।

দেবালয়ে রঘুনাথ কতকক্ষণ অপেক্ষা
করিলে পর জনার্দন দেব মন্দিরে প্রবেশ
করিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশৎ
বর্ষ হইয়াছে, অবয়ব দীর্ঘ ও একগুণে বলিষ্ঠ,
চক্ষুস্বর্ণ শান্তিরস-পূর্ণ এবং স্বেচ্ছাশ্রু বি-

শাল বক্ষঃস্থল আবরণ করিয়াছে। জনা-
র্দনের বর্ণ গৌর, কন্ধু হইতে যজ্ঞোপবীত
লব্ধিত রহিয়াছে! পূজকের পবিত্র শান্তি-
পূর্ণ মন, ও বালকের তায় সরল হৃদয়
জনার্দনের মুখ দেখিলেই বোধগম্য হইত।
জনার্দন ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রবেশ করি-
লেন, তাঁহাকে দেখিয়া রঘুনাথ সমস্ত্রমে
আসন ভাগ করিয়া গাত্ৰোপস্থান করিলেন।

সংক্ষেপে মিষ্টালাপ করিয়া উভয়ে
আসন গ্রহণ করিলেন ও জনার্দন শিবজীর
কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘ-
নাথ বতদূর পারিলেন যুদ্ধের বিবরণ বলি-
লেন, ও শিবজীর প্রণাম জানাইয়া পূজকের
হস্তে কএকটি সুরবর্ম্মুজা দিয়া বলিলেন—

“প্রভুর প্রার্থনা যে তিনি এক্ষণে
যোগলদিগের সহিত যে তুমুল রণে নিযুক্ত
হইয়াছেন, তাহাতে আপনি তাহার জয়ের
জন্য ভবানীর নিকট পূজা করিবেন।
দেবীর প্রসাদ ভিন্ন মনুষ্য-চেষ্টা রূপা।”

জনার্দন তাঁহার নৈসর্গিক স্থির গম্ভী-
রস্বরে উত্তর করিলেন “সনাতন হিন্দু-
ধর্ম্ম রক্ষার জন্য মাদৃশ লোকের চিরকা-
লই যত্ন করা বিধেয়, সেই ধর্ম্মের প্রহরী
স্বরূপ শিবজীর বিজয়ের জন্য অবশ্যই
পূজা দিব। মহাত্মাকে জানাইও সে বি-
ষয়ে ক্রটি করিব না।”

রঘুনাথ। “প্রভুর দেবীপদে আর
একটি আবেদন আছে। তিনি ঘোরভর
যুদ্ধে প্ররক্ত হইবেন, তাহার ফলাফল ক-
থঞ্চিৎ পূর্বে জানিবার আকাঙ্ক্ষা করেন।

ভবানুশ দূরদর্শী দৈবজ্ঞ এ বিষয়ে অবশ্যই
তঁাহার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারেন।”

জনার্দন ক্রমেক চক্ষু মুদিত করিয়া র-
হিলেন, পরে পুনরায় আপনার অকম্পিত
গাঙ্গুর স্বরে বলিলেন—

“ রজনীষোণে দেবী-পদে শিবজীর
বাসনা জানাইব, কল্যাণে উত্তর জা-
নিত্তে পারিবে। ”

রঘুনাথ ধনুবাদ করিয়া বিদায় হই-
বার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে
জনার্দন বলিলেন ।

“ তোমাকে পূর্বে এই ভূর্গে দেখি
নাই, অদ্য কি প্রথমে এ স্থলে আসিয়াছ ? ”

রঘু । “ অদ্যই আসিয়াছি । ”

জন । “ ভূর্গে কাহারও সহিত পরি-
চয় আছে ? থাকিবার স্থল আছে ? ”

রঘু । “ পরিচয় নাই, কিন্তু কোন এক
স্থানে রজনী অতিবাহিত করিব, কল্যাণে
তেই চলিয়া যাইব । ”

জন । “ কি জন্য অনর্থক ক্রেশ সহ
করিবে ? ”

রঘু । “ প্রভুর অনুগ্রহে কোন ক্রেশ
হইবে না, আমাদের সর্কদাই এক্ষেপে রাত্রি
অতিবাহিত করিতে হয় । ”

রঘুকের এইরূপ কথা শুনিয়া ও সরল
উদার স্বভাব দর্শনে জনার্দনের অশ্রুংকরণে
বাৎসল্যের উত্থেক হইল, বলিলেন—

“ বৎস ! যুদ্ধসময়ে ক্রেশ অনিবার্য,
কিন্তু অদ্য ক্রেশ সহনের কোন আবশ্যকতা
নাই । আমার এই দেবালয়ে অবস্থিতি কর,
সরযু তোমার খাদ্যের আয়োজন করিয়া
দিবে । পরে রাত্রে বিশ্রাম করিয়া কল্যাণে
বীর আজ্ঞা শিবজীর নিকট লইয়া যাইবে । ”

রঘুনাথজীর বক্ষস্থল সহসা স্ফীত
হইল, তঁাহার হৃদয়ে যেন কে সজোরে
আঘাত করিল । এটি যাতনা না আনন্দের
উদ্বোধ ? সরযু ! সরযু ! সে কি সেই
সাগংকালীন আকাশপটে অঙ্কিত মনো-
হর চিত্র ? রজনীর আগমনে আকাশপট
হইতে সে চিত্র লীন হইয়াছে, কিন্তু রঘু-
নাথের হৃদয়-পট হইতে সে আনন্দময়ী মূর্তি
কখন—কখন—কখনই লীন হইবে না ।

—

কাল

“ নদী আর কাল-গতি একই সমান , ”

একই রূপেতে দোহে করয়ে পলাণ ।

তটিনীর গতি প্রায়, অমূল্য সময় হার

ঢালিছে অদৃশ্য ভাবে অনন্তে শরীর ;

চলিতেছে চল চল, কে তারে ফিরাবে বল ?—

ফিরিবেনা—ফিরাবারে পারে কোন বীর ?
যেন তটিনীর গতি !—এত অজ্ঞানতা অতি !—

জলেতে ভাসিয়া গেলে অভুল রতন ;

যতন করিলে পরে পুনঃ তারে পাই করে—

আবর্তে ঘুরিয়া উঠে আপনি কখন ।

কালের তরঙ্গে হার, যদি কছু ভেসে যায়,

পুনঃ কি কখন তার পাই করতলে ?
 প্রফুল্ল কমল দলে ভাসারে দিলাম জলে
 ঘুরিতে ঘুরিতে পদ্ম হাসি হাসি চলে,—
 তখনি নামিয়া নীরে সঁতারিয়া নলিনীরে
 ফিরিয়ে আনিতে পারি প্রয়াস করিলে;—
 ফিরে কি ভাসিয়াগেলে কালের সলিলে ?

২

কত রত্ন অগণন—অমূল্য উজ্জ্বল
 কাল-স্রোতে গেছে ভেসে অর্ণবে অতল—
 অবনীৰ অলঙ্কার ! ফিরিবে না তারা আর !
 এ নহে তটিনী-গতি !—বারেক তা হলে
 জীবন করিয়া পণ করিতাম দরশন
 সাহসে বাঁধিয়া বুক নামি সেই জলে,
 ফিরাইতে গতি তার প্রতিজ্ঞার বলে !

৩

এক দিনে কত হয় এক দিনে কত লয়—
 সপ্ত দিনে এই তিন ব্রহ্মাণ্ড স্বজন !
 পলকে প্রলয়-জলে কতু বিশ্ব যায় তলে
 পলকে প্রকাশে লক্ষ জগৎ নৃতন !
 তুচ্ছ নহে একপল ক্ষুদ্র এক বিন্দু জল
 দশ দিন যুগ মাস মিশি পলে পল,
 বারি বিন্দু বিন্দু সনে মিশি হয় একক্ষণে
 জনমে ভীষণ সিদ্ধু অতন্ত অতল !
 ক্ষুদ্র দেখি তুচ্ছ ভাব যে হৃদয়ে জ্ঞানাভাব
 অনন্ত জগৎ এই অণুকণাময় !
 নব শিশু ক্ষুদ্রাকার, কালে ভীষণ অবতার,
 পদ সন্তে কাঁপে ব্যোম গিরি সমুদয়।
 বিচিত্র কালের গতি জ্ঞানিগণ কর।

৪

উন্নতি কি অবনতি,—সাধনের ফল ;

সভ্যতা ভব্যতা কিবা কালেতে সকল।
 কালে শিশু ভীমকায় কালে ভীম শিশু প্রায়
 কালেতে মশক ঐরাবত-অবতার,
 কালে হয় কালে লয় কালেতে জলের রয়
 উর্দ্ধগামী !—অবিশ্বাস ? বিচিত্রব্যাপার !
 সুরমা নগরী হয় কালেতে শ্মশান প্রায়
 ফেঁকপাল হা বিপাতঃ ! ফুকে গভীর !
 ভীষণ অটবীচয় কালে রাজধানী হয়
 রাজধানী অরণ্যানী ! দরিদ্র ফকির
 পৃথিবীর অধিপতি !—প্রবল প্রতাপ অতি,—
 জকুটি ভঙ্গিতে কাঁপে মেদিনী গগণ !
 কালে ইন্দ্র বনবাসী ইন্দ্রাণী দনুজদাসী !—
 অন্নভাবে অন্নপূর্ণা কাতর জীবন !
 কালে ভীম মকস্থল পুষ্পোদ্যান ! বল মল
 করে কিবা প্রতিপল সাজি চাক সাজে !
 সরস সরসী তার, শতদলে শোভা পায়,
 মাধবী বকুল চাপা হেমলতা রাজে।
 চারিদিকে ফুটে ফুল বিশ্ববাসী প্রেমাঙ্কল
 মেহুর মলয় বয় ছুটে পরিমল,
 কোকিল পঞ্চম গায় অলি মধুলোভে ধায়
 আনন্দ-উৎসব-মত্ত ধরিত্রী সকল।
 কালেতে প্রমোদ বন মকস্থল বিভীষণ
 ধুধু করে বালুময় প্রকাণ্ড প্রান্তর !
 দীপ্ত প্রভাকর করে প্রচণ্ড মুরতি ধরে
 মায়াবিনী মরীচিকা !—শিহরে অন্তর !
 প্রবল প্রতাপে ভায়, মতানিল ছুটে যায়,
 উৎপাটিত সন্তাড়িত করি সমুদায় !
 মরি কিবা ভীম ভাব !—উচ্ছ্বাসিৎ রাব
 পাবক-প্লাবনে করি প্লাবিত ধরায় !
 গভীর অর্ণবচয় কালে উচ্চ হিমালয়—

কালে হিমালয় বিশ্বগর্ভে নিমগন ।
 প্রমত্ত পবন ধায় উত্তুঙ্গ তরঙ্গ ভায়
 ভীম ভাবে ছুটে যায় ছাড়িয়া গর্জন ।
 কাঁপায়ে মেদিনীবোম, শনি শক্রমূর্খ্য সোম,
 আছাড়ে আছাড়ে পড়ি নিমগ্ন পাহাড়ে ;
 আবর্তে আবর্তে ঘুরি ভীমনাদ ছাড়ে !

৫

শতদল-দল-গত যেমন জীবন,
 এই বিশ্বে সমুদায় জানিবে তেমন ।
 সমীরণ সদা বয় কখন সে স্থির নয়
 সদাগতি নাম ওই ; কুঙ্গু কলু স্বরে,
 আপনার মনে হায় ! সতত তটিনী ধায়

মিশিছে চলিয়া নিত্য গভীর সাগরে ।
 অদৃশ্য কালের গতি ;--কিন্তু সে চঞ্চল অতি,
 জ্ঞানীরে তুলাতে নারে অজ্ঞানে কুহরে,--
 মিশিছে চলিয়া নিত্য কালের প্রান্তরে
 উত্তাল তরঙ্গ রাশি, মত্ত ভাবে অট্ট হাসি,
 উঠিছে ছুটিছে রঙ্গে পবন-হিমোলো,
 অতল অনন্তব্যাপী অর্ণবের কোলে ;--
 সে তরঙ্গ-রঙ্গে হায় ! জীব জলবিশ্ব প্রায়,
 জীবলীলা লীলাচলে মিশাইয়া যায়,
 যে জন্ম যথার্থ জ্ঞানী, জ্ঞানে নহে অভিমানী
 জীবনের ব্রত সেই মাখে সাধনায় ।

(হরিমোহন)

আগ্রা ।

এমনও এক সময় হইয়া গিয়াছে, যখন এই আগ্রা হার অদূরবর্তিনী যত্ন-রাজধানী মথুরা পুরীর প্রাজ্ঞগস্থ কেলিকানন স্বরূপ শোভমানা ছিল । এমনও সময় আবার অগ্রীও হইয়াছে যখন এস্থান বিশ্বব্যাপক মহাতেজস্বী শাক্যোপাসকদিগের বিহার ভূমি মথুরার ষার-বজ্রস্থ যাত্রিনিবাস মধ্যে পরিগণিত ছিল । হয়ত কোম দিন ইহাই লক্ষ্য যুদ্ধ ও কনিষ্ঠ প্রভৃতি ইণ্ডুসাইথীয় রাজচক্রবর্তীদিগের প্রতিদিন সেবনীয় মৃগয়াভূমিতে পরিবর্তিত হইয়াছিল । আবার এমনও দিন উপস্থিত হইয়াছিল যে, হয়ত সেই দিনে ইহার প্রান্তবর্তী মহাবল পরাক্রান্ত পরমার

পরিহার এবং চৌহান বংশীয় রজঃপুত-জাতীয় রাজপুত্রেরা ইহাকে আপন আপন দিগ্গুচ্চ পথের বিশ্রামাবাস করিয়া ব্যবহারে আনিরাছিলেন । আবার সর্বশেষে ইহার ভাগ্যে এমনও এক সময় আসিয়া যুটুরাছিল, যখন এই আগ্রা সমস্ত ভারতবর্ষের কেন্দ্রভূমি হইয়া মোগল-কুল-ভিলক সম্রাটের আকবরের রাজধানীরূপে পৃথিবীবক্ষে অতুল ঐশ্বর্যের আকরভাবে বিরাজ করিতেছিল ।

ভারতের ঐতিহাসিক ভিমির মধ্যে মুসলমানদিগের পূর্ববর্তী কালে এ স্থানে কখন কোন্ সময়ে কি ভাবে যে কতকিছু হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহা বর্তমান স-

ময়ে কোনরূপেই অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা নির্দেশ করিয়া দেখাইতে পারি না। কিন্তু এইটি এক প্রকার নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারি যে, মোগলদিগের সভ্যতা, শিক্ষা, বিদ্যা, বুদ্ধি এবং বল প্রথমে এখন হইতেই তরঙ্গের ন্যায় ক্ষীণ হইয়া কখন বা হিমালয়সঙ্গে, কখন বা পূর্ব ঘাটপার্শ্বে, কখন বা পশ্চিমঘাটতে এবং কখন বা কন্যাকুমারীর অন্তরীপশৃঙ্গে বাইরা আঘাত করিতেছিল। এইখানেই কোন সময়ে আবুলফজল, ফয়জী, বীরবল ও মানসিংহ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তির রহস্যম্পতিকক্ষস্থ চন্দ্রচূড়ায়ের ন্যায় আকবর পার্শ্বে থাকিয়া কখন বা ইহার দরবারে আম্ নামক গৃহে এবং কখন বা ইহার দরবারে খাম্ নামধেয় ভবনে করে কর সম্মিলন পূর্বক নৃত্য করিয়াছিল। ইহারই ভয়াবশেষের অভ্যন্তরীণ কোন এক গৃহপ্রাঙ্গণে বসিয়া মস্ত্রিবর আবুলফজল তাঁহার চিরপ্রসিদ্ধ আইন আকবরির পাণ্ডুলিপি লিখিয়াছিলেন; এবং ইহারই ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত ভগ্নগৃহ মস্জিদাদির কণ্ডসমূহকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য কোন দিন সেই প্রসিদ্ধ যবনকবি ফয়জী, আপনার মূললিত কবিতাক্ষমমে মালা গ্রাম্মন করিয়া আপন হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। এইক্ষণ কাল-কুরঙ্গ, সেই সমস্ত ঘটনা ও কথাকে ভূতরাঙ্গোর অশ্বভূমিতে নির্বাসিত করিয়া, ইহাকে আপনার মুখাবলীত তৃণপত্রের ন্যায় কেবল কতকগুলি চূর্ণীকৃত

সমাদিপুঞ্জাবশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। যে দিকে দেখ, সেই দিকেই ভাঙ্গা গোর ও সমাদি মস্জিদ। কোন স্থানে কোন প্রসিদ্ধ গৃহশ্রেণীর খান কত ভগ্ন ইষ্টক পড়িয়া আছে;—কোথাও বা একটি প্রাচীরংশ তৃণ গুল্মে রোমায়িত হইয়া কোন এক নিভৃত স্থানের আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া আছে। কোন স্থানে কোন একটি গৃহের বিভগ্ন শরীর ও নিকলাভাসুর, অস্ত্রমাত্রাবশিষ্ট লুকপালের মুখাভানবের স্তম্ভপথপার্শ্বে পড়িয়া রতিনা পাম্বুর্ণের দস্ত ও অতঙ্গরের পতি জাকৃতি করিতেছে। কোথাও বা সেই সকল প্রসিদ্ধ লোকদিগের মধ্যে কাহার কাহার দেহাবশিষ্ট রক্তোমুক্তি, শকটবস্ত্রের মদ্যপথে পড়িয়া এবং চক্রবর্ণণে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পশ্চিমের শ্মশ্রু ও কপালসমূহকে বিরঞ্জিত করিতেছে। কোথাও আবার কালবিদলিত, সর্ব্বোৎপাটিত এবং শূন্যাবশিষ্ট অট্টালিকা-ভূমিতে স্বভাবজাত কণ্টক সমাকুল বহুল তরুর সমাশ্রয়ে, বিজনতা যেন বিনাশ দর্শনে অতিকরণস্বরে পারাবতকণ্ঠে রোদন করিতেছে। বস্তুতঃ যে দিকে চক্ষু এবং কর্ণ ফিরাইবে, সেই দিকেই বোধ হইবে, যেন বিরাটকাল, এক পার্শ্বে আপনার চিরসহচর স্বরূপ বন, বিজনতা, ও শূন্যতা প্রভৃতি প্রেতদলের সহিত বসিয়া অতি গস্তীরভাবে ভোজনব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত রাখিয়াছে;—আর অপর পার্শ্বে অদিবাসী পাচকেরা গৃহ, অট্টালিকা ও ঘটনাদিরূপ

নূতন নূতন অন্নব্যঞ্জন শাক স্থপাদি রন্ধনের ধুম, অগ্নিস্ফালা, কোলাহল ও দণ্ড কটাহ প্রভৃতির খট খট শব্দে চক্ষুকর্ণকে অন্ধ ও বধির করিয়া তুলিতেছে।

যদিও ইহার গত যৌবনজীর সহিত তুলনা করিলে আশ্রয় এইক্ষণ কিছুই নহে, তথাপি ইহার প্রাচীন মাহাত্ম্য এবং কালকরের অম্পৃষ্ঠ--ইহার অন্তর্গত কোন কোন পদার্থ দূর হইতে ভ্রমণকারীদিগকে এখনও আকর্ষণ করিয়া আনে। এখনও ইহা দর্শক বর্গের তীর্থ স্থান বলিয়া গণনীয়। অতএব যদি আমি এখানে মোগল বংশীয় দিগের মহাপীঠ এই আশ্রয় নগরের কোন কোন রত্নাস্ত্র লিপি বন্ধ করি, বোধ হয় তাহা পাঠক বর্গের নিতান্ত অপ্রিয়কর অথবা পঠন-ক্লাস্তিকর হইবে না। তাঁহার প্রাচীন আখ্যাবর্তের অর্থাৎ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বর্তমান অবস্থার বহুতর বিষয় সামান্য ভাবে সাংক্ষেপিক রূপে ইহা দ্বারা পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। যেমন কোন একটি মনুষ্য শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার অভ্যন্তরীণ নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি ও তৎসহ তদন্তর্গত ব্যাপারাদি অতি সামান্য ভাবে দর্শন করিলেও সামান্যরূপে সমুদয় মনুষ্য শরীরেরই পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, সেইরূপ কোন একটি দেশ কি প্রদেশের কোন একটি কেন্দ্রীভূত নগরকে সামান্যরূপে মনোনিবেশের সহিত দর্শন করিলে, কিংবা তাহার রত্নাস্ত্র পাঠ করিলেও সামান্যতঃ সেই সমস্ত ভূখণ্ডের বহুতর বিষয়

পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। আমি অতি দীর্ঘকাল এই নগরে বাস করিয়া আসিতেছি। এই সময়ের মধ্যে, যদিও কোন দিন দেখিবার জন্য অধিক যত্ন করি নাই, তথাপি বিনাযত্নেই এত বিষয় চক্ষু পতিত হইয়াছে যে, তাহা এখন যত্নের সহিত কুড়াইয়া একত্রিত করিতে পারিলে, তাঁহার এ পর্যন্ত এ সকল স্থান দেখেন নাই, তাঁহাদিগকে তদ্বারা একটি ছোট খাট কোঁতুকাবহ উপহার প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আমি এখানে তাহাই করিতে প্ররত্ত হইলাম। আমার স্বদেশীয় পাঠকেরা যদি ইহা পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ আশ্রয়িত হন, আমি তাহা হইলেই পরিশ্রমসার্থক মনে করিব।

প্রস্তাব আরম্ভ করিবার পূর্বে গুটিকত কথা। যদিও প্রকৃত বিষয়ের সহিত তাহার বিশেষ কোন সংশ্রব নাই, তথাপি মনের দুঃখ প্রকাশ জন্য পাঠকবর্গকে গুটিকত কথা বলা আমার যেন আশুচক বোধ হইতেছে। পাঠকবর্গ অল্প পরিমাণ অনুধাবনের সহিত ভাবিলেই অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে, আমাদের অন্তঃকরণ পূর্বাশ্রয় কিঞ্চিৎ পরিমাণে অধিকতর জিজ্ঞাসু এবং অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণ আমাদের দ্বারা আমাদের পার্শ্ববর্তী ঘটনা কি ব্যাপারাদি পূর্বের ত্রায় তত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষিত হয় না। সকল বিষয়েরই একটু একটু তত্ত্ব জানিতে অনেকেরই ইচ্ছাকরে।

যদিও এই জ্ঞান-কুখ্য সম্যক্ রূপে সর্ব সাধারণের অন্তরে এক্ষণ পর্য্যন্তও অধিকার-স্থান পায় নাই, যদিও সাধারণ্যে দাক্ষিণ্য মন্দায়িত প্রকোপ এখন অত্যন্ত প্রবলই রহিয়াছে, তথাপি কোন কোন শ্রেণীর লোকের মধ্যে কোন কোন অংশে অতি সামান্য পরিমাণে একটুকু কুখ্যার বেগ জন্মিয়া উঠিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এটি মৃত আশালতাতে প্রাণ সঞ্চা-রের কিঞ্চিৎ পরিচয় তাহার সন্দেহ নাই। ইহা যে ইংরেজি শিক্ষা এবং ইংরেজ জাতির প্রকৃতিগত দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দীপনায় হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এ সকল হইয়াও মধ্যপথে কতকগুলি অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে, পূর্বে আশালতার অক্ষর যেন আর রুদ্ধি পাইতেছে না। একটু একটু হরিদ্বর্ণ মুখ বাহির করিয়া যেখানকার যাহা, তাহা সেই ধামেই আবার বিবর্ণতা পাইয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে। এরূপ হইয়া যাওয়ার কএকটি কারণ আছে। তন্মধ্যে প্রধান এবং সর্ব প্রথম এই যে, যাহার কুখ্য জন্মিয়াছে তাহার অন্ন নাই, আর যাহার অন্ন আছে, তাহার কুখ্য কি কচি-মাত্র নাই। অন্নবানেরা অন্নের শয়্যা, অন্নের উপাধান, অন্নের পাত্রিকা এবং অবশেষে অন্ন পথ পর্য্যন্ত বাঁধাইয়া তাহার উপরে প্রত্যহ পদচারণা করিবেন ও তাহাতে মৃত পুরীষ পরিত্যাগ করিয়া অপ-রের অগম্য করিয়া রাখিবেন; তথাপি

নিরন্নদিগের কুখ্যানল নির্বাণ জন্ম প্রা-ণান্তেও একটি কপর্দক পরিত্যাগ করি-বেন না। তাঁহাদের অন্নরাশি বস্ত্রা বাঁধিয়া বাঁধিয়া আপন হস্তে প্রতিদিন মল-রূপে নিক্ষেপ করিয়া পাচাইবেন, তথাপি একটি পয়সা অন্নের কুখ্য-নিরন্তর জন্ত ব্যয়িত হইতে দেখিতে পারিবেন না। তাঁহাদের কুখ্যও জন্মে না, অন্নের এরূপ হ্রগতিও ঘটে না। যাহার অনেক উদ্দীপক ঔষধি খাওয়াইবার পরে কিঞ্চিৎ জন্মে তাহাও বিকৃত কুখ্য;—কাগ এবং বোতল ভাঙ্গা খাইবার কুখ্য;—মাটি খাইবার কুখ্য। একটিরও অন্ন বাঞ্ছনের প্রতি অভিক্চি হয় না। ভারতের ভাগ্যে যদি অন্নবস্ত্রদি-গের একবার প্রকৃত কুখ্য জন্মিত, তাহা হইলে অনেক নিরন্ন তত্ত্ব-কুখ্যার্ত লোক তাঁ-হাদের ভোজ্য সমাগোহে আপন আপন উদর পুষ্টি করিয়া মহান্ আনন্দ লাভ করিতে পারিত; আর এরূপে মুহমান হইয়া যাইত না। দেশের স্তম্ভও অনেক উজ্জ্বল এবং প্রসন্ন দেখাইত। যে সকল লোকের কথা এখানে উল্লিখিত হইল, ইহঁারা প্রায় সকলেই আপন আপন পিতৃ-পুরুষদিগের ছল বন বাহুপার্জিত অন্ন অন্নবস্ত্র; ইহঁাদিগের আপন বিক্রমোপা-র্জিত কিছুই নহে, ইহঁারা যক্ষ নাগের মূর্তি ধারণ করিয়া কেবল পিতামহের স্মরণ ক-লসকে বেঁটন করিয়া রহিয়াছেন। ইহাতে পুরুষকারের কোন চিহ্নই দেখিতে পা-ওয়া যায় না। যদি পক্ষান্তরে ইহঁারা এই

অন্নদ্বারা দেশের মানারূপ জ্ঞান-হুর্ভিক্ত
নিবারণের চেষ্টা পান, তাহা হইলে ই-
হাঁদিগের অনেক পুরুষকারের কথা হইয়া
উঠে সম্ভেদ নাই। ঝাড় পানসের সঙ্গে
ইহাঁদিগের অন্তিম চূর্ণ হইয়া যাইবার আর
সম্ভাবনা থাকে না।

নিরন্নদলের মধ্যে অনেকে পাঠশালা
রূপ চিকিৎসালয়ে থাকিয়া শিক্ষক বৈ-
দ্যের উপদেশ রূপ উদ্দীপক ঔষধ দ্বারা
কিছু দিন হইল জ্ঞান-ক্ষুধাকে অত্যন্ত উ-
ত্তেজিত করিয়াছিলেন। দেখা গেল যে,
তঁাহাদের অনেকেই সেই চিকিৎসালয় ছা-
ড়িয়া যখন কিঞ্চিৎ অন্নবস্ত হইয়া উঠিলেন,
অমনি এককালে ক্ষুধা রহিত হইয়া শয্যা
পড়িলেন। তাহাদের ক্ষুধা আর রহিল না।
নানাপ্রকার বিকৃত ক্ষুধা জন্মিতে লাগিল।
বোতল ভাঙ্গা, কাগ, ছাই, মাটি ও গো-
বরের কচি জন্মিয়া উঠিল। এইরূপ অস্বাভাবিক
উপস্থিত হওয়াতে কোন দলেই পুষ্টি বি-
স্তৃত হইতে পারিতেছে না। অন্নবস্তের
যে রূপ বিকৃত পদার্থ সকলের আহারে এ-
কদিকে শঙ্ক হইয়া যাইতেছেন, সেইরূপ নি-
রন্নের ক্ষুধাসত্ত্বেও অপারদিকে মুহ্যমান হ-
ইয়া পড়িতেছেন। একরূপ কেন হইল? ক্ষুধা
থাকে ত অন্ন থাকেনা, অন্ন থাকে ত ক্ষুধা
থাকে না। একি অন্নেরই দোষ, না, লো-
কের প্রকৃতির দোষ? যদি অন্নের দোষ
হইবে, তবে ভিন্নদেশে কেন ভিন্নরূপ দৃষ্ট
হয়? লার্ডরস্, লার্ডওরের প্রকৃতির ক্ষুধা
কেন অন্নরূপ? এই ভারতবর্ষের কাল-

চর্চিত বকে এত স্থানে এত কৌতুহল
রহিয়াছে এবং সেই সকল চিক্লেস সহিত
এত ঐতিহাসিক তত্ত্ব লোকের অবজ্ঞা
এবং উপেক্ষা বশতঃ এতদিকে এতভাবে
দৃষ্টিপথের অগোচরে ভূগর্ভে বিলীন হ-
ইয়া যাইতেছে যে, যদি তাহা এ দেশীয়
ধনিসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ সম্মি-
লিত হইয়া আপন পিতৃপুরুষদিগের প্রতি
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপে সেই সকলের
চিত্রপাট ও তৎসহ তাঁহাদের ঐতিহাসিক
রত্নাস্ত্র একত্রে এক স্থানে সংগ্রহ করিয়া
পুস্তকে নিবদ্ধ করেন, তাহা হইলে সেই
পূর্বে পুরুষদিগের সমাধির উপরে একটি
অপূর্বে স্বর্ণ স্তম্ভ প্রস্থত হয়। এবং এই
সকল চিক্লেস-চিত্র ও তাহার রত্নাস্ত্র সর্বদা
অন্তঃকরণে দেশের অনুরাগকে উদ্দীপন
করে। সময়ে সেই উদ্দীপনা আবার প্রাণ-
বলেও পরিণত হয়। যঁাহারা এই স্তম্ভ
প্রস্থত করেন, তাঁহারাও পৃথিবীতে সর্ব-
স্বতীর অধিষ্ঠান কাল পর্যন্ত ভারত বাসী-
দিগের ভাবি হৃদয়ে জীবিত থাকিতে
পারেন। যে দেশে শ্রাণ আছে, খু-
জিয়া দেখ, সেই দেশেরই প্রতি গৃহে
এইরূপ স্মরণ-স্তম্ভ পুস্তকাকারে প্রামাণ্যে
বিগ্রহরূপে অর্চিত হইতেছে। আর যে
দেশে ইহা পাদ-দলিত হইয়া স্মরণাগার
হইতে অবজ্ঞা ও অবহেলার সম্বার্কনী দ্বারা
অপসারিত হইয়াছে, সেই দেশই প্রেত-
লোকগত পিতৃ-দেবতাদিগের অবমাননা
রূপ পাণ্ডে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া এবং পূর্বে

পুস্তকদিগের বলবীৰ্য্য কীৰ্ত্তি সাহসাদির উদ্দীপনারূপ ভেজে বঞ্চিত হইয়া ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ ও অবশেষে ভস্মরূপে পরিণত হইয়াছে। কোন একটি সামান্য গ্রামের ইতিহাসও যদি প্রকৃত রূপে লিখিত হয়, তাহাতেও অনেক পরিশ্রম, সহায়তা, সময়, অনুসন্ধান ও কখন কখন অর্থবিতরণ আবশ্যক করে। বিদেশীদেরা এবং ল্প্রকারের কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে আমাদের নিকট হইতে যত সাহায্য এবং সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন, আমরা স্বদেশীদেরা আপনাদের নিকট হইতে তাহার চতুর্থাংশের একাংশও সহজে পাইতে পারি না। সুতরাং আমরা কাব্য লিখি, কল্পনার আশ্রয় লই, এবং স্বস্তান্ত জগতের সম্মুখীন হইতে, অথবা ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রবেশ করিতে যেরূপ সাহায্য, সপ্ন ও উপকরণ সামগ্রীর আবশ্যকতা তাহা না পাইয়া, এবং পাইতে চাহিলে কমল-মধু-মুগ্ধ স্বদেশীয় ধনিসন্তানদিগের নিকট স্থগিত, উপেক্ষিত ও সৰ্ব্বপ্রকারে বিড়ম্বিত হইয়া কাল-কৃষ্ণি-নিহিত পুরাতন তত্ত্বের অনুসন্ধানে বিরত হই। পুরাতন তত্ত্বের অনুসরণ আমার পক্ষে আরও কষ্টকর। অথস্থার নিপীড়নে আমি যার পর নাই অসহায়। আর, পদমৰ্যাদা এবং প্রতিপত্তি-বিরহে এই আগ্রার অনেক স্থানই আমার অগম্য, অথবা দুরধিগম্য। আমি পাঠক-বর্গকে এই হেতু পূর্বেই বলিয়া রাখিতেছি যে, আমি তাঁহাদিগকে যাহা

উপহার দিব, তাহা অযত্নলব্ধ এবং ইতিহাসের শৃঙ্খলা-শূন্য।

আগ্রা হিন্দুদের সময়ে কি ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার কোন স্পষ্ট চিহ্নই ইহার শরীরের উপর এক্ষণ বিদ্যমান নাই। কনিংহাম্ প্রভৃতি স্থপতি কাকবিশারদ ব্যক্তির ইহার নামের ব্যুৎপত্তি হইতে এবং অন্যান্য লেখকদিগের মত হইতে ও অন্যবিধ কারণ সমস্ত হইতে ইহার নাম ও প্রাচীনত্বের বিষয়ে নানা প্রকার অনুমান করেন। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণ জন্ত তাহার কিছুটা এখানে উল্লেখ করা হইল।

টঙ্কস'হেবের রাজস্থানের পুরাতত্ত্বে আগ্রা কোন কালে অগরওয়ালুবংশীয় সরদারদিগের বাসভূমি ছিল বলিয়া, উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের বংশাবশেষ এখনও নাকি দিল্লীর পশ্চিমে অগরোহা নামক স্থানে, বুদ্ধেলখণ্ডে, রাজপুতনার কোন কোন অংশে এবং মালোয়াদেশের অগ্গর নামক স্থানে বাস করিতেছে।

কুইন্টস্কার্টয়স্ তাঁহার পুরাতত্ত্বে “অগ্রামেশ” নামে যে এক প্রাচীন রাজার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কেহ কেহ, আগ্রা, তাঁহার রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমান করেন। কেহ বলেন যে, রজঃপুতবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে “অগ্রাজ” নামে কেহ ছিলেন। তিনি অগ্নি হইতে উদ্ভব হইয়া ছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম অগ্রাজ হইয়াছিল। আগ্রা এক সময় তাঁহারই রাজধানী ছিল।

কেহ আবার বলেন, পুরাণে অগ্নিমিত্র নামে যে এক রাজার উল্লেখ আছে, সেই অগ্নিমিত্র শব্দই কালে আকৃষ্ট ও অপভ্রান্ত হইয়া অগরাজ হইয়া গিয়াছে। অগরাজ এবং অগ্নিমিত্র এক ব্যক্তিরই অভিধান। সুতরাং এস্থানে অগ্নিমিত্র অর্থাৎ অগরাজের রাজধানী ছিল বলিয়াই, ইহার নাম আণ্ড্রা হইয়াছে।

কেহ অনুমান করেন, কাল-প্রসিদ্ধ মথুরার অগ্রবর্তী নগর বলিয়াই ইহার আণ্ড্রা নাম দেওয়া হইয়াছে। অন্য এক সম্প্রদায় বলেন যে, হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে অগর্ শব্দে লবণকণ্ডকে বুঝায়। আণ্ড্রার মৃত্তিকাতে অনেক স্থানে লবণ উৎপন্ন হয়, এবং ইহার কূপাদির জলও লবণাক্ত। সুতরাং ইহাকে অগর্ অর্থাৎ লবণকণ্ড মনে করিয়াই ইহার নাম আণ্ড্রা রাখা হইয়াছে।

আবার ১৮৬৯ সনে এই আণ্ড্রানগরের কোন একটা স্থান খনন করিতে করিতে প্রায় দ্বিসহস্রেরও অধিক রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যায়। তাহার সমুদয় মুদ্রাতেই প্রাচীন পাশ্চাত্য সংস্কৃত অক্ষরে অতি স্পষ্টরূপে “ গুহিল জী ” নাম অঙ্কিত ছিল। কেহ কেহ ভাবেন যে, এই “গুহিল জী” হয় ত মেওয়ার দেশীয় খীলোট বংশের আদিপুরুষ জীগোহাদিত্য অথবা গুহিল হইবেন। ইনি ইংরেজী ৭৫০ অব্দে প্রাদুর্ভূত হন। কিন্তু মুদ্রার কলেবরে যে জাতীয় অক্ষর অঙ্কিত ছিল, তাহা যেন এই কাল হইতেও অনেক প্রা-

চীন কালের অক্ষর বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং ঐ মুদ্রা যে খীলোট বংশীয় জীগুহিলের মুদ্রা, এ বিষয়ে সংশয় থাকে। এদিকে কনিংহাম সাহেব গৌরালিয়রের নিকটে নরওয়ার নামক স্থানে “ জীগুহিল পতি ” নামাঙ্কিত গোটাকত টাকা পান। ঐ টাকাতে যে প্রণালীর অক্ষর সকল অঙ্কিত ছিল, তাহার সহিত আণ্ড্রাতে প্রাপ্ত মুদ্রা সকলের কলেবরস্থ অক্ষর সমুদয়ের অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু ইতি মধ্যে আবার সেই প্রদেশের তোরমনের পুত্র পশুপতির নামাঙ্কিত আরও চারিটি মুদ্রা পাওয়া যায়। এই চারিটি মুদ্রা পাওয়ার পরে, কনিংহাম সাহেব এই অনুমান করেন যে, পূর্বেই গুহিলপতিও এই বংশেরই কেহ হইবেন। তোরমন খ্রীষ্টীয় অব্দের ২৬০ হইতে ২৮৫, এবং পশুপতি ২৮৫ হইতে ৩১০ অব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হন বলিয়া প্রবাদ আছে। এইক্ষণ সর্ব্বের কাল্‌হিল সাহেব এই ঘটনা দেখিয়া নরওয়ারের জীগুহিল পতি ও আণ্ড্রার গুহিলজীকে এক মনে করেন। এবং এই আণ্ড্রা যে কোন সময়ে সেই জীগুহিল পতির সিংহাসনভূমি ছিল, তাহা সিদ্ধান্ত করেন।

এদিকে আবার আণ্ড্রার দুর্গ হইতে প্রায় ৩ মাইল উপরের দিকে যমুনার দক্ষিণ তটে একটি বাগান ও বাড়ীর কিঞ্চিৎ চিহ্ন পড়িয়া আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। লোকেরা ইহাকে রাজা ভোজের বাগান

ও বাড়ী বলিয়া নির্দেশ করে। এই রাজা ভোজ কে, তাঁহার কি রক্তান্ত, তাহা এই-ক্ষণ জানিবার কোন উপায় নাই। সর্কের-রর কার্লাইল সাহেব বলেন যে, তিনি নাকি এখানকার কোন বিচক্ষণ লোককে ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, প্রত্যুত্তরে সে ব্যক্তি তাঁ-হাকে বলিয়াছেন যে, ইহা খ্রীষ্টীয় ৬ বর্ষ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত, মালোয়ারদেশীয় রাজা ভোজের বাগান ও বাড়ীর ভগ্নাবশেষ। সাধারণের যদিও তাঁহাকে এত বিশেষ করিয়া এবিষয় বলিতে পারিয়া ছিল না বটে, কিন্তু ইহা যে রাজা ভোজের বাড়ী এবং মুসলমানদের আক্রমণকালের পূর্বে হইতেই এখানে আছে, তাহা তিনি সক-লের নিকট হইতেই এক প্রকার সর্ববাদি-সম্মত রূপে শুনিয়া ছিলেন। যদি এই জন-শ্রুতি সত্য হয়, তাহা হইলে আগ্রাতে মু-সলমানদের পূর্ববর্তী কালের এই এক-মাত্র হিন্দু চিহ্ন বর্তমান আছে, বলিতে পারা যায়।

অঞ্জনা-পুত্র যে প্রকার সাগরগর্ভ হইতে উদ্ভোলিত চারিটি প্রস্তরাক্ত অক্ষর দ্বারা কাল-বিলুপ্ত সমগ্র মহানটক পুস্তক উদ্ধার করিয়াছিলেন, সাহেবদিগের অধ্যবসায় এবং যত্নরূপ আঞ্জনেরও সেই প্রকার বি-স্মৃতি সাগরস্থ অনিশ্চিততা রূপ অতলস্পর্শ সলিলে নিমজ্জিত ভারতের প্রাচীন ইতি-হাসকে কখন বা মৃত্তিকা প্রোধিত মুদ্রাশ-রীরাঙ্কিত চতুরকর দ্বারা এবং কখন বা ই-

তন্ততোবিক্ষিপ্ত কাল নিষ্টিষ্ঠ মন্থন ইষ্টক খণ্ড দ্বারা উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প। ধনা ইহাঁদের যত্ন! ধনা ইহাঁদের পরিশ্রম! এবং ধনা ইহাঁদিগের অধ্যবসায়! আমরা শয়ন করিয়া থাকি, পরিহাসে আর গল্পে সময় অতিপাত করি এবং বৈঠকখানায় বসিয়া কখন বা হা, হা, হী, হী, রবে পৃ-থিবীকে তৃণবৎ উড়াইয়া দেই, তথাপি একবার চক্ষুকম্বলন করিয়া দেখ না যে, আমাদের দ্বারের দুই পাশে কি ছড়ান রহিয়াছে এবং এই সকল ছড়ান পদার্থ-চূর্ণ দ্বারাই বা কি বিষয় কতদূর আকৃতিতে আনা যাইতে পারে। আর ইহাঁরা ভি-ন্নদেশীয় এবং ভিন্ন-শোণিত-শুক-জাত হ-ইয়াও কেবল শুদ্ধ কৌতূহল নিরুক্তিব জন্য আমাদের পতিত গৃহের ভগ্ন ইট, পাট-কেল এবং মৃত শরীরের অস্থি পঞ্জর ঘা-টিয়া আমাদের পরিচয় নিতে এবং আমা-দের পরম্পরের সহিত পরম্পরের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত করিতে প্রাণপণে যত্ন করিতে-ছেন। আমরা পাশাপাশি থাকিয়াও আপন যত্নে কেহ কাহাকে চিনিতে চেষ্টা করিতেছি না।

পাঠকবর্গের সমোপে উপরোল্লিখিত কতিপয় পংক্তিতে আগ্রা নামের উৎ-পত্তি এবং তাহার ব্যুৎপত্তি হইতে যে যে অমুমান তন্তুখণ্ড এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হই-য়াছে ও ইহার বন্ধে হিন্দুদিগের যে যে চিত্তরেখা, ইহার প্রাচীন পরিচয়ের জ্ঞান আজি পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা এক

প্রকার সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, এ পর্যন্ত আর কিছু জানা হয় নাই। কিন্তু ইহার পার্শ্ববর্তি স্থানাদিতে সংশ্লিষ্ট পাদন করিবার এত বিষয় আছে যে, তাহা অর্থ ব্যয় করিয়া খনন করিলে অনেক নূতন কথা আবিষ্কৃত হইতে পারে। আজি একটি সামান্য লোক, ইফীসস্ খনন করিয়া তাহার গভীর মৃত্তকি হইতে চূর্ণীকৃত ডায়না দেবীর মন্দিরের সম্পূর্ণ অবয়ব চিত্রিত করিয়া তুলিয়াছে। ভারতে কি সেরূপ অর্থ নাই যে, ইহার বক্ষে কোন কোন বিলুপ্ত স্থানের বিলুপ্ত কীর্তি সকল সেই রূপে চিত্রিত হইতে পারে? আছে। অনেক তমসাক্ত গর্ত সকলের মধ্যে আজিও রজত কাঞ্চন স্তূপীকৃত হইয়া আছে। কিন্তু তাহার দ্বারা কী আছে একটিও মনুষ্য নাই।

হিন্দুদিগের পরে মুসলমানদিগের কাল। মুসলমানদিগের কীর্তি ইহার বক্ষের প্রায় সর্বত্রই পুঞ্জ পুঞ্জ বিক্ষিপ্ত আছে। ইহাতে ইহাকে মুসলমানদিগের স্থাপিত নগর বলাই সঙ্গত। লোকেরাও এক প্রকার তাহাই বলিয়া থাকে। সর্বপ্রথমে লোদীবংশীয়েরা এখানে আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন। সেকেন্দর বিন্ বহল লোদী খৃস্টীয় ১৫১৫ সনে আগ্রাতে দেহত্যাগ করেন। ইহার সমাধি কোথায় দেওয়া হয়, তাহার কিছু নিশ্চিত নাই। ইনি এই নগরের অভ্যন্তরে বাদল গড় নামক কোন একটি প্রাচীন হিন্দুদুর্গকে সং-

স্কার করিয়া এখানে বাস করেন। এই বাদলগড় নামক হিন্দু দুর্গ কোন্ স্থানে ছিল, এখন মৃত্তিকার উপরিভাগ দেখিয়া তাহা জানিবার কোন সুর্যোগ নাই। সহরের মধ্যে “লোদী খাঁকা টিলা” নামক যে একটা উচ্চ স্থান আছে, কোন কোন লোকে তাহাকেই বাদলগড়ের ভূমি বলিয়া বলে। কেহ বা আকবর নির্মিত বর্তমান দুর্গকে বাদলগড়ের প্রাচীন ভিত্তিভূমির উপরে নির্মিত হইয়াছে বলিয়া বলে। গোয়ালিয়র দুর্গের নিম্ন প্রাচীরের সেক্ষেত্রে বাদলগড় বলিয়া থাকে। তাহা ১৪৭৫ খৃঃ অব্দে রাজা কল্যাণমলের ভ্রাতা বাদল সিংহ দ্বারা রচিত হয়। কনিংহাম সাহেব সেই স্তম্ভে আগ্রার কালবিলুপ্ত বাদল গড়কেও তাহারই রচিত বলিয়া অনুমান করেন। উপরোক্ত “লোদী খাঁকা টিলা” ব্যতীত সহরের পশ্চিমে পাঁচ মাইল অন্তরে সেকেন্দর নামক স্থানে সেকেন্দর লোদীর প্রাসাদ বাটীর অল্প কিছু ভগ্নাংশ পতিত আছে। ইহা ব্যতীত লোদী বংশীয়দের আর কোন চিহ্ন এখন নাই। লোদী খাঁর টিলা বিষয়ে একটুকু সন্দেহ আছে। খাঁ খানন্ লোদী নামে বাবর এবং হুমায়ূনের একজন প্রসিদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। এবং খাঁ জাহান লোদী নামে জাহাঙ্গিরেরও এক জন সেনাপতি ছিলেন। এক্ষণ লোদী খাঁয়ের টিলা যে কোন্ লোদীর আবাস বাটী ছিল, তাহা বলা সহজ ব্যাপার নয়। সেকেন্দর লো-

দৌর মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম লোদীও এখানে বাস করেন।

য় ১৫২৬ সনের মে মাসে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজয় করিয়া আগ্রা এবং দিল্লী করস্থ করেন। তাঁহার প্রাসাদবাটী ও উজ্জানাদির ভগ্নাবশেষ অন্য অল্প গৃহাদির ইচ্ছক চূর্ণ সংহতি সহ বর্তমান নগরের ঠিক বিপরীত দিকে যমুনার পূর্ব-তটে রেলওয়ে স্টেশন ও ইংমাস্ট্রদোলার সমাধি মসজিদ হইতে নুনিহাই নামক গ্রাম পর্যন্ত স্তূপে স্তূপে নানাদিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। নুনিহাই গ্রামকে এখনও রেলের গাড়ীর উপর হইতে যেকালে দেখা যায়, যেন একখানি ছোট খাট নগর বলিয়া ভ্রম হয়। উহার মধ্যে এখনও অনেক সমৃদ্ধিশালী লোক বাস করে। বাবরের সময়ে যে, ঐ স্থানেই আগ্রাছিল, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। ৯৩৭ হিজরী সনে বাবরের দেহ পত্তন হইলে পর, তাঁহার পুত্র হমায়ুন প্রথমে এখানে অধিবাস করেন। যে সনে বাবরের মৃত্যু হয়, হমায়ুন সেই সনেই একটি মসজিদ প্রস্তুত করেন। তাহার ভগ্নাংশ আজিও তাজমহলের বিপরীত দিকে যমুনার পর পাঁরে কাচপুরা নামক গ্রামের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মসজিদের গায়ে হমায়ুনের নাম ও যে সনে তাহা নির্মিত হইয়াছে সমুদয় লেখা আছে। গ্রাম্য লোকেরা তাহার উৎসঙ্গে কুচীর নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছে এবং ক-

পোত শুক প্রভৃতি পক্ষী সকল তাহার চূর্ণীকৃত মস্তকের কোটরে থাকিয়া পার্শ্ববর্তী শস্য ক্ষেত্র অপহরণে জীবন যাপন করিতেছে। এই মসজিদেরই কিঞ্চিৎ পূর্বদিকে যমুনাটট পর্যন্ত ব্যাপ্ত ভূমি খণ্ডকে “মাহতাব খাঁকা বাগ” বলে। এখানে এক্ষণে কিছুই নাই। কেবল একদিকে একটি ভগ্ন বুকড় কিঞ্চিৎ ইচ্ছক চূর্ণ লইয়া পতিত রহিয়াছে। এই স্থান সম্বন্ধে একটি সুন্দর ছোট প্রবাদ আছে। মাহতাব খাঁ কোন এক আমিরের পুত্র ছিলেন। তিনি তাজমহলের স্মার আর একটি বাড়ী এখানে প্রস্তুত করিবেন বলিয়া উদ্যোগ করেন, এবং ভূমিকে প্রাচীর-বন্ধ করিয়া লন। সাজিহান তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিলেন যে, যদি তুমি এখানে কোন গৃহ প্রস্তুত কর আর সেই গৃহ দেখিতে তাজমহল অপেক্ষা কোন অংশে কুৎসিত হয়, তাহা হইলে এতসুন্দর এই তাজ গৃহের কাছে, ওরূপ একটি কদাকার পদার্থ সর্ষদা থাকিলে তাজের শোভার অনেক বাঘাত হইবে। আর যদি তোমার গৃহ তাজগৃহ হইতে সৌন্দর্য্যে উৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আমার তাজের শোভা সমস্ত গ্রাসিত ও বিলুপ্ত হইবে। মাহতাব খাঁ ইহা শুনিয়া বাগান প্রস্তুত করিতে ক্ষান্ত হন। সাজিহান তৎপর এইস্থানে আপনার সমাধির জন্য তাজ মহলের অবিকল অপর একটি উদ্যান ও বাড়ী প্রস্তুত করিতে মনন করেন এবং তাহা যমুনার উপর দিয়া ম-

খয় প্রস্তাবের সেতু ধারা, তাক গৃহের সঙ্গে সম্পন্ন করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য পুত্র অবজ্ঞার কারণে তিনি অকালে কারাকান্দ হওয়াতে সে ইচ্ছা তাঁহার অন্তরেই লীন হইয়া যায়। এই মাহাত্ম্যের বাগ এবং পূর্বে কৃত হুমায়ূনের মসজিদের পশ্চিমে যমুনাতট দিয়া বহুদূর ব্যাপিনা বাবর ও হুমায়ূনের প্রাসাদ বাটী ও উদ্যানাদি রচিত ছিল। এক্ষণ তাহার কিছুই নাই। কেবল এখানে সেখানে মৃত্তিকা-স্তূপ ও ক্ষয়প্রাপ্ত সকল ছড়ান রহিয়াছে। বাবর কি হুমায়ূন কাহারই সমাধি এখানে নাই।

মুসলমান বংশের কুবলয় স্বরূপ আকবর ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে আগ্রা এবং দিল্লী অধিকার করেন। অধিকারের পরক্ষণেই তিনি আগ্রাতে আসিয়া বাস করেন নাই। আগ্রা হইতে পশ্চিম দক্ষিণে প্রায় ২৪ মাইল ব্যবধানে ফকির সলিম-চিল্লির দরগা ফতেহ পুর সিকরীতে কিছুদিন বাস করেন। সেখানে মসজিদের বাসোপযোগী প্রাসাদ বাটী, উদ্যান ও অন্যান্য বহুবিধ অট্টালিকা আজিও দর্শকদিগের নয়ন বিনোদনের জন্য প্রস্তুত আছে। এইস্থানে কিছুকাল বাস করিয়া সেখানে তাঁহার পুত্র সলিমের (জাহাঙ্গিরের) জন্ম হইলে

পর প্রায় ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে আগ্রাতে আসিয়া অধিষ্ঠান করেন। প্রবাদ আছে যে, বখন তিনি আগ্রাতে আসেন তখন কিছুকালের জন্য আগ্রার বর্তমান দুর্গ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত সহরের দক্ষিণ পশ্চিমে ইদগাহ নামক বৃহৎ সমষ্টি হইতে সোয়া মাইল ব্যবধানে এবং বর্তমান মাজিষ্ট্রেট অফিস হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে সুলতানপুর ও খাওয়ারাসপুর নামক গ্রাম দ্বয়ে শিবির সন্নিবেশ করিয়া থাকেন, এবং দুর্গ তাঁহার অধিবাসের উপযুক্তরূপে সজ্জিত হইলে তাহাতে আসিয়া অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করেন। এই ঘটনা হইতেই পূর্বে কৃত গ্রাম দ্বয় সুলতানপুর ও খাওয়ারাসপুর নাম প্রাপ্ত হয়। সুলতানপুর অর্থে সুলতান অর্থাৎ রাজার আপন নগরকে বুঝায় আর খাওয়ারাসপুর অর্থে খাওয়ারাস অর্থাৎ চাকরদিগের অধিষ্ঠিত স্থানকে বুঝায়। খৃঃ ১৫৭১ অব্দে আগ্রার বর্তমান দুর্গ নির্মিত হয়। এই সময় হইতেই আগ্রা আকবরবাদ রূপে অপর এক নতুন নাম ধারণ করে। কিন্তু এই নামে বোধ হয় ইহাকে এক উত্তর পশ্চিমাবর্তী লোক ভিন্ন অপরে উত্‌চিনিতে পারে না। আগ্রাই ইহার সর্বত্র প্রসিদ্ধ নাম।

ক্রমশঃ

(প্রবাসী ।)

বাণীস্তোত্র ।

গীতি ।

জয় বিদ্যা জগত জননি,
জীবমুক্তি-প্রদায়িনি,
কলুষনাশিনি রমে
জয়দে বরদে বাণি ও ।

সুখ মোক্ষ তব পদে
কঙ্কণামগ্নি হে শুভদে-
ভকতবৎসলা বালা,
মুঢ়ে জ্ঞানদায়িনি ও ॥

২

বেদমাতা বিশ্বরমে,
কবীশ-মনীষ-প্রিয়তমে,
আর্গমে নির্গমে ব্যক্ত,
মহিমা তোমারি ;

অনন্ত উৎসব রঙ্গে
ছত্রিশ রাগিনী সঙ্গে
পূজিছে সদা চরণ কমলে
কম্পনা-কামিনী ও ॥

৩

মধুর মলয়ানিলে,
গায় জমর কোকিলে,
বসন্তে তোমার গুণ,
বসন্তবাসিনি ;

আহা কিবা সুখসঙ্গ,
নাহি ভাল স্বর ভঙ্গ,
হাসিছে কুসুম, নাচিছে তারা,
খেলিছে তরঙ্গিনী ও ॥

৪

সুরাসুর মায়ের বশ,
অক্ষয় মায়ের বশঃ,
ভুবনপূজিত নাম,
পাপ-হঃখ-হারি ;

অপরূপ দেখতে চাহিয়ে,
বসেছে আনন্দে মায়েরে লইয়ে
সারস্বত সুরত যত,
মধ্যে বীণাপাণি ও ॥

৫

কত যত্ন কত শ্রমে,
শুভ দিনে স্বর্ণভূমে,
পূজিত তোমারে রমে,
নগরে নগরে ;

অযোধ্যা অবন্তী পুরী,
মধুরার সে মাধুরী,
হারারে কপালদোষে,
ভারত হঃখিনী ও ॥

৬

বাল্মীকি গৌতম বাস,
 ভবভূতি কালিদাস,
 শঙ্কর, ভাস্কর শুল্ক
 ভারত-স্বপ্নাশনে ;
 দেহ বর হে বরদে
 তোমার পদপ্রসাদে
 ভারত পাইবে প্রাণ
 মৃতসঞ্জীবনি ও ॥

৭

ছিলে যুগ যুগ ভারি,
 ভারতে পবিত্র করি,
 ভারতে প্রসন্ন্য সদা,
 হ্যাদে গৌ ভারতি ;
 এ গভীর অঙ্ককারে,
 রূপা কটাক বিত'রে,
 পতিত ভারতে উদ্ধারহ,
 পতিতপাবনি ও ॥

(পথিক)

জীবন প্রভাত ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

কণ্ঠমাল।

—

“মস্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।”

ভারতচন্দ্র রায় ।

রজনী প্রায় এক প্রহর হইলে সরযু-
 বালা পিতার আদেশে অতিথির খাদ্যের
 আয়োজন করিয়া দিলেন, রঘুনাথ আসন
 গ্রহণ করিলেন, সরযু পশ্চাতে দণ্ডায়মান
 রছিলেন। মহারাষ্ট্রদেশে অদ্যাবধি অ-
 হুত ব্যক্তিকে পরিবারের মধ্যে কোন এক
 জন রমণী আসিয়া ভোজন করাইবার
 রীতি আছে।

রঘুনাথ বলিলেন, কিন্তু ভোজন দুই
 থাক, চিত্ত সংবন করিতে পারিলেন না।
 খেতপ্রসূর-বিনির্ধিত আধারে সরযু মিষ্ট

সরবৎ আনিয়া দিলেন, রঘুনাথ পাত্রখা-
 রিণীর দিকে সোধেগচিত্তে চাহিলেন, যেন
 তাঁহার জীবন, প্রাণ, দৃষ্টির সহিত মিলিত
 হইয়া সেই কন্যার দিকে ধাবমান হইল।
 চারি চক্ষু মিলন হইল, অমনি সরযুর মুখ-
 মণ্ডল লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল, লজ্জাবতী
 চক্ষু মুদিত করিয়া, মুখ অবনত করিয়া,
 ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন। রঘুনাথও
 যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া অধোবদন হ-
 ইলেন।

পুনরায় সরযু আর একটি পাত্র আ-
 নিলেন, রঘুনাথ বর্ষের নছেন, এবার তিনি
 মুখ অবনত করিয়া রাখিলেন, কেবল সর-
 যুর পুন্দর পূর্ণ বসনবিজড়িত হস্ত ও ক-
 ঙ্গণবিজড়িত শৃঙ্গোল বাহুদ্বয় দেখিতে
 পাইলেন; অগত্যা কদর স্কীত হইল, এ-

কটি দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হইল। সরযু তাহা শুনিতে পাইলেন, তাঁহার হস্ত দ্বন্দ্ব কাঁপিতে লাগিল, তিনি দীর্ঘে দীর্ঘে পাখে সরিয়া গেলেন।

ভোজন সাজ হইল। রঘুনাথের শয্যা-রচনা হইল, রঘুনাথ দীপ নিৰ্ব্বাণ করিলেন, শয়ন করিলেন না, ঘরের দ্বার দীর্ঘে দীর্ঘে উদঘাটন করিয়া নক্ষত্রালোকে ছাদে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

সেই গভীর অন্ধকারে নক্ষত্র-বিভূষিত নৈশ আকাশের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া অস্পন্নক যোদ্ধা কি চিন্তা করিতেছেন? নিশার ছায়া ক্রমে গভীরতর হইতেছে, সেই স্নানিত ছায়ার মনুষ্য, জীব, জন্তু, সমগ্র জগৎ স্রষ্ট হইয়াছে, হ্রগে শব্দমাত্র নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে প্রহরীগণের শব্দ শুনা যাইতেছে ও প্রহরে প্রহরে ঘণ্টারব্দ সেই নিস্তরু হ্রগে ও চতুর্দিকস্থ পর্কতে প্রতিহত হইতেছে। এ গভীর অন্ধকার রজনীতে রঘুনাথ অনিদ্র হইয়া কি চিন্তা করিতেছেন?

রঘুনাথের জীবনের এই প্রথম গভীর চিন্তা, এই হৃদয়ের প্রথম ভীষণ উদ্বোধন, এ চিন্তা এ উদ্বোধন রজনীর মধ্যে শেষ হইবার নহে, চিরজীবনে কি শেষ হইবে? এত দিন রঘুনাথ বালক ছিলেন, অথ যেন সহসা তাঁহার শাস্ত, নীল, জীবনাকাশের উপর দিনা বিদ্যাৎসপিণী একটি প্রতিমূর্তি সরিয়া গেল, রঘুনাথের নয়ন, হৃদয় কলসিয়া গেল, তাঁহার স্রষ্ট চিন্তা, উদ্বোধন, ও

সহজ বেগবতী মনোরক্তি সহসা জাগরিত হইল। শত সহজ বার সেই আনন্দময়ী মূর্তি মনে আনিত লাগিল, সেই আলেখ্য-লিখিত জয়গুণ, সেই ভ্রমর-কৃষ্ণ উজ্জ্বল চক্ষু, সেই পুষ্পনিন্দিত মধুময় গুণ্ড হইট, সেই নিবিড় কেশপাশ, সেই সুরগোল বাস্তুগুণ মনে জাগরিত হইতে লাগিল, আর রঘুনাথ উদ্ব্যস্ত হইয়া সেই চিত্রের দিকে দেখিতে লাগিলেন। মস্তক ঘূর্ণিত হইল, শরীর অবসন্ন হইল, কিন্তু হৃদয়ের তৃষা নিবারণ হইল না; পুনঃ পুনঃ নব নব সৌন্দর্য মানস-চক্ষুতে উদয় হইতে লাগিল, পুনঃ পুনঃ অগ্নিদিকে পতঙ্গবৎ সেই সৌন্দর্য্যদিকে হৃদয় আকৃষ্ট হইতে লাগিল। এই আনন্দময়ী কন্তা কি তিনি লাভ করিতে পারিবেন? এই আরত স্নেহপূর্ণ নয়ন, এই জুবানিন্দিত গুণ্ড, এই চিত্তহারি অতুল লাবণ্য, রঘুনাথ! কি তোমার হইবে? তুমি একজন সামান্ত হাবিলদার মাত্র, জর্নার্দন অতি উচ্চ কুলোদ্ভব রাজপুত্র, তাঁহার রূপবতী কন্তা রাজাদিগেরও প্রার্থনীয়া! কিজন্য এরূপ আশায় হৃদয় রূথা ব্যাধিত করিতেছ? রঘুনাথ! এ রূথা তৃষ্ণায় কেন হৃদয় দগ্ধ করিতেছ? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রাচীরের উপর হস্ত স্থাপন করিয়া তাহার উপর মস্তক স্থাপন করিলেন। ললাটের শিরা স্ফীত হইতে লাগিল। ভাবিলেন “হার! আমি অকিঞ্চিৎকর বন্ধুহীন সামান্য সৈনিক মাত্র! আমার বংশমর্যাদা বিলুপ্ত, আমার নাম

নাই, গৌরব নাই, আমি সরসুর অযোগ্য ! কোন রাজা বা ধনাঢ্য ব্যক্তি এই কুম্ভটিকে হৃদয়ে ধারণ করিবে, আমি ইহার স্মৃতিমাত্র যাবজ্জীবন বহন করিব ; দেশে, বিদেশে, যুদ্ধে, শত্রুশিবিরে, জীবনে, মরণে, বহন করিব । হা বিধাতঃ ! কেন আমি সরসুর অযোগ্য হইলাম,—বা অযোগ্য হইয়া কেন এ কুম্ভটি দর্শন করিলাম ?” তবে কি এ আশা ত্যাগ করিবেন ? সে যুক্তি হৃদয় হইতে তিরোহিত করিবেন ? সে যে জীবনের অংশ স্বরূপ হইয়াছে ; রঘুনাথ দেখিলেন স্বহস্তে হৃদয় উৎপাটন করা সম্ভব, সে যুক্তি অপনয়ন করা হুঃসাধ্য । রঘুনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিলেন ।

আবার চিন্তা করিলেন “ সেই স্বর্গীয় অঙ্গুরা কি মুহূর্ত্ত জন্য আমার জন্য চিন্তা করিয়াছেন ? ঐহার জন্য আমার হৃদয় ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত হইয়াছে, তাঁহার হৃদয়ের এক কণায়ও কি আমি স্থান পাইয়াছি ? ঐহার জন্য আমার মন ও জীবন ব্যাকুল হইয়াছে, তাঁহার মন মুহূর্ত্তের জন্যও কি এ অকিঞ্চিৎকর সৈনিকের জন্য ধাবমান হয় ? ঐহাকে একবার দেখিবার জন্য আমি জীবন দিতে উদ্যত, তিনি কি মুহূর্ত্তের জন্যও আমার প্রতি সদয় দৃষ্টি করিয়াছেন ? জানি না কিন্তু সরসু ! সরসু ! আমার হৃদয় জানিলে তুমি আমার উপর বোধ হয় এক মুহূর্ত্তের জন্যও সদয়

প্রদান করিতে, অভাগা তাহার অধিক চাহেনা ।” আবার অন্ধকার আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন ।

প্রহরের ঘণ্টা বাজিল, কিন্তু রঘুনাথের এ বিষম চিন্তা শেষ হইল না । হস্তে গণ্ডস্থাপন করিয়া একাকী নিঃশব্দে সেই হৃর্ত্তে অন্ধকারের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন । এই শান্ত রজনীতে তাঁহার হৃদয়ে কি প্রলয়ের ঝটিকা বহিতেছে !

কিন্তু যৌবনকালে আশাই বলবতী হয়, শীঘ্র আমাদের নৈরাশ হয় না, অসাধ্যও আমরা সাধ্য বিবেচনা করি, অসম্ভবও সম্ভব বোধ হয় । রঘুনাথ আকাশের দিকে চাহিয়া, চাহিয়া চাহিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিতেছিলেন, অনেকক্ষণ পর সহসা দণ্ডায়মান হইলেন, আপন হৃদয়ের উপর উভয় বাহু স্থাপন করিয়া সর্গকর্ণে কণেক দণ্ডায়মান রহিলেন, মনে মনে বলিলেন “ ভগবন্, সহায় হও, অবশ্য ক্লতকার্য্য হইব, যশ, মান, খ্যাতি, মনুষ্যসাধ্য, কি জন্য আমার অসাধ্য হইবে ? আমার শরীর কি অন্য অপেক্ষা ক্ষীণ ? বাহু কি অন্য অপেক্ষা দুর্ব্বল ? যুদ্ধে কি আমি অন্য অপেক্ষা ভীক ? * * “ দেখিব এই পণ রাখিতে পারি কি না । ” * * “ তাহার পর ? যদি ক্লতকার্য্য হই তাহা হইলে সরসু ! আমি তোমার অযোগ্য হইব না ; তখন সরসু ! তোমাকে গণ্ধদলে অদ্যকার এই সকল কথা বলিব, তখন তোমার মৃদয় হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া স্বর্ণ-

মুখ তুলে করিব, তখন স্বহস্তে ঐ মন্দির
কেশ পাশে মুক্তামালা জড়াইয়া দিব, আর
ঐ মন্দির বিশ্ববিনন্দি ওষ্ঠভঙ্গ—” র-
ঘুনাথ ! রঘুনাথ ! উন্নত হইও না।

তখন রঘুনাথ কথঞ্চিৎ শান্ত-হৃদয়ে
শয়ন করিতে আসিলেন। গৃহের ভিতর
না যাইয়া সেই ছাদের বেষ্ট্রানে পূর্বদিন
সরযু বসিয়াছিলেন সেইস্থানে শয়ন ক-
রিতে আসিলেন। দেখিলেন—কি দে-
খিলেন? দেখিলেন একটি কণ্ঠমালা প-
ড়িয়া রহিয়াছে; দুইটি করিয়া মুক্তা, পরে
একটি করিয়া পলা,—রঘুনাথ সে মালা
চিনিলেন। সেই মালা পূর্বদিন সঙ্ক্যা-
কালে সরযু কণ্ঠে ও বক্ষঃস্থলে ধারণ ক-
রিয়াছিলেন, বোধ হয় অসাবধানতা বশত
ঐস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। রঘুনাথ আ-
কাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন “ভগবন্
একি আমার আশা পূর্ণ হইবার পূর্বলক্ষণ
দান করিলেন?” শত সহস্রবার সেই মালা
চুম্বন করিয়া পরে পরিধেয় কুর্তীর নীচে
বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। পরে অচিরে
সেই স্থানেই নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।
কিন্তু সে নিদ্রা স্বপ্নপূর্ণ, স্বপ্ন সরযু-পূর্ণ।

পরদিন প্রাতে রঘুনাথের নিদ্রাভঙ্গ
হইল। জনার্দন দেবের নিকট ভবানীর
আজ্ঞা জানিলেন; “স্নেহদিগের সহিত
যুদ্ধে জয়, স্বধর্মদিগের সহিত যুদ্ধে পরা-
জয়।” পরে কিলাদারের নিকট কতক-
গুলি লিপি ও যুদ্ধবিষয়ক উপদেশ লইয়া
রঘুনাথ যাত্রা করিলেন।

দুর্গ ভাগের পূর্বে একবার সরযুর
সহিত দেখা করিলেন; সরযু যখন মন্দিরে
আসিয়াছেন, ধীরে ধীরে আপনিও তথায়
যাইলেন। হৃদয়ের তুমুল উদ্বেগ কথঞ্চিৎ
দমন করিয়া দ্বিবৎ কম্পিতস্বরে বলিলেন—

“ভদ্রে! কল্যা নিশিযোগে ছাদে এই
কণ্ঠমালাটি পাইয়াছি, সেইটি দিতে আসি-
য়াছি; অপরিচিতের মুকুতা মার্জনা
করুন।”

এই বিনীতবাক্য শুনিয়া সরযু ফি-
রিয়া চাহিলেন, দেখিলেন সেই কমণ্ডীর
উদার মুখমণ্ডল, সেই কেশায়ত উন্নত ল-
লাট ও উজ্জ্বল ক্রম নয়নদ্বয়, সেই তরুণ
যৌদ্ধার উন্নত অবয়ব! সহসা রমণীর শ-
রীর কম্পিত হইল, গৌর মুখমণ্ডল পুন-
রায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল! সরযু উত্তর
দিতে অশুভ!

সরযুকে নির্ঝাঁকু দেখিয়া রঘুনাথ ধীরে
ধীরে বলিলেন “যদি অনুমতি করেন তবে
এই মন্দির মালাটি উহার অভ্যন্ত স্থানে
স্থাপন করিয়া জীবন চরিতার্থ করি।”

সরযু সলজ্জনয়নে একবার রঘুনাথের
দিকে চাহিলেন, উ! সে বিশাল আয়ত
নয়নের কণ্ঠদৃষ্টিতে রঘুনাথের হৃদয় সহস্রধা
বিদ্ধ হইল। তৎক্ষণাৎ রঞ্জিতমুখী লজ্জায়
আবার চক্ষু মুদিত করিলেন।

মৌনই সম্ভতির লক্ষণ জানিয়া রঘু-
নাথ ধীরে ধীরে সেই কণ্ঠমালা পরাইয়া
দিলেন, কন্যার পবিত্র শরীর স্পর্শ করি-
লেন না।

কন্যার শরীর একেবারে রোমাঞ্চিত হইল, ও বাস্তবতাভিত পত্রের ন্যায় ধর ধর করিয়া কাঁপিতে লাগিল ; ধন্যবাদ দি-
বেন কি তাঁহার কল্পিত গুণ হইতে বাক-
স্কৃষ্টি হইল না ।

রঘুনাথ সরসুর এই উদ্যম দেখিয়াই
আপনাকে যথেষ্ট অনুগৃহীত বিবেচনা ক-
রিলেন । কণেক পর কবৎ খেদযুক্ত স্বরে
বলিলেন—“তবে অতিথিকে বিদায় দিন ।”

সরসু এবার লজ্জা ও উদ্বেগ সংযম
করিয়া ধীরে ধীরে রঘুনাথের দিকে চা-
হিলেন ; আবার ধীরে ধীরে ভূমির দিকে
নয়ন ফিরাইয়া অতি মৃদু অস্পষ্ট স্বরে
কহিলেন, “আপনার নিকট অনুগৃহীত
রহিলাম, পুনরায় কি এ দুর্গে আগমন
হইবে ? ”

উ ! পিপাসার্ত চাতকের পক্ষে প্র-
থম রুক্তিবিন্দুর ন্যায়, পথভ্রাস্ত পথিকের
পক্ষে উবার প্রথম রক্তিমচ্ছটার ন্যায়,
সরসুর প্রথমোচ্চারিত এই অমৃত কথাগুলি
রঘুনাথের হৃদয় আনন্দলহরীতে প্লাবিত
করিল ! তিনি উত্তর করিলেন—

“রমণীরত্ন ! আমি পত্রের দাস, যুদ্ধ
আমার ব্যবসায়, পুনরায় কবে আসিতে
পারিব, কখনও আসিতে পারিব কি না
তা জানি না ; কিন্তু যতদিন জীবিত থাকিব,
যতদিন এই হৃদয় শুষ্ক না হইবে,
ততদিন আপনার সৌজন্য, আপনার যত্ন,
আপনার দেবনিশ্চিত মুক্তি মুহূর্তের জন্যও
বিশ্রুত হইব না । আপনার পিতা এই পথে

আসিতেছেন, আমি বিদায় হইলাম, কখন
কখন নিরাশ্রয় দরিদ্র সৈনিককে স্মরণ
করিবেন ।”

সরসু উত্তর দিতে পারিলেন না, রঘু-
নাথ দেখিলেন সেই আয়ত নয়ন দুইটি ছল
ছল করিতেছে ; তাঁহার আপনার নয়নও
শুক ছিল না ।

অচিরে দেবালয় হইতে বাহির হইলেন ও
অশ্বে আরুঢ় হইয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেন।

রঘুনাথের অধীনের অশ্বারোহিণ
পূর্ব দিন রঘুনাথের অস্প পরে আসিয়া
ছিল, স্ততরাং প্রাচীরের বাহিরে তাহার
রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিল । তাহার
পুনরায় আপনাদিগের অসমসাহসী ও দু-
র্দম ভেজস্বী হাবিলদারকে পাইয়া হুকার
শব্দ করিয়া উঠিল, কিন্তু সেই সরল বাল-
ককে আর পাইল না । ভোরগ দুর্গাগম-
নের দিন হইতে রঘুনাথজীর বালোচিত
চপলতা দূর হইল, মনুষ্যের চিন্তা ও প্রতি-
জ্ঞায় জীবন আচ্ছন্ন হইল ।

সেই দিবসেই রঘুনাথজী হাবিলদার
সিংহগড় উপস্থিত হইয়া শিবজীকে সমস্ত
সংবাদ জানাইলেন ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

শায়ন্তা ধাঁ ।

“ কেন চিন্তাকুল আজি মবাবের মন ? ”

নবীনচন্দ্র সেন ।

যদিও কএক বৎসর অবধি শিবজীর
ক্ষমতা ও রাজ্য ও দুর্গসংখ্যা দিন দিন ।

হাজি পাইতেছিল, তথাপি ১৬৬২ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে বশীকরণ অভিপ্রায়ে বিশেষ কোন যত্ন করেন নাই। সেই বৎসর শায়েস্তাখাঁ আমীর উল ওমরা খেতাপ প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণের শাসনকর্তা নিয়োজিত হইলেন, ও শিবজীকে একেবারে জয় করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। শায়েস্তাখাঁ সেই বৎসরেই পুনা ও চাকন দুর্গ ও অন্য কএক স্থান অধিকার করেন, ও পর বৎসর অর্থাৎ এই আখ্যায়িকা বিরত সময়ে শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প করেন। দিল্লীর সম্রাটের আদেশানুসারে মাড়ওয়ারের রাজা প্রসিদ্ধনামা যশোবন্ত সিংহও এই বৎসরে (১৬৬৩ খ্রীঃ) বহু সৈন্য লইয়া শায়েস্তাখাঁর সহিত যোগ দিলেন, নুতরাং শিবজীর বিপদের সীমা ছিল না। মোগল ও রাজপুত সৈন্য পুনা নগরের নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিল ও শায়েস্তাখাঁ স্বয়ং দাদাজী কানাইদেবের গৃহে অর্থাৎ যে গৃহে শিবজী বাল্যকালে মাতার সহিত বাস করিতেন, সেই গৃহেই অবস্থিত করিতেছিলেন। শায়েস্তাখাঁ শিবজীর চতুরতা বিশেষরূপে জানিতেন নুতরাং তিনি আদেশ করিলেন যে অমুমতিপত্র বিনা কোন মহারাজ্যীয় পুনা নগরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। শিবজী নিকটবর্তী সিংহগড় নামক এক দুর্গে সৈন্য অবস্থিত করিতেছিলেন। মহারাজ্যীয়েরা সে সময়ে যুদ্ধব্যবসারে অধিক পরিপাক হয় নাই, দিল্লীর

পুরাতন সেনার সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করা কোনমতেই সম্ভব নহে; নুতরাং শিবজী চতুরতা ভিন্ন আধীনতা রক্ষা ও হিন্দু রাজ্য বিস্তারের অন্য উপায় দেখিলেন না।

চৈত্র মাসের শেষযোগে একদিন সাংকালে মোগলসেনাপতি শায়েস্তাখাঁ আপন অমাত্য ও মন্ত্রীগণকে আহ্বান করিয়া সভার বলিয়াছেন, ও কিরূপে শিবজীকে জয় করিবেন তাহাই পরামর্শ করিতেছেন। দাদাজী কানাইদেবের বাটীর মধ্যে সভাগৃহেই এই সভা হইয়াছিল। চারিদিকে উজ্জ্বল দীপাবলী জ্বলিতেছে; ও জানালার ভিতর দিয়া সাংকালের শীতলবায়ু উদ্যানের পুষ্পগন্ধ বহিয়া আনিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। আকাশ অন্ধকার, কেবল দুই একটি নক্ষত্র দেখা যাইতেছে, আমির উল ওমরা স্বয়ং ঈশ্বাক্ষা করিয়া বলিলেন—

“তাঁহাকে পাইলে জয় করিতে কত কণ? ” আনুগ্ৰী নামে একজন চাঁটুকর বলিল “আমিরের সেনার সম্মুখে মহারাজ্যীয় সেনা যেন মহাবাত্যার সম্মুখে শুষ্ক পত্রের ম্যায় আকাশে উড়িয়া যাইবে অথবা ভীত হইয়া পৃথিবীর ভিতর প্রবেশ করিবে। ”

সেনাপতি তুচ্ছ হইয়া হাস্য করিলেন।

চাঁদখাঁ নামক একজন প্রাচীন সেনা কএক বৎসর অবাধি মহারাজ্যীয়দিগের বল বিক্রম দেখিয়াছিলেন; তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন “আমি বোধ করি তাহাদের উক্ত দুইটি ক্রমতাই আছে। ”

শায়ের্তাৰ্থী জিজ্ঞাসা করিলেন “কেন?”

চাঁদৰ্থী নিবেদন করিলেন “ গত বৎসর কতিপয় পার্শ্ববর্তী মহারাষ্ট্রীয় বখন চাকর দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, আমাদের সমস্ত সৈন্য দুই মাস অবধি চেষ্টা করিয়া কিরূপে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দুর্গ জয় করিয়াছে তাহা জঁহাঁপনার স্মরণ আছে; একটি দুর্গ হস্তগত করিতে সহস্র মোগলের প্রাণনাশ হইয়াছে। আবার এ বৎসর সৰ্ব্বস্থানে আমাদের সৈন্য থাকতেও নিতাইজী আসমান দিয়া আহমদনগর ও অরজাবাদ পার্শ্ব উড়িয়া যাইয়া দেশ হারখার করিয়া আসিয়াছে।

সভাসদ সকলে নিশ্চক্ৰ হইয়া রহিল, শায়ের্তাৰ্থী কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন, কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ করিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন—

“ চাঁদখার বয়স অধিক হইয়াছে, তিনি এক্ষণে পৰ্ব্বত-ইন্দুরকে ভয় করেন। পূৰ্বে তাহার এরূপ ভয় ছিল না। ” চাঁদখার মুখমণ্ডল আরক্ত হইল, কিন্তু তিনি নিকন্তর রহিলেন।

আনওরী সময় বুঝিয়া বলিল “ জঁহাঁপনা ঠিক আজ্ঞা করিয়াছেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা ইন্দুর বিশেষ, তাহারা যে পৰ্ব্বত-ইন্দুরের ন্যায় গর্ভে প্রবেশ করিয়া থাকিতে পারে তাহা আমি অস্বীকার করি না। ”

শায়ের্তাৰ্থী একটি বড় স্মন্দর রহস্য বিবেচনা করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠি-

লেন, স্মতরাং সভাসদ সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল। চাঁদখারেরই জয়!

চাঁদখাঁ আর সছ্য করিতে পারিলেন না, অস্পৃষ্ঠস্বরে বলিলেন—“ ইন্দুরে পুন্য ভিতর গর্ত করিয়া বাহির না হইলে রক্ষা। ” শায়ের্তাৰ্থী এ বিষয়ে উদ্বেগশূন্য ছিলেন না; কিন্তু ভয়চিহ্ন সম্বরণ করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন—“ এখানে দিল্লীর সহস্র সহস্র নখায়ুধ বিভাল আছে, ইন্দুরে সহসা কিছু করিতে পারিবেন না। ” সভাসদ সকলেই “ কেৰামৎ ” “ কে-রামৎ ” করিয়া সেনাপতির এই বাক্যের অনুস্রোদন করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিষয়ে এইরূপ অনেক রহস্য হইলে পর কি প্রণালীতে যুদ্ধ হইবে তাহাই স্থির হইতে লাগিল। চাকর দুর্গ হস্তগত হওয়া অবধি শায়ের্তাৰ্থী দুর্গ হস্তগত করা একেবারে দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন “ এই প্রদেশ দুর্গ পরিপূর্ণ, যদি একে একে সমস্ত দুর্গ হস্তগত করিতে হয়, তবে কত দিনে যে দিল্লীখরের কার্যাসিদ্ধি হইবে, কখনও সিদ্ধি হইবে কি না তাহার স্থিরতা নাই। ” চাঁদখাঁ কার্যাস্ত ছিলেন এই ক্ষণেই অপ্রতিভ হইয়াছেন সে কথা বিস্মৃত হইয়া সংপরামর্শ দিবার চেষ্টা করিলেন। “ জঁহাঁপনা! দুর্গই মহারাষ্ট্রীয়দিগের বল, উহার। সম্মুখ রণ করিবে না, অথবা রণে পরাস্ত হইলেও উহাদিগের ক্ষতি নাই, কেননা দেশ পৰ্ব্বতময়, উহাদের সেনা

এক স্থান হইতে পলায়ন করিয়া কোন দিক দিয়া অন্য স্থানে উপস্থিত হইবে, আমরা তাহার উদ্দেশ্য পাইব না। কিন্তু দুর্গগুলি একে একে হস্তগত করিতে পারিলে মহারাজীরদিগের অবশ্যই দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে।”

শায়েস্তাখাঁ চাকন দুর্গ অধিকার করিয়া অবধি আর দুর্গ জয় করিবার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বলিলেন ‘কেন? মহারাজীরেরা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলে কি আমরা পশ্চাৎকাবন করিতে পারিব না? আমাদের কি অশ্বারোহী নাই, পশ্চাৎকাবন করিয়া সমস্ত মহারাষ্ট্রসেনা ধ্বংস করিতে পারিবে না?’

চাঁদখাঁ পুনরায় নিবেদন করিলেন—‘যুদ্ধ হইলে অবশ্যই যোগলের জয়, ধরিতে পারিলে আমরা মহারাজীরসেনা বিনাশ করিব তাহার সংশয় নাই, কিন্তু এই পর্বতপ্রদেশে মহারাজীর অশ্বারোহীকে পশ্চাৎকাবন করিয়া ধরিতে পারে এমন অশ্বারোহী হিন্দুস্থানে নাই। আমাদের অশ্বগুলি বৃহৎ অশ্বারোহী বর্ধারত ও বহু-অস্ত্র-সম্বিত; সমভূমিতে, সম্মুখেক্ষেত্রে তাহাদের ভেজ, তাহাদের ভার দুর্দমনীয়, তাহাদের গতি অপ্রতিহত; কিন্তু এই পর্বতপ্রদেশে তাহাদিগের যাতায়াতের বাধাভাঙ জন্মে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহারাজীর অশ্ব ও অশ্বারোহীগণ যেন ছাগের ন্যায় তুন্দ্রশৃঙ্খল লক্ষ দিয়া উঠে, ও হরিণের ন্যায় উপত্যকা ও পুরা-

খের মধ্য দিয়া পলায়ন করে। জঁহাপানা! আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন। সিংহগড়ে শিবজী আছেন সহস্রা সেই স্থান অবরোধ করুন; এক মাস কি দুই মাস কালের মধ্যে দুর্গ জয় করিব, শিবজী বন্দী হইবে, দিল্লীখরের জয় হইবে। নচেৎ এ স্থানে মহারাজীরদিগের জন্য অপেক্ষা করিলে কি হইবে? তাহাদের পশ্চাৎকাবনের চেষ্টা করিলেই বা কি হইবে? দেখুন নিতাইজী অনার্সালে আমাদের নিকট দিয়া যাইয়া আহমদনগর ও আরজাবাদ ছারখার করিয়া আসিল, কস্তম জমান তাহার পশ্চাৎকাবন করিয়া কি করিল?’

শায়েস্তাখাঁ সক্রোধে বলিলেন—‘কস্তম জমান বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে, ইচ্ছা করিয়া নাভাজীকে পলাইতে দিয়াছে; আমি তাহার সমুচিত দণ্ড দিব। চাঁদখাঁ, তুমিও সম্মুখ যুদ্ধের বিকল্পে পরামর্শ দিতেছ, দিল্লীখরের সেনাগণের মধ্যে সাহসী কি কেহই নাই?’

প্রাচীন যোদ্ধা চাঁদখাঁর মুখমণ্ডল আবার রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া এক বিন্দু অশ্রুজল মুছিয়া ফেলিলেন; পরে সেনাপতির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—‘পরামর্শ দিতে পারি এরূপ সাধ্য নাই; সেনাপতি, যুদ্ধের প্রণালী স্থির করুন, যেরূপ লক্ষ্য হইবে, তামিল করিতে এ মাস পরাধু্য হইবে না।

চাঁদখাঁর উৎকৃষ্ট পরামর্শ অনুসারে

কার্য করেন, শায়েরস্তার্থীর এরূপ সাহস ছিল না।

এই সময়ে একজন ভৃত্ত আসিয়া সমাচার দিল যে, সিংহগড়ের দূত মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী নামক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, নীচে অপেক্ষা করিতেছেন। শায়েরস্তার্থী তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাকে সভাগৃহে আসিবার আজ্ঞা দিলেন। সভার সকলে এই দূতকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

কণেক পরই মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

ন্যায়শাস্ত্রীর বয়স এক্ষণে চত্বারিংশৎ বৎসর হয় নাই; অবয়ব মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় দ্বেষৎ ধর্ম ও কৃষ্ণবর্ণ। ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল সুন্দর, বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুযুগল দীর্ঘ, নয়ন গভীরবুদ্ধিব্যঞ্জক, ললাটে দীর্ঘ তিলক চন্দন, স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। শরীর পুরু ভুলার কুর্ন্তিতে আরত, হস্তরাং গঠন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মস্তকে প্রকাণ্ড উকীষ, এরূপ প্রকাণ্ড যে বদনমণ্ডল যেন তাহার ছায়াতে আরত রহিয়াছে। শায়েরস্তার্থী সাদরে দূতকে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন।

শায়েরস্তার্থী জিজ্ঞাসা করিলেন ‘সিংহগড়ের সংবাদ কি?’

‘মহাদেওজী একটি সংকুত শ্লোক পড়িলেন—

‘সন্তি নদ্যোদগুকেষু তথা পঞ্চবটীবনে।

সরযুবিল্লেদশোকং রাঘবস্ত কথং সছেৎ ॥’

পরে তাহার অর্থ করিলেন ‘দণ্ডকারণ্যে ও পঞ্চবটী বনে শত শত নদী আছে কিন্তু তাহা দেখিয়া কি রাঘব সরযু নদীর বিল্লেদ হৃৎক ভুলিতে পারেন? সিংহগড় প্রভৃতি শত শত দুর্গ এক্ষণে শিবজীর হস্তে আছে, কিন্তু পুন্য আপনীর হস্তগত, সে সম্ভাপ কি তিনি ভুলিতে পারেন?’

শায়েরস্তার্থী পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন— ‘হাঁ, তোমার প্রভুকে বলিও প্রধান দুর্গ আমি হস্তগত করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার যুদ্ধ করা বিফল, দিল্লীখরের অধীনতা স্বীকার করিলে বরং এক্ষণে আশা আছে।’

ব্রাহ্মণ দ্বেষদ্বাস্য করিয়া পুনরায় সংকুত পাঠ করিলেন—

‘ন শঙ্কোহি স্বাভিলাষং জাপন্নিতুষ্ঠাতকঃ
জায়াতু তৎ বারিধরস্তোষয়তি যাচকং ॥’

অর্থাৎ চাতক কথা কহিয়া আপন অভিলাষ মেথকে জানাইতে পারে না, কিন্তু মেথ আপনীর দয়া বশতই সেই অভিলাষ বুঝিয়া পূর্ণ করে। মহাজ্ঞানের যাচককে দিবার এই নীতি। প্রভু শিবজী এক্ষণে পুন্য ও চাকন হারাইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিতেও সজ্জা বোধ করেন, কিন্তু স্ববান্দুশ মহলোক তাঁহার মনের অভিলাষ জানিয়া অযুগ্রহ করিয়া বাহা দান করিবেন তাহাই শিরোধার্য।’

শায়েরস্তার্থী আনন্দ সঞ্চার করিতে পারিলেন না। বলিলেন ‘পণ্ডিতজী তোমার পাণ্ডিত্যে আমি যে কতদূর পরি-

তুমি হইলাম বলিতে পারি না; তোমাদের সংস্কৃত ভাষা কি সুরমধুর ও ভাবপরিপূর্ণ। যথার্থই কি শিবজী সন্ধির ইচ্ছা করিতেছেন ?

মহাদেও। 'খাঁ সাহেব! সম্মুখ-যুদ্ধে দিল্লীশ্বরের সৈন্যের দোর্দণ্ডপ্রতাপে বিপর্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমরা কেবল সন্ধি সন্ধি এই শব্দ করিতেছি।'

শায়ের্তাখাঁ এবার আত্মাঙ্গ আর সস্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'চাঁদ খা! সম্মুখ যুদ্ধ ভাল না হুর্গ অবরোধ ভাল, কিসে দ্বারা শত্রু অধিক ভীত হইয়াছে? 'পরে আনন্দ কথঞ্চিৎ সস্বরণ করিয়া শায়ের্তাখাঁ বলিলেন,—

'ব্রাহ্মণ! আপনার শাস্ত্রালোচনায় সজ্জ্বল হইলাম, এক্ষণে যদি সন্ধির কথাই বলিতে আসিয়া থাকেন তবে শিবজী আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহার নিদর্শন টক?'

ব্রাহ্মণ তখন গভীরভাবে বস্ত্রের ভিতর হইতে নিদর্শন পত্র বাহির করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শায়ের্তাখাঁ সেইটি দেখিলেন। পরে বলিলেন—'হাঁ আমি নিদর্শন পত্র দেখিয়া সজ্জ্বল হইয়াছি। এক্ষণে কি কি প্রস্তাব করিবার আছে ককম।'

মহাদেওজী। 'প্রভুর এইরূপ আজ্ঞা যে যখন প্রথমেই আপনাদিগের জয় হইয়াছে, তখন আর যুদ্ধ করা বৃথা।'

শায়ের্তাখাঁ। 'ভাল।'

মহা। 'সুতরাং সন্ধির জন্য তিনি উৎসুক হইয়াছেন।'

শায়ের্তাখাঁ। 'ভাল।'

মহা। 'এক্ষণে কি কি নিয়মে দিল্লীশ্বর সন্ধি করিতে সম্মত হইবেন তাহা জানিতে তিনি উৎসুক, জানিলে সেই গুলি পালন করিতে যত্নবান হইবেন।'

শায়ের্তাখাঁ। 'প্রথম, দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করণ। তাহাতে আপনার প্রভু স্বীকৃত আছেন?'

মহা। 'তাঁহার সম্মতি বা অসম্মতি জানাইবার আমার অধিকার নাই; মহাশয় যে যে কথাগুলি বলিবেন তাহাই আমি তাঁহার নিকট জানাইব, তিনি সেই গুলি বিবেচনা করিয়া সম্মতি অসম্মতি পরে প্রকাশ করিবেন।'

শায়ের্তাখাঁ। 'ভাল। প্রথম কথা আমি বলিয়াছি, দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করণ। দ্বিতীয়, দিল্লীশ্বরের সেনা যে যে হুর্গ হস্তগত করিয়াছে তাহা দিল্লীশ্বরেরই থাকিবে। তৃতীয়, সিংহগড় প্রভৃতি আরও কএকটি হুর্গ তোমরা ছাড়িয়া দিবে।'

মহা। 'সে কোন্ কোন্টি।'

শায়ের্তাখাঁ। 'তাহা দুই এক দিনের মধ্যে পত্রদ্বারা জানাইব। চতুর্থ, অবশিষ্ট যে যে হুর্গ ও দেশ শিবজী আপন অধীনে রাখিবেন তাহাও দিল্লীশ্বরের অধীনে জায়গীর স্বরূপ ভোগ করিবেন, তাহার জন্য কর দিতে হইবে। এইগুলি তোমার প্রভুকে জানাইও, ইহাতে তিনি সম্মত কি

অসম্মত তাহা যেন আমি দুই এক দিনের মধ্যে জানিতে পারি।’

মহা। ‘যে রূপ আদেশ করিলেন সেইরূপ করিব। এক্ষণে যখন সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে তখন যতদিন সন্ধিস্থাপন না হয়, ততদিন যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকিতে পারে?’

শাস্ত্রে। ‘কদাচ নহে। খুঁত কপটচাৰী মহারাজীরদিগকে আমি কদাচ বিশ্বাস করি না। এমত খুঁততাই যে তাহাদের অসাধ্য। যতদিন সন্ধি একেবারে স্থাপন না হয় ততদিন যুদ্ধ চলিবে, আমরা তোমাদের অনিষ্ট করিব, তোমরা পার আমাদের অনিষ্ট করিও।’

‘এবমন্ত্ৰ’ বলিয়া ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলেন; তাঁহার চক্ষু হইতে অম্বিকণা বহির্গত হইতেছিল।

তিনি ধীরে ধীরে প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। প্রত্যেক দ্বার, প্রত্যেক বরতল করিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। একজন মোগল প্রহরী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল ‘দূত মহাশয় কি দেখিতেছেন?’ দূত উত্তর করিলেন ‘এই গৃহে প্রভু শিবজী বাল্যকালে ক্রীড়া করিতেন তাহাই দেখিতেছি; এটিও তোমাদের হস্তগত হইয়াছে, বোধ হয় একে একে সমস্ত ভূগণ্ডলিই তোমরা লইবে; হা! ভগবন!’ প্রহরী হাস্য করিয়া বলিল ‘সে জন্য আর কথা খেদ করিলে কি হইবে, আপন কার্যে যাও।’ ‘সে

কথা সত্য’ বলিয়া ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

ব্রাহ্মণ শীত্ৰই বহুজনাকীর্ণ পুনা নগরীর লোকের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শুভকার্যের দিনস্থির।

“—নিশি বিপ্রহরে
কুমন্ত্রণা করিতেছে রাজজ্যোতিষগণ।”

নবীনচন্দ্র সেন।

ব্রাহ্মণ একে একে পুনার বহু পথ অতিবাহন করিলেন; যে যে স্থান দিয়া যাইতে লাগিলেন সেই সেই স্থান বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দুই একটি দোকানে জব্য ক্রয়ের ছলে প্রবেশ করিয়া কথায় কথায় নানা বিষয় জানিলেন, পরে বাজার পার হইয়া গেলেন, প্রশস্ত রাজপথ হইতে একটি গলিতে প্রবেশ করিলেন, সেখানে রজনীতে দীপ সমস্ত নিৰ্ব্বাণ হইয়াছে, নাগরিক সকলে দ্বার বন্ধ করিয়া নিজ নিজ আলয়ে শুষ্ট।

ব্রাহ্মণ একাকী অনেক দূর যাইলেন, আকাশ অন্ধকারময় কেবল দুই একটি তারা দেখা যাইতেছে, নাগরিক সকলে শুষ্ট, জগৎ নিস্তব্ধ। ব্রাহ্মণের মনে সন্দেহ হইল, তাঁহার বোধ হইল যেন তাঁহার পশ্চাতে পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। স্থির হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন,—কৈ সে পদশব্দ আর শুনা যায় না।

পুনরায় পথ অভিবাছন করিতে লাগিলেন, ক্রমে পুনরায় বোধ হইল যেন পক্ষান্তরে কে অনুসরণ করিতেছে। ব্রাহ্মণের হৃদয় ঈষৎ চঞ্চল হইল। এই গভীর নিশীথে কে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে? সে শব্দ না মিত্র? শব্দ হইলে কি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে? উদ্বেগ পরিপূর্ণ হৃদয়ে ক্রমে চিন্তা করিলেন; পরে নিঃশব্দে তুলা-নির্মিত কুর্তির আন্তিনের ভিতর হইতে একটি তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিলেন, একটি পথের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইলেন; গভীর অন্ধকারের দিকে ক্রমে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন, কৈ কেহই নাহি, সকলে শ্রুণু, নগর শব্দ-শূন্য ও নিস্তব্ধ!

সন্দিগ্ধমনা ব্রাহ্মণ পুনরায় আলোকপূর্ণ বাজারের ফিরিয়া গেলেন; তথায় অনেক দোকান, নানাজাতীয় অনেক লোক এখনও ক্রয় বিক্রয় করিতেছে, তাহার ভিতর মিশিয়া বাইবার চেষ্টা করিলেন। আবার তথা হইতে সহসা এক গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন, পরে দ্রুতবেগে অস্ত্রাস্ত্র গলির ভিতর দিয়া নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন! নিঃশব্দে অনেকক্ষণ শ্বাস কক্ষ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। শব্দমাত্র নাহি, চারিদিকে পথ, ঘাট, কুটার, অটালিকা সমস্ত নিস্তব্ধ, নৈশ গগন গভীর হুর্ভেদ্য অন্ধকার দ্বারা সমস্ত জগতকে আবৃত করিয়াছে! অনেকক্ষণ পর একটি চীৎকারশব্দ স্রব হইল; ব্রাহ্মণের হৃদয়

কম্পিত হইয়া উঠিল, তিনি নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ক্রমে পুনর আবার সেই শব্দ হইল, মহাদেওজীর ভয় দূর হইল, সে নাগরিক প্রহরী পাছারা দিতেছে। হুর্ভাগ্যক্রমে মহাদেও যে গলিতে লুকায়িত ছিলেন সেই গলিতেই প্রহরী আসিল। গলি অতি সঙ্কীর্ণ, মহাদেও পুনরায় সেই ছুরিকা হস্তে লইয়া হুর্ভেদ্য অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী ধীরে সেই স্থানে আসিল; এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে সেইস্থানে আসিল; মহাদেও যেস্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন সেই দিকে চাহিল। উঃ মহাদেবের হৃদয় হুক হুক করিতে লাগিল, তিনি শ্বাস কক্ষ করিয়া হস্তে সেই ছুরিকা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইল না; ধীরে সে পথ হইতে চলিয়া গেল। মহাদেও ধীরে ধীরে তথা হইতে বাহির হইয়া ললাটের শ্বেদ মোচন করিলেন।

পরে নিকটবর্তী একটি ঘরে আশ্রয় করিলেন; শায়ন্তার্থীর এক জন মহারাষ্ট্রীয় সৈনিক বাহির হইয়া আসিল, হুই জনে অতি সজোপনে নগরের মধ্যে অতি গোপনীয় ও মনুষ্যের অগম্য স্থানে বাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় হুই জনে উপবেশন করিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন 'সমস্ত প্রস্তুত?'
সৈনিক। 'প্রস্তুত।'

ব্রাহ্মণ। ‘অনুমতিপত্র পাঠিয়াছ?’

সৈনিক। ‘পাঠিয়াছি।’

আবার অস্পষ্ট পদশব্দ শ্রুত হইল। মহাদেওজী এবার ক্রোধে আরক্তমনন হইয়া ছুরিকাহস্তে সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন; অন্ধকারে অমেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন কিছুমাত্র দেখিতে পাঠিলেন না। ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরে সৈনিককে বলিলেন ‘রক্তহস্তে আসিয়াছ?’

সৈনিক বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া দেখাইল। ব্রাহ্মণ বলিল ‘ভাল। মতর্ক থাকিও। বিবাহ কবে?’

সৈনিক। ‘কলা।’

ব্রাহ্মণ। ‘অনুমতি পাঠিয়াছ?’

সৈনিক। ‘হাঁ’ একটি কাগজ দেখাইল।

ব্রাহ্মণ। ‘কত জন লোকের?’

সৈনিক। ‘বাদ্যকর দশ জন, ও অস্ত্রধারী ত্রিশ জন ইহার অধিক অনুমতি পাঠিয়ায় না।’

ব্রাহ্মণ। ‘এই যথেষ্ট, কোন সময়ে?’

সৈনিক। ‘রজনী এক প্রহর!’

ব্রাহ্মণ। ‘ভাল। এই দিক হইতে বরষাত্রা আরম্ভ হইবে।’

সৈনিক। ‘স্মরণ আছে।’

ব্রাহ্মণ। ‘বাদ্যকরেরা সজ্ঞারে বাদ্য করিবে।’

সৈনিক। ‘স্মরণ আছে।’

ব্রাহ্মণ। ‘জ্যোতি কুটুম্ব যত পারিবে জড় করিবে।’

সৈনিক। ‘স্মরণ আছে।’

ব্রাহ্মণ তখন অস্পষ্ট হাস্য করিয়া বলিলেন ‘আমরাও শুভকার্যে যোগ দিব, সে শুভকার্যের যটা সমস্ত ভারতবর্ষে রাষ্ট্র হইবে।’

সহসা একটি সজ্ঞারে নিকিণ্ড তীর আসিয়া ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলে লাগিল; সে তীরে প্রাণনাশ নিশ্চয় সম্ভব, কিন্তু ব্রাহ্মণের কুস্তির নীচে লৌহ-বর্মে লাগিয়া তীর খণ্ড খণ্ড হইল।

শুৎপরেই একটি বর্ষ। বর্ষার ভীষণ আঘাতে ব্রাহ্মণ ভূমিতে পতিত হইলেন, কিন্তু সে দুর্ভেদ্য বর্ষা ভিন্ন হইল না, মহাদেও পুনরায় উঠিলেন। সম্মুখে দেখিলেন নিকোষিত অসিহস্তে একজন দীর্ঘ যোগল যোদ্ধা,—তিনি চাঁদখাঁ।

অদ্য সভাতে সেনাপতি খায়েরুখাঁ। চাঁদখাঁকে ভীক বলিয়াছেন। যুদ্ধাবসার চাঁদখাঁর কেশ শুরু হইয়াছিল, সম্মুখযুদ্ধ বিনা তিনি কখনও পলায়ন জানিতেন না, এ অপবাদ কখন কেহ তাঁহাকে দেয় নাই।

যনে মর্যাদাসিক বেদনা পাঠিয়াছিলেন, অন্যকে তাহা কি জানাইবেন, যনে স্থির করিলেন কার্য্য দ্বারা এ অপবাদ দূর করিব, মতেৎ এই যুদ্ধেই এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ দান করিব।

ব্রাহ্মণের আচরণ দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি শিবজীকে বিশেষ করিয়া জানিতেন, শিবজীর অসামান্য

রণ ক্ষমতা, তাঁহার বহুসংখ্যক ধর্ম, তাঁহার অপূর্ণ ও দ্রুতগামী অখারোহী সেনা, তাঁহার হিন্দুধর্মে আস্থা, হিন্দুরাজ্য স্থাপনে অভিলাষ, হিন্দুস্বাধীনতাসাধনে প্রীতিজ্ঞা, এ সমস্ত চাঁদখাঁর নিকট অগোচর ছিল না। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ প্রারম্ভেই যে শিবজী পয়াজয় স্বীকার ও সন্ধি স্বাক্ষর করিবেন এরূপ সম্ভব নহে, তথাপি এ ব্রাহ্মণ শিবজীর নিদর্শন পত্র দেখাইয়াছে। এ ব্রাহ্মণ কে? ইহার গুপ্ত অতিসন্ধিই বা কি?

ব্রাহ্মণের কথাগুলিতেও চাঁদখাঁর সম্বন্ধ জড়িয়াছিল, মহারাষ্ট্রের নিন্দা শুনিয়া যখন ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্বলিত হয় তাহাও তিনি দেখিয়াছিলেন। এ সমস্ত সম্বন্ধের কথা শারয়েস্তাখাঁর নিকট বলেন নাই, সত্য বলিয়া কেন আবার তিরস্কার সহ্য করিবেন, কিন্তু মনে মনে স্থির করিলেন এই ভণ্ড দূতকে ধরив। সেই অবধি দূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, পথে পথে, গলিতে গলিতে অদৃশ্যভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন। মুহুর্তের জন্যও ব্রাহ্মণ চাঁদখাঁর নয়নবহির্ভূত হইতে পারেন নাই।

সৈনিকের সহিত ব্রাহ্মণের যে কথা হয় তাহা শুনিলেন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি যোদ্ধা তখনই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, এই দূতকে বিনাশ করিয়া সৈনিক সেনাপতিসদনে লইয়া যাইয়া প্রতিপত্তি লাভের সঙ্কল্প করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন ‘শারয়েস্তা

খাঁ! যুদ্ধব্যবসায় যুধা এ কেশ শুক্ল করি নাই, আমি ভীকও নহি, দিল্লীখরের বিকাকাচারীও নহি; অদ্য যে বড়যন্ত্রটি ধরিয়ী প্রকাশ করিয়া দিব তাহার পর বোধ হয় এ প্রাচীন দাসের কথা অবহেলা করিবে না।’ কিন্তু আশা যায়াবিনী।

মহাদেওজী ভূমি হইতে উঠিতে না উঠিতে চাঁদখাঁ তীর ও বর্ষা ব্যর্থ দেখিয়া লক্ষ্য দিয়া তাঁহার উপর আসিয়া পড়িলেন ও খজা দ্বারা সজোরে আঘাত করিলেন। আশ্চর্য্য বর্ধে লাগিয়া সে খজা প্রতিহত হইল।

“কুকণে আমার অনুসরণ করিয়াছিলে” বলিয়া মহাদেওজী আপন আন্তরিক গুটাইয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকা আকাশের দিকে উত্তোলন করিলেন।

নিমেষমধ্যে বহুমুষ্টি চাঁদখাঁর বক্ষস্থলে অবতীর্ণ হইল,—চাঁদখাঁর মৃতদেহ ধরাতলশায়ী হইল।

ব্রাহ্মণ সূক্ষ্ম অধরোষ্ঠের উপর দস্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। ধীরে ধীরে সেই ছুরিকা পুনরায় লুকাইয়া বলিলেন—

“শারয়েস্তাখাঁ! মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিন্দা করার এই প্রথম ফল, ভবানীর কলাগে দ্বিতীয় ফল কলা ফলিবে।”

শারয়েস্তাখাঁ! অনাগ্র তিরস্কারে অদ্য যে অমূল্য বীর রক্তটিকে হারা হইল, বিপদের সময় তাহাকে স্মরণ করিবে কিন্তু আর পাইবে না।

যোদ্ধার কর্তব্যকার্যে যে সময়ে চাঁদ-
খাঁ জীবন দান করিলেন, সেনাপতি শা-
য়েস্তাখাঁ সে সময়ে বড় সুরখে নিত্রা যাই-
তেছিলেন, শিবজীকে বশীকরণ বিষয়ে
সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন ।

মহারাজ্ঞীর সৈনিক এই সমস্ত ব্যাপারে
বিশ্মিত হইয়া বলিল ‘প্রভু কি করিলেন ?
কল্যাণ বিষয়ে গোল হইবে, আমাদের স-
মুদায় সঙ্কল্প রূখা হইবে ।’

ব্রাহ্মণ । ‘ কিছুমাত্র রূখা হইবে না ।
আমি জানিয়াছি চাঁদখাঁ অদ্য সভায় অ-
পমানিত হইয়াছেন, এখন কএক দিন
সভায় না যাইলেও কেহ সন্দেহ করিবে
না । এই মৃতদেহ ঐ গভীর কূপে নি-
ক্ষেপ কর, আর স্মরণ রাখিও কল্যাণ র-
জনী এক প্রহরকালে ”—

সৈনিক । “ রজনী এক প্রহরকালে । ,,

ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে পুনানগর ত্যাগ ক-
রিলেন । তিন চারি স্থানে প্রহরগিণ তাঁ-
হাকে ধরিল, তিনি শায়েরস্তাখাঁর স্বাক্ষরিত
অনুমতি পত্র দেখাইলেন, ও নিরাপদে
পুনা হইতে বহির্গত হইলেন ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

রাজা যশোবন্ত সিংহ ।

“ কোন্ ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জাতিত্ব, ব্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে গুণবান বদি

পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নিগুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পর পর সদা । ”

মধুসূদন দত্ত ।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় রাজপুত্র রাজা
যশোবন্ত সিংহ একাকী শিবিরে বসিয়া
রহিয়াছেন ; হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া
এই গভীর নিশীথেও কি চিন্তা করিতেছেন,
সম্মুখে কেবল একটি মাত্র দ্বীপ জ্বলি-
তেছে, শিবিরে অন্য লোক মাত্র নাই ।

সংবাদ আসিল মহারাজ্ঞীর দূত সা-
ক্ষাত করিতে আসিয়াছেন । যশোবন্ত
তাঁহাকে আনয়ন করিতে কহিলেন, তাঁ-
হারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ।

মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী শিবিরে আ-
সিলেন, যশোবন্ত তাঁহাকে সাদরে আ-
ল্বাম করিয়া উপবেশন করিতে বলি-
লেন । উভয়ে উপবেশন করিলেন ।

ক্ষণেক যশোবন্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহি-
লেন, কি গভীর চিন্তা করিতেছিলেন ।
মহাদেও নিঃশব্দে রাজপুত্রের দিকে সূ-
তীক্স দৃষ্টি করিতেছিলেন ।

পরে যশোবন্ত বলিলেন ‘ আমি আ-
পনার প্রভুর পত্র পাইয়াছি । তাহাতে
যাহা লিখিত আছে অবগত হইয়াছি,
তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রস্তাব আছে ?

মহা । ‘ প্রভু আমাকে কোন প্র-
স্তাব করিতে পাঠান নাই, খেদ করিতে
পাঠাইয়াছেন । ’

যশো । ‘ কেবল পুনা ও চাকান দুর্গ আমা-
দের হস্তগত হইয়াছে মাত্র, এইজন্য খেদ ? ’

মহা। ‘ভূর্গনাশে তিনি কুরু ন-
হেন, তাঁহার অসংখ্য ভূর্গ আছে।’

যশো। ‘মোগল-যুদ্ধস্বরূপ বিপদে
পড়িয়া তিনি খেদ করিতেছেন।’

মহা। ‘বিপদে পড়িলে খেদ করা
তাঁর অভ্যাস নাই।’

যশো। ‘তবে কি জন্য খেদ ক-
রিতেছেন?’

মহা। ‘যিনি হিন্দুরাজ-তিলক, যিনি
কত্রিরকুলাবতংশ, যিনি সনাতন ধর্মের
রক্ষাকর্তা, তাঁহাকে অদ্য স্নেহের দাস
দেখিয়া প্রভু কুরু হইয়াছেন।’

যশোবস্তুর মুখমণ্ডল জ্বলন্ত
হইল; মহাদেও তাহা দেখিয়াও দেখিলেন
না, গভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন;—

‘উদয়পুরের প্রতাপরাণার বংশে
যিনি বিবাহ করিয়াছেন, মাড়ওয়ারের
রাজস্বত্র ঝাঁহার মস্তকের উপর ধৃত হই-
য়াছে, রাজস্থান ঝাঁহার মুখাভিতে পরি-
পূর্ণ রহিয়াছে, সিপ্রাতীরে ঝাঁহার বাহু-
বিক্রম দেখিয়া আরংজীব ভীত ও বিন্মিত
হইয়াছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষ ঝাঁহাকে
সনাতন হিন্দুধর্মের স্তম্ভস্বরূপ জ্ঞান করে,
দেশে দেশে, প্রাণে প্রাণে, মন্দিরে মন্দিরে
ঝাঁহার জন্মের জন্য হিন্দুযাত্রের, ব্রাহ্মণ-
যাত্রের, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে,
অদ্য তাঁহাকে মুসলমানের পদ হইয়া হি-
ন্দুর বিকটে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া প্রভু
কুরু হইয়াছেন। রাজন্! আমি সামান্য
দূতমাত্র, আমি কি বলিতেছি জানি না,

অপরাধ হইলে মার্জনা করিবেন, কিন্তু এ
যুদ্ধসজ্জা কেন? এ সৈন্যসামন্ত কেন?
এ সমস্ত বিজয়পতাকা কি জন্য উত্তীর্ণ
হইতেছে? আধিকার বৃদ্ধি করিবার জন্য?
হিন্দু স্বাধীনতা স্থাপন করিবার জন্য?
কত্রোচিত যশোলাভের জন্য? আপনি
কত্রকুলবর্ষত! আপনি বিবেচনা করুন;
আমি জানি না।’

যশোবস্তু অধোবদনে রহিলেন। মহা-
দেও আরও বলিতে লাগিলেন—

‘আপনি রাজপুত্র! মহারাষ্ট্রের
রাজপুত্র-পুত্র; পিতা পুত্র যুদ্ধ সস্তবে
না। আপনার সহিত প্রভুর যুদ্ধ সস্তবে
না; স্বয়ং ভবানী এ যুদ্ধ নিবেদ্য করিয়া-
ছেন। আপনি আজ্ঞা করুন আমরা পা-
লন করিব। রাজপুত্রের গৌরবই অনাধ
ভারতবর্ষের একমাত্র গৌরব। রাজপু-
ত্রের যশোগীত আমাদের রমণীগণ এখনও
গাইয়া থাকে, রাজপুত্রদিগের উদাহরণ
দেখিয়া আমাদের বালকগণ শিক্ষিত হয়,
সে রাজপুত্রের সহিত যুদ্ধ! কত্রকুলভি-
লক! রাজপুত্র-শোণিতে আমরাদিগের
ধন্য রক্তিত হইবার পূর্বে যেন মহারাষ্ট্র
নাম বিলুপ্ত হয়, রাজ্য বিলুপ্ত হয়, আমরা
যেন বর্ষা ও ধন্য ভাগ করিয়া পুনরায়
লাজল ধারণ করিতে শিখি!’

যশোবস্তু সিংহ তখন মরন উঠাইয়া
ধীরে ধীরে বলিলেন ‘দূতপ্রধান! তো-
মার কথাগুলি বড় মিষ্ট, কিন্তু আমি দি-
নীশ্বরের অধীন, মহারাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ

করিব বলিয়া আসিয়াছি, মহারাজের সহিত যুদ্ধ করিব—'

'এবং শত শত স্বর্গসীমাকে নাশ করিবেন, হিন্দু হিন্দুর মস্তক ছেদন করিবে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের বক্ষে ছুরিকা বসাইবে, ক্ষত্রিয়ের শোণিতস্রোতে ক্ষত্রিয়ের শোণিতস্রোত মিশাইবে, শেষে স্রেচ্ছ সত্রোতের সম্পূর্ণ জয় হইবে।' ইহং বাজতাবে দূত এই কথা বলিলেন।

যশোবন্তের মুখ আরক্ত হইল, কিন্তু উষ্ণেগ স্বধরণ করিয়া কিঞ্চিৎ কৰ্কশভাবে বলিলেন—

'কেবল দিল্লীখরের জয়ের জন্য যুদ্ধ নহে;—আমি তোমার প্রভুর সহিত কি-রূপে মিত্রতা করিব? শিবজী বিক্রো-হাচারী, চতুর শিবজী অমোর সাজীকার অনারাসে কল্যা ভঙ্গ করে।'

এবার ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্বলিত হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন 'মহারাজ! সাবধান, অলীক নিন্দা আপনার সাজে না। শিবজী কবে হিন্দুর নিকট যে বাক্য দান করিয়াছেন তাহার অমাথা করিয়া-ছেন? কবে ব্রাহ্মণের নিকট যে পণ ক-রিয়াছেন, ক্ষত্রিয়ের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন? দেশে শত শত গ্রাম, শত শত দে-বালয় আছে; অমুসলমান ককন, শিবজী সজ্ঞ পালন করিতে, ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিতে, হিন্দুর উপকার করিতে, গোবৎ-সাদি রক্ষা করিতে, হিন্দুদেবের পূজা

দিতে কবে পরাধুখ? তবে মুসলমানদি-গের সহিত যুদ্ধ। জেতা ও বিজিতদিগের মধ্যে কবে কোন দেশে সখ্যতা? বজ্রনথ যখন সর্পকে ধারণ করে সর্প সে সময় মৃতবৎ হইয়া থাকে, মৃত বলিয়া তাহাকে পরিভ্যাগ করিবারাত্র জর্জরিত-শরীর না-গরাজ সময় পাইয়া দংশন করে, এটি বি-ক্রোহাচরণ নয়, এটি স্বভাবের রীতি। কু-কুর যখন খরগোশকে ধরিবার চেষ্টা করে, খরগোশ প্রাণরক্ষার জন্ত কত যত্ন করে, একদিকে পলাইবার উদ্যোগ করিয়া স-হসা অন্যদিকে যায়, এটি চাতুরী না স্ব-ভাবের রীতি? দেখুন, বাবতীর জীব জন্তু দিগকে জগদীশ্বর যে প্রাণরক্ষার যত্ন ও উপায় শিখাইয়াছেন, মনুষ্যকে কি সে উপায় শিখান নাই? আমাদের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন স্বরূপ স্বাধীনতা যে মুসলমানেরা শত শত বৎসর অবধি শোষণ করিতেছে, হৃদয়ের শোণিত স্বরূপ বল, মান, দেশ-গৌরব, জাত্যভিমান শোষণ করিতেছে, ধর্ম বিনাশ করিতেছে, তাহা-দিগের সহিত আমাদের সখ্যতা ও স-ভাসম্বন্ধ? তাহাদিগের নিকট হইতে যে উপায়ে সেই জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারি, স্বধর্ম ও জাতি-গৌরব রক্ষা করিতে পারি, সে উপায় কি চতুরতা, সে উপায় কি নিন্দনীর? জীবনরক্ষার্থ পলায়ন-পট্ট যুগের শীতগতি কি বি-ক্রোহ? শাবককে বাঁচাইবার জন্য পক্ষী যে অপহারককে অন্যদিকে লইয়া যাইতে

যত্ন করে, সেটি কি নিন্দনীয়? কত্রিয়-রাজ! দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, মুসলমান-দিগের নিকট মহারাষ্ট্রীয় চতুরতার নিন্দা শুনিতে পাঠি, কিন্তু হিন্দুপ্রবর! আপনি হিন্দুজীবন রক্ষার একমাত্র উপায়কে নিন্দা করিবেন না, শিবজীকে নিন্দা করিবেন না।' মহাদেওয়ের জ্বলন্ত নয়নধর জলে আবৃত হইল।

ব্রাহ্মণের চক্ষে জল দেখিয়া যশোবন্ত হৃদয়ে বেদনা পাঠিলেন। বলিলেন 'দুত-প্রবর! আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাহি নাই, যদি অন্যান্য বলিয়া থাকি মার্জনা করিবেন। আমি কেবল এই মাত্র বলিতেছিলাম যে দেখুন রাজপুতগণও স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা সাহস ও সম্মুখ রণ ভিন্ন অন্য উপায় জানেন না। মহারাষ্ট্রীয়েরাও কি সেই উপায় অবলম্বন করিয়া সেইরূপ ফললাভ করিতে পারে না?'

মহা। 'মহারাজ! রাজপুতদিগের পুরাতন স্বাধীনতা আছে, বিপুল অর্থ আছে, দুর্গম পর্বত বা মক্বেফিত দেশ আছে, পুন্ডর রাজধানী আছে, সহস্র বৎসরের অপূর্ব রণশিক্ষা আছে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের ইহার কোনটি আছে? তাহারা দরিদ্র, তাহারা চিরপরাধীন, তাহাদের এই প্রথম রণ-শিক্ষা। আপনাদিগের দেশ আক্রমণ করিলে আপনাদের পুরাতন রীতুমুসারে যুদ্ধ দেন, পুরাতন দুর্ধ্ব ভেজ ও বিক্রম প্রকাশ করেন, অসংখ্য রাজ-

পুত সেনার সম্মুখে দিল্লীখরের সেনা সরিয়া যান। আমাদের দেশ আক্রমণ করিলে আমরা কি করিব? পূর্বরীতি বা রণশিক্ষা নাই, অসংখ্য সৈন্য নাই, বাহারা আছে তাহারা প্রত্যুত রণ দেখে নাই! যখন দিল্লীখর কাবুল, পঞ্চাব, অযোধ্যা, বিহার, মালব, বীরপ্রসবিনী রাজস্থান ভূমি হইতে সহস্র সহস্র পুরাতন রণদর্শী যোদ্ধা প্রেরণ করেন, যখন অপরূপ রুহৎ অনিবার্য রণ-অর্থ ও রণ-গজ প্রেরণ করেন, যখন তাঁহার কামান, বন্দুক, বাকদ, গোলা, রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা, সহস্র সহস্র শকটে আনিয়া রাশীকৃত করেন, তখন দরিদ্র মহারাষ্ট্রীয়েরা কি করিবে? তাহাদিগের সেরূপ অসংখ্য যুদ্ধদর্শী সৈন্য নাই, সেরূপ অর্থ গজ নাই, সেরূপ বিপুল অর্থ নাই, চতুরতা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? ভরিত-গতি ও পর্বত-যুদ্ধ ভিন্ন তাহাদের আর কি উপায় আছে? কত্রিয়রাজ! জীবন-প্রান্তে দরিদ্রজাতির এইরূপ আচরণ ভিন্ন উপায় নাই। জগদীশ্বর করুন মহারাষ্ট্রীয় জাতি দীর্ঘজীবী হউক, তাহাদিগের অর্থ ও যুদ্ধায়োজনের উপায় সংস্থান হইলে, দুই তিনশত 'বৎসরের রণশিক্ষা হইলে, তাহারাও রাজপুতের অসাধারণ গুণ অনুকরণ করিবে।'

এই সমস্ত কথা শুনিয়া যশোবন্ত চিত্ত অতিক্রান্ত হইয়া রহিলেন, হস্তে লগাট স্থাপন করিয়া একপ্রাচিতে চিত্রা করিতে লাগিলেন। মহাদেও দেখিলেন তাঁহার

বাক্যগুলি নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই, আবার
ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

‘আপনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ, হিন্দুগৌরবসা-
ধনে সম্বন্ধ করিতেছেন কেন? হিন্দুধ-
র্মের জয় অবশ্যই আপনি ইচ্ছা করেন,
শিবজীরও ইচ্ছা ভিন্ন অন্য ইচ্ছা নাই।
মুসলমান শাসন ধ্বংস করণ, হিন্দুজাতির
গৌরব সাধন, স্থানে স্থানে দেবালয় স্থা-
পন, সনাতন ধর্মের গৌরবরক্ষা, হিন্দুশা-
স্ত্রের আলোচনা, ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দান,
গোবৎসাদি রক্ষা করণ, ইহা ভিন্ন শিব-
জীর অন্য উদ্দেশ্য নাই। এই বিষয়ে যদি
তঁাহাকে সাহায্য করিতে বিমুখ হইলে
তবে স্বহস্তে এই কার্য সাধন করুন।
আপনি এই দেশের রাজত্ব গ্রহণ করুন,
মুসলমানদিগকে পরাস্ত করুন, মহারাষ্ট্রে
হিন্দুস্বাধীনতা স্থাপন করুন। আদেশ ক-
রুন দুর্গের দ্বার এইক্ষণেই উদ্বাচিত হইবে,
প্রজারা আপনাকে কর দিবে, আপনি
শিবজী অপেক্ষা সহস্রগুণে বলবান, স-
হস্রগুণ দূরদর্শী, সহস্রগুণ উপযুক্ত, শিবজী
সমুদ্রতটতে আপনার একজন সেনাপতি
হইয়া মুসলমানদিগের ধ্বংস সাধন করি-
বেন। তাঁহার অন্য বাসনা নাই।’

এই প্রস্তাবে উচ্চাভিলাষী যশোবন্তের
নয়ন যেন আমন্দে উৎকুল হইল। অনেক-
ক্ষণ চিন্তা করিলেন, কিন্তু অবশেষে ধীরে
ধীরে বলিলেন ‘মাড়রার ও মহারাষ্ট্রে
অনেক দূর, এক রাজার অধীন থাকিতে
পারে না।’

মহাদেও। ‘তবে আপনার উপযুক্ত
পুত্র থাকিলে তঁাহাকে এই রাজ্য দিন, ন-
চেৎ কোন আত্মীয় যোদ্ধাকে দিন। শি-
বজী ক্ষত্রিয় রাজার অধীনে কার্য করি-
বেন, কিন্তু কদাচ ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ
করিবেন না।’

যশোবন্ত আবার চিন্তা করিয়া ব-
লিলেন—‘এই বিপদকালে, আরংজী-
বের সহিত যুদ্ধ করিয়া এদেশ রাখিতে
পারিবে এমন আত্মীয় নাই।’

মহাদেও। ‘কোন ক্ষত্রিয় সেনাপ-
তিকে নিযুক্ত করুন, হিন্দুধর্ম ও স্বাধীনতা
রক্ষা হইলে শিবজীর মনস্বামনা পূর্ণ হ-
ইবে; শিবজী সানন্দচিত্তে রাজ্যপরিভাগ
করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন।’

যশো। ‘সে রূপ সেনাপতিও নাই।’

মহা। ‘তবে যিনি এই মহৎ কার্য
সাধন করিতে পারিবেন তঁাহাকে সাহায্য
করুন। আপনার সাহায্যে, আপনার
আশীর্ব্বাদে, শিবজী অবশ্যই স্বদেশ ও
স্বধর্মের গৌরব সাধন করিতে পারিবেন।
ক্ষত্রিয়রাজ! ক্ষত্রবোদ্ধাকে সহায়তা ক-
রুন, তারতবর্ষে এরূপ হিন্দু নাই, আকাশে
এরূপ দেবতা নাই যিনি আপনাকে এজস্ত
প্রশংসাবাদ না করিবেন।’

যশোবন্ত কণেক চিন্তা করিয়া বলি-
লেন, ‘বিজয়র, তোমার তর্ক অলঙ্ঘনীয়,
কিন্তু দিল্লীখর আমাকে স্বেচ্ছ করিয়া এই
কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি কিরূপে
অন্যরূপ আচরণ করিব? সে কি উচিত?

মহা। ' দিল্লীধর যে হিন্দুদিগের কাকের বলিয়া জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছেন সে কার্য কি ভ্রোচিত ? দেশে দেশে যে হিন্দুপুজক, হিন্দুমন্দির, হিন্দু-দেবালয়ের অবমাননা করিতেছেন সে কি ভ্রোচিত ? কাশীর পুরাতন মন্দির চূর্ণ করিয়া সেই প্রস্তর দ্বারা সেই পুণাধামে মসজীদ নির্মাণ করাইয়াছেন, সে কি ভ্রোচিত ?'

ক্রোধকম্পিতস্বরে যশোবন্ত বলিলেন—
' বিজবর ! বিজবর ! আর বলিবেন না, যথেষ্ট বলিয়াছেন। অদ্যাবধি শিবজী আমার মিত্র, আমি শিবজীর মিত্র। রাজপুত্রের প্রতিজ্ঞা কখনও মিথ্যা হয় না, অদ্যাবধি শিবজীর পুণ ও আমার পুণ এক, শিবজীর চেষ্ঠা ও আমার চেষ্ঠা অভিন্ন। সেই হিন্দুবিরোধী দিল্লীধরের বিকল্পে এত দিন যিনি যুদ্ধ করিয়াছেন সে মহাত্মা কোথায় ? একবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের সন্তাপ দূর করি।'

মহারাজীর দূত দ্বয়ং হাস্য করিয়া যশোবন্তের কর্ণের নিকট মুখ লইয়া যাইয়া একটি কথা কহিলেন। শুনিবা মাত্র যশোবন্ত একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন, চকিতের মায় ক্ষণেক নির্বাক হইয়া রহিলেন, বিন্মরোৎফুল্ল লোচনে দু-তের দিকে দেখিতে লাগিলেন, পরে সানন্দে ও সাহসেরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উত্তরে গোপনে, অতি মৃদুস্বরে

অনেকক্ষণ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর মহাদেও বলিলেন ' মহারাজ, অনুগ্রহ করিয়া কলা কোন ছলে পুনা হইতে কএক ক্রোশ দূরে থাকিলে ভাল হয়।'

যশো। ' কেন ? কলা পুনা হস্তগত করিবার চেষ্ঠা করিবে ?'

দূত। হাস্য করিয়া বলিল ' না, একটি বিবাহ কার্য সম্পাদন হইবে, মহারাজ থাকিলে শুভকার্যে ব্যাঘাত হইতে পারে।'

যশোবন্ত বুঝিয়া বলিলেন ' ভাল, দু-রেই থাকিব।' দূত বিদায় যাজ্ঞা করিলেন। যশোবন্ত ঈর্ষাকাস্য করিয়া বলিলেন—

' ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয়ের বোধ হয় অনেক দিন পাঠ সমাপন হইয়া থাকিবে ; এক্ষণে স্মরণ আছে কি না ?'

মহা। তথাপি যে বিদ্যা আছে তাহাতে দিল্লীর সেনাপতি শায়ের্তা খাঁ বিন্মিত হইয়াছেন।'

যশোবন্ত দ্বার পর্যন্ত সঙ্গে যাইলেন, পরে বিদায়ের সময় বলিলেন ' তবে যুদ্ধ বিষয়ে যেরূপ কথোপকথন হইল সেইরূপ কার্য করিবেন।'

মহা। ' সেইরূপ কার্য করিবার জন্য প্রভু শিবজীকে বলিব।'

যশো। ' হাঁ বিন্মরণ হইয়াছিলাম, সেই রূপ কার্য করিতে তোমার প্রভুকে

বলিও।’ হাসিতে হাসিতে শিবিরাত্যস্তরে প্রবেশ করিলেন।

বশোবস্তুর এক জন বিশ্বস্ত অমাত্য অঙ্গুষ্ঠপূর্ণ পরে শিবিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ‘আপনার শিবির হইতে এই মাত্র

এক জন অশ্বারোহী সিংহগড় প্রমুখে বাইলেন, উনি কে?’

বশোবস্তু উত্তর করিলেন, ‘উনি হিন্দুজাতির আশাশ্বরূপ, হিন্দুধর্মের প্রহরী।’

(প্রাপ্ত)

ভারতের প্রজানীতি ।

ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষে উদীচা ভাষা সমূহে যে সকল সংবাদ পত্র, পুস্তক ও পত্রিকাদি মুদ্রিত হয় বা হইবে, তাহার নুশাসন জন্য সংপ্রতি রাজপুস্তকগণ যে ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহা লইয়া ভারতের সর্বত্র তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। ব্যবস্থার সম্ভাবিত কার্যকারিতা এখনও পরিচায়িত হয় নাই বটে, কিন্তু প্রবর্তনাতেই আশঙ্কার তরঙ্গাতিবাত আঁরক্ক হইয়াছে; ইহার প্রকৃতি ও পরিণাম বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই মনোযোগ বিধান অবশ্য কর্তব্য। আমরা এই নিমিত্ত মনন করিয়াছি, এই উপলক্ষে আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার সমালোচন করিয়া, বক্ষ্যমাণ ব্যবস্থার স্বত্রগত বিচার করিব।

রাজার গৌরব রাজার ভাবায় পরিবাণ্ড রহিয়াছে; রাজার শরীর অলংঘ্য এবং পবিত্র; সুতরাং রাজভাষাও নিস্পাপ, নিষ্কলক। মুদ্রণ-শাসনীয় ব্যবস্থা-

তেও এই স্বত্রের মর্খাদা রক্ষিত হইয়াছে; ইংরেজরাজ বলিয়া দিয়াছেন, যে ইংরেজীতে যে ব্যক্তি মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ, তাহার অভিপ্রায়গত সাধুতার, তাহার নীতিগত নুশিকার এবং তাহার ধর্মবুদ্ধিসম্বৃত বিজ্ঞতার অন্য পরিচয় নিস্প্রয়োজন। সে যে কথা বলে, তাহাতে ভ্রান্তি থাকিলেও সে ভাল মন্দ বিচার করিয়া বলিয়াছে, ইহা বুঝা যায়; বাহ্যকে উদ্দেশ্য করিয়া বলে, সেও সে কথার ভাল মন্দ বিচার করিয়া লইতে জানে। সেই জন্য ইংরেজীতে ত্রম মার্জ্জনীয়, কারণ সংশোধনের সম্ভাবনা আছে।

এই নিয়মের ফলে, ১৫ মার্চের পরে দেশীয় ভাষায় যে সকল পত্রাদি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে রাজনীতি বা রাজব্যবস্থা সম্বন্ধে আর সে পূর্বের মত বাস্তবিক পরিষ্কৃত্য নাই। কিন্তু মিশ্রিত ক্রোধের কল্পে, কোত্তের দীর্ঘনিশ্বাসে, লক্ষ্যের সঙ্কোচে, বিগণিত অভ্যর্থনের প্র-

মাণ সর্বত্র দেদীপ্যমান। মুদ্রণ-স্বাধীন-তার লোপ হইল বলিয়া মুক্তিভাঙ্গরে ভারতীয় লেখক বাহা প্রকাশ করিতেছেন না, ভারতবাসীর সভায়, ভারতবাসীর প্রমোদ-মন্দিরে, যানে, পাদচারে, আলোপে, প্রালাপে, হাস্যে পরিহাসে, সেই অসন্তোষ যেম মুক্তি ধরিয়া বিচরণ করিতেছে। কাগজের কথা এখন মুখে কুটিয়া বাহির হইতেছে। ফলে, এই ফলে বলিয়া রাখা আবশ্যিক যে, এই সমস্তই ভারতবাসীর একতম সম্প্রদায় নিবন্ধ। সাম্প্রদায়িকদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়, তাহা আমরা জানি; পাশ্চাত্য শিক্ষার ষাঁহাদের ক্ষমত-রুতির ক্ষুষ্টি হইয়াছে, ষাঁহাদের চিন্তবলের বিকাশ হইয়াছে, জঘন্সুখি ও মাতৃভাবার নামে ষাঁহাদের অহংকরণ তরঙ্গায়িত হয়, তাঁহাদের অনেকেই এ সম্প্রদায় ভুক্ত, তাহাও আমরা জানি। তথাপি সবিনয়ে, অগচ নিঃসঙ্কোচে আমরা বলিতেছি, যে এই দলের অন্তর্ভুক্ত হওরা আমরা বিশেষ বা সামান্য কোন প্রকার গৌরবের বিষয় বিবেচনা করি না। আমরা বাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব, তাহার জন্ম স্পষ্টাকরে একথা ব্যক্ত করিয়া রাখা আবশ্যিক।

ষাঁহারা এই সম্প্রদায়ের অধিনায়ক, তাঁহারা ভারতবর্ষের দুঃখে নিরন্তর ব্যথিত। ভারতবর্ষে বিজাতীয়, বিদেশীয় রাজা আধিপত্য করিতেছে, ভারতবর্ষের রাজ্যে বিদেশীয় দেহ পুঙ্ক হইতেছে,

ভারতবর্ষে বিজাতির রীতি নীতি, ভারতবাসীর সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া অথবা ইচ্ছার বিকল্পে প্রবর্তিত হইতেছে,—এই ইহাদের দুঃখ। স্থূল কথা, ভারতবর্ষ স্বাধীন নহে,—তাহাতেই ইহাদের অসন্তোষ। এ অসন্তোষের অস্তিত্ব কেহই অস্বীকার করে না; যে ব্যবস্থার উপলক্ষে আমরা এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার উপস্থাপন সময়ে মন্ত্রণা-বিশারদ ব্যবস্থাপকবর্গ এই অসন্তোষের উপরেই ব্যবস্থার ভিত্তি পত্তন করা হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এবং এই অসন্তোষের বিস্তার অনিচ্ছকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং এই অসন্তোষ ন্যায় ও যুক্তিমূলক কি না, এই স্বাধীনতাস্পৃহা অনুমোদনীয় কি না, প্রথমতঃ তাহারই বিচার করা আবশ্যিক।

স্বাধীনতা ও ঈশ্বরচাচারে অল্পই প্রভেদ। মনুষ্যের নিকট বাহা জবাবদিহি করিতে হয় না, এইরূপ দায়শূন্য নবাবও যদি নিজের অর্ধের সার্থকতা করিতেছি মনে করিয়া অতি সুখাদ্য সামগ্ৰী বা অতুপাদানের পানীয়ে অমিত আসক্তি হারাই স্বীয় স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত করেন, তাঁহাকেও আমরা দোষ দিয়া থাকি; কারণ, তিনি ঈশ্বরচাচার-পরায়ণ। অথচ এই দোষ দেওরাতে, এই নিন্দা করাতে আমাদের যে অনধিকার চর্চা করা হয়, তাহা নহে। সমাজভুক্ত ব্যক্তি যাজেই সমাজের নিকট নীতিমূলক দায়ে আবদ্ধ, সেই জন্যই আ-

মরা নবাবের নিন্দাবাদ করি ; তাঁহার বু-
তুকা বা পিপাসার শান্তি করণ বিষয়ে
তাঁহার স্বাধীনতা থাকিলেও সেই স্বাধী-
নতার অপপ্রয়োগ বা অতি প্রয়োণে আ-
মরা আমাদের সেই নিন্দা করিবার ক্রম-
তার পরিচালন করি ; সাধ্য থাকিলে সে-
রূপ স্থলে শাসন করিতেও জ্রুটি করিতাম
না, তাহাতে সন্দেহ নাই । আপনার শ-
রীর লইয়া আত্মতৃপ্তি সাধন বিষয়ে এত
বাধা ;—সাক্ষাৎ সৰ্বদেই হাতে কাহারই
ক্ষতি হয় না ও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, ত-
থাপি সমাজনীতির এই আক্রোশ । এমত
অবস্থায় রাজনৈতিক সমাজের বন্ধন যে
ইহা অপেক্ষা দৃঢ়তর হইবে, তাহা বি-
চিত্র কি ?

রাজনৈতিক সমাজের মূলসূত্র,—অ-
ধীনতা । প্রত্যেক ব্যক্তি স্বৈচ্ছাচারের কি-
রদংশ করিয়া রাজার হস্তে ন্যস্ত করাতেই
রাজনৈতিক সমাজের স্থিতি । কিন্তু সেই
অংশের পরিমাণ নির্দেশ করা অসম্ভব ।
কেত্র বুদ্ধিরা, সময় বুদ্ধিরা ইহা তাবৎ
কালের নিমিত্ত নিকপিত হইয়া থাকে ।
এই অধীনতাই আমাদের মঙ্গলের কারণ ;
এই রাজা প্রজা সম্বন্ধের উপরে সামা-
জিক উন্নতির নির্ভর । সভ্য সমাজের
প্রজাগণ শারীরিক ও ঐবয়সিক পুথ স্বচ্ছ-
ন্দতা ভোগ করিয়া, কাব্য, সঙ্গীত এবং
চিত্রবিদ্যাাদির আলোচনায় যে অন্তর্জগ-
তের উন্নতি ও স্বাস্থ্যসাধনের অবসর পা-
ইয়া থাকে, এই অধীনতাই তাহার মূল্য

স্বরূপ । সুতরাং সমাজে বাহাকে স্বা-
ধীনতা বলি, তাহা স্বৈচ্ছাচার হইতে বি-
ভিন্ন ; বস্তুতঃ তাহা অধীনতারই এক প্র-
কার ফল । কেবল নিয়ম ও নিয়মকর্তা
কথঞ্চিৎ স্বাধীন ; তন্নিম্ন সকলেই সেই
নিয়মের এবং বাহার হস্তে সেই নিয়ম ব-
লবৎ করিবার ভার দেওয়া হয়, তাহার
অধীন । ইউরোপ ও ইউরোপের মজ্জনী-
ক্ষিত আমেরিকা এই সকল তত্ত্বের আদর
ও গৌরব বুদ্ধিরাছে, শাসনের পুথ সে-
খানে জানে ; সেখানে প্রজায় বাহা কিছু
করে, সেই শাসনের উৎকর্ষ চেষ্ঠাতেই
তাহা করে , সুতরাং তত্তৎ দেশে সভ্যতা,
বিদ্যা এবং ধনশালিতার বিস্ময়কর বৃদ্ধি ।

ভারতবর্ষের অবস্থা অন্তরূপ । ভারত-
বর্ষ কোন্ কালে এক সাম্রাজ্য ছিল, ইতি-
হাসেরও তাহা মনে নাই । এখনকার ভা-
রতবর্ষ দেখিয়া বাহা মনে হয়, তাহাতে
মস্তক ঘুরিয়া যায় ।—একাদশ কোটি হি-
ন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা ; তদুপরি বুদ্ধ
দেব, দৈত্যদেব, রামজী, হনুমানজী আ-
ছেন ; বিংশতি কোটি লোকের বিংশতি
প্রকার ভাষা, শতাধিক প্রকার পরিচ্ছদ ।
শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়, বিগত
সহস্র বৎসরের মধ্যে বঙ্গবাসী, বোম্বাই
বাসীর সঙ্গে কোলাহুলি দুরে থাকুক,
বাক্যালাপ পর্য্যন্তও করে নাই ; এখনও
বোজনাস্তরে স্বাধীন রাজা, আর ইহীদের
মধ্যে কেহই আধুনিক নহেন, সূর্য বা চ-
ন্দ্রের সাক্ষাৎ বংশধর । এতদ্ভিন্ন আর্যা,

অনার্য, ব্রহ্ম, ববন, মারহাট্টা, বর্গী— কে নয়? আমাদের সমাজনীতির শিক্ষক; যাহার যে তা'বে ইচ্ছা আমাদিগকে পশুত্ব শিক্ষাইয়া গিয়াছে। তথাপি স্বাধীনতাবাদীরা বলিবেন— ভারতবর্ষ একবর্ষ।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বহুকাল পূর্বে হইতে ছিল না, এখনও নাই; অথচ এ স্বাধীনতার বিনিময়ে ইউরোপ প্রভৃতির তুলনায় আমরা কিছুই পাই নাই। ইহার উত্তম কারণ আছে।—প্রথমতঃ, আমরা স্বাধীনতাই হারাইয়াছি, কিন্তু কোন প্রাণীর অনুরোধে কাহাকেও তাহা অর্পণ করি নাই, স্পর্শতঃ বা ভাবতঃ আমরা কখনই কোন চুক্তিতে পক্ষভুক্ত হই নাই। দ্বিতীয়তঃ, বহুযুগ ধরিয়া আমাদের উপকারের জন্ত কেহ আমাদের রাজা হয় নাই, স্বার্থসাধনের জন্য কেহ দস্যুতাবে আসিয়া দস্যুর মত চলিয়া গিয়াছে, কেহ বা অতিলোভপরবশ হইয়া রহিয়া গিয়াছে। আত্মাতিরিক্ত উদ্দেশ্য কাহারই ছিল না। আমরা কে, ভারতবর্ষ কি, ইহা বুঝি না বলিয়াই এত গণ্ডগোল।

যাঁহার একান্ত জন্মভূমিতত্ত্ব; যাঁহার শুদ্ধ ভারত-নামামৃত্ত অবগাঞ্জলিপুটে পান করিয়া অন্নাতার স্নানিত জঠরজ্বালা-বিস্মৃত হইতে পারেন; স্বদেশ বলিলেই, হিমালয় হইতে কুমারিকা ও পঞ্চনদ হইতে চতুর্দিক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত এই বিশাল ক্ষেত্র যাঁহারের মনোমগ্নের উপরে প্রতি-

কলিত হয়; বেদ বলিলেই একেশ্বরবাদ, নিরীশ্বরবাদ, নিক্সাগমুক্তি, বজী মাথালের পূজা ও সত্য পীরের সির্গী যাঁহারের অন্তরের অন্তস্তলে উদিত হয়; পুরাণের নামে যাঁহারী ত্রিক্ষের মন্ত্রণাকৌশল হইতে বিপিন ক্রক্ষের গগন-মার্গ-বিদারিণী বক্তৃতা ও কুরুক্ষেত্র হইতে পাবনার প্রজাদের দাঙ্গার ধারাবাহিকতা দেখিতে পান,—তাঁহারীও একথা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আর্কোপনিবেশ এই ভারত-ভূমি রাজসূর ও অশমেধ সত্ত্বেও চির দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত, যে এই খণ্ড-রাজ্যমালা বিভিন্ন সময়ে বিবিধ ধর্মবিপ্লবে বিপর্যস্ত; তাঁহারীও স্বীকার করিতে বাধ্য যে রাজনীতিসম্বন্ধে সমগ্র ভারতবর্ষ কশ্মিষ্ কালেও একতন্ত্রাধীন হয় নাই, যে দরবেশ বা সেকেন্দরের আক্রমণে বিদ্ধাচল বা রাজমহলের উপলমালা বিকম্পিত হয় নাই, দক্ষিণে বা পূর্বে ভারত ভারিয়া কেহ অশ্রুপাত করে নাই। এই অনার্য ভারতভূমি যবনের সংস্পর্শ-দূষিত হইবার পরে একবার একটুকু একীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু যে কারণেই হউক, তাহা সম্পন্ন হইয়া উঠে নাই। ভারতের সমগ্র “ভবিষ্যতের উদয়-কন্দরে নিহিত।”

ভারতের বেদ, ভারতের দর্শন, ভারতের কাব্য, ভারতের গণিত এক কালে,— “খুঁজিত সকলে, পুঞ্জিত সকলে ফিনিক, সিরীয়, যুনানী মণ্ডলে।”

একথা সত্য ; কবির এ সকল কথা বলিবার অধিকার আছে ; অতি দূরসম্পর্কেও কৃত্তিব দেখাইয়া মানবচরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করা যায়, আভিজাত্যগৌরব কোন প্রকারে উদ্দীপ্ত করিতে পারিলে মনুষ্যকে উন্নীত করিতে পারা যায় । কিন্তু রাজনীতির কঠোর অঙ্কে উপস্থাপিত করিবার যোগ্য কথা এ সকল নহে । ধর্ম বা বিদ্যার আলোচনার ভারতবর্ষের এক ব্যক্তি বা এক প্রদেশ চরমসীমা দেখাইয়া থাকিলে, আত্মাদের কথা, এবং সেই মূলে স্বজাতীয়তা স্থাপন করিতে পারিলে নব্বলের বিষয় সম্বন্ধে নাই । কিন্তু তাহাতে শাসনতন্ত্র-গত একজাতিত্ব সপ্রমাণ হয় না । এসিয়া খণ্ডে বীশ শ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন, এবং স্বকীয় ধর্মনীতির প্রচার করেন, ইহাও আমাদের পরিতুষ্টি-জনক সংবাদ, কিন্তু তাই বলিয়া জেকসালেম এবং পঞ্চনদের রাজনৈতিক উত্থানপতনের একীকরণ উপপন্ন হইবে না । সমগ্র পৃথিবী মনুষ্যের আবাসক্ষেত্র, অতএব এক এবং অভিন্ন ; যতদিন এই পরমবৈরাগ্য অবলম্বন করিতে না পারিবে, ততদিন প্রাচীন ভারতের একতার কথা মনে করিয়া অদ্য দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবার অধিকার তোমার নাই । ভারতে রাজতন্ত্রবিষয়ে আর্ষ্য, পারসীক, গ্রীক, মোগল, পাঠান, ফরাশী, ইংরেজ সকলই তুল্য ।

সাত শত বৎসর ভারত পরাধীন বলিয়া আজি আমরা হুঃখ করিতেছি ;

কিন্তু মুসলমানের যখন প্রথম অভ্যুদয়, তখন ভারতের প্রাণ কাঁদে নাই, ভারতের বণিক ও কৃষক কবোক্ষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে নাই । তাহার পর, যখন ক্রমে ক্রমে ইংরেজের প্রতাপ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল, তখনও ভারতবর্ষ তদবস্থ । অদ্য এই ইংরেজের রাজ্যে সাঁওতাল, গারো, কুকির যে অবস্থা, ইংরেজ যখন প্রথম রাজ্য-বিস্তার আরম্ভ করিল, তখন আমাদের পূর্বপুরুষগণের রাজনৈতিক অবস্থায় যে বিশেষ প্রভেদ ছিল, এরূপ বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই, বিশ্বাস করা উচিতও নহে ।

ইংরেজ বণিকৃতি, ইংরেজ ধূর্ত, ইংরেজ প্রবঞ্চক, ইংরেজ—তাহাকে বাহ্য বলিবে, তাহাই । কিন্তু সে কথায় আমাদের ইচ্ছাপত্তি কি ? গজনবী মামুদের বা ঘোরীর মত না আসিয়া ইংরেজ বণিকৃতি এদেশে আসিয়াছিল, তাহাতে আমাদেরই লাভ ;—অন্যথা রক্তশ্রোত প্রবলতর বহিত মাত্র । তথাপি স্বকৃতনামা স্বদেশ-বৎসলদের মনে রাখা উচিত যে, ভাব গ্রহণ করিয়া ইতিহাসপাঠে ইহাই বুঝা যায় যে ইংরেজ রাজ্যাভিলাষে প্রথমতঃ এদেশে আইসে নাই । সময়ের তাড়নায় অবস্থার তাড়নায় তাহাদিগকে রাজত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছে । আর ইংরেজেরা এখন যাহার অধিকারী তাহার অধিকাংশই ছলে বা বলে লব্ধ হয় নাই, ইহাও মনে রাখা আবশ্যিক ।

কলতঃ যেখানেই ইংরেজের রাজ্যলাভ ঘটিলে ঋক্ষক, কি নিয়মে সে রাজ্য পরিচালিত হইতেছে ; তাহা দেখা কর্তব্য। নিয়মের পরীক্ষা, ফলে ;—উদ্দেশ্যের পরিচয়, কার্য্যে। বাহার চক্ষু আছে, সেই দেখিতে পারে যে ইংরেজের রাজ্যে অসভ্যতার পরিবর্তে সভ্যতা, মুখতার পরিবর্তে জ্ঞান, দারিদ্র্যের পরিবর্তে ধনবিস্তার, উপদ্রবের পরিবর্তে শান্তি, অন্ধকারের পরিবর্তে আলোক স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন, নির্ভীকচিত্তে, নিঃসঙ্কোচে, ট্যাকে টাকা গুঁজিয়া, ছাতা মাথায়, জুতা পায়, চাষা গ্রামের জমিদারের বিৰুদ্ধে অভিযোগ করিতে যায় ; একশত ব্যক্তি এক শত ব্যয় সুবিচার পাইয়াছে দেখিয়া বিচারককে ধর্ম্মাবতার বলে, ধর্ম্মাবতার মনে করে। এখন, যে গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-পত্র নাই, সে গ্রামকে আমরা দিক্কার করি ; বাঙ্গালা ভাষায় জর্মনীয় পণ্ডিতের বিদ্যা পরীক্ষা করি ; এখন, কস তুরক্ষে যুদ্ধ হইলে ইউরোপের কোন্ রাজার কি পস্থা অনুশরণীয় আমরা তাহার নির্ধারণ করি ; সূর্য্যমণ্ডলের কলঙ্কে শস্য সম্ভাবনার বিচার করি ; এখন, গলায় কস্ফটার, পায়ে মোজা না থাকিলে আমাদের সন্দী হয় ; ভদ্রলোক আমাদের বাচীতে আলিয়া আমাদেরিগকে অনারিত দেখিলে, আমরা উলঙ্ঘ মনে করিয়া লজ্জিত হই ; এখন, কাগজে লিখিয়া রাজরাজেশ্বরকে অপদস্থ করি ; বক্তৃতা করিয়া জ-

গৎ উত্থাদিত করিয়া তুলি। অধিক কি, কএক বৎসর মাত্র ইংলণ্ডীয় গুণকর পদপ্রাপ্তে জ্ঞান চর্চা করিয়া, গুণকে বিদ্যায় পরাভব করিতে পারি না বলিয়া, গান্ধার্ব্যলায় জলে ডুবিয়া মরিতে বাই !—জিজ্ঞাসা করি, এই সমস্ত কাহার প্রসাদাৎ ? তোমার ভারতের ইতিহাসের কোন্ স্থলে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া এইরূপ আর একটি চিত্র তুমি দেখাইতে পার ?

তথাপি আমরা স্বাধীন হইব ! আমাদের অপেক্ষাও মুখ ভারতবাসীকে এহেন রাজারও বিদ্রোহিতা করিতে উপদেশ দিব ! রাজদ্রোহিতা শিখাও তাহাতে তত দুঃখ নাই, কিন্তু তুমি যে এখনও বালক, এখনও শিক্ষানবীশ। এ গুণ মহাশয় হয়ত মরিতে পারেন, কিংবা গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে পারেন, কিন্তু কর্তা যে এখনও জীবিত। আগে সংসারের ভার গ্রহণ কর, গৃহস্থ হও, তখন গুণ মহাশয়কে পেন্সন দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা থাকে দিবে ; না দাও, তিনি চলিয়া যাইবেন। এখন উত্তলা হইও না।

উপরে যাহা বলা গেল, একবার তাহার ফল স্থির করা যাউক। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষ কখনও এক সাম্রাজ্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না, সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অর্থ নাই। ইংরেজ যে স্বত্র অবলম্বন করিয়া রাজ্য করিতেছেন, তাহাতে ভারতের একতা সম্পাদন সম্ভবপর ; একতা সংসাধিত হইলে মঙ্গলের আশা করা

যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজের রাজত্বে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিলম্বন রূপে হইতেছে। এখনও ভারতবর্ষে যে সকল স্বাধীন উপরাজ্য আছে, সেখানকার প্রজাদের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে বিশেষরূপে ইহা উপলব্ধ হইবে। তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এক্ষণে যে রূপ প্রসার, পূর্বে এমন ছিল না। চতুর্থতঃ, রাজনীতি সম্পর্কে আমরা এখনও বালক; আমাদের রাজনৈতিক পুঙ্ক্তিসাধন আবশ্যিক এবং ইংরেজের দ্বারা তাহা সাধিত হইতেছে। স্তরতঃ ইংরেজের অধীনতা আমাদের বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষার প্রধান উপকরণ গুরুভক্তি। গুরুর প্রতি ভক্তি না থাকিলে, তাঁহার উপদেশে শ্রদ্ধা না থাকিলে, তাঁহার কথায় আস্থা না থাকিলে, বিদ্যালাতের কিংবা জ্ঞানোপার্জনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। রাজনীতিতে ইংরেজ সাক্ষাৎস্বয়ং আমাদের গুরু; অতএব তিনি যখন বলেন যে ভারতবর্ষের উপকারের নিমিত্তই তিনি প্রয়াসী, তখন সে কথার মর্মগ্রহণ করিতে না পারিলেও তোমার বিশ্বাস করা কর্তব্য। যে সূত্রে ইংরেজ ভারতের রাজতন্ত্র পরিচালন করিতেছেন, তাহার আমূলপ্রান্ত ধারণা করিবার শক্তি ভারতবাসীর এখনও হয় নাই। তথাপি গুরুর কর্তব্য কর্ম ইংরেজ করিতেছেন,— যে যন্ত্রে যখন ভারতবাসীকে দীক্ষিত করেন, তাহার উদ্দেশ্য, তাহার পরিণাম,

তাহার উপকারিতা এবং তাহার প্রয়োগার্থতা বুঝাইবার যত্ন করিয়া থাকেন; এবং বুঝিতে না পারিলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারিবে বলিয়া ইংরেজ ভারতবাসীকে বচন-স্বাধীনতা প্রদান করিতেছেন। অসঙ্কোচে যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর, যেখানে তোমার সন্দেহ হয় ভঞ্জন করিতে বল, সঙ্কটচিত্তে ইংরেজ তাহা শুনিতেন, শুনিবেন। কিন্তু অভক্তি প্রদর্শন করিলে কেন তিনি বিরক্ত হইবেন না? মুষ্টিতা দেখাইলে কেন তোমার কথায় কর্ণপাত করিবেন? তুমি যে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পাও, ইহা ইংরেজের দয়ার গুণে; তুমি যে দয়ার পাত্র, তুমি যে অনুগৃহীত হইলে যথোচিত আচরণ করিতে জান, তাহা কেন দেখাইবে না? আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা যেরূপ তাহাতে ইংরেজরাজকে,—

“মহতী দেবতা হোমা নররূপেণ তিষ্ঠতি” মনে করিয়া এবং এই শাস্ত্র-বচন সর্বদা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আচরণ করাই আমাদের উচিত, আমাদের আবশ্যিক, আমাদের পরম ধর্ম।

অতএব, ইংরেজ যখন আমাদের গুরুস্থানীয়, ভারতবর্ষে ইংরেজের স্থায়িত্ব যখন সর্বথা আমাদের কাম্য, তখন তাহাতে আমাদের ভক্তিভাব অবিচলিত থাকিতে পারে, আমাদের প্রেমভাব দিন দিন প্রবলতর হয়, আমাদের মাধুর্যমিশ্রিত মমতার ভাব ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হ-

ইয়া উঠে, তদ্বিষয়ে সর্বথা আমাদের বক্তৃ-
শীল হওয়া অবশ্য কর্তব্য। সকল লো-
কের বিদ্যাবুদ্ধি কখনই সমান হইতে পা-
রেনা; সেই জন্য সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীল
বলিয়া যাহারা পরিচিত সেই উপরিতন
দেশের কথায় নিম্নতর স্তরের ব্যক্তিরূদ্ভ বি-
শেষ আস্থা স্থাপন করিয়া কার্য করে।
সুতরাং যাহাতে রাজপুরুষবর্গের সাধু
এবং অকৃত্রিম মারলাপূর্ণ অভিপ্রায়ের
প্রতি সন্দেহ আরোপিত হয়, তাহা করা
সেই দেশের পক্ষে মহাপাপ, তাহাতে
বিশেষ ক্ষতি এবং অনিষ্টের সম্ভাবনা।

আমরা গুণবাদী নহি; সকল বস্তুর
সুন্দর অংশই বাছিয়া দেখি, তাহা নহে।
যাঁহারা আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা স-
ম্বন্ধীয় উপরি ন্যস্ত কথা গুলিতে গুণবাদি-
তার লক্ষণ দেখিবেন, তাঁহাদিগকে এই
মাত্র বলিতে পারি যে, অপ্রিয় হইলেও
অনেক সময়ে সত্য কথা বলা আবশ্যিক,
এবং—

“ হিতং মনোহারিচ স্তুল্লভং বচঃ। ”

তথাপি আমরা স্বীকার করি যে, কল্পি-
তই হউক বা বাস্তবই হউক যে সকল দুঃ-
খের কাহিনী ভারতবর্ষের সর্বত্র আজি
কালি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার সমু-
দয়ই ঈর্ষা, দাস্তিকতা বা অসদভিসন্ধি-
জুস্তিত নহে। কিন্তু অজ্ঞতার পরিচয় অ-
ধিকাংশ ক্ষেত্রে দেদীপ্যমান, ইহাও সহ-
জেই বুঝিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষের দুঃখের গীত যাঁহারা গা-

হিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে এক সম্প্র-
দায়ের মনের ভাব এইরূপ যে তাঁহারা
ইংলণ্ডের প্রজাবর্গ এবং ইংরেজাধিকৃত ভা-
রতবর্ষের প্রজাবর্গের রাজনৈতিক অধিকার
এবং স্বত্বের সর্বাক্রম সমতার অভাবে
পক্ষপাতিতার প্রমাণ দেখিতে পান, এবং
তাহা ন্যায়াসমোদিত নহে বিবেচনা ক-
রিয়া অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া থাকেন।
তাহার ফলে রাজভক্তির যে কিয়ৎপরি-
মাণে লাঘব হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই।
কিন্তু আমরা ইহঁদের খেদের কারণ বু-
ঝিতে পারি না। ভিন্নপক্ষাক্রান্ত, ভিন্ন-
ক্ৰটিসম্পন্ন, ভিন্ন-সভ্যতা-প্রবর্তিত রাজা
ভারতবর্ষের নিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা সং-
স্থাপন করেন, তাহার অধিকাংশই পরী-
ক্ষোদ্ভিষ্ট; ইংরেজ স্বদেশে যাহার গুণ-
বত্তা দেখিয়াছেন, যাহার উপকার বুঝি-
তেছেন, স্বভাবতই এদেশে সেই নিয়মের
বা সেই কার্যের ফলবত্তা দেখিতে বাঞ্ছা
করেন; কিন্তু তাহার উপযোগিতার বি-
ষয়ে যে আদৌ তাঁহারা সন্দেহান হইবেন
ইহাও স্বভাবসিদ্ধ। সেই জন্য প্রবর্তিত
ব্যবস্থা নিত্য পরীক্ষা করিয়া সময়ে সময়ে
তাহার সঙ্কণ্ডন বা সম্প্রসারণ করিতে
বাধ্য হন। আমরা ইংলণ্ডের ইতিহাস,
ইংলণ্ডের সাহিত্য, ইংলণ্ডের সমাজনীতিতে
লালিত এবং পালিত; ভারতবর্ষের আ-
ভ্যন্তরিক অবস্থা জানি না বলিলেও চলে।
ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের সহিত আমাদের যে
সহানুভূতি, তাহাও সেই বিজাতীয় শিক্ষা-

প্রণোদিত । সুতরাং উত্তর দেশের প্রকৃ-
তিগত বৈলক্ষণ্যের প্রতি সমুচিত দৃষ্টি না
রাখিয়া সহসা রাজনৈতিক বৈষম্যে বি-
রক্তি প্রকাশ করি ; ইংলণ্ডে যাহাঁ ভাল,
এখানেও তাহাই ভাল, এই এক ভ্রান্ত সি-
দ্ধান্ত দ্বারা রাজকীয় কার্যকলাপের সমা-
লোচনা করি । গতিকেই আমাদের অ-
সন্তোষ । ইতঃপূর্বে যাহা বলিয়াছি, এ-
খানে তাহা প্রতিপন্ন হইল ; আমাদের
অজ্ঞতার জাজ্বল্যমান উদাহরণ এই স্থলে
পাওয়া গেল । ইংলণ্ডের প্রজা যে কথায়
জাতস্বত্ব বলিয়া আশ্ফালন করে, যাহার
সঙ্কোচ দেখিলে বা আশঙ্কা করিলে খজা-
হস্ত হইয়া উঠে, সেই কথাতে আমাদের
ওজপ উল্লেখ বা উক্তি নিতান্ত হাস্যজনক
এবং নিতান্ত উপেক্ষণীয়, ইহা অনেকেই
বুঝেন না । তবে এই সকল পরীক্ষোদ্দিষ্ট
স্থলে আমাদের মতামত ব্যক্ত করিবার
আবশ্যিকতা আছে ; শাস্ত্রভাবে ভক্তি-
পূর্ণ বাক্যে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা
বলি উচিত । ইংরেজ আমাদেরকে একরূপ
স্থলে বলিবার অধিকার দিয়াছেন ; সে
অধিকারে এখনও হস্তক্ষেপ করা হয় নাই ;
কখনও হইবে বলিয়াও বোধ হয় না ।

অন্য এক সম্প্রদায়ের দ্রুৎকারী, নি-
য়ম এবং যাহার উপর সেই নিয়মের প্র-
য়োগ পরীক্ষার ভার আছে, সেই ব্যক্তির
প্রভেদ করেন না বা করিতে জানেন না ।
কর্কট মার্জিষ্ট্রেট এবং ফৌজদার আইন
ইহারা এক এবং অভিন্ন বিবেচনা করেন ।

যে লর্ড লিটন, কুলার্ ব্যাপারের মন্তব্য
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনিই আবার
মুদ্রণ আইন উপলক্ষে তথাবিধ বক্তৃতা
করিতে পারেন, ইহাঁও তাঁহারা বুঝিতে
পারেন না । ফলতঃ এই সম্প্রদায়ের লো-
ককে বুঝাইবার প্রয়োজনও নাই ; ক্ষেত্র-
ভেদে প্রয়োগ-ভেদ, এবং ফল-ভেদ হয়,
আপনা আপনি যে ইহা দেখিতে পার
না, সে অন্ধ ; তাহার পক্ষে আলোকেও
অন্ধকারে প্রভেদ নাই । তথাপি একটি
কথা বলিয়া রাখা আবশ্যিক ; অযুত কর্ম-
চারী লইয়া এই সাম্রাজ্য চালাইতে হয় ;
সুতরাং কচিৎ কৃত্র ব্যক্তিবিশেষের ভ্রম-
প্রমাদ হইবে, ইহা কেবল যে সম্ভব তাহা
নহে, প্রত্যুত গৌরবেরই বিষয় ; এবং এই
সকল ভ্রমপ্রমাদের শাসন বা সংশোধনে
আত্যন্তিক কঠোরতা প্রদর্শন না করিয়া
যে, অপেক্ষাকৃত সদরূচরণ দেখান হইয়া
থাকে, ইহা উচ্চতর রাজপুরুষবর্গের বি-
জ্ঞতা এবং মহানুভাবতারই পরিচায়ক ।
রাজ্যরক্ষা শিশুর ক্রীড়া নহে । যে সকল
ব্যক্তি উল্লিখিত দোষ প্রদর্শন করেন, তাঁ-
হারা যদি অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া দোষের
গুরুত্বানুসারিণী কথা বলেন, রাজপুরুষবর্গ
কখনই সে কথায় অবজ্ঞা করিবেন না ।

অতএব স্থূলতঃ দেখিতে গেলে স্বাধী-
নতাবাদীদের কথা যে প্রকার অসার
এবং অগ্রাহ্য, যাহারা ইংরেজায়িত, এবং
যাঁহারা সূত্রগত ও ব্যক্তিগত কার্যের প্র-
ভেদনির্কাচনে অক্ষম, তাহাদের কথাও

সেইরূপ অযৌক্তিক। কিন্তু ইহাদের অ-সন্তোষ এই অবধি ক্ষান্ত হইলেই ক্ষতি ছিল না। ফলতঃ তাহা না হইয়া ইহাতে প্রকৃত বিপদের আশঙ্কা আছে।

ইউরোপে, মধ্য এশিয়াতে, এবং ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমায় এইক্ষণে সত্য সত্যই রাজনীতি-সঙ্কট উপস্থিত। ভারতবাসী রাজনীতির কথায় এখনও নিতান্ত শিশু, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। স্মৃতরাং এখন কোন কথা কহিতে হইলে দ্বিগুণ সাবধানতার প্রয়োজন। তদ্বিপরীতে আমাদের অসত্য বা অসম্যক্ তত্ত্ববার্তা এবং অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিয়া আজি কালিকার বিষম সমস্যা পূরণ করিতে গিয়া, আমরা যদি হঠকারিতার পরিচয় দেই, যদি ইংরেজরাজের অধার্মিকতা, ভীকতা, দুর্বলতা, স্বার্থপরতা, শোষণকতা, রাজপুরুষগণের পক্ষপাতিতা, অত্যাচারপরতা; আর সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, ভারতবর্ষের পূর্বতন কম্পিত গৌরবকথার প্রলাপবচনে প্রজাবর্গকে উত্তেজিত, ভক্তিশূন্য, এবং বিপ্লবপ্রিয় করিবার জন্য ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক পন্থা প্রদর্শন করি, তবে ইংরেজের হস্তক্ষেপ করা অবশ্য কর্তব্য। আজি কালি যখন চিরদিনাপেক্ষা অধিকতর রূপে শান্তির প্রয়োজন, তখন অকুরেই উপদ্রবের বিনাশসাধন, ইংরেজের একান্তই উচিত। না করিলে রাজধর্মের অপলাপ হইবে, আমাদের সর্বনাশ হইবে।

তিন শ্রেণীর লেখককে লক্ষ্য করিয়া মুদ্রণ-ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথম, যাহারা স্পষ্টতঃ, বা পাকতঃ ইংরেজরাজকে অত্যাচারপরায়ণ, শোষণক, পক্ষপাতকলুষিত, ভীম ইত্যাদি বিশেষণ দিয়া অপদম্ব এবং সম্মানচ্যুত করিতে বস্তু করে; দ্বিতীয়, যাহারা ইংরেজ ও ভারতবাসী হিন্দু ও খৃষ্টানকে পরস্পরের প্রতি জাতিবৈরের পন্থা প্রদর্শন করে, একজন বা দশজন দুরাচারের ব্যবহার দেখাইয়া সমগ্র জাতির নিন্দাবাদ করে, এবং ব্যক্তিবিশেষের কথা তুলিয়া শেষে কুলে কালি দিতে যায়; তৃতীয়, যাহারা অনুগ্রহ-লব্ধ এই মহাস্ত্র পাওয়া, তাহার অপপ্রয়োগ করিয়া স্বার্থসাধনের জন্ত ভয়প্রদর্শন বা উৎপীড়ন করে। এই নীচরক্তি, লম্বুচেতা, কাপুরুষ লেখকদিগের উল্লেখ করিলেই, ইহাদের জঘন্যতার যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া হয়। বাস্তবিক ইহারা সমাজের কণ্টক, মনুষ্যমানমের মানি মাত্র। ফলতঃ উপরে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহাতে এই তিন শ্রেণীর লোকেরই যে দমন হওয়া আবশ্যিক, বোধ করি সমদর্শী ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছি। ব্যবস্থার সম্পাদন যে সর্বোচ্চ সুন্দর হইয়াছে, তাহার কোনও অংশে দোষ নাই, অভাব নাই, বা বাস্তব নাই, তাহা আমরা বলিতেছি না। তবে ইহার সূত্র লইয়া বিবাদ করিবার অধিকার নাই, গণগোল করা অ-

ন্যায়, একথা আমরা বার বার বলি । ষাঁ-
হারা ভারতবর্ষের হিতকামনার ছলে আ-
শ্ববিনাশ সাধন করিতে বসিয়াছেন, প্রজা-
স্বন্দের গলে ছুরিকা বসাইতে উদ্যত, তাঁ-
হারা শঙ্কিত হউন, সাবধান হউন ;—
ষাঁহাদের লেখনী গরলপ্রসবিনী, ভারত-
বর্ষের শিরায় শিরায় ষাঁহারা বিষ ঢালি-
তেছেন, তাঁহারা শঙ্কিত হউন, সাবধান
হউন ;—ষাঁহারা রোঁজ-তণ্ড অথচ লঘুতৃণ-

সদৃশ ভারতবাসীর চিত্তে অগ্নিসংযোগ
করিতে ব্যগ্র, ভারতবর্ষ ছার খার করিতে
উপস্থিত, তাঁহারা শঙ্কিত হউন, সাবধান
হউন । অন্য কাহারও শঙ্কার কারণ নাই,
ক্রোধের কারণ নাই, দুঃখের কারণ নাই,
এবং স্বকীয় কুম্বকোমল মুখশয্যার কু-
ম্বকোমল ক্রোড়দেশ পরিত্যাগ করিয়া
রূপা ভাবনার শুষ্ক হইবার কারণ নাই ।
(উকীল)

—

আশ্রা

আশ্রার বাহা কিছু মাহাত্ম্য, এই স-
ময় হইতেই তাহার স্বত্রপাত হয় । এই
সময় হইতেই ইহার উন্মেষিত যৌবন-গন্ধ
নানা রাজ্য হইতে ভ্রমরনিবহ স্বরূপ বি-
বিধ প্রকারের লোককে ঝাঁকে ঝাঁকে
অন্ধ করিয়া আনিতে থাকে । কত আমির,
কত ওমরা, কত সাহেব, কত পাদরী, কত
ফকীর, কত সন্যাসী, কত পণ্ডিত এবং
কত ছদ্মবেশী এই সময় হইতেই ইহার
লক্ষ্মীপ্রদ পাংশু রাশিতে মস্তক অলঙ্কৃত
করিয়া ঘাটে, পথে, মাঠে, আলয়ে ও
গলিতে গলিতে ঘটিকাস্থ দোলক যন্ত্রের
ন্যায় ইহার সর্বত্র বিহুলিত হইতে থাকে ।
এই সময় হইতেই ইহার ভূত-বিলীন অধি-
বাসীরা প্রতি রাত্রে সুরগা, নফীর ও নাক্
কারার মূহল মধুর অভিধাতে নিম্বিত হ-
ইয়া বিশাল দামামা ও করতালের সঘন-

গভীর গর্জনে প্রভাতে জাগরিত হইতে
থাকে । এই দিন হইতেই আশ্রা কিয়ৎ-
কালের জন্য প্রাসাদ-মুকুট-শ্রেণীস্থ সুরণ
কলসে ঝলসিয়া সমস্ত পৃথিবীতে বিস্ম-
য়োৎপাদন করে ; এবং এই সেই দিন,
যে দিন হইতে ইহা দূর দূরস্থ চক্রবর্তীদি-
গের নিকটে সুপরিচিত হইয়া মোগল-
শরীরে ভারতের ঐশ্বর্য-গর্ভ বিস্তার ক-
রিতে থাকে । এখন বাহা কবিদিগের ক-
ল্পনা স্বপ্নেও চিত্র করিতে পরাস্ত হয়,
কিছু দিন পূর্বে তাহাই সত্য ঘটনারূপে
ইহার বক্ষঃসরোবরে ভাসমান ছিল ।
ইহার রেণুপরিণত অট্টালিকামালার গ-
বাক্ষপংক্তি চতুর্দিকে প্রায় দিবা রাত্র
মোগল সন্দরীদিগের মুখপদ্মে চিত্রিত থা-
কিত । সেকালে কিছু দিনের জন্য সমস্ত
ভারতের বিদ্যাবুদ্ধি এই খানেই সমবেত

ভাবে সমাসীন ছিল। এই বিদ্যা এবং এই বুদ্ধির কপিকা মাত্র কর্বণে কি সংস্পর্শনে লোকে তখন আজিকার মতই গর্ভিত হইত, অন্য বুদ্ধি কি বিদ্যা সহজরূপে উৎকৃষ্ট হইলেও লোকে তখন এ বিদ্যার নিকটে তাহাকে উৎকৃষ্ট দেখিত না। মাতৃভাবার যে আসন, তাহা প্রায়লোকেরই রসনাবেদিতে আজিকার ন্যায় সজীর্ণদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখানকার রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, বেশ ও ভূবাদের তরঙ্গমাল্য ভারতের ঘরে ঘরে ব্যাপ্ত হইয়া এক সময় হুলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছিল। এখানেও কোন সময় মোগলমস্তিষ্কের প্রতিভা হইতে নূতন ধর্ম আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ধর্মসংহিতা রচিত হইয়াছিল, প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছিল, প্রচারিত হইয়াছিল এবং শিষ্যোপশিষ্যাদি দ্বারা ধরাতল বিলুপ্ত হইয়াছিল। “আল্লাহ আকবর” এই দ্ব্যর্থ নাচক ধ্বনি কোন সময় লোকের মুখগর্ভে দৈনিক সম্ভাষাতে এখানেই প্রথমে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। দেবতা হইয়া লোকের ভক্তিমঞ্চে আসীন হইবার আশা এক সময়ে এখানকার সিংহাসন হইতেই লতাকারে উশ্খিত হইয়া আকাশ বেষ্ঠন করিতে চাহিয়াছিল। আজিকার লোকেরা যেমন আজিকার স্থান বিশেষে আজিকার শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া আছে, কোন সময়ে কোন সময়ের লোকেরাও সেইরূপ এই বিশেষের শিল্পাদি দেখিয়া নির্বাক

হইয়া স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিয়াছিল। আজি যেমন নগরবিশেষে সমস্তই সাহেবানা, কোন সময়ে এখানেও সমস্তই মোগলানা ছিল। এই দিনে যেমন লোকেরা, সমুদয় বাগান, ভিটি ও বসতির বাটী বিক্রয় করিয়া সমুদ্র সত্তরণান্তর দ্বীপবিশেষে বাইয়া যে ফল লাভ করে, সেই দিনেও লোকেরা সেইরূপ সর্বস্বান্ত পণ করিয়া একবার গঙ্গা ও যমুনা বাহিরা এখানে আসিতে পারিলে সেই ফল লাভ করিত। পাঠকবর্গকে আর অনর্থক ভাবার ব্যাপকতা দ্বারা উত্তাক্ত না করিয়া সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, কোন সময় সমস্ত ভারতের সুখ দুঃখ বিতরণের ভাঁড়ার কিয়ৎকালের জন্ত এইখানেই সংস্থাপিত ছিল। কোন সময় ইহার এক খানি ইস্টকমণ্ড এক দিবসে যে ব্যাপার দর্শন করিয়াছে, আজি তাহা এক ব্যক্তি এক মাস বসিয়া লিখিয়া শেষ করিতে পারে কি না সন্দেহ। অতএব আমি আমার অসহায় অবস্থায় ইহার প্রাচীন এবং নবীন অবস্থা সম্বন্ধে ষতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা ক্রমে পাঠকবর্গের নিকটে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

প্রাকৃতিক অবস্থা।

আগ্রা হিমালয়ের প্রসারিত পাদপত্রের ক্রমনিম্ন ভূমির উপরে সংস্থাপিত এবং সমদ্রবক্ষঃ হইতে ৫৫০ ফুট উচ্চ। বাঙ্গলা দেশ সমুদ্রের বক্ষঃস্থল হইতে

যত খানি উচ্চ, তাহা ইহা হইতে বিরোধ করিলেই পাঠকবর্গ অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে, বঙ্গের নগরাদির সহিত তুলনা করিলে উচ্চতায় এস্থান একটি অনতিদূরত্ব পর্যন্ত সদৃশ। সিকিম-শৈল-শ্রেণীর পাদদেশে নিম্ন আসাম প্রভৃতি স্থান এখান হইতে ২৫০ ফুট নিম্ন, এবং সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি স্থান ৪০৫ ফুট; হাতের পরিমাণে ২৭০ হাত नीচে। কলিকাতা, বাথরগঞ্জ প্রভৃতি স্থান যে আরো কত नीচে, তাহা ইহা হইতেই অনায়াসে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সাধারণে এই বিশ্বাস যে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, হিমালয়ের পদতলস্থ একটি সামান্য সমতল উচ্চ ভূমি মাত্র। আমাদেরও পূর্বে এই বিশ্বাসই ছিল; কিন্তু এখন জানা যাইতেছে যে, ইহার উত্তরপশ্চিমে যমুনা এবং শতদ্রুর মধ্যবর্ত্তি ক্ষেত্র এখান হইতে আরও ৩৬৩ হাত উচ্চ। অতএব ইহা হইতে এই দেখা যায় যে, হিমালয় যেন সপরিবারে ভারতের মস্তকে দক্ষিণায়া ইয়া বসিয়া বঙ্গাভিমুখে পদধর প্রসারিত করিয়া আছে, এবং তাহার পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগে নখ-রেখা সদৃশ বঙ্গভূমি সমুদ্রতটে অবস্থান করিতেছে।

আগ্রা বিভাগে ইটাওয়া, মইনপুরী, ফরকাবাদ, এটা এবং মথুরা এই কয়টি প্রদেশ আছে। ইটাওয়া আগ্রা হইতে লৌহবস্ত্র ৭৩ মাইল ব্যবধানে কিঞ্চিৎ পূর্বদক্ষিণে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে

রেলপথে আগ্রা আসিবার কালে ইটাওয়া স্টেশনের মধ্যদিয়া উত্তরপশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইতে হয়। ইটাওয়ার সহর, ইটাওয়ার রেল স্টেশন হইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে থাকে। সহর হইতে আবার যমুনা, প্রায় মাইল দুই দক্ষিণ দিয়া পূর্বদক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। এস্থান আগ্রা বিভাগের মধ্যে স্বাস্থ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। অনেক কক্ষালাবিশিষ্ট বান্ধালি বাবুরা দেশের জল বায়ুর উৎপাতে উৎপীড়িত হইয়া শরীর সংস্কারের জন্য অনেক সময় এস্থানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। গ্রীষ্মকালে আগ্রা যত গরম হয়, এস্থান তত হয় না; এবং ইহার বায়ুতে আগ্রা অপেক্ষা স্নিগ্ধতা কিঞ্চিৎ অধিক আছে বলিয়াই ইহার সহবাস অনেকের মনোরম। ইহাতে স্নিগ্ধতা থাকিবার বোধ হয় আর কোন কারণ নাই; কেবল এই কারণ যে, ইহার উত্তর পার্শ্বেই মইনপুরী প্রদেশ। এই মইনপুরী প্রদেশের দেশের মধ্যদিয়া অনেকগুলি কৃশাঙ্গী নদী পূর্বদক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, এবং তাহার গাত্রের অশ্রান্ত ভাগ কতকগুলি ঝিল ও হ্রদে, খচিত আছে। মইনপুরী আগ্রা হইতে রাজবস্ত্র প্রায় ৭০। ৮০ মাইল পূর্বদিকে। ইটাওয়া হইতেও যাইবার পথ আছে, লৌহবস্ত্র নাই। এস্থান আমাদের কাছে এক বিষয়ে একান্ত মনোহর। এখান হইতে আমরা কখন কখন ঝিলজাত মাগুর ও শিঙ্গীমৎস্য পাইয়া থাকি। যদিও তাহা আয়তনে ৫

আদে জম্মুভূমির মৎস্য হইতে অনেকাংশে নিরুফ্ট, তথাপি অবসরের সাদৃশ্য আছে বলিয়া উহার অভাবাংশ সকল আহার সময়ে কপ্পনাসাহায্যে পূরণ করিয়া লই। দেশীয় মৎস্য অনেক দিন হইল দেখি না, এই বলিয়াই উহাতে আমাদের এত আদর। মইনপুরীর পূর্বোক্তর ফরকাবাদ। এই প্রদেশ গঙ্গা নদীর উত্তর তটে বিস্তৃত। ফরকাবাদের সহর গঙ্গার তট হইতে প্রায় ৩।৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। আগ্রা হইতে রাজবন্দে প্রায় ১০০ মাইলেরও অধিক দূর ব্যবধানে। ইহার সহিত আমাদের এক রাজস্ব ব্যতীত আর কোন বিশেষ বনিষ্ঠতা নাই। ফরকাবাদের পর এটা। এটা আগ্রা হইতে কিঞ্চিৎ পূর্বোক্তর এবং রাজবন্দে প্রায় ৫০ মাইল হইতেও অধিক দূরে। এক রাজ্যীয় সম্পর্ক ভিন্ন এস্থানের সহিতও আমাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ইহার পর মথুরা। মথুরার সহর আগ্রা হইতে পশ্চিমোক্তরে রাজবন্দে প্রায় ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার সহিত তীর্থ সম্বন্ধে আমাদের অতি বনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিছু দিন পূর্বে যাত্রীরা আগ্রা হইয়া উটের গাড়ীতে ইহাকে দর্শন করিয়া যাইত এবং পথে দম্ব্যকর্তৃক সর্বস্বাপহৃত হইয়া অনেক সময় অশ্রমুখে পদব্রজে মথুরা ও রম্ভাবন হইতে প্রত্যারত হইত। আজ কালি লোহবন্দে হওয়াতে লোকেরা সে উৎপাত হইতে সর্বতোভাবে রক্ষা পা-

ইয়াছে। ইংরেজদিগের শাসিত রাজ্যে এত দম্ব্যভয় কিরূপে সম্ভবে, ইহা ভাবিয়া পাঠকবর্গ বোধহয় কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যাম্বিত হইতে পারেন। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্যের কোন কারণ নাই। মথুরার রাজবন্দে কিয়দংশ ভ্রতপুরের এলাকা মধ্যে পড়িয়াছে। দম্ব্যরা সর্বদাই এই সন্ধিস্থানে থাকিয়া আপন আপন অভীষ্ট সাধন করে। যদি রাজার শাসন উৎকৃষ্ট হইত, তাহা হইলে এরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এদেশীয়দের নিতান্ত হ্রদৃষ্টিবশতঃই তাহা না হওয়াতে যাত্রীদিগকে অতিশয় কষ্ট পাইতে হয়। আজ কালি যাত্রীদিগকে আর এ ভাবনা ভাবিতে হয় না। এখন যেমন আগ্রা না আসিয়া বরাবর কলিকাতা হইতে বাষ্পীয় শকটে হোষ্টাস্ ফেশন দিয়া স্বতন্ত্র লোহবন্দে এককালে মথুরায় যাইয়া উপস্থিত হওয়া যায়, সেরূপ আবার আগ্রা হইয়াও রাজপুতনার বাষ্পীয় শকটে স্বতন্ত্র শাখা লোহবন্দে মথুরায় যাওয়া যায়। মথুরা কখন কখন কুটুম্ব হস্তে আমাদের পেরা ও খুবচুঙ্গরূপ মিফার যোগাইয়া থাকে। খুবচুঙ্গ চিনিতে পাক করা হুঙ্কের টাঁচি। আর মথুরার পেরা এইজন্য প্রসিদ্ধ যে, ইহা যুগান্তেও নষ্ট হয় না এবং ছুড়িয়া ফেলিলে দম্ব্যর মস্তকও ভগ্ন করা যায়। প্রবাদ আছে যে, মথুরাবাসী চৌবে ব্রাহ্মণেরা ইহার ৬।৭ সের অনায়াসে আহার করিয়া উঠে।

আগ্রাবিভাগের দক্ষিণ সীমা ধৌলপুর, গোয়ালিয়র এবং জ্বালাউন্। পূর্ব-সীমা কানপুর এবং অযোধ্যা বিভাগের অন্তর্ভুক্তী হরদোই প্রদেশ। উত্তর সীমা সাজিহানপুর, বদাওন, আলিগড় এবং পঞ্জাবের অধীনস্থ গুড়গাঁও। পশ্চিম সীমাতে রাজপুতনার অন্তর্গত ভরতপুর।

আগ্রা যমুনার পশ্চিমতটে অবস্থিত। যমুনা হিমালয় হইতে নিঃসৃত হইয়া ইহার উত্তরপশ্চিম দিয়া আসিয়া নগরের পাদদেশ ধৌত করিয়া বালগতিতে পূর্বদক্ষিণাভিমুখে দাবিত হইয়াছে। ইহার গতি এক এক স্থানে এত বক্র হইয়া গিয়াছে যে, সেই বক্রের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব আসিতে কোথাও বা ২০ মাইল, কোথাও বা ১২ মাইল এবং কোথাও বা ৬ মাইল পথ ঘুরিয়া আসিতে হয়। প্রভাতে একস্থান হইতে নৌকা খুলিয়া আসিয়া, সন্ধ্যার সময় নৌকা লাগাইয়া দেখে যে, সেই স্থানেরই অপরদিকে মাত্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই কারণেই বোধ হয়, আমাদের দেশীয় লোকদিগের নৌকাপথে আসিতে এত বিলম্ব হইত। যমুনা আমাদের একমাত্র জলাশয়। ইহারই আশ্রয়ে আমরা দাক্ষিণ্যের পশ্চিমোত্তরীয় আশ্রয়বাস্তে জীবন ধারণ করিয়া থাকি; তন্ময় হইয়া যাই না। জম্বুজমির সাগর-নিভা তটিনী সকলের জন্মটি আমরা ইহারই ক্রশাজোপরিস্থ মন্দ মন্দ বীচিলহরী দেখিয়া অনেক

সময় এককালে বিন্দু হইয়া যাই। ইহার তটস্থ বিলক্ষণ উচ্চ এবং স্থানে স্থানে গ্রামসীমান্তিত শ্যামল বৃক্ষাদি দ্বারা ভূষিত হওয়াতে দূর হইতে যেন মনোহর কেলিশৈলশ্রেণীর ন্যায় দেখায়। তটস্থিত ভূমি উত্তর পার্শ্ব হইতে দিকে অনেক দূর পর্যন্ত দূর দূরস্থ উচ্চভূমি সকল হইতে আনীত বর্ষাকালীয় জলপ্রবাহ সকলের দ্বারা একরূপ গভীর ভাবে বন্ধুর হইয়া গিয়াছে এবং নানাদিক হইতে আগত সেই সকল পয়ঃপথের পরস্পর সঙ্গম দ্বারা একরূপ বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার প্রতিক্রম মানচিত্রে দেখিলে, যেন তাহা যমুনার শাখাপ্রাখাবিশিষ্ট তনুকহরাজীর ন্যায় বোধ হয়। এক এক স্থানের পয়ঃপ্রণালী এত গভীর ও দীর্ঘ যে, তাহাতে দুই তিন সহস্র সৈন্য অনায়াসে লুকায়িত হইয়া থাকিতে পারে। নানাদিক হইতে নানা পয়ঃপথ আসিয়া নানাভাবে মিলিত হওয়াতে ইহাদের গতি এত বিভিন্নপথগামিনী হইয়াছে যে, কোন অপরিচিত ব্যক্তি ইহার মধ্যে নামিলে সহজে বাহির হইতে পারে না। অনেক সময় পথ না পাইয়া যুড়িতে থাকে। এদেশের প্রায় নদীর তটই এইরূপ রেভাইন্ড জাল (Revolving) দ্বারা বন্ধুরীকৃত হইয়া আছে, বৃষ্টি হইবামাত্রই এই সকল পথ আশ্রয় করিয়া তটভূমি সমস্ত গ্রাম ও নগরাদির জল বেগে আসিয়া-যমুনা গর্ভে পতিত হইয়া থাকে।

কর্ণকালও ভূমির উপরে তিষ্ঠিতে পারে না। সৃষ্টির পরমুহুর্তেই ভূমি শুষ্ক হইয়া উঠে, এই গতিকেই দেশ বর্ষাকালেও অতিশয় শুষ্ক থাকে। সহরের মধ্য দিয়া অনেক গভীর গভীর পয়ঃপথ যাইয়া এক্ষেপে যমুনাতে পতিত হইয়াছে। বর্ষাকালে যখন ইহাদের মধ্যদিয়া জল চলিতে থাকে, তখন জলের এত বেগ হয় যে, প্রতিবৎসরেই শুনা যায়, দুই চারি জন যুবা ও বালক ইহার জলবেগে ক্রীড়া করিতে গিয়া যমুনাতে পতিত হইয়া মৃত হইয়াছে। যমুনার জল খাইতে অতিশয় মধুর। অনেক সংস্কারবশতঃ অগুণ করে বলিয়া ইহার গর্ভের জল খার না। ইহার তটস্থিত কুপোদকই প্রায় সাধারণো ব্যবহৃত। বর্ষাকালে ইহার বক্ষঃ অপেক্ষাকৃত অনেক বিস্তৃত হয়। জল অত্যন্ত আবিল হয়, এবং অতিশয় বেগবান্ হয়। কোন কোন বর্ষে উভয় তট প্লাবিত হইয়া ইহার তীরস্থিত পথ ও গৃহপ্রাঙ্গণ সকলে পর্য্যন্ত জল প্রবেশ করে। শীতকালে ও গ্রীষ্ম ঋতুতে ইহা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ইহার প্রায় সমস্ত বক্ষই শুষ্ক ও শুক্লবর্ণ পুদিন সকল জাগিয়া উঠে। কোন কোন স্থানে হাঁটু জল হইতেও অনেক কম জল থাকে, কোন স্থানে মানুষ পর্য্যন্তও তল হয়। ইহাতে বিস্তর কচ্ছপ আছে; স্নান করিবার সময় দুই হাতে ঠেলিয়া স্নান করিতে হয়। এত কচ্ছপ যে প্রথমতঃ নামিতে অতিশয় ভয় বোধ হয়, কিন্তু

লোকের সঙ্গে ইহাদের এইরূপ ভ্রাতৃত্বাব জন্মিয়াছে যে, ইহারা কাহারও কিছু অনিষ্ট করে না। ইহার কোন কোন অংশে কুল্লীরও আছে। কিছু দিন হইল এখানে বিডল্ মিউজিয়ম্ নামে যে একটি মিউজিয়ম ছিল, তাহাতে আমি একটি রুহৎ কুমীরের কঙ্কাল দেখিয়াছিলাম। সেটি নাকি লোকে এই যমুনার মধ্যেই মারিয়াছিল। তাহার উদরের মধ্যে মনুষ্যের শরীরের যে সকল অঙ্গকার পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও তাহার শরীর-কঙ্কালের সঙ্গে এক পাখের আবদ্ধ ছিল। বর্ষাকালে ইহাতে শুশুকদিগকেও উল্ক্ষন করিতে দেখা যায়।

যমুনা ছাড়া আখ্রার প্রায় ৮।১০ মাইল দক্ষিণ দিয়া খাড়ি নদী নামে নালার আকৃতি অতিক্রমাদী অপর একটি নদী পশ্চিমে ভরতপুরের এলাকা হইতে আসিয়া পূর্বদক্ষিণবাহিনী হইয়া সহরের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণে গিয়া এরাদত্ নগরের নামাতে বোর্ন্ অথবা উতুমঘুন্ নামে আর একটি নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

বোর্ন্ নদীও ভরতপুর অঞ্চল হইতে আসিয়া আখ্রার আরও বহুদূর দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গোইতা, পার্বতী ও পূর্বোক্ত খাড়ি প্রভৃতি অতিক্রম্য পয়ঃপ্রণালীসমূহী নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া সিকোহাবাদ নামক রেলওয়ে ষ্টেশনের বহুদূর দক্ষিণে যমুনাতে যাইয়া পতিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধা চর্যগুণী অথবা চঞ্চল ও আমাদের অপর এক জর্নৈশ্বর্য্য। যদিও ইহাকে সম্পূর্ণরূপে আমাদের বলিয়া বলিতে আমরা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হই, তথাপি ইহা আমাদের বিভাগের দক্ষিণ সীমার আংশিক পরিধা এবং ইহার মৎস্য-সম্পত্তি আমাদেরই বাবুরচিখানার বিভব। চঞ্চল খোলপুরের মধ্যদিয়া আসিয়া আগ্রার প্রায় ১২।১৩ কোশ দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইটাওয়ার ফেশনের বহুদূর পূর্বদক্ষিণে যমুনাতে মিলিত হইয়াছে। ইহা আকৃতি এবং প্রকৃতিতে প্রায় যমুনার সদৃশ।

ইহা ছাড়া সহরের প্রায় ৪ মাইল পূর্ব দিকে অপর একটি আংশিক আর্দ্র পরঃপ্রণালী উত্তর দিক হইতে আসিয়া যমুনার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে। জল-সম্পত্তি নাই বলিয়া আক্লাদে ইহাকেও আমরা নদী বলিয়া থাকি। এতদ্ভিন্ন আমাদের বিভাগে মইনপুরী ও ইটাওয়ার মধ্যে শির্বা, সিন্ধু, পীরা, আহমি, উকন্দ, কুলন্দ্রী, কালী, ইন্দন এবং পাণ্ডু প্রভৃতি নদীনামধারিণী কতকগুলো সোঁতা নালা চারিদিক হইতে যাইয়া যমুনা ও গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। যদিও ইহার অনেক বর্ষের মেঘাপগমে ভাবুযুগ দেখিয়া শুষ্কতাপ্রাপ্তে পাংশুবুক হইয়া উঠে, তবু গ্রাম্য স্থলের উপস্থিতিপুস্তকের ছাত্র-সংখ্যার ন্যায় ইহার আমাদের বিভাগের মানচিত্রে নদী সংখ্যা পূরণ করিয়া থাকে,

এবং আমরাও ভীষণ লু-বাসুর দাহসময়ে ইহাদের শরীরের স্বক্ষ স্বক্ষ মসিচিত্র দেখিয়া আশ্চর্য হই। এখানেই যে আমাদের জলবিভব ক্ষান্ত হইল, পাঠকবর্গ কখন এরূপ মনে করিবেন না। ইহা ছাড়াও আমাদের বিভাগে ঝিল ও হ্রদ নামধারী খানা, ডোবা ও গর্ত এদিকে ওদিকে ছড়ান আছে, এবং প্রকৃত ঝিল ও হ্রদও আছে। এই বিকল্প দৃষ্টবন্ধ মহামকর রাজস্থানের পার্শ্ব থাকিয়া আমরা কিরূপে এত সোঁতা, নালা, খানা, ডোবা, হ্রদ এবং ঝিলের অধিপতি হইলাম? যে রাজস্থানের অন্তর্গত বিকানোর প্রদেশে প্রবাদ আছে যে, খৃষ্টিয় ১৮৬৯ সনে টাকাতে চারি সের জল বিক্রয় হইয়াছিল এবং যাহার অধিবাসীদিগের মধ্যে কেহ একবার আগ্রাতে আসিয়া যমুনার প্রবাহ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিল যে, “আরে! ইকেইসা, তমাম্ জল বহু চলা কোই ইসে বাঁধ নেহি রাখ্তা!” ঈদৃশ অঞ্চলের ধারে কাছে এত জলশুলীর বিদ্যমানতা; কিরূপে সম্ভবে? পাঠকবর্গ এবিষয় আন্দোলন করিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ বিস্ময়াক্ষিপ্ত হইতে পারেন। আমরাও মানচিত্র দেখিয়া প্রথমে তাহাই হইয়াছিলাম। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন দ্বারাই সোঁট আমাদের মন হইতে দূর হইয়াছে। আমাদের পদতলেই যমুনা এবং যমুনার আর এক পার্শ্বই খানিক দূর দিয়া গঙ্গা বহিতেছে। মইনপুরী, ইটাওয়া, ফরকাবাদ, এটা এবং

মধুরা প্রদেশের অধিকাংশ, সমুদ্রই এই উভয় নদীর মধ্যবর্তী ক্ষেত্রবৎ ভূমিতে অবস্থিত করিতেছে। এই ভূমিখণ্ডকে এখানে দোয়াব বলে। দোয়াব অর্থাৎ দুই জলের মধ্যবর্তী ভূমি। এই দুই ভারত-প্রসিদ্ধ নদীর মধ্যবর্তী হওয়াতেই এই স্থান সকল সর্বদা ইহাদের দ্বারা ধৌত হইয়া হইয়া অপেক্ষাকৃত নিম্ন হইয়া পড়িয়াছে। যদিও আমি কখন এসকল স্থানে যাইয়া দেখি নাই, তথাপি মানচিত্রস্থ প্রতিক্রম দ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, ইহারাই এই নদীদ্বয়ের গতি পরিবর্তন দ্বারা বারে বারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ইহাদেরই খিতান পদার্থ সকল দ্বারা পুনঃ পুনঃ রচিত হইয়াছে। ইহারাই এই উভয় নদীরই শুষ্ক গর্ত ভিন্ন আর কিছু নয়। অতএব এ সকল স্থানে এত বিল, ঝিল এবং সোতা, নালা থাকিবার এই কারণ। কোন কোন বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে বাঙ্গলা দেশের সদৃশ। শূন্যিচ্ছিত্রীকালে লু-বায়ু ইহাদের শরীরোপরি কিঞ্চিৎ মন্দভাবে বহিয়া থাকে। বর্ষান্তেও আর্দ্রতার তত প্রকোপ হইতে পারে না। এই অঞ্চলের অনেক স্থানে নীল জন্মে। পাঠকবর্গ আমাদিগকে যেন সম্পূর্ণভাবে অগ্নিদেহের মধ্যে গণনা করেন না। যদিও আমাদের অব্যবহিত পশ্চাৎদিক হইতে রাজস্থানের মক্শ্বলীকরণ চুল্লী, শীতের ছয় মাস নিরবাপিত থাকিয়া, সমস্ত নিদাঘ আমাদিগকে উত্তপ্ত তন্দুর মুখে ফেলিয়া ভাজিতে থাকে, তবু

আমরা আমাদের বিভাগীয় প্রতিবেশিবর্গের জল-সম্পত্তির কথা শূন্যিচ্ছিত্রীকরণে অনেক স্নিগ্ধ থাকি। এককালে কবাব হইয়া যাই না। আমাদের দৈনিক আহারের মৎস্যোপকরণ এই সকল নদী, নালা, বিল, ঝিল হইতেই যোগান হইয়া থাকে। রোহিত, কাতলা, কালীবাউস, বোয়াল, ছোট ছোট চাইন, ফলি, চিতল, মিরকা, পাঙ্কাস, গজ্ঞার, সরপুঁটী, পুঁটী, খরশুল, চেলা, বাঁশপাতি, টেঙ্গরা, ক্ষুদ্র চিত্রী, নারিকেলি, বাঁচা, রিঠা, আইর, টাদা, পৌয়া, ফেশুরা, চাপিলা, ছোট ছোট শকুল, মাগুড়, শিঙ্গী, কাঁকড়া এবং কখন কখন ইলিশ পর্য্যন্তও পাইয়া থাকি। ইলিশ, ফাল্গুন, টেঙ্গর এবং বৈশাখ এই তিন মাসের মধ্যে কোন কোন দিন পাওয়া যায়। এখানে ইলিশ শব্দ শুদ্ধ ইলিশের আকৃতি এবং অবয়ব বাঁচা। স্বাদবোধক নয়। ইহাকে যখন পাই, তখনই অন্তঃসদা অবস্থায় পাই। ডিমের ইহা প্রায় সর্বস্বাপন্নতা হইয়া থাকে। অন্য অন্য মৎস্যেরা আমাদেবের ঋতু অনুসারে উপস্থিত হয়। রোহিত, কাতলা, মিরকা এবং বোয়াল প্রায় বার মাসই পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের মৎস্য অপেক্ষা শীতের মৎস্য কিছু স্বাস্থ্য। উত্ত আইশের গন্ধ থাকে না। ফিরিঙ্গী ভায়াদের জন্য খরশুল মাছে হাত রাখিবার যো নাই। এদেশে বাসার ভৃত্য কাছার-জাতিরাই মৎস্য বিক্রয় করে এবং নৌকাবাহক মালা

জাতীরেয়াই মৎস্য ধরে। কখন কখন কাহারেয়াও ধরে। এখানে মৎস্যের কোন বাজার নাই। কাহারেয়া স্ত্রীপুরুষে মাখার করিয়া করিয়া বাঙ্গালি, ফিরিঙ্গী এবং মুসলমান এই জাতির মধ্যে বিক্রয় করে। বোধ হয় এই তিন জাতি এই অঞ্চলে আসিবার পূর্বে এদেশে মৎস্যের ব্যবহার ছিল না; ব্রহ্মধর্ম এবং ঐঙ্গন ধর্মের শাসনই ইহার বোধ করি এক মাত্র কারণ। মরা খায় বলিয়া যদিও এদেশের কচ্ছপ খাইতে অতিশয় যুগা হয় এবং কখন কোন বাঙ্গালি কি ফিরিঙ্গী খায় না, কিন্তু তাহার ডিম মৎস্যবিক্রেতাদিগকে বলিয়া আনাইয়া খাইয়া থাকে। হকিমি মতে মাছ গরম বলিয়া গ্রীষ্মকালে এদেশের মুসলমানেরা কেহ খায় না। এই গতিকে একটুকু শস্তা হয়। কিন্তু খাইতে বড় ভাল লাগে না। বিশেষতঃ বড় বড় মাছ। বড় মাছ মাত্রেরই পেট চিরা থাকে স্তরস্তর তাহাদের আভ্যন্তরিক অনেক খাদ্যাংশ পাইবার যো থাকে না। অনেক সময় মনোমত এবং অভিকচি-গত অন্য লাভের জন্য বাঙ্গালিরা মৎস্য বিক্রেতাদিগকে পুরাতন বস্ত্রাদি দান করিয়া উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন।

আগ্রা ও যমুনা সম্বন্ধে আর একটি বিষয় পাঠক বগর্কে পূর্বে কহিতে ভুলিয়াছি। কিঞ্চিৎ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যমুনা এবং গঙ্গার গর্ভ নিয়তই পরিবর্তনশীল। ইহাদের গর্ভ-পরিবর্তন ঘাৱাই

পার্শ্ববর্তি স্থানাদির আকৃতি এবং প্রকৃতি-গত অনেক বৈলক্ষণ্য জন্মিয়া থাকে। শুনা যায় যে, আগ্রা হইতে পূর্বদক্ষিণে প্রায় ১২।১৩ মাইল দূরে যমুনার একটি পরিভ্রান্ত শুষ্ক গর্ভ আছে। ইহা প্রস্থে কোন কোন স্থানে ১১ মাইলের অধিক হইবে এবং দীর্ঘে কোন কোন স্থানে ২০ মাইলের ও অধিক হইবে। বর্ষাকালে এখনও এই গর্ভ অংশতঃ প্লাবিত হয়। কার্লাইল সাহেব বলেন, এবং তাহা অনেক সম্ভব যে, যদি হিন্দুদিগের সময়ের প্রাচীন আগ্রা খুজিতে হয়, তাহা হইলে এই পুরাতন গর্ভের পার্শ্বস্থ গ্রামাতে খোঁজাই কর্তব্য। বাস্তবিক এইক্ষণ ভারতবর্ষে যত নগর বিদ্যমান আছে, তাহাতে প্রাচীন হিন্দুদিগের কীর্তি-সমাধি দেখিতে হইলে, আধুনিক নগর সকলের পার্শ্ববর্তি স্থানাদি খনন করিয়া দেখিতে হয়।

কোন নবীন অভ্যাগত বঙ্গবাসী, যখন বাঙ্গালী শকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া দীর্ঘপর্ঘাটনজনিত শরীর-প্লাগি হইতে কিঞ্চিৎ অবকাশ পান, এদিকে ওদিকে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন, এবং পথের এপার্শে ওপার্শে হাট্টিয়া মুহুর্মুহুঃ নগরের মুখচ্ছবির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, তখন সর্বপ্রথমেই তাঁহার মনে একটি ধূলিধূসরিত বিকঙ্ক ভাবের উদয় হইয়া থাকে, এবং সুস্বিচ্ছ শ্যামল লতাপত্রভকণ্ডাতির গাঢ় অবগুঠনে স্কন্দ

অবশিষ্টতা বঙ্গভূমির সাংলিখ্য হইতে দূরে
 নিক্ষিপ্ত হইয়া যেন চতুর্দিকে কেবল হা-
 হাকারের প্রতিকৃতি দেখেন। গৃহাদির
 প্রতি নয়নপাত করিলে দেখেন, কেহ
 আতপভরে মস্তকে খড় বাঁধিয়া, কেহ সূ-
 জীর্ণ পুরাতন পতনোন্মুখ গাত্রবেষ্টিনে দ-
 রমা জড়াইয়া, কেহ শৈবালে লেপিত,
 কেহ ভূগঙ্করে রোমাঙ্কিত ভয় কর্পরে ব-
 সিয়া, কেহ পলিতকেশনিভ মর্ষরাগ্নে-
 খিত মস্তকে বিচূর্ণচূড় হইয়া, কেহ সুরবর্ণ-
 কলস মস্তকে মর্ষরাঘরে আপাদশির
 আচ্ছাদিত করিয়া ও পদ্মাসনে যমুনাতটে
 উপবিষ্ট হইয়া, কেহ সদ্যঃ চূর্ণ-ধৌত-ক-
 লবরে বিবিধ রঙ্গমালার কুঠ বিরঞ্জিয়া,
 কেহ আবার তাহারই পাখে গলিতত্বকে
 ও জানু-জঙ্ঘা-কপোল-বিভঙ্গে বিকটাস্য
 হইয়া এবং কেহ নিক্ষিপ্ত শরীর ইষ্টকে ধরা
 পতিত রহিয়া অতি গস্তীর ভাবে
 মনুস্বাক্ষের অবিরাম কল কল ও য়া-
 নাদির খট খট ও ঘর্ষরের মধ্যে ভূত ভ-
 বিঘাৎ বর্তমান চিন্তারূপ যোগে যেন
 নিঃশব্দ নিমগ্ন রহিয়াছে। চারিদিক হইতে
 ত্রস্তের রঞ্জোরেণু উড়িয়া উড়িয়া সকলের
 গাঙ্ক লাগিতেছে। ধূলিরই মঞ্চ, ধূলিরই
 আসন, এবং ধূলিরই ধূনী। যে দিকে
 দেখা যায়, কেবল ধূল্যই ধূল্য। বাস্তবিক
 আজি কালি আখ্রোর ধূল্যই প্রধী প্রধান
 প্রাকৃতিক সম্পত্তি। জানি না, আঁকবর কি
 দেখিয়া ইহাকে মনোনিভ কল্পিয়া লেন।
 বর্ষার ছটি মাস নিঃশব্দে চলিয়া গেলে,

অবশিষ্ট দশ মাস আখ্রো কেবল ধূলি-
 তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতে থাকে। এত ধূল্য
 হইবার বোধ হয় দুটি কারণ। প্রথমতঃ
 ইহার মৃত্তিকাই স্বাভাবিক পাংশুল ও
 আঁঠা শূন্য। দ্বিতীয়তঃ, বিবিধ প্রকারের
 যানাদি অনবরত অবিপ্রান্তভাবে ইহার
 পৃষ্ঠকে ঘর্ষণ করিয়া থাকে। ইহার পৃ-
 ঠোপরিস্থ অণুসংহতিতে যে কিঞ্চিৎ যৌ-
 গাকর্ষণ আছে, তাহাও প্রতিনিয়ত ইংরে-
 জ্রিকট এবং দেশীয় একা, বহেলী ও উষ্ট্র
 সিক্রমের চক্রঘর্ষণে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহার
 শরীরস্থ প্রায় দ্বিহস্ত প্রমাণ মৃত্তিকা বর্ষে
 বর্ষে আকাশপথে উভ্ভীন হওতঃ দূর দূরস্থ
 রাজ্যাদিতে নিক্ষিপ্ত হয়। এখানকার
 ক্ষেত্রাদির মৃত্তিকাও এইরূপ পাংশুল এবং
 মকুবর্ণ অর্থাৎ ঈষৎ পীতাভ। জলে মিল
 না করিলে ডেলা বাঁধে না। যে ক্ষেত্রের
 মৃত্তিকার স্বাভাবিক ডেলা বাঁধা হয়, শু-
 নিয়াছি তাহা অতিশয় উর্বর এবং তাহার
 প্রতি বিঘাতে কৃষককে বার্ষিক সাত আট
 টাকা কর দিতে হয়। মধ্যম শ্রেণীর ভূ-
 মিও কিঞ্চিৎ ডেলা বাঁধা হয় এবং তাহা-
 তেও শস্যাদি উৎপন্ন হয়। বিঘা প্রতি
 ইহারও তিন চারি টাকা কর দিতে হয়।
 অধম শ্রেণীর ভূমি অধিকাংশই ক্ষার ও ক-
 লরময়। ইহাতে উষ্ট্রের খাদ্য নানা প্র-
 কার কষ্টকাঙ্ক্ষী রক্ষ ভিন্ন আর কি-
 ছুই জন্মে না। যখন আমরা কোন কোন
 সময় ক্ষেত্রাদিতে ভ্রমণ করিতে বাই, তখন
 আমরা দেখি যে, কোন কোন স্থান সুরক্ষ-

তোক্ত ঔত্তিদ-লবণ দ্বারা শুক্লীকৃত হইয়া আছে। কোন কোন খামে সোরাও দৃষ্ট হয়। নগরের অভ্যন্তরস্থ মৃত্তিকাতে এত সোরা যে, নূতন কোন গৃহ নির্মিত হইলে, কএক বৎসরের মধ্যেই ইহার আক্রমণে জর্জরিত হইয়া উঠে এবং প্রাচীরস্থ চূর্ণের আন্তর সকল খসিয়া খসিয়া পড়ে। ইন্টক সকল চূর্ণ হইয়া ঝুর ঝুর করিয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু প্রস্তর নির্মিত গৃহে এরূপ হইতে দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন বলকাল হইতে মনুষ্য এবং পশুযুগ সঞ্চিত হইয়া এরূপ হইয়াছে। পূর্বের সহরেরই উত্তরপশ্চিম প্রান্তে মহ নামক গ্রামের কাছে এক প্রকার লবণ জন্মিত, এখন তাহা সরকার হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যমুনার ধারে আকবরের সময়ের সোরাওয়ারী কুঠীনামে একটি রহৎ বাটী আছে; এইক্ষণ তাহা মথুরার প্রসিদ্ধ ধনী লক্ষ্মী চাঁদ শেঠ কিনিয়া লইয়াছেন। শুনা যায় যে, আকবরের সময়ে এখানে সোরা প্রস্তুত হইত।

আগ্রার সহর সমুদয় একস্থানে একত্রীকৃত নয়। ইহা অংশে অংশে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত এবং সহরের মধ্যে মধ্যে অনেক বিস্তৃত বিস্তৃত শূন্য স্থান সকল পড়িয়া আছে। এ সকল শূন্য স্থানের অনেক গুলা পূর্ব হইতেই শূন্যাবস্থায় আছে, এবং কতক গুলা প্রাচীন গৃহাদির বিলোপে ক্রমে শূন্য হইয়া উঠিয়াছে। কাশী এবং দিল্লীকে কোন অভূক্ত স্থানে বসিয়া যেরূপ মনো-

হর দেখায়, ইহার শরীরের অভ্যন্তরে অনেক শূন্য ভূমি থাকাতে ইহাকে সেরূপ সুন্দর দেখায় না। এরূপ হওয়াতে যদিও ইহা নরনের আরাম দায়ক হয় নাই বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যের অনেক আরামজনক হইয়াছে। স্থানে স্থানে বায়ু সুন্দররূপে খেলিতে পারে বলিয়া অনেক পরিষ্কৃত থাকে। ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত ইহার এক একটি অংশও নিত্যন্ত অবিস্তৃত নয়। ইহার সমুদয় অংশ এক স্থানে একত্রিত হইলে, ইহাকে বর্তমানাপেক্ষা অত্যন্ত বিস্তৃত দেখাইত। ইহার গাত্ৰোপরিস্থ ভূমি, আমাদের দেশের ভূমির ন্যায় তত সমতল নয়; সর্বত্রই প্রায় উচ্চ নিচ। যদিও এখানকার বর্ষা অতিশয় ক্ষীণ, তবু ইহার মৃত্তিকা অনেক জল বলিয়া নানাদিক হইতে আগত বর্ষার জল-গতি দ্বারা ক্রমে ধৌত হইয়া হইয়া স্থানে স্থানে বড় বড় নালা সকল প্রস্তুত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে কঙ্কর-প্রস্তরমিশ্রিত মৃত্তিকার বিস্তৃত স্তূপ সকল দাঁড়াইয়া আছে। লোকেরা তাহার উপরে গৃহ অট্টালিকাদি তুলিয়া বসিয়া রিতেছে। এই জন্যই সহরের বক্ষ্য সকল নালায় গর্ভ দ্বারা এক প্রকার এবং খেবরো হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কোন নালা প্রায় পঁচিশ ত্রিশ মাইল হইতেও দীর্ঘ। নীপলমণ্ডি নামক সহরের একটি অংশ এইরূপ একটি নালায় এক অংশের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে। বর্ষার সময়ে ইহার মধ্যে স্থাপিত গৃহাদির কটি যেখান জল

চলিতে থাকে। কলিকাতাতে সাহেবেরা এত অর্থ ব্যয় করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য হইতেছেন না, এখানে প্রকৃতি আমাদিগকে আপন যত্নে বিনা ব্যয়ে তাহা করিয়া সর্বদা শুষ্ক বিছানায় ঘুসু রাখিতেছে।

মৃত্তিকার হাত কএক নীচেই কঙ্কর প্রস্তরের স্তর। পূর্ব বাঙ্গালার মৃত্তিকাতে কোন খানেও ইহা নাই। থাকিবার বোধ হয় কারণও নাই। কিন্তু রাঢ় দেশের কোন কোন স্থানে আমি ইহা দেখিয়াছি। তাহারা ইহাকে যেটো বলে এবং ইহা ভস্ম করিয়া চূর্ণা প্রস্তুত করে। এখানেও তাহাই করে। এখানে সাধারণতঃ সমস্ত চূর্ণা কর্ণ ইহাকে ভস্ম করিয়া হয়। ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূর্ণ-প্রস্তর। আকৃতি অত্যন্ত বন্ধুর। ইহাকে কুটিয়া গুঁড়া করিয়া এবং তদ্বারা কর্দম প্রস্তুত করিয়া কুম্ভকারেরা এক প্রকার সুন্দর অতি পাতল মুরাই প্রস্তুত করে। এই মুরাইতে সাধারণ মাটির মুরাই হইতে জল অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে। এখানে ইহাকে 'কঙ্কর কা মুরাই' বলে। ভূমির অব্যবহিত নীচেই এই চূর্ণা প্রস্তরের স্তর থাকিতে এখানকার কূপোদক মাত্রই চূর্ণের অংশ থাকে। কোন খানে কম, কোন খানে বেশি। এই চূর্ণের অংশ এবং তৎসহ সোরা ও অন্য-বিধ ক্ষারজ লবণের অংশ মিশ্রিত থাকিতে

এখানকার প্রায় সমুদয় কূপোদকই খাইতে বিষাদ। কেবল যমুনার পাশ্বে বর্তি কূপোদকেই এ দোষ নাই। থাকিলেও সহজে জিহ্বাতে অনুভব করা যায় না। এই চূর্ণ-প্রস্তরের স্তর তেদ করিয়া আরও অনেক নীচে চলিয়া গেলে মিষ্ট জলের স্তর পাওয়া যায়। আমার পরিচিতের মধ্যে কোন একটি সমৃদ্ধিশালী ক্ষত্রিয় বাড়ীতে বসিয়া মিষ্ট জল খাইবার আশায় এখানকার ইঞ্জিনিয়ার সাহেবদিগের দ্বারা আপনায় গৃহপ্রাঙ্গণে বহু অর্থব্যয় করিয়া একটি কূপ খনন করাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন মতেই মিষ্ট জল পাইতে পারিলেন না। উপরিস্থিত স্তর সকলের মধ্যদিয়া বর্ষা এবং অন্যান্য প্রকারের জল সকল চোরাইয়া পড়িয়া কূপের নিম্নস্থ জলকে নষ্ট করিয়া ফেলে।

উপরোক্ত কঙ্কর বাতীত, ইহার বক্ষে চিক্নী ও পোতানি নামে আরও দুই প্রকার মৃত্তিকা পাওয়া যায়। তাহা এখানকার সাধারণ লোকেরা গৃহ-প্রলেপে ব্যবহার করিয়া থাকে। সাহেবেরাও অনেক সময়ে পরিমিতব্যয়িতার অনুবোধে আপনার প্রাঙ্গণস্থ বহিঃ-প্রাচীরাদিতে ইহার প্রলেপ করাইয়া থাকেন। ইহার প্রলেপ দেখিতে চূর্ণের প্রলেপ হইতে বড় কম সুন্দর দেখায় না।

(ক্রমশঃ)

(প্রবাসী)

তরঙ্গিনী ।

গীতি-কবিতা ।

(রাগিনী লয়ী, তাল জং)

বড়ই সাধের তুমি সজ্জনি আমার রে,
তরঙ্গ-রঙ্গিনী !
যখন দেখিতে যাই
তখন দেখিতে পাই
নৃতন-মুরতি তব নয়ন-রঞ্জিনী ।
প্রেমের প্রবাহ তুমি প্রাণ-বিনোদিনী ।

২

কত নীলা ও তনুতে, কতই ভঙ্গিমা রে,
বিভ্রম, ভামিনি !
চাঁদের আলোতে হেসে,
চাঁদের আলোতে ভেসে,
চলেছ চটুলে কোথা বল তাহা শুনি ।
হাসিছে তোমার মুখে মুখদা যামিনী ।

৩

কার না জুড়ায় প্রাণ হেরিলে ওরূপ রে,
রূপ-বিলাসিনি !
আকাশে একটি চাঁদ,
হৃদে তব কোটি চাঁদ,
জড়িত জ্যোৎস্নায় তুমি রস-তরঙ্গিনী !
তুমিই কি বিয়োগীর সস্তাপ-বারিণী ?

৪

যৌবন-জ্যোৎস্নারে তব খেলিছে লহরী রে,
ভুবন-মোহিনী,
লহরে লহরে মরি

উখলিছে কি মাধুরী
কি গরিমা, কিনা ছটা ভুজঙ্গ-গঞ্জিনী,
পুলিনে মলিন লাজে বন-মোহাগিনী ।

৫

মৃদল মৃদল বহে ধীর-সমীরণ রে,
অধীর-গামিনি !
অধীর সে পরশনে,
বুঝি না কি ভেবে যনে,
কি মায়ার কি ছলনা খেল মায়াবিনি !
একি পুনঃ ? তালে তালে নাচিছ তটিনি ?

৬

আবার আবার একি ভীষণ হিলোল রে,
তট-বিঘাতিনি !
কেন এই গরজন
এ নিষ্ঠুর দরশন
নিরখি অস্বরে ওই নীল-কাদম্বিনী,
পরকীর ছায়াও কি ছোয় না মাটি

৭

কল কল কল নাদে কি কথা কহিছ রে,
কল-নিনাদিনী !
অন্ত যায় রবি শশী
পোঁছায় হৃৎকের নিশী
তবু হায় না ফুরায় তোমার কাহিনী
কার প্রেমে বল ধনি, তুমি উষাদিনী ?

মরমের দুখ আজি কহিব তোমায় রে,
 ভূধর-মন্দিনি !
 তব তটে বসি' বসি',
 অশ্রু জলে সদা ভাসি,
 নিবায় এ অশ্রু-বারি দুঃখীর-সঙ্গিনি !
 স্রবময়ি ! স্রব-দয়া, কৰুণা-রূপিণি !

বড়ই সাধের তুমি সজনি আমার রে,
 তরঙ্গ-রঙ্গিণি !
 'কোথা যাও ফিরে চাও'
 সঙ্গে মোরে লয়ে যাও
 তরল-তরঙ্গ-ময়ি ! অনন্ত-গামিনি !
 ভাসাব তরঙ্গে তব জীবন-তরনী। (স্বীনঃ)

সংক্ষিপ্তসমালোচন

১। 'মিত্রপাঠ'; আনন্দচন্দ্র মিত্র প্র-
 নীত।—বঙ্গদেশের ইহা একটি কলঙ্ক যে,
 ষাঁহাদিগের কবিত্বশক্তি আছে, তাঁহারা
 বালকবালিকাদিগের জন্যে কাব্য লিখেন
 না। ইহার এক কারণ এই, এইরূপ কার্যে
 প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহারা প্রায়শই স্বজনবৎসল
 ও অনুগত-পালক শিক্ষাসমাজের নিকট
 বিড়ম্বিত হন;—আর এক কারণ এই, তাঁ-
 হারা কাব্যের বিপণিতে ষাঁহাদিগের সহিত
 প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে উপস্থিত হইতে লজ্জা বোধ
 করেন, দৈর্ঘ্য কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে,
 প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা দূরে থাকুক,—সেই
 কোটি লেখকবর্গের সহিত তাঁহারা
 সময় বিশেষে মল্লযুদ্ধ করিতেও বাধ্য হন।
 হেলেনাকাব্যের রচয়িতা উল্লিখিত বিড়ম্বনা
 ও লজ্জা উভয়েরই প্রতি দৃকপাতশূন্য হইয়া
 এই কলঙ্ক মোচনে যত্নশীল হইয়াছেন। তাঁ-
 হার মিত্রপাঠ, বালকশিক্ষার জ্যেষ্ঠ উৎকৃষ্ট
 গ্রন্থ। যে শ্রেণির বালকেরা বোধোদয়
 পড়িয়া থাকে, তাহারা মিত্রপাঠ পড়িলে

ভাষা শিখিবে, অথচ জ্ঞান লাভ করিবে।

২। 'কুম্ভমালা। নিসর্গ স্বন্দরী-প্রণেতা
 জীশারদা প্রসাদ স্মৃতিরত্ন বিরচিত।' এদে-
 শীয় কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে ইদানীং ষাঁ-
 হারা প্রসিদ্ধ ও প্রথিতনামা হইয়াছেন,
 তাঁহারা সকলেই মিল্টন, বায়রণ, স্কট ও
 টেনিসন প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণের মন্ত্র-
 শিষ্য। তাঁহাদিগের বাঙ্গালা কবিতা ইং-
 রেজী কবিতার নূতন এক যুষ্টির মত।
 বিলাতের বিবিদিগকে সাজী এবং বলয়
 চন্দ্রহার প্রভৃতি আভরণ পরাইয়া বোঁ
 সাজাইলে, অথবা এদেশের বধুদিগকে গা-
 উন পরাইয়া বিবি সাজাইলে যেমন দে-
 খায়, ঐ সমস্ত কবিতাও আমরাদিগের
 নিকট তেমনি প্রতীত হয়। দেখিতে স্ম-
 ন্দর,—শোভায় অপূর্ণ; কিয়ৎপরিমাণে
 নূতন নূতন, অথচ স্থিরচক্ষে তাকাইলে
 পরিচিতপূর্ণ। স্মৃতিরত্ন মহাশয় প্রভৃতি
 কতিপয় ব্যক্তির গুরুস্থান স্বদেশ। তাঁ-
 হারা বাহ্য কিছু শিখিয়াছেন, তাহা কা-

লিদাস, ভারবি ও ভবভূতি প্রভৃতি ভারতীয় কবিপ্রদায়ের নিকট । স্মৃতরাং তাঁহাদিগের কবিতায় ঐ অপরূপ, ঐ নূতন নাই । কিন্তু অপরূপ ও নূতন না হইলেও কুন্দমালার মত কবিতা অবহেলার বস্তু নহে । আমরা নিসর্গসুন্দরীর নিখল কান্তি দেখিয়াই স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে কবি বলিয়াছি, তদীয় অশ্রুজলসিক্ত কুন্দমালার গাঁথনি দেখিয়া তাঁহার কবিত্ব শক্তির বিকাশবিষয়ে আশান্বিত হইলাম ।

৩। ‘কবিতামুকুর । শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত ।’ এশুকুর তদীয় বিজ্ঞাপনের দ্বিতীয় দফায় লিখিয়াছেন ; “—আমাদের পূর্বপুরুষগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি নবাবসরকারে চাকরি করিয়া মজুমদার খেতাব প্রাপ্ত হন, এবং তদবধি আমাদের বংশাবলী ঐ খেতাবে আখ্যাত হইয়া আসিতেছেন । কিন্তু আপাততঃ ঐ খেতাব মনোরম বোধ না হওয়ার আমাদের চিরপ্রচলিত মুখোপাধ্যায় উপাধি গ্রহণ করা গেল । ”

একথায় আমাদের কোন আপত্তি নাই । কত লোক কত অসৎকর্ম করিয়া খেতাব লইতেছে, অগচ কেহ তাহাদের নিন্দা করিতেছে না । এমত স্থলে আমাদের এশুকুর কেতাব লিখিয়া খেতাব লইবেন, অথবা পুরাতন খেতাব, পুরাতন জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিবেন, তাহাতে ইহা খলু নখর জগতে কোন পাষণ্ডচিত্ত দুর্নীত ব্যক্তির আপত্তি হইতে

পারে ? কিন্তু এশুকুর তদীয় বিজ্ঞাপনের প্রথম দফায় বাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমাদের নানারূপ আপত্তি আছে । প্রথম দফায় প্রথম পংক্তি এই,— “কয়েকটি কবিতা বিরচিত করিয়া কবিতামুকুর প্রকাশিত হইল ।” বাঙ্গালা ভাষা বেওয়ারিশী মাল হইলেও ইহাতে এইরূপ ব্যাকরণ-বিকল ও রীতিবিকল বাক্য গ্রথিত হওয়া অনুচিত । দ্বিতীয় আপত্তি ‘পরাপরাধেন পরস্য দণ্ডঃ ।’ এশুকুর লিখিয়াছেন,— “কবির হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহোদয়ের রীতি অবলম্বন পূর্বক অধিকাংশ কবিতাগুলি লিখিত হইয়াছে ।” এই কথায় আমাদের কেন, অনেকেরই আপত্তি হইতে পারে । এশুকুর কিরূপ কবিতাকে হেমচন্দ্রের অনুকৃতি বলেন, নিম্নে তাহার একটি প্রদর্শিত হইল ।

“ আশীলক্ষ বর্ষ পঞ্চাদি জনম,
জনমি জগতে, ভুঞ্জিয়া অসম
যাতনা যতেক, জীবাস্বা চরম,
হয় দৃষ্ট ভবে মান-বা-কারে ।

কত বিড়ম্বনা কঠোর নিগ্রহ
ভোগ-শেষ হয় টুটে যবে গ্রহ,
যায় তবে পেয়ে ঈশ-অনুগ্রহ,
আগ্রহে জীবাস্বা পবিত্রাধারে । ”

এই কবিতাটিতে হেমবাবুর অনুকরণের মধ্যে আমরা এই দেখিয়াছি,— ইহার একস্থানে লেখা আছে, ‘প্রয়োগ’,— আর একস্থানে লেখা আছে, ‘শাখা’ এবং তৃতীয় একস্থানে লেখা আছে

‘পূৰ্ণকোরস্’। অনুকরণ মন্দ নহে।

৪। ‘কবিতা প্রস্থনমালা। জীরজনী-কান্ত বসু প্রণীত।’ এখানিতে নানাবিধ নীতি কথা আছে। যথা,—

“হে মানব! যে প্রতিজ্ঞা কর একবার,
দেখ যেন নাহি হয় অন্যথা তাহার।
বাক্যে যা বলিবে তাহা অবশ্য করিবে,
নতুবা বিভূর কাছে অপরাধী হবে।
প্রত্যয় হবে না কাক তোমার বচনে;
অতএব কর যত্ব প্রতিজ্ঞাসাধনে।”

৫। ‘ভারত-উদ্ধার। অথবা চারি আনা মাত্র। (ভবিষ্য ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা।) জীরামদাস শর্মা-বিরচিত।’ আমরা করিতা মুকুর এবং কবিতা প্রস্থন-মালার মঞ্চে সজেই যে, ভারত উদ্ধারের নাম করিলাম মান্যবর জীযুক্ত রামদাস শর্মা ইহাতে অবশ্যই পুলকিত হইবেন, এবং বিনা যত্নে, বিনা পরিশ্রমে এবং অত্যাশ্রয় মাত্র অর্থ ব্যয়ে কবি সমাজে স্থান পাইলেন বলিয়া অবশ্যই তিনি আনন্দ ভরে অশ্রুপাত করিবেন। কিন্তু তথাপি আমাদিগকে সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, ভারত উদ্ধারের অপর নাম ‘চারি আনা’—কবিতা মুকুর এবং কবিতা প্রস্থন মালার অপর নাম ‘ছয় আনা।’ বঞ্চে অদ্যাপি গুণাগুণের তারতম্যানুসারে কাব্যের মূল্য নির্ধারণ হয় কি না,—অদ্যাপি লোকে কাঁচ কাঞ্চনের পার্থক্য দেখিয়া আপনা হইতেই আপনার উপযুক্ত স্থান বাছিয়া লয় কি না, ইহা হ-

ইতেই রস-ভাব-বিচার-সক্ষম বিচক্ষণ পাঠকবর্গ তাহা অনুভব করিতে পারিবেন।

মূল্য-গত তারতম্যের কথা পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপে সমালোচনা করিতে হইলে আমাদের বলা আবশ্যিক যে, রামদাস শর্মার এই নূতন কাব্য বাঙ্গালা ভাষার এক নূতন সৃষ্টি। ইহার প্রত্যেক বাক্য এবং প্রত্যেক পংক্তিই রচয়িতার অসাধারণ মনস্বিতা এবং অনন্যসাধারণ ব্যঙ্গবর্ণন-শক্তির পরিচয় প্রদান করে। ফলতঃ এই কাব্যখানির আদ্যন্ত পাঠ করিলে মনে সর্বত্রই এই প্রতীতি জন্মে যে, বাঙ্গালার বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য এবং নাম কাটা সিপাহিদিগকে যদি কেহ চিনিয়া থাকে, তবে চিনিয়াছেন রামদাস শর্মা, এবং বাঙ্গালার অন্তঃসারশূন্য অকর্মণ্য বাগ্মী ও লেখকবর্গকে উপদেশ দেওয়ার জন্য যদি কোন ব্যক্তি উপযুক্ত হইয়া থাকেন, সেই ব্যক্তিও আমাদের এই রামদাস শর্মা।

উৎসাহ উপকারজনক, উৎসাহের অনুকরণে রূথা আক্ষালন যার পর নাই অপকারজনক। স্বদেশবাৎসল্য সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়, কিন্তু স্বদেশবাৎসল্যের নাম লইয়া সময় ও শক্তির অপচয় করা, এবং নট ও নটীর মত রঙ্গভূমিতে নৃত্য করিতে যাওয়া সর্বতোভাবে নিন্দনীয়। কৃষিকার্য্য পৃথিবীর উপকারি,—পার্থিব প্রয়োজনে অপরিহার্য্য, কিন্তু কৃষিকার্য্যের অনুরোধে মার্জারের দ্বারা হল-

চালনা, মুম্বিকের দ্বারা ক্ষেত্রোৎকর্ষ-বিধানের চেষ্টা একান্ত উপহাসের বিষয়। সাধনার স্বর্ণ আছে, কিন্তু সিদ্ধির প্রথম সোপান শিক্ষা। ইত্যাদি গভীর তত্ত্বকে অতি-গভীর বিজ্ঞপচ্ছলে বর্ণনা করাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য, এবং এই উদ্দেশ্যবিষয়ে গ্রন্থকারের মনোরথ সফল হইয়াছে। যে তাঁহার এই ত্রিচচারিংশ পৃষ্ঠাতক পুস্তক খানি লইয়া অর্ধ ঘণ্টা কাল উপবিষ্ট রহিয়াছে, সে ই প্রথমে হাসিয়াছে,—হাসিয়া অন্যকে হাসাইয়াছে, এবং পরিশেষে প্রতপ্তহৃদয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছে।

রামদাস শর্ম্মার অমিত্রাক্ষর পদ্য নিতান্ত প্রীতিপ্রদ। ভাবালইয়া ক্রীড়া করিতে, ভাষার রস-বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়া পাঠকের চিত্তে তৃপ্তি জন্মাইতে তাঁহার অগুমাত্রও আয়াস হয় না। তিনি নিরন্তর ব্যঙ্গ বিজ্ঞপ এবং জ্লেষ পরিহাসে ব্যাপ্ত রহিয়াও দুই এক স্থলে তুলিয়া কিরূপে অন্যবিধ উচ্চ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, নিম্নোক্ত পংক্তিচয়ে তাহা প্রকাশ পাইবে।

“কে বলে নদীর স্রোত কাল-স্রোত-সম ?
ভাসাইয়া জবাফুল গঙ্গার সলিলে—
একটি একটি করি বহুতর ফুল,—
সারি দিয়া ভেসে যেতে দেখেছি বাহার
তীরে দাঁড়াইয়া, শেষে বহুকণ পরে,
সাঁতারিয়া সব গুলি এনেছি ধরিয়া।
কিন্তু রে কালের স্রোতে পারিজাত জিনি
অমূল্য কুমুম কত ভাসিয়া গিয়াছে,

দেখিছি নয়নে ছায় ! পারি নি ফিরাতে !
সাগরে সাঁতার দিলে ফিরে যদি পাই
মুখের শৈশব তবে চাহি না কি আর ?
একবার কালস্রোতে পড়িয়াছে যাছা,
তার তরে হাহাকার ভিন্ন কি উপায় ?
কে বলে নদীর স্রোত কালস্রোতসম ?”

আমাদিগের সুযোগ্য সহকারী অধ্যাপক সন্দর্শনসম্পাদক ভারত-উদ্ধারের সমালোচনা করিতে গিয়া অভিনববস্তুদর্শন-জন্য আনন্দের উৎসাহে ইহার একাঙ্ক উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা যদি অধিকতর আনন্দোৎসাহে ইহার অপারাজ্জ উদ্ধৃত করি তাহা হইলে আর রামদাস শর্ম্মার ‘চারি আনা’ লাভ ঘটয়া উঠে না। অগচ আমাদিগের বিবেচনায় প্রত্যেক বাঙ্গালিরই ইহাঁকে চারি আনা দক্ষিণা দিয়া কিঞ্চিৎ বিদ্যালভ করা কর্তব্য। আমরা এই নিমিত্ত ভারত উদ্ধারের আর কোন স্থল উদ্ধৃত না করিয়া কেবল গ্রন্থকারকে আশীর্বাদ মাত্র দিয়াই বিদায় করিতে বাধ্য হইলাম। আমরা আশীর্বাদ করি, ব্যাস যেমন ভারত-কাব্য লিখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বরে অমর হইয়াছেন, রামদাস শর্ম্মাও সেইরূপ এই ভারত উদ্ধার কাব্য রচনার জন্ত বিশিষ্ট কৃষ্ণের বরে কম্পতকর অক্ষয়-কল লাভ করুন,—এবং হেম-তুলিকা-চিত্রিত শতীর মত ভার্যা ও জয়ন্তের মত পুত্র লাভ করিয়া ইশ্বরের উজ্জ্বল কান্তিতে সমুজ্জ্বল হউন।

যমুনা তটে

যমুনার কাল জল নাচিতে নাচিতে
দেখি'নু ছুটিছে জঁত হাসিতে হাসিতে,
করি রঙ্গ মনসাথে, প্রেমিকে ফেলিয়া ফাঁদে
ভাগিরথী-কোলে স্রোত সোহাগেতে

ঢালিতে !

উদিত নবীন রবি, ধরিয়া নবীন ছবি,
তরল রূপের ছটা ঝলমল করিছে !
কি মরি সে কম কান্তি ! হৃদয়ে জন্মান ভ্রান্তি,
তরল তপন হতে রূপধারা ঝরিছে !
কাল জলে ভাসি ভাসি ছড়াইয়া রূপরাশি
হাসিমাখা মুখে মরি জনমন হরিছে !
কেমন রবির ছবি যমুনার খেলিছে !

২

মন্দ মন্দ গন্ধবহ ফুলরেণু উড়ায়,
হাসিতে মাখায় হাসি স্রধাধারা ছড়ায়,
ফুলদলে নাচাইয়া, লতা পাতা কাঁপাইয়া,
কুঞ্জবন হাসাইয়া মূহুরবে বহিল ।
কালিন্দীর কালজলে আমরা কি কুতূহলে
রবির কণকছটা ঝলমল করিল !—
তরঙ্গে ঢালিয়া অঙ্গ তালে তালে নাচিল ।

৩

কালিন্দীর কালজলে কিবা শোভা হইল!
নব খনদলে যেন সৌদামিনী হাসিল !—
লতা পাতা তরুদল সব হল সচঞ্চল,
একে, বঁকে, থেকে থেকে, ধীরে ধীরে
কাঁপিল !

হলে পর হিমালয়, সেও হেথা হ'ত লয় !
আমরি কালিন্দী কিবা গঙ্গাজলে মিশিল?
বরদার বক্ষে কেরে মসি-রেখা আঁকিল ?

৪

ত্রিটিশের জয়ন্তস্ত সমুন্নত বদনে
ভীমভূর্গ ছুটিতেছে চুস্বিবারে গগনে !
ভীষণ গস্তীর বেশ, উর্দ্ধজটা ব্যোমকেশ,
নিমগ্ন গভীর তপে !—সেও আজ কাঁপিল !
দেখিয়া কেহ না দেখে—দেখিয়া কেহ না
দেখে !—
না দেখিয়া কেহ কিংবা মনে মনে শিখিল--
যমুনার কাল জল কত খেলা খেলিল !

৫

দেখিতে দেখিতে ভানু অন্তগত হইল ।
হাসি হাসি মুখশশী শশধর উদিল !
আমরি কি রূপরাশি ! সকলি উঠিল হাসি--
রসবতী বসুমতী খল খল হাসিল ।
রজতের শুভ্রজলে জলস্থল ভাসিল !
তীরস্থিত পুষ্পাদ্যানে পুষ্পরাজি হাস্তাননে
হাসাইয়া জনমন কিবা মরি ফুটিল ।
গুণে বশ দিগ দশ, ঢল ঢল সুরাস,
সুধারসভারবাহী সমীরণ ছুটিল !
গুঞ্জরবে অলি সবে দিবা ভ্রমে । জুটিল
সাগর-অধরা মছী খেতাধর পরিল !—
একাকার ত্রিসংসার ! রূপে মন হরিল ।

৬

শুভ্র জল, শুভ্র স্থল, ফল, ফুল, তরু দল,
শুভ্রতর নীলাশ্বর!—কমনীয় কোলেতে
নবশিশু শুভ্রমুখ—হৃদয়ে উথলে সুখ,
ভাসে যথা ছেরি মাতা সুখ-সিন্ধু-জলেতে!
ভেসেছে সকলি পুত সুখ-সুখা-রমেতে।

৭

হায় পূর্ব কথা সব আজি মনে পড়িল।
সুখের সাগরে আই বাড়বাগ্নি জ্বলিল!
চলিয়াছ চল চল, হে যমুনে! বল বল
সে যমুনা তুমি কিগে!, যার কালজলেতে
ভাসিত রাদিকাশ্যাম পুত প্রেমরসেতে!
ফুটিত কণকপদ্ম, বিমল অমৃত পদ্ম—
মধুগন্ধে আমোদিত হত সব পরণী;—
যমুনে! তুমি কি সেই নববনবাণী?

৮

*যমুনে! তুমি কি সেই মৃদুকলনাদিনী?
কোথা সে গোপের বাল্য প্রকুল ফুলের ডালা
অধরে মোহনবাঁশী,—বল গজগামিনি,
কোথা রাখা-মনোহর—পরম পুরুষবর?
কোথা সে পবিত্র প্রেম? সুরবর্ণের নলিনী?
সেই হৃতা সেই গীত; সে বাজনা সুললিত
কোথা সেই মহোৎসব? তপনের গরিমা?
ও পবিত্র তব নীর সত্য কি গো কাল চির
কিংবা ভেবে ভেবে মনে পড়িয়াছে
কালিমা?
কালিমা হৃদয়ে যার, কিসে হাসি হবে তার—
পশিলে কুম্বে কীট সে কুম্বে ফুটে না!—
হতাশার চিত্তপটে ইন্দ্রধনু উঠে না।

৯

কাল স্বচ্ছ জল তব, তপন তনয়ে!

নহে কভু, পড়িয়াছে কালিমা হৃদয়ে!
উদ্বলিত চিত্তোচ্ছ্বাস, অত্যাশ প্রাশাস শ্বাস
হৃদয়-পাবক-ফ্লাস—স্কুলিঙ্গের অবনী!
তোমার এ হাসি নয়!—শশী কি উদ্ভিত হয়
অমানিশাগগনেতে?—তুমিই যে কেবলি
বাহিরে শীতল রয়ে, অন্তরে গরল বয়ে,
গুমরে গুমরে সদা জ্বলিতেছ ললনে;—
তা নয় তা নয় নয়; অচল সচল চয়
কাঁদিতেছে—পুড়িতেছে সদা মনোবেদনে।
কাঁদিব না আমি আর, আজিকে পেয়েছি
সার,

তব তটস্থিত যথা তক লতা বল্লরী—
বায়ুবিলোড়িত জলে, উত্তাল তরঙ্গ দলে
হয় বটে লগু ভগু,—ভূধর কি নগরী,—
সেই ধ্বংসে কিন্তু নয় ধ্বংস সেই সমুদয়—
কাঁপে বটে প্রভাকর—প্রতিবিশ্ব কেবলি!
সেই মত আজ সত্য তরঙ্গিত বসুমতী
নীরবিলে বায়ুবেগ হাসিবেক সকলি;—
ফুটিবে ও কালজলে সরসিজ-আবলী।

১০

কুলুকুলু ধনি করি প্রবাহিনী চলিল।
সেই স্বচ্ছ নীরে কিবা চঞ্চল বিদ্রাৎ বিভা
সুবর্ণ ব্রততী কোলে কুমুদিনী হুলিল।
নিশা হল অবসান, বিহঙ্গ ধরিল গান,
শীতল প্রভাত বায়ু মৃদু মৃদু বহিল।
পূর্বাধরে কেবা আসি ঢেলে দিল হাসি-
রাশি—
আমরি কি রূপ ছটা!—বসুন্ধরা জানিল!
অতি রমণীয় বেশ, কুম্বে সজ্জিত কেশ,
সুধামগ্নী উষাদেবী হাসি উকি মারিল!

আমরি এ কাককার্য অচলনা!—অত্যা-
শর্চা!—

প্রসন্ন সহাস্য আসা পুংঃ রবি উদিল।
আদরে জগতজন নবরসে মাতিল।

১১

অগ্নি উবা স্রহাসিনী! অমৃতের আসারে
হাসি যথা মৃদু মৃদু ভাসাইলে সবারে;—
শীতল শিশির জলে জুড় লে ধরাতলে-

সঞ্জিবিলে সমুদায় পুন নব জীবনে;—
এ হৃদয় কবে বল হাসাইবে? মনানল
জুড়াইবে—পার কি গো? মধুরস মি-
লনে?

হে রবি উঠিলে ভাল মাখিয়া কিরণজাল,
কবে হে উঠিবে হাসি এ হৃদয়-গগনে;—
ফুটিবে পরম পদ্ম দেখে তব বদনে।

শ্রীহরিরেমেহন মুখোপাধায়।

বিন্দন।

বিন্দন ভারতীয় ইতিহাস পটের এক-
খানি প্রধান চিত্র। প্রধান চিত্র বলিয়াই
অদ্যাপি বৈদেশিক সমালোচক গণ ইহা
লইয়া কৌতুক-প্রিয় জনগণের সমক্ষে
আস্কালন করিয়া বেড়াইতেছেন। এই
আস্কালন যাহারা দেখিতেছে, অথবা
লোকপরিষ্পারায় ইহার কাহিনী শুনিতেছে
তাহাদের কেহ অট্টহাস্যে করতালির
ধ্বনিতে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে, কেহ
ঘণায় মুখ বিকৃত করিয়া একটা অসহায়
পতিত জাতির দেহে কলঙ্কের হুর্গন্ধ পঙ্ক
ঢালিয়া দিতেছে, কেহ হুঃসহ মর্ষ বেদনার
অধীর হইয়া উদ্দেশে তর্জনী সঞ্চালন
করিতেছে, এবং কেহ বা নির্জন্মে গম্ভীর
ভাবে অতীত ঘটনা পর্যালোচনা করিয়া
হুঃখে, ক্ষোভে ও অভিমানে দীর্ঘনিঃশ্বাস
ফেলিতেছে। এই (বিচিত্র) আস্কালনে

আমরা বলি এই আস্কালন কিছু
মাত্র বিচিত্র নহে। ইহা হৃদয়ের অপরি-
বর্তনীয় মর্ষ অথবা প্রকৃতি-তরঙ্গিনীর অব-
শ্যস্ত্রাবী তরঙ্গ-লীলা। যখন যাহা পরি-
দৃশ্যমান সংসারের সমক্ষে আপনার
প্রভাব বিস্তার করে, মানব প্রকৃতি তখনই
তাহার বিচারে প্রস্তুত হয়, মানব কল্পনা
তখনই উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রাণে আরো-
হণ করিয়া দীর্ঘে দীর্ঘে তাহার অন্তর্গত
মর্ষ নানাবর্ণে রঞ্জিত করিতে থাকে। এই
মর্ষ অথবা এই কল্পনার বলে, সে হয়ত
সমাজে পূজনীয় হইয়া অনেকের হৃদয়গত
শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইবার অধি-
কারী হয়, অথবা হয়ত কলঙ্ক ও নিন্দার
পক্ষে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া দিকারের অধি-
তীয় পাত্র হইয়া থাকে। বনাস্ত-বিহা-
রিণী বিহঙ্গী যখন মানবের অগম্য কাননে
থাকিয়া অনন্ত লীলাকাশে মৃদুমধুর সঙ্গীত-

সুদা বর্ষণ করে, এবং আপনার সৌন্দর্য্য-মহিমায় আপনিই মুগ্ধ হইয়া শ্যামল তরুর শাখায় শাখায় নাচিয়া বেড়ায়, তখন কে তাহার বিষয় আলোচনা করে? কোন্ প্রাণিরস্তাস্ত্রের প্রতিপত্র তাহার স্ততিগীতিতে পরিপূরিত হয়? কোন্ কঠোর সমালোচকের কঠোর সমালোচনার তীব্রবাণে তাহার অযত্ন-রক্ষিত সূন্দর দেহ ক্ষত বিক্ষত হইতে থাকে? কিন্তু এই বিহঙ্গী যখন লোক-লোচনের সম্মুখবর্তিনী হয়, তখন ইহার সঘঞ্জে কত তুমুল আন্দোলন হইতে থাকে, বৈজ্ঞানিকের লেখনী ইহার যশ, গুণ প্রভৃতির সঘঞ্জে কত বিষয় অজ্ঞান সংগ্রহ করিয়া বিজ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকে। তখন কেহ এই বিহঙ্গীকে প্রাণ বিমুক্ত করিয়া উৎকট স্বার্থপরতা চরিতার্থ করে। কেহবা বিরাগে বিতৃষ্ণায় ইহার কোমল-দেহ-বিচ্ছিন্ন কোমল পালক-রাশি দূরে নিক্ষেপ করিয়া আপনার অহঙ্কারের পরিচয় দিতে থাকে।

ঝিন্দন যদি এই বনবিহারিণী বিহঙ্গীর স্থায় আপনার মহিমায় আপনিই বিমুগ্ধ থাকিতেন; অথবা বিমুগ্ধ হইয়াই আপনার মহিমা বিকাশ আপনিই করিয়া স্বস্তী হইতেন তাহা হইলে তিনি কখন কাহারও বিস্মিত বাণ বা প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলির লক্ষ্য হইতেন না। অনন্ত-প্রসারিত গগনতলে ক্ষুদ্র নক্ষত্র-বিন্দুর স্থায় অথবা অনন্ত বিস্তৃত জলদি-হৃদয়ে নগণ্য জল-বিঘের স্থায় তিনি নীরবে উ-

স্থিত হইয়া নীরবেই বিলয় পাইতেন। কিন্তু ঝিন্দন এরূপ নীরবে সমুস্থিত হয়েন নাই। অনেকে বিশ্বয়-স্তিমিত নেত্রে তাঁহার সমুস্থান চাহিয়া দেখিয়াছে; অনেক মন্ত্রণাপর রাজনীতিজ্ঞের হৃদয়ে তাঁহার সমুস্থান আশঙ্কা উৎপাদন করিয়াছে। ওয়াটালুর তীষণ ক্ষেত্রে যাহারা টলে নাই, পলাশির শোণিত স্রোত দর্শনে যাহারা বিচলিত হয় নাই, রাজনীতির রহস্যধারণে যাহারা অসামর্থ্য প্রকাশ করে নাই, যাহারা বারিদি বেষ্টিত একটা ক্ষুদ্র দ্বীপে বাস করিয়া সমগ্র পৃথিবীর নিকট বীরত্ব ও রাজনীতিজ্ঞতার পূজা পাইয়া আসিয়াছে, ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এক হইয়া যাহাদের প্রভুশক্তির নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে; ঝিন্দন তাহাদিগকেও নিস্তেজ বণিক-প্রকৃতিক বলিয়া উপহাস করিতেন; তাহাদের বিভীষিকাও ঝিন্দনের তেজস্বি হৃদয়ের কঠিন আবরণ ভেদ করিতে অসমর্থ হইত। এরূপ তেজস্বিনী ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ললনার চরিত্র লইয়া যে বৈদেশিক সমালোচক গণ আক্ষালন করিবেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে।

কিন্তু বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা এই, ঝিন্দন যাহাদের হৃদয়ে আঘাত দিয়াছেন, যাহাদিগকে বিকলাঙ্গ করিতে সাধ্যমত প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহারাই ঝিন্দনের চরিত্র-পটের চিত্রকর হইয়া সাধারণের সমক্ষে উপনীত হইয়াছে। সুতরাং এ-

তৎ প্রসঙ্গে তাহাদের আক্ষালন আপনা হইতেই নিয়মিত সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। মানব মন সহজেই দুর্বল, সহজেই চঞ্চল, ও সহজেই তারল্য-বিকাশক। ইহা ধীরতা ও বিবেকের অবলম্বনে না চলিলে এই অপরূপ সংসার-প্রলয় পয়োধির জলোচ্ছ্বাসে একবারে নিমগ্ন হইয়া যায়। পদ্মপত্রের উপর বারিবিন্দু যতক্ষণ স্থির ভাবে থাকিতে পারে,—ততক্ষণ মন যদি ধীরতা ও বিবেক বিহীন হয়, তাহা হইলে কর্তব্য বুদ্ধি একবারে স্তম্ভিত হইয়া আইসে। এই কর্তব্য বুদ্ধির স্তম্ভী-ভাবে যদি অকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে বিন্দনের চরিত্র অল্পনে নিঃসন্দেহ সেই অকার্য্যানুপাতের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে।

চিত্রকর চিত্রের যথাযথ স্থলে যথাযথ বর্ণ প্রতিকলিত না করিলে চিত্রখানি যে-রূপ কদাকার ও অশুদ্ধ হয়, বৈদেশিক চিত্রকরের হস্তে বিন্দনের চিত্রও ঠিক সেই রূপ কদাকার ও অশুদ্ধ হইয়াছে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যত কিছু কলঙ্ক, যত কিছু পঙ্কিল পদার্থ ও যত কিছু অস্পৃশ্য ঘৃণাহ সামগ্ৰী আছে, চিত্রকর অস্মানবদনে, অস-কৃত্তিত হৃদয়ে, তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া বিন্দনের চিত্র আঁকিয়াছেন। কলঙ্কই এই চিত্রের উপাদান এবং একটি নারীকে কলঙ্কিনী করিয়া তৎসংস্পর্শ একটি প্রবল আড়ির উপর সাধারণের বিরাগ উৎপা-

দনই এই চিত্রের উদ্দেশ্য। চিত্রকর এই উপাদান সঞ্চলনে ও এই উদ্দেশ্য সাধনে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার সহিষ্ণুতা ও উদারতার বিশেষ প্রশংসা এই, তিনি এই সমস্ত কলঙ্কের ভার বহনে কিছুমাত্র কাঁতর হয়েন নাই, ইহার উৎকট দুর্গন্ধে নামিকা সঙ্কুচিত করিয়া কিছুমাত্র মুখ বিকৃত করেন নাই। সংসার-বিরাগী পরমাত্মনিষ্ঠ পরমহংসের ন্যায় তিনি সকল প্রকার দুর্গন্ধময় দ্রব্যই আদরে আঁকির চিত্রে হস্তে করিয়া আপনার কার্য্য সাধন করিতেছেন। ইহাতে ঘৃণা, লজ্জা অথবা বিরাগ আসিয়া তাঁহার কার্য্যে বাধা জন্মায় নাই। এইরূপ ধীরে ধীরে কলঙ্কের রেখাপাত করাতে চিত্রের সকল স্থানই কলঙ্কময় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কোনও স্থলে কমণীয়তার বিকাশ নাই, কোনও স্থলে সরলতার স্ফুর্তি নাই, এবং কোনও স্থলে পবিত্র সৌন্দর্য্যের মদালসবিভ্রম নাই। অবায়ু-সস্তাড়িত অপার জলধিতে যেমন একই নীলিমা ভাসিয়া বেড়ায়, নিষ্কম্প জলধর পটলে আচ্ছাদিত গগণে যেমন একই কালিমা লীলা করে, এই চিত্রের প্রতি রেখাতে সেইরূপ একই কলঙ্ক বিকাশ পাইতেছে। শবাসনা লোলরসনা কধিরাভদেহা দিগম্বরী ভৈরবীর মূর্তিতে অথবা রোমের বীর চূড়ামণির প্রেম ভিখারিণী সৈশরী রাজবালাতেও মাধুর্য্য ও পবিত্রতার আভাস সম্ভবে, কিন্তু এই চিত্রে অণুমাত্র মাধুর্য্য ও পবিত্রতার

রেখাপাত সম্ভবে না। কালের কয়াল রাজ্যে তীব্র হলাহলময় যত নরক আছে, তৎসমুদয়ের প্রতিবিম্বই এই চিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। বিন্দনের ও বিন্দন-সংস্কৃষ্ট জাতির সহিত যাহাদের সহানুভূতি নাই; ইহাদের অভ্যুদয়ে যাহাদের লাভের স্পৃহা নাই, তাহারা যে এই কলঙ্কময় চিত্রের কলঙ্কিনী আভা দেখিয়া ঘোরতর করতালি-ধ্বনির সহিত অট্টহাস্যে উপহাস করিবে, তাহাও কিছু বিচিত্র নহে।

কিন্তু বৈদেশিক চিত্রকরের সকলেই যে ভারতীয় ইতিহাসপটে এইরূপ কালিমা বিস্তার করিয়াছেন, আমরা প্রাণান্তেও তাহা বলিব না। অনেক বৈদেশিক, ধীরতা ও বিবেকের মন্ত্রণায়, বিন্দনের সহিত বিলক্ষণ সন্মত হইয়াছেন। এবং ন্যায়ের দিকে চাহিয়া বিন্দনের কার্য-কলাপের সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাদের প্রতিভাবে পূর্বে কালিমা অপসারিত হইয়া বিন্দনের চরিত্রে যথাযথ বর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে। আমরা যদি একথা স্বীকার না করি তাহাই হলে আমরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ, হৃদয়হীন ও অমানুষপ্রকৃতি। দরিদ্র অসহায় ভারতবর্ষ দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত এই অপকৃপাত পুরুষসিংহদিকাকে অভিবাদন করিতেছে।

কি কি পাপ কার্য দেখাইয়া বৈদেশিকগণ বিন্দনকে কলঙ্কিনী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহার কোনও উল্লেখ করিব না। বিন্দন ধীরে

ধীরে যখন রাজাধিরাজ রণজিৎ সিংহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, ধীরে ধীরে যখন রণজিৎের সহধর্মিণীরূপে পরিগৃহীত হইয়া আপনার ভবিষ্য ক্ষমতার অক্ষপাত করেন, এবং ধীরে ধীরে যখন কোহিনুরের কান্তিতে বিভাসিত হইয়া লাহোরের দরবারে রাজনীতির পর্যালোচনা করেন, বৈদেশিকের নেত্রে তখন তাঁহার যেরূপ পাপীরসী মূর্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, সে মূর্তি ধ্যান করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ইহার পর বিন্দন যখন স্বীয় নিরতিনেমির বহুবিক আবর্তনের পর কারাগার হইতে বিমুক্ত হইয়া বারিদি বেষ্টিত অপরিচিত ও অজ্ঞাতস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়েন, এবং এই স্থানে যখন অদৃষ্ট-লিপি তাঁহার জীবনশ্রোতঃ কালের অনন্ত শ্রোতে মিশাইয়া দেয়, তখনও বিন্দনকে দয়ার চক্ষে নিরীক্ষণ করা হয় নাই। অদিক কি, অদ্য যে পুরুষসিংহ ইংলণ্ডে থাকিয়া সকলের নিকট আদর ও প্রীতি পাইতেছেন, ভারতের ললটমণি রাজরাজেশ্বরী বিষ্টোরিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সম্মানিত করিতেছেন, কলঙ্কিনী বিন্দনের সম্মান বলিয়া তিনিও কলঙ্কী হইয়া ইতিহাসের পত্রে পত্রে লীলামর্কটের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। এই সমস্ত কলঙ্কের কাহিনী শুনিলেও কর্ণে হস্তার্পণ করিতে হয়। বৈদেশিকগণ এই পাপ, এই কলঙ্ক, এত সুপে সুপে মাজাইয়া রাখিয়াছেন যে, ভারত মহাসাগর শতবর্ষ পরিগ্রহ ক-

করিয়াও ইহা প্রকাশিত করিতে পারিবে না, হিমালয় স্বীয় গগনস্পর্শী শৃঙ্গাবলী পাতিত করিয়াও ইহা ধূলি রাশিতে পরিণত করিতে সমর্থ হইবে না।

আমরা বিন্দনকে চিরকাল দয়ার চক্ষেই দেখিব; কঠোর আঘাতে কঠোর প্রহারে যে অবলার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে তাহাকে আবার পদাঘাত করা শূন্য মহাপাপ, চিরকাল ইহা আমরা মনে রাখিব। অবলা চিরদিনই প্রীতির পুত্রলী। অবলা চিরদিনই দয়ার পাত্র। ইহার পর যখন দেখিতেছি, বহুলোকে বহুদিক্ হইতে একটি অবলাকে ধরিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব তাঁহার ডনা করিতেছে, অবাচ্য ভৎসনার স্তম্ভিত্ত্ব বাণে তাহার হৃদয়প্রস্থি বিচ্ছিন্ন করিতেছে, এবং মৃত হইলেও নিরন্ত না হইয়া অকথ্য কলঙ্কের মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার পরলোকগত আত্মার তর্পণ করিতেছে; তখন কে কোন্ প্রাণে সেই অবলার মৃতদেহে আঘাত দিতে সমুদাত হয়? কে কোন্ প্রাণে তাঁহার শত্রুদের উদ্দেশ্যিত নিন্দাবাদের পুনরুদ্বোধনা করে? এই জনাই আমরা দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে বলিতেছি, বৈদেশিক সমালোচকগণ বিন্দনের চরিত্রে যে যে কলঙ্কের আরোপ করিয়াছেন, তাহার পুনরুদ্বোধনা করিয়া লেখনীকে কলঙ্কিত করিব না। এতুলে জনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বিন্দনের প্রতি যে যে দোষ আরোপিত হইয়াছে, যদি তৎসমুদয় সত্য হয়, তাহা

হইলে প্রকাশ করায় দোষ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্ব, লোকে বিন্দনকে যে যে কলঙ্কে কলঙ্কিত বলিতেছে, সে সকল প্রকৃত ঘটনার উপর স্থাপিত কি না তাহার মীমাংসা করা কর্তব্য। এই মীমাংসা একবারে অসম্ভব নহে। প্রতিদ্বন্দ্বিগণ যে যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকল বিষয় উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা দৃঢ়তর হয় নাই। সুতরাং তাহার উপর সহজে বিশ্বাস স্থাপিত হইতে পারে না। এদিকে বিন্দনের যে অনন্যসাধারণ প্রভাব ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বিগণ তাহার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ঘটনাবলীর এইরূপ অসম্পূর্ণতার একরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে, বিপক্ষ সম্প্রদায় কেবল বিষম অন্তর্দাহে অধীর হইয়া বিন্দনকে সাধারণের নিকট অপদস্থ করিয়াছেন। সুতরাং আরোপিত দোষ প্রকাশ করিয়া ফল কি? হইতে পারে বিন্দন অবলাসুলভ কমণীয়তার বশীভূত হইয়া একজনের প্রতি অধিক অনুগ্রহ দেখাইতেন, অথবা একজনকে অধিক ভাল বাসিতেন; ন্যায়ের অনুরোধে আমরা ইহা অবশ্যই স্বীকার করি যে, পক্ষনদের অধিশ্রীর এইরূপ পক্ষপাতিত্ব দোষের মধ্যে গণনীয়। ইহার জন্য বিন্দনকে অপরাধিনী বলিতে আমরা পীড়িত নহি। কিন্তু “অপরাধিনী” বলিবার পূর্ব্ব একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিব। অনুগ্রহ প্রদর্শন ও ভালবাসা অবলাহৃদয়ের অনিবার্য্য ধর্ম্ম। বিন্দন অবলাহৃদয়ের

অধিকারিণী হওয়াতেই এই অবলাধিকারী
কাশ করিয়াছেন। বিচারক জগৎ ইহা-
তেও তাঁহাকে মার্জনা করিল না। বাঁহারা
জগতের সমক্ষে আপনার প্রভাব বিকাশ
করেন, তাহাদের হৃদয়ের প্রতি স্তর এই-
রূপ কঠোরভাবেই পরীক্ষিত হইয়া থাকে।

ঝিন্দনের অন্য শত অপরাধ থাকুক,
কিন্তু তিনি পঞ্জাবে আপনার প্রভুত্ব যেরূপ
বিস্তার করিয়া সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আ-
কর্ষণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম
ইতিহাসের স্মৃতিগীতিতে অনন্তকাল বি-
ঘোষিত হইবে। ঝিন্দন যখন পঞ্জাবের
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন, যখন আপ-
নার অপূর্ব প্রভাব ও অপূর্ব প্রতিভাবে
স্বক্ষমানস্বক্ষমরূপে রাজকার্য্য পর্যালোচনা
করিতে লাগিলেন, তখন সমস্ত পঞ্চদশ
সমস্রমে গাজীদ্বাংস করিয়া তাঁহার লো-
কাভীত তেজস্বী মহিমার নিকট মস্তক অব-
নত করিল। দরবারের অমাত্যগণ তখন
তাঁহাকে তেজস্বী রণজিৎ সিংহের উপ-
যুক্ত তেজস্বিনী মহিষী বলিয়া শ্রদ্ধা ক-
রিতে লাগিল, এবং রাজ্যের প্রজাগণ ত-
খন তাঁহাকে রক্ষাকর্ত্রীমাতা বলিয়া ভক্তি
করিতে লাগিল। এক্ষণে আমরা ঝিন্দ-
নের এই তেজস্বিতা এবং প্রজাসাম্রাজ্যের
এই ভক্তি ও শ্রদ্ধার বিষয় কিছু কিছু ব-
লিয়া বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

দলীপ সিংহ যখন পঞ্জাবের সিংহা-
সনে আরোহণ করেন, তখন হইতেই ঝি-
ন্দনের ক্ষমতার বিকাশ হইতে থাকে।

ঝিন্দন এত দিন খনির অন্ধকারময় গর্ভে
থাকিয়া আপনার প্রভাব আপনাই দীপ্তি
পাইতেছিলেন, এক্ষণে খনির গর্ভ হইতে
সমুখিত হইয়া চতুর্দিকে সেই দীপ্তি বি-
স্তার করিতে লাগিলেন। রণজিৎ সিংহের
পরলোক প্রাপ্তির পর পঞ্জাব রাজ্য যে-
রূপ অশ্রুবিদ্রোহের ভয়াবহ তরঙ্গে আ-
ন্দোলিত হয়, তাহা ইতিহাস পাঠকগণ
সবিশেষ অবগত আছেন। দলীপ সিংহ
এই সময়ে নাবালক; সুতরাং রাজ্যসং-
ক্রান্ত কোন কার্য্যেই তাঁহার হাত ছিল
না। ঝিন্দন এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে লাছো-
রের সিংহাসনে সমাসীন হইয়া রাজ্যের
স্বব্যবস্থা করিতে যত্ন করেন। তিনি প্র-
তিদিনই নিয়মিত সময়ে দরবারে উপস্থিত
হইয়া রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতেন,
এবং প্রতি দিনই স্বীয় শিশু পুত্রের রাজ্য
নিষ্কণ্টক ও নিকপত্র করিবার জন্য রাজ-
নীতির গূঢ়তম মর্মে উদ্বেদ করিয়া সকলকে
বিস্মিত করিতেন। যে দুই প্রতীপপ্রবাহ
পরম্পরের আঘাতে প্রতিঘাতে হিংসাপ-
রাগ হইয়া বেলাভূমি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে
ছিল; ঝিন্দনের প্রভাবে তাহারা এক-
ত্রোতে মিশিয়া শান্তভাবে প্রবাহিত হয়।
বাহারা দীর্ঘকাল কেশাকেশি, মুটামুটি,
শোণিতভাবে অদীর হইয়া উত্তর ও দক্ষিণ,
পূর্ব ও পশ্চিম হইতে পরম্পরে পরম্প-
রকে রোষকষায়িত নেত্রে নিরীক্ষণ ক-
রিতে করিতে দর্পের স্পর্ধা করিতেছিল,
ঝিন্দনের প্রভাবে তাহারা একহাড়, এক

প্রাণ হইয়া পরস্পরকে প্রীতিভাবে আ-
লিঙ্গন করে। বাঁহার হৃদয় এইরূপ তে-
জস্বিতার পরিপূর্ণ, বাঁহার মন এইরূপ উ-
চ্চতর প্রাণে আকৃষ্ট, সে কখন অসার বা
অপদার্থ হইতে পারে না।

যখন বিন্দন পঞ্জাবের শীর্ষস্থানে ব-
র্তমান, রাজা লাল সিংহ তখন উজীরের
পদে আকৃষ্ট। লাল সিংহের কোনও অ-
মাতোচিত গুণ ছিল না। পঞ্জাবের স-
কলেই তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন ক-
রিত। লাল সিংহ পঞ্জাবে থাকিয়া উচ্চ-
তম সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন
বটে, কিন্তু এই সৌভাগ্যে তাঁহার কোনও
গুণ বিকাশ পায় নাই। তাঁহার সৌন্দর্য্য
কেবল দেহ-যুক্তিতেই পর্যাবসিত হইয়াছিল,
উহা আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে উপগত হইয়া
চিত্তের উদারতা সাধন করে নাই; স্মৃশাস-
নক্ষমতা কেবল অন্তঃপুর প্রকোষ্ঠেই সীমা-
বদ্ধ ছিল, উহা বহিঃপ্রদেশে প্রসারিত হ-
ইয়া রাজ্যের উন্নতি সাধন করে নাই; রণ-
নিপুণতা কেবল তোষামোদ-প্রিয় কুপোষ্য
সম্প্রদায়ের সমক্ষেই প্রকাশিত হইত,
উহা রণস্থলে প্রদর্শিত হইয়া সৈন্যাদিগকে
উৎসাহ দেয় নাই। ফলে লালসিংহ শি-
খসমাজে ধুমকেতু স্বরূপ ছিলেন। বিন্দন
এই ধুমকেতুর প্রতি কিছুমাত্র বিরাগ প্রদ-
র্শন করেন নাই! প্রত্যুত, নানা প্রকারে উ-
হার প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। বিন্দনের চরিত্রের
এই অংশ নিত্য ক্ষীণ ও নিত্যস্থ দুর্বল।
এই ক্ষীণতা ও এই দুর্বলতা বিন্দনের অব-

লাপ্রকৃতির দোষ। বিন্দন লাল সিংহের
প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইতেন এবং
তাঁহাকে সাধারণ লোক অপেক্ষা একটুকু
অধিক ভাল বাসিতেন; সুতরাং অনুগ্রহ
ও ভালবাসার পাত্রের দোষ বিন্দনের
চক্ষে দোষ বলিয়াই পরিগণিত হয় নাই।
আমরা! পূর্বেও বলিয়াছি, এক্ষণেও বলি-
তেছি, বিন্দনের এই দোষ অবলাহুদয়ের
দোষ বলিয়াই আমরা চিরকাল দয়ার চ-
ক্ষেই দেখিব।

রাজত্বের মৃত্যুর পর খালসা সৈন্যের
বিশৃঙ্খলা ও যথেষ্টাচারিতা দেখিয়া ইং-
রেজগণ আপনাদিগের সীমান্তপ্রদেশ
(Frontier) রক্ষা করিবার স্ববন্দোবস্ত
করিলেন। এজন্য বহুসংখ্যক সৈন্য ব্রিটিশ
রাজ্যের সীমায় উপস্থিত হইল। ব্রিটিশ
গবর্নমেন্টের এই উদ্যোগ দর্শনে খালসা
দিগের হৃদয় নানাপ্রকার আশঙ্কিত তরঙ্গে
আন্দোলিত হইতে লাগিল। বিন্দনও
এই তরঙ্গের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন
না। বিন্দন যখন পঞ্জাবে আধিপত্য ক-
রিতেছিলেন, তখন সীমান্ত ভাগে ইংরে-
জদিগের সৈন্য-শৃঙ্খলা দেখিয়া ভাবি-
লেন, ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট আপনাদের সী-
মায় যেরূপ আট ঘাট বাঁধিতেছেন, তা-
হাতে ইচ্ছাং পঞ্জাবরাজ্য আক্রান্ত হইতে
পারে। পূর্ব-স্মৃতি আসিয়া তাঁহার এই
ভাবনার সহায় হইল। বিন্দন আবার
ভাবিলেন, ইংরেজগণ এইরূপা কৌশলেই
ভারতে আপনাদের রাজ্য প্রসারিত ক-

রিয়াছে; এইরূপ কৌশলেই স্বাধীন রাজ্য সমূহে পরাধীনতার ছুরি হ লোঁহ নিগড় পরাইয়া দিয়াছে। এই কৌশলের বলেই দক্ষিণে মহারাষ্ট্র দীর্ঘকাল হস্ত সঞ্চালন, পাদমস্তাডন ও শোণিত মোক্ষণের পর, কালের বিকট ক্ষণে শয়ন করিয়াছে, এবং এই কৌশলের বলেই মধ্যে মুসলমান যোগরত তপস্বীর ন্যায় উর্দ্ধমেজ হইয়া আপনার পূর্বে গৌরবের ধ্যান করিতেছে। এইরূপ ভাবনার অধী হওয়াতেই বিন্দন প্রথম শিখ যুদ্ধানলের ইন্ধন সংগ্রহ করিতে পরাভূত হইয়ন নাই। যে আশঙ্কায় খালসাগণ মদমত্ত বারণের ন্যায় শতক্র পায় হইয়া ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ করিল, সেই আশঙ্কায়ই বিন্দন তাহাদিগকে নিরস্ত না করিয়া উৎসাহিত করিলেন। ইহাতে বিন্দনের যে বিশেষ সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আমরা স্বীকার করিব না। বিন্দন এবিষয়ে যদি তাঁহার পতির অবলম্বিত নীতি অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতার সম্মান রক্ষা পাইত।

লালসিংহও তেজসিংহের বিশ্বাসঘাতকতার প্রথম শিখ যুদ্ধে খালসাদিগের পক্ষীয় হইল। বিন্দন এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই একপ্রকার ব্রিটিশ-সিংহের করায়ত্ত হইলেন। স্মরণ্য প্রথম শিখ যুদ্ধের পরই বিন্দনের অদৃষ্ট-চক্র এক এক গ্রাম নিম্নে বাইতে লাগিল। কিন্তু তেজস্বিনী বিন্দনের তেজস্বি হৃদয় ব্রিটিশ

সিংহের ছুরি বার তেজের নিকট পরাভূত হইল না। বিন্দন অটল পর্বতের ন্যায় অটল হইয়া রহিলেন। তাঁহার রাজ্য পরপদানত হইয়াছে, পরজাতি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া তাঁহার রাজ্যে আসিয়া আপনাদের ইচ্ছানুসারে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছে, ইহা তাঁহার অসহনীয় হইল। বিদেশীর এই আশ্পর্ক, এই অধিকারপ্রিয়তার বিন্দন মর্মে আঘাত পাইলেন। কাহিনীর কোমল হৃদয় অপমান-বিষে কালীময় হইয়া উঠিল।

রেসিডেন্ট (হেনরী লরেন্স) বিন্দনের প্রকৃতি বুঝিতে পারিলেন। একপ তেজস্বিনী নারী লাহোরে থাকিলে যে আপনাদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রহিবে না, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। এই বিশ্বাসেই রেসিডেন্ট বিন্দনকে লাহোর হইতে সেখপুরে নির্বাসিত করিলেন। সেখপুরও দীর্ঘকাল বিন্দনের লাভণ্য তরঙ্গে তরঙ্গায়িত রহিল না। পরবর্তী রেসিডেন্টের (ফেডরিক কারি) মন্ত্রণায় বিন্দন সেখপুর হইতে আবার বারণসীতে নির্বাসিত হইলেন। এইরূপ উপায়পরি নির্বাসনে বিন্দনের কিছুমাত্র বিকার পরি লক্ষিত হইল না। প্রকৃত বীরজায়া ও বীরনারীর ন্যায়, বিন্দন অটল ভাবে অধিকার চিন্তে স্বীয় দশা-বিপর্যায়কে আলিঙ্গন করিয়া পঞ্জাব পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। বিন্দন এক সময়ে যে লাহোরের সিংহাসনে অধিরোধ করিয়া

চারদিকে আপনার গৌরব বিকাশ করিয়াছিলেন, যে লাহোরের অমাত্য-সমিতি এক সময়ে বিদ্বানের অপ্রতিহত প্রভুশক্তির নিকট অবনতমস্তক ছিলেন; সেই লাহোর পরিভাগ সময়ে বিদ্বানের যেরূপ স্থিরতা দৃষ্ট হইয়াছিল, পঞ্জাব পরিভাগ সময়ে ও সেইরূপ স্থিরতার কিছুমাত্র হানি হইল না। যে পঞ্জাব এককাল তাঁহাকে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় পূজা করিয়া আসিয়াছিল, এক্ষণে সেই পঞ্জাব তাঁহার নেত্র বিনোদনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। স্থির হৃদয়ে বিদ্বান পঞ্জাব পরিভাগ করিলেন। বৈদেশিকের নিকট বিদ্বানের চরিত্রগতি বতই নিম্নগামিনী বলিয়া বোধ হউক না কেন, বৈদেশিক চিত্রকরের হস্তে পড়িয়া বিদ্বানের চিত্র বতই কালিমায় পরিণত হউক না কেন, বিদ্বান এই স্থিরতার জন্য নারী সমাজে গরীয়সী বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

এই নিরীক্ষান-ঘটনাই বিদ্বানের সৌভাগ্য-অভিনয়ের যবনিকা পতন। এই যবনিকা-পতনের অব্যবহিত পরে পঞ্জাবে যে ভয়াবহকাণ্ড সজ্জাটি হয়; বিদ্বানের নিরীক্ষানই তাহার অন্যতম কারণ। এই ভয়াবহকাণ্ড দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ শিখদিগের স্বাধীনতা-ইতিহাসের শেষ অধ্যায়; এবং দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ শিখদিগের সৌভাগ্য-নেমির শেষ আবর্ত। সাগরের দুই উত্তর জলোচ্ছ্বাস যেমন ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে প্রলয়ের ধ্বজা স্বরূপ

আসিয়া পরম্পরের সংঘর্ষে ভীষণ কোলাহল সমুখিত করে, এবং বহুক্ষণ যাত প্রতিঘাতের পর শ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়া অনন্ত বারিরাশির সহিত মিশিয়া যায়, দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে ও সেইরূপ দুইটি প্রবল জাতি বিশ্ব-ত্রাস গর্জনে বিভিন্ন দিক্ হইতে আসিয়া বহুক্ষণ হস্তাহস্তির পর এক ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ রণ-জিৎরাজ্যে করাল প্রলয়-কাদম্বিনী। ইহার জংকম্পকারী জল-প্রবাহে শিখদিগের প্রভু মহত্ব সমস্তই বিধৌত হইয়া গিয়াছে। রণজিৎ সিংহ ইন্টকের উপর ইচ্ছক প্রথিত করিয়া যে মনোহর অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন, এই যুদ্ধের প্রবল বাত্যাতেই তাহা স্থলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। অপর দিকে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ শিখ দিগের বীর্যবিক্রম অসাধারণ বিস্মুরণকারী। গুরুগোবিন্দ সিংহ যে ফল লক্ষ্য করিয়া শিখদিগকে সাধারণ উজ্জ-সমাজে একত্রিত করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধেই তাহা পরিপক হয়। যে চিনিয়ান ওয়ালার নাম ভারত ইতিহাসে খণাকরে অঙ্কিত রহিয়াছে, যে চিনিয়ান ওয়ালার জন্য ভারতবর্ষ বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় হইয়া প্রাণগত প্রদ্বার পূজা পাইয়া আসিতেছে; যে চিনিয়ান ওয়ালার শিখদিগের হৃদমনীয় তেজের নিকট ওয়া-টালুজির ত্রিচীষ তেজও পরাভব মানিয়াছে; দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধেই সেই চিনিয়ান ওয়ালার পুণ্য-পুঞ্জময় মহাতীর্থ হইয়া সক-

লের রসনায় রসনায় লীলা করিতে থাকে। বৈদেশিকের লিখিত ইতিহাস বাহাই ব-লুক না কেন, আমরা অসকুচিত হৃদয়ে ঝিন্দনের নিরীক্ষনকেই এই প্রলয়-ঘটনার অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দেশ করিব। অনেকে বলিতে পারেন, ঝিন্দনের নিরীক্ষন-সময় পঞ্জাবে বিপাকের কোন ও চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। কেহই অশ্রুপাত, হাহাকার, শিরে করাঘাত করিয়া এই নিরীক্ষন-সময় চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় নাই। পঞ্জাব নিবাস, সিন্ধু সমুদ্রের ন্যায় দীর ভাবে ঝিন্দনের নিরীক্ষন চা-হিয়া দেখিয়াছে ; " সুতরাং ঝিন্দনের নি-রীক্ষনকে শিশুজাতির লুপ্তাশ্রম ও তন্ত্রিবন্ধন বুদ্ধ-গজ্ঞটনের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে না। বাহারা এইরূপ বলিয়া পবিত্র ইতিহাসের সম্মান নষ্ট করিতে চাহেন, তাহারা মানব প্রকৃতির তত্ত্বান-ভিজ্ঞ। আমরা শত হস্ত দূর হইতে তাহাদিগকে অভিবাদন করি। তাহারা বাহাকে আক্লাদের চিহ্ন মনে করেন, আমরা তাহাকেই বিষয়-মর্মে-পীড়ার বি-ষম দাহন মনে করি; এবং তাহারা বাহাতে মুখ ও শান্তি দেখিয়া মুখী হইলেন, আমরা তাহাতেই গভীর আতঙ্ক ও গভীর মনো-বেদনা দেখিয়া দুঃখিত হই।

যে দুঃখ হৃদয়ের স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে না; তাহা সামান্য বাহু বি-কারের সহিতই বিশেষিত হইয়া যায়। এই দুঃখ দুঃখের অভিনয় প্রদর্শন মাত্র।

যখন দেখি, কেহ দুঃখে অধীর হইয়া দুই হস্তে মস্তকের কেশউৎপাটন করিতেছে, হাহাকারে রোদন করিয়া চারিদিকে জনতা বুদ্ধি করিতেছে, তখন সদয় ভাবে তাহাকে দুঃখের অভিনয়কারী বলিয়াই নির্দেশ করিব; কিন্তু যখন দেখিব, কেহ কোন ঘোরতর আকস্মিক বিপৎপাতে প্রিয়মান হইয়া অস্বাভাবিকভাবে সাগ-রের ন্যায় দীর ভাবে বলিয়া আছে, মস্ত-কের এক গাছি কেশও নড়িতেছে না, এক বিন্দু অশ্রুও নেত্র হইতে বিচ্যুত হ-ইতেছে না; হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত তৃতান ধস্, ধস্, করিতেছে, কোন বাহু ভঙ্গীর সহিত তাহার তাপ বাহিরে আসিয়া প-ড়িতেছে না; পরমাত্মসংযত, ধ্যানস্তি-মিতনেত্র যোগীর ন্যায় নিঃশব্দ ও নিষ্পন্দ ভাবে সে আপনার জ্বালায় আপনাই পুড়িয়া মরিতেছে; তখন তাহাকে কাতর ভাবে দুঃখের জীবন্ত মূর্তি বলিয়াই উল্লেখ করিব। " অল্প দুঃখ নেত্র বারির সহিতই বিগলিত হয়; অল্প ক্রোধ ক্রকুৎসন ও দস্ত ঘর্ষণের সহিতই নিরীক্ষিত হইয়া যায়; অল্প আশঙ্কা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিতই বি-লয় পায়। " কিন্তু যে দুঃখ হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রসারিত হয়, যে ক্রোধ শিরীয় শি-রায়, ধমনীতে ধমনীতে সঞ্চারিত হইয়া জ্ব-লন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করে, যে আশঙ্কা মর্মে মর্মে বজ্রমূল হইয়া অন্তঃকরণকে তীব্রভাবে আন্দোলিত করিতে থাকে, তাহা কখনও অশ্রুজল, ক্রকুৎসন ও দীর্ঘ

নিঃশ্বাসের সহিত বিলীন হয় না। বিন্দ-
নের নির্বাসন সময়ে পঞ্জাবের যে নিশ্চল
ভাব লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা এইরূপ দুঃখ,
ক্রোধ ও আশঙ্কা-মূলক। পঞ্জাবের এই
নিশ্চলতা শান্তির নিশ্চলতা নহে; ইহা
গভীর দুঃখ, গভীর ক্রোধ ও গভীর আশ-
ঙ্কার নিশ্চলতা। এই দুঃখ, ক্রোধ ও আশ-
ঙ্কার দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ সমুপস্থিত হয়। ঙ্ক
গোবিন্দ সিংহের মহিমা-বলে পঞ্জাবের
অন্তর্নির্গূঢ় জুবানল এই যুদ্ধের সময়েই
প্রচণ্ড হতাশনে পরিণত হইয়া বিষম স্কু-
লিঙ্গক্রোড়া প্রদর্শন করে। যে বীর শ্রেষ্ঠ
চিনিয়ান ওয়ালায় বিজয় বৈজয়ন্তীতে
পরিশোভিত হইয়াছিলেন; যুদ্ধের সময়
সাঁহার হস্তে সেনানায়কতা সংরক্ষিত ছিল,
সেই পুরুষ-পুঙ্গব সের সিংহ ও বিন্দনের
নির্বাসনে মর্মান্বিত হইয়া স্পষ্ট উল্লেখ
করিয়াছেন, “ইহা সকলেই ভালরূপে
জানিতে পারিয়াছেন, সমস্ত পঞ্জাব-
বাসী, সমস্ত শিখ, সংক্ষেপতঃ সমস্ত পু-
থিবীর বিদিত হইয়াছে, ফিরিঙ্গিগণ কি-
রূপ দৌরাত্ম্য, অত্যাচার ও বিশ্বাস-ঘাত-
কতাসহকারে পরলোক-স্বখ-ভোগী রণ-
জিৎ সিংহের বিধবা মহিষীর সহিত বাব-
হার করিয়াছে, এবং কিরূপ দৌরাত্ম্যে
এই রাজ্যের লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত ক-
রিয়া তুলিয়াছে। প্রথমতঃ তাহার সমস্ত
প্রজার মাতা স্বরূপ মহারানীকে কারাভঙ্গ
ও হিন্দুস্থানে নির্বাসিত করিয়া সন্ধিভঙ্গ
করিতে ক্রটি করে নাই, দ্বিতীয়তঃ তাহা-

দের দৌরাত্ম্যে শিখগণ এতদূর নিস্পীড়িত
হইয়া উঠিয়াছে যে, আমাদের ধর্ম নষ্ট
হইয়া গিয়াছে; এবং তৃতীয়তঃ, আমা-
দের রাজ্য পূর্বাশেফা গৌরব শূন্য হইয়া
পড়িয়াছে *।” ইহাতে ও কি বলিব বিন্দ-
নের নির্বাসনে পঞ্জাব দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ
হয় নাই? ইহাতে ও কি বলিব, পঞ্জাব
নিকরবেগে বিন্দনের নির্বাসন চাহিয়া
দেখিয়াছে?

কিন্তু বিন্দনের নির্বাসনে কেন প-
ঞ্জাব এইরূপ দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইল? কেন
পঞ্জাবের প্রতি রোমকূপে ক্রোধের অনল-
কণা প্রবিষ্ট হইল? কেন পঞ্জাবের শি-
রায় শিরায় তীব্র বিষ প্রসারিত হইল? ই-
হার একই উত্তর, বিন্দনের প্রতি পঞ্জাবের
আন্তরিক ভক্তি, আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আ-
ন্তরিক ভালবাসা। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও
ভালবাসার পাত্রের শৌচনীয় দশা কথ-
নই শান্তভাবে নিরীক্ষণ করা যায় না।
পঞ্জাব সাঁহাকে পরম দেবতার ন্যায়
ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত, মাতার ন্যায়
সরল হৃদয়ে ভাল বাসিত, সাঁহার নি-
র্বাসনে যে পঞ্জাবের হৃদয় উগ্র হলা-
হলে কালিময় হইয়া উঠিবে, তাহা
সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। এক্ষণে
এরূপ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভাল বাসার পা-
ত্রকে আমরা কোন্ প্রাণে পাপীয়সী ও
কলঙ্কিনী বনিয়া ঘৃণা করিব? কোন প্রাণে

* সের সিংহের এই উক্তির জন্য
প্রবন্ধলেখক দায়ী নহেন।

এরূপ উজ্জ্বল মূর্তিতে কলঙ্কের পঙ্ক লেপিয়া হৃদয় অপবিত্র করিব ? যাঁহারা এরূপ পবিত্র ভাবে দেখিয়াও বিন্দনকে পাণীয়সী ও কলঙ্কিনী বলিয়া নির্দেশ করেন, তাঁহারা মানব জাতির শত্রু। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া পবিত্র ভক্তির অবমাননা করেন, পবিত্র শব্দার মুগ্ধচ্ছেদ করেন, এবং পবিত্র ভালবাসার অন্ত্যোষ্ঠি-ক্রিয়া করেন। তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন ও সহানুভূতি নাই।

এই উজ্জ্বল্যেই বিন্দন নব্বতম শতাব্দীর মধ্যভাগে সমস্ত ভারতবর্ষ বিভাসিত করিয়াছিলেন ; এই উজ্জ্বল্যেই বিন্দনের সমস্ত ক্ষীণতা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, এবং এই উজ্জ্বল্যেই আমরা বিন্দনের এতদূর পক্ষপাতী হইয়াছি। বিন্দন তেজস্বিনী নারীর অদ্বিতীয় দৃষ্টান্তভূমি। তিনি লাবণ্যলীলাময়ী ললনা হইয়াও, দৃঢ়তা ও অটলতার আশ্রয় ছিলেন, কোমলতাময় অঙ্গনা হৃদয়ের অধীকারিনী হইয়াও, মীরতার অবলম্বন ছিলেন, এবং কমনীয় কাণ্ডির আধার হইয়াও ভীম-গুণাবিত তেজস্বিতার পরিপোষক ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোনও নারী এরূপ হঠাৎ সমুখিত হইয়া একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সহিত এরূপ তেজস্বিতা ও শাসন ক্ষমতার স্পর্শ করে নাই। আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি, বিন্দনের তরলা প্রকৃতিতে অনেক খুঁত থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতে যে সকল অলৌকিক-সামান্য গুণ আছে, তাহার জন্য

বিন্দনকে আদর না করা কাপুরুষতার কর্ম। কবে কখন ক্রিপেট্টা আপনার সম্মোহন রূপ-মাগরে সকলকে ডুবাইয়া প্রেমের খেলা খেলিয়াছেন, কবে কখন কুইন মেরী হৃদয়ের গরল ঢালিয়া আপনার পাপের প্রারশচিত্ত করিয়াছেন ; বিন্দনের একটা খুঁত দেখিয়াই তাঁহার চরিত্রে সেই ক্রিপেট্টা বা কুইন মেরীর কলঙ্ক লেপন করা প্রকৃত সামাজিকতার লক্ষণ নহে। দোষকে সকল স্থলেই দোষ বলিয়া ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করা উচিত, এবং গুণকে সকল স্থলেই গুণ বলিয়া আদরের সহিত গ্ৰহণ করা উচিত। কোনও বিশ্বশত্রু পাষণ্ডের কোনও অলোকসাধারণ গুণ দেখিলে তাহার পাষণ্ডত্ব ক্ষণকাল বিস্মৃত হইয়া তাহার লোকাভীত গুণের পূজা করা কর্তব্য। যখন দেখিতেছি, একজন নির্দয় দস্যু একদিকে মূর্তিমান পাপের ন্যায় সকলের হৃদয়-বৃত্তি ছিন্ন করিয়া সর্ব্বশ্ব বিলুপ্তন করিতেছে ; অপর দিকে অপরিমিত, ও অনবদ্য ভক্তির সহিত মাতার পদসেবা করিতেছে ; এবং অপরিমিত ও অনবদ্য প্রেমের সহিত বনিতার মনোরঞ্জন করিতেছে ; তখন তাহার মাতৃভক্তি ও দাম্পত্য-প্রেমের নিকট মহাজেই মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। যখন দেখিতেছি, একজন নির্ভুর ভ্রূশায় এক সময়ে একজন নির্দোষ নিরীহের উপর অজ্ঞাতারের পরাক্রান্ত দেখাইয়া আপনার ভ্রূশায়তা চরিতার্থ করিয়াছে, পরক্ষণেই আ

বার পবিত্র ভাবে সংযত চিত্তে স্নান করিয়া আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই যেন ভক্তিরসার্স হৃদয়ে স্বীয় অশ্রুজল ভাগীরথীর জল প্রবাহের সহিত মিশাইয়া উর্দ্ধনেত্রে নিষ্পন্দ ভাবে পরম দেবতার আরাধনা করিতেছে; তখন আপনা হইতেই তাহার দেবভক্তির পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। একপলি চাশয় নির্ভূরগণও যখন সময় বিশেষে হৃদয়ের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে, তখন বিন্দন এক জনের প্রতি একটুকু অধিক মাত্রায় অনুগ্রহ দেখাইতেন অথবা একজনকে একটুকু অধিক মাত্রায় ভাল বাসিতেন বলিয়াই যে তিনি শ্রদ্ধা ও প্রীতির অপাত্র হইবেন, হৃদয় থাকিতে আমরা

ইহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না।

আমরা বিন্দনকে আজীবন শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিতই দেখিব; আজীবন বিন্দনের চরিত্র শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিতই স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখিব। আমরা কখনও অপরের আয়োজিত কলঙ্কের কথাই গায় দিয়া হৃদয়কে কলঙ্কিত করিব না। বৈদেশিক গণ যেরূপ জঘন্য ভাবে বিন্দনের চরিত্র আঁকিয়াছেন, যেরূপ জঘন্য ভাবে অসহায় ভারতের একটী অসহায় ললনার উপর কলঙ্কের কালীমা বর্ষণ করিয়াছেন, আমরা চিরকাল তাহার জন্য দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিব; এবং চিরকাল যুগ ও অবজ্ঞার সহিত সেই জঘন্য চিত্রের প্রতি তাচ্ছল্য দেখাইব।

জীবন প্রভাত।

অর্চনম পরিচ্ছেদ।

শিবজী।

“অসুর-উচ্ছিস্ট গ্রাসিত কলেবর ?
অসুর পদাঙ্করজঃ; শোভিত মস্তকে ?
তার চেয়ে শতবার পশিব গগনে,
প্রকাশি অমরবীর্ষ্য সময়ের স্রোতে,
ভাসিব অনন্তকাল দৈত্যের সংগ্রামে,
দেবরক্ত যতদিন না হবে নিঃশেষ।”

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্বদিকে রক্তমাছটা দেখা যাই-

তেছে, এমন সময় ব্রাহ্মণবেশধারী শিবজী সিংহগড় প্রবেশ করিলেন। উপনীত ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, উষ্ণীষ ও তুলার কুর্তি ফেলিয়া দিলেন, প্রাতঃকালের আলোকে মস্তকের লৌহ শিরস্ত্রাণ ও শরীরের বর্ষ ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল। বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা, কোষে ‘ভবানী’ নামক প্রসিদ্ধ খড়্গ। হস্তদ্বয় দীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিশাল, শরীর ঈষৎ ঝক্ক বটে, কিন্তু সুবন্ধ; সূদৃঢ়বন্ধনী ও পেশীগুলি বর্ষের নীচ হইতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। পেশওরা মূরে-

শ্বর ত্রিমূল পিঙ্গলী সানন্দে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—

‘ভবানীর জয় হউক ! আপনি এতক্ষণ পরে কুশলে ফিরিয়া আসিলেন।’

শিব । ‘আপনার আশীর্ষ্যদে কোন বিপদ হইতে উদ্ধার না হইয়াছি ?’

মুর । ‘সমস্ত স্থির হইয়াছে ?’

শিব । ‘সমস্ত ।’

মুর । ‘অদ্যাত্রি বিবাহ ?’

শিব । ‘অদ্যই ।’

মুর । ‘শারেশ্বরাঁ কিছু জানেন না ? তীক্ষ্ণবুদ্ধি চাঁদখাঁ কিছু জানে না ?’

শিব । ‘শারেশ্বরাঁ ভীত শিবজীর নিবট সূক্তি প্রার্থনা প্রতীক্ষা করিতেছেন ; যোদ্ধা চাঁদখাঁ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, আর যুদ্ধ করিবেন না ।’ শিবজী সবিশেষ বিবরণ বলিলেন ।

মুর । ‘যশোবন্ত ?’

শিব । ‘আপনি পত্রে যে সমস্ত যুক্তি দেখাইয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছিল ; আমি যাইয়াই দেখিলাম তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিয়াছেন ; দুরতরাং অনায়াসেই আমার কার্য সিদ্ধ হইল ।’

মুর । ‘ভবানীর জয় হউক ! উঃ আপনি এক রাত্রিতে একাকী যে কার্য সাধন করিলেন তাহা সহস্রের অনায়া । যে অসমসাহসী কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা ভাবিলে অক্ষণও হৃৎকম্প হয় । শিবজী ! শিবজী ! এরূপ কার্যে আর প্রবৃত্ত

হইবেন না, আপনার অমঙ্গল হইলে মহারাষ্ট্রের কি থাকিবে ?

শিবজী গভীর ভাবে বলিলেন ‘মুরেশ্বর ! বিপদে ভয় করিলে অদ্যাবধি জায়গীরদার মাত্র থাকিতাম, বিপদে ভয় করিলে এ মহৎ উদ্দেশ্য কিরূপে সাধন হইবে ? চিরজীবন বিপদে আচ্ছন্ন থাকে ক্ষতি নাই, কিন্তু ভবানী কখন যেন মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন হয় ।’

মুর । ‘বীরশ্রেষ্ঠ ! আপনার জয় অনিবার্য, স্বয়ং ভবানী সহায়তা করিবেন । কিন্তু দ্বিপ্রহর রজনীতে, শক্রশিবিরে, একাকী ছদ্মবেশে ? অঙ্গীকার কখন এরূপ আচরণ করিবেন না, আপনার কি বিশ্বস্ত অনুচর নাই ?’

শিবজী দেখিলেন মুরেশ্বর পোশকের নরনে একবিন্দু জল । হাস্য করিয়া বলিলেন,— ‘অজ্ঞ সত্যই একটী মহা বিপদে পতিত হইয়াছিলাম।’

মুর । ‘কি ?’

শিব । ‘এমন মুর্খকেও আপনি সংস্কৃত শ্লোক শিখাইয়াছিলেন । আপনি নাম স্বাক্ষর করিয়া পাঠ্যে না, সে সংস্কৃত স্মরণ রাখি

মুর । ‘কখন, কি হইয়াছিল ?’

শিব । ‘আর কিছু নহে, শারেশ্বরাঁখাঁর সত্যায় যাইয়া ত্রায়শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় সমস্ত শ্লোকগুলি ফুনিয়া গিয়াছিলেন ।’

মুর । ‘তাঁহার পর ?’

শিব । ‘হুই একটী মনে ছিল, তদ্বা

রাই কার্য্য সিদ্ধ হইল।' সহাস্য বদনে শিবজী শয়নাগারে গেলেন।

শিবজীর সহিত আমাদের এই প্রথম পরিচয়; এই স্থলে তাঁহার পূর্ব রূতান্ত আমরা কিছু বলিতে চাই; ইতিহাসজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা করিলে এইটী পরিভাগ করিয়া বাইতে পারেন।

শিবজী ১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন, স্মৃতরাং আখ্যায়িকা বিবৃত সময়ে তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসর ছিল। তাঁহার পিতার নাম শাহজী ও পিতামহের নাম শিবজী-ভনন্দে। আমরা প্রথম অধ্যায়ে কু-

দেশের দেশমুখ প্রসিদ্ধ নিম্নলিখিত পিতার কথা বলিয়াছি; সেই বংশের পিতা রাও নায়েকের তৃতী দীপা-ক মল্লজী বিবাহ করিয়াছিলেন। অ-

দিন অবধি সন্তানাদি না হওয়ার, মদনগরনিবাসী শাহশরীফ নামক জন মুসলমানপীরের নিকট মল্লজী ক অনুরোধ করেন, এবং পীরও মল্ল-

সন্তানার্থে প্রার্থনাদি করেন। তাহা-কছু পরে দোপাবাইয়ের গর্ভে একটী ন হওয়ারে মল্লজী সেই পীরের না-

মানে পুত্রের নাম শাহজী রাখিলেন। আহমদনগরের প্রসিদ্ধনামা লক্ষজী । রাওয়ের নাম প্রথম অধ্যায়েই উ-হইয়াছে। ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দে জলির মল্লজী আপন সন্তান শাহজীকে ল-

যাদব রাওয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন। জীর বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র,

যাদব রাওয়ের কন্যা জীজীর বয়স তিন কি চারি বৎসর, স্মৃতরাং বালক বালিকা বড় আনন্দে একত্রে ক্রীড়া করিতে লা-গিল। উদ্দর্শনে যাদব রাও সন্তুষ্ট হইয়া আপন কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন 'কেমন, তুই এই বালকটীকে বিবাহ করিনি?' পরে অত্যাশ্চর্য লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'তুই জনে কি সন্দেহ জোড় মি-লিয়াছে!' এই সময়েই শাহজী ও জীজী পরস্পরের দিকে ফাগ নিষ্ক্রেপ করায় সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল; কিন্তু মল্লজী সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন 'বন্ধুগণ! সাক্ষী থাকিও, যাদব রাও আমার বৈবাহিক হইবেন, অত্ প্রতিক্রম হইলেন।' সকলে এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। যাদবরাও উচ্চ বংশজ, শাহজীর সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিতে কখনই বাসনা করেন নাই; কিন্তু মল্লজীর এই চতুরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন।

পর দিন যাদব রাও মল্লজীকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু বৈবাহিক বলিয়া স্বীকার না করিলে মল্লজী বাইবেন না বলিয়া পাঠাইলেন। যাদবরাও সেরূপ স্বীকার করিলেন না, স্মৃতরাং মল্লজী আসিলেন না। যাদব রাওয়ের গৃহিণী যাদবরাও হইতেও বংশধর্যাদার অভিমানিনী। কথিত আছে যে যাদবরাও রহস্য করিয়াও আপন হৃদিতার সহিত শাহজীর বিবাহ দিবেন বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার গৃহিণী

তঁাহাকে বিলক্ষণ দুই এক কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন! মল্লজী সরোষে একটি গ্রামে চলিয়া গেলেন ও প্রকাশ করিলেন যে ভবানী সাক্ষাৎ অবতীর্ণা হইয়া তঁাহাকে বিপুল অর্থ দিয়াছেন। মহারাষ্ট্র-রদিগের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে ভবানী এই সময়ে মল্লজীকে বলিয়াছিলেন, ‘মল্লজী, তোমার বংশে একজন রাজা হইবেন, তিনি শত্রুর ন্যায় গুণান্বিত হইবেন, মহারাষ্ট্রদেশে ন্যায়বিচার পুনঃ স্থাপন করিবেন, এবং ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ের শত্রুদিগকে দূরীভূত করিবেন। তঁাহার সময় হইতে কাল গণনা হইবে ও তঁাহার সম্ভানসম্ভতি সপ্তবিংশ পুরুষ পর্যন্ত সিংহাসনারূঢ় থাকিবেন।’

সে যাহা হউক, মল্লজী যে এই সময়ে বিপুল অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। সেই অর্থের দ্বারা আত্মোন্নতির চেষ্টা করিলেন ও এ দিনে তঁাহার শ্যালক যোগপালও তঁাহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। অচিরে মল্লজী আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি হইলেন, ‘রাজা ভন্থে’ খেতাব প্রাপ্ত হইলেন, সুবর্ণী ও চাকান দুর্গ ও তৎপার্শ্বস্থ দেশের ভার প্রাপ্ত হইলেন, ও জায়গীর স্বরূপ পুনা ও সোপানগর পাইলেন। তখন আর যাদবরাওয়ের কোন আঁপত্তি রহিল না; ১৬০৪ খ্রীঃ অব্দে মহা সমারোহে শাহজীর সহিত জীজীর বিবাহ হইল, ও

আহম্মদনগরের সুলতান স্বয়ং সেই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। তখন শাহজীর বয়স্ক্রম ১০ বৎসর মাত্র। কালক্রমে মল্লজীর মৃত্যুর পর শাহজী পৈতৃক জায়গীর ও পদ প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে দিল্লীস্থর আকবরশাহ আহম্মদনগর রাজ্য দিল্লীর অধীনে আনিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন। এই যুদ্ধ প্রায় পঞ্চাশৎবর্ষ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। আকবরের পর জাহাঁঙ্গীর ও তৎপর শাহজিহান আহম্মদনগর জয়ের জন্য প্রয়াস পান; পরে শেবোক্ত সত্রাটের সময় ১৬৩৭ খ্রীঃ অব্দে এই রাজ্য সম্পূর্ণরূপে দিল্লীর অধীনে আইসে ও যুদ্ধ শেষ হয়। এই যুদ্ধকালে শাহজী স্বেচ্ছা ছিলেন না। ১৬২০ খ্রীঃ অব্দে (জাহাঁঙ্গীরের শাসনকালে) তিনি আহম্মদনগরের প্রধান সেনাপতি মালীক অমরের অধীনে ছিলেন ও একটি মহাযুদ্ধে আপন সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করিয়া সকলেরই সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। নয় বৎসর পর তিনি দিল্লীস্থর শাহজাহাঁর পক্ষাবলম্বন করিলে, উক্ত সত্রাট তঁাহাকে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি করিলেন ও অনেক জায়গীর দান করেন। কিন্তু সত্রাটদিগের অনুগ্রহ আজ আছেত কাল থাকে নাই; তিন বৎসর পর শাহজীর কতকগুলি জায়গীর সত্রাট কাড়িয়া লইয়া ফতেহখাঁকে দান করেন, তাহাতে শাহজী বিরক্ত হইয়া, সত্রাটের পক্ষ ত্যাগ করিয়া ১৬৩২ খ্রীঃ অব্দে বিজয়পুরের সুলতানের

পক্ষ অবলম্বন করিলেন ও আপন মৃত্যু পর্ষান্ত অর্থাৎ দ্বাত্রিংশৎ বৎসরের মধ্যে কখনও বিজয়পুরের বিক্কাচরণ করেন নাই।

পতনোন্মুখ আহম্মদনগর রাজ্য নিজ জসাধারণ বাহুবলে দিল্লীর স্বাধীন রাখিবার জন্য শাহজী দিল্লীর সৈন্য সহিত অনেক যুদ্ধ করিলেন। সুলতান শক্রহস্তে পতিত হইলে, শাহজী সেই বংশজ আর একজনকে সুলতান বলিয়া সিংহাসনে আরোপিত করিলেন, কতকগুলি বিজয়রাজ্যের সাহায্যে দেশ শাসনের সুন্দর রীতি স্থাপন করিলেন, বহু সংখ্যক দুর্গ হস্তগত করিলেন, ও সুলতানের নামে সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

মাত্রাট শাহজিহান এই সমস্ত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শাহজী ও তাঁহার প্রভু বিজয়পুরের সুলতানকে এককালে দমন করিবার জন্য অষ্টচত্বারিংশৎ অশ্বারোহী ও বহুসংখ্যক পদাতিক প্রেরণ করিলেন। দিল্লীধরের সহিত যুদ্ধ করা বিজয়পুরের সুলতান বা শাহজীর সাধ্য নহে; কয়েক বৎসর যুদ্ধের পর সন্ধিস্থাপন হইল; আহম্মদনগর রাজ্য বিলুপ্ত হইল (১৬৩৭) এবং শাহজী বিজয়পুরের অধীনে জায়গীরদার ও সেনাপতি রহিলেন। সুলতানের আদেশানুসারে কর্ণাট দেশের অনেক অংশ জয় করিলেন, সুরাতাং বিজয়পুরের উত্তরে পূনার নিকট তাঁহার যেরূপ জায়গীর ছিল, দক্ষিণে কর্ণাট দেশেও সেইরূপ বহু জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন।

জীজীবাই দ্বারা শাহজীর শত্রুজী ও শিবজী নামে দুই পুত্র হয়। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, জীজীর পিতা লক্ষজী যাদবরাও পুরাতন দেবগড়ের হিন্দুরাজার বংশ হইতে অবতীর্ণ, এরূপ জনশ্রুতি আছে। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে শিবজী সেই পুরাতন রাজবংশোদ্ভব সন্দেহ নাই। ১৬৩০ খৃঃ অব্দে, শাহজী টুকাবাই নামী আর একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; অভিমানিনী জীজীবাই তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীর সংসর্গ ত্যাগ করিলেন ও পুত্র শিবজীকে লইয়া পূনার জায়গীরে আশ্রয় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন শাহজী টুকাবাইকে লইয়া কর্ণাটেই থাকিতেন, তথায় তাহার গভে বেনকাদী নামে একটি পুত্র হইল।

শাহজীর দুইজন অতিবিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও কর্মচারী ছিলেন। দাদাজী কানাইদেব পূনার জায়গীর রক্ষা করিতেন এবং জীজী ও শিশু শিবজীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন; নারায়ণপন্ত নামে অন্য কর্মচারী কর্ণাটের জায়গীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে স্বর্ণীভূগে শিবজীর জন্ম হয়। এই দুর্গ পূনা হইতে অনুমান ২৫ ক্রোশ উত্তরে ও জুনীর নামে খ্যাত। শিবজীর তিন বৎসর বয়সের সময় শাহজী টুকাবাইকে বিবাহ করিলেন, সুরাতাং জীজীর সহিত বিচ্ছেদ জমিল। শাহজী কর্ণাটাভিমুখে যাইলেন, জীজী সম্পূর্ণ পূনার আশ্রয় দাদাজী কানাই

দেবের রক্ষণাবেক্ষণে বাস করিতে লাগিলেন ।

শিবজীর বাসার্থে দাদাজী পুনানগরে একটি রুহং গৃহ নির্মাণ করাইলেন, আমরা ইতিপূর্বে সেই গৃহে শায়স্তার্থীকে দেখিয়াছি ।

মাতা পুত্রে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন, ও বালাকালাবদি শিবজী দাদাজীর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । শিবজী কখনও নাম লিখিতেও শিখেন নাই, কিন্তু অল্প বয়সেই ধনুর্কর্ষণ ব্যবহার, বর্ষা নিক্ষেপ, নানারূপ মহারণ্যীয় খজা ও ছুরিকা চালন ও অশ্বারোহণে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন । মহা-ক্রীয় মাত্রেই অশ্বচালনার তৎপর, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও শিবজী বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিলেন । এইরূপ ব্যায়াম ও যুদ্ধশিক্ষায় বালকের দেহ শীঘ্রই সুদৃঢ় ও বলবান হইয়া উঠিল ।

কিন্তু কেবল অস্ত্রবিদ্যায়ই শিবজী কাল অতিবাহিত করিতেন না । যখন অবসর পাইতেন দাদাজীর চরণোপাস্তে বসিয়া মহাভারত ও রামায়ণের অনন্ত বীরত্বের গল্প শ্রবণ করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন । শুনিতে শুনিতে বালকের হৃদয়ে সাহসের উদ্বেক হইল, হিন্দুধর্মে আস্থা দৃঢ়ীভূত হইল, সেই পূর্বকালীন বীরদিগের বীরত্ব অনুকরণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল ; ধর্মবিদ্বেষী মুসলমানদিগের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিল । অচিরে শাস্ত্রা-

নুযায়িক সমুদয় জিয়া কণ্ঠ শিখিলেন, এবং কথা শুনিতে এরূপ আগ্রহ জন্মিল যে অনেক বৎসর পর যখন দেশে খ্যাতি ও রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তখন পর্যন্ত কোন স্থানে কথা হইবে শুনিলে বহু বিপদ ও কষ্ট সহ্য করিয়াও তথায় উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতেন ।

এইরূপে দাদাজীর যত্নে, শিবজী অল্পকাল মধ্যেই স্বধর্মাতুরক্ত ও অতিশয় মুসলমান-বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন, ও ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে স্বাধীন পলীগার হইবার জন্য নানারূপ সংকল্প করিতে লাগিলেন । আপনার ন্যায় উৎসাহী যুবকদিগকে এবং দণ্ড্যাগণকেও চারিদিকে জড় করিতে লাগিলেন, ও পর্বতপরিপূর্ণ কঙ্কণদেশে তাহাদিগের সহিত সর্বদাই যাতায়াত করিতেন । সেই পর্বত কিরূপে উল্লঙ্ঘন করা যায়, কোথায় পথ আছে, কোন্ পথে কোন্ দুর্গে যাওয়া যায়, কোন্ কোন্ দুর্গ অতিশয় দুর্গম, কিরূপে দুর্গ আক্রমণ বা রক্ষা করা যায়, এ সকল চিন্তায় বালকের দিন অতিবাহিত হইত । কখন কখন কেয়কদিন ক্রমাগত এই পর্বত ও উপত্যকার মধ্যে যাপন করিতেন ; কোন দুর্গ কোন পথ, কোন উপত্যকা শিবজীর অজ্ঞাত ছিল না । শেষে কিরূপে দুই একটি দুর্গ হস্তগত করিবেন এই চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

বালকের এইরূপ কথা শুনিয়া ও অচরণ দেখিয়া রক্ত দাদাজী ভীত হইতে লাগিলেন । তিনি অনেক প্রবোধবাক্য

হারা বালককে সে পথ হইতে আনয়ন করিয়া জারগীর বাহাতে সূচাকরূপে রক্ষা হয়। তাহাই শিক্ষাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শিবজীর হৃদয়ে যে বীরত্বের অঙ্কুর স্থাপিত হইয়াছিল তাহা আর উৎপাটিত হইল না। শিবজী দাদাজীকে পিতৃতুল্য সম্মান করিতেন, কিন্তু যে উন্নত পথে প্রবর্তিত হইয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করিলেন না।

মাউলীজাতীয়দিগের কষ্টমহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য শিবজী তাহাদিগকে বড় ভাল বাসিতেন, ও তাঁহার যৌবন-সুহৃদগণের মধ্যে যশজীকর, তন্নজীমালজী ও বাজীফাসলকর নামক তিন জন মাউলীই প্রিয়তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন। পরিশেষে ইঁহাদের সহায়তায় ১৬৪৬ খৃঃ অব্দে তোরণ দুর্গের কিল্লাদারকে কোনরূপে বশবর্তী করিয়া শিবজী সেই দুর্গ হস্তগত করিলেন। এই আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই তোরণ দুর্গের বর্ণনা করা হইয়াছে; এই প্রথম বিজয়ের সময় শিবজীর বয়সক্রম ঊনবিংশ বর্ষ মাত্র। ইহারই পরবৎসর তোরণ দুর্গের দেড় কোশ দক্ষিণপূর্বে একটি ভূঙ্গগিরিশৃঙ্গের উপর শিবজী একটি নূতন দুর্গ নির্মাণ করিলেন ও তাহার রাজগড় নাম দিলেন।

বিজয়পুরের সুলতান এই সমস্ত বিষয়ের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন ও এই সমস্ত উপস্রবের কারণ জিজ্ঞাসা ক-

রিলেন। বিজয়পুরের বিশ্বস্ত কর্মচারী শাহজী এসমস্ত বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না, তিনি দাদাজীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দাদাজী কানাইদেব শিবজীকে পুনরায় ডাকাইলেন। এইরূপ আচরণে সর্বনাশ হইবার সম্ভব তাহা অনেক বুঝাইলেন, ও বিজয়পুরের অধীনে কার্য করিয়া শিবজীর পিতা কিরূপ বিপুল অর্থ, জারগীর, ক্ষমতা ও সম্মান পাইয়াছেন তাহাও দেখাইলেন। শিবজী পিতৃসদৃশ দাদাজীকে আর কি বলিবেন, মিষ্ট বাক্যদ্বারা উত্তর দান করিলেন, কিন্তু আপন কার্যে নিরস্ত হইলেন না। ইহার কিছু দিন পরেই দাদাজীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর প্রাক্কালেই দাদাজী শিবজীকে আর একবার ডাকাইয়া নিকটে আনেন। বৃদ্ধ পুনরায় ভৎসনা করিবেন এই বিবেচনা করিয়া শিবজী তথায় যাইলেন, কিন্তু যাহা শুনিলেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন। মৃত্যুশয্যায় যেন দাদাজীর দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হইল, তিনি শিবজীকে সম্মুখে ভাবে বলিলেন “বৎস, তুমি যে চেষ্টা করিতেছ তাহা হইতে মহত্তর চেষ্টা আর নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা সাধন কর; ব্রাহ্মণ, গোবৎসাদি ও কৃষকগণকে রক্ষা কর, দেবালয়-কলুষিতকারীদিগকে শাস্তি প্রদান কর, ঈশানী যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই পথ অনুধাবন কর।” বৃদ্ধ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন, শিবজীর

হৃদয় এই দিব্য উপদেশ পাইয়া উৎসাহ ও সাহসে দশগুণ স্ফীত হইয়া উঠিল। তখন শিবজীর বয়ঃক্রম বিংশ বৎসর।

সেই বৎসরেই চাকন ও কন্দানা দুর্গের কিল্লাদারগণকে অর্থে বশীভূত করিয়া শিবজী উভয় দুর্গ হস্তগত করেন, ও কন্দানার নাম পরিবর্তিত করিয়া সিংহগড় রাখেন। আখ্যায়িকার চাকন ও সিংহগড়ের কথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। শিবজীর বিমাতা টুকোবাইয়ের ভাতা বাজীমহিতী সোপা দুর্গের ভার প্রাপ্ত ছিলেন। একদিন দ্বিপ্রহর রজনী সময়ে আপন মা-উনী সৈন্য লইয়া শিবজী এই দুর্গ সহসা আক্রমণ করিয়া হস্তগত করেন। মাতুলের প্রতি কোনও অত্যাচার না করিয়া তাহাকে কর্ণাটে পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন। তৎপরেই পুরন্দর দুর্গের অধীশ্বরের মৃত্যু হওয়ার তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে ভাতুকলহ হয়, শিবজী কনিষ্ঠ দুই ভাইয়ের সহায়তা করিবার ছলনায় আপনি সেই দুর্গ হস্তগত করেন। এই অভদ্র আচরণে তিন ভাতাই শিবজীর উপর বিরক্ত হইলেন, কিন্তু শিবজী যখন দেশের স্বাধীনতা স্বরূপ আপন মহৎ উদ্দেশ্য তাঁহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলেন, যখন সেই উদ্দেশ্যসাধন জন্য ভাতৃগণ হইতে সহায়তা যাচঞা করিলেন, তখন তাঁহাদিগের ক্রোধ রহিল না। শিবজীর বাৎপটুতার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, তাঁহার কথা শুনিয়া ও তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সম্যক বু-

ঝিতে পারিয়া তিন ভাতাই শিবজীর অধীনে কার্য করিতে স্মীকৃত হইলেন।

এইরূপে শিবজী একে একে অনেক দুর্গ হস্তগত করেন, তাহার নাম লিখিয়া এই আখ্যায়িকা পূর্ণ করিবার আবশ্যিকতা নাই। ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে শিবজীর কর্মচারী আবাদী স্বর্ণদেব কল্যাণদুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী প্রদেশ জয় করিলেন, তখন বিজয়পুরের সুলতান জুন্ধ হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে কারাবদ্ধ করিলেন ও তাহাকে এক প্রস্তরময় ঘরে রাখিয়া আদেশ করিলেন যে নিয়মিত সময়ের মধ্যে শিবজী অধীনতা স্বীকার না করিলে সেই গৃহের দ্বার প্রস্তর দ্বারা একেবারে বন্ধ হইবে। শিবজী দিল্লীশ্বরের নিকট আবেদন করিয়া পিতার প্রাণ বাঁচাইলেন, কিন্তু চারি বৎসরকাল শাহজী বিজয়পুরে বন্দী স্বরূপ রহিলেন।

জৌলীর রাজা চন্দ্রাণকে শিবজী স্বপক্ষে আনিবার জন্য ও মুসলমান অধীনতাশৃঙ্খল চূর্ণ করিবার জন্য অনেক পরামর্শ দেন। চন্দ্রাণও যখন একেবারে অস্বীকার করিলেন তখন শিবজী নিজ লোকদ্বারা সেই রাজা ও তাঁহার ভাতাকে হত্যা করাইয়া, সহসা রাত্রিযোগে আক্রমণ করিয়া সেই দুর্গ হস্তগত করেন। শিবজী আপন উদ্দেশ্যসাধনার্থ অনেক গর্হিত কার্য করিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ গর্হিত কার্য আর একটা করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। সমস্ত জৌলী প্রদেশ অধিকার করিলেন

ও সেই বৎসরেই (১৬৫৬) প্রতাপগড় নামক একটী নূতন দুর্গ নির্মাণ করাইলেন, ও আপন প্রধান মন্ত্রী সত্ৰাজ্যপত্নকে পেশওয়া খেতাব দিলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে সত্ৰাজ্য কঙ্কণদেশে ফতেখাঁর নিকট পরাস্ত হওয়ার শিবজী তাঁহাকে অকর্ণধ্য বিবেচনা করিয়া পদচ্যুত করিলেন ও মুরেশ্বর ত্রিমূল পিঙ্গলীকে পেশওয়া করিলেন। মুরেশ্বরের সহিত পাঠক পূর্বেই পরিচিত হইয়াছেন। সমগ্র কঙ্কণদেশ জয় করিবার জন্য বহু সংখ্যক সৈন্য জড় হইল।

এবার বিজয়পুরের সুলতান শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার মানস করিলেন। আবুল ফাজেল নামক একজন প্রমিদ্ধ যোদ্ধা ৫০০০ অশ্বরোহী ও ৭০০০ পদাতিক ও বহুসংখ্যক কামান লইয়া যাত্রা করিলেন। গর্ভিতভাবে প্রকাশ করিলেন যে শীঘ্রই সেই অকিঞ্চিৎকর বিদ্রোহীকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া সুলতানের পায়তখতের নিকট উপস্থিত করিবেন। (১৬৫৯ খৃঃ অব্দ)

এ সৈন্যের সহিত সম্মুখযুদ্ধ অসম্ভব ; শিবজী সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। আবুল ফাজেল গোপীনাথ নামক একজন ব্রাহ্মণকে শিবজী-সদনে প্রেরণ করিলেন। প্রতাপগড় দুর্গের নিকট সভামধ্যে সাক্ষাৎ হইল ও নানারূপ কথাবার্তা হইল, রজনী বাপনার্থ গোপীনাথের জন্য একটী স্থান নির্দেশ করা হইল।

রজনীযোগে শিবজী গোপীনাথের

সহিত দেখা করিতে আসিলেন। শিবজীর অসাধারণ বাক্পটুতা ছিল, তিনি গোপীনাথকে অনেক প্রকার বুঝাইয়া বলিলেন 'আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি আমার শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমার কথাগুলি শ্রবণ করুন। আমি যাহাই করিয়াছি সমস্তই হিন্দুজাতির জন্য, হিন্দুধর্মের জন্য করিয়াছি ; অসং ভবানী আমাকে ব্রাহ্মণ ও গোবৎসাদিকে রক্ষা করিবার জন্য উত্তেজনা করিয়াছেন, হিন্দু-দেব ও দেবালয়ের উদ্ভিষ্টকারীদিগকে দণ্ড দিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, ও স্বধর্মের শত্রুর বিক্কাচরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মণ, ভবানীর আদেশ সমর্থন করুন, ও আপন জাতীয় ও দেশীয় লোকের মধ্যে অশুদ্ধে বাস করুন।' এইরূপ উত্তেজনা বাক্যের পর শিবজী প্রতিজ্ঞা করিলেন যে জয়লাভ হইলে তিনি গোপীনাথকে হেওরা গ্রাম অর্পণ করিবেন। পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সেই গ্রাম তাঁহাদেরই থাকিবে। গোপীনাথ এই সমস্ত বাক্যে তুষ্ট হইয়া শিবজীর সহায়তা করিতে স্বীকার হইলেন ; পরামর্শ স্থির হইল যে কার্যসিদ্ধির জন্য আবুল ফাজেলের সহিত শিবজীর কোন স্থানে সাক্ষাৎ করা আবশ্যিক।

কয়েকদিন পর প্রতাপগড় দুর্গের নিকটই সাক্ষাৎ হইল। আবুল ফাজেলের পঞ্চদশ শত সেনা দুর্গ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রহিল, তিনি অসং একমাত্র সহচরের সহিত শিবিকারোহণে নির্দিষ্ট যুঁহে

আসিয়া উপস্থিত হইলেন । শিবজী সেই দিন বহু যত্নে প্রাতে স্নান পূজাদি সমাপন করিলেন ; স্নেহময়ী মাতার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ যাচঞা করিলেন ; তুলার কুর্তি ও উষ্ণীষের নীচে লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রাণ ধারণ করিলেন ; দুর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, বাল্যসহচর তন্নকীমালকীকে সঙ্গে লইয়া আবুল ফাজলের নিকট আসিলেন.—আলিঙ্গনচ্ছলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা মুসলমানকে ভূতলশায়ী করিলেন । শিবজীর উদ্দেশ্য সাধন হইল, কিন্তু এই গর্হিত কার্যে তাঁহার যশোরশি চিরকাল কলুষিত থাকিবে । তৎক্ষণাৎ শিবজীর গুপ্তসেনা আবুল ফাজলের সেনাকে পরাস্ত করিল, অন্নকী দত্ত নামক শিবজীর প্রসিদ্ধ কর্মচারী পানাম্বা ও পবনগড় হস্তগত করিলেন, বিজয়পুরের অন্য সেনাপতি রস্তুম জমানকে সমুখযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিজয়পুরের দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া দেশ লুণ্ঠন করিয়া আনিলেন ।

বিজয়পুরের সহিত যুদ্ধ আরও তিন বৎসর পর্য্যন্ত চলিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন পক্ষই বিশেষ জয়লাভ করিতে পারিল না । অবশেষে ১৬৬২ খৃঃ অঙ্গে শাহজী মদ্যবর্তী হইয়া বিজয়পুর ও শিবজীর মধ্যে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিলেন । শাহজী যখন শিবজীকে দেখিতে আসিলেন শিবজী পিতৃভক্তির পরাকর্ষ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন । আপনি অশ্ব হইতে অবতরণ

করিয়া পিতাকে রাজার তুল্য অভিবাদন করিলেন, পিতার শিবিকার সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন, ও পিতা বসিতে আদেশ করিলে ও তিনি পিতার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলেন না । কয়েকদিন পুত্রের নিকট থাকিয়া শাহজী পরম তুষ্ট হইয়া বিজয়পুরে যাইলেন, ও সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিলেন । শিবজী পিতা কর্তৃক সংস্থাপিত এই সন্ধির বিকটাবরণ করেন নাই । শাহজীর জীবদ্দশায় শিবজীর সহিত বিজয়পুরের আর যুদ্ধ হয় নাই, তাহার পরও যখন যুদ্ধ হয় সেই সময়ে শিবজী আক্রমণকারী ছিলেন না ।

১৬৬২ খৃঃ অঙ্গে এই সন্ধিসংস্থাপন হয়, পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই বৎসরই মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয় । আমাদের আখ্যায়িকাও এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে । মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভের সময় সমস্ত কঙ্কণদেশ শিবজী অধিকৃত করিয়াছিলেন, ও তাঁহার সপ্ত সহস্র অশ্বারোহী ও পঞ্চাশৎ পদাতিক সেনা ছিল ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

শুভকার্য সম্পাদন ।

“যুগে যুগে কপ্পে কপ্পে নিত্য নিরন্তর,
জ্বলুক গগন ব্যাধি অনন্ত বহিতে ।
জ্বলুক সে দেবভেজ স্বর্গ সংবেষ্টিয়া,
অহোরাত্রি অবিশ্রান্ত প্রদীপ্ত শিখায়,

দহক দানবকুল দেবের বিক্রমে
পুত্র পরম্পরা দক্ষ চির শোকানলে।”

ত্রিহেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

সূর্য্য অস্তাচল-চূড়া অবলম্বন করিয়া-
ছেন, সিংহগড় দুর্গের ভিতর সৈন্যগণ
নিঃশব্দে সজ্জিত হইতেছে; এত নিঃ-
শব্দে যে দুর্গের বাহিরের লোকও দু-
র্গের ভিতর কি হইতেছে তাহা জানিতে
পারে না।

দুর্গের একটি উন্নত স্থানে কএকজন
মহাযোদ্ধা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; সেই
দুর্গচূড়া হইতে দৃশ্য অতি মনোহর! দুর্গ-
তলে, পূর্বদিকে সুন্দর নীরা নদী প্রবাহিত
হইয়াছে, সেই নদীর উপত্যকা বসন্ত কা-
লের নব পুষ্প পত্র ও দুর্গদলে সুরশো-
ভিত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে।
উত্তরদিকে বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র, বহুদূর পর্য্যন্ত
সুন্দর হরিষ্রণ ক্ষেত্র সূর্য্যাকিরণে উজ্জ্বল
দেখা যাইতেছে। বহুদূর দিক্তীর্ণ পুনা
নগরী সুন্দর শোভা পাইতেছে, যোদ্ধাগণ
প্রায়ই সেইদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, অজ্ঞ
রজনীতে সেই নগরীতে কি বিবম ঘটনা
সংঘটিত হইবে তাহাই চিন্তা করিতেছি-
লেন। কেহ কেহ বা দক্ষিণ ও পশ্চিম-
দিকে দেখিতেছিলেন, উন্নত পর্ব্বতের পর
উন্নত পর্ব্বত, যতদূর দেখা যায় অনন্ত প-
র্ব্বতশ্রেণী নীল মেঘমালায় বিজড়িত রহি-
য়াছে, অথবা অস্তাচলচূড়াবলিস্বিসূর্য্যাকি-
রণে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে! কিন্তু
বোধ করি যোদ্ধাগণ এই চমৎকার পর্ব্বত

দৃশ্যের বিষয় ভাবিতেছিলেন না; অন্য
চিন্তায় অভিভূত রহিয়াছেন।

যে যুদ্ধে বা যে অসমসাহসিক কার্য্যে
একবারে বহুকালের বাঞ্ছিত ফল লাভ
হইতে পারে বা এককালে সর্ব্বনাশ হইতে
পারে, তাহার প্রাক্কালে মুহূর্ত্তের জন্যও
অতিশয় সাহসিক হৃদয়ও চিন্তাপূর্ণ ও স্ত-
ম্বিত হয়। অজ্ঞ শায়েষ্টার্মা ও মোগল
সৈন্য ছিন্নভিন্ন ও পরাভূত হইবে, অথবা
অসমসাহসে মহারাষ্ট্র সূর্য্য একবারে
চির-অন্ধকারে অন্ত যাইবে, এইরূপ চিন্তা
অগত্যা যোদ্ধাদিগের হৃদয়ে উজ্জেক হইতে
লাগিল। কেহ এ চিন্তা ব্যক্ত করিলেন
না, ভবানীর আশীর্ব্বাদে অবশ্যই জয় হ-
ইবে, মবলেই এইরূপ বনিয়াছিলেন, ত-
থাপি যখন নিঃশব্দে যোদ্ধা যোদ্ধার দিকে
নিরীক্ষণ করিলেন তখন কাহারও মনোগত
ভাব লুক্কায়িত রহিল না। কেবল বিংশ
বা পঞ্চবিংশ মাত্র সেনা লইয়া শিবজী
শত্রুসেনার মধ্যে যাইয়া আক্রমণ করি-
বেন! এরূপ ভীষণ কার্য্যে শিবজীও ক-
খন লিপ্ত হইয়াছেন কি না সন্দেহ! কে-
নই বা যোদ্ধাদিগের ললাট মুহূর্ত্তের জন্যও
চিন্তামেঘাচ্ছন্ন না হইবে?

সেই বীরমণ্ডলীর মধ্যে বহুদর্শী পেশ-
ওয়া মুরেশ্বর জিমূল ছিলেন। অল্প বয়সে
তিনি শিবজীর পিতা শাহজীর অধীনে
যুদ্ধব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন, পরে শিব-
জীর অধীনে আসিয়া প্রতাপগড়ের চমৎ-
কার দুর্গ তিনিই নির্মাণ করেন। চারি

বৎসরাবধি পেশওয়া পদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি সেই পদের যোগ্যতা বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আবুল ফাজলকে শিবজী হত্যা করিলে পর মুরেশ্বরই তাঁহার সেনাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন, পরে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধান্ত হওয়া অবধি তিনিই পদাতিক সৈন্যের সরনোবৎ অর্থাৎ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। যুদ্ধকালে সাহসী, বিপদকালে স্থির ও অবিচলিত, পরামর্শে বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী, মুরেশ্বর অপেক্ষা কার্যদক্ষ কর্মচারী ও প্রকৃত বন্ধু শিবজীর আর ছিল না।

আবাজী স্বর্ণদেব নামে তথায় দ্বিতীয় একজন দূরদর্শী ও যুদ্ধপটু ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম নীলুপস্ত স্বর্ণদেব, কিন্তু আবাজী নামেই তিনি খ্যাত ছিলেন। তিনিই ১৬৪৮ খঃ অব্দে কল্যাণ দুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী প্রদেশ হস্তগত করেন, এবং সম্প্রতি রায়গড়ের প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধনামা অন্নজীদত্ত ও অল্প সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। চারি বৎসর পূর্বে তিনিই পানাম্বা ও পবনগড় হস্তগত করেন, ও শিবজীর কর্মচারীর মধ্যে একজন প্রধান ও আভিযায় কার্যদক্ষ ছিলেন।

অশ্বারোহীর সরনোবৎ অর্থাৎ সেনাপতি নিতাইজী পহলকর সিংহগড়ে ছিলেন না; তিনি কিরূপে মোগল সৈন্যের সম্মুখ দিরা যাইয়া আরজাবাদ ও আহম্মদনগর ছাড়খার করিয়া আসিয়াছিলেন

তাহা আমরা শায়েস্তার মতায় চাঁদখাঁর প্রমুখ্যৎ শুনিয়াছি। সিংহগড়ে সে সময়ে কেবল অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী সেনা কর্তাজী ওঞ্জরনামক একজন নীচস্থ সেনানীর অধীনে অবস্থিত করিতেছিল।

পূর্বে অধ্যাদে শিবজীর তিন জন প্রধান মাউলী বাল-মুহদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বাজী ফাসলকরের তিন বৎসর পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল; তন্নজীমালতী ও যশজী কল্প অল্প সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। বালাকালের মৌহাদ্দা, যোবনের বিষয় সাহস ইহারা এক্ষণে জুলেন নাই, শিবজীকে প্রাণের ন্যায় ভাল বাসিতেন; শতবার রজনীযোগে মাউলী সৈন্য লইয়া শিবজীর সহিত শত পর্ষত দুর্গ নিঃশব্দে আরোহণ করিয়া সহস্রাধিকার করিয়াছিলেন।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যার ছায়া যেন স্তরে স্তরে জগতে অবতীর্ণ হইতেছে, তখনও সেই যোদ্ধৃমণ্ডলী দুর্গশৃঙ্গে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান; এমত সময়ে শিবজী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-বাক্যক কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না। যোদ্ধার নয়ন উজ্জ্বল, বস্ত্রের নিচে তিনি বর্ষ ও অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, অদ্য নিশির অসমসাহসিক কার্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। দৃষ্টি স্থির ও অবিচলিত।

ধীরে ধীরে বলিলেন “সমস্ত প্রস্তুত, বন্ধুগণ! বিদায় দিন।”

ক্ষণেক সকলেই নিশ্চক্ৰ হইয়া রহিলেন, শেষে যুরেশ্বরপুত্র বলিলেন “তবে স্থির করিয়াছেন, অদ্য রজনীতে স্বৰ্গদেব কি অন্নজী কি আমাকে সঙ্গে যাইতে দিবেন না? মহাত্মন! বিপৎকালে কবে আমরা আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি?”

শিবজী। “পেশওয়াজী! ক্ষমা ককন, আর অনুরোধ করিবেন না; আপনাদের সাহস, আপনাদের বিক্রম, আপনাদের বিজ্ঞতা আমার নিকট অবিদিত নাই; কিন্তু অদ্য ক্ষমা ককন। ভবানীর আদেশে আমি অদ্য বিবস প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অদ্য আমিই এই কার্য্য মাদন করিব নচেৎ অকিঞ্চৎকর প্রাণ বিসর্জন দিব। আশীর্বাদ ককন জয়লাভ করিব; নচেৎ যদি অমঙ্গল হয়, যদি অদ্যকার কার্য্যে নিধন প্রাপ্ত হই, তথাপি আপনারা তিন জন থাকিলে মহারাষ্ট্রের সকলই রহিল। আপনারা আমার সহিত বিনয় হইলে কাহার দূরদর্শী বুদ্ধিবলে দেশ থাকিবে? কাহার বাহুবলে স্বাধীনতা থাকিবে? হিন্দু-মৌরব কে রক্ষা করিবে? যাত্রাকালে আর অনুরোধ করিবেন না।”

পেশওয়া বুঝিলেন আর অনুরোধ করা রুখা, স্ততরাং আর কিছু বলিলেন না। শিবজী পেশওয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

“যুরেশ্বর, আপনি পিতার নিকট কার্য্য করিয়াছেন, আপনি আমার পিতৃ-

তুলা, আশীর্বাদ ককন যেন আজ জয়লাভ করিতে পারি, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ অবশ্যই ফলিবে। আবাজী! তন্নজী! আশীর্বাদ ককন, আমি কার্য্যে প্রস্থান করি। সকলেই বাষ্পোৎফুল্ল লোচনে বিদায় দিলেন।

পরে তন্নজী ও যশজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “বাল্য-সুহৃৎ! বিদায় দাও।”

দুই জনই খেদে নির্ঝাঁকু! ক্ষণেক পর তন্নজী বলিলেন—“প্রভু! কি অপরাধে আমাদের সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিতেছেন? কোন্ নৈশ ব্যাপারে, কোন্ দুর্ঘটনার সময় আমরা প্রভুর সঙ্গে না ছিলাম? পূর্বকাল স্মরণ করিয়া দেখুন, ককনদেশে আপনার সহিত কে ভ্রমণ করিত? শৈলচূড়ে, উপত্যকায়, পর্বতগহ্বরে, তরঙ্গিতীতীরে কে আপনার সহিত দিবায় শিকার করিত, রজনীতে একত্র শয়ন করিত, বা দুর্গজয়ের পরামর্শ করিত? যশজী, মৃত বাজী, আর এই দাস তন্নজী। বাজী প্রভুর কার্য্যে হত হইয়াছে, আমাদেরও তাহা ভিন্ন অস্ত্র বাসনা নাই। অনুমতি ককন অদ্য প্রভুর সঙ্গে যাই, জয়লাভ হইলে প্রভুর আনন্দে আনন্দিত হইব, যদি প্রভু বিনয় হন, বিবেচনা ককন আমাদের এখানে জীবিত থাকিলে কোন উপকার নাই; আমাদের এরূপ বুদ্ধিবল নাই যে পরে রাজকার্য্যে কোন সাহায্য করি। আপনার বাল্য-সুহৃৎকে বঞ্চিত করিবেন না।”

শিবজী দেখিলেন তন্নজীর চক্ষে জল ; মুগ্ধ হইয়া তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন “ ভাতঃ তোমাদিগকে অদেয় আমার কিছুই নাই ;—শীঘ্র রণ-সম্ভা করিয়া লও। ” দুই জনে বিদ্যাদাতিতে দুর্গের নীচে অবতরণ করিলেন, তথায় বর্ষাকালের সাগৎকালিক কুম্ভবর্ণ মেঘরাশির ঞায় রাশিরাশি সৈন্য সজ্জিত হইতেছিল। শিবজী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দুঃখিনী জীজী একাকী একটি ঘরে উপবেশন করিয়া চিত্রা করিতেছিলেন, পুঞ্জের অদ্যকার বিপদে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছিলেন, এমত সময় শিবজী আসিয়া বলিলেন—

“ ভাতঃ, আশীর্বাদ করুন, বিদায় হই। ”

জীজী স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন “ বৎস ! আইস একবার তোমাকে আলিঙ্গন করি ; কবে তোমার এ বিপদরাশি শেষ হইবে, কবে এ দুঃখিনীর শোক ও চিন্তা শেষ হইবে ? ”

শিব। “ ভাতঃ, আপনার আশীর্বাদে কবে কোন্ বিপদ হইতে উদ্ধার না হইয়াছি ? কোন্ মুখে জয়ী না হইয়াছি ? ”

জীজী। “ বৎস ! দীর্ঘ-জয়ী হও, ঈশানী তোমাকে রক্ষা করুন ! ” সস্নেহে শিবজীর মস্তকে হাত দিলেন, দুই নয়ন বহিয়া অশ্রুজল শীর্ণ বক্ষঃস্থলের উপর পড়িতে লাগিল।

শিবজী সকলের নিকট বিদায় লইয়াছেন। এতক্ষণ তাঁহার দৃষ্টি স্থির ও স্বর অকম্পিত ছিল ; এক্ষণ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, চক্ষুধ্বস্ত ছল্ ছল্ করিতে লাগিল ; উদ্বেগকম্পিতস্বরে বলিলেন—

“ স্নেহময়ী জননি ! আপনিই আমার ঈশানী, আপনাকে যেন ভক্তিভাবে চির-জীবন পূজা করি, আপনার আশীর্বাদে সকল বিপদ তুচ্ছজ্ঞান করিব। ” বীর-শ্রেষ্ঠ মাতার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন, মাতৃস্নেহের পবিত্র অশ্রুবারিতে সেই পবিত্র পদযুগল ধৌত করিলেন।

জীজী পুত্রকে হস্ত পরিয়া উঠাইলেন, ও বহু অশ্রুপাত করিয়া বিদায়কালে বলিলেন “ বৎস, হিন্দুধর্মের জয়সাধন কর ; স্বয়ং দেবরাজ শঙ্কু তোমার সাহায্য করিবেন। ” শিবজী অশ্রুমোচন করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে গেলেন।

সমস্ত সেনা সজ্জিত। শিবজী নিঃশঙ্কে অস্বারোহণ করিলেন ; নিঃশঙ্কে সৈন্যগণ দুর্গদ্বার অতিক্রম করিল।

দুর্গদ্বার অতিক্রম করিবার সময়ে একজন অতি অল্পবয়স্ক যোদ্ধা শিবজীর সম্মুখে আসিয়া শির নামাইল ; শিবজী তাহাকে চিনিলেন ; জিজ্ঞাসা করিলেন—

“ রঘুনাথজী হাবিলদার ! তোমার কি প্রার্থনা ? ”

রঘু। “ প্রভু যে দিন ভোরণ দুর্গ হইতে পত্রাদি আনিয়াছিলাম, সে দিন

প্রসন্ন হইয়া পুরস্কার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।”

শিব। “অদ্য এই উৎকট ব্যাপারের প্রারম্ভে কি পুরস্কার চাহিতে আসিয়াছ?”

রঘু। এই পুরস্কার চাই যে ঐ উৎকট ব্যাপারে আমাকে লিপ্ত হইতে দিন; যে পঞ্চবিংশ মাউলী যোদ্ধার সহিত পুনানগরে প্রবেশ করিবেন, দাসকে তাহাদের সহিত আপনার সঙ্গে যাইতে আদেশ করুন।”

শিব। “কেন ইচ্ছাপূর্বক এ সঙ্ঘটে আসিতেছ? তোমার এই বিষয়েই বা বিশেষ কি অধিকার আছে?”

রঘু। “রাজন! আমি ক্ষুদ্রতম সৈনিক, আমার বিশেষ অধিকার কি থাকিবে? এই মাত্র আছে যে আমার এ জগতে কেহ নাই, অন্যে মরিলে লোকেশোক করিবে, আমি এই আহবে মরিলে আক্ষেপ করিবে এরূপ জন মাত্র নাই। আর যদি প্রভুকে কার্যদ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারি, জীবিত থাকিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারি; তবে,—তবে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল।”

রঘুনাথের সেই রুক্ষকেশুচ্ছগুলি ভ্রমরবিনন্দিত, নয়নের উপর পড়িয়াছে, সেইরূপ বালকের সরল উদার মুখমণ্ডলে যোদ্ধার স্থির প্রতিজ্ঞা বিরাজ করিতেছে। অল্পবয়স্ক যোদ্ধার এইরূপ কথা শুনিয়া ও উদার মুখমণ্ডল দেখিয়া শিবজী সন্তুষ্ট

হইলেন, ও সঙ্গে পুনার ভিতরে যাইতে অনুমতি দিলেন। রঘুনাথ আবার শিরোনত করিয়া পরে লক্ষ্য দিয়া অশ্বে অধিরোহণ করিলেন।

সিংহগড় হইতে পুনা পর্য্যন্ত সমস্ত পথে শিবজী নিজ সৈন্য রাখিলেন। সন্ধ্যার ছায়ায় নিঃশব্দে সেই পথের স্থানে স্থানে সেনা সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। একটি দীপ জ্বলিলে, বা সৈন্যেরা শব্দ করিলে পুনায় তাঁহার এই কার্য প্রকাশ হইতে পারে, সুতরাং নিঃশব্দে অন্ধকারে সৈন্য সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন।

সে কার্য শেষ হইল, রজনী জগতে গাঢ় অন্ধকার বিস্তার করিল, শিবজী তন্নদী ও বশঙ্গী ২৫ জন মাত্র মাউলী লইয়া পুনার নিকটে একটি রহৎ বাগানে পত্নীহীনা তথায় লুক্কায়িত রহিলেন। রঘুনাথ ছায়ার মত প্রভুর পশ্চাৎ রহিলেন।

আরও গাঢ়তর অন্ধকার সেই অত্রকাননকে আবৃত করিল, সন্ধ্যার শীতলবায়ু আসিয়া সেই কাননের মধ্যে মর্মর শব্দ করিতে লাগিল, সন্ধ্যার পথিক একে একে সেই কাননের পার্শ্ব দিয়া পুনাভিমুখে চলিয়া যাইল, নিবিড় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখিল না, পত্রের মর্মর শব্দ ভিন্ন আর কিছু শ্রবণ করিল না।

ক্রমে পুনায় গোলমাল নিস্তব্ধ হইল, দীপাবলি নিৰ্ব্বাণ হইল, নিস্তব্ধ নগরে কেবল প্রহরীগণ এক একবার উচ্চ শব্দ

করিতে লাগিল, ও সময়ে সময়ে শূণ্যালের শব্দ বায়ুপথে আসিতে লাগিল ।

ঢং ঢং ঢং সহস্রা শব্দ হইয়া উঠিল ; শিবজীর হৃদয় চমকিত হইল ; সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন, গলির মধ্যে শব্দ হইতেছিল, নগরের বাহির হইতে দেখা যায় না ।

ঢং ঢং ঢং পুনরায় শব্দ হইল, আবার চাহিয়া দেখিলেন ; বহুলোক দীপাবলী লইয়া বাদ্য করিতে করিতে প্রশস্ত পথ দিয়া আসিতেছে ;—এই বরষাত্রা !

বরষাত্রা নিকটে আসিল । পুনর চারিদিকে প্রাচীর নাই, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে । পথ লোকে সমাকীর্ণ, ও নানা বাজ্রযন্ত্র দ্বারা অতি উচ্চ রব হইতেছে । অনেকে অশ্বারোহী, অধিকাংশ পদাতিক ।

শিবজী নিশঙ্কে বাল-সুহৃদ তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিলেন । পরস্পরে পরস্পরের দিকে চাহিলেন মাত্র । ‘হয়ত এই শেষ বিদায়’ এই ভাব সকলের মনে জাগরিত হইল ও নয়নে ব্যক্ত হইল, কিন্তু বাক্যে অনাবশ্যক । নিশঙ্কে শিবজী ও তাঁহার লোক সেই যাত্রীদিগের সহিত মিশিয়া গেলেন ।

যাত্রীগণ শায়েস্তার্থীর বাটির নিকট দিয়া যাইল ; বাটির কামিনীগণ গবাঙ্কে আসিয়া সেই বহুলোকসমারোহ দেখিতে লাগিলেন । ক্রমে যাত্রীগণ চলিয়া গেল, কামিনীগণ ও শয়ন করিতে গেলেন ; যাত্রীদিগের মধ্যে প্রায় ত্রিশৎ জন ঋঁসা-

হেবের গৃহের নিকট লুক্কায়িত রহিলেন । ক্রমে বরষাত্রীর গোল ধামিয়া গেল । শুভকার্য সম্পাদিত হইল ।

রজনী আরও গভীর হইল ; শায়েস্তার্থীর রন্ধন গৃহের উপর একটি গবাঙ্ক ছিল তথায় অল্প অল্প শব্দ হইতে লাগিল, ঋঁ সাহেবের পরিবারের কামিনীগণ সকলে নিদ্রিত অথবা নিদ্রালু, সে শব্দ শুনিয়াও প্রোথ্য করিলেন না ।

একখানি ইফকের পর আর একখানি, পরে আর একখানি সরিল, খুর খুর করিয়া বায়ুকা পড়িল । নারীগণ তখন সন্দিগ্ধ হইয়া সেই স্থান দেখিতে আসিলেন, দেখিলেন ছিত্রের তিতর দিয়া একজন, পরে আর একজন, পরে আর একজন যোদ্ধা ! পিপীলিকা সারের ন্যায় যোদ্ধৃগণ গৃহে প্রবেশ করিতেছে ! তখন চিৎকার শব্দ করিয়া যাইয়া শায়েস্তার্থীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে সমুদয় অবগত করিলেন ।

শিবজী সন্ধি প্রার্থনার মিনতি করিতেছেন, ঋঁ সাহেব এইরূপ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন ; সহসা জাগরিত হইয়া শুনিলেন, শিবজী পুনঃ হস্তগত করিয়া তাঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছেন ।

পলায়নার্থে এক দ্বারে আসিলেন, দেখিলেন বর্মদারী মহারাজীয় যোদ্ধা ! অস্ত্র দ্বারে আসিলেন, তাহাই দেখিলেন । সভয়ে সমস্ত দ্বার বন্ধ করিলেন, গবাঙ্ক দিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছিলেন,

এমত সময়ে সন্তয়ে শুনিলেন ‘ হর হর মহাদেও ’ বলিয়া মহারাষ্ট্রীগণ পার্শ্বের গৃহ পরিপূর্ণ করিল।

তখন রাজপুত্রী আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া চারিদিকে গোল হইল। প্রাসাদের রক্ষকগণ সহসা আক্রান্ত হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছিল, অনেকেই হত বা আহত হইয়াছিল, তথাপি অবশিষ্ট লোক প্রভুর রক্ষার্থ দৌড়িয়া আসিল ও সেই পঞ্চবিংশজন মাউলীকে চারিদিকে বেষ্টিত করিল।

শীঘ্রই ভীষণ রবে সেই প্রাসাদ পরিপূর্ণিত হইল; কোন ঘরের দীপ নিৰ্ব্বাণ হইয়াছে, অন্ধকারে মাউলীগণ পিঠাচের স্তায় চীৎকার করিয়া হত্যা করিতে লাগিল; কোন ঘরে মশালের আলোকে হিন্দু ও মুসলমান যুদ্ধ করিতেছে, কবাতের বন্ধননা শব্দ, আক্রমণকারীদের মুহুমূর্ত্তঃ উল্লাসরব, ও আক্রান্ত ও আহতদিগের চীৎকারে ও আর্তনাদে প্রাসাদ পরিপূর্ণিত হইল। সেই সময়ে শিবজী বর্ষা হস্তে লক্ষ দিয়া যোদ্ধাদিগের মধ্যে পড়িলেন। ‘ সনাতনধর্ম্মের জয় হটক ’ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, মাউলীগণ সঙ্গে সঙ্গে ছুঁকার করিয়া উঠিল, মোগল প্রহরীগণ পলায়ন করিল, অথবা সমস্ত হত ও আহত হইল। শিবজী ভীষণ বর্ষাঘাতে ঘোর ভয় করিয়া শায়স্তার্থীর শয়নঘরে আসিয়া পড়িলেন।

সেনাপতির রক্ষার্থে তৎক্ষণাৎ কয়েকজন মোগল সেই ঘরে ধাবমান হইল;

শিবজী দেখিলেন সর্বসম্মুখে মৃত চাঁদখাঁর ক্রিমশালী পুত্র শমশের খাঁ! পিতা অপমানিত হইয়া প্রাণ হারাষ্টয়াছে; তথাপি পুত্র সেই প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ও অগ্রগণ্য! শিবজী এক মুহূর্ত্ত দণ্ডায়মান হইলেন; কোষে খজা রাখিয়া বলিলেন, ‘ যুবক, তোমার পিতার রক্তে এক্ষণে আমার হস্ত কলুষিত রহিয়াছে, তোমার জীবন লইব না, পথ ছাড়িয়া দেও। ’

‘ কাফের! হত্যাকারীর এই দণ্ড! ’ শমশের খাঁর নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলন্ত, শিবজী আশ্রয়স্থানের প্রয়াস পাটবার পূর্বেই শমশেরের উজ্জ্বল খজা আপন মস্তকোপরি দেখিলেন।

মুহূর্ত্তের জন্য প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া ইফ্দেবতা ভবানীর নাম লইলেন; সহসা দেখিলেন পশ্চাৎ হইতে একটি বর্ষা আসিয়া খজাধারী শমসেরকে ভূতলশায়ী করিল। পশ্চাতে দেখিলেন রঘুনাথজী হাবিলদার!

‘ হাবিলদার! এ কার্য আমার স্মরণ থাকিবে। ’ কেবল এই মাত্র বলিয়া শিবজী অগ্রসর হইলেন।

এই অবসরে গবাক দিয়া রজ্জু অবলম্বন করিয়া শায়স্তার্থী পলাইলেন। কয়েক জন মাওলী সেই গবাকমুখে ধাবমান হইয়াছিল, একজন খজের আঘাত করিয়াছিল তাহা শায়স্তার্থীর অঙ্গুলীতে লাগিয়া একটি অঙ্গুলী ক্ষেদন হইল, কিন্তু

শায়েরস্তাখাঁ আর পশ্চাতে না ফিরিয়া পলায়ন করিলেন, তাঁহার পুত্র আবদুল ফতেখাঁ ও সমস্ত প্রহরী নিহত হইয়াছিল। তখন শিবজী দেখিলেন যর, প্রাঙ্গণ, বারন্দা রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে প্রহরীগণের মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে, ক্রীলোক ও পলাতকগণের আর্তনাদে প্রাসাদ পরিপূরিত হইতেছে, ও তখনও মাউলীগণ, মোগলদিগের ধ্বংস সাধনার্থ চাষিদিগকে ধাবমান হইতেছে। মশালের অম্পর্ক আলোকে কাহারও মৃতদেহ, কাহারও ছিন্নমুণ্ড, কোথাও বা রক্ত প্রাণালী ভীষণ দেখাইতেছিল। তখন শিবজী আপন মাউলীদিগকে নিকটে ডাকিলেন। সকল সময়ে সকল যুদ্ধেই তিনি জয়লাভ করিলে পর রূপা প্রাণনাশ দেখিলে বিরক্ত হইতেন ও শত্রুর ও সেরূপ প্রাণনাশ যাছাতে না হয় তাহার যথেষ্ট যত্ন করিতেন। আদেশ করিলেন, ‘আমাদের কার্যসিদ্ধি হইয়াছে, তীক শায়েরস্তাখাঁ আর আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না; এক্ষণে দ্রুতবেগে সিংহগড়াভিমুখে চল।’

অন্ধকার রজনীতে শিবজী অনারাসে পুনা হইতে বহির্গত হইলেন ও সিংহগড়ের দিকে ধাবমান হইলেন, প্রায় দুই ক্রোশ আসিয়া মশাল জ্বলিবার আদেশ দিলেন। বহুসংখ্যক মশাল জ্বলিল; পুনা হইতে শায়েরস্তাখাঁ দেখিতে পাইলেন মহারাজসেনা নিরাপদে সিংহগড়ে উঠিল।

পর দিন প্রাতে ক্রুদ্ধ যোগলগণ সিংহগড় আক্রমণ করিতে আসিল, কিন্তু গড়ের কামানের গোলার ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। কর্তাজী গুজর ও তাঁহার অধীনস্থ মহারাজীয় অশারোহীগণ বহুদূর পর্যন্ত পশ্চাৎদাবন করিয়া গেল।

অপ্প বিপদে সাহসী যোদ্ধার আরও যুদ্ধশিপাসা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু শায়েরস্তাখাঁ সেরূপ যোদ্ধা ছিলেন না; তিনি আরংজীবকে একখানি পত্র লিখিলেন, তাছাতে নিজ সৈন্যের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন ও যশোবন্ত অর্থে বশীভূত হইয়া শিবজীর পক্ষাচরণ করিতেছে এইরূপ জানাইলেন। আরংজীব দুই জনকেই অকর্মণ্য বিবেচনা করিয়া ডাকাইয়া পাঠাইলেন, ও নিজপুত্র সুলতান মোরাজীমকে দক্ষিণে পাঠাইলেন, পরে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য যশোবন্তকে পুনর্ব্বার পাঠাইলেন।

ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন যুদ্ধকার্য হইল না। ১৬৬৪ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই শিবজীর পিতা শাহজীর কাল হওয়ার শিবজী সিংহগড়েই স্রাজ্ঞাদি সমাপন করিয়া, পরে রায়গড়ে যাওয়া রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন ও নিজনামে মুদ্রা অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। আমরা এখন এই নবভূপতির নিকট বিদায় লইব।

পাঠক! বহু দিবস হইল তোরগদুর্গ হইতে আসিয়াছি, চল এই অবসরে একবার সেই দুর্গে যাইয়া কি হইতেছে দেখি।

মৌক্তিক

—

পাঠক, অনেক দিন হইল যে মণিকার তোমার সুন্দর গ্রীবার ছীরককণ্ঠ পরাইয়াছিল, অদ্য সেই আবার এই মৌক্তিক হার লইয়া তোমার সমক্ষে উপস্থিত। মুক্তা নানা আকারের ও নানা মূল্যের, রুহৎ হংসভিষের ন্যায় মুক্তাও আছে, এবং সর্বপ প্রমাণ অতি ক্ষুদ্র মুক্তাও আছে। আবার এক একটি মুক্তার মূল্য একাদশ লক্ষ মুদ্রারও অধিক, আবার দেশীয় কবিরাজ মহাশয়েরা যে মুক্তা ভক্ষ্য করেন, তাহার মূল্য এক পয়সারও কম। আমার এই হারে সুন্দরের কাক-চাতুর্ধ্য নাই। এবং ইহার গুণ ব্যাখ্যা করিতে “মেলেনী মাসী” ও নাই। কিন্তু মুক্তাগুলি বহুমূল্য—কেন না বহুযত্নে সংগৃহীত। যদি তুমি একবার পরিধান কর তবেই অম সার্থক বোধ করিব।

মুক্তার উৎপত্তি সম্বন্ধে ভারতবর্ষে একটি কাব্যীয় প্রবাদ আছে। অর্থাৎ বৈশাখ মাসে যখন নূতন জল পতিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন শুক্লি গুলি মুখব্যাদান করিয়া জলের উপরিভাগে বিচরণ করিতে থাকে, পরে যে দিবস স্বাতীনকত্রের যোগ হয়, তখনকার রুক্তিজল শুক্লির অভ্যন্তরে পতিত হইলেই মুক্তার উৎপত্তি হয়।

ভেরোনা নগরবাসী রোমীয় পণ্ডিত

প্লিনি এই ভারতীয় প্রবাদের সহিত স্বীয় কল্পনা মিশাইয়া মুক্তার উৎপত্তির এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন যে “কস্তুরিকা-গৃহীত নীহারকণার গুণানুসারে মুক্তার গুণের ভারতম্য হয়। শিশিরবিন্দু পরিষ্কৃত হইলে মুক্তাও পরিষ্কৃত হয়; এবং উহা অপরিষ্কৃত হইলে মুক্তাও অপরিষ্কৃত হয়। যখন সেই বহুমূল্য বিন্দু শুক্লিগর্ভে পতিত হয়, তখন বায়ু মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে, মুক্তার পাংশুবর্ণ হয়; শুক্লিতে যত শিশির ধরে তত পড়িলে মুক্তা রুহৎ হয়। বিদ্যাহ্রদগম হইলে অকস্মাৎ শুক্লির মুখকন্ধ হওয়াতে মুক্তা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয়। শিশিরবিন্দুগ্রহণ সময়ে বজ্রপাত হইলে মুক্তাও অস্তঃসারশূন্য; খোমার ন্যায় হইয়া যায়।”

ইতালি দেশের একজন প্রসিদ্ধ কবিও পূর্বোক্তরূপ কল্পনা করিয়াছেন। মুক্তার কল্পিত উৎপত্তি যত অদ্ভুত না হউক, প্রকৃত উৎপত্তি বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে কস্তুরিকা-জাতীয় অনেকগুলি মৎস্যের এক প্রকার পীড়া হইতে এই বহুমূল্য-পদার্থটি উৎপন্ন। * ডাক্তার বেয়ার্ড

* ১৭১৭ খৃঃ অঃ কুমার নামা পণ্ডিত বলেন প্রাণীদিগের শরীরে ইহা একপ্রকার পাথরি রোগ।

কছেন, কখন কখন শক্তি ও তন্মধ্যস্থ মৎস্যদেহের অন্তরে বালুকণা বা অপর কোন পদার্থ প্রবেশ করাওে একপ্রকার বিজাতীয় কণুয়ণ উপস্থিত হয়। সেই উপদ্রব নিবারণ করিবার জন্ত মৎস্যটি ঐ পদার্থের উপরে একখানি অতি সূক্ষ্মডক্ক বিস্তার করে, এবং উহাকে স্থায়ী শরীরস্থ একপ্রকার স্বচ্ছ পদার্থ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ফেলে। কখন কখন অপর কোন জন্তু শক্তিমধ্যস্থ প্রাণীটিকে বহির্গত করিবার জন্ত শক্তি-দেহের কোনস্থল বিদ্ধ করে; কিন্তু উক্ত প্রাণীটি তৎক্ষণাৎ পূর্ব কথিত উপায়ে ঐ বিদ্ধস্থল আবরণ করিয়া আশ্রয় রক্ষা করে। এই উভয় কারণ হইতে যে মৌক্তিকের উৎপত্তি তাহা শক্তির অভ্যন্তরেই দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদবেত্তা লিলিয়স এই শেষোক্ত উপায়ে মুক্তা উৎপাদন করিয়া স্বদেশস্থ রাজার নিকট বহু সম্মান ও গৌরবান্বিত উপাধি প্রাপ্ত হন। চীন দেশীয় লোকদিগের নিকট ইহা অনেক কাল হইতে বিদিত আছে। তাহারা জীবিত কস্তুরা ধরিয়া তাহার গাত্রে নানা পরিমাণের রক্ত করিয়া ছাড়িয়া দেয়, অনেক কস্তুরা এইরূপে বিনষ্ট হয়, কিন্তু অনেকের অভ্যন্তরে এই কৃত্রিম উপায়ে নানা আকারের মুক্তা উৎপন্ন হয়।

শক্তির বেয়ার্ডের মতে অপর একপ্রকার মুক্তা শক্তি মধ্যস্থ প্রাণীতে জন্মে, এবং উহাই সর্বোৎকৃষ্ট। সর এভার্ড হিউম কছেন যে প্রাণী শরীরে প্রাণুক্রম

কণুয়ণ হইবার কারণ এই উহাতে একরূপ কতকগুলি অণু উৎপন্ন হয়, যাহা হইতে শাবক জন্মে না, অর্থাৎ উহা নষ্ট হইয়া যায়। শক্তি-মৎস্য যেরূপ অপর ডিষ্ট প্রসব করে, ইহাদিগকে তক্রপ প্রসব করে না। উহা বীজাধারেই দ্বিতীয় বৎসর পর্যন্ত থাকে। প্রাণিশরীর হইতে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া বীজাধার ক্রমে বহু করিতে থাকে। দ্বিতীয় বৎসরের শেষে ঐ বীজকোষের উপরে একটি সূক্ষ্মডক্ক জন্মে। এবং পূর্বোক্ত পদার্থে সেই অণুগুলি সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া সূক্ষ্ম সূগোল মুক্তা উৎপন্ন হয়। শক্তির অভ্যন্তরে মুক্তা গুলি-কখন গোল, কখন বাদামী আকারের হয়। প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা যে অতিক্রম মুক্তার উল্লেখ করিয়াছি তাহাদিগকে মুক্তা বুরি কহে। ইংরেজীতে উহার নাম বীজ-মুক্তা। এই মুক্তা-বুরি গুলির প্রাচীন সময়ে বহুধা ব্যবহার ছিল। কারণ প্লিনি এক স্থলে কছেন যে, 'স্ত্রীলোকেরা পাছুকাতে পর্যন্ত মুক্তা পরিধান করিত।' এদেশীয় স্ত্রীলোকেরাও পূর্ব বেশরের হুলে ইহা ব্যবহার করিতেন, এবং অধুনা সীতি ও সূক্ষ্ম প্রভৃতির হুলে ইহা ব্যবহৃত হয়। এস্থলে একটি কথা বলা প্রয়োজন। শক্তি-মৎস্যের পীড়া নিবন্ধন মুক্তার যে উৎপত্তি হয়, তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। যাহারা মুক্তা সংগ্রহ করে, তাহারা বলে যে মৎস্য অক্ষত শক্তি-গর্ভে মুক্তা প্রায়ই পাওয়া যায় না;

কিন্তু ভয় ও অসমান শক্তি-গর্ভে মুক্তা সচরাচরই দেখা যায়।

এসিয়া, ইউরোপ, ও আমেরিকার স্থানে স্থানে মুক্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এসিয়ায় সিন্ধুনদের পিল্ভী নামক মোহানায়, করাচীনগরে, করমণ্ডল উপকূলস্থ টিউটিকরিন নগরে, লঙ্কার কণ্ডাচী উপসাগরে; মালকঙ্গ প্রণালীতে, লোহিত সাগরে, পারস্য উপসাগরস্থ খরকদ্বীপে, এবং জাপান ও ফিলিপাইন দ্বীপের নিকটে মুক্তা পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত মুর্সিদাবাদের কোন কোন বিলেও যথেষ্ট মুক্তা পাওয়া যায়। ইউরোপের মধ্যে স্কটল্যাণ্ডে অধুনা যথেষ্ট উৎকৃষ্ট মুক্তা মিলে। কথিত আছে যে দুইশতাব্দী পূর্বে রোমানেরা ইংলণ্ড হইতে প্রভূত পরিমাণে মুক্তা সংগ্রহ করিত। প্লিনি বলেন যুলিয়স্ সিজর ভিনস্ দেবীরে যে কঙ্কলিকা উপহার দেন, তাহা ব্রীটনীয় মুক্তায় খচিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পার্থস্যারের নদীজাত লক্ষটাকার মুক্তা বর্ষে বর্ষে লণ্ডনে বিক্রীত হইয়াছে, এমন কি এখনও যাহারা কনওয়ে নামক উপকূলে ভ্রমণ করিতে যান, তাহার। এক ওলপরিমিত ব্রীটনীয় মুক্তা ২০ টাকা হইতে ৫ টাকা মূল্যে যত ইচ্ছা ক্রয় করিতে পারেন। কসিয়াতে নবো-গরড্, ভার, স্কভ, প্রভৃতি প্রদেশে; এবং সাক্সনি, বেভেরিয়া, বোহিমিয়া, এবং সিলিসিয়ার নদীতে অদ্যাপি যথেষ্ট মুক্তা জন্মে।

আমেরিকায় মেক্সিকো ও ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে, সেণ্ট টমাস, নবগ্রেণেডা, এবং ব্রীটিস পশ্চিম ইণ্ডিয়া দ্বীপসমূহে বহুল পরিমাণে মুক্তা পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত এল্ফেজেরিয়া ও সুলুদ্বীপে, মাগ্রে-রিটা দ্বীপে, ও পানামা উপসাগর প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট মুক্তা পাওয়া যায়। পারস্য গবর্নমেন্টের অধীনস্থ একমাত্র বেহারিগ দ্বীপে বর্ষে বর্ষে ২৪ লক্ষমুদ্রার মুক্তা সংগৃহীত হয়। করাচি নগরের নিকট যে সকল ক্ষুদ্র মুক্তা সংগৃহীত হয়, তজ্জন্ম গবর্নমেন্টকে বর্ষে বর্ষে চরিশ সহস্র মুদ্রা কর দিতে হয়। কি প্রণালীতে মুক্তা সংগৃহীত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকটন করিলে, বোধ হয় পাঠক বর্গের বিরক্তিকর হইবে না।

লঙ্কাদ্বীপই মুক্তার জন্য পৃথিবী মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ; অতএব কণ্ডাচী উপসাগরে মুক্তা-সংগ্রহের বিবরণই আমরা নি-পিবদ্ধ করিতেছি। প্রতিবৎসর গবর্ন-মেন্ট হইতে উক্ত উপকূলের জরিপ হয়। জরিপ শেষ হইলে এক বৎসরের নিমিত্ত নিলামে ঐ জমা বিক্রীত হয়। ফেব্রুয়ারি মাসে আরম্ভ হইয়া এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে মুক্তা সংগ্রহ শেষ হয়। সাকলো ছয় সপ্তাহ বা দুইমাস কাল ডুবাকরা মুক্তাসংগ্রহ করিতে পার। কিন্তু এই সকল ডুবাক মালাবার উপকূলবাসী রো-মান কাগলিক খৃষ্টান, ইহাদের এই সময় এতগুলি পর্ব ও উপবাসাদি আছে যে,

মোট ৪০ দিনের অধিককাল কাজ করিতে পারে না। মুক্তাসংগ্রহব্যাপার যে দিন আরম্ভ হইবে, তাহার পূর্ব দিবস রাত্র ১০ ঘটিকার সময় একটি কামানের শব্দ হয়। তৎক্ষণাৎ কণ্ঠাটী উপসাগর হইতে সমুদায় নৌকা ছাড়িয়া দেয়। প্রতুষের সময় নির্দিষ্ট স্থানে নৌকা পৌঁছইছে, এবং দিবা দুই প্রহর পর্যন্ত ডুবাকরা মুক্তা সংগ্রহ করে। দ্বিপ্রহরের পর তথা হইতে নৌকা বোঝাই করিয়া বেলাবেলি কণ্ঠাটী উপসাগরে প্রত্যাবর্তন করে। অমনি শুক্তি গুলি তীরে উঠাইয়া নিলাম করা হয়। প্রত্যেক নৌকায় ১০ জন ডুবাক ও দশজন নাবিক থাকে। তদ্ব্যতীত নৌকার অধ্যক্ষরূপে একজন কর্ণধার এবং “হাদ্‌ড-দমী” নামে মালাবারাঙ্গ এক এক জন পুরোহিত বা ওঝা থাকে।

একবারে ৫ জন করিয়া ডুবাক অবগাহন করে, তাহারা উত্থিত হইলে, অবশিষ্ট পাঁচজন অবগাহন করে। কাপ্তান ফ্লুয়ার্ট কছেন ডুবাকরা সাধারণতঃ প্রতি ডুবে ৫৩ হইতে ৫৭ সেকেণ্ড পর্যন্ত জলের তলে থাকে; কিন্তু অর্থ দিলে ৮৪ হইতে ৮৭ সেকেণ্ড পর্যন্ত থাকিতে পারে। অনেক পাঠক বোধ হয় ইহাতে বিশেষ আশ্চর্য্য কিছু দেখিতে পাইতেছেন না। ভরসা করি নিম্ন লিখিত বিবরণ পাঠে বুঝিতে পারিবেন যে, ৮৭ সেকেণ্ড জলের নীচে থাকা বড় সহজ ব্যাপার নহে।

প্রথমতঃ চিকিৎসকেরা নির্ণয় করিয়া-

ছেন যে স্বস্থ শরীরে প্রৌঢ়াবস্থ পুরুষদিগের নাড়ী প্রতি মিনিটে ৭৫ বার পর্যন্ত চলে; সুতরাং ৮৭ সেকেণ্ডে ১০৯ বার নাড়ী চলে। দ্বিতীয়তঃ, ঘটিকা যন্ত্রের দোলদণ্ড প্রতি সেকেণ্ডে একবার করিয়া দোলে, এবং মনুষ্যের শ্বাসও স্ব্হাবস্থায় প্রতি সেকেণ্ডে গড়ে একবার করিয়া বহে, সুতরাং ৮৭ বার শ্বাস ত্যাগ করিতে যত সময় লাগে ডুবাকরা তত সময় জলের নীচে থাকে, একি সাধারণ ক্ষমতা! অধুনা বিজ্ঞানের উন্নতিবশতঃ ডুবাকরা জলের নীচে ৬।৭ ঘণ্টা থাকিতে পারে, কিন্তু সে যন্ত্রের সাঁহায্যে। যাহা হউক, আমরা পুনশ্চ প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি।

ডুবাকদিগের কটীদেশে একটি করিয়া জালি থাকে, সংগৃহীত শুক্তিগুলি তাহার মধ্যে রাখে। শীত্র শীত্র জলের ভিতর অধিরোহণ করিবার জন্য রজ্জু দ্বারা একটি ফাঁস প্রস্তুত থাকে; এবং তাহাতে একখণ্ড রহৎ প্রস্তর সংলগ্ন থাকে। নীচে নামিবার সময় ঐ ফাঁসের মধ্যে পদস্থাপন করে। আর একগাছি রজ্জুও ডুবাকদের কটীদেশে সংলগ্ন থাকে। অনেকক্ষণ জলের নীচে থাকিয়া কষ্ট হইলে, তাহারা এই রজ্জুটি নাড়িতে থাকে; তৎক্ষণাৎ নৌকাস্থিত লোকেরা তাহাদিগকে টানিয়া তুলে। উঠিবার সময় পূর্বোক্ত ফাঁস হইতে পানি বাহির করিয়া লয়। ডুবাকরা উত্তর কর্ণ ডুলা দ্বারা বন্ধ করে,

এবং যতক্ষণ জলের নীচে থাকে, এক হস্তে নাসিকারক্ষু চাপিয়া রাখে। তাহার দিমে ৪০ হইতে ৫০ ডুব পর্য্যন্ত দেয়, এবং প্রতিডুবে প্রায় একশত শুক্তি উত্তোলন করে।

ডুবাকদের পক্ষে হাজরের ভয়ই অত্যন্ত। যে পর্য্যন্ত হাজডমী ওঝারা মন্ত্র দ্বারা হাজডের মুখ বন্ধ না করে, তাবৎ ডুবাকরা জলে নামে না। যতদিন মুক্তা সংগ্রহব্যাপার চলিতে থাকে, ওঝারা কূলে থাকিয়া পূজা, নানাবিধ অনুষ্ঠান, ও নানা প্রকার শারীরিক কষ্ট করে। কখন কখন ওঝারা নৌকাতেও থাকে। যতক্ষণ ওঝা মৌকায় থাকে, ততক্ষণ ডুবাকরা অকৃতোভয়ে অগাধ জলে বাইতে ও পরাধুখ হয় না। মুক্তা সংগ্রাহক বণিকেরা ওঝাদিগকে বেতন দেন। ডুবাকরা মুক্তার কোন অংশ বা তাহার মূল্য স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করে। শুক্তিগুলিকে মৃত্তিকায় গর্ত করিয়া ঢাকিয়া রাখে, এবং তাহার উপরে দড়মার বেড়া দেয়। কিছু দিন পর পচিয়া শুক্তিগুলি দ্বিধা হইয়া যায় ও মুক্তা বাহির হয়। অতঃপর মুক্তাগুলিকে প্রক্ষালিত, পরিষ্কৃত, ও সরকু করা হয়। মুক্তা দ্বারাই এই প্রকার চূর্ণ প্রস্তুত হয়, তদ্বারা মাঝিয়া মুক্তা পরিষ্কার করে।

শ্বেত, ময়ূণ, উজ্জ্বল মৌক্তিকই সর্বপ্রথম। জেফ্রি নামা একজন প্রসিদ্ধ বহুজীবী বলেন যে “ দুইবৎ শ্বেত, অতুজ্জ্বল, অক্ষত, কলকরহিত মুক্তাই সর্বোৎকৃষ্ট।” বর্ণ

বিশিষ্ট মুক্তা তাঁহার মতে অকর্মণ্য। সম্পূর্ণ গোলাকার মুক্তাই উৎকৃষ্ট, কিন্তু ইয়ারিং প্রভৃতিতে অশাক্তি মুক্তাই অধিক ব্যবহৃত হয়। হিন্দুরা ঈষলোহিত বা ঈষৎ পীত মুক্তাই অধিক মনোহর জ্ঞান করেন। জেফ্রি এইরূপে মুক্তার মূল্য নিরূপণ করেন;—প্রায় চারিরক্তি পরিমিত মুক্তার মূল্য চারি টাকা; ৮ রক্তি পরিমাণ হইলে ১৬ টাকা; ১২ রক্তি পরিমাণ হইলে ৩৬ টাকা। অর্থাৎ ৪ রক্তিতে এক ‘কেরাট’ হয়, সুতরাং যত ‘কেরাট’ হইবে তাহার বর্ণ লগু, এবং সেই বর্ণফল দ্বারা এক কেরাটের মূল্য ৪ টাকাকে গুণ কর। কিন্তু প্রাচীন কালীন অনেক মুক্তার কথা শুনা যায়, তাহার মূল্য এই নিয়মে নিরূপিত হয় নাই। এমন কি, এখনও কোন মুক্তা অতি উৎকৃষ্ট বা স্নন্দর হইলে, তাহার মূল্য পরিমাণানুসারে হয় না।

অস্বদেশীয় পণ্ডিতদিগের মতে কেবল শুক্তিই মুক্তার উৎপত্তি স্থান নহে। ভাব প্রকাশে যথা:—

“ শঙ্খো গজশ্চ ক্রোড়শ্চ ফণিমৎস্যশ্চ
দক্ষরঃ।
বেগুরেতে সমাখ্যাতান্তর্জাজৈ মৌক্তিক
যোনয়ঃ ॥ ”

অর্থাৎ শঙ্খ, হস্তী, শূকর, ভূজঙ্গ, মৎস্য, কচ্ছপ, বংশ প্রভৃতিতেও মুক্তা জন্মায়। রাজ নির্ঘণ্টে জাতিভেদে অর্থাৎ মুক্তার উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

“মাতঙ্গোরোগমীনপোত্রিশিরসস্বকসার-
শঙ্খাশুভ্ৰং
শুক্লীনািমুদরাক্ষ মৌক্তিক মনিঃ স্পষ্টো
ভবভাস্তথা ॥ ”

মুক্তার লক্ষণ সম্বন্ধে রাজ নির্ঘণ্ট বলেন—
“ নক্ষত্রাভং শুদ্ধমত্যন্ত মুক্তং স্নিগ্ধং স্থূলং
নির্মলং নিব্র্ণঞ্চ ।

নাস্তংধত্তে গৌরবং যত্নুলায়াং তন্নি-
খ্যালাং মৌক্তিকং সৌখাদায়ি । ”

যে মুক্তা নক্ষত্রের নায় শূত্র ও উজ্জ্বল,
অত্যন্ত বিশুদ্ধ, স্নিগ্ধ, স্থূল, নির্মল ও ত্রণ-
রহিত, এবং তুল্যতে স্থাপন করিলে যা-
হার গুরুত্ব অনুভূত হয়, সেই নির্মল মৌ-
ক্তিকই সুখদায়ি অর্থাৎ প্রশস্ত ।

রাজ নির্ঘণ্টকার পুনশ্চ মুক্তার বি-
শেষ লক্ষণ কহিয়াছেন । যথা—

“ ছায়াপাটলনীলপীতধবলাস্তত্রাপি
সামান্যতঃ ।

সপ্তান্যং বহুশো ন লন্ধি
রিতি চেচ্ছৌক্তেরকং তুলানং ॥ ”

যদিচ অপর সপ্তবিধ মুক্তা শৌক্তিকের
অর্থাৎ শুক্তি-গর্ভজাত মুক্তার তুল্য বহু-
ছায়াবিশিষ্ট না হউক, তথাপি পাটল,
নীল, পীত, ধবল এই কএক প্রকার ছায়া
তৎসমুদায়ে সাধারণতঃ আছে ।

ভোজ রাজতন্ত্র নামে একখানি উৎ-
কৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থে ছায়া দ্বারা নানাবিধ
মুক্তার পরীক্ষা করিবার বিবরণ লিখিত
আছে । আমরা এস্থলে বহু অন্বেষণ করি-
য়াও তাহা প্রাপ্ত হইলাম না । দুঃখের কথা

বলিব কি আমরা একখানি হস্তলিখিত
রাজনির্ঘণ্টে মুক্তাসম্বন্ধে আরও যে সকল
প্রমাণ পাইলাম, তাহা লিপিকরের প্রমাদ-
বশতঃ এত অশুদ্ধ হইয়াছে, যে তাহার
কোনও অর্থসংগ্রহ হয় না । অধিক কি,
আমরা যে কএকটি বচন উদ্ধৃত করিলাম
তাহারও স্থানে স্থানে অনেক ভ্রম রহিল ।

এতদ্দেশীয় ভিষ্কদিগের মতে মুক্তার
নানাগুণ, এবং উহা তাঁহারি নানাবিধ
ঔষধেও ব্যবহার করেন । কিন্তু ইউ-
রোপীয় চিকিৎসকেরা একথা গ্রাহ্য ক-
রেন না । তাঁহারি বলেন যে, সামান্য
চুর্ণ এবং মুক্তাভ্রম্বে কোনও প্রভেদ
নাই । বস্তুতঃ আমরা স্থূলাস্তরে মুক্তার
যে রাসায়নিক গুণের উল্লেখ করিয়াছি,
তাহাতে এতদূতয়কে একই পদার্থ বলি-
লিয়া বিশ্বাস হয় । যাহা হউক বৈদ্যক
শাস্ত্রমতে মুক্তার গুণ এই ।

“ সারকত্বং, শীতত্বং, কষায়ত্বং, স্ফাভূত্বং,
লেখনত্বং, চক্ষুযাত্বঞ্চ । ”, ইতি রাজবল্লভঃ ।

অর্থাৎ মুক্তায় সারকত্ব, শৈতা, কষা-
য়ত্ব ও মুখপ্রিয়ত্ব গুণ আছে । ইহা দ্বারা
লেখন অর্থাৎ ক্ষার দ্বারা যে দাগ করিয়া
দেওয়া যায়, সেই গুণ এবং চক্ষুরোগের
উপশমত্ব গুণও আছে ।

“ রূষাভং বলপুষ্টিদত্ত্বঞ্চ ” ইতি ভাবপ্রকাশঃ ।

ইহাতে পুং শক্তির বৃদ্ধি, বল ও পুষ্টি
প্রদান করে ।

“ মৌক্তিকঞ্চ মধুরং সূশীতলং দৃষ্টিরোগ-
শমনং বিষাপহং ।

রাজস্বক্ষমপরিকোপনাশনং ক্ষীণবীর্ষ্যাবল-
পুষ্টিবর্দ্ধনং ॥, ইতি রাজনির্ঘণ্ট—

ইহা মধুর, স্ন্যশীতল, দৃষ্টিরোগ-ও
যক্ষ্মারনাশক; এবং ক্ষীণবীর্ষ্যদিগের বল-

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অপর কএকটি
পদার্থের সহিত মুক্তার আপেক্ষিক গুণত্ব
নিরূপণ ও তুলনা করিয়াছেন। প্রতিঘন
ফুটে যত গুণত্ব তাহা তন্মানে দেওয়া যাই-
তেছে। এক ওন্স অর্ধ ছটাক।

চীনাবাসন	২৩৮৫	অর্থাৎ	৭৪.২	সের
চকুমকি প্রস্তর	২৫৯৪		৮১.	
স্ফটিক	২৬৪০		৮২.৩	
প্রবাল	২৬৮০	“	৮৩.৭	
মুক্তা	২৬৮৪	“	৮৩.৯	
হীরক	৩৫৩৬	“	১১০.৫	
গোমেদক	৩৮০০	“	১১৮.৬	
নীলকান্তমণি	৩৯৯৪	“	১২৫.৮	“
পদ্মরাগমণি	৫২৮৩	“	১৩৩.৮	“
অয়স্কান্তমণি	৪৯৩০		১৫৪.	

যে দশটি পদার্থের তুলনা করা গেল,
তন্মধ্যে মুক্তা পাঁচটি অপেক্ষা ভারী,
এবং অবশিষ্ট পাঁচটি অপেক্ষা লঘু। মুক্তা
লৌহ অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ লঘু;
কিন্তু জল অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ ভারী;
অঙ্গারক চূর্ণের স্ফায়িত হেতু মুক্তা এত
দৃঢ়; অন্ন পদার্থ (এসিড্) মধ্যে মুক্তা
নিষ্কেপ করিলে তৎক্ষণাৎ দ্রব হইয়া যায়।
অর্থাৎ এসিডের সহিত সোডা, মিলিত হ-
ইলে যেরূপ বুদ্ধ উত্পন্ন হইয়া থাকে, মুক্তা

দ্রবীকরণ কালেও ঠিক তজ্রূপ হয়। ফলতঃ
সোডা যে পদার্থ, মুক্তার রাসায়নিক উ-
পকরণও তাহাই। দ্রব হইয়া গেলে
অতি সূক্ষ্ম একটি তৃক্ মাত্রাবশিষ্ট থাকে।
সময়ে সময়ে কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করিতে
অনেকে প্রয়াস পাইয়াছে। কিন্তু
জেকুইন নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত
এবিষয়ে যতদূর কৃতকার্ষ্য হইয়াছেন তত
আর কেহই নহে। বাজারে মাসের
যে মুক্তা বিক্রয় হয়, উহাই জেকুইনের আ-
বিষ্কৃত। সংপ্রতি কতিপয় প্রসিদ্ধ মুক্তার
সংক্ষেপ বিবরণ লিখিয়া আমরা প্রস্তা-
বের উপসংহার করিতেছি।

প্রাচীন পুরাণতে দেখাযায়, একদা
মার্কস্ এটনি ও ক্লিওপেট্রা কোন ভোজে
বাজি রাখেন। তাহাতে রূপ ও ধনে গ-
র্বির্ভা রাণী স্বীয় কর্ণভূষা হইতে দুইটি বহু-
মূল্য মুক্তা লইয়া একটি সেকার দ্রব করিয়া
পান করেন; অপরটি এটনি কাড়িয়া ল-
ইয়া রক্ষা করেন এবং তাহা দ্বিগুণিত ক-
রিয়া ভিনসুদেবীর কর্ণভূষায় প্রদত্ত হয়
উহার মূল্য সম্বন্ধে নানা মত আছে। কেহ
বলেন ৮০৭২৯১৫০ টাকা*, কাহারও
মতে ৭৬০০০০ টাকা† এবং কাহারও
মতে ৮৪০০০০ টাকা।‡

জুলিয়াস সিজর ক্রটাসের জননী সা-
ভিলিয়াকে উপহার স্বরূপ যে একটি মুক্তা

* পেটাসিনকৃত প্রাণিতত্ত্ব। † এন্-
সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা ১৭ ব। ‡ ম-
ণ্ডাস্কৃত অভিধান।

দিয়াছিলেন, তাহার মূল্য কাহার মতে ৫০০০০০ পাঁচ লক্ষ মুদ্রা, * কাহার মতে ৪৮৪১৭৫ মুদ্রা। †

এ, জে, বি, হোপ নামা পার্লিগামেন্টের সদস্য বিশেষের নিকট একটি মুক্তা ছিল, অত বড় মুক্তার কথা এখন আর বড় শুনা যায় না। উহার ওজন ১৮৬০ আনা, বেড় ৪৯ ইঞ্চি, দৈর্ঘ্য ২ ইঞ্চি। মূল্য প্রায় ১৯০০০০ টাকা। ‡

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে টেবালিয়ার নামে একজন পরিত্রাজক পারস্যাদিগের নিকট একটি মুক্তা দেখেন, উহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ ইঞ্চি; বেড় প্রায় ৩৯ ইঞ্চি এবং মূল্য ১১০০০০০ একাদশ লক্ষ মুদ্রা। † ইহার আকৃতি অশুকার, অক্ষত ও অত্রণ। আরব্য দেশস্থ কেটিকা নামক স্থানে ইহা ক্রীত হয়। কেহ অনুমান করেন যে, পারস্যের পূর্বতন সুলতান ফতেআলি সার এই মুক্তাটি ছিল।

* পেনিসাইক্লোপিডিয়া † পেটাসনিকৃত প্রাণিতত্ত্ব।

‡ ব্রেঞ্জিসের বৈজ্ঞানিক অভিধানের বিবরণেও প্রায় এইরূপ।

¶ মণ্ডার্স অভিধানমতে এইরূপ এবং বিটনের সার্ক্‌ভৌমিক অভিধানের মতেও এই; কেবল বিটনের মতে দৈর্ঘ্য ২ ইঞ্চি। পেনিসাইক্লোপিডিয়ায় মতে মূল্য ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার। হেডেনের সমর-নির্গায়ক অভিধানমতে মূল্য ১ কোটি ১০ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার মতে ১ লক্ষ।

হংসডিম্বাকার একটি পানামা উপ-কুলজাত সুল্কর মুক্তা স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপকে ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হয়। উহার আয়তনও একটি কপোতাণ্ডের ত্রায় হইবে। উহার মূল্য পেনি সাইক্লোপিডিয়ায় মতে চল্লিশ সহস্র; কিন্তু হেডেনের অভিধানানুসারে ১৩৯৯৬০ মুদ্রা। †

ডি বৃটী নামা পণ্ডিত কহেন যে সত্রাট দ্বিতীয় রডল্ফের মুকুটে হংসাণ্ডবৎ ৩০ কেরাট অর্থাৎ ১৮ ভরি ওজনের একটি মুক্তা ছিল। ইহার মূল্যের নিরূপণ কেহ করেন নাই। সাধারণ নিয়মানুসারে গণনা করিলে ৩৬০০ টাকা হইবে। ইহার নাম “অতুলন।”

ভিনিসের গবর্নমেন্ট স্বমের বাতসা সোলেমানকে যে মুক্তাটি উপহার দেয়, তাহার মূল্য ১৬০০০০ একলক্ষ ষাট হাজার টাকা।

দশম লিও নামে রোমান কাথলিক দিগের ধর্মাধ্যক্ষ (পোপ) কোন ভিনিসিয়ান মণিকারের নিকট এক লক্ষ চারি সহস্র মুদ্রায় একটি মুক্তা ক্রয় করেন।

স্পেনের রাজধানী মেড্রিডনগরবাসিনী একটি মহিলা ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন দেশ হইতে একটি মুক্তা ক্রয় করিয়া আনেন, তাহার মূল্য তিনলক্ষ তের শত মুদ্রা।

† পেনিসাইক্লোপিডিয়ায় মন ১৫৭৯।

কসিয়ার মস্কোনগরের জোসিমা চি-
ত্রশালিকায় পেলিগ্রিনা নামে দুক্‌নিভ
শুভ্র, সম্পূর্ণ গোল, অভ্যাজ্জল একটি মুক্তা
আছে। ইফটইশিয়া কোম্পানির কোন
জাহাজের নিকট লেঘহরণ নগরে জো-
সিম নামা একব্যক্তি উহা ক্রয় করে। উ-
হার ওজন প্রায় ১৯ রতি পরিমাণ, এবং
সামান্য হিসাবে মূল্য ১৩৩৬ মুদ্রা। উহা
মস্কোনগরস্থ আশ্চর্য্য পদার্থের মধ্যে অতি
বিখ্যাত।

কতিপয় বর্ষ গত হইল মালদ্বীপ নগ-
রের কোন প্রদর্শনে একটি অদ্ভুৎ জড়াও
রত্ন প্রদর্শিত হয়। উহা একটি অর্ধমৎস্য-
নারীকৃপ, মস্তক ও বাহু শ্বেত চুনি প্রস্তু-
রের, হস্ত দ্বারা কেশ বিভ্রাস করিতেছে,
বক্ষ একটি দীর্ঘাকার জাপান-মুক্তা, উহাও
দুগ্‌বৎ শুভ্র ও অতি স্বন্দর। মৎস্যাক্রান্ত
হরিঘর্ণের চুনি প্রস্তরে নির্মিত। এই মুক্তা-
টিকে অনেকে বহুমূল্য জ্ঞান করিয়াছি-
লেন।

শ্রীঃ

কবি কাঞ্চনাচার্য্য

এই রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমির অনন্ত
গর্ভে কত রত্ন অপূর্ণ প্রভায় প্রতিভাত
হইয়াছে এবং তদনন্তর কালের করাল
প্রাণে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা কাল-
প্রাণে অস্পৃষ্ট রহিয়া অজ্ঞাপি অতিক্রম
আলোকে মনুষ্যের লোচনগোচর হই-
তেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে ?
দুর্ভূত অনার্য্যজাতির ক্রুরহস্তেই বা কত
মহাস্মার যশঃশরীর ভস্মীকৃত হইয়াছে, কে
তাঁহা বলিতে পারে ? হুরদৃষ্ট যে কত প্র-
কার মুক্তি পরিগ্রহ করিয়া ভারতের স-
র্বাঙ্গে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে,
তাঁহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কত ম-
হাস্মার নামমাত্র, কত রসার্চিত্ত ভাবুকের
এস্কের নামমাত্র আমাদের শোকের হেতু-
ভূত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। কোনও
এস্ককারের একখানি ক্ষুদ্রতম এস্ক দৃষ্টি-

গোচর হইলেও আমাদের অশ্রুতকরণ এই
সন্দেহে আকুল হইয়া উঠে, যে ইঁহঁর অ-
বশ্য অস্ত্র এস্ক ছিল—এ রসমাগরের অ-
বশ্য অপর প্রবাহ ছিল। বাস্তবিক, মৎ-
স্কৃত সাহিত্যমাগরে অবগাহন করিলে ভ-
গ্নপ্রাসাদশ্রেণীদর্শনে তত্ত্বানুসন্ধারীর স্থায়,
একরূপ অপূর্ণ ব্যাকুলতা আসিয়া হৃদয়ে
উপস্থিত হয়। যাহা হউক, সে কথা সম-
য়ান্তরে আলোচ্য। অন্য যে বিসয় আমা-
দিগের বিবক্ষিত, তাহার অবতারণা করা
যাইতেছে।

এই প্রস্তাবের শীর্ষদেশে সাঁহার নাম
উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি একজন রসার্দ্-
চিত্ত শ্রকবি। ধনঞ্জয় বিজয় নামক অতি-
ক্ষুদ্র একখানি গ্রন্থ তাঁহার কবিত্বের নিদ-
র্শন-স্বরূপ বর্তমান আছে। এখানি ব্যা-
য়োগ। রূপকের যে দশ প্রকার ভেদ ক-

প্পিত হইয়াছে, ব্যায়োগ তাহার অন্য-
তম । অলঙ্কারগ্রন্থে ব্যায়োগের যে সকল
লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে, ইহা সেই সমস্ত
লক্ষণে সংযুক্ত । উত্তরকালরচিত বলিয়াই
হউক, বা প্রয়োজনাত্তাববশতই হউক,
সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থে ইহার নাম, বা ইহার
শ্লোক উল্লিখিত অথবা উদ্ধৃত হয় নাই।
দ্রুংখের বিষয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্বর-
চিত “ সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য-
শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব ” নামক যে গ্রন্থে
সংস্কৃত কবিসম্বলীর গ্রন্থের পরিচয় ও
সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে
খনঞ্জয়-বিজয়কার কাঞ্চনাচার্যের নাম উ-
ল্লেখযোগ্য বিবেচনা করেন নাই। গ্র-
ন্থের ক্ষুদ্রাঙ্গতা যে তাঁহার উল্লেখ না ক-
রিবার কারণ, এরূপ আমরা মনে করি না।
মহামণি ক্ষুদ্রাঙ্গতি হইলেও তাহা শিরো-
ধার্য্য। অন্যথা অমক, ময়ূর ভট্টাদির এত
সম্মান কেন ? যদিও কাঞ্চনাচার্য্য ময়ূর-
ভট্টাদির সম্পূর্ণ তুল্যকক্ষ নহেন, তথাপি
স্বকবিশ্রেণীতে অবশ্য পরিগণনীয়, তা-
হাতে সন্দেহ নাই। আমরা স্বমতসমর্থ-
নার্থ তাঁহার গ্রন্থের বিষয় সংক্ষেপে কি-
ঞ্চিৎ আলোচনা করিব ।

গ্রন্থের প্রারম্ভে যে নান্দীশ্লোকদ্বয়
প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অতি উদাত্ততাব-
পূর্ণ। প্রথম শ্লোকটি বিষ্ণুবিষয়ক। যথা ;—
হরেলীলাবরাহস্য দংষ্ট্রাদগুঃ স পাত্তবঃ ।
হেমাঙ্গিকলসা বত্র ধাত্রীশ্চত্রপ্রিয়ং দধৌ ।
প্রায়কালে নিখিল জগৎ জলপ্লাবিত

হইলে ভগবান্ নারায়ণ বিশাল বরাহমূর্ত্তি
ধারণ করিয়া দশনদ্বারা ধরণীমণ্ডলকে উ-
দ্ধৃত করিয়াছিলেন । এই সময়কে অধি-
কার করিয়া কবি মঙ্গলাচরণ করিতে-
ছেন ;—শীলাঙ্কলে বরাহমূর্ত্তিধারী ভগ-
বান্ বিষ্ণুর সেই বিশাল দশন তোমাদি-
গকে রক্ষা ককন, যে দশনের উপরি পৃথিবী
ছত্রের শোভা ধারণ করিয়াছিল এবং যে
দশন সেই পৃথিবীরূপ ছত্রের দণ্ড স্বরূপ
হইয়াছিল এবং স্বর্ণময় স্রমেৰু যে উর্দ্ধকৃত
পৃথিবীরূপ ছত্রের কলসস্বরূপ (ছত্রের
শিরঃস্থিত বস্তুবিশেষ) হইয়াছিল । পা-
ঠকগণ দেখুন, সংক্ষিপ্তবাক্যে কতদূর
অলৌকিক ভাবের পরিব্যক্তি হইয়াছে ।

নান্দীর দ্বিতীয় শ্লোকটি কালীবিষ-
য়ক। যথা ;—

তদ্বঃ প্রমাক্টু বিপদঃ প্রণতাঙ্গিহস্ত্যা
ত্ৰাস্তং পদং মহিবমূর্দ্ধনি চণ্ডিকায়ঃ ।
বৈরী যদিয়নখরাংশু-পরীতশৃঙ্গঃ
শক্রায়ুধাঙ্কিতনবাসু ধরপ্রভোহভুৎ ॥

ভগবতীর মহিষাসুরের সহিত সময় সময়
অবলম্বন করিয়া কবি কহিতেছেন,—দেবী
চণ্ডিকার প্রণতজনের পীড়াহর সেই চরণ
তোমাদিগের বিপত্তিনাশ ককন, যে চরণ
মহিবরূপী অসুরের মস্তকে স্থাপিত হইলে
সেই চরণের অকণনখশ্রেণীর প্রভায় মহি-
ষের কুটিল শৃঙ্গদ্বয় সুরঞ্জিত হওয়ার ঘোর-
রুক্ষবর্ণ মহিষাসুর ইন্দ্রধনুঃশোভিত নবমে-
ঘের শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল । এই শ্লোকে কি
অপূর্ব সৌন্দর্য্যতাব উদ্ভাবিত হইয়াছে !

বিরাট স্থপতির উত্তর গোঁগৃহ হইতে যে অসংখ্য গো রাজ্য দুর্বোধানাদি কর্তৃক বলপূর্বক হৃত হয়, তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অর্জুন কর্তৃক সেই সকল গোর প্রত্যানয়ন এ প্রেমের বর্ণনীয়। শরৎকাল যুদ্ধাদির অনুকূল বলিয়া প্রেমের প্রারম্ভেই শরৎ সূচনা করা হইয়াছে। অনন্তর নায়ক ধনঞ্জয়ের যুদ্ধযাত্রা। যাত্রাকালে নায়কের হৃদয়ভাব দেখুন ;—
অর্জুনঃ। (সোৎসাহং) অনুকুলং দৈবং-
লক্ষ্যতে যতঃ,

যা লতাশ্চিমাতে মৈব লগ্না সম্প্রতি পাদয়োঃ।
কুঙ্করাজোভিষাতব্যঃ স্বয়মেব সমাগতঃ ॥

অর্জুন উৎসাহের সহিত বলিতেছেন, দৈব অনুকূল বলিয়া বোধ হইতেছে। যে লতাকে অন্বেষণ করিতেছি, সেই লতা পদদ্বয়ে আসিয়া সংলগ্ন হইল। যে কুঙ্করাজের নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রার্থে উৎসুক ছিলাম, তিনি স্বয়ংই উপস্থিত!

যুদ্ধে প্রবল দায়িত্বরূপ শত্রু পরাজয়ে যশঃসুখলাভ উৎসাহে উৎসাহিত হইলেও তাহাদিগের গোহরণরূপ দুর্কার্য্য অরণ করিয়া নির্ধিকৃষ্টিতে কহিলেন,—
“রে সূযোধন! পূর্বপুরুষ গণ নিপুলভূ-
জবলে যে রাজ্য অর্জন করিয়াছিলেন, তুই কপটপাশক্রীড়াচ্ছলে সেই রাজ্য হস্তাগত করিয়া অদ্য গোহরণে প্রবৃত্ত হইয়া-
হিস্ম। হাধিক্! আমাদিগের কুলগুণ ভগবান্-
চন্দ্রমাতোর দ্বারা লজ্জাপ্রাপ্ত হইলেন।”

কিয়ৎকণ পরেই যুদ্ধোপকরণাদিসহ

বিরাটকুমার আগমন করিলেন। অর্জুন রথারূঢ় হইলেন ও বিরাটকুমার সারথি হইয়া বেগে রথচালনা করিতে লাগিলেন। কএকটি শ্লোকে সারথিমুখে অশ্ব ও রথের গতি অতিসুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। অবিলম্বেই গোপালক সকল দৃষ্টিগোচর হইল। অর্জুন তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃ-
স্বরে কহিলেন,—

রে রে গোপালা অলংবিধাদেন। তথাহি ;
সিঞ্চন্তঃ ককণারসেন হৃদয়ং যাবন্ন বৎস। অমী-
মাতুর্মাংসবিলোকনবাসনিনো মুঞ্চন্তি হস্বা-
রবান্।
যাচন্তে নহি যাবদেব শিশবঃ পাতুং পয়ঃ
সোৎসুক-
স্তাবদগাঁব ইহেতাবেত ভবতাং চেতোজ্বরঃ
শাম্যতু ॥

“রে রে গোপসকল! তোমরা বি-
বাদ দূর কর। এই যে গোবৎস সকল মা-
তার পথের প্রতি সোৎসুকে দৃষ্টিনিষ্কপ-
পূর্বক ককণরসে হৃদয় আর্দ্র করিতেছে,
ইহারা যাবৎ হস্বারব না করে, আঁব শি-
শুগণ উৎসুক হইয়া যাবৎ হৃৎকপানেব জ্ঞা-
প্রার্থনা না করে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত গো-
সকল ক্রোধান্নে আছে বলিয়া জানিও।
তোমাদিগের মনের উদ্বেগশান্তি হউক।”

অনন্তর অনতিদূরে কুর্কটৈম্যরাশি স-
ন্নিবেশিত বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত হইল।
অবিলম্বে দৃষ্ট হইল অশ্বসমূহের ঋণ-
ভিমাতে উদ্ভিষ্ট ধূলিরাশি ‘স্খীর্ণকপোতক-
ঠক্টি’ গারণ পূর্বক নতশূল আচ্ছন্ন ক-

রিতেছে, 'ভর-পূর্য্যমাণ' গভীর শঙ্খ-
নাদে দিগন্ত প্রতিনাদিত হইতেছে, উর্দ্ধে
পক্ষিকুল ভয়ে ক্রত উড়য়মান, নিম্নে
আরণ্যাপশুগণ তাদৃশ সস্তমচকিত। ক্রমে
রথ সৈন্যাজ্ঞেণীর নিকটবর্তী হইতে লা-
গিল। বিপক্ষবীরগণ অর্জুনের একাকী
উত্তরের সহ প্রতিবলে অবগাহন করিতে
দেখিয়া নানাবিতর্ক করিতে লাগিল। এই
সময়ে কুঙ্করাজ সেনানীদিগকে সজ্জিত
করিতেছিলেন। পার্থ রাজপুত্র উত্তরকে
তাঁহা দেখাইলেন। উত্তর কহিলেন, দেব,
বিপক্ষযোদ্ধবর্গের বলবীর্ঘ্য ও স্বরূপ অব-
গত হওয়া সারথির একান্ত কর্তব্য। পার্থ
কহিলেন, ঐ দেখ, শ্রোমকষাগ্নিতলোচন
হিড়িম্বাভীর সম্মুখেও যে সাহসী বিবদ-
রের অঙ্গ হইতে নির্য্যোকের নাগর্য্যৌপ-
দীর হৃদয়-স্থল হইতে লজ্জাভুকুলাঞ্চল আ-
কর্ষণ করিয়াছিল, সে ঐ দুঃশাসন, কুঙ্ক-
রাজের দক্ষিণভাগে। (১) কুমার কহি-
লেন, সাহসের পরাকাষ্ঠা বটে! পার্থ
কহিলেন, এদিকে দেখ (২) অন্য অঙ্গ-

(১) রোষোৎকর্ষকষাগ্নিতোজ্জ্বলদৃশোপ্যোগে

হিড়িম্বদ্রিষঃ

পাঞ্চালীহৃদয়স্থলাৎ সরভসং লজ্জাভুকুলা-
ঞ্চলঃ ।

নির্য্যোকঃ কণিনস্তনোরিব বলাৎ যেনাব-
কৃষ্ণঃ পুরা

সোহয়ং সাহসিকাগ্রনীশ্চনুরথো দুঃশাসন-
স্তিষ্ঠতি ॥

(২) অন্যাজ্ঞনাশিরহুতিপ্রণয়েন কীর্ত্ত্যে-

নাসংসর্গ চিরপরিহার করিয়াছেন বলিয়া
প্রণয়বশে ধবলবেশা কীর্ত্তিদেবী পলিত-
চ্ছলে যাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন,
যিনি চুম্বযুদ্ধে সুবিশ্রুত জাহ্নদগ্নোর বি-
জ্ঞতা, তিনি ঐ দেবব্রত ভীষ্মদেব, বিপুল-
যশাঃ আমাদিগের পিতামহ। এই সময়ে
নৈমানিকগণ যুদ্ধদর্শনলালসায় নভোম-
ণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র
সবিশ্বয়ে দেখিলেন, এক দিকে অগণ্য
যুদ্ধহর্ম্মদ কর্ণাদি বীরগণ, অপরদিকে অস-
হায় রথী পার্থ সময়ে প্রবেশ করিয়াছে।
দেখিয়া বুঝিলেন, বিপুলতেজোময় সহ
অপারের প্রতি দৃকৃপাত করে না। এদিকে
কুমার উত্তর অগ্রে অবলোকন করিয়া
কহিলেন, দেব! কুঙ্করাজই আসিতেছেন।
পার্থ কহিলেন, তবে আমাদিগের মনো-
রথ পূর্ণ হইল। অবিলম্বে রাজ্য দুর্ঘ্যোপন
রথারোহণে পুরোবর্তী হইয়া পার্থের অ-
ভিমুখে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, (৩)
অহে সাহসিক! বনবাসের ক্রেশরাশিতে
কি জীবনে এমন নির্য্যেক উৎপন্ন হই-
রাছে, যে তুমি একাকী এই অসংখ্য যো-
দ্ধার সহ যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ? ধ-

বালিজিতো ধবলয়া পলিতচ্ছলেন ।

দ্বন্দ্বাহবপ্রকটনির্জিতজাহ্নদগ্নো-

দেবব্রতঃ পৃথুযশাঃ স পিতামহোহনঃ ॥

(৩) বনবাসপরিক্রেশাৎকিং নির্ষিগ্নোসি
জীবনে

যদভীরেকএব হমনৈকৈর্ঘোদ্ধু মুদ্যতঃ ॥

নঞ্জর সোপহাসে (৪) কহিলেন, পার্থ এক-
কাকী কালকেয়ের সহ নিবাতকবচগণকে
ভয়ীভূত করিয়াছিল ; একাকীই বাসুদে-
বের ভয়ীকে হরণ করিয়া ছিল, আর
সেই একব্যক্তিই খাণ্ডববন অনলে দগ্ধ
করিয়াছিল । পার্থের সময়ে এ পস্থা সূতন
নহে । দুর্যোধন কহিলেন, উপহাসে প্র-
য়োজন কি, পরীক্ষাস্থল সংগ্রামই উপস্থিত
হইয়াছে । পার্থ সহাস্যে কহিলেন, কুক-
নাথ ! এস্থান হইতে অপসরণ কর ; সে
অন্যবিধ দ্যূতক্রীড়া, যাঁহাতে ক্রপদদ্বাজ-
পুঞ্জীকে দাসী করিয়াছিলে ; এখানে
শরশলাকাপাতপূর্বক প্রতিস্থপতির শর-
রূপ অনেক ক্ষত্রিয়দিগের দ্যূতক্রীড়া হইয়া

(৪) একোনিবাতকবচান্ সহ কালকে-
রৈর্ভস্মীচকার ভগিনীমহরচ্চ শৌরেঃ ।
একেন খাণ্ডববনং জুহুবেহনলে চ পার্থস্য
নাভিনব এষ রণেশু পস্থাঃ ॥

দুর্যোধন । অলমৈতেকপহাসৈঃ উপস্থিতো
নিকষোপলোপমঃ সংগ্রামঃ ।

নায়কঃ । (সহাসম্) ।

অপসর কুকনাথ দ্যূতমত্চাদৃশং তৎ ক্র-
পদস্থপতিপুঞ্জী যত্র দাসীকৃতাসীৎ । ইহ
হি শরশলাকাপাতপূর্বং সগর্ভং প্রতি-
স্থপতিশরার্টকঃ ক্ষত্রিয়দ্যূতকেলিঃ ॥

দুর্যোধন । (সামর্থ্যং) ।

করিবদনবলয়ভূষিতকরশ্চিত্তাক্রকার্মু-
কাভ্যাসঃ ।

নর্ভনশলাপ্রাশিষ প্রবীরপুরুষোচিত্তো-
হি সংগ্রামঃ ॥

থাকে । দুর্যোধন সরোষে বলিলেন,
যাহার হস্ত শ্ৰুতিরকালকার্মু কাভ্যাস প-
রিত্যাগ করিয়া হস্তিদন্তনির্ধৃত বলয়ে ভূ-
ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহার অভ্যন্ত
হৃতাশালার প্রবেশই উচিত, এস্থানে নহে ;
এ সংগ্রামস্থান, প্রবীর পুরুষের উপযুক্ত ।
বিরটিপুঞ্জ সকটাক্ষে উত্তর করিলেন, (৫)
আর্ধ্য ! আপনি ইহাকে যে চিরপরিত্যক্ত
কার্মুকাভ্যাস বলিতেছেন, তাহা যুক্তই
বটে । যেহেতু ইন্দ্রপ্রেরিত গন্ধর্ভগণ যখন
আপনাদিগকে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়, ত-
খন রূপাপরবশ নিজ জ্যেষ্ঠভাতার আদেশ-
ক্রমে আপনাদিগের মোচনার্থ ইনি যে
শরপঞ্জর রচনা করিয়াছিলেন, অতি বি-
হ্বলতা প্রযুক্ত আপনি তাহা দেখিতে পান

(৫) কুমারঃ । (সোপহাসম্) আ-
র্যৈনং চিরপরিত্যক্তকার্মুকাভ্যাস ইত্য-
ভিধৎসে তদ্যুক্তং ।

সংক্রন্দনপ্রহিতখেচরবর্গবন্ধ-
যুগ্মং রূপাকুলনিজাঞ্জশাসনেন ।

ভীমানুজেন বিহিতা শরপঞ্জরজী-

র্নালোকিতাহি ভবতাস্থপ বিহ্বলেন ॥
দুর্যোধন । সূত অলং বিপ্রজনোচিত্বাকুল-
লহেন । বিষময়ং ভূমিঃ । রথসঞ্চারো-
চিতাং ভুবমবতরাম । ইতি নিক্রান্তৌ ।
বিদ্যাপরঃ । নায়করথং নির্দিশ্য । দেব !

ভ্রমন্দনস্যন্দনবাজিরাঞ্জি-

ধুরক্ষতকুম্বরজঃপাতকঃ ।

বিপক্ষবক্ষোহরণিমম্বনোশ্ব-

প্রতাপবহ্নিরিব ধুমলেশাঃ ॥

নাই। হৃষ্যোধন কহিলেন, হৃত! ত্রাস-
ণের ন্যায় বান্ধবলছে প্রয়োজন কি ?
এভূমি অতি বন্ধুর, রথসঞ্চারোপযুক্ত ভূ-
মিতে অবতরণ কর। অনন্তর উভয়ে রণ-
ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। অশ্বসমূহের
খুরাহত ধূলিরাশি উন্মিত হইতে লাগিল।
আকাশে বিদ্যাধর অর্জুনের রথের প্রতি
নির্দেশ করিয়া কহিলেন, দেব দেখুন আ-
পনার আশ্রয়ের রথযোজিত অশ্বসমূহের
খুরোদ্ধত ধূলিরাশি বিপক্ষদিগের বন্ধ-
স্থলরূপ অরণিদগুজাত প্রতাপবহির ধূম-
রাশি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এ-
দিকে যুদ্ধঘোষণা হওয়ার অশ্বের হ্রয়ারবে
হস্তীর রংহিতে, বিপুল জ্যাঘাতশব্দে যুদ্ধ-
বাদ্যরাবে ও মদহস্তিনিবহের স্কন্ধলদি
ঘটানিনাদে যুদ্ধস্থলে তুমুল কোলাহল
উন্মিত হইল। অর্জুন অস্ত্র শিক্ষাবলে
অতি লঘুহস্তে বাণবর্ষণে নিমেষমধ্যে কা-
হাকে খণ্ডিতগণ্ড, কাহাকে ভগ্নকোদণ্ড,
কাহাকে শীর্ষকহীন, কাহাকে নির্ভিন্ন-
চক্ষুঃ, কাহাকে ভগ্নভুজ, কাহাকে ক্ষত-
বন্ধস্থল করিয়া ফেলিলেন। ইস্ত্রের পার্শ্ব-
চর বিদ্যাধর পার্শ্বের ক্লুতহস্ততার নিমেষ
মধ্যে সংগ্রাম-ক্ষেত্রের অপূর্নদশা দেখিয়া
সবিন্ময়ে সব্যাগ্রে ইস্ত্রকে কহিলেন, দেব
দেখুন দেখুন, (৬) সৈন্যরাশিতে এই
রণভূমি ভাত্রমাস হুর্দ্বিনের আকার ধারণ

(৬) বিজ্ঞাধরঃ। দেব পশ্য পশ্য
যুদ্ধস্তির্মদবারি বারণগণৈর্মঘারিতং

কার্শ্বকৈ-

করিয়াছে। তথাহি, মদজাবী মাণ্ডলযুধ ব-
র্ধুক মেঘজালের ন্যায় আচরণ করিতেছে, এই
বিচিত্র কার্শ্বকগুলি ইস্ত্রধনুঃ বলিয়া বোধ
হইতেছে, খেতচ্ছত্র সকল শিলীক্কু পুষ্পের
শোভা ধারণ করিয়াছে, আর অস্ত্রসংঘটনে
সমুদ্ভূত বিক্ষিপ্ত অগ্নিস্কুলিঙ্গ খদ্যোত পু-
ঞ্জের ন্যায় আচরণ করিতেছে, এবং জ্বলন্ত-
নারাচ সকল অশনির ন্যায় বোধ হইতেছে।

অতঃপর যে ভয়ঙ্কর ও মনোহর যুদ্ধব্যা-
পার বর্ণিত হইয়াছে আমরা তাহার প্রদ-
র্শনে বিরত হইলাম। কারণ, সজেক্ষেপে
পরিচয়-প্রদানই আমাদিগের উদ্দেশ্য।
কিন্তু ক্রিতান্ত অন্যায় হয় বিবেচনা করিয়া
২২মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আমরা ক-
বির বর্ণনাশক্তির পরিচয় দিব।

প্রাচীনকালে যেরূপ অলৌকিকভাবে
যুদ্ধদৃশ্য বর্ণিত হইত, এ কবিও সে প্রণালী
পরিভাগ করেন নাই। ক্রমে বীরশ্রেষ্ঠ
স্রোণাচার্য্য হৃষ্যোধন কর্তৃক ভৎসিত হ-
ইয়া অর্জুনের প্রতি বৈন্যকঅস্ত্র প্রয়োগ
করিলেন। তখন বিমানচারিগণ দেখিলেন,-
সিন্দ্র, রাকগমোলিতিঃ স্বদশনপ্রোভাসুদ
শ্রোণিভি
লীলোদন্তকরাণ্মাকতন্তর-প্রোদ্ধূতারা-
গণৈঃ।

রেটঃ শকশরাসনারিতমধশ্ছত্রৈঃ শি-
লীক্কাগ্নিতং।

খদ্যোতানিতমস্ত্রঘটনসমুদ্ভূতস্কুলিঙ্গৈঃ স্কুর
নারাটচরণনারিতং রণভূবাসৈন্যৈর্মত-

স্যাগিতম্ ॥

পাদাধাতুলকুলক্ষিতধরৈঃ সক্ষীর্ণমাল-
 ক্যতে
 হেরষাঽবিনিঃস্বৈতর্গদমুঠৈঃ স্তদৈরমৈর-
 ষরস্ ॥

পাথ' অবিলম্বে সিংহাজ্ঞপ্রয়োগে
 তাহার নিবারণ করিলেন ;—
 দংষ্ট্রাজ্যোতিঃ-খচিতগগনৈঃ কেশরাটো-
 প-স্ত্রীটৈম-
 কলাকুলৈঃ কিত্তিধরঙহাসঞ্চরক্ষীরনদৈঃ ।
 সিংহৈরস্তনর্ধরশিখরোৎখাতকুলস্তূলাস্বগ্
 ধারাশ্বাদব্যসনবিবর্শৈঃকাপিনীতাগজেস্রাঃ॥
 ইত্যাদি ।

বিদ্যাধর কহিলেন, দেব ! জয়ের
 আর অপেক্ষা নাই । ভীষ্মের অর্ধসকল
 হত, দ্রোণাচার্য্যের সারণি নিহত, কর্ণের
 রথ চূর্ণীকৃত, দ্রোণপুত্রের ধনুলতা ছিন্ন
 হইয়াছে, কৃপাচার্য্য বিচেতন হইয়াছেন
 ও কুকনাথ ভয়ঙ্কর নিজ সৈন্যগণের সহ
 পলায়ন করিতেছেন এবং অর্জুনের তাঁহার
 পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছেন । প্রতীহারী
 নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, দেখুন দেখুন,
 দুর্যোধনের অত্যাচিত উপস্থিত । বিদ্যাধর
 কহিলেন, ভয় নাই, বিমুখের উপরি “ই-
 স্রতনয়ের ” অস্ত্র কখনও নিপতিত হয়
 না। বাস্তবিক তাহাই হইল । পাথ' নিরত
 হইলেন । সমরও শেষ হইল এবং গোস-
 কল প্রত্যাবর্তিত হইয়া গৌরককদিগকে
 সমর্পণ পূর্বক পৌরজন কর্তৃক অভিন-
 দিত হইয়া পুরপ্রবেশ করিলেন । অতঃপর
 আতৃচতুষ্টির সহিত তদীয় মিলন, অজ্ঞা-

তবাস হইতে মুক্তি, বিরাটের অহুন্নয় ও
 কন্যাদান সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া কবি
 প্রমুসমাণ্ডি করিয়াছেন । প্রমুসর শেষ
 স্তোত্রটি পাঠে প্রতীত হয়, যে মগুন না-
 মক কবির সহিত তাঁহার প্রতিযোগিতা
 ছিল । কিন্তু হায় ! কোথায় মগুন ! তাঁ-
 হার প্রতিযোগীর কাব্যে তদীয় নামো-
 ল্লেখ মাতেই পৃথিবীতে এককালীন তাঁহার
 অস্তিত্ব আমাদিগের বোধবিষয় হইতেছে,
 অন্যথা তাহারও সম্ভাবনা ছিলনা হয় !
 মানবেরা যে যশঃ কীর্তিকে অবিনশ্বর ব-
 লিয়া অভিমান করেন, তাহারও এইরূপ
 নশ্বরতা এবং যশোলিপ্সাজনিত পশিত
 মণ্ডলীর যে অন্যান্যবিরোধ সমাজে নিন্দ-
 নীয়, তাহারও এরূপ সফলপ্রসাবিতা !

ধনঞ্জয়বিজয় সম্বন্ধে যাহা কিছু লি-
 খিত হইল, ইহাতেই পাঠক প্রমুসকারের
 কবি স্মৃষ্টি অনুভব করিতে পারিবেন ।
 তদ্বিষয়ে বাগাডম্বর নিস্প্রয়োজন । হৃদয়-
 গত রসভাবোচ্ছ্বাস ভাবায় যথাযথরূপে
 স্ফুটীকৃত হইলেই কবিতার উৎপত্তি হয় ।
 পাঠমাত্রেরই প্রতীতি হয় যেন উহা কবির
 লেখনী হইতে সঞ্জনপ্রবাহে নির্গত হই-
 য়াছে, কবিকে উন্মিত সামান্য প্রমাস-
 পরম্পরাও স্বীকার করিতে হয় নাই ।
 উহা পাষাণোপ উৎসধারা, মনুষ্যের হস্ত-
 ব্যায়ামোৎক্ষিপ্ত জলগণ্ডুষ নহে । কবি-
 তার বাহ্য নিদর্শন সুলভঃ এই দেখা যায়,
 যে উহাতে অনাবশ্যক শব্দমাত্রও লক্ষিত
 হয় না, সমস্তই প্রকৃতরসের পরিপুষ্টির নিমিত্ত

প্রযুক্ত হয় । বিশেষতঃ সংস্কৃত কবিতার আর এক রীতি এই যে কতিপয় পদ অতিগোচর হইলেই তাহার স্বরূপ উপলব্ধি হয় । অলক্ষ্য ব্যবহিত স্থান হইতে বন্ধু-জনের স্বর শুনিয়া যেমন প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে, অক্ষতপূর্ব্ব প্রকৃত কবিতা শ্রবণেও তেমনি তৎক্ষণাৎ উহা কবিনির্ম্মিত বলিয়া পরিচয় সঙ্গাত হয় । প্রস্থারম্ভে শরদারস্ত-কালীন প্রভাতবর্ণনাবসরে,—

দারাগাংমুরবৈরিণো রতিপতেয়াতুস্ত্রি-
লোকীজিতঃ
ক্ষারংপক্ষজকোটরোদরজুযো নিত্রাবি-
রামে শ্রিয়ঃ ।

প্রত্যক্ষ কুমরালপক্ষপটহৃদনিপ্রবন্ধানুগং
ভূদী মঙ্গলগাথিকেকব সততং প্রোৎকু-
জতি প্রাক্ষণে ॥ ৭

(৭) এই বর্ণনায় রাজার নিত্রোভঙ্গস-ময়ে বৈতালিকবধুর তাললয়ানুগত মাস্ক-লিক গীতপ্রসঙ্গ ব্যঞ্জিত হইয়াছে । কিন্তু ইনি সামান্য রাজ্ঞী নহেন । ইনি জগতের উৎপাতস্বরূপ দৈত্যগণের নিহস্তা বীরশ্রে-ষ্ঠের মহিষী, ত্রিভুবনবিজয়ী রতিপতির জ-ননী, স্বয়ং ত্রিভুবনসৌন্দর্য্যরূপিণী লক্ষ্মী দেবী । সুকোমল কমলগর্ভ তাহার শ-য়নাগার । প্রভাতে রাজহংসকুল জাগ্রত হইয়া অলস পক্ষপুটের সঞ্চালনশব্দসহ-কারে সেই কমলময় সরোবরে অবতরণ করিতেছে, মধুকরী অগ্রে অগ্রেই আগ-মন করিয়া মধুর গুঞ্জন আরম্ভ করিয়াছে ।

এই কবিতা যখনই আমাদিগের কর্ণে প্রবেশ করে, তখনই ইহার রচয়িতাকে— স্বভাবের এই বিগুণবৈচিত্র্যবিধাতাকে কা-ব্যজগতের অন্যতর বিধাতা বলিয়া আমা-দিগের প্রতীতি জন্মে । বাস্তবিক, গায়-কের অসম্পূর্ণগীত রাগপ্রবাহ, চিত্রকরের অসম্যক্ অঙ্কিত রেখাময় আলেখ্য এবং কবির ক্ষীণধারায় অভিরূঢ় বাগমৃত সহ-জেই স্ববিভবসামগ্র্যের পরিচয় দেয় । যদিও মূল আদর্শের সমক্ষে ইহা অকিঞ্চি-ৎকর,—স্বভাভারতকে সহস্রশাখ অক্ষয় বটরূক্ষ বলিলে ইহা তাহার একটি শাখা-রও তুলনীয় কি না সন্দেহ, তথাপি ইহা রমণীয় । সেই বিশালমুক্তি পাদপের যেমন এক ভগ্নবিস্ময়বিমিশ্র অপূর্ব্ব শোভা, সেই রূক্ষকে বাল্যাদশায় কতিপয় বনসর-সশ্যামলপল্লবশোভিত ক্ষুদ্র একটি শাখা-রূপে অবলোকন করিলে তাহারও তেমনি আর একরূপ অপূর্ব্ব ললিতকান্তি আমা-দিগের হৃদয়কে মুগ্ধ করে । সংসারে এরূপ শোভা গ্রহণ করিতেও হৃদয়ের দ্বার স্বভাবতঃ উদ্দঘাটিত হয় সন্দেহনাই । জীশা--
নুধনুশো লক্ষ্মীদেবী সেই স্বরসঙ্গীতে স-মুদ্বোধিত হইলেন ; অমনি কমলদল উ-দ্দঘাটিত হইতে লাগিল ; লক্ষ্মীদেবী নয়-নোন্মীলন পূর্ব্বক বাহরাবিভূত হইয়া অমৃ-তনিস্যন্দিনী দৃষ্টিপাতে ত্রিঙ্গগৎ সমুদ্ভা-সিত করিলেন । ইহা অপেক্ষা প্রভাত-বর্ণন আর কত মধুর হইতে পারে ?

ডেস্‌ডিমোনা।

১

নিশীথ রজনী, যোর অঙ্গকার
যেহেছে সাইপ্রস্‌ শত প্রসরণে,
কুসুম-কোমল শাস্তির আধার
মার অঙ্কে যথা চিন্তাশূন্য মনে

২

নিজ্রা যার শিশু, তেমতি হৃন্দর
সাইপ্রস্‌ শুরে ভূমধ্য সাগরে
বীচিরবচ্ছলে মনোমুগ্ধকর
ধীরে ধীরে ধীরে অবগণ বিবরে

৩

বুমের অক্ষুট সংগীত চালিয়া
হরিছে চেতনা; সাগরে আঁধারে,
আঁধারে সাগরে দেহ মিশাইয়া
রাজ্য করিছে আজ চারি গারে।

৪

ধীরে ধীরে ধীরে অতি ধীরে ধীরে
কুত্র বীচিমালা খেলিছে পুলিনে,
যথা নিজ্রাগত শিশুর শরীরে
সঞ্চালেন কর জননী যতনে।

৫

এ দিগন্ত ব্যাপী আঁধার ভেদিয়া
ভরে ভরে যেন তারকা জ্বলিছে,
লোহিত বিস্তার দিশি উজ্জলিয়া
হৃদরে আঘের তরঙ্গ খেলিছে।

৬

নির্জন-নিশ্চল-সাগরটাকতে
ধূমবর্ণ-গণ্ড-টেশলের প্রমাণ
শোভিতেছে হুর্গ, নিত্রিত জগতে
দাঁড়াইয়া যেন কজ্র নিজ্রা বান।

৭

আঁধারে ছুবিয়া উচ্চ হুর্গচূড়ে
কাদবিনী-কোলে ফট্ ফট্ করি
হৃন্দর বিচিত্র বৈজয়ন্তী উড়ে
নিঃশব্দে জমিছে সশস্ত্র প্রহরী।

৮

নিত্রিত জগত গভীর নিজ্রায়
হুর্গকক্ষে এক সতী ডেস্‌ডিমোনা
কুসুম-কোমল ধবল শযায়
নিজ্রা যার;—যেন বিশদ-বসনা

৯

ভিক্টোরিয়া লিপি রূপে আলোকরি
সরসীর জলে রয়েছে ফুটিয়া
কিষা জ্যোতির্ধরী তারকা আমরি।
যেন সে কক্ষেতে পড়েছে খলিয়া—

১০

জ্বলিতেছে দীপ যেন মান-জ্যোতিঃ
ভবিষ্যৎ দারি; কিছুই জানেনা
সোণার প্রতিক্রিয়া প্রেম-মুক্তিমতী
নিজ্রা যার পক্ষে সতী ডেস্‌ডিমোনা!

১১

উর্দ্ধমুখী হয়ে নিত্রিতা সুন্দরী ;
দক্ষিণ মৃগাল-ভুজ মৃগঠিত
স্থাপিত কোমল স্ক্রীত বক্ষোপরি,
বাম বাহু নিম্নে হেলায় লম্বিত ।

১২

সুন্দর শৃঙ্খলা বিহীন হইয়া
লাবণ্য মাখাম ললাটে কেমন
চূর্ণ কুস্তলের লহরী পড়িয়া
নয়ন নাসাগ্র করিছে চুষন ।

১৩

প্রশান্ত ললাটে, মুদিত নয়নে,
কোমল কপোলে, স্কন্ধ নাসাশিরে
অলকাবলীতে, কর্ণ-আভরণে,
ক্ষীণ দীপালোক খেলে ধীরে ধীরে ।

১৪

“—অকারণ নহে, নহে অকারণ,
কিন্তু সে কারণ—নিশার কুস্তলে
মুকুতা-রূপিণী স্ফটিক হৃদয়
হাস যে তোমরা, লো তারা কুস্তলে,

১৫

“সে কারণ, হায়,—সে পাপ-কারণ
বলিব না আমি শু'নোনা তোমরা ;
শুনিলে সে কথা রোধিবে জবণ,
অন্ধ শিহরিবে হবে স্ফোতি: হারা ।

১৬

“—কিন্তু রক্ত-পাত,—তার রক্ত-পাত
করিবনা ; তার সোণার শরীরে,
করিব না আমি কতু অত্যাচার
কিন্তু তথাপিও বধিব তাহারে ।

১৭

“যদি নাহি বধি, যদি এ ধরায়
এ কাল-সাপিনী আরও কিছু দিন
ধরে পাপ-দেহ, নাহি জানি হায় !
কত হতভাগা কত জ্ঞানহীন

১৮

“ব্যক্তিরে সে বিবে করিবে জর্জর !
তার বাণ্ডায় আমারি মতন
রূপে মুগ্ধ হয়ে কত মূর্খ নর
পতঙ্গের মত হইবে পতন ।

১৯

“নিবাইব এই প্রদীপ এখনি ।
—তার পর ?—এই ঘোর পাণ্ডিত্য
জীবনপ্রদীপ । কণকবরণি
লো জ্বলন্ত-শিখা তোরে একবার

২০

“নিবাইয়া পুনঃ দীপ্ত করা যায়,
কিন্তু সুর্যমুখী কলো বিষধরি,
জীবনপ্রদীপ জ্বালাইতে হায়
পারিবি কি যদি নির্ঝাপিত করি ?

২১

“এই হস্তে যদি প্রাণ-পুষ্প তোর
ছিঁড়ি একবার, জীবন্ত রাখিতে,
অভাগিনি, আর নহে সাধ্য তোর ;
শুকাইবে এক দিবসে নিশিতে ।

২২

“এ সুরভি পুষ্প পূর্কে ছিঁড়িবার
একবার আমি দেখিব আগিরা ”
এই বলি সেই প্রেমপ্রতিমার
বিদ্বাধরে শীল অধর স্থাপিরা

২৩

করিল চুম্বন, সতী শিহরিল।
“আর একবার— এই শেষ বার”
সহসা ললনা জাগ্রত হইলা।
পরাজিয়া মৃদু-বীণার বাক্য

২৪

কহিলা সুন্দরী,— “ওকে প্রাণেশ্বর ?
“আমি, ডেস্‌ডিমোনা” কহিলা ওথেলো
“হইল রজনী দ্বিতীয় প্রহর
শোণ্ড এসে কেন জাগিতেছ বল ?”

২৫

যথা অম্মাংপাং আশঙ্কা না করি
আগ্নের গিরির নিকটে আদিয়া
নিত্য কর্ণযত দিবস শকরী
করিতেছে লোক নিশ্চিন্ত হইয়া;

২৬

কিন্তু অচলের উচ্চ চূড় কুটি
শিলা, ভষ্ম, ধাতু, উতপ্ত-অঙ্গার
সহসা যেমন অন্তরীক্ষে উঠি
মুহূর্ত্তেকে ধ্বংস করে চারি ধার।

২৭

সেই রূপ হায় শুদ্ধা ডেস্‌ডিমোনা
ওথেলোর হৃদে রোরব অনল
গর্জিছে যে তার কিছুই জানেনা ;
যেন নিরমল উষার কমল।

২৮

“ঈশ্বরোপাসনা করেছ কি আজ ?
যদি এখনও নাহি করে থাক,
করি কোম মহা গরহিত কাজ
চাও যদি কমা, শীত্র তাঁকে ডাক”

২৯

সুগভীর স্বরে ওথেলো কহিলা।
“এক কথা আজ কহিছ প্রাণেশ ?”
বিস্মিত হইয়া সতী উত্তরিল।
ওথেলোর মুখে দৃষ্টি অনিমেষ

৩০

স্থাপিয়া সুন্দরী দেখিলা সন্তয়ে
ওথেলোর আজি ভীষণ মুরতি ;—
চক্ষু দুটি ক্রোধে বিস্ফারিত হয়ে
বৈদ্যাতিক তেজে পাইছে স্ফুরতি ;

৩১

দেহের ত্রাণিমা হয় অনুমান
বাড়িয়াছে যেন, অথরে কধির,
কটিবন্ধে জ্বলে অস্ত্র ধরশাণ,
স্নেহ মাখা নহে স্বর সুগভীর।

৩২

তীব্রতর স্বরে কহিলা ওথেলো
“কহিলাম যাহা কর শীত্র করি ;
এইস্থানে আমি ভ্রমি ক্ষণ কাল
অপ্রস্তুত ভাবে তোমারে, সুন্দরী

৩৩

বধিবনা আমি ; অন্তিম সময়
অন্তর্ধ্যামী যিনি সম্মুখে তাঁহার
খুলেদেও পাপ-কুটিল-হৃদয় ;
বধিবনা আমি আত্মাকে তোমার।”

৩৪

যেন ডেস্‌ডিমোনা নেশার বিহ্বল
কিছুই দেখেনা, কিছুই বোঝেনা ;
চক্রে ঘোরে যেন কক্ষ-ধরাভল,
বলি বলি করি বচন সরে না

৩৫

অবশেষে ধীরে কহিলা সরলা,
 “বধিবে আমারে কহিছ কি তাই ?”
 “তাই কহিতেছি” দুট উত্তরিল। ;
 “তবে এ দাসীয়ে তাঁর পদে চাই

৩৬

“নিউন ঈশ্বর” এতক কহিয়া
 অশ্রু-পূর্ণ দুটি কমল-নয়ন
 আকাশের পানে ধীরে উঠাইয়া
 নীরবিলা সতী ; নীরবে তখন

৩৭

দুইটি মুকুতা ধসিরা পড়িল !
 ক্রোধাঙ্ক ওখেলো তাহা দেখিলনা ;
 জানিস্ দুর্ভতি জানিস্ ওখেলো,
 এ মুক্তার দুটি নাহিক তুলনা !

৩৮

নিরমর মুচু কহিল অমনি ;—
 “তবে তাই হোক” নম্রতম স্বরে
 কহিলা সুন্দরী, “অধিক রজনী
 হয়েছে প্রাণেশ, যোর নিজাত্তরে

৩৯

“আখি দুটি তব লোহিত বরণ,
 পরিহাস ছাড়, আইস শয্যার !”
 জাননা অভাগি নিত্রিত এখন
 হইবে আপনি অনন্ত-নিত্রায় ।

৪১

কহিল ওখেলো ; “নিজ ব্যতিচার,
 পাণীর্তা বারেক কর লো স্বরণ ।”
 সুহিরা কদালে মুক্তার ধার
 তন্নস্বরে সতী কহিলা তখন ;

৪১

“—ওখেলো প্রাণেশ ! মুক্তকণ্ঠে আজ
 কহিতেছি আমি ধর্মে সাক্ষী করি
 তোমারই মুরতি সত্তত বিরাজ
 করে এ ক্ষণে দিবস শর্করী ।

৪২

“একদেবে আমি তজ্জি তক্তিত্তরে ;
 সেদেব ওখেলো ! তুমিই আমার
 এই উর্ষিভঙ্গ সংসারসাগরে
 জীবন-তরীর তুমি কর্ণধারী ।

৪৩

“অপর পুঙ্কবে অপবিজ্ঞ ভাবে
 একবার যদি নিরখিরা থাকি,
 যবে দেহ হতে প্রাণ উড়ে যাবে
 হে ঈশ্বর ! তুমি ডুর্নাইয়া রাখি

৪৪

“অতল-অমন্ত রৌরব-অনলে
 দিও অভাগীর অনন্ত যাতন ।”
 এতক কহিয়া ভাসি অশ্রুজলে
 ছিন্নতন্ত্রিসম খামিলা তখন ;

৪৫

কিন্তু ভয়ে ভয়ে দেখিলা চাহিয়া
 কোথায় ওখেলোর শরীর কাঁপিছে,
 চক্ষু রক্তবর্ণ, অধর বহিয়া
 কোটে কোটে লাল কধির পড়িছে !

৪৬

“চুপ্ ডেস্ ডিমোনা !” কহিল ওখেলো
 মেঘমন্ত্রসম সুগভীর স্বরে ।
 “করিলাম চুপ্ কি হয়েছে বল ?”
 ডেস্ ডিমোনা সতী কহিলা কাতরে ।

৪৭

“কি হয়েছে হার, কি হয়েছে বল ?”
কহিল গুথেলো,—“কি হইবে আর
বাছি বাছি যেই শুভ্র শতদলে
বতনে তুলিয়া ছন্দে আমার

৪৮

“করিফু-স্বাপন, এক বিমধরী
তাছা হতে হার, বাছির হইয়া
মর্থ্য স্থানে মোর দংশেছে সুন্দরি !
কি যে হইয়াছে, কাজ কি কহিয়া !

৪৯

“দেখ ডেস্‌ডিমোনা শুন কথা মোর
আসন্ন সময় তব সন্নিকটে,
জীবন-স্বামিনী শীত্র হবে তোর
নিজ অপরাধ কও অকপটে।

৫০

“কৃত পাপ কেন করি অস্বীকার
পাপের উপরে পাপ চাপাইবে !
কেমনে বহিবে এত পাপভার
পরকালে তব কি গতি হইবে ?,,

৫১

“প্রাণনাথ ! “চুপ্ চুপ্ ! পাপিয়সি !
গুথেলো কাহারো প্রাণনাথ নয়,”
তথাপি কাতরে কহিল রূপসী
“তুমিই আমার আছ প্রাণময় !

৫২

কেশিকেকে আমি—ধর্মে সাক্ষী করি
কহি বার বার—কেশিকেকে আমি,
গুথেলো তোমাকে ভিলাঙ্ক পাসরি,
ভজি নাই কতু, তুমি মোর স্বামী !”

৫৩

“ভজি নাই তুমি ? পিশাচি, পাপিনি !
ভজি নাই তুমি”—গুথেলো গর্জিল ;
“কেমনে লো তবে কহলো সাপিনি !
আমার কামাল কেশিও পাইল ?”

৫৪

“আমি দেই নাই !” “তুমি দেও নাই ?”
“আমি দেই নাই গুথেলো প্রাণেশ !
আমি দেই নাই জানেন গোঁসাই
বুঝি সে কোথাও পড়িয়া পাইল !”

৫৫

“ডাক কেশিও রে, সুধাও তাহারে
সে যা সত্য জানে কঙ্কক স্বীকার !”
“প্রতারণা আর করিতে আমারে
নারিবে পাপিনি ! সব দোষ তার

৫৬

স্বীকার করেছে ; ডেস্‌ডিমোনার,
গুথেলোর পত্নী—না না তাছা নয় ;
ডেস্‌ডিমোনার সহ ব্যতিচার
করেছে কেশিও অনেক সময়।”

৫৭

কহিল সুন্দরী কাঁদিতে কাঁদিতে
“গুথেলো, এমন অসত্য বচন
পারেনা কেশিও কখন কহিতে।
‘সত্য’ বিব হাসি হাসিয়া তখন

৫৮

গুথেলো কহিল ;—“কহিতে পারেনা ;
ছুট কেশিওর চিরদিন তরে
দৃঢ় বন্ধ মুখ, নীরব রসমা।”
‘তবে’ ডেস্‌ডিমোনা কহিল কাতরে

৬৯

“তবে কি কেশিও হয়েছে নিহত ?”
 “দেখ ডেস্‌ভিমনা” উত্তরিল মুঢ়,
 “এই শিরোদেশে কেশ সংখ্যা যত
 কেশিওর এত সংখ্যক প্রচুর

৬০

“যদি—শুনিছ ত ?—খাকিত জীবন,
 ক্ষুধার্ত হ্রস্ব শার্দূলের প্রার
 করিতাম আমি একত্রে চর্ষণ !
 তার সদ্য উষ্ণ শোণিত-ধারায়

৬১

দাবানলসম যে মহা অনল
 দহিতেছে হায় ! মরম আমার,
 নিবাইয়া তাহা হ’তাম শীতল !
 তার পরে—না না কহিবনা আর”—

৬২

“মরেছে কেশিও বিনা দোষে হায় !”
 এতক কহিয়া কাঁদিলা সুন্দরী
 “হায় ! হায় ! আজ্ আমি নিরুপায়”
 “কেশিওর তরে, কিলো বিষধরি !”

৬৩

গর্জিল ওখেলো—“কেশিওর তরে
 করিস্ আক্ষেপ সম্মুখে আমার ?”
 এতক কহিয়া মহাক্রোধভরে
 অগ্রসর হল মুঢ় হ্রস্বচার ।

৬৪

“ওখেলো, প্রাণেশ !” সজল নয়নে
 পতিপ্রাণা সতী কহিল কাতরে
 “রেখে এস ঘোরে গহন কাননে
 উন্নত তলুক বধায় বিচরে ।

৬৫

“সেইখানে আমি চিরদিন রব
 বিরক্ত তোমারে কভু করিব না ;
 যত কষ্ট হয় মনে মনে সব
 ব’ধোনা আমারে পরাণে ব’ধোনা !”

৬৬

“বধিবনা তোরে ? পিশাচি ! পাপিনি !
 বধিবনা তোরে ?” ঘোর সিংহরবে
 গরজিল মুঢ় ;—“একাল সাপিনী
 থাকিলে সংসারে সর্বনাশ হবে ।,,

৬৭

অশ্রুজলে ভাসি, কর যোড় করি
 কহিলা সাবিত্রী শোক-ভগ্ন-স্বরে,—
 “পোহাইলে এই কাল বিভাবরী
 বধো অভাগীয়ে ! আজি দয়া করে

৬৮

“প্রাণেশ ওখেলো ! আজি দয়া করে
 জীবিত থাকিতে দেও এ ধরায় !
 তব চিরদাসী অগ্নিমে কাতরে
 তব পদে মাত্র এই তিক্তা চায় !”

৬৯

“না না তা হবে না—কখনই হবে না,
 —দ্যাখ্ পলাইতে পুনঃ চাস্ যদি,
 অস্ত্রাঘাতে ঘাতে দ্যাখ্ ডেস্‌ভিমনা
 বহারিব তোর শোণিত নদী !”

৭০

পতিপদতলে স্মৃতিত হইয়া
 কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তরিল সতী,
 “তবে মুহূর্তেক দাঁড়াও ডাকিয়া
 লই দয়াময়ে—অগতির গতি ।,,

৭১

“না না না আর না” — এতেক কহিয়া
কত্র-রপী মূঢ় অর্দ্ধ-লক্ষ দিল,
মূঢ় লোহ জিনি বজ্রাঙ্গুলি দিয়া
দগ্নিতার গলা চাপিয়া ধরিল।

৭২

“দ্বার খোল, প্রভু, খোল খোল দ্বার,,
“কে তুমি?” চমকি ওখেলো কহিল;
“দ্বার খোল আগে” সঙ্গে সঙ্গে তার
বারংবার দ্বারে আঘাত পড়িল।

৭৩

খুলিল দুয়ার। দাসী এমিলিয়া
উদ্ধ্বাসে আসি পশিল কোঠায়;
“যাও যাও প্রভু, যাও দেখ গিয়া
রডারিগো হত হইয়াছে হার!,,

৭৪

“পড়িয়াছে কিসে রডারিগো মারা?
নহে সে কেশিও—কখন?—এখন?
হইয়াছে যম আজ মাতওয়ারা
একের বদলে অনেক নিধন!,,

৭৫

“হার অকারণে মোর প্রাণ যায়!
জানাইও নাথে প্রাণম আমার,
চলিলাম এমি বিদায়! বিদায়!,,
“—ওবে গলা কর্তী ডেসডিমোনার!,,

৭৬

“উঠ উঠ সবে! হার! হার! হার!
কহ চাহুরাগী” কাঁদি এমিলিয়া
সুখাইল দাসী ডেসডিমোনার,—
“কাহার একাজ কহনা ভাদিয়া!,,

৭৭

“আমি নিজে মরি কারো দোষ নয়!,,
ক্ষীণ-ভঙ্গ-স্বরে কহিলা ললনা,
“পতি-পদে মোর প্রাণম নিশ্চয়
জানাইও এমি! ভুলোনা! ভুলোনা!,,

৭৮

কহিতে কহিতে নীরব-রসনা
চক্ষু জ্যোতিঃ-হীন স্পন্দহীন কার,
স্ফটিক হৃদয়া সতী ডেসডিমোনা
হইলা মগন অনন্ত নিদ্রায়! ঐদী—

পানিনি।

সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তিভূমি এক্ষণে
কোথায়? ইহার নির্ঘাতা কে? কোন্
সময়ে ইহার সূত্রপাত হয়, এবং কোন্ স-
ময়েই বা কোন্ দেশের লোকেরা ইহার
প্রচার করিয়াছিল? কে কে ইহার উন্নতি
করিয়াছিল? ইহা কি আদিমতম ভারত-

বাসীদিগের মাতৃভাষা ছিল? না তাঁহা-
দের অন্তবিধ ভাষা ছিল, তাহাই সংস্কৃত
পূর্বক নিয়মবদ্ধ করিয়া, সংস্কৃত নাম দিয়া
প্রচার করিয়াছিলেন? এ সকল নির্ণয় করে
কাহার সাধ্য? এই বর্ষায়সী ভাষার উৎ-
পত্তিকাল নির্ণয় করে কাহার সাধ্য। উ-

পরে যে “পাণিনি” মুহূর্তপূর্ণ করিয়া প্রস্তাব আরম্ভ করিলাম, উনি এই বর্ষীয়সী ভাষার কত নিম্নের বালক তাহা বলিয়ায় না। এমনি শুনিতে পাণিনি বৃদ্ধতম, কিন্তু এই ভাষার ক্রোড়ে বসাইয়া দেখিলে উহাকে সদ্যঃপ্রসূত শিশু বলিয়া বোধ হইবে।

এই ভাষার উৎপত্তিকাল চিন্তার পর-পারে লুক্কায়িত আছে। বুদ্ধির অগম্য পথে প্রোথিত আছে—আর তাহা পাওয়া যাইবে না।

যাহারা সংস্কারক বা উন্নতি করেন তাঁহাদিগকেও পাওয়া যাইবে না, তাঁহারা ইহলোকে নাই—অনেক শতবর্ষ ইহলোক ভাগ করিয়াছেন। আর তাঁহাদিগকে পাওয়া যাইবে না। তবে আমাদেরই দুই পাঁচ জন পূর্ব পুরুষ, যাহারা সংস্কৃত লইয়া ক্রিষ্টিংকাল মাত্র জীড়া করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুই একজনের নাম-মাত্র উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব পূর্ণ করিব মানস করিয়াছি। তন্মধ্যে পাণিনি, শীর্ষকে যাহার নাম অঙ্কিত করিয়াছি, তাঁহারই বিষয় যথাসাধ্য বলিবার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সংস্কৃত ভাষা এদেশীয়দিগের যত্নের ধন। এক সময়ে এদেশীয়েরা ইহার দ্বারা স্বর্গীয় স্রষ্টা পানের স্কাভ নিরুত্তি করিয়াছিলেন। ভাণ্ডরি, ঔপম্যাব, যাস্ত, গলব, শাকল্য, জৈমিনী প্রভৃতি ঋষিকুলের নিকট ইনি দেবতাবা বলিয়া পরিচিত হি-

লেন। তাঁহারা যত্নের সহিত ইহার পুষ্টি সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতঃপর এই সংস্কৃত ভাষা ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশরুক, আশিশালী, শাকটায়ন, ব্যাডি, পাণিনি, কাতায়ন, ও পতঞ্জলি প্রভৃতি আচার্য্য-কুলের নিকট বিশেষ সমাদৃত ছিলেন, তাঁহারাও যথাসাধ্য ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মার্জনা করিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত আচার্য্যদিগের মধ্যে পাণিনি সর্বকনিষ্ঠ। এখন আর পূর্বাচার্য্যদিগের মত চলে না, সর্বকনিষ্ঠ পাণিনির মতই এক্ষণে প্রবল। যদিও দুই একটা মত প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ চলে না, সে সকল গ্রন্থ লোপ হইয়াছে।

পাণিনির মত এত প্রবল কেন? তাঁহারই বা এত মান্য কেন? তিনি কোন্ দেশের লোক? কোন্ সময়ের লোক? কাহার পুত্র? এসকল জ্ঞানিবার জন্য অনেকেরই কুতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। ইতঃপূর্বে অনেক মহাত্মাকে সেই কুতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমিও তৎপথে পদাৰ্পণ করিতেছি। যদি বল প্রয়োজন কি?—প্রয়োজন না থাকিলে অত্যন্ত মূঢ় ব্যক্তিরও বিষয় প্রবৃতি হয় না। পাণিনির সমস্তাদি নির্ণয় করিতে গিয়া তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিতা দোষে লিপ্ত হইয়াছেন, এবং নিমূল কল্পনার আশ্রয়ে থাকিয়া ত্রিজ্ঞানুদিগকে ভুল বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই জন্যই আমি তাঁহাদের সিদ্ধান্তে স-

ক্ষুণ্ণ না থাকিয়া, স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছি।

আমারও যে তুল হইবে না, ইহাও প্রত্যাশা করা যায় না; কেন না, অতীত বস্তুর যথার্থ নির্ণয় হুঃসাধ্য। অতীত বিষয়ের উপর প্রত্যক্ষের প্রভূতা নাই। প্রত্যক্ষ কেবল বর্তমান লইয়াই থাকেন। অনুমানও কখন কখন ভ্রম বুঝাইয়া দিয়া থাকে, যেহেতু অনুমান-প্রমাণটি প্রত্যক্ষ-সংস্কৃত। ভ্রান্ত অনুমান বস্তুর দোষেও হয়, দেখিবার দোষেও হয়। আর একটি প্রমাণ আছে তাহার নাম 'ঐতিহ্য।' ঐতিহ্য কি, তাহা বলিতেছি। যাহা রক্তপন্নপরা চলিয়া আসিতেছে তাহাই ঐতিহ্য। যদি কোন প্রবাদ বহুকাল হইতে অবিচ্ছেদে চলিয়া আইসে, তবে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করার রীতি আছে, কিন্তু তাহা সত্য না হইতেও পারে। অতএব অতীত বস্তুর যথার্থ-নির্ণয়পক্ষে যখন এত বাধা আছে, তখন আমিও যে ভ্রান্ত নির্ণয় করিতে পারিব ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে পদ্ধতিতে অতীত বস্তুর নির্ণয় হওয়া সুসম্ভব, সেই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া স্বেচ্ছা-চারিতা দোষ ত্যাগ করিয়া, নিমূল কল্পনা বর্জন করিয়া অতি সাবধানে নির্ণয় করিব, ইহাতে যতটুকু সত্যের আকর্ষণ সম্ভব, পাঠকগণ তাহাই পাইবেন।

পুরাতত্ত্ব জানিবার হুইটি মাত্র উপায়

আছে, যুক্তি ও ঐতিহ্য। অবিচ্ছেদে ও ধারাবাহিকরূপে সমাগত বিশ্বাসযোগ্য জনপ্রবাদ। তৎকালের কি তৎপরবর্তী কালের লিপি, ঘটনাবিশেষের লুপ্তাবশেষ, প্রাকৃতিক অবস্থার তারতম্য, এই সকল উহার আলম্বন। এই সকল অবলম্বন করিয়াই যুক্তি ও ঐতিহ্যের দ্বারা প্রাচীন বস্তু অনুসন্ধান করিতে হয়। যে যুক্তির কোন মূল নাই, যে যুক্তি পূর্ব্ব-পর বিচ্ছিন্ন, একদিকে সংলগ্ন, একদিকে অসংলগ্ন, এমন যুক্তি পরিত্যাজ্য। ঐতিহ্য পক্ষেও এই রীতি। এই রীতির অনুগত থাকিয়াই পাগিনির জীবনী নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

আচার্য্য হেমচন্দ্র স্বরূপ অতিধানচিন্তামণির মর্ত্যকালে পাগিনির নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

“অথ পাগিনৌ, শালাতুরীয়দাক্ষেরৌ।”

শালাতুরীয় ও দাক্ষের এই দুইটি শব্দ পাগিনি নামক মুনিবোধক। এই লিপির দ্বারা ৭৫০ বৎসরের সংবাদ পাওয়া গেল। বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রচারক শঙ্করাচার্য্যকেও পাগিনির নামোল্লেখ করিতে দেখা যায়। যথা—

“নচ পাগিনিম্মুতিবিরোধঃ—”

(১ম অং)

এই লিপি অনুসারে নির্ণয় হইতেছে যে, পাগিনি ১০৮৯ বৎসরেরও পূর্ব্ববর্তী, কেন না শঙ্করাচার্য্য উক্ত পল্লিমিত কালের লোক। যথা “নিখিনাগেহভবন্থ্যাক্”

ইত্যাদি বহুতর প্রমাণ আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা অনাবশ্যক ।

ঐকমিনীমূত্রের ভাব্যকার শবরস্বামী শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা বহুপ্রাচীন । কেননা শঙ্করাচার্য্য স্বরূত বেদান্ত ভাষ্যের ১ম অধ্যায়ে “ যতুশাস্ত্রতাপর্ধ্যবিদামনুক্রমণম্ ” এই উক্তি করিয়া, শবরস্বামীর বাক্য উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মোচিত পূজা করিয়াছেন । এই রূক্তম শবরস্বামীও পানিনির উল্লেখ করিয়াছেন । যথা—

“ নহি ব্রহ্মিশঙ্কেন আপাণিনেবাংবহারতঃ
আর্দৈবঃ প্রতীয়েয়ন্ পানিনিরুতিমনুমন্য। ”

(১ অং, ১ পাদ)

অতএব, ইহার দ্বারা স্থির হইতেছে যে পানিনি অত্নান ১২ । ১৩ শত বৎসরের পূর্নবর্তী । যেহেতুক শবরস্বামীর কাল এক্ষণে উহার স্থান নহে । অমর সিংহকেও পানিনির অনুসরণ করিতে দেখা যায়, স্তত্রাং পানিনি ৫০০ খৃষ্টাব্দের বহুকাল পূর্নবর্তমান ছিলেন, ইহা নিশ্চিত হইতে পারে ।

যগদেবের শেষনন্দ ও চন্দ্রগুপ্তের সমকালিক চাণক্য মুণিকেও পানিনির উল্লেখ করিতে দেখা যায় । যথা—‘ অস্তেভূঃ ’ ‘ ক্রবোবাচি ’ ‘ আগারোহ্মি করণম্ ’ ‘ ক্রবমপায়ের্পাদানম্ ’ এই সকল পানিনিমূত্র তিনি স্বরূত ন্যায়ভাষ্যে উক্তার করিয়াছেন । চাণক্য যখন পানিনির উল্লেখ করিয়াছেন তখন নিশ্চয় হইতেছে যে, তিনি অবশ্য ২৩ শত বৎসরের কোন এক অনির্দিষ্ট কালের লোক ।

এস্থলে ন্যায়ভাষ্য পাঠকের একটি সংশয় উপস্থিত হইতে পারে । সে সংশয় এই যে, ন্যায়-ভাষ্যে লেখা আছে তাহা বাৎস্যায়নরূত ; কিন্তু আমি বলিলাম চাণক্যরূত । এই সংশয়-ভঙ্কনের জন্য, চাণক্য ও বাৎস্যায়ন যে একব্যক্তি, এস্থলে তাহাও প্রমাণ করা যাইতেছে ।

চাণক্যের একটি নাম নহে । পূর্নকালে গুণ, বংশ, কার্য্য, ইত্যাদি বহু কারণবশতঃ এক ব্যক্তির বহু নাম থাকিত, স্তত্রাং চাণক্যেরও বহু নাম ছিল দেখা যাইতেছে । তাঁহার বাৎস্যায়ন, মল্লনাগ, কোটিল্য, চাণক্য, ত্রামিল, পক্ষিলস্বামী, বিষ্ণুগুপ্ত, ও অঙ্গুল এতগুলি নাম ছিল । জ্যোনাচার্য্য হেমচন্দ্র স্বরূত অভিধানচিন্তামণিতে এই সমস্ত নামগুলিই পর্যায়বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন । যথা—

“ বাৎস্যায়নে মল্লনাগঃ কোটিলশ্চণ-
কাস্ত্রজঃ ।
ত্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোহঙ্গুল-
শ্চসঃ । ” (মর্ত্যাকাণ্ড)

ন্যায়ভাষ্য যে চাণক্য-বাৎস্যায়নের রূত তাহারও প্রমাণ আছে । উদ্যোতকর মিশ্ররূত বাস্তিক, এবং বাচস্পতি মিশ্ররূত তাৎপর্য্য-টীকায় এই গ্রন্থ পক্ষিলস্বামী-রূত বলিয়া উল্লেখ আছে । ন্যায়শাস্ত্রে যে পক্ষিলস্বামীর একটি স্তত্র মত আছে তাহা আধুনিক নৈয়ায়িকগণও স্বীকার করেন । পক্ষিলস্বামী বাৎস্যায়নকে চাণক্য ভিন্ন অন্য কোন বাৎস্যায়ন কল্পনা

করা যায় না। সূত্রায় এই চাণক্যের নীতিশাস্ত্র, শব্দশাস্ত্রে আছে। শব্দশাস্ত্রে ইনি কোটিল্য-নামে বিখ্যাত। এসকল আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, এ-জন্য এ সম্বন্ধের বিশেষ বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ করিলাম না।

চাণক্য পণ্ডিত যখন পাণিনির উল্লেখ করিতেছেন, তখন অবশ্য তিনি চন্দ্রগুপ্তের বা শেষবন্দ্যের পূর্ববর্তী। ইহার দ্বারা তদীয় কালসংখ্যাস্থলে অতীত ২৫০০ শত বৎসর গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতঃপর আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যদ্বারা কোন একটা নির্দিষ্টকাল স্থির করা যাইতে পারে। আরোহ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ২৫০০ শত বৎসরে গিয়া দাঁড়াইতে হইল। এক্ষণে অবরোহ প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেখা যাউক তাহাতেই বা কোথায় দাঁড়াইতে হয়।

কোন একটা নির্দিষ্টকাল কেন্দ্র করিয়া অবরোহ প্রণালীতে ক্রমে অবতরণ করিয়া আসিতে হয়।

কোন কালটিকে কেন্দ্র করা যাইবে? সর্বসংহারক কাল যে সময়ে এই ভারত-বর্ষে ভীষণ সংক্ষয় উপস্থিত করিয়াছিল, যে দিনটির অবসানে কালরাজিতুল্য ক-রালরাজের মধ্যভাগে বটরক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া জাগরণে কৃতবর্ষা ও ক-পাচার্য জীবন্য পৃথিবী দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, যে সংক্ষয়ের পর ভারত আর জাগ্রত হইল না, সেই সময়টিকে

কেন্দ্র করিয়া নিম্নে আগমন করা যাইতেছে।

কুকক্ষেত্রের যুদ্ধকালটির উল্লেখ মহাভারতে আছে; কিন্তু তাহাতে একটি নির্দিষ্টকাল-সংখ্যা পাওয়া যায় না। সূত্রায় অত্র কোন প্রামাণিক গ্রন্থের অনুসরণ করা যাইতেছে। বরাহসংহিতানামক জ্যোতির্শাস্ত্রে এই কালটির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। রাজতরঙ্গিনী নামক প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থে ও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যথা—“গতেষু ষট্শ সার্কেষু ত্র্যধিকেষু চ বৎসরে। অভ-বনুকুপাণ্ডবাঃ।”

কালির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে কুক-পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়। উক্ত গ্রন্থকারেরা জন-শ্রুতি মাত্র অবলম্বন করিয়া উক্ত কাল সংখ্যা লেখেন নাই। জ্যোতির্গণনা ও অদব্যবহার তাহাতে প্রমাণ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের সময়েও যৌধিষ্ঠিরাদ প্রচলিত হইল। বিক্রমাদিত্যের সন্থৎ আরম্ভের সময় যৌধিষ্ঠিরাদ ২৫২৬ ছিল। এইরূপ অর্থাভট্টীয় গ্রন্থেও যৌধিষ্ঠিরাদ বর্তমান থাকার উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠিরের স্বাস্ত্যবসিত মহাভারত, ভগবৎ ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল (সাত ভেয়ে তারা) মধ্যমক্ষে ছিল। ইহা অবলম্বন করিয়া উক্ত জ্যোতির্বেত্তারা বলিয়াছেন, যে উক্ত সপ্তর্ষিমণ্ডল শত বৎসর করিয়া এক এক নক্ষত্রভাগ করে। শত বৎসরান্তে প-

রিবর্তিত হইয়া অন্য নক্ষত্রে গতি হয় । স্বর্ষ্যের যেমন একমাসে এক রাশি ভোগ হয়, সেইরূপ সপ্তর্ষিমণ্ডলের ২২৫ বৎসরে এক রাশি ভোগ হয় । এতাদৃশ সপ্তর্ষিমণ্ডল সুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে মধ্য নক্ষত্রে ছিল, এক্ষণে আমরা উহাকে কৃত্তিকার প্রথম পাদে দেখিতেছি । এই কালে প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় হইয়াছে, যে কলির ৬৫৩ বৎসর পরে কুব্জক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল । তাহার পরেও সুধিষ্ঠিরেরা অনেক বৎসর জীবিত ছিলেন । তাহাতে অনধিক ৭০০ বৎসর ধরা যাইতে পারে । এই সুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ অর্জুনের, তৎপুত্র অভিমত্যা, তৎপুত্র পরীক্ষিৎ, তৎপুত্র জনমেজয় ; এই জনমেজয়ের পরে নৈমিষারণ্যীয় ঋষিদিগের দ্বারা মহাভারত প্রচার হয় । কুব্জক্ষেত্রের যুদ্ধ আর মহাভারত প্রচার, এত-মধ্যে অত্যানু ৩০০ শত বৎসর ব্যবধান আছে, ইহা বলিলে বোধ হয় সমধিক দোষ হয় না, এবং তাহা হইলে কলির সহস্র বৎসরান্তে মহাভারত প্রচার হইয়াছে ইহাও বলা যাইতে পারে । এই ভারতে পুরাণকালের এবং উৎসমকালের যে কোন মহাত্মা, সকলেই সন্নিবিষ্ট আছেন, কিন্তু ইহাতে বাস্ক, পারস্কর, শাকটায়নাদির উল্লেখ নাই । কেবল মহাভারত নহে, মহাভারতের পরবর্ত্তি অন্যান্য পুরাণেও নাই । যখন মহাভারতের পরবর্ত্তী বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণসমূহের উৎপত্তিকালে বাস্ক পারস্করাদির

অসম্ভা নির্ণীত হইতেছে, তখন তাঁহারা নিশ্চিত তদপেক্ষা অত্যানু ৫০০ শত বৎসরের পরভাবিক । পাণিনি মুনি স্বীয় সূত্রে ঐ সকল ব্যক্তি অর্থাৎ বাস্ক, পারস্কর, শাকটায়ন, এবং ভারতীয় ব্যাস, তৎশিষ্য ও তৎপ্রশিষ্যাদির উল্লেখ করিয়া নিজেদের অনেক নিম্নবর্ত্তিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন । এই সকল আলোচনা করিয়া দেখিলে, অবরোহ প্রণালীতে, কলির দুই সহস্র বৎসর বাদ দেওয়া যাইতে পারে । এখন পাঠক দেখুন, পাণিনি মুনি কালপ্রাসাদের কোন সোপানটিতে বসিয়া ব্যাকরণসূত্র রচনা করিতেছেন ? বর্ত্তমান সময় হইতে অত্যানু ২৫০০ বৎসরের পূর্বে এবং কলির প্রবর্ত্তির ২০০০ বৎসর পরে তিনি এই সঙ্কি-স্থানটি অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন ।

যুক্তি অবলম্বন করিলে পাণিনির সময় নির্ণয় সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত সত্যলাভ হইতে পারে না । এক্ষণে দেখা যাউক, ঐহিত্য অবলম্বন করিলে কি হয় ।

ঐহিত্য অবলম্বন করিলেও উপরোক্ত নির্ণয়েই স্থির থাকে এবং তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না, বরং যুক্তিসত্তা সত্যটি দৃঢ় হয় । ঐহিত্য গ্রহণ করিবার অবলম্বন অধিক নাই, রুহৎ কথা এবং তাহারই সঙ্কলন কথাসরিৎসাগর ও রুহৎ কথামঞ্জরী, এই গ্রন্থত্রয় মাত্র আছে । এই গ্রন্থত্রয়েই পাণিনির জীবনীর ঐক্য আছে । অতএব রুহৎ কথার উল্লেখমাত্র করিয়া

তাহা হইতে ঐতিহাসিক সার কথা কএ-
কটি উল্লেখ করিতেছি। পাঠকগণ ইহা
মিলাইয়া দেখিলে যুক্তিসভ্য সত্যের সহিত
বড় অধিক ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবেন না।

রহৎকথা বলেন, পাগিনি উপবর্ষ প-
শিতের ছাত্র। উপবর্ষ নামক একজন শম-
শাস্ত্রের আচার্য ছিলেন, তাহা আমরা
গ্রন্থান্তরেও পাইয়াছি। যথা ;—

“যদাহ ভগবানুপবর্ষঃ

বর্ণাএবহিশম্বাঃ” (সূত্রভাষা ২অঃ)

রহৎকথা বলেন, পাগিনি মধ্যদেশে ছি-
লেন। পাগিনি নিজেই ‘শালাতুরীয়’
নাম দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। শালা-
তুর নামক প্রদেশ তাঁহার পূর্বপুরুষের
বাসভূমি ছিল, কিন্তু তিনি নিজে তদ্দেশ-
বাসী নহেন।

রহৎকথা বলিয়াছেন যে, পাগিনি
নন্দের সমসাময়িক, পূর্বপ্রদর্শিত যুক্তি-
তেও প্রায় তাহাই পাওয়া গিয়াছে।

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে
রহৎকথার মধ্যেও ঐতিহাসিক সত্য
লুক্কায়িত আছে। কেবল রহৎকথা কেন,
কথাগ্রন্থমাত্রেরই কিয়ৎপরিমাণে সত্য
আছে। কোন এক সত্যভিত্তির উপর
কথারচকেরা অলঙ্কার দিয়া বাহুল্য রচনা
করিয়া থাকেন, ইহাই কথারচকদিগের
স্বভাব। তন্ত্রিন আকাশকুসুমের স্থায়
সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলে উহা কথাগ্রন্থ বলিয়া
পরিচিত হইতে পারিত না। যেহেতু কথা-
গ্রন্থের লক্ষণই ঐরূপ। যথা ;—

“প্রবন্ধ-কম্পনাং শ্লোক সত্যং প্রাজ্ঞাঃ
কথাংবিদুঃ।

পরম্পরাশ্রয়া যা স্যাৎ সা মত্যাধারিকা
বুদ্ধিঃ ॥”

অতএব যুক্তি-সত্য অর্থের সহিত র-
হৎ কথাং যে যে অংশের সামঞ্জস্য আছে,
তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে ক্ষতি
কি? রহৎকথা পাগনিকে নন্দের স-
মকালিক বলিয়াছেন, তাহা শেষ নন্দ
না হইয়া নবনন্দের তৃতীয় কি চতুর্থ নন্দ
হউক। রহৎ কথা বলিয়াছেন পাগিনি ও
ব্যাড়ি তুল্যকালিক, যুক্তি ও পাগিনি
নিজে তাহাই বলিতেছেন।

আচার্য গোল্ডফুকের মতে পাগিনি
খৃষ্টজন্মের ৬০০ শত বৎসর পূর্ববর্তী।
ইউরোপীয় অজ্ঞাত পণ্ডিতগণের মতে
তিনি খৃষ্টজন্মের ৪০০ শত বৎসরের পূর্ব-
বর্তী ছিলেন। তিব্বতদেশীয় লামা তা-
রানাথ তাঁহাকে নন্দের সমকালিক এই
মাত্র বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন্ নন্দ
সময়ে বর্তমান ছিলেন তাহা স্পষ্ট করিয়া
বলেন মাই। যদি শেষ নন্দ হয় তবে
তিনি তদীয় মতে খৃষ্টজন্মের ৫০০ শত বৎ-
সর পূর্ববর্তী। বঙ্গদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ প-
ণ্ডিত বাচস্পতি তারানাথও এই রূপস্থির
করিয়াছেন, কিন্তু আমরা পূর্বে দেখাইয়া
আসিয়াছি যে নন্দের তুল্যকালজন্মা চা-
গকা-পণ্ডিত অপেক্ষা পাগিনি বহুল প্রা-
চীন এবং যাক্ষ পারস্করাদির বহু অর্বাচীন।
তখন তিনি কোন প্রকারেই শেষনন্দ

সমকালিক হইতে পারেন না। আমা-
দিগের মতে তিনি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ন-
ন্দ্যের সমকালিক। ইহার পূর্ববর্তী বলিতে
পারি না, কেন না, তাহা হইলে তিনি
বাংসের অধস্তন পঞ্চমশিয়া এবং যাক্ব প্র-
কৃতিকে চিনিতে পারিতেন না, সুতরাং
উঁহাদিগকে স্বকৃত ব্যাকরণসূত্রে আ-
নিতে পারিতেন না।

পাণিনি কোন দেশীয় লোক? উঁ-
হার বাসভূমি কোথায় ছিল? এবিষ-
য়েরও অন্বেষণ করা যাউক।

পূর্বে বলিয়াছি যে পাণিনির আর
দুইটি নাম আছে, শালাতুরীয় এবং দা-
ক্ষয়। শালাতুরীয় নামটি দেখিয়া ইউ-
রোপীয় পণ্ডিতেরা শালাতুর নামক গ্রাম
উঁহার জন্মভূমি বা বাসভূমি নির্ণয়
করিয়াছেন। শালাতুর গ্রামটি গান্ধার
(কান্দাহার) প্রদেশের অন্তর্গত, আধু-
নিক ‘অটক’ নামক স্থানের উত্তর প-
শ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে
তিনি জন্মিয়াছিলেন বা এই স্থানে বাস
করিতেন, ইহার কোন কথাটিতেই আমরা
অনুমোদন করিতে পারি না। কারণ,
পাণিনি নিজেই শালাতুরগ্রাম উঁহার
বাসভূমি বলিতে নিষেধ করিয়া গিয়া-
ছেন। যথা—চতুর্থ অধ্যায়ে ৯০ সূত্রে ‘অভি
জনশচ।’ এই সূত্রে আর উঁহার শালা-
তুরীয় নাম, এই দুই একত্র হইয়া একটি
শুভ্র সভা প্রকাশ করিতেছে। সেইটি
এই যে, শালাতুর গ্রাম উঁহার বাস-ভূমিও

মহে এবং জন্মভূমিও নহে। তবে কি?
উঁহা উঁহার কুল-পুরুষদিগের জন্মভূমি
এবং বাসভূমি। যথা—

পাণিনি ‘অভিজনশচ’ সূত্রের পূর্বে
‘তদগা নিবাসঃ’ এই একটি সূত্র করি-
য়াছেন। ইহার দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে
যে, নিবাস ও অভিজন এই দুয়ের মধ্যে
অবশ্য কিছু প্রভেদ আছে। সেই প্র-
ভেদটি স্মৃতিকার দেখাইয়া দিয়াছেন। যথা,
“যত্র সংপ্রভাষাতে স নিবাসঃ যত্র পূর্ব-
পুরুষে কথিতং সোইভিজনঃ” যে স্থান পূর্ব
পুরুষের বাস ছিল তাহা অভিজন এবং
যাহা বর্তমান বাসস্থান তাহা নিবাস।
এতদূশ অভিজন অর্থে পাণিনি নিজে
‘শালাতুরীয়’ নামটি নিষ্পন্ন করিয়া গি-
য়াছেন। কেন না,—‘অভিজনশচ’ এই
সূত্রের পরে, অভিজন অর্থটির আকর্ষণ
করিয়া, ‘তুদী শলাতুর বর্গতী কুচবারা-
ড্‌চক্ (৪।৩।১৪) এই সূত্রটি নির্মাণ
করিয়া, শলাতুর শব্দের উপরে চক্ প্রত্যয়
করিয়া ‘শালাতুরীয়’ রূপনির্মাণ করি-
বার আদেশ করিয়াছেন। অতএব পা-
ণিনি নিজে যখন “শালাতুর” গ্রাম
আপনার অভিজন বলিয়া জানিতেন, ত-
খন আমরা উঁহাকে শালাতুরবাসী বলিতে
পারি না। সুতরাং পাণিনিকে বৃহৎক-
থার লিখিত মগধদেশবাসী বলিতে হ-
ইল। কেননা ‘অভিজনশচ’ এই অর্থে নি-
ষ্পন্ন শালাতুরীয় নামের দ্বারা বৃহৎকথার
ঐতিহাসিক সত্যতা সপ্রমাণ হইতেছে।

বৃহৎকণার ইতিহাসাংশ যে কিয়ৎ-
 পরিমাণ সত্য, এবং পাগিনি যে এদেশীয়
 ভাষা পাগিনির ‘দাক্ষয়’ এই তৃতীয়
 নাম দ্বারা ও প্রকাশ পাইতেছে। যথা—
 “জীবিতুবংশো তদপত্যং যুবা” এবং
 “অপত্যং পৌত্রপ্রভৃতি গোত্রম্” এই
 দুই সূত্রে, বংশ-পুরুষ জীবিত থাকিলে
 তদীয় প্রপৌত্র প্রভৃতি অতি দূর বংশীয়েরা
 ‘যুবন’ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে বলিয়াছেন।
 এতদনুসারে ‘দাক্ষি’ নামক ব্যক্তির
 জীবিত কালের মধ্যে, তৎপৌত্র কি প্র-
 পৌত্র দাক্ষয় নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
 এই দাক্ষয় ও ব্যাড়ি এক ব্যক্তি। কেন
 না, পতঞ্জলি ব্যাড়িকৃত লক্ষণোক্তক
 সংগ্রহ নামক গ্রন্থকে দাক্ষয়ণের কৃত
 বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—
 ‘শোভনাখলু দাক্ষয়ণস্য সংগ্রহসাকৃতিঃ’
 ইত্যাদি। অতএব, ব্যাড়ি বা দাক্ষয়ণের
 পিতামহ কি প্রপিতামহের নাম দাক্ষি এবং
 এই দাক্ষির কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম দাক্ষী।
 “দক্ষসাপত্যং পুমান্ দাক্ষি, দক্ষসাপত্যং
 জী দাক্ষী।” এই নির্বচনলভ্য অর্থের অ-
 প্রামাণ্য আশঙ্কা কস্মিন্ কালেও নাই।
 পাগিনি এই দাক্ষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ ক-
 রেন, ইহাও তদীয় ‘দাক্ষয়ণ, নাম দ্বারা
 লক্ষ্য এবং ‘দাক্ষী-পুঞ্জের ধীমতা’ ই-
 ত্যাদি স্পষ্ট প্রমাণ-বাক্যও আছে। এ-
 তদনুসারে, দাক্ষয়ণ বা ব্যাড়ির পিতামহ
 বা প্রপিতামহ দাক্ষির সহিত দাক্ষয় বা
 পাগিনির মাতুল ভাগিনের সম্বন্ধ দাড়াই-

তেছে। দাক্ষির জীবদ্দশাতেই ব্যাড়ির
 পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল, এবং ব্যাড়ির জী-
 বৎ কালেও তদীয় পিতামহ বা প্রপিতা-
 মহ দাক্ষি নিশ্চিত জীবিত ছিলেন, তাহা
 না থাকিলে ব্যাড়ির ‘দাক্ষয়ণ’ নাম
 হইতে পারিত না। অতএব ব্যাড়ির নাম
 দাক্ষয়ণ*। আর পাগিনির নাম দা-
 ক্ষয়, এই নাম দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে,
 ব্যাড়ি ও পাগিনির বয়োগত ন্যূনাধিক্য
 থাকিলেও তাঁহারা পরস্পরকে দেখিয়া
 ছিলেন, সম্মেহ নাই। পরন্তু ব্যাড়ি অ-
 পেক্ষা পাগিনি বয়োরুদ্ধ হওয়াই অধিক
 সম্ভব। ইহা নিম্ন প্রদর্শিত চিত্র দেখি-
 লেই প্রতীত হইবে।—

(বংশ পুরুষ)

দক্ষ।

।

দাক্ষি (পুত্র)

দাক্ষী (কন্যা)

।

পাগিনি বা দাক্ষয়

ব্যাড়ি বা দাক্ষয়ণ

* ব্যাড়ির মাতার দাক্ষী নামটি গো-
 ত্রানুসারে হইয়াছে। নচেৎ তাঁহার প্র-
 কৃত নাম নন্দিনী। এতদনুসারে ইহার
 ‘নন্দিনী-তনয়’ একটি নাম। দাক্ষি-
 গাত্যবাসী ছিলেন বলিয়া ‘বিজ্ঞাবাসী’
 নামও ছিল। আচার্য্য হেমচন্দ্র “অথ
 ব্যাড়ি বিজ্ঞাবাসী নন্দিনীতনয়শ্চ সঃ।”
 নামমালার গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।

“ জীবতিতু বংশো তদপত্যং যুবা ,”
পাণিনির এই লিপি অনুসারে দাক্ষিণ
জীবনশার সম্ভান তিন্ন যে দাক্ষেয় ও দা-
ক্ষায়ণ নাম নিষ্পন্ন হয় না, সংস্কৃত বিদ্যা-
বিশারদ আচার্য্য গোল্ডফুকের দৃষ্টিতে
তাছা পতিত হয় নাই । সেই জন্তই তিনি
পাণিনি ও ব্যাড়িকে তুল্য-কালিক বলিতে
পারেন নাই এবং ঐতুলটি তাঁহার সকল
সিদ্ধান্তের মূল শিখিল করিয়া রাখিয়াছে ।

যুক্তি ও ঐতিহ্যের দ্বারা এই পর্য্যন্ত
জানা যায় যে, পাণিনি অত্যান সার্কসি
সহস্র বৎসরের পূর্বে ভারতবর্ষে জন্ম গ্র-
হণ করিয়াছিলেন ; নবনন্দের তৃতীয় কি
তৃতীয় নন্দকে তিনি জানিতেন । তাঁহার
পূর্বপুরুষেরা গান্ধার প্রদেশের শালাতুর
গ্রামে বাস করিত, এবং তিনি স্বয়ং মগ-
ধাদি প্রদেশের কোনও একস্থানে বাস
করিতেন । তিনি দক্ষ গোত্রের ও পাণিন্
উপাধি-প্রাপ্ত কোন এক বিখ্যাত বংশের
সম্ভান, তাঁহার মাতার নাম দাক্ষী এবং
জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন । দাক্ষিণাত্য-
বাসী ব্যাড়ির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ স-
ম্পর্ক ছিল এবং দেখা সাক্ষাৎও ছিল ।
ইহার পিতার নাম ঠিক জ্ঞাত হওয়া যায়
না । কেহ কেহ বলেন, তাঁহার নাম দে-
বল । কোন্ দেবল তাছা জানা যায় না ।
ফল মহাত্মারতীর ঋষি দেবল নহেন । ইনি
ব্যাকরণাচার্য্যগণের শিরোভূষণ । এ-
ন্ধণে আচার্য্য গোল্ডফুকের মত সমা-
লোচিত হইতেছে ।

গোল্ডফুকের মতে পাণিনি খৃষ্টজ-
য়ের ৬০০বৎসরের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন ।
কিন্তু নন্দের তুল্যকালিক, ন্যায়-ভাষ্য
পাণিনি স্বত্র উদ্ভূত হওয়ারে এই মতের
মূলে কুঠারাঘাত পড়িতেছে । এইরূপ
অন্যান্য বহুবিষয়ে তাঁহার সহিত আমা-
দিগের মতের অর্টনক্য হওয়ায় আমরা
দুঃখিত হইতেছি । কি করি, ঐতিহ্য ও যু-
ক্তির বলে যে সকল সত্য আবিষ্কৃত হয়
তাহার অপমান করিতে পারি না । অ-
তএব, সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গ এবিষয়ে আমা-
দের প্রগল্ভতা মার্জনা করিবেন ।

আচার্য্য গোল্ডফুকের কেবল মাত্র
ব্যাকরণ স্বত্রের কতকগুলি কথা লইয়া
তদীয় কাল, দেশ, এবং তদানীন্তন প্রযা-
বলীর যে সত্ত্বা নির্ণয় করিয়াছেন, তাছা
অযৌক্তিক । বৈয়াকরণিক সঙ্কেত কেবল
প্রচলিত সাধুশব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ
দেখিয়া, তাহার সাধুতা সমপ্রমাণ করিয়া
দেয় মাত্র । এতস্তিন্ন কোন ইতিহাস নি-
র্ণয় করিয়া, দেয় না । প্রকৃতি প্রত্য-
য়ের বিভাগ ও সাধন-প্রণলী প্রদর্শন
পূর্বক বিশেষ শব্দকে অর্থ বিশেষে ব্যব-
স্থাপনা করাই ব্যাকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য ।
কিন্তু পারিভাষিক বা নিরূপ সঙ্কেতযুক্ত
শব্দের উপর ব্যাকরণের কিছু মাত্র প্রভুতা
নাই, সুতরাং ব্যাকরণের সহিত তাদৃশ
শব্দের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই । ইহা
সত্য কি অসত্য নিদর্শন দেখাইতেছি ।
পুরাণে একটি শব্দ আছে “ পঞ্চাত্র ”

“পঞ্চাত্তরোপী নরকং ন য়তি” যে পঞ্চাত্তরোপণ করে তাহার নরকে গতি হয় না। এই পঞ্চাত্তর শব্দটির অর্থ পাণিনি বলিবেন, পাঁচটি আত্মরক্ষ, বস্তুতঃ তাহা নহে। নিম্ব, অশ্বশ্ব, বট, জাতিপুষ্প, দাড়িম্ব, এই সকল রক্ষ একত্র রোপণ করিলে তৎসমুদায়কে পঞ্চাত্তর বলে, ইহাতে আত্মের নাম গন্ধগু নাই, অথচ ইহা পঞ্চাত্তর হইল।

যদিও পঞ্চাত্তর শব্দটির উৎপত্তি পাণিনির পরে হইয়া থাকে এমতও হয়, তথাপি তৎপরবর্তী আচার্য্যেরা বা বৈয়াকরণিকেরা তাহা ভ্যাগ করিবেন কেন? ইহাতে বুঝিতে হইবে যে তাদৃশ শব্দের সমাবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই এবং ভজ্জন্যই ব্যাকরণে তাদৃশ শব্দের বর্জন আছে।

আর একটি শব্দ আছে “ষোড়শী”। এই শব্দের অর্থ পাণিনি বলিবেন, ষোল সংখ্যার পুষ্টি। কাব্য লেখকেরা বলিয়াছেন “সুবতী” স্ত্রী। পুরাণে আছে, তীর্থস্থলে প্রদত্ত উনবিংশপিণ্ড, আবার বেদে বলে একটি যজ্ঞপাত্র অর্থাৎ সোমরস গ্রহণের পাত্র। এই ষোড়শী শব্দটি পাণিনি কি অন্য কোন ব্যাকরণের মতে যজ্ঞপাত্র বুঝা যায় না। ইহা পূর্বে উৎপন্ন হইলে ব্রাহ্মণদিগের সর্বস্বধন সোমের পাত্র বিন্যস্ত হইয়া ষোল সংখ্যার পূরণ মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইতেন না!! কিন্তু পাঠকগণ, বলিয়া দিতেছি, ইহা পাণিনির চিরপরিচিত স্বকুর্বেদের সহস্র

স্থানে আছে। “অতি রাত্রে ষোড়শীং গৃহ্নাতি নাতিরাত্রে ষোড়শীং গৃহ্নাতি” ইত্যাদি। অতএব, কেবল মাত্র ব্যাকরণ সূত্রের দ্বারা কোন ইতিবৃত্তি নির্ণয় হইতে পারে না। যেমন একমাত্র ব্যাকরণের দ্বারা কোন ইতিহাস নির্ণয় হয় না সেই রূপ, এক শব্দকে দুই ব্যক্তি দুই অর্থে ব্যবহার করিল বলিয়া সেই দুইজনের মধ্যে একটা লক্ষ্যমান কালনিবেশ করাও যায় না।

এইরূপ শিখিল মূলযুক্তির আশ্রয় লইয়া আচার্য্য গোল্ডফুর্কর ন্যায়, সাঙ্খ্য, বেদান্ত, মীমাংসা, উপনিষদ, আরণ্যক, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমুদয় আর্ষ গ্রন্থকে পাণিনির পরভাবী বলিয়া লোকে বুঝা মোহ জন্মাইয়া দিয়াছেন। উল্লিখিত সমস্ত শব্দই পারিভাষিক। পারিভাষিক শব্দের দ্বারা যে ব্যাকরণের কাল নির্ণয় হয় না তাহা তিনি কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন নাই।

পাণিনির একটি সূত্র আছে “অরণ্যাম্ মনুষ্যে” মনুষ্য অভিধেয়ে “আরণ্যকঃ” এই পদ নিষ্কাশন হইবে। যথা—আরণ্যকো মনুষ্যঃ অর্থাৎ অরণ্যবাসী মনুষ্য। ইহা দেখিয়াই তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পাণিনির পূর্বে বা সময়ে আরণ্যক নামক বেদাংশ ছিল না, কিন্তু উহা মনুপ্রভৃতি প্রাচীন ঋষিদিগের সময়ে ছিল? ইহাতে তাহার সিদ্ধান্তের ভ্রম হইয়াছে।

ন্যায় দর্শন ও সাঙ্খ্যদর্শন ও পারিভা-

ষিক শব্দ। এই পরিভাষা গুলি শিবাস-
প্রদায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণ
আমরা বাহাকে যোগদর্শন ও পাঠঞ্জল-
দর্শন বলি, তাহার প্রকৃত নাম “
প্রবচন”। আমরা বাহাকে উত্তর মী-
মাংসা ও যেদাস্তদর্শন বলি, তাহার প্রকৃত
নাম “উত্তরকাণ্ড”। এইরূপ উপনিষদ শব্দ
সাক্ষেতিক। পাণিনি যুনি ব্যাস ও তাঁ-
হার ক্রমাশুসারে নিম্নবর্তী পাঁচজন শি-
ষ্যকে অর্থাৎ শিষ্য প্রথিষা প্রভৃতিকে চি-
নিতেন, যুক্তিরাদি রাজন্যবর্গকে চি-
নিতেন, ইহা তদীয় সূত্রে প্রকাশ
আছে। ন্যায়, সাংখ্য, আরণ্যক প্রভৃতি
পাণিনির জ্ঞাত ছিলনা, কিন্তু তাঁহার অ-
নেক পূর্ববর্তী উল্লিখিত ব্যক্তিদের জ্ঞাত
ছিল? ইহা কিরূপ সত্য, বিজ্ঞ পাঠকগণ
বিবেচনা করুন। উল্লিখিত ব্যক্তির যে
উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় জ্ঞাত ছিলেন, তাহা
সকল আর্ষ গ্রন্থেই প্রকাশ আছে। একটি
নহে, দুইটি নহে, বহু পরিমাণ বচন
আছে। একদেশে নহে, দুইদেশে নহে,
সকল দেশের পুস্তকেই তুল্য পাঠ আছে।
অতএব সেই শ্লোকগুলি আধুনিক বলাও
অপ্প সাহসের কার্য্য নহে।

“নির্বাণোগোহ্বাতে” “আশ্চর্য্যমনিভ্যে”,
এই সকল সূত্র দেখিয়া এবং ইহার “অ-
স্তুত ইতিবক্তব্যম্” ইত্যাদি স্মৃতি ও ভাষ্য
দেখিয়া গোল্ডস্ট্রুকের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন
যে, পাণিনির পূর্বে নির্বাণ শব্দের মুক্তি-
বাচকতা দূরে থাকুক, সামান্য নিবিয়া বা-

ওয়া অর্থও ছিলনা। আশ্চর্য্য শব্দেরও
অস্তুত্বার্থদ্যোতকতাছিলনা। আমরা এবি-
ষয়ে তর্ক করিতে ইচ্ছা করিব না; যেহেতু
তাহা নিশ্চয়োজ্ঞন। তবে এইমাত্র বলি
যে তিনি কি জন্য “পানংদেশে” এই
সূত্র লইয়া বিচার করেন নাই? তিনি,
পান শব্দে তরল খাদ্য বুঝাইত কিনা তাহা
নিশ্চয় করিতে পারেন নাই বলিয়া, ঐ সূ-
ত্রটির আর উল্লেখ করেন নাই। পাঠকগণ
কি “পানং দেশে” সূত্র আছে বলিয়া
বলিতে পারেন যে পাণিনির পূর্বে বা
পাণিনির সময়ে পান শব্দে দেশ বা স্থান
বুঝাইত—তরলখাদ্য বুঝাইত না? ফসতঃ
মহামহোপাধ্যায় গোল্ডস্ট্রুকের এই স-
কল স্থানে যে যে তর্ক উদ্ভাবন করিয়াছেন
সমস্তই অমূলক। কেননা, পাণিনি সূত্র-
স্থান মাত্র রচনা করিয়া ছিলেন, স্মৃতি কি
ভাষ্য তাঁহার নহে। অতএব অন্যের প্রদত্ত
উদাহরণ দ্বারা পাণিনির সাময়িক ব্যবহার
নির্নীত হইতে পারেনা।

আর একটি গুরুতর বিচার উদ্ভাপিত
হইতেছে। পণ্ডিতবর গোল্ডস্ট্রুকের পা-
ণিনি-সূত্রের মধ্যে অথর্ষবেদের উল্লেখ
দেখিতে পান নাই বলিয়া অনুমান করি-
য়াছেন যে পাণিনি অথর্ষবেদ অবগত
ছিলেন না। অথর্ষবেদটি তাঁহার পর
রচিত হইয়াছে। এইরূপ বাক্য ব্যক্ত ক-
রাতে তাঁহার বিলক্ষণ ভ্রম প্রকাশ পাই-
য়াছে। তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন—
“আথাবর্ণিকস্যেক লোপশ্চ” (৪ । ৩)

“কপি বোধাদাঙ্গিরসে” “দাণ্ডি-
নায়ন হান্তিনায়নধর্কর্নিক—”(৬।৪)
এই সকল সূত্রে যে অথর্ক-শব্দ আছে
এবং আঙ্গিরস শব্দ আছে, তাহার অর্থ
তৎকালে কি ছিল? আমরা দেখিতেছি
অথর্ক শব্দের চতুর্থবেদবোধকভিন্ন অন্য
অর্থ ছিল না। অথর্ক শব্দের যদি চতুর্থ
বেদ কি তৎপ্রণেতা মুনি ভিন্ন অন্য অর্থ
থাকিত, তবে তিনি তাহা দেখাইতে পারেন
নাই কেন? এ বিষয়ে তাঁহার অনুমান এই
যে পাণিনি যখন অথর্কবেদ বা অথর্কা-
ঙ্গিরস এইরূপ স্পর্শ করিয়া বলেন নাই
তখন তিনি তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। তাঁ-
হার ন্যায় পণ্ডিতের এই অনুমানকৌশল
দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। এই পা-
ণিনি কেবল “ছন্দসি” “ছন্দসি” ব-
লিয়া গিয়াছেন। “দৃষ্টংসায়” বলিয়া
গিয়াছেন। বেদ বা সামবেদ, যজুর্বেদ,
ঋগ্বেদ, কি কোথাও এরূপ স্পর্শ করিয়া
বলেন নাই। অতএব পাণিনির সময়ে
যদি কোন বেদই না থাকে তবে অথর্ক
বেদও থাকিবে না ইহাতে আমাদের
আপত্তি নাই।

ঋগ্বেদে যে যে স্থানে অথর্কন শব্দ আছে
তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। প্রথমতঃ
৬, ১৬, ১৪। পুনশ্চ ১০, ১৮, ২ তৎ-
পরে ১০; ২১, ৫। ৮, ৯৭। পুনশ্চ
১০। ৮৭। ১২।—৯। ১১। ২। পুনশ্চ
১০, ১৪, ৬। ১। ৮০। ১৬। ৮৩। ৫।

৬। ১৬। ১৩। পুনশ্চ ১। ১০। ১২। ০।
৯। ১। ১১২। ১০। ঋগ্বেদ সংহিতা।

অনেকের ভ্রম আছে অথর্কাঙ্গিরস
মুনি অথর্কবেদের রচক। কিন্তু অথর্কা-
ঙ্গিরস ব্যক্তিটি কে? তাহা অধিকাংশ
ব্যক্তি জানেননা। মহাব্যাস উদ্যোগপর্কে
ইহার পরিচয় দিয়াছেন। ইনি বৃহস্পতি।
দেবতাদিগের গুরু এবং অঙ্গির ঋষির
পুত্র। পৌরাণিক মতে ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া
ইহাকে অথর্কাঙ্গিরস উপাধি প্রদান ক-
রেন, কারণ ইনি অথর্ক-বেদোক্ত মন্ত্রের
ঘারা ইন্দ্রের স্তুতি করিয়াছিলেন এবং এই
বেদে ইহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

পাণিনি সূত্রে যাক্ষের উল্লেখ থাকায় আ-
চার্য্য গোল্ডস্টুক তাঁহাকে পাণিনির পু-
ত্রবর্তী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এইক্ষণে
সেই যাক্ষপ্রণীত নিকল্প মধ্যে অথর্কাঙ্গিরস
মুনির অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে। ইত্যাদি।

এইরূপ পণ্ডিতবর গোল্ডস্টুক যে
সিদ্ধান্তে পাণিনিবিচার করিয়াছেন, তাহা
আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যুক্তিসঙ্গত
বোধ হইতেছে না। কিন্তু তিনি যে পাণিনি
সম্বন্ধে অপরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, তৎ-
পাঠে আমরা অনেক জ্ঞান লাভ করি-
য়াছি। এই প্রশংসা তাঁহার কীৰ্ত্তি-স্তুতি স্ব-
রূপ চিরকাল সাহিত্য সংসার উজ্জ্বল
করিয়া থাকিবে।

আমরা পাণিনি সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়
স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিব। জীরাবাদাস সেন।

উকীলের প্রজানীতিসম্বন্ধে চারিটি কথা।

জ্যৈষ্ঠমাসের বান্ধবে ভারতের প্র-
জানীতি-শির্ষক যে প্রবন্ধ প্রকটিত হয়,
তাঁহা পাঠ করিয়া অনেকে ক্ষুব্ধ, কেহ বি-
রক্ত, কেহ বা ক্রোধান্বিত হইয়াছেন।
বাস্তবিক উহাতে সত্য মিথ্যা যে প্রকারে
জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে প্রব-
ন্ধের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় এবং লেখকের মত-
নিশ্চয় নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু
আমাদের বিশ্বাস যে, লেখক স্বেচ্ছ-চতুর ;
এবং মনোহুঃখে দক্ষ-হৃদয় হইয়া গরল-
রূপে অমৃত উদ্দীর্ণ করিয়াছেন। আমা-
দের এ প্রকার বিশ্বাস করিবার কারণ
আমরা প্রদর্শন করিতেছি।

প্রবন্ধলেখক 'উকীল' বলিয়া আত্ম-
পরিচয় দিয়াছেন ; তাহাতেই যথেষ্ট স্ফ-
ুজিত করা হইয়াছে যে, তাঁহার প্রত্যেক
কথাই বিতর্ক করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে,
প্রতিচিত্রের ওকালতীর আবরণ উন্মোচন
করিয়া দেখিতে হইবে। বস্তুতঃ সে ভাবে
দৃষ্টি করিলে বিতর্কাত্মক প্রবন্ধলেখকের
সহৃদয়তা, স্বদেশবৎসলতা, এবং কর্তব্য-
প্রিয়তার পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।
আর আমরা যাহা মনে করিয়াছি, লেখ-
কের যদি সত্য সত্যই সেইরূপ অতিপ্রায়
হয়, তাহা হইলে তাঁহার লেখনভঙ্গী অ-

বশ্যই প্রশংসার যোগ্য। দিনকাল বি-
বেচনা করিয়া মনোস্তাব ব্যক্ত করিতেই
বুদ্ধিমত্তা এবং কৌশল-বত্তা প্রদর্শিত হয়।

হ্রস্বলক্ষ্য প্রবলরূপে প্রতীক্ষ্যমান ক-
রিতে হইলে যে পক্ষা অবলম্বন করিতে
হয়, আমাদের উকীল তাহাই অবলম্বন ক-
রিয়াছেন। তাহার পর, যাহাকে সম্বো-
ধন করিয়া বলিতে হইতেছে, তাহার মন
ভুলাইবার জন্য যে কৌশলের আশ্রয় গ্র-
হণ করিতে হয়, উকীল তাহাও করিয়া-
ছেন। তথাপি যাহাদের বুদ্ধি জড়প-
দার্থ নহে, যাহারা সর্ববিষয়ের অন্তস্তল-
প্রবেশী, তাহাদের চক্ষে উকীল ধূলা দিতে
পারেন না, কেহই পারে না, কারণ পা-
রিবার উপায় নাই। প্রকৃতপক্ষে ভা-
বিয়া দেখিতে গেলে উকীল ব্যবসায়ানুচিত
কার্য করিয়াছেন বলিলেও বলা যায় ;
যাহার উকীল তাহারই ক্ষতি করিয়াছেন
বলিয়া প্রতীতি জন্মে। তবে মথীতে যে
রক্তাস্ত সকল সপ্রমাণ, তাহার ব্যতিক্রম
বা বিপরীত গমন করিবার অধিকার তাঁ-
হার নাই বলিয়াই, বোধ হয়, তিনি নিষ্কৃতি
পাইবেন।

ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক অ-
বস্থা বিবেচনা করিয়া মুদ্রণশাসনীব্যবস্থা

অনুচিত প্রবর্তন নহে, এংং আবশ্যিক, উকীল এই প্রতিজ্ঞার উপপত্তি সাধন জন্ত যে কএকটি পদার্থে আমাদিগকে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলিয়াছেন, তাহা এই—

“প্রথমতঃ, ভারতবর্ষ কখনও এক সাম্রাজ্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না, সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অর্থ নাই। ইংরেজ যে স্বত্র অবলম্বন করিয়া রাজ্য করিতেছেন, তাহাতে ভারতের একতা সম্পাদন সম্ভবপর, একতা সংসাধিত হইলে মন্ত্রলের আশা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজের রাজত্বে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিলক্ষণ রূপে হইয়াছে। এখনও ভারতবর্ষে যে সকল স্বাধীন উপরাজ্য আছে, সেখানকার প্রজাদের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে বিশেষরূপে ইহা উপলব্ধ হইবে।

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এক্ষণে যেরূপ প্রসার, পূর্বে এমন ছিল না।

চতুর্থতঃ রাজনীতি সম্পর্কে আমরা এখনও বালক, আমাদের রাজনৈতিক পুষ্টিসাধন আবশ্যিক, এবং ইংরেজের দ্বারা তাহা সাধিত হইতেছে। সুতরাং ইংরেজের অধীনতা আমাদের বাঞ্ছনীয়।”

তাহার পরেই উকীল বলিতেছেন, ইংরেজ আমাদের রাজনীতি বিষয়ের গুরু,— ইংরেজ দেবতা! এবং ইহা হইতে যে কথা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা উকীলের ভাষাতেই ব্যক্ত হউক;—

“অতএব, ইংরেজ যখন আমাদের

গুরুস্থানীয়, ভারতবর্ষে ইংরেজের স্থানীয় যখন সর্ব্বথা আমাদের কাম্য, তখন বাহাতে আমাদের ভক্তিভাব অবিচলিত থাকিতে পারে, আমাদের প্রেমভাব দিন দিন প্রবলতর হয়, আমাদের মাধুর্য্য-মিশ্রিত মমতার ভাব ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বথা আমাদের যত্নশীল হওয়া কর্তব্য। সকল লোকের বিদ্যা বুদ্ধি কখনই সমান হইতে পারে না; সেই জন্য সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীল বলিয়া বাহারা পরিচিত সেই উপরিভিত দশের কথায় নিম্নতর স্তরের ব্যক্তি-রূপ বিশেষ আস্থা স্থাপন করিয়া কার্য্য করে। সুতরাং যাহাতে রাজপুরুষদিগের সাধু এবং অকৃত্রিম সারল্যপূর্ণ অভিপ্রায়ের প্রতি সন্দেহ আরোপিত হয়, তাহা করা সেই দশের পক্ষে মহাপাপ, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি এবং অনিষ্টের সম্ভাবনা।”

পরিশেষে উকীল সিদ্ধান্ত করিলেন যে “যদি প্রজাবর্গকে উত্তেজিত, ভক্তি-শূন্য এবং বিপ্লব-প্রিয় করিবার জন্য ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক পন্থা প্রদর্শন করি, তবে ইংরেজের হস্তক্ষেপ করা আবশ্য কর্তব্য। অকুরেই উপদ্রবের বিনাশ সাধন ইংরেজের একান্তই উচিত। না করিলে রাজধর্ম্মের অপলাপ হইবে, আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে।”

যিনি রাজ্যেশ্বর তিনি রাজ্যের শান্তি রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, শান্তি রক্ষা তাঁহার কর্তব্য কর্ম্ম—এই সামান্য অবি-

সংবাদিত ভবের সংস্থাপন জন্য চতুর উকীল এত বাগাড়ম্বর করিতেছেন, ইহা মনে হইলে হাস্য-সংবরণ করা অসাধ্য হইয়া উঠে । কিন্তু মুদ্রণশাসনীব্যবহার-সম্বন্ধে পক্ষে ইহার অধিক কিছু বলিবারও নাই । প্রবন্ধলেখক উকীল সাজিয়া আমাদিগকে দেখাইলেন, যে কটুক্তি কর, কটাক্ষ কর, বাহা ইচ্ছা বলিয়া যাও কিন্তু লক্ষ্ম-ঝম্পের অবসান এই ধানেই হইবে । সেই জন্ত ইহার পরেই ‘উকীল’ নীরব, আর সে তর্কের গাঁথনি নাই, বিচার-প্রস্তুতির বেগ-শালীতা নাই । ফল স্থির হইল যে, যে কথার জন্ত ওকালতী, তাহা প্রতিপন্ন হইবার নহে । “ ছোর বার, মুলুক তার ” এই নীতিই মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থার একমাত্র অবলম্বন । যদি তাহা না হইত, তবে কথা বার্তা না কহিয়া, প্রমাণ প্রয়োগ না দেখাইয়া ‘উকীল’ সহস্রা গর্জন করিয়া বলিতে পারিতেন না যে “ ইহার সূত্র লইয়া বিবাদ করিবার অধিকার নাই, গণ্ডগোল করা অন্তার । ”

কেন ? শাস্তি রক্ষাই কি ব্যবস্থার সূত্র ? তবে দণ্ডবিধি আছে কেন ? বস্তি সহস্র বিলাতী সজিন ভারতে ঝক্ মক্ করিতেছে কেন ? রাজ্যের শস্য ধ্বংস করিয়া পঙ্গপালের মত এত লাল পাগড়ি, নীলজামা ভারতের বুকের উপর অহোরাত্র দাপট করিয়া বেড়াইতেছে কেন ? ভারতবাসীর ক্ষয়-শোষিত শোণিতকে রক্তরূপে পরিণত করিয়া এই

অমৃত রাজকর্মচারী আর অকর্মচারী কি কেবল বল্লীক লুপ্ত নির্মাণ করিতেছেন ?

ফলকথা, মুদ্রণশাসনীব্যবস্থার সূত্র শাস্তি রক্ষা নহে, ইহার অপরা সূত্র আছে । ন্যায়ভীতি, স্বপ্রবর্তিত পক্ষপাতশূন্য বিচারপ্রণালীর মূলোচ্ছেদ, এই ব্যবস্থার মূল সূত্র । দোর্দণ্ড প্রতাপ চালনাই এ ব্যবস্থার প্রাণ । অপ্রিয় প্রকৃত কথা শুনবার অনিচ্ছাই এ ব্যবস্থার নিদান ।

কিন্তু উকীল একথা স্বীকার করিতে পারেন না, সেই জন্য এস্থলে নীরব । এই আত্মঘাতক তর্ক পরিবর্তন না করিলে ওকালতী চলে না, সেই জন্য অন্তঃশূন্য এক ছকার ছাড়িয়া উকীলকে এই স্থল উল্লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে ।

তথাপি স্লেষবিশারদ প্রবন্ধলেখক উকীলের মুখে যে কথা স্বীকার করাইয়াছেন, আমাদের পক্ষে তাহাই পর্যাপ্ত । উকীলকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, যে “ ব্যবস্থার সম্পাদন যে সর্বোচ্চ স্মরণ হইয়াছে, তাহার কোনও অংশে দোষ নাই, অভাব নাই বা বাহুল্য নাই, তাহা আমরা বলিতেছি না । ” স্বীকারী এ ব্যবস্থার অসম্ভব, বিরক্ত বা ভীত, তাঁহারা ইহার অধিক কি বলেন ? বঙ্গবাসী কঁাদিবে, কিন্তু “ মা গো ! ” বলিয়া কঁাদিতে পারিবে না;—তারতবর্ষের ভাবার প্রতি এই নিষ্ঠুরাচরণ, মুদ্রণ শাসনী ব্যবস্থার দোষ । বর্ণ-ভেদ জাতি-ভেদ, ধর্ম-ভেদ মনে না করিয়া ইংরেজ

বিচারক অপক্ষপাতে ন্যায়ের তুল্যদণ্ড ধরিয়া রহিয়াছেন; সে বিচারক ইংরেজ রাজ্যেরই নিয়োজিত, কিন্তু ভারতবর্ষের মুত্রাকরের বিচার তিনি করিতে পাইবেন না—ব্যবস্থার এই স্থলে অস্তাব। রাজ্যের বৃকে বসিয়া রাজ্যের বাড়িতে রাজ্যের স্বজাতি ভারতের জন্য মুত্রিতাকরে অক্ষপাত করিলেন, ভারতের ক্ষুদ্রতম পুস্তক-বিক্রেতা সেই লিপি আনাইয়া বিপণির গৌরব বাড়াইল, মুদ্রণ-শাসনী ব্যবস্থা তাহাকে দণ্ড দিবে—ব্যবস্থার এই বাহুল্য।

উকীল স্পষ্ট করিয়া, এ কথা গুলি বলিলেন না, বলিতে পারিলেন না। বলিতে হইলে তাঁহাকে এই কথাই বলিতে হইত। প্রবন্ধ-লেখক এস্থলে উকীলকে এই কথাগুলি বলিবার জন্য উৎপীড়ন করেন নাই, কিন্তু যাহা বলিতে হইত তাহার আভাস দিয়াছেন। ইহার অপেক্ষা কঠোরতর বা অধিকতর অন্তর্ভেদী শ্লেষ আর কি হইতে পারে?

ব্যবস্থার পক্ষ সমর্থন জন্য উকীলকে নথীর বিপরীত প্রসঙ্গ করিতে হইয়াছে, ভারতবর্ষে বা ভারতবর্ষকে উপলক্ষ করিয়া আজি কালি রাজনীতিসম্বন্ধে উপস্থিত, এই এক অতিরিক্ত কথা ব্যবস্থার হেতুবাদের পোষক বলিতে হইয়াছে। কিন্তু ব্যবস্থার প্রবর্তনিতা একথার উল্লেখ করেন না, সুতরাং আমরা ইহার যৌক্তিকতার বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য নহি। তবে সংক্ষেপে

আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, যে ১৮৫৭। ৫৮ অব্দের সহিত তুলনা করিলে, বর্তমান কালকে শান্তি এবং নিশ্চিন্ততার মুক্তি বলিয়া পরিচিত করা যায়। মনে রাখিতে হইবে যে নীরবে, নির্ধীরোধে, নিকপজবে বরদার গায়েকবাড়ের রাজ্যচ্যুতি এবং কারাদণ্ড অধিক দিনের কথা নহে, মনে রাখিতে হইবে যে, যে নিজাম বেরার রাজ্য পুনঃ-প্রাপ্তির জন্য ইংরেজরাজ্যের সঙ্গে বহুদিন ধরিয়া বচসা করিয়া আসিতেছেন, তিনিই আবার ইউরোপে ইংরেজের সাহায্য কামনায় নিজ সৈন্য সামন্ত দিবার জন্য ব্যাধি; মনে রাখিতে হইবে—না, ভারতেঋত্রীর জয় হউক! তাঁহার প্রতিনিধি এবং মন্ত্রিবর্গ যে কথার উল্লেখ করেন নাই, তাহার প্রতিবাদ জন্য কেন সময় নষ্ট করিব?

তথাপি আমাদের বোধ হইতেছে যে প্রবন্ধলেখক একথার উত্থাপন করিয়া ইংরেজরাজপুঙ্কষণের উপর কঠোর ব্যঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহার লিখনভঙ্গীতে মনে হয় যেন রাজপুঙ্কষণ ব্যবস্থার পরিবর্তন জন্য যে সকল কারণে চালিত হইয়াছেন, তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিতে তাঁহাদের সাহস নাই, অথবা সত্যের প্রতি তাহাদের আজি কালি অশ্রদ্ধা বা অপ্রস্তুত জন্মিয়াছে। ভারতবর্ষের ইংরেজ এতাদৃশ হীনভাবাপন্ন হইয়াছেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করি না। নথীতে যাহা নাই, উকীলের সে কথা আমরা গ্রাহ্য করিলাম না।

এখন পূর্বকথার প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখা যাইতেছে যে, উকীল যে সকল প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা মানিয়া লইলেও মূল প্রতিজ্ঞার পূরণ হয় না ; মূল প্রতিজ্ঞার সহিত তাহাদের কার্যকারণ সম্বন্ধ কিছুমাত্র নাই এবং এই সম্বন্ধ সংস্থাপনজন্য উকীলও প্রয়াস পান নাই। প্রবন্ধলেখকের চতুরতা—বুদ্ধিবার বস্তু, আশ্বাদনের বস্তু, সরস এবং সুমিষ্ট। দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুকাইয়া দিই।

১ম ;—ভারতবর্ষ কখনও এক সাম্রাজ্য ছিলনা, সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অর্থ নাই। যদি ইহার পরেই বলা যায়—অতএব মুদ্রণশাসনীবাবস্থা আবশ্যিক, তাহা হইলে বক্তাকে বাতুল বলিতে কেহই সঙ্কোচ করিবেনা।

২য় ;—ইংরেজরাজ্যে আমাদের বিশ্লক্ষণ উন্নতি—অতএব ব্যবস্থার প্রয়োজন। একথা বলিলে হাসিতেও লজ্জা বোধ হয়।

৩ ;—ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রসার একদল পূর্কপেক্ষা অধিক। উক্তম কথা, কিন্তু তাই বলিয়া কি মুদ্রণশাসন ?

৪র্থ ;—রাজনীতি বিষয়ে আমরা বালক, ইংরেজ আমাদের গুরু, ইংরেজ দেবতা। তাহাতেই কোন্ বক্ষ্যমাণ ব্যবস্থার “মহীপালের গীত” ভাব অপসারিত হইতেছে ? বয়োবৃদ্ধি সহকারে কি বালকতারও বৃদ্ধি হয় ? আজি চন্নিশ

বৎসর আমরা মুদ্রণ-স্বাধীনতা পাইয়াছি ; এ চন্নিশ বৎসর কি আমাদের বয়স বাড়ে নাই, না কি বয়স কমিয়াছে ? আর “দেবতার মত” ইংরেজ এতকাল আমাদের গুরুগিরি করিয়া যদি এই ফল ফলাইয়া থাকেন, তবে সে গুরুর কলঙ্কের কি সীমা আছে ? তাহাহইলে সে গুরুকেও দিক্ ! আমাদের মত শিষ্যকে শতবার দিক্ ! যদি সপাদ শত বৎসর এছেন গুরুর চরণোপান্তে বসিয়া শেষ কালের উন্নতির পরিবর্তে অবনতি হইয়া থাকে, তবে উচিত যে, হয় এই গুরুমহাশয় গ্রাম ত্যাগ করিয়া আপন ষাণ্ডভিটায় বসিয়া মুদিখানা খুলিয়া গ্রোসাচ্ছাদনের চিন্তা দূর করেন ;—নয় এই শিষ্য রুন্দ স্ব স্ব গলদেশে রজ্জুবন্ধন পূর্বক সাভিনিবেশচিতে বিচালি চর্কন আরম্ভ করেন। প্রবন্ধলেখক রসিক, আমরাও কম নহি। কিন্তু লোকে সহজে বুঝেনা, এ ক্ষোভ আমাদের উভয়েরই রহিয়া গেল।

যাহারা স্বাধীনতা প্রয়াসী হইয়া ভারতবর্ষে বিদ্রোহভাব উত্তেজিত করে, তাহাদেরই জন্য মুদ্রণ-ব্যবস্থা বিধি-বদ্ধ হইয়াছে, উকীল অন্তঃসলিলা নদীর মত এই কথা তাহার প্রবন্ধের ভিতরে ভিতরে অর্ধ আবরিত রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তিনটী কথা উৎপাদিত হইতেছে।

১ম ;—বিদ্রোহভাবের উত্তেজনকারী কেহ আছে কিম্বা ? যদি থাকে তবে কেন আছে ?

২য়;—স্বাধীনতাশ্রিয়তার সহিত রাজভক্তির নিত্য বৈরতাব কি না ?

৩য়;—মুদ্রণব্যবস্থার বিদ্রোহতাবের দমন সম্ভবপর কি না ?

ভারতীয় প্রজ্ঞার অন্তরে বিদ্রোহ-তাবের অন্তিম আমরা একেবারে অস্বীকার করি। ভারতের কৃষক, বণিক, ভূ-স্বামী—যাহাদিগকে লইয়া ভারতবর্ষ,—তাহারা ইংরেজ-রাজ্যের স্থানিহ-কামনা তিন্ন অন্য কিছু জানেন না। উকীলও একথার স্বচনা দিয়াছেন; তবে এবিদ্রোহতাবের জন্য কোথায় অশেষণ করিতে হইবে? উকীল ইহার উত্তর দেন নাই, উত্তর দিতে অক্ষম।

উকীল এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই বটে, কিন্তু “অসন্তুষ্টি” আখ্যা দিয়া এক জ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে তাহাদেরই স্বন্ধে দোষারোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি উকীল যে সমুদয় বিশেষণের দ্বারা ইহাদিগকে পরিচারিত করিয়াছেন, তাহাতেই ইহাদের গৌরবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; প্রবন্ধলেখক এই স্থলেই স্বেষ-দক্ষতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

উকীল স্মরণ বলিতেছেন,—“পাশ্চাত্য শিক্ষায় যাহাদের ছন্দ-বৃত্তির স্ফূর্তি হইয়াছে, যাহাদের চিন্তবলের বিকাশ হইয়াছে, জন্মভূমি ও মাতৃভাবার নামে যাহাদের অন্তঃকরণ তরঙ্গান্বিত হয়—তাহারাই—“অসন্তুষ্টি”। ইহাদের “সংখ্যা অল্প নয়” তাহাও উকীল স্বীকার করি-

তেছেন। ইহাদের “অসন্তোষের” কারণ নির্দেশ করিতেও উকীল সংকোচ করেন নাই; কারণ “তাহারা ভারতবর্ষের দুঃখে নিরন্তর ব্যথিত। ভারতবর্ষে বিজাতীয়, বিদেশীয় রাজ্য আধিপত্য করিতেছে, ভারতবর্ষের রাজ্যে বিদেশীয় দেহ পুষ্ট হইতেছে, ভারতবর্ষে বিজাতীয় রীতিনীতি, ভারতবাসীর সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া অথবা ইচ্ছার বিকল্পে প্রবর্তিত হইতেছে”। ওদ্বপরি—ভারতবর্ষের দুঃখের কাহিনী “দৈর্ঘ্য, দান্তিকতা বা অসদভি-সঙ্কি-বিজুক্তিত নহে।”

এইবার সারসংগ্রহ করিয়া দেখ, যাহারা স্বদেশ-বৎসল, যাহারা শুল্কিনিত, যাহারা সঙ্ঘদয়, তাহারাই উকীলের মতে অসন্তুষ্টি; অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্রদর্শী, যাহারা ইতিহাসের অনুশীলন করে, যাহারা কাল-ধর্ম বুঝিতে সক্ষম, তাহারাই অসন্তুষ্টি! ভয়ঙ্কর কথা! আমরা ইহার অনুমোদন করি না, কারণ তাহা হইলে রাজ্যের দোষ আছে, এবং রাজ্যের স্বকার্য্যে দোষ প্রকাশ পাইতেছে, ইহাই বলিতে হইবে। আমাদেব শঙ্কা হইতেছে, প্রবন্ধলেখক এই স্থলে মর্ম-দুঃখে অধীর হইয়া আত্ম-বিশ্বাসের পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছেন। তথাপি বলিয়া রাখি, যাহারা রাজ্যের কার্য্যে জটিল দেখিয়া ব্যথিত হয়, আর সেই জটিল রাজ-গোচরে জ্ঞাপন করে, তাহাদের রাজ-ভক্তি নিতান্তই প্রবল; নহিলে একটু তাহার দেখাইয়া দিত না, ত্রণ লুকাইয়া

রাখিত ; যত দিনে অভ্যন্তর ঘুরিত হইয়া
অঙ্গশ্বেদের প্রয়োজন না উপস্থিত হইত,
ওতদিন নীরব থাকিত । ইহার কখনই
রাজদ্রোহী হইবার ব্যক্তি নহে ; ইহার
কাহাকেও রাজদ্রোহিতা শিখাইবে না ।

তথাপি মনে করা যাইতে যে, ইহার
ভারতীয় প্রজাপুঞ্জকে বিদ্রোহী এবং বি-
প্লবপ্রিয় করিবার জন্য যত্ন করিতেছে ।
সে যত্ন কি মুজিতাক্ষরে রাজার নয়নো-
পরি করিবে বলিয়া-কেহ বিশ্বাস করিতে
পারে ? তবে একথা লইয়া মুদ্রণশাসনীয় ব্য-
বস্থাকে কেন ? দিনে ডাকাইতি করা যাহাদের
অভ্যন্ত, তাহারাই গৃহস্থকে কখন কখন
পত্র লিখিয়া জানায় বটে । পরাধীনতাই
আমাদের অভ্যন্ত ; অপহৃত স্বাধীনতা কা-
ড়িয়া লইতে আমরা কখনও শিখি নাই ;
কখনও উদ্যোগ করি নাই, কখন চেষ্টাও
করি নাই । তবে এ “ মড়ার উপর খাঁ-
ড়ার বা ” কেন ?

স্বাধীনতা ভালবাসিলেই যে কাহা-
কেও রাজদ্রোহী হইতে হইবে, ইহার অর্থ
নাই, “ উকীলই ইহার হেতুবাদ করিয়া-
ছেন, এবং সুন্দর দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছেন ।
মোটামুটি বলা যায়, ইউরোপ এবং আ-
মেরিকা স্বাধীন ; অথচ তথাকার লোক
স্বদেশের রাজার অধীন । উকীলের প-
রিভাষা অনুসারেই, রাজনৈতিক স্বাধীনতা
অধীনতার রূপান্তর যাত্রা । ইংরেজ-রাজ্যে
ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রসার দিন দিন
বৃদ্ধি পাইতেছে ; এবং ব্যবস্থা-প্রণয়ন, ও

আয় বায়ের বিধানাদি বিষয়েও ভারত-
বাসী ক্রমে ক্রমে অধিকতর ক্ষমতা প্রাপ্ত
হইতেছে । সুতরাং রাজপ্রসাদানুসারেই
ভারতবাসী স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হ-
ইতেছে । স্বাধীনতা কামনা রাজার অনু-
মোদিত এবং রাজার অনুগ্রহে পরিপূর্ণ
হইতেছে । তবে কেন ভারতবর্ষের প্র-
জারূপ স্বাধীনতা ভালবাসিবে না ? এত-
স্তিন্ন ইংরেজরাজ আমাদিগকে নিত্য নিত্য
বলিতেছেন, তোমরা স্বাধীনতা পাইবার
যোগ্য হইলেই আমরা তাহা প্রত্যর্পণ ক-
রিব, ভারতের উপকার-জন্যই ভারতে
আমরা আসিয়াছি । ইহাতে এই বুঝা
যায় যে, স্বাধীনতারদিকে দৃষ্টি না রাখি-
লেই বরং ভারতবাসী প্রত্যাবার্ত্তন হইবে,
রাজেচ্ছার প্রতীপ-গমন চেষ্টার দোষে
দোষী হইবে । এত যে অমূল্য শিক্ষা
ইংরেজ আমাদিগকে দিতেছেন, ইহা কি
কেবল আমাদিগকে দাসত্ব এবং পশুত্বে
অবনীত করিবার জন্য ? উকীল বলেন,
তাহা নহে ; আমরাও বলি তাহা কখনই
নহে ।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যে আমাদের
চরমলক্ষ্য হওয়া উচিত, তাহা- যেমন আ-
মাদের রাজার অভিপ্রেত, তেমনি উকী-
লেরও বাঞ্ছনীয় । ভারতের একতা যে
অভিলষিতব্য, উকীল তাহা একাধিকবার
প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ; সে
একতার পরিণামে মঙ্গল হইবে, উকীল
তাহাও বলিয়াছেন । সে মঙ্গল যদি স্বা-

ধীনতা না হয়, তবে কি? মুদ্রণশিল্পে যদি স্বাধীনতার প্রতি অসুরাগ রুচি পায়, তবে মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থা যে কেবল নিম্প্রয়োজন, তাহা নহে, প্রত্যুত, নিতান্ত অব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া ভিরকরণীয়।

প্রসঙ্গান্বিত ব্যবস্থার দ্বারা বিজ্ঞোহ-ভাবের দমন যে অসাধ্য এবং অসম্ভব, ইহা বলাই বাহুল্য। যদি প্রকৃত পক্ষে ইংরেজ-রাজের বিকটচারণ করা কাহারও অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে মুদ্রিতাক্ষরের আশ্রয় গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সে আদৌ অতিযত্নে তাহা পরিবর্জন করিবে। ১৮৫৭ সালের বিজ্ঞোহিবর্গ হিন্দুপেট্রিয়ার্ট পত্রে প্রবন্ধ প্রচার করে নাই, এইরূপ শুনা আছে। চর্কিত চর্কণে প্রস্তুতি থাকিলে, এই স্থলে বলিতাম যে ভারতবাসীর ক্ষমতায় সত্য সত্যই যদি বিজ্ঞোহ-প্রস্তুতি থাকিত, তাহা হইলে সংবাদ পত্রাদির প্রচারে অপসারিত হইবারই কথা। বাঙ্গা-যন্ত্রের রক্ষণ-বন্ধু নিত্য উপকারই করিয়া থাকে; তাহাতে অনিষ্ট হয় না।

অতএব, উকীলের কথা যথাবৎ বি-ভ্রাস করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইতেছে যে মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থা সমর্পণ করিবার চেষ্টা রূপা, যে চেষ্টা রূতকার্য হইবার নহে। ইহাও সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আমাদেব স্বাধীনতা-স্পৃহা গর্হিত নহে, বরং ইংরেজরাজ সর্বথা তাহার আনুকূল্য করিতেছেন। তবে এই সংপ্রস্তুতির স্-

প্রয়োগ এবং পুষ্টি সাধন কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা একবার দেখা যাউক।

উকীল যথার্থই বলিয়াছেন, যে ইংরেজ আমাদেব গুণ। সাত শত বৎসর স্বার্থপর দস্যুর অধীনে থাকিয়া আমরা যে প্রকারে হ্রদশাপন্ন হইয়াছি, এই গুণের অনুরোধে এখন আমরা তাহা বুদ্ধিতে সমর্পণ হইয়াছি। নিস্বার্থ ইংরেজরাজের রূপাবলে মহাবেগে আমরা উন্নতিপথে সঞ্চালিত হইতেছি। প্রগাঢ় অন্ধকার হইতে এখন আমরা তীব্র আলোকে আনীত হইয়াছি, এখন বিশ্বমে, শুদ্ধভাবে, সংকুচিত নেত্রে চতুর্দিকে চাছিয়া দেখিতেছি, এবং পূর্বতন হ্রদশার স্বরূপ চিন্তা করিতেছি। এই মহোপকারের জন্য, জয় জয় আমরা ইংরেজসমীপে রুতজ্ঞ রহিব।

অধিকন্তু ইংরেজ আমাদিগকে এক্ষণে একরূপ অবস্থায় উপস্থাপিত করিয়াছেন, যে এখন আমরা মার্শমেনের কথায় ভুলিয়া ওদীর গ্রন্থকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করি না। অতিপূর্বে আমরা কি ছিলাম, স্বচক্ষে তাহা দেখিতে পাই; এখন সামান্য। “সাধারণী” ও আমাদিগকে অশোকের জয়স্তম্ভ দেখাইয়া দেয়, প্রাচীন তাপস-কুলের আশ্রমে—আমাদিগকে লইয়া যায়, এবং তীর্থস্থলের মহিমা গান করিয়া, আর্ধ্যসন্তানের চিরন্তন সম্বন্ধ— একধর্মতা, একপ্রাণতা মনে করিয়া, দেয়। উকীল এই সত্যের পর্থাবরোধ করিতেছিলেন, নহিলে তাঁহার ওকালতী

চলে না। কিন্তু ইংরেজ-গুণের প্রসাদে আমরা তব্বামুসজ্জান করিতে শিখিয়াছি, তব্ব জানিরাছি। আর আমরা বাক্‌ছলে ভুলি না। ইংরেজরাজ আজিও মহাদি ধর্মির সম্মান রক্ষা করিয়া, আর্ধ্য জাতির একতা প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদেরিগের হৃদয়ে জাগরক করিয়া নিতেছেন। বাস্তবিক ভারতবর্ষের আদিম সভ্যতা, স্বাধীনতা—এবং উন্নতাবস্থার চিত্র নিরন্তর আমাদের নয়ন-সমক্ষে না ধরিলে, আমরা এত সত্বর অমূল্য গুরুপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম না, ইংরেজ-বাহুিত আমাদের স্বাধীনতা প্ররুতির পুষ্টি সাধন হইত না।

এ সমুদয়ই উকীল আমাদেরিগকে দেখাইরাছেন। উকীলের প্রজানীতিকে আমরা রত্নাকর বলিয়া অভিহিত করিব। খুঁজিলেই ইহাতে রত্ন পাওয়া যাইবে। ইহাতে উত্তাল-তরঙ্গ আছে, বাড়বানলের শঙ্কা আছে, কুস্তীর হালকের তর আছে, —সত্য; তথাপি ইহা—রত্নাকর। জল দেখিয়া তর পাইলে চলিবে না। মনুন্দোবে ইহাতে গরল উঠিতে পারে, কিন্তু অমৃতও ইহাতে পাওয়া যায়।

আর প্রস্তাব বাস্তব করিব না; উকীলকে ধন্যবাদ দিয়া আমরা এই স্থলে কান্ত হইব।

বঙ্গবিধবা ।

(জ্ঞানদাসের ছন্দানুকৃতি)

১

সখিরে কি কব মনের দুখ ;
কি দুখও সেই কি কহিব তোরে,
ভাবিতে বিদরে বুক ।
(সখিরে) বিধাতা করিলা জনম দুখিনী,
বুঝতি বিধবা বালা ;
(হার) অহুদিম সেই, নয়নের জলে,
চুড়াই মনের জ্বালা ।

২

সখিরে, আমি ছেম অতানিনী,
নাহি জানি পতি, কিবা সে মুরতি,

বিবাহ কি নাহি জানি ।

(সখি) মা বাপ নিদয়, ঠৈশব সময়ে,
পর হাতে সঁপি দিলা,
(আমি) অনিচ্ছাতে সেই, খেলিই তখন,
সে এক দুঃখের খেলা ।

৩

সখিরে, কি কব প্রাণের জ্বালা ;
হিড়িয়া কলিকা, কটক লতার,
বিধিরা গাঁখিল মালা !
(সখি) তাতেও আবার, বিধাতা বিমুখ ;
সেও মালা হিঁড়ে গেল ;

(আমি) ধূলার পড়িলা, বাই গড়াগড়ি,
এ মোর কপালে ছিল ।

৪

সখিরে, বিধাতা নিষ্ঠুর অতি ;
দুঃখের অনলে, দহিতে নিয়ত,
গড়েছিল। এমুত্তি ।

(সই) হেন যদি বিধি, করিলা অবিধি,
কেন না হরিলা স্মৃতি ;

কেন লো অঙ্গনি, বাসনা কামনা

(পাপ) হৃদয়ে করিলা স্থিতি * ।

৫

সখিরে, কাল নিশি অবসানে ;
দেখেছি যেরূপ, পাশরিতে নারি,
ধৈর্য না ধরে প্রাণে !

(সখি) কুমুম কাননে, একাকী বিরলে,
যখন ছিলাম বসি ;

(আমি) সছসা দেখিছু, হাসিতে হাসিতে,
ভূতলে নামিল শশী ।

৬

সখিরে, কি কব রূপের কথা ;
সে মুখ স্মরিতে, ঝড়ে হনয়ন,
মরমে উপজে ব্যথা !

(হার) কিবা অনুপম, সে শ্যাম মুরতি,
বদনে প্রীতির ভার ;

(সই) চাহিতে চাহিতে, দেখিতে দেখিতে,
হরে নিল মম আমার ।

৭

সখিরে কিবা সে মধুর ভাষা ;

শুনিতে শুনিতে বাড়িল পিয়াস,
না পুরিল মন আশা !

(জিনি) বংশীর সুরব, কোকিল কাকলি,
কহিলা ককণ সুরে ;

“(বড়) ভাল বাসি আমি, তোমাতে স্মন্দরি,
এসেছি তোমার তরে ।”

৮

সখিরে, আমি হেন অভাগিনী ;

“ভাল বাসি তোরে” এমধুর কথা,
জনমে নাহিক শুনি !

(হল) আলু খালু প্রাণ, হারাইনু জ্ঞান
হইনু পাগল পারা ;

(তখন) খসিল বসন, মন বহে স্বাস,
স্থির হনয়ন ভার !

৯

সখিরে, কি কব এ পোড়া মুখে,
মনে হল সাধ, কণ্ঠহার করি,
পরি সে রতনে বুক ।

(আমার) মনে হল সাধ, পড়িছু প্রমাদে,
হুক হুক হিয়া কাঁপে ;

(তখন) চারিদিকে চাই, দেখে যদি কেহ,
পুড়িব কলঙ্ক তাপে !

১০

সখিরে, বলিতে বিদরে হিরে !

নেহারিছু আমি, সেইরূপ রাশি,
নয়নে নয়ন দিয়ে ।

(তখন) সেই স্রবাকর, কোমল হুকর,
কণ্ঠেতে করিল দান ;

(অম্মনি) সাপটিয়া সই, ধরিছু উরসে,
পারশে অবশপ্রাণ !

* স্থিতি করিলা সর্কর্মকরূপে ব্যবহৃত ।

১১

সখিরে, আচমিতে এ কি হল ;
অথরে চুঘিতে, পূর্ণিমার চাঁদ,
আকাশে মিশিরা গেল ।

(সখি) হইতাম যদি, বন বিহঙ্গিনী,
উড়িতাম তার তরে ;

(আমি) হইতাম সখী, বারেক নিরখি,
সেই পূর্ণ লশধরে ।

১২

সখিরে, আমি ছেন অভাগিনী,
এ পাপ পরশ, সছেনা সে দেখে,
হায় আগে নাছি জানি !

(আহা !) পাই যদি পুনঃ সেই স্রগাকরে,
দেখিরা সুচাই ক্ষুধা ;

(আমি) দূর হতে সই, চকোরের মত,
খাই সে মুখের স্রধা !

১৩

সখিরে, পাসরিয়া ভয় লাজে ;
যোগিনী হইয়া বেড়াইব সখি,
গহন কানন মাঝে ।

(সখি) কখন কাঁদিব, কখন হাসিব,
কতু পড়ি ধরাতলে ;

(আমি) নথরে কাটিয়া, সরোবর সই,
ভরিব নয়ন জলে !

১৪

সখিরে, সেই সরোবর মাঝে ;
কুমুদিনী হয়ে, বেড়াব ভাসিয়ে,
দেখিতে সে দ্বিজরাজে ?

(আমি) আকাশের পানে, থাকিব চাহিয়া,
ঐরূপ করিব ধ্যান ;

(সখি) না পাইলে তারে, অগাধ সলিলে,
ভুবিয়া তাজিব প্রাণ !

১৫

সখিরে, কি কাজ বিলম্ব করি ?
আর এক পথ, আছেহরে আমার,
শোন তবে সহচরি ।

(সই) সাজাইরা চিত্তা, জ্বলন্ত অনলে,
পাপ দেহ কর ছাই ;

মনের আশুন, মিশিবে আশুনে,
(আমার) বেঁচে থেকে কাজ নাই !

১৬

সখিরে, সেই স্রুথের শ্মশান পরে ;
অশোক বকুল, তমালের তরু,
রোপিস্ যতন করে ।

(যখন) পথিক আসিয়ে পথশ্রান্ত হয়ে,
বসিবে সে তকতলে ;

(তখন) কহিস “ এখানে, বঙ্গের বিধবা,
পুড়িয়াছে চিত্তামলে ! ” (পথিক)

জীবনপ্রভাত।

দশম পরিচ্ছেদ।

আশা।

“মুদি পোড়া আঁধি বসি রসালের তলে,
ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি পাইব সত্তরে
পাদপদ্ম! কাঁপে হিয়া হুক হুক করি
শুনি যদি পদশব্দ”

মধুসূদন দত্ত।

যেদিন রঘুনাথ তোরণদুর্গে আসিয়াছিলেন, যেদিন তাঁহার হৃদয় উন্মত্ত ও উৎক্লিষ্ট হয়, সেইদিন প্রথমপ্রেমের আনন্দঘরী লহরীতে আর একটি বালিকা-হৃদয় ভাসিয়া গিয়াছিল। ছাদে সঙ্কার সময় যখন সয়-যুর দৃষ্টি সহসা সেই তরণ যোদ্ধার উপর পতিত হইল, বালিকার হৃদয় যেন সহসা অজ্ঞাতপূর্ব্বে উদ্বেগে চমকিল ও স্তম্ভিত হইল। আবার চাহিলেন, আবার সেই উদার বদন মণ্ডল, সেই উন্নত তরণ যুদ্ধ-বেশধারী অবয়ব দেখিলেন, প্রথমপ্রেমের তরঙ্গবেগে বালিকার হৃদয় উৎক্লিষ্ট হইতে লাগিল।

সেই উদ্বেগ-পরিপূর্ণ হৃদয়ে রঘুনাথকে ভোজর করাইতে বাইলেন, পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দেব-বিনিম্বিত অবয়বের দিকে চাহিয়া রহিলেন, সময়ে সময়ে স্পন্দন

হইয়া একেবারে চকিতের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। আবশ্যিকমতে সম্মুখে আসিলেন, প্রেমবিন্দুকা বালিকা তখনও নয়ন কিরাইতে পারিলেন না; যখন চারিচক্ষুর মিলন হইল, তখন লজ্জারত-বদনা দীয়ে দীয়ে সরিয়া আসিলেন।

সরিয়া আসিলেন, কিন্তু হৃদয়ে সূতন একটি ভাব উদয় হইল। রঘুনাথ তাঁহারদিকে সোহেগে দৃষ্টি করিলেন কেন? রঘুনাথ এরূপ বিচলিত-চিত্ত হইয়া ভোজনর কহিতেছেন কেন? তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাস কি জন্য? হস্ত কাঁপিতেছে কি জন্য? জগদীশ্বর! ঐ দেবপুরুষ কি এই অভাগিনীকে মনে স্থান দিয়াছেন?

পরদিন আবার সেই তরণ যোদ্ধাকে দেখিলেন, আবার হৃদয়, মন, প্রাণ সেই দিকে ধাবমান হইল। যখন বিদায় লইয়া যোদ্ধা অঞ্চলত হইয়া চলিয়া গেলেন, সয়-যুর প্রাণটিও লইয়া লেগেন, কেবল দেহ-মাত্র প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তির ত্রায় সেই মন্দিরে দণ্ডায়মান রহিল। যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন, পুরুষের মন উচ্চাভিলাষে যুদ্ধ-উল্লাসে স্ফীত হইতে লাগিল; রমণী একাকী গাবাক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া নিঃশব্দে দর-বিগলিত ধারার অশ্রু বিমো-

চন করিতেছিলেন, তাঁহার হৃদয় নিঃশব্দে
বিদৌর্গ হইতেছিল।

বালিকা একথা মুখ কুটিয়া বলিলে
কিরূপে, এ মৰ্মভেদী দুঃখ জানাইবে কা-
হার কাছে ?

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বালিকা গবাক্ষপার্শ্বে
দণ্ডায়মান রহিলেন। অর্ধ ও অর্ধারোহী
অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বালিকা
নিম্পন্দে সেইদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন।
দিবালোকের পর্কতমালা অনেকদূর প-
র্ষ্যন্ত দেখা যাইতেছে, তাহার উপর, যত-
দূর দেখা যায়, পর্কত-রূক্ষ সমুদ্রের লহ-
রীর মত বায়ুতে তুলিতেছে। উপরে পর্কত-
শূল হইতে স্থানে স্থানে জলপ্রপাত পতিত
হইতেছে, সেই স্বচ্ছজল নদীরূপে বহিয়া
যাইতেছে। নীচে স্রন্দর উপত্যকায় গ্রা-
মের কুটীর দেখা যাইতেছে, স্রন্দর হরিদ্বর্ণ
ক্ষেত্র সমস্ত দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্য
দিয়া পর্কত-কন্ডা তরঙ্গিনী ধীরে ধীরে ব-
হিয়া যাইতেছে, ও মেঘ বিবর্জিত সূর্য্য এই
স্রন্দর দৃশ্যের উপর দিয়া আপন আলোক-
ছিন্নাল আনন্দে গড়াইয়া দিতেছেন। কিন্তু
সরসু এ সমস্ত দেখিতেছিলেন না, তাঁহার
মন এ সমস্ত দৃশ্যে ন্যস্ত ছিল না। তিনি
কেবল একমাত্র পর্কতপথের দিকে চা-
হিয়াছিলেন, তাঁহার মন সেই দিকে প্র-
ধাবিত হইয়াছিল। চাহিয়া চাহিয়া বা-
লিকা আর কিছু দেখিতে পাইলেন না ;
তাঁহার নয়ন পুনরায় জলে আধুত হইল,
শীতলই অব্যাহত ধারা বহিয়া গও ও বন্ধঃ-

স্থল সিক্ত করিল। বালিকার হৃদয় বি-
দৌর্গ হইতেছিল।

শূভ্র-হৃদয়ে সরসুবালা সংসারকার্য্যে
নিরোজিত হইলেন ; স্নেহময়ী কন্ডা পি-
তার শ্রম্ভায় ব্যাপ্ত হইলেন, তাঁহার
হৃদয়ের চিন্তা অব্যক্তব্য ও অব্যক্ত, প্রকুল
মুখখানি কেবল ঈষৎ স্নান, ধীরে ধীরে
পূর্কের ত্রায় কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ঈ-
র্ষ্যই রমণীর প্রধান গুণ, ঈর্ষ্যই রমণী বা-
ল্যকাল অবধি অভ্যাস করেন। এই
বিষয় সংসারের নানা শোক দুঃখে, পী-
ড়ায়, যাতনায়, বিষয় উষেগে, সকল সম-
য়েই নারী ঈর্ষ্যাধারণ করিয়া সংসারকার্য্য
নির্ব্বাহ করেন। অসহ্য শোকযাতনা
হৃদয়ে গোপন রাখিয়া হাস্যমুখী স্বামীর
সেবা করেন, দুর্ব্বহনী পীড়া তুচ্ছ করিয়া
স্নেহময়ী সযত্নে সন্তানকে লালন পালন
করেন। শুনিয়াছি, পুরাকালে তাপসেরা
ইন্দ্রিয়সুখ তুচ্ছ করিতেন, হেলায় সহস্র
যাতনা সহ্য করিতেন। কিন্তু যখন আমি
সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করি, প্রেমময়ী
রমণীকে সহস্র যাতনা, সহস্র দুঃখ, সহস্র
অপমান সহ্য করিয়াও স্বামীর দিকে এক-
নিবিচ্ছিন্ন থাকিতে দেখি ; যখন স্নেহ-
ময়ী জননীকে পীড়া, দারিদ্র্য, সংসারের
অসংখ্য ও অসহ্য যজ্ঞণা হেলায় সহ্য ক-
রিয়া পুত্র কন্ডাদিগকে সযত্নে লালন পা-
লন করিতে দেখি, তখন আমি তাপস-
দিগের কথা বিন্মুত হই, সংসারের মধ্যে
গৃহস্থিনী তাপসীদিগের সঙ্কল্পতা দেখিয়া

বিস্মিত হইল। সরস্বতী রমণী, স্নাতক
বাল্যকাল হইতে সহগুণ অভ্যাস করিয়া-
ছিলেন; নিঃশব্দে পিতার শুক্রবা করিতে
লাগিলেন, সংসারের কার্য নিরীহ ক-
রিতে লাগিলেন, হৃদয়ের উদ্বেগ নিঃশব্দে
হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন।

সারংকালে পিতার ভোজনের সময়
নিকটে বসিলেন; স্বহস্তে পিতার শয্যা
রচনা করিয়া দিলেন, পরে ধীরে ধীরে
আপন শয়নাগারে যাইলেন, অথবা সেই
নিশ্চল রজনীতে পুনরায় ধীরে ধীরে সেই
গবাক পাশে বসিয়া নিঃশব্দে উপবেশন
করিয়া রহিলেন।

পুনরায় প্রভাত হইল, পুনরায় দিন
গতে সন্ধ্যা হইল, সপ্তাহ অতীত হইল,
মাসকাল অতিবাহিত হইল, সে তরুণ-
যোদ্ধা আর আসিলেন না, তাঁহার কোন
সংবাদও আসিল না। সরস্বতী সেই
পূর্বতপস্বী চাহিয়া রহিলেন।



একাদশ পরিচ্ছেদ।

চিন্তা।

“এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহারি,
ফেলি দূরে বর্ষা, চর্ষা, অসি, ভূগ, ধনু,
তাজি রথ, পদব্রজে এস মোর পাশে।”

মধুসূদন দত্ত!

জনার্দন স্বভাবেই সরলস্বভাব লোক
ছিলেন, সমস্ত দিন শান্তাশীল বা দেব-
পূজার রত থাকিতেন, প্রভাতে ও সারং-

কালে কিন্নাদারের নিকট সাক্ষাৎ ক-
রিতে যাইতেন, কদাচ বাটীতে থাকি-
তেন। তিনি একমাত্র কস্তাকে অতিশয়
ভাল বাসিতেন, ভোজনের সময় কন্যাকে
নিকটে না দেখিলে তাঁহার আহ্বার হইত
না, রজনীতে কখন কখন শাস্ত্রের গম্প
বলিতেন, সরস্ব বসিয়া শুনিতেন। এত-
স্তির প্রায়ই আপন কার্যে রত থাকিতেন;
কস্তাও পূর্ববৎ পিতার সেবা করিতেন,
গৃহকার্য সম্পাদন করিতেন, তাঁহার হৃদ-
য়ের চিন্তা ও কখন কখন ঈশ্বর জ্ঞান মুখ-
খানি জনার্দন লক্ষ্য করেন নাই।

বালিকার হৃদয়ে সহসা যে ভাবগুলি
উদয় হয়, তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না;
একদিন সন্ধ্যাকালে ও একদিন প্রাতে
সরস্বর হৃদয়ে সহসা যে ভাবের উদ্ভেক
হইল, তাহা এক সপ্তাহে বা এক মাসের
মধ্যেই বিলুপ্ত হওয়াই সম্ভব। যদি সর-
স্বর মাতা থাকিত, বা ছোট ছোট ভগ্নী
বা খেলিবার সঙ্গিনী থাকিত, বা জ্ঞাত
কুটুম্ব অনেকে থাকিত, তবে সেই মাতাকে
দেখিয়া বা খেলার রত হইয়া সেই নব-
ভাব বিস্মরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু
সরস্ব জন্মাবধি একাকিনী, পিতা ভিন্ন
তিনি আপনার লোক কাহাকেও কখন
দেখেন নাই, কাহাকেও জানিতেন না,
স্নাতক বাল্যকাল অবধিই ধীর, শান্ত, চি-
ন্তাশীল। প্রথমযৌবনে যে রূপ দে-
খিয়া সহসা সরস্বর হৃদয় আলোড়িত হ-
ইল, মন উদ্ভূত হইল, অপূর্ব সুখের উ-

জ্যাস হইল, সরযু এখন সেই চিন্তায় মগ্ন হইলেন ; দিনে, সায়ংকালে, প্রাতঃতে, সেই চিন্তা করিতেন, সুতরাং সে বিলুপ্ত না হইয়া ক্রমেই হৃদয়ে গভীরাক্রিত হইতে লাগিল ।

সে চিন্তা কি ? সরযু সেই তরুণ সো-নাপতির চিন্তা করিতেন । তিনি একদিনে যুদ্ধের উল্লাসে মগ্ন হইয়াছেন, দুর্গ হস্তগত করিতেছেন, শত্রু ধ্বংস করিতেছেন, বিক্রম ও বাহুবলে বীরনাম ক্রয় করিতেছেন, এখন কি আর এ অভাগিনীকে স্মরণ আছে ? চিরকাল আমাকে স্মরণ রাখিবেন, বলিয়াছিলেন সে কথা কি এখন মনে আছে ? পুরুষের মন ! নানা কার্য, নানা চিন্তা, নানা শোক, নানা উল্লাসে সর্বদাই পরিপূর্ণ থাকে । জীবন আশাপূর্ণ, অদ্য এই কার্য সাধন করিব, কল্য অপার কার্য সিদ্ধ করিব, এইরূপ নানা আশায় অতিবাহিত হয় । আশা ফলবতী হউক আর নাই হউক, জীবন সর্বদা উল্লাসপূর্ণ থাকে । রাজদ্বারে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শোকগৃহে বা নাট্যশালায়, নানা কার্যে নানা চিন্তায় হৃদয় পূর্ণ থাকে ! কিন্তু অভাগিনী নারীর কি আছে ? প্রেম আমাদের জীবন, প্রেম আমাদের জগৎ ; জীবিতেশ্বর ! সেটিতে যেন নৈরাশ করিও না ! ধীরে ধীরে এক বিলুপ্ত জল সরযুর গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িল ।

আবার চিন্তা আসিত;—তরুণ যোদ্ধা কি এখনও এ অভাগিনীর কথা ভাবেন ?

একালে এ বয়সে কি তাঁহার মন স্থির আছে ? হায় ! নব নব আনন্দে আমার কথা অনেক দিন বিস্মৃত হইয়াছেন ! তাঁহার রমণীর অভাব কি ? সুরেশ্বর অভাব কি ? নবীন যোদ্ধা এতদিনে অভাগিনীকে বিস্মৃত হইয়াছেন ! হায় ! নদীর উর্ধ্ব পার্শ্বস্থ পুষ্পটীকে লইয়া ক্ষণকাল খেলা করে, পুষ্প আনন্দে নাচিয়া উঠে, তাহার পর উর্ধ্ব কোথায় চলিয়া যায়, পুষ্পটি শুকাইয়া যায়, কিন্তু জল আর ফেরে না ! আমাদের হৃদয়, আমাদের জীবন, পুরুষের খেলার দ্রব্য । মুহূর্ত্তে তাহাদের খেলা সাক্ষ হয়, পরে রমণীর সমস্ত জীবন খেদ ও দুঃখপূর্ণ ! নীরবে সরযু আর একবিন্দু জল মোচন করিলেন ।

নিশীথে যখন সেই উন্নত দুর্গ ও চারিদিকে পর্কতমালা চন্দ্রের সুরধাকিরণে নিস্তন্ধে সুপ্ত হইত, তখন নীল আকাশ ও শুভ্র চন্দ্রেরদিকে চাহিতে চাহিতে বালিকার হৃদয়ে কত ভাব উদয় হইত, কে বলিবে ? বোধ হইত যেন, সেই পর্কত-পাথ দিয়া একজন নবীন অশ্বারোহী আসিতেছেন, অশ্ব শ্বেতবর্ণ, আর্বোহীর সেইরূপ গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ ললাট ও নয়ন দ্বয়ং আয়ত করিয়াছে ! যেন দুর্গে আসিয়া অশ্বারোহী অবতরণ করিতেন, যেন তাঁহার মস্তকে সুরবর্ণ-খচিত শিরক্ৰাগ, বলিষ্ঠ সুরগোল বাহুতে সুরবর্নের বাজু, দক্ষিণ হস্তে সেই দীর্ঘ রথী ! যেন যোদ্ধা আবার আহার করিতে বসিলেন, সরযু তাঁহাকে ভো-

জন করাইতেছেন; অথবা রজনীতে সেই ছাদে সরযু সেই যোদ্ধার হস্ত ধারণ করিয়া একবার মনের কথা খুলিয়া বলিতেছেন, হৃদয় ভরিয়া একবার কাঁদিতেছেন। যোদ্ধার প্রশান্ত শীতল বক্ষে সরযু মুখ খানি লুকাইয়া একবার প্রাণভরে কাঁদিতেছেন! উঃ! সে দিন কি কখন আসিবে? সে আনন্দময় প্রতিমাকে কি সরযু আর দেখিতে পাইবে?

চিত্তার শেষ নাই, অগাধ সমুদ্রের হিল্লোলের ন্যায় একটির পর আর একটি আইসে, তাহার পর আর একটি। সরযু আবার ভাবিলেন যেন যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তরুণ সেনাপতি বহু খাতি লাভ করিয়াছেন, বড় উপাধি পাইয়াছেন, কিন্তু সরযুকে ভুলেন নাই। যেন পিতা তাঁহার সহিত সরযুকে বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন, যেন ঘর লোকে পরিপূর্ণ, চারিদিকে দীপালোক জ্বলিতেছে, বাজ্য বাজিতেছে, গীত হইতেছে, আর কত কি হইতেছে সরযু জানেন না, ভাল দেখিতে পাইতেছেন না। যেন সরযু কল্পিত-কলেবরে সেই দেব প্রতিমূর্তির নিকট বসিলেন, যেন যুবকের হস্তে আপন স্বেদাক্ত কল্পিতহস্তটি রাখিলেন, যেন রজনীতে সেই জীবিতেশ্বরকে পাইলেন। উঃ! আনন্দে বাসিকা-হৃদয় স্কীত হইতেছে, তিনি আনন্দাশ্রু সঞ্চরণ না করিতে পারিয়া সেই বীরের শীতল হৃদয়ে মস্তক স্থাপন করিয়া মুহূর্ত্ত ক্রন্দন করিতেছেন। সরযু! পাগলিনী হইও না।

আবার চিন্তা আসিল। রঘুনাথ খ্যাতিপন্ন হইয়েন নাই, রঘুনাথ উপাধি প্রাপ্ত হইয়েন নাই, রঘুনাথ দরিদ্র, কিন্তু সরযু সেই পরম ধনকে পাইয়াছেন। পর্বতের নীচে ঐ যে সুন্দর উপত্যকা দেখা যাইতেছে, যেখানে শান্তবাহিনী নদী চন্দ্রালোকে ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, যেখানে হরিষর্গ সুন্দর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র চন্দ্রালোকে সুষ্পষ্ট রহিয়াছে, ঐ রমণীয় স্থানে অনেকগুলি কুটীরের মধ্যে যেন একটি ক্ষুদ্র কুটীর সরযুর! যেন দিব্যবসানে সরযু স্বহস্তে রত্ননকার্য্য সমাপন করিয়াছেন, যেন যত্নপূর্ব্বক জীবিতনাথের জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, কুটীর সম্মুখে সুন্দর হর্ষার উপর বসিয়া রহিয়াছেন, পার্শ্বে শিশুসন্তান ক্রীড়া করিতেছে। যেন সরযু দূর ক্ষেত্রের দিকে চাহিতেছেন, যেন সেই দিক হইতে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর একজন দীর্ঘকায় পুরুষ কুটীর অভিমুখে আসিতেছেন। সরযুর হৃদয় হতা করিয়া উঠিল, শিশুসন্তানকে জোড়ে করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, যেন সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ আসিয়া প্রথমে শিশুকে, পরে শিশুর মাতাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন। উঃ! সরযুর মস্তক ঘুরিতে লাগিল, সরযু ধন মান চাহে না, স্বর্ণ রৌপ্য চাহে না, খ্যাতি পদ চাহে না; ভগবন্! সরযুকে সেই ক্ষুদ্র কুটীর, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠী দাও।

গভীর নিশীথে শান্ত হইয়া সরযু

সেই ছাদে স্তম্ভ হইয়া পড়িলেন ; অনেকক্ষণ নিত্রা যাইলেন ; ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন । দেখিলেন ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্র, সহস্র মোগল সহস্র মহারাষ্ট্রীয়ের হিন্ন মস্তক বা হিন্ন বাহু পতিত রহিয়াছে, ক্ষেত্র রক্তে আৱৃত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে সেই নবীনবোদ্ধা পড়িয়া রহিয়াছেন ! যোদ্ধার বক্ষঃস্থল হইতে রক্তস্রোত বহির্গত হইতেছে ও উজ্জ্বলতাপূর্ণ, নয়নদ্বয় সরস্বতী দিকে চাহিয়া রহিয়াছে । সরস্ব শিহরিয়া চীৎকার শব্দে জাগরিত হইলেন, দেখিলেন সূর্য্য উদয় হইয়াছে, তাঁহার সমস্ত শরীর ঘর্ষাক্ত, ও এখনও কাঁপিতেছে, তাঁহার দীর্ঘ কেশপাণ, বাহু স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের উপর আশুল্লঃসিতরূপে রহিয়াছে ।

এইরূপে এক মাস, দুইমাস তিন মাস অতিবাহিত হইল, কিন্তু সে নবীনবোদ্ধা আর আসিলেন না । গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসিল, তাহার পর স্নান্দর শরৎকাল শুভ্রচন্দ্র ও তারাৱলীকে সঙ্গে লইয়া যেন জগৎকে স্রষ্টাপূর্ণ ও শান্ত করিল, কিন্তু সরস্বতী গুণ্ডন শান্ত হইল না । শীত আসিল, চলিয়া গেল, আবার মধুময় বসন্তকাল আসিল, পুষ্পগুলি দেখা দিল, বৃক্ষে বৃক্ষে পত্র মঞ্জরিত হইল কিন্তু পূর্ববসন্তে সরস্ব যে মধুময়ী স্মৃতি দেখিয়াছিলেন, মধুকালের সহিত তিনি আর ফিরিয়া আসিলেন না ।

বৎসরকাল অতীত হইল, সরস্ব সেই পর্ব্বত-পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন,

কিন্তু সে পথে সে নবীনবোদ্ধা আর দেখা দিলেন না ।

ষাদশ পরিচ্ছেদ ।

নৈরাশ ।

“বিবাদে নিখাস ছাড়ি পড়ি ভূমিতলে
হারাই সতত জ্ঞান ; চেতন পাইয়া
মিলি যবে আঁধি, দেখি তোমার সম্মুখে !”
মধুসূদন দত্ত ।

কয়েক মাসের চিন্তার অবশেষে সরস্বতীর শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, মুখ স্নান হইল, নয়নদুটী দ্বয়ং কালিমাৱেষ্টিত হইল। যে লাবণ্য দেখিয়া দুর্গের সকলেই গিম্বিত হইতেন, সে অপূর্ব্ব প্রফুল্ল লাবণ্য আর নাই ; শরীর শীর্ণ, ওষ্ঠদুটি শুষ্ক, নয়নের প্রফুল্ল জ্যোতিঃ হ্রাস পাইয়াছে । শরীরে যত্ন নাই, মনেও প্রফুল্লতা নাই । জনার্দন সময়ে সময়ে সন্মুখে জিজ্ঞাসা করিতেন “সরস্ব ! তোমার শরীর কাহিল হইতেছে কেন ?” অথবা “সরস্ব ! তোমার খাওয়া দাওয়ার কচি নাই কেন ?” কিন্তু সরস্ব উত্তর দিতেন না, পিতা কিছু না জানিতে পারেন, এই জন্য দৈৱকাম্য করিয়া অন্য কথা আনিতেন, স্মৃতাংশ সরল-স্বভাব জনার্দন কিছুই জানিতে পারিলেন না ।

কিন্তু অগ্নি বস্মারূত হইলে সেই বস্মকে দাহ করে, যত্নসঙ্কোপিত চিন্তা সরস্বতীর হৃদয় শুরে শুরে দহু করিতে লাগিল । শরীর আরও অবসন্ন হইতে লা-

গিল, বদন-মণ্ডল পাণ্ডুবর্ণধারণ করিল, চকুধর কোটর-এবিষ্ট হইল, বালিকার শরীর আর সঙ্ক করিতে পারিল না, সরযু সঙ্কটজনক পীড়াক্রান্ত হইলেন। ভীষণ জ্বরে শরীর দগ্ধ করিতে লাগিল, বালিকা জ্বালার অস্থির হইয়া “জল” “জল” করিতে লাগিল, অথবা সময়ে সময়ে অজ্ঞান হইয়া নানারূপ কথা কহিতে লাগিল।

জনার্দন যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন, কিন্তু কারণ জানিতেন না। শারীরিক পীড়ামাত্র বিবেচনা করিয়া এসিদ্ধ চিকিৎসকদিগকে আনয়ন করিয়া কন্যার চিকিৎসা করাইলেন।

বালিকার অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া চিকিৎসকেরাও ভীত হইল। বালিকার শরীর কখন কখন ঘর্মে আধুত হইত, কখন বা শীতে কটকিত হইয়া উঠিত। সর্বদাই অজ্ঞান অবস্থায় থাকিত, নানারূপ কথা উচ্চারণ করিত, কিন্তু তাহা এরূপ ভীত ও অস্পষ্ট যে কিছুই বুঝা যায় না।

হৃদয় রক্তশূন্য অঙ্গুলীগুলি সর্বদাই নড়িত, কখন কখন বালিকা বাহু প্রসারণ করিত, সময়ে সময়ে শিহরিয়া উঠিত, সময়ে সময়ে চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিত।

উঃ! সেই রোগীর মনে কত সময়ে কত রূপ চিন্তার উদ্বেগ হইত, তাহার স্বপ্নে কত রূপ আকৃতির আবির্ভাব হইত, তাহা কে বলিবে?

কখন সন্ধ্যুখে বিভীর্ণ মকভূমি দেখিত,

বালুকারণি ধু ধু করিতেছে, হৃদয়ের প্রথর তাপে সে বালুকা উত্তপ্ত হইয়াছে, সেই মকভূমিতে সেই রৌদ্রে বালিকা একাকী গমম করিতেছে। উঃ! তৃষ্ণায় যুক ফাটনা যাইতেছে; জল! জল! এক বিলু জল দিয়া প্রাণ রক্ষা কর, গাত্রচর্ম দগ্ধ হইতেছে, জল! জল! জল! সে মকভূমিতে রক্ষা নাই, গ্রাম নাই, কেবল তপ্ত বালুক', সরযুর পদ দগ্ধ হইতেছে।

আকাশে মেঘ নাই, অথবা বাহা আছে তাহাতে উত্তাপ অধিকতর বৃদ্ধি করিতেছে! সরযুকে কে জল দিবে? সন্ধ্যা অট্টহাস্য শুনা যাইল, সরযু সেই আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, রঘুনাথ তাঁহার কন্ঠে দেখিয়া বিজ্ঞপ করিয়া হাসিতেছেন; বালিকা ক্রোধে ওখেদে তর্জন করিয়া উঠিল। সুরুরোগী চীৎকার করিয়া উঠিল, চিকিৎসকগণ ভীত হইল।

আবার স্বপ্ন দেখিল। নিবিড় বন, অন্ধকার, জনশূন্য! সেই বনের মধ্য দিয়া সরযু বেগে পলাইতেছে, একটা ব্যাজ তাঁহার পশ্চাৎবর্তমান হইতেছে। চীৎকারশব্দ করিয়া সরযু পলাইতেছে, তাঁহার শব্দে বন প্রতিশ্রুতি হইতেছে, বনের কটকে শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, পদযুগল ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, কিন্তু ভয়ে দাঁড়াইতে পারে না। উঃ! শরীর জ্বলিতেছে, পা জ্বলিতেছে, এ জ্বালা কিছুতে নিবারণ হয় না? সন্ধ্যা সন্ধ্যুখে কি দেখিল? দেখিল সেই পুকবর্জিত সন্ধ্যুখে দ-

গায়মান রহিয়াছেন, ভীত সরষুকে বাম-
হস্তে রক্ষা করিলেন, দক্ষিণহস্ত চালনার
খজাঘারা ব্যাক্রমে ধরাশায়ী করিলেন।
উঃ! সরষুর প্রাণ শীতল হইল; আন্ত
রোগীর অস্থিরতা নিবারণ হইল, রোগী
গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। চিকিৎ-
সকগণ এই মূলক্ষণ দেখিয়া সে দিন
চলিয়া গেলেন।

এইরূপে প্রায় একমাস পর্য্যন্ত সরষু
রোগগ্রস্ত ও অজ্ঞান হইয়া রহিল। সময়ে
সময়ে রোগের এরূপ তীব্রতা হইত যে
চিকিৎসকেরাও জীবনআশা ত্যাগ ক-
রিতেন। জনার্দন স্ত্রীর মৃত্যু অবদি এক-
রূপ উদাসীন হইয়াছিলেন, শাস্ত্রামুশী-
লনে ও পূজাকার্য্যেই রত থাকিতেন, এক
দিনের জন্তও শাস্ত্রপাঠে নিরত থাকিতেন
না। কিন্তু অল্প সংসারের মায়া কাহাকে
বলে বুঝিলেন; বুদ্ধ নিরানন্দে সেই শ-
যার নিকট বসিয়া থাকিতেন, স্নেহময়ী
কস্তুর জন্ত হৃদয় শোকে উত্থিত হই-
তেন, সেই কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া
থাকিতেন, নিশীথে অনিদ্র হইয়া তাহার
শুশ্রূষা করিতেন। অনেক দিনে, অনেক
বড়ে, ক্রমে ঐযদি সেবনে রোগের উপ-
শম হইতে লাগিল; অনেক দিন পরে স-
রষু শয্যা হইতে উঠিলেন, অন্ন আহার ক-
রিলেন, এ দিক ওদিক পদচারণ করিতে
সমর্থ হইলেন, কিন্তু ওখন বদন-মণ্ডল এ-
কেবারে পাণ্ডুবর্ণ, শরীরে যেন রক্ত নাহি
কিছুই নাই।

রজনী একপ্রহর হইয়াছে, ক্ষীণ দু-
র্বল সরষু ছাদে উপবেশন করিয়া শ্রীম-
কালের মন্দ মন্দ নৈশ বায়ু সেবন করি-
তেছেন। তিনি এখনও অতিশয় ক্ষীণ, শ-
রীরের জ্বালা এখন ও সম্পূর্ণরূপে যায় নাই, এই
জনাই বায়ুসেবন করিতে ভাল বাসিতেন।

ধীরে ধীরে গত শ্রীম্মের কথা মনে
আসিতে লাগিল, যে যুবক তাঁহাকে রুখা
আশা দিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারই কথা
মনে আসিতেছিল। চিন্তার তীব্রতা এ-
খন নাই, কেননা শরীর অতি দুর্বল, চি-
ন্তাশক্তিও দুর্বল। যেমন মন্দ মন্দ গতিতে
সরষু পদচারণ করিতে পারিতেন, তাঁহার
চিন্তাশক্তিও সেইরূপ ধীরে ধীরে পূর্ব
বৎসরের কথা জাগরিত করিতেছিল।

নিশির মন্দ মন্দ বায়ুতে যেন ধীরে
ধীরে পূর্বস্মৃতি আনিতে লাগিলেন;
গলদেশে সেই কণ্ঠমালা হুলিতেছিল,
সেইটার দিকে দেখিতে লাগিলেন। দে-
খিতে দেখিতে একবিন্দু জল শুষ্ক গণ্ডস্থল
দিয়া গড়াইয়া পড়িল; তাহিলেন “ যদিও
তিনি আমাকে বিস্মৃত হইয়াছেন, আমি
কি তাঁহাকে ভুলিতে পারি? যতদিন
জীবিত থাকিব, এই কণ্ঠমালা সময়ে হৃদয়ে
ধারণ করিব।” আর এক বিন্দু জল গ-
ড়াইয়া পড়িল, কণ্ঠমালা দিবার সময় যে
মিষ্ট কথাগুলি রঘুনান্ন বলিয়াছিলেন
তাঁহা স্মরণ হইল; রঘুনান্নের মুখখানি
মনে পড়িল; বোধ হইল, যেন রঘুনান্ন সেই
মিষ্টম্বরে আবার ডাকিলেন “ সরষু!”

সরযু শিহরিয়া উঠিলেন, পরে খেদে অল্প হাসিয়া ভাবিলেন “ হায়! আমি জ্ঞান হারাইলাম না কি? সকল সময়ে তাহাকে দেখিতে পাই, এখনই বোধ হইল যেন তিনি সেই মিস্ট্রের আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। ভগবন্! এবি-ডব্বনা কেন!”

আবার সেই কোকিল-বিনিন্দিত শব্দ শুনিতে পাইলেন—“ সরযু!” সরযু চমকিত হইয়া পশ্চাৎদিকে চাহিলেন, দেখিলেন—রঘুনাথ!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মিলন।

“দৈশিব প্রেমেরস্বপ্ন জাগি হে দুঃসনে!”

মধুসূদন দত্ত।

দেখিতে দেখিতে রঘুনাথ নিকটে আসিলেন, সহসা নত হইয়া সরযুর পদ-যুগল ধরিয়া বলিলেন “ সরযু! আমাকে ক্ষমা কর, আমার মত পাতকী এ জগতে নাই, কিন্তু তুমি আমাকে মার্জনা কর।” রঘুনাথের চক্ষুজলে সেই পদযুগল সিক্ত হইল।

আনন্দে, বিস্ময়ে, লজ্জায় সরযু বাকু-শূন্য হইলেন, রঘুনাথকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন। আর কি করিলেন, তিনি জ্ঞা-যেন না; আনন্দে তাঁহার শরীর বায়ুতা-ড়িত পত্রের মত কাঁপিতে ছিল। বাঁহার প্রেমময় মুখখানি এক বৎসর অবধি চিন্তা

করিতেছিলেন, বাঁহার উপর হৃদয়, মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, জগদীশ্বর! সরযু কি সেই হারাধন ফিরিয়া পাইলেন?

রঘুনাথ পুনরায় কল্মিতস্বরে বলিলেন “ সরযু! তুমি আমার চিন্তা করিয়াছিলে, তুমি পীড়িত হইয়াছিলে, সেই পীড়ায় তুমি আমার নাম করিয়াছিলে;— আর আমি,—আমি কোথায় ছিলাম? সরযু এ পারিপার্শ্বকে কি তুমি মার্জনা করিতে পার?” সরযু চাহিয়া দেখিলেন— চন্দ্রালোকে দেখিলেন, সেই কৃষ্ণকেশ-শো-ভিত, উদার দেবনিন্দিত মুখখানি সিক্ত, —সেই ভ্রমরনিন্দিত নয়ন হইতে অশ্রু বহিয়া পড়িতেছে! সরযুর নয়নও শুষ্ক রহিল না।

রঘুনাথ আবার বলিলেন “ উঃ! ঐ পাণ্ডু-বদন দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে; আমি তোমাকে কত শোক দিয়াছি; তুমি আমাকে কি মনে করিয়াছিলে?” পরে ধীরে ধীরে আপন বক্ষের উপর সরযুর হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, “ কিন্তু সরযু! যদি তুমি এই হৃদয়ের ভাব জানিতে, দিবাভাগে, নিশীথে, শি-বিরে, ক্লেবে, যুদ্ধমধ্যে ঐ দেবী-বিনিন্দিত যুক্তি কত তাবিয়াছি যদি জানিতে, তবে বোধ হয় তোমাকে যে দাক্ষণ কষ্ট দিয়াছি তাহাও মার্জনা করিতে। জগদীশ্বর! আমি কি জানিতাম যে সরযুবালা এ অ-ভাগীর জন্য চিন্তা করেন, এ অভাগাকে মনে রাখিয়াছেন?”

পরম্পর পরম্পরের দিকে চাছিলেন, চারিচক্র মিলন হইল, চারি চকুই জলে ছল ছল করিতেছে, উভয়ের হৃদয় স্পর্শিত হইতেছে, সরসুর দুইটা হাত রঘুনাথ স্ব-হস্তে ধারণ করিয়াছেন, উভয়ের হৃদয় পরিপূর্ণ, মুখে আর বাক্য নাই; মন,প্রাণ, হৃদয়ের বেগবতী চিন্তা যেন সেই সজল ময়নে প্রকাশ পাইতেছে ।

চন্দ্র ! রঘুনাথ ও সরসুর উপর সুরধাব-বর্ষণ কর, তুমি নিশীথে জাগরণ করিয়া সকল দেখিতে পাও, কিন্তু জগতে এরূপ দৃশ্য আর দেখ নাই । তবু বয়সে যখন মন প্রথম প্রেমোন্মাদে উৎকণ্ঠ হয়, যখন নবজাত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় নবজাত প্রেমের আনন্দ-হিচ্ছোল মানসজগতে গড়াইতে থাকে, যখন বহুবিন্দুদের পর পরম্পর পরম্পরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া উদ্ভূত প্রায় হয়, যখন পরম্পরের প্রেমে আনন্দিত হইয়া উভয়ে জগৎ বিস্মৃত হয়, স্থান কাল বিস্মৃত হয়, দোষ গুণ বিস্মৃত হয়, নীচে পৃথিবী, উপরে আকাশ বিস্মৃত হয়, — কেবল সেই প্রণয়ন্থ ভিন্ন সমুদয় বিস্মৃত হয়, — তখন, তখনই যেন এ জগতে ইন্দ্র-পুরী অবতীর্ণ হয় ।

চন্দ্র ! আরও সুরধা বর্ষণ কর । বায়ু ! ধীরে ধীরে বহিয়া যাও, এরূপ সুরধার স্থানে তুমি কখনও বহিয়া যাও নাই । সরসু অশুচিত কার্য্য করিতেছেন তাহা জানেন না, অজাত পুকুরের হস্ত ধারণ করিয়া আছেন তাহা জানেন না ; কেবল

যে মুক্তি এক বৎসরকাল খান করিয়াছি-লেন, সেই মুক্তিকে সাক্ষাৎ দেখিতেছেন এইমাত্র জানেন, কেবল সেই নবীন মুখ-গুণ, সেই চকু, সেই কেশ, সেই গুণ, দেখিতেছিলেন, এইমাত্র জানেন । আর র-ঘুনাথ ! একি ভ্রমোচিত কার্য্য ? রঘুনাথ জানেন না, রঘুনাথ উদ্ভূত !

সেই চন্দ্রালোকে, নিস্তরু নিশাকালে রঘুনাথ সংক্ষেপে আপন বিবরণ সরসুকে জানাইলেন, সরসু পুলকিত শরীরে সেই মিন্টু কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন । একবৎসর কাল অবাধি রঘুনাথ নানাস্থানে, নানা যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিলেন, তোরণে আ-সিবার জন্য একদিনেরও অবকাশ পান নাই । একগণে শিবজী রায়গড়ে বাইরা রাজা উপাধি লইয়াছেন, দেশশাসনপ্র-ণালীতে মনোনিবেশ করিয়াছেন, রঘুনাথ বিদায় পাইয়াছেন । রঘুনাথ দরিদ্র হা-বেলদার মাত্র, তাঁহার নাম নাই, অর্থ নাই, পদ নাই, তিনি সরসুরত্বকে কি রূপে পাইবেন ? জগদীশ্বর সহায় হউন, রঘুনাথ চেতনার ক্রটি করিবেন না, রঘুনাথ সেই র-ত্বটা কুড়াইয়া বন্ধ ধারণ করিবেন, অথবা চেতনার অক্ষিৎকর জীবন দান করিবেন । রঘুনাথ অদ্যই দুর্গে আসিয়াছেন, আসি-য়াই সরসুর পীড়ার কথা শুনিয়াছিলেন, রাজিতে একবার সরসুকে গোপনে ধা-কিয়া দেখিবেন বলিয়া ধীরে ধীরে ছাদে আসিয়াছিলেন । কিন্তু সে পাণ্ডুবদন দে-খিয়া আত্মসম্বরণ করিতে পারেন নাই,

ধীরে ধীরে নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, নিকটে আসিয়াছেন, তাহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে, সরযু তাহা মার্জনা করিবেন। রঘুনাথ পুনরায় কলাই চলিয়া যাইবেন, কিন্তু দেখে যতদিন প্রাণ থাকিবে, সরযুর চিন্তা, সরযুর মুখখানি কখনও বিস্মৃত হইবেন না। সরযুকে এক একবার এই দরিত্র সেনার জন্য চিন্তা করিবেন।

পুলকিত শরীরে সরযু মধুর কথাগুলি শুনিতেছিলেন, আছা! তাঁহার তাপিত হৃদয় শীতল হইল, দঙ্ক শরীর জুড়াইল, কিন্তু রাত্রি অধিক হইয়াছে, পিতা শয়ন করিয়াছেন, সরযুর কি রঘুনাথের নিকট বসিয়া থাকা উচিত? এই কথা সহসা মনে জাগরিত হওয়ার সরযু উঠিলেন, ধীরে ধীরে রঘুনাথের হস্ত হইতে আপন হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন, পরে বলিলেন—

‘রঘুনাথ!’ সেই মিষ্ট নামটি উচ্চারণ করিয়াই লজ্জার অধোবদন হইলেন। রঘুনাথের হৃদয় স্তম্ভ করিয়া উঠিল। বলিলেন “সরযু! সরযু! আর একবার ঐ মিষ্টশব্দে ঐ নামটি উচ্চারণ কর, এক বৎসরের চিন্তা অদ্য বিস্মৃত হইব, এক বৎসরের কষ্ট অদ্য তুচ্ছজ্ঞান করিব।”

সরযু লজ্জা সংবরণ করিয়া বলিলেন “রঘুনাথ! জগদীশ্বর তোমাকে নিরাপদে রাখুন, তোমাকে জয়ী করুন! এ অভাগিনীর তাহা তিন্ন অন্য প্রার্থনা নাই। তাহা তিন্ন জীবনে অন্য চিন্তা নাই।” ধীরে ধীরে সরযু শরমাগারে যাইলেন।

সে দিন রঘুনাথ তোরণ-দুর্গে রহিলেন, পরদিন প্রাতে কিল্লাদারের নিকট বিদায় লইয়া দুর্গ ভাগ করিলেন।

কতিপয় মাস অতিবাহিত হইল; সরযুর চিন্তা পূর্ববৎ বলবতী; কিন্তু পূর্ববৎ খেদযুক্তা নহে। তিনি আনন্দের, স্মৃতির চিন্তাই করিতেছেন; মার্মাবিনী আশা কানে কানে বলিত “শীঘ্র যুদ্ধ শেষ হইবে, শীঘ্র রঘুনাথ জয়ী হইবেন, তখন তিনি এ অভাগিনীকে বিস্মৃত হইবেন না।” সরযুর শরীর ও পূর্ববৎ পুষ্টিতা ও লাবণ্যধারণ করিল। দেখিয়া জনার্দন পুনরায় নিশ্চিত হইলেন, পুনরায় শাস্ত্রাত্মশীলনে মন দিলেন।

কএক মাস পরে সংবাদ আসিল, যে সত্রাট অধরাধিপতি জয়সিংহকে শিবজীর সহিত যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন। জনার্দন পূর্বপ্রত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বড়ই উৎসুক হইলেন; কিল্লাদারের অনুমতি লইয়া তোরণদুর্গ হইতে যাত্রা করিলেন। জনার্দন সরল-হৃদয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে শত্রুশিবিরে বাইতে দিতে কিল্লাদার বা শিবজী কোন আপত্তি করিলেন না; বিশেষ ভয়ানকগণের জয়সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন হয় শিবজীর এই ইচ্ছা ছিল, জয়সিংহের সহিত যুদ্ধে তিনি কদাপি সম্মত ছিলেন না।

সমস্ত স্থির হইল, জনার্দন কস্তার সহিত তোরণদুর্গ ভাগ করিলেন, কস্তার হৃদয় আনন্দে মাচিরা উঠিল।— কেমন?

সরযুর চিন্তামালিন্ত দূর হইল, সরযুর

লাংগা ফুটিয়া বাহির হইল, সরযুর হৃদয়া-
শয়ন হুক হুক করিতেছে, সরযুর মুখে স-
স্কন্দা হাসি !

সরযুর আনন্দে পিতা আরও আন-

ন্দিত হইলেন, উভয়ে নিরাপদে রাজা জ-
রসিংহের শিবিরে পৌঁছিলেন । পাঠক !
আমরা ভোরগদুর্গে থাকিয়া কি করিব,
চল আমরাও সেই স্থানে বাই ।

১৮৩

নিশীথচিন্তা ।

বিরহ ।

প্রেমের পুষ্টি মিলনে, না বিরহে ?
ঐহাদিগের হৃদয় আছে, এবং হৃদয়ে
শ্রীতির পবিত্রপ্রতিমা অঙ্কিত আছে ;—
ঐহারা প্রেম আর বিরহকে ব্রজলীলার
কথা মনে না করিয়া, হৃদয়রহস্য ও অ-
ধ্যাত্মতত্ত্বের নিগূঢ় কথা বলিয়া মনে ক-
রেন, সেই সাধুহৃদয় প্রেমিকেরা এই প্র-
েমের উত্তর ককন । আমার চক্ষে প্রেমের
মোহময় সম্মিলন যেমন সুখপ্রদ, বিরহের
বিবাদময়বহিঃ তেমনই উপকারজনক ।
একটিতে শ্রীতির আলঙ্কার, আর একটিতে
শ্রীতির-উল্কাপনা । যে বিরহের যজ্ঞীয়
অগ্নিতে দগ্ধ হয় নাই, সে প্রেমের আ-
ভোগ ও আবেশ কাহাকে বলে, তাহা
জানেন না । যে সম্মিলনসুখের নির্মল
অমৃতরাশিতে অবগাহন করে নাই,—হৃ-
দয়ে হৃদয় মিশাইয়া মানবহৃদয়স্থ তরল ত-
রঙ্গের সেই গভীর সঙ্গীত জ্বলন করে নাই,
বিরহের বিষবস্ত্রণার যে কি শিক্ষা, কি
সম্পাদ, কি মেঘান্ত জ্যোৎস্বা, কি মধু-
যর দুঃখ আছে, তাহাও সে জানিতে পার
না ; কলতে বিরহ নিরবচ্ছিন্ন বিপদ নহে ।

বিরহে প্রেমের পরিশুদ্ধি,—শ্রীতির
পবিত্রতা । যে প্রেম নিরাবিল ও নির্মল
নহে, তাহা প্রেমের বিভ্রমণা মাত্র, তাহা
মকুষাঘ হইতে পরিভ্রষ্ট, অথবা মনুষ্য-
ত্বের উচ্চতর আদর্শে বঞ্চিত, পশু-প্রকৃতি-
সম্পন্ন ইতর জনেরই ভোগে আসিতে
পারে ; প্রকৃত মনুষ্যের উপভোগ্য হয়
না । সুতরাং শ্রীতি বাহাতে সর্বতো-
ভাবে আবিলভাশূন্য হয়, ইহাই প্রার্থ-
নীয় ;—হৃদয় বাহাতে শ্রীতির নাম ল-
ইয়া পকে গিয়া ফুবিয়া না পড়ে, ইহাই
বাঞ্ছনীয় । বিরহে সেই নিরাবিল মাধুর্য্য,
সেই পঙ্ক-স্পর্শ-শূন্য প্রেমের প্রথম স্বাদ ।
হৃদয়, বিরহে দগ্ধ হইয়া, অগ্নিদগ্ধ কাঞ্চনের
ন্যায়, নূতন কাঙ্ক্ষি ধারণ করে,—এবং
দুঃখের মুর্খুরদাহনে পুড়িয়া পুড়িয়া প-
বিত্রতার মোহনমূর্ত্তি সন্দর্শন করে । এই-
রূপে ইচ্ছা লালসাশূন্য হয়, লালসা এক
বারে বিনষ্ট না হইলেও শ্রীতিতে পরিণতি
পায়, এবং মনুষ্যের প্রাণ স্মৃতির উপাসনা
করিতে 'প্রথম শিক্ষা' পাইয়া দেবপ্রকৃতির
সোপানপারম্পর্য্য-ধীরে ধীরে আয়োজন

করে। মানুষ শিক্ষাকে কোন প্রকারেই সামান্য শিক্ষা বলিতে সাহস পাই না।

শোক কি? না স্মৃতির উপাসনা। এবং স্মৃতির উপাসনাতেই মনুষ্যের গোঁ-রব। মুহূর্তের জন্ত যে অনুরাগ, তাহা মানব জাতির অখন্তন জীবনমুহূর্তেই শোভা পায়,—মনুষ্যে শোভা পায় না। মনুষ্যের অনুরাগ অনন্তকাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত প্রবাহিত হইতে না পারিলে পরিতৃপ্ত হয় না,—স্বর্ষা, চন্দ্র, ও নক্ষত্রনিচয়ের সৃষ্টি ও বিলয়কেও পরিহাস করিয়া একবারে কালের সঙ্গে সমান রেখায় বহিতে না পারিলে, কৃতার্থ হয় না। এই নিমিত্তই মনুষ্যের জন্ম মনুষ্যের শোক,—এবং এই নিমিত্তই শোকে মনুষ্যের এক অলৌকিক, অনির্করচরিত্র, অকল্পিত স্মৃতি। যাহারা শোকসম্পন্ন ব্যক্তিকে সংসারের রূপা কথা কহিয়া সাধুনা দিতে ইচ্ছা করে, আমার বিবেচনায় তাহারা হৃদয়-শূন্য। আর,—যাহারা বিবিধ নিষ্ঠুর নীতিসূত্র অথবা মমতার অনিত্যতা প্রভৃতি বিবিধ অর্থশূন্য বাক্য শুনাইয়া শোকাকুল হৃদয়ের মর্মস্থান হইতে লোকান্তর-গত প্রিয়জনের প্রতি-মূর্ত্তিখানি পুছিয়া ফেলিতে যত্নশীল হয়, তাহারা মূঢ়। আমার নিকট শোকের প্রতিকৃতি, সাধনার প্রতিকৃতির ন্যায়, বার পর নাই স্বন্দর ও পবিত্র,—এবং শোকাকুলের দৃষ্টি সুধাবর্ষিণী। আমি পার্থনাদকে শোক বলিয়া এবং প্রিয় বিচ্ছেদের প্রথম আঘাতে যে এক-সাক্ষরতা অর্থে, তাহাকে

ও শোক বলিয়া ব্যাখ্যা করি না। পূর্বেই বলিয়াছি যে, শোকের নাম স্মৃতির উপা-সনা, এবং যে প্রেরণ উপাসনার ভাবে শোকাকুল, সে সার্থক-জন্ম। মনুষ্য যখন শোকে এইরূপ শান্ত, স্মৃতির ও ধীরপ্র-কৃতি হয়, তখন তাহার জন্য দুঃখ না হইয়া, প্রত্যুত তাহার প্রতি আমার ভক্তি জন্মে,—এবং মনুষ্যের স্নেহ ও মনুষ্যের মমতা যে নিতান্তই একটি কথার কথা, খেলার সামগ্রী অথবা মায়ার ছলনা নহে, ইহা অনুভব করিয়া মনুষ্যজাতির প্রতি প্র-দ্বাভে হৃদয় তখন অবনত হইয়া পড়ে। যে সংসারে স্বার্থই একমাত্র উপাস্য দে-বতা, কতিলাভ-গণনাই মনুষ্যের একমাত্র শিক্ষা, এবং ভোগের আবর্ত্তচক্রই মনুষ্যের বিলাসক্ষেত্র, যদি সেই সংসারেও শো-কের প্রকৃত সম্মান না হয়;—যে সংসারে প্রীতি প্রাতঃসূর্য্যের কিরণ-স্পর্শে বিক-শিত হইয়া সন্ধ্যাগমেই শুকাইয়া যায়, ম-নুষ্যের মমতা সৈকত-ভূমিতে জলরেখার ন্যায় দেখিতে দেখিতেই অদৃশ্য হয়, অনু-রাগের তরঙ্গ বসন্তকালীন স্রোতস্বিনীর লীলাতরঙ্গের ন্যায় এই ধল-ধল হাসিতে থাকে, এই আবার তাড়িয়া পড়ে, এই পুসরার লীলাজলে বিলীন হইয়া যায়, যদি সেই সংসারেও স্মৃতির উপাসনা ম-নুষ্যচিত্তে সমুচিত পূজা না পায়, তবে জানি না মনুষ্যের শেষ গতি কি?

বিরহও শোকের ন্যায় স্মৃতির উপা-সনা। স্মরণ্য বিরহও শোকের ন্যায়

সম্মাননীর । বাহার হৃদয়ে শোকের দীপ-
শিখা লুকাইত তাবে জ্বলিতে থাকে, সেই
শোক-সন্তপ্ত ব্যক্তির পরিমলমুখজীতেও
বে গাভীর্ষ্য, বিরহসন্তপ্ত প্রেমিক ব্যক্তির
পরিমল-মুখ-মাধুরীতেও সেই গাভীর্ষ্য ।
শোক সূদীর্ঘবিরহ ;—বিরহ শোকের সা-
ধরিক ভোগ । শোকে বে শিখা,বিরহেও
সেই শিখা ;—শোকে বে শুকি, বিরহেও
সেই পরিশুকি । প্রত্যেক এইমাত্র, শোক
অনেক হুর্ভাগ্য মনুষ্যের নিকটেই আশা-শূন্য
অন্ধকার । বিরহের অন্ধকার আশাপ্রদ ।

অপিচ,বিরহে প্রেমের পরীক্ষা । সৃষ্টি
বখন মুখরা নর্ধ-সখীর ন্যায় হৃদয়ের কথা
হৃদয়ের নিকট কহিয়া দেয়, রজুর ন্যায়
বন্ধনীর কার্য করিয়া হৃদয়ের সহিত হৃদ-
য়কে ঐশ্বর্য করিতে যত্নশীল হইতে,—জি-
হ্বার বাহা প্রকাশ পায়না, অন্তরের অন্ত-
রতমহাননিহিত সেই নিগূঢ় কাহিনী প্র-
কাশ করিয়া প্রিয়জনের চিত্তবিনোদন করে,
মিতান্ত অসারচিত্ত কীর্ণপ্রাণ মনুষ্যও তখন
প্রীতির হিমোলে কণকালের তরে তা-
সিতে পারে । তাদৃশ বহুসিদ্ধ প্রীতির আর
গৌরব কিসে ? সেই প্রীতিই প্রীতি, বাহা
আপনার বলে আপনি জীবিত রহে;—সেই
প্রীতিই প্রীতি, বাহা কালের তরঙ্গাঘাতে
এবং অবস্থার বৃর্ণপাকে আহত ও প্রত্যাহত
হইয়াও সম্পূর্ণরূপে অটল থাকে; সেই প্রী-
তিই প্রীতি, বাহা চকুর প্রলোভন এবং চির-
প্রিয় প্রেরোচনার বঞ্চিত রহিয়াও আশা ও
দৈরাশ্যে,আলোকে ও অন্ধকরে হৃদয়গুত-

লের ধ্যান করে । ইহারই নাম প্রণয়ের তপস্যা ।
এবং প্রীতির যদি কিছু পরীক্ষা থাকে,সেই
পরীক্ষা বিরহের এই সূদীর্ঘ তপস্যায় ।

এই সংসারে কে না প্রণয়ের খেলা
খেলে ? এবং কে না প্রণয়ের খেলা খে-
খেলিয়া আত্মবিড়ম্বনা, এবং মনুষ্যের অ-
বমাননা করে ? মুহূর্ত্ত পরে বাহাকে ভু-
লিয়া যায়, মনুষ্য তাহাকে প্রাণাধিক
বলে । নরনপথের অন্তরালে গেলেই যে
একবারে হৃদয়েরও অদৃশ্য হইয়া পড়ে,
মনুষ্য তাহাকে অভিন্নহৃদয় বন্ধু বলিয়া স-
জ্ঞায়ণ করে । বাহাকে হর্ষ ও বিষাদ,
স্বপ্ন ও হুঃখ, কোন সময়েই মনে পড়েনা,
এবং অতি দীর্ঘ বিরহেও বাহার জন্য
মন পোড়ে না,—মনুষ্য বাহাকে ছাড়িয়া
আনন্দ ও নিরানন্দ উভয়ই ভোগ করিতে
পারে,—এবং বাহার অদর্শন ও অতাবে
আপনাকে কোন অংশে অজহীন জ্ঞাননা
করিয়া জীবনের সমস্ত ব্যাপারেই নিবিষ্ট
রহিতে সমর্থ হয়,—কি হুগা কি লজ্জার
কথা, মনুষ্য তাদৃশ দূরস্থ জনকেও নিকটে
পাইলে প্রিয়সম্ভাষণের মধু বিলাইয়া পু-
লকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে । প্রীতির পর-
মার্থ্য্য পবিত্রতা লইয়া এইরূপ লৌকিক
খেলা খেলিতে আমার সাহস হয়না,—
এবং মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের এইরূপ ছল-
নার খেলা দেখিতেও আমার আর প্রাণে
সহেনা । প্রীতির নাম অমৃত । সুগাস্তব্যাপি
তপস্যা বিনা এ অমৃতে মনুষ্যের অধিকার
হয়না ;—প্রীতি অবনীতে সাক্ষাৎ স্বর্গ ;

মনুষ্য বহুদিনের সাধনার আপনার আ-
ত্মকে মরকম্পর্শ হইতে প্রকাশিত করিতে
না পারিলে, এই স্বর্ণে প্রবেশ-পথ পা-
রনা। যদি হৃদয়ে প্রকৃত প্রীতিই পরিস্ফুট
হইল, তাহা হইলে আর বিরহ কি? এবং
বিরহে দুর্ভাবনা কি? এই বিখিল জগৎ
নৈশমিশুকৃত্যের অতিভূত হইয়া নিজার
ক্রোড়ে অচেতন রহে, বিরহিণী প্রীতি
তখন তপস্বিনীর ম্যার জাগ্রত রহিয়া, সু-
খও নয়, দুঃখও নয়, সুখদুঃখের মিশ্রণও
নয়, মনের সেই যে এক অনির্কচনীর্ অ-
বস্থা, প্রিয়-চিন্তার আবেশে তাহাতে ডু-
বিয়া পড়ে। আত্মার গাভীর্ষ্য এবং প্র-

কৃতির গাভীর্ষ্য তখন এক হইয়া যায়। প্র-
কৃতির যে সকল প্রকল্প সৌন্দর্য্য অন্য
সময়ে চক্ষে পড়ে না, প্রেমালোক-প্র-
দীপ্ত মনুষ্যচক্ষু বামিনীর তিমিররাশি
ভেদ করিয়া তাহা তখন দেখিতে পায়।
ঐতি যে সকল অপার্থিব রসি কখনও
শুনিতো পায় না, দূরপ্রত সঙ্গীতের ম্যার
তাহা তখন ঐতিপথে প্রবেশ করে,—
এবং মধ্যে যত কেন ব্যবধান থাকুক না
হৃদয় তখন হৃদয়ের সহিত আলাপ করিয়া,
যিনি সকল হৃদয়ের শেষগতি এবং প্রী-
তির আদি প্রস্রবণ, তাঁহার অমৃতমর
ক্রোড়ে লীন হয়।

কবিতা পুস্তক *

✓ আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পড়িয়া
প্রীত হইয়াছি। ইহাতে যে কয়টি ক-
বিতা বিনিবেশিত হইয়াছে, বঙ্গদর্শন ও
ডায়েরের পাঠকবর্গ অবশ্যই তাহা পড়িয়া-
ছেন। কিন্তু তাঁহারা এই কবিতাগুলিকে
বন্ধিম বাবুর বলিয়া জানিতেন না। এই-
কণ তাহা জানিতে পাইয়া, পাঠসময়ে হৃ-
তম আনন্দ লাভ করিবেন।

যদি চিত্রনৈপুণ্য অথবা কল্পনার বৈ-
চিত্র্যই কবিত্বশক্তির প্রধান পরিচয় হয়,
তাহা হইলে বাবু বন্ধিমচন্দ্র বঙ্গদেশের

একজন প্রধান কবি। তাঁহার আয়েষা,
তাঁহার স্বর্ধ্যমুখী, তাঁহার মৃগালিনী, তাঁহার
তিলোত্তমা, দময়ন্তী শকুন্তলার প্রগল-সখী
হইবার যোগ্য। এসকল দেবভ্রমর্ত, দে-
বজনম্পৃহণীর পবিত্রপুষ্প তাঁহার মানস-
কুঞ্জে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তিনি কবিস-
মাজে আদরের আসন পাইতে অধিকারী।
তাঁহার অপরাপর উপাদেয় কাককাধোর
মধ্যে শৈবলিনীর প্রতাপরায় পাৰ্শ্বিও উ-
পকরণে গঠিত হইয়াও এমনই এক অুপা-
র্শ্বিও সৌন্দর্য্যে প্রতিভাত রহিয়াছে যে,

* বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কাঁটালপাড়, বঙ্গদর্শনযন্ত্রালয়ে রাখানাপ
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।)

বতকাল ইহা নিরীক্ষণ কর, চক্ষু কখনও
কিরিতে চাহিবে না। আমরা বখন প্রভা-
পের প্রতি দ্বিরনেত্রে দৃষ্টিপাত করি,—
প্রভাপের গভীরী প্রীতি, গভীরতর মহ-
ত্বের অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হই, তখন প্রভাপচ-
রিত্র-অষ্টাকে শুধু প্রশংসা করিতে আমরা-
গের প্ররুতি হয় না। আমরা তখন ভক্তি
ও কৃতজ্ঞতার তাঁহার নিকট অবনত হই, এবং
কাব্যশাস্ত্রই যে প্রকৃত ধর্মশাস্ত্র, তাহা অনু-
ভব করিয়া কবিকে জনরের সহিত সাধুবাদ
দেই। কলতঃ বঙ্কিম বাবুর তুলিপাতশক্তি
অসামান্য। বাঁহার জন্ম নাই, এবং জ-
ন্মে প্রীতির আবেগ এবং কল্পনার প্রবাহ
নাই, তিনি এইরূপ সৃষ্টি নৈপুণ্যও এইরূপ
চিত্রনৈপুণ্য দেখাইতে পারেন না।

কিন্তু বঙ্গীরপাঠকসমাজে এসকল
গুণে কবিদের পরীক্ষা হয় না। এদেশে
কবিদের পরীক্ষা কর্ণে। বাঙ্গালির কবি
ঠুংরী ঠালের তরলভরঙ্গ তুলিয়া আপনি
নাচিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যকে নাচা-
ইবে;—নহিলে সে কবি নহে। বাঙ্গালির
কবি কথার কথার ছড়া কাটিবে, কণার
ছটার বাহবা দেওয়াইবে, এবং অকথারও
কথা সৃষ্টি করিবে;—নহিলে সে কবি
নহে। সংক্ষেপতঃ বাঙ্গালির কবি কে-
বলই গীত গাইবে, সে গীতে জমরওড়নের
অনুকরণ না হইয়া ভেকরনির অনুকরণ হ-
উক, তাহাতে দোষ নাই। কিন্তু তা-
হাকে মিরবজির গাইতে হইবে। যদি প্রকৃ-
মবালাচনা কিংবা রাজনীতির কথা লইয়া

আলোচনা করিতে হয়, তাহাও
ভট্টাচার্য্য কিংবা ভূতপূর্ব প্রভাকরের রী-
তিতে হুম্মোমরী গীতিকবিতার লিখিত হ-
ওয়া চাই। এই জন্যই বঙ্গে অত্যাংকুট গ-
দ্যাকাব্যও অকাব্য বলিয়া উপেক্ষিত, এবং
এই জন্যই বঙ্গে বারপার নাই জঘন্য, ও
অশ্লীশ্য পদ্য প্রবন্ধ কাব্য বলিয়া আ-
দৃত।

বঙ্কিম বাবুর সমস্ত লেখাই পদ্যে।
সুতরাং বঙ্গদেশের সাহিত্যানুরাগী র-
সিক সম্প্রদায়ের নিকট তিনি উপন্যাস-
রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং আনমনী
ও ছীরা, এবং অলবলা ও বিদ্যাভিগঞ্জের
স্তুতিগায়ক বলিয়া সমাদৃত থাকিলেও স্র-
কবি বলিয়া এতদিন পরিচিত ছিলেন
না। তাঁহার এই কবিতা-পুস্তক সেই অ-
ভাব পূরণ করিবে। বিংশতি বৎসরের
প্রগাঢ় চিন্তাশ্রমে যে ফল ফলে নাই,
এতদিনের পর সেই ফল ফলিবে। বাঁহার
স্কট ও লিটনের কল্পনার সহিত বাঙ্গালির
কল্পনার তুলনা করিতে পারেন, সেই
অপ্পসংখ্যক অসামাজিক ব্যক্তিরাই এত
দিন তাঁহাকে স্রকবি বলিয়া সম্মান ক-
রিতেন, এইক্ষণ আপামর সাধারণ সকল
শ্রেণির পাঠকই তাঁহার নাটনী ছন্দর ক-
বিতা পড়িয়া তাঁহাকে মুকুটধে ও নি-
র্ভীকচিত্তে কবি বলিবে। বঙ্কিম বাবু মন-
স্বিতার উচ্চশৈলে সমাসীন রহিয়াও বা-
ঙ্গালি তুলাইবার মোহমজে কিরণ সিদ্ধ-
বিদ্যা লাভ করিয়াছেন, তাহা নিরোদ্ধৃত

পংক্তি নিচয় পাঠ করিলেই পাঠকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন।

“ এই মধুমাংসে, মধুর বাতাসে,
শোন লো মধুর বাঁশী।

এই মধুবনে, জীমধুবন্দনে,
দেখ লো সকলে আসি ॥)

মধুর সে গায়, মধুর বাজায়,
মধুর মধুর ভাসে।

মধুর আদরে, মধুর অধরে,
মধুর মধুর হাসে ॥

মধুর শ্যামল, বদন কমল
মধুর চাহনি তায়।

কণক সুপূর, মধুকর যেন,
মধুর বাজিছে পায় ॥

মধুর ইঞ্জিতে, আমার সঙ্কেতে,
কছিল মধুর বাণী।

সে অবধি চিতে, মাধুরি হেরিতে,
ধৈর্য নাহিক মানি ॥

এসুখ রঞ্জেতে, পরলো অঞ্জেতে,
মধুর চিকণ বাস।

তুলি মধুকুল পর কানে হুল,
পুরাণ মনের আশ ॥

গাঁধি মধুমালা, পর গোপবালা,
হাসলো মধুর হাসি।

চল বধা বাজে, যমুনার কূলে,
শ্যামের মোহন বাঁশী ॥

২

চল বধা বাজে, যমুনারকূলে,

ধীরে ধীরে ধীরে বাঁশী।

ধীরে ধীরে বধা, উঠিছে চাদনি,

হুল জল পরকাশি ॥

ধীরে ধীরে রাই, চল ধীরে যাই,
ধীরে ধীরে কেল পদ।

ধীরে ধীরে শুভ, নাদিছে যমুনা,
কল কল গদ গদ ॥

ধীরে ধীরে জলে, রাজহংস চলে,
ধীরে ধীরে ভাসে ফুল।

ধীরে ধীরে বাসু, বহিছে কাননে,
দোলায়ে আমার হুল ॥

ধীরে বাবি তথা, ধীরে কবি কথা,
রাধিবি দোহার মান।

ধীরে ধীরে ভার, বাঁশিটা কাড়িবি,
ধীরেতে পুরিবি তান ॥

ধীরে শ্যাম নাম, বাঁশিতে বলিবি,
শুনিব কেমন বাজে।

ধীরে ধীরে চূড়া, কাড়িয়ে পরিবি,
দেখিব কেমন সাজে ॥

ধীরে বনমালা, গলাতে দোলাবি,
দেখিব কেমন দোলে।

ধীরে ধীরে ভার, মন করি চুড়ি,
লইয়া আসিবি চলে ॥

যে দেশে জয়দেবের জন্ম, বিদ্যাশক্তির
বিক্রম বিলাস, এবং সর্বত্রই ব্রজবি-
লাসী শ্যামধনের বংশীধনি, সেই দেশ
ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোথাও এইরূপ ল-
লিত কবিতা দিখিত হইতে পারে না,
এবং সেই দেশের প্রেমালস অধিবাসী
ভিন্ন অন্য কেহই এইরূপ কবিতার প্রকৃত
রস পান করিতে সমর্থ হয় না। আমরা
মৃগালিনী ও গিরিজার কল-কঠ নিঃসৃত

সুকোমল সংগীত জ্ঞান করিয়া বহুদিন হইল এইরূপ অনুমান করিয়াছিলাম যে, বঙ্কিম বাবু ইচ্ছা করিলেই একজন উৎকৃষ্ট গীতি-কবি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন । এই কবিতাপুস্তকের প্রত্যেক কবিতাই এইরূপ আমাদের সেই অনুমানকে সমর্থন করিতেছে । মলিত পদ-বিন্যাস, সুমলিত ছন্দোবদ্ধ, প্রাঞ্জল ভাষা এবং রসের মৃদুললহরী এই কয়টিই সাধারণতঃ গীতিকবিতার প্রধান গুণ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে, অন্ততঃ বঙ্গদেশের গীতি-কবিতা এই সাধারণ গুণেই প্রণয়-ব্যবসারিদিগের মধ্যে সুপরিচিত । আমরা বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পড়িয়া

দেখিলাম, বঙ্কিম বাবুর কবিতানিচয়ে এ সকল গুণের কিঞ্চিদ্ভ্রাত্তও অভাব নাই । তাঁহার ভাষা কখনও মুষ্কার ভাষা মধুর-হাস্যে চিত্ত বিমোদন করে, কখনও প্রগল্ভার বঙ্কিমকটাক্ষে চিত্তবিদারণ করে ;—কখনও ভাবের আবেশে আপনা হইতে ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে, কখনও মৃদুসমীর-সঞ্চালিত তরঙ্গিণীর ন্যায় নাচিয়া নাচিয়া এবং খেলিয়া খেলিয়া যুগ-পৎ নয়ন মন মোহন করে । অভাবের মধ্যে এই দেখিলাম, ইহাতে উদ্দীপনা নাই, কিন্তু আবেশ আর উদ্দীপনা একত্র থাকিতে পারে কি না, তাহাও সন্দেহের কথা ।)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

১ । “ প্রবন্ধমালা । জীৱজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত । ” এই পুস্তকে অঙ্কদিগের শিক্ষা ও জীবনোপায়, প্রত্যাপ সিংহ, রামায়ণের সাধারণ ধর্ম ও নীতি, সংস্কৃত এবং গুরু-গোবিন্দ সিংহ এই পাঁচটি প্রবন্ধ বিনিবেশিত হইয়াছে, এবং এই পাঁচটি প্রবন্ধই আমাদের বিবেচনার ছাত্রশিক্ষার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে । ইহার বাঙ্গালা ভাষায় বিন্দু, ভেদমই প্রাঞ্জল । এই প্রবন্ধাদি ছাত্রশিক্ষার পত্রীকার পাঠ্যপুস্তক

মধ্যে পরিগৃহীত হইলে, আমাদের স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই উপকার দর্শিবে ।

২ । “ পাঠমঞ্জরী । নীতিপুর্ণ পদ্যগদ্যময় সরল পাঠ । ” এখানিও রজনী বাবুর দ্বারা প্রণীত হইয়াছে, এবং তিনি যে উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধপ্রণয়ন করিয়াছেন, রচনার প্রাঞ্জলতা এবং বিষয়ের সারগর্ভতা এই উভয় গুণেই সেই উদ্দেশ্যে সফল হইয়াছে । ইহা চলনসহ পুস্তক অপেক্ষা সর্বাবশ্যে উৎকৃষ্টতর ।

জীবনপ্রভাত



চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

রাজা জয়সিংহ ।

“নরকুলোত্তম তুমি —————
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে !”
মধুসূদন দত্ত ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আরংজীব শায়ের্তার্বা ও যশোবন্ত সিংহ উভরকেই অকর্ণণ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে ডাকাইরা পাঠাইয়াছিলেন, ও নিজ পুত্র সুলতান মোরাজীমকে দক্ষিণে প্রেরণ করেন, ও তাঁহার সহায়তার জন্য যশোবন্তকে পুনরায় প্রেরণ করেন । তাঁহারাও বিশেষ ফললাভ করিতে না পারায়, স-ত্রাট্ অবশেষে তাঁহাদের স্থানান্তরিত করিয়া অধরাধিপতি প্রসিদ্ধনামা রাজা জয়সিংহ ও তাঁহার সহিত দিলাওয়ার খাঁ নামক একজন বিক্রমশালী আফগান সেনাপতিকে দক্ষিণে প্রেরণ করিলেন । ১৬৬৫ খৃঃ অব্দের চৈত্রমাসের শেব-যোগে জয়সিংহ পুনর উপাধৃত হইলেন । শায়ের্তার্বার ন্যায় নিকৎসাহ হইয়া ব-সিয়া না থাকিয়া, তিনি দিলাওয়ারখাঁকে পুরন্দর দুর্গ আক্রমণ করিতে আদেশ ক-রিলেন, ও অন্নং সিংহগড় বেষ্টিত করিয়া

রাজগড় পর্যন্ত সৈন্যে অগ্রসর হইলেন ।

শিবজী হিন্দু-সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে পরাধুখ, বিশেষ জয়সিংহের নাম, সৈন্তসংখ্যা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দোর্দণ্ড প্রতাপ ও পরাক্রম তাঁহার নিকট অবিদিত ছিল না । সেরূপ পরাক্রান্ত সেনাপতি বোধ হয় সত্রাট্ আরংজীবের আর কেহই ছি-লেন না,—তাৎকালিক ফরাসী ভ্রমণ-কারী বর্গীর লিখিয়া গিয়াছেন যে, বোধ হয় সমগ্র ভারতবর্ষে জয়সিংহের ন্যায় বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী লোক আর একজনও ছিলেন না । শিবজী প্রথম হইতেই ভয়োদ্যম হইলেন, ও বার বার জয়সিংহের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠা-ইতে লাগিলেন । তীক্ষ্ণবুদ্ধি জয়সিংহ চতুর শিবজীকে জ্ঞানিতেন, এ সমস্ত প্র-স্তাব বিশ্বাস করিলেন না । অবশেষে শিব-জীর বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপান্ত ন্যায়শাস্ত্রী দূতবেশে জয়সিংহের নিকট আসিলেন, ও রাজাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন যে শিবজী রাজা জয়সিংহের সহিত চতুরতা করিতেছেন না, তিনিও কত্রিয়, কত্রো-চিত সম্মান তিনি জানেন । শাস্ত্রজ্ঞ ব্রা-হ্মণের এই সত্যবাক্য রাজা জয়সিংহ বি-শ্বাস করিলেন, তখন ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ

করিল। বলিলেন “ শিবজী! আপনার বাক্যে আমি আশ্বস্ত হইলাম ; রাজা শিবজীকে জানাইবেম যে দিল্লীর সম্রাট তাঁহার বিদ্রোহাচরণ মার্জনা করিবেন, পরন্তু তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন, সে জন্য আমি বাক্যদান করিতেছি। আপনার প্রভুকে বলিবেন, আমি রাজপুত্র, রাজপুত্রের বাক্য অন্যথা হয় না। ” রঘুনাথ এই আশ্বাসবাক্য শিবজীর নিকট লইয়া গেলেন।

ইহার কএক দিন পর বর্ষাকালে রাজা জয়সিংহ আপন শিবিরে সভার মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন, একজন প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল—

“ মহারাজের জয় হউক ! রাজা শিবজী স্বয়ং বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন। ”

সভাসদৃ সকলে বিস্মিত হইলেন, রাজা জয়সিংহ স্বয়ং শিবজীকে আহ্বান করিতে শিবিরের বাহিরে যাউলেন। বহু সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে আহ্বান ও আলিঙ্গন করিয়া শিবিরান্তরে আনিলেন, ও রাজগদিতে আপনার দক্ষিণ দিকে বসাইলেন।

শিবজীও এইরূপ সমাদর পাইয়া যথেষ্ট সম্মানিত হইলেন। রাজা জয়সিংহ কণেক মিঠালাপ করিয়া অবশেষে বলিলেন, “ রাজন্, আপনি আমার শিবিরে আসিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন,

এই শিবিরে আপনার গৃহের ন্যায় বিবেচনা করিবেন। ”

শিব। “ রাজন্, এ দাস কবে আপনার আজ্ঞাপালনে নিমুক্ত ? রঘুনাথ পশু দ্বারা আপনি দাসকে আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন, দাস উপস্থিত হইয়াছে। আপনার মহৎ আচরণে আমিই সম্মানিত হইয়াছি। ”

জয়। “ হাঁ, রঘুনাথ নারায়ণীকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা স্মরণ আছে। রাজন্, আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা কষ্টব, দিল্লীখর আপনার বিদ্রোহাচরণ মার্জনা করিবেন, আপনাকে রক্ষা করিবেন, আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন, এ বিষয়ে আমি বাক্যদান করিয়াছি, এ সম্বন্ধ করিব, রাজপুত্রের কপা অন্যথা হয় না। ”

এইরূপে কণেক কথোপকথনের পর সভাসদৃ হইল ; শিবিরে শিবজী ও জয়সিংহ ভিন্ন আর কেহই রহিলেন না ; তখন শিবজী কপটানন্দ-চিহ্ন ভাগ করিলেন, হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া চিত্ত করিতে লাগিলেন। জয়সিংহ দেখিলেন, তাঁহার চক্ষে জল।

বলিলেন—“ রাজন্ ! আপনি যদি আত্মসমর্পণ করিয়া ক্ষুর হইয়া থাকেন, সে খেদ নিশ্চরোজন্ ! আপনি বিশ্বাস করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছেন, রাজপুত্র বিশ্বস্তের উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। অদ্যই রজনীতে আমার অশ্বশালা

হইতে অর্থ বাছিয়া লউন, পুনরায় প্রস্থান করুন, আপনি নিরাপদে আসিয়াছেন, নিরাপদে যাইবেন, আমার আদেশে কোনও রাজপুত্র আপনার উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। পরে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি ভাল, না পারি ক্ষতি নাই, কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম কদাচ বিশ্বরণ করিব না।”

রাজা জয়সিংহের এতদূর সাহায্য দেখিয়া শিবজী বিস্মিত হইলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন—

“মহারাজ! ভবানুশ লোকের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছি তাহাতে খেদ নাই। বালাকাল অবধি যে হিন্দু-ধর্মের জন্ত, যে হিন্দুগোঁরবের জন্য চেষ্টা করিয়াছি, সে মহত্বদায়, সে উন্নত উদ্দেশ্য, অদ্য এককালে বিনষ্ট হইল, সে চিন্তায় ছন্দয় বিদীর্ণ হইতেছে, কিন্তু সে বিষয়েও মন স্থির করিয়াই আপনার শিবিরে আসিয়াছিলাম, সে জন্তও এখন খেদ করিতেছি না।”

জয়। “তবে কি সত্য স্কুগ হইয়াছেন?”

শিব। বালাকাল হইতে আপনারদের গৌরব-নীত গাইতে ভালবাসিতাম; অদ্য দেখিলাম সে গীত মিথ্যা নহে, জগতে যদি সাহায্য, সত্য ও ধর্ম থাকে তবে রাজপুত্র-শরীরে আছে। এরাজপুত্র কি স্ববন্দ্যস্বীকার করিবেন? মহারাজ জয়সিংহ কি স্ববন আরংজীবের সেনাপতি?”

জয়। “ক্ষত্রিয়রাজ! সেটা প্রকৃত

দুঃখের কারণ। কিন্তু রাজপুত্রেরা সহজে অধীনতা স্বীকার করেন নাই, যতদিন সাধ্য দিল্লীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; বিধির নির্বন্ধে পরাধীন হইয়াছেন। মেওনারের বীরপ্রবর প্রাতঃসরগীয় প্রতাপ অসাধ্য সাধনের ও যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমুত্তিও দিল্লীর করপ্রদ, এ সমস্ত বোধ হয় মহাশয় অবগত আছেন।”

শিব। “আছি। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি, সাহাদেবের সহিত আপনারাদিগের এতদিনের বৈরভাব, তাঁহাদের কার্যে আপনি এরূপ যত্নশীল কি জন্ত?”

জয়। “যখন দিল্লীশ্বরের সেনাপতিই গ্রহণ করিয়াছি, তখন তাঁহার কার্যসিদ্ধির জন্য সত্যদান করিয়াছি; যে বিষয়ে সত্যদান করিয়াছি তাহা করিব।”

শিব। “সকলের নিকট সকল সত্য কি সত্য পালনীয়? সাহারা আমাদের দেশের শত্রু, ধর্মের বিকন্ধাচারী, তাঁহাদের সহিত কি সত্যসম্বন্ধ?”

জয়। “আপনি ক্ষত্রিয় হইয়া এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুত্রকে একথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুত্রের ইতিহাস পাঠ করুন, সহস্র বৎসর মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন কখনও সত্য লভ্যন করেন নাই। কখন জয়লাভ করিয়াছেন, অনেক সময়ে পরাস্ত হইয়াছেন, কিন্তু জয়ে পরাজয়ে, সম্পদে আপদে, সর্বদা সত্যপালন করিয়াছেন। এখন আমাদের সে গৌরবের স্বাধীনতা

নাই, কিন্তু সভাপালনের গৌরব আছে । দেশে বিদেশে, মিত্র মধ্যে, শত্রু মধ্যে, রাজপুত্রের নাম গৌরবান্বিত । ক্ষত্রিয়রাজ টোডর মল্ল বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, মানসিংহ কাবুল হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত দিল্লীধরের বিজয়পতাকা লইয়াছিলেন, কেহ কখনও স্তম্ভ বিশ্বাসের বিকলচিত্রণ করেন নাই, মুসলমান সত্র্যটের নিকটও যাহা সভ্য করিয়াছিলেন তাহা পালন করিয়াছিলেন । মহারাষ্ট্ররাজ । রাজপুত্রের কথাই সন্ধিপত্র, অনেক সন্ধিপত্র লঙ্ঘন হইয়াছে, রাজপুত্রের কথা লঙ্ঘন হয় নাই ।”

শিব । “মহারাজ ! যশোবন্তসিংহ হিন্দুধর্মের একজন প্রধান প্রহরী ; তিনি মুসলমানের জন্য হিন্দুর বিকক্ষে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন ।”

জয় । “যশোবন্ত বীরশ্রেষ্ঠ, যশোবন্ত হিন্দুধর্মের প্রহরী, সন্দেহ নাই । তাঁহার মাড়ওয়ারদেশ মক্কাভূমিময়, তাঁহার মাড়ওয়ারী সেনা অপেক্ষা কঠোর জাতি ও সাহসী সেনা জগতে নাই । যদি যশোবন্ত সেই মক্কাভূমিতে বেষ্টিত হইয়া সেই সেনার সহায়ে হিন্দুস্বাধীনতা রক্ষার,— হিন্দুধর্ম রক্ষার যত্ন করিতেন, আমি তাঁহাকে সাধুবাদ করিতাম । যদি জয়ী হইয়া আরংজীবকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীতে হিন্দুপতাকা উড্ডীন করিতেন, ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম রক্ষা করিতেন, আমি তাঁহাকে সত্র্যটি বলিয়া সম্মান করিতাম । অথবা

যদি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া স্বদেশ ও স্বধর্ম রক্ষার্থে বীরপ্রবর প্রতাপের ম্যায় সেই মক্কাভূমে প্রাণত্যাগ করিতেন, আমি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতাম । কিন্তু যে দিন তিনি দিল্লীধরের সেনাপতি হইয়াছেন, সেই দিন তিনি মুসলমানের কার্যসাধনে ব্রতী হইয়াছেন । সে কার্য ভাল হউক, মন্দ হউক, ব্রত গ্রহণ করিয়া গোপনে লঙ্ঘন করা কত্রোচিত কার্য হয় নাই ; যশোবন্ত কলকে আপন যশোরাশি স্নান করিয়াছেন । তিনি সিপ্রানদী তীরে আরংজীবের নিকট পরাস্ত হইয়া অবধি আরংজীবের অতিশয় বিদ্বেষী,মচেৎ তিনি এ গর্হিত কার্য করিতেন না ।”

চতুর শিবজী দেখিলেন জয়সিংহ যশোবন্ত নহেন ! ক্ষণেক পরে আবার বলিলেন,—

“হিন্দুধর্মের উন্নতি চেষ্টা কি গর্হিত কার্য ? হিন্দুকে ভ্রাতা মনে করিয়া সহায়তা করা কি গর্হিত কার্য ?”

জয় । “আমি তাহা বলি নাই । যশোবন্ত কেন আরংজীবের কার্য ত্যাগ করিয়া, জগতের সান্ধ্যতে, ঈশ্বরের সান্ধ্যতে, আপনার সহিত যোগ দিলেন না ? আপনি বেরূপ স্বাধীনতার চেষ্টা করিতেছেন,তিনি সেইরূপ করিলেন না কি জন্য ? সত্র্যটের কার্যে থাকিয়া গোপনে বিকলচিত্রণ করা কপটাচরণ । ক্ষত্রিয়রাজ ! কপটাচরণ কি কত্রোচিত কার্য ?”

শিব । “তিনি আমার সহিত প্র-

কাশ্যো যোগ দিলে দিল্লীখর অন্য সেনাপতি পাঠাইতেন, সম্ভবতঃ আমরা উভয়ে পরাস্ত ও হত হইতাম । ”

জয় । “ যুদ্ধে মরণ অপেক্ষা কত্রিরের সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে ? কত্রিয় কি যুদ্ধে মরণ ডরে ? ”

শিবজীর মুখ আরক্ত হইল তিনি বলিলেন,—

“ রাজপুত ! মহারাজ্ঞীরেয়াও মৃত্যু ডরে না, যদি এই অকিঞ্চিৎকর জীবন দান করিলে আমার উদ্দেশ্য সাধন হয়, হিন্দু-স্বাধীনতা, হিন্দু-গৌরব পুনঃস্থাপিত হয়, তবে ভবানীর সাক্ষাতে এই মুহূর্ত্তে এই বন্ধঃস্থল-বিদীর্ণ করিব, অথবা রাজপুত ! তুমি অব্যর্থ বর্ষা ধারণ কর, এই হৃদয়ে আঘাত কর, সহাস্যবদনে প্রাণত্যাগ করিব । কিন্তু যে হিন্দু-গৌরবের বিষয় বাল্যকালে স্বপ্ন দেখিতাম, যাহার জন্য শত যুদ্ধ সুস্থিলাম, শত শত্রুকে পরাস্ত করিলাম, এই বিংশ বৎসর পার্বতে, উপত্যাকায়, শিবিরে, শত্রু মধ্যে, দিবসে, সায়ংকালে, গভীর নিশীথে, চিন্তা করিয়াছি, আমি মরিলে সে হিন্দুধর্ম্মের, সে হিন্দুস্বাধীনতার, সে হিন্দু গৌরবের কি হইবে ? যশোবস্ত ও অ মি প্রাণ দিলে কি সে সমস্ত রক্ষা হইবে ? ”

জয়সিংহ শিবজীর তেজস্বী কথাগুলি শ্রবণ করিলেন, চক্ষুতে জল দেখিলেন, কিন্তু পূর্ববৎ স্থিরভাবে দীর্ঘে দীর্ঘে উত্তর করিলেন—

“ সত্যপালনে যদি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা না হয়, সত্য লঙ্ঘনে হইবে ? বীরের শোণিতে যদি স্বাধীনতাবীজ অকুরিত না হয়, তবে বীরের চাতুরীতে হইবে ? ”

শিবজী পরাস্ত হইলেন । অনেকক্ষণ পর পুনরায় দীর্ঘে দীর্ঘে বলিলেন—“ মহারাজ ! আমি আপনাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করি, আপনার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ ভীক্ষুবৃদ্ধি যোদ্ধা আমি কখনও দেখি নাই, আমি আপনার পুত্রতুল্য । একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, আপনি পিতৃতুল্য সংপরামর্শ দিন । আমি বাল্যকালে যখন কঙ্কণপ্রদেশের অসংখ্য পর্বত ও উপত্যাকায় ভ্রমণ করিতাম, আমার হৃদয়ে নানারূপ চিন্তা আসিত, স্বপ্ন উদয় হইত । ভাবিতাম যেন সাক্ষাৎ ভবানী আমাকে স্বাধীনতা স্থাপনের জন্য আদেশ করিতেছেন, যেন দেবালয়সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে ব্রাহ্মণদিগের সম্মান বৃদ্ধি করিতে, গোবৎসাদি রক্ষা করিতে, ধর্ম্মবিরোধী মুসলমানদিগকে দূর করিতে দেবী সাক্ষাৎ উত্তেজনা করিতেছেন । আমি বালক ছিলাম, সেই স্বপ্নে ডুলিলাম, সদর্পে খজা গ্রহণ করিলাম, বীরশ্রেষ্ঠদিগকে জড় করিলাম, দুর্গ অধিকার করিতে লাগিলাম । যৌবনেও সেই স্বপ্ন দেখিয়াছি,—হিন্দু নামের গৌরব, হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য, হিন্দু স্বাধীনতা সংস্থাপন ! সেই স্বপ্নবলে দেশ জয় করিয়াছি, শত্রু জয় করিয়াছি, রাজ্য

বিস্তার করিয়াছি, দেবালয় স্থাপন করিয়াছি। কত্রিগরাজ! আমার এ উদ্দেশ্য ক'মন্দ? এ স্বপ্ন কি অলীক স্বপ্ন মাত্র? আপনি পুত্রকে উপদেশ দিন।”

বহুদূরদর্শী, ধর্মপরায়ণ, রাজা জয়সিংহ ক্রমে নিশ্চক্ৰ হইয়া রহিলেন; পরে গভীরস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন “রাজন্! আপনার উদ্দেশ্য অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আমি জানি না, আপনার স্বপ্ন অপেক্ষা প্রকৃত আর কিছুই আমি জানি না। শিবজী! তোমার মহৎ উদ্দেশ্য আমার নিকট অবিস্মৃত নাই, আমি শত্রুর নিকট, মিত্রের নিকট, তোমার উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিয়াছি, পুত্র রাম সিংহকে তোমার উদাহরণ দেখাইয়া শিক্ষা দিয়াছি, রাজপুত্র স্বাধীনতার গৌরব এখনও বিস্মৃত হয় নাই। আর শিবজী! তোমার স্বপ্নও স্বপ্ন নহে; চারিদিকে যত দেখি, মনে মনে যত চিন্তা করি, বোধ হয় মোগলরাজ্য আর থাকে না,—যত্ন, চেষ্টা, সকলই বিফল! মুসলমান-রাজ্য কমকরাশিতে পূর্ণ হইয়াছে, বিলাসপ্রিয়তার জর্জরিত হইয়াছে, পতনোন্মুখ গৃহের ন্যায় আর দাঁড়াইতে পারে না। শীঘ্র কি বিলম্বে, এই প্রাসাদতুল্য মোগলরাজ্য বোধ হয় খুলিসাৎ হইবে, তাহার পর পুনরায় হিন্দুর প্রাধান্য। মহারাষ্ট্রের জীবন অক্ষুণ্ণ হইতেছে, মহারাষ্ট্রের যৌনতেজে বোধ হয় স্তোরভবর্ষ প্রাণিত হইবে। শিবজী! তোমার স্বপ্ন

স্বপ্ন নহে, ভাবানী তোমাকে শিক্ষা উত্তেজনা করেন নাই!”

উৎসাহে, আনন্দে, শিবজীর শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল; তিনি পুনরায় স্ফীত হইলেন—

“তবে ভবাদৃশ মহাত্মা সেই পতনোন্মুখ মোগল প্রাসাদের একমাত্র সুস্থ স্বরূপ রহিয়াছেন কি জ্ঞাত?”

জয়। “সত্যপালন কত্রিগর্ভা, বাহা সত্য করিয়াছি তাহা পালন করিব। কিন্তু অসাম্য সাধন হয় না, পতনোন্মুখ গৃহ পতিত হইবে।”

শিব। “ভাল, সত্য পালন করুন, কপটাচারী আরংজীবের নিকট ও আপনার স্বর্ষাচরণ দেখিয়া দেবতারাগে বিস্মিত হইয়া আপনার সাধুবাদ করিবেন। কিন্তু আমি আরংজীবের নিকট কখনও সত্য করি নাই, আমি যদি চাতুরী দ্বারাও স্বধর্মের উন্নতি সাধনের প্রয়াস পাইয়া থাকি, আরংজীবের বিকঙ্কচরণ করিয়া থাকি, তবে সে চাতুরী কি নিন্দনীয়?”

জয়। “কত্রিগরাজ! চাতুরী যোদ্ধার পক্ষে সকল সময়ে নিন্দনীয়, কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে চাতুরী অধিকতর নিন্দনীয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের গৌরব-রক্ষা অনিবার্য, বোধ হয় তাঁহাদের বাহুবল ক্রমশঃ রক্ষি পাইবে, বোধ হয় তাঁহারা ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু শিবজী! অদ্য যে শিক্ষা আপনি দিতেছেন, সে শিক্ষা কদাচ ভুলিবে না। আ-

মার কথায় দোষ গ্রহণ করিবেন না, অদ্য আপনি নগর লুণ্ঠন করিতে শিখাইতে-
ছেন, কল্যা তাহার ত্বরতর্ক লুণ্ঠন ক-
রিবে, অদ্য আপনি চতুরতা দ্বারা জ লাভ
করিতে শিখাইতেছেন, পরে তাহার
সম্মুখযুদ্ধ কখনই শিখিবে না। যে
জাতি অচিরে ভারতের অধীশ্বর হইবে,
আপনি সেই জাতির বাসাগুরু, গুরু
ন্যায় ধর্ম শিক্ষা দিন। অদ্য আপনি
মহারাজ্ঞীরদিকে সম্মুখ-রণশিক্ষা দিন,
চতুরতা বিস্মৃত হইতে বলুন আপনি হিন্দু-
শ্রেষ্ঠ! আপনার মহৎ উদ্দেশ্য আমি শত
শতবার ধন্যবাদ করিয়াছি, আপনি এই
উন্নত শিক্ষা না দিলে কে দিবে? মহা-
রাষ্ট্রের শিক্ষাগুরু! সাবধান! আপনার
প্রত্যেক কার্যের ফল বহুকালব্যাপী—
বহুদেশব্যাপী হইবে! মন্দ শিক্ষা দিলে
শতবর্ষ পর্যন্ত দেশে দেশে সেই শিক্ষার
ফল দৃষ্ট হইবে। রুদ্ধ বহুদর্শী রাজপুত্রের
কথা গ্রহণ করুন।”

এই মহৎ বাক্য শুনিয়া শিবজী ক-
ণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, শেষে বলি-
লেন,—

“আপনি গুরু গুরু! আপনার
উপদেশগুলি শিরোধার্য! কিন্তু অদ্য
আমি আরংজীবের অধীনতা স্বীকার করি-
লাম, শিক্ষা কবে দিব?”

জয়। “জয় পরাজয়ের দ্বিরতা নাই।
অদ্য আমার জয় হইল, কল্যা তোমার জয়
হইতে পারে; অদ্য তুমি আরংজীবের

অধীন হইলে, ঘটনাক্রমে কল্যা স্বাধীন
হইতে পারে।”

শিব। “জগদীশ্বর তাহাই কখন,
কিন্তু আপনি আরংজীবের সেনাপতি
থাকিতে আমার স্বাধীন তওয়ার আশ-
রূপ। এবং ভবানী হিন্দুসেনাপতির সহিত
যুদ্ধ করিতে নিবেদন করিয়াছেন।”

জয়সিংহ জয় হামিরা বলিলেন—
“শরীর ক্ষণভঙ্গুর, এ রুদ্ধ শরীর কত
দিন থাকিবে?—কিন্তু যতদিন থাকিবে
সতাপালনে বিরত হইবে না।”

শিব। “আপনি দীর্ঘজীবী হউন।”

জয়। “শিবজী! এক্ষণে বিদায়
দিন;—আমি আরংজীবের পিতার নি-
কট কার্য করিয়াছি, এক্ষণে আরংজী-
বের অধীনে কার্য করিতেছি, যতদিন
জীবিত থাকিব দিল্লীর এ রুদ্ধ সেনা বি-
ক্রোহাচরণ করিবে না;—কিন্তু কত্রিয়
প্রবর! নিশ্চিন্ত থাক, মহারাষ্ট্রের গৌরব,
হিন্দুর প্রাধান্য অনিবার্য! রুদ্ধের বচন
গ্রোহা কর, বহুদর্শিতার কথা গ্রোহা কর,
মোগলরাজ্য আর থাকে না, হিন্দুতেজ
আর নিবারিত হয় না, তখন দেশে দেশে
হিন্দুর গৌরব নাম, তোমার গৌরব নাম,
প্রতিধ্বনিত হইবে।”

শিবজী অশ্রুপূর্ণ লোচনে জয়সিং-
হকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন “ধর্মী-
স্বন্দু! আপনার মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক,
আপনার কথাই যেন সার্থক হয়! আপ-
নার সহিত যুদ্ধ করিব না, আমি আত্মস-

মরণ করিয়াছি ; কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে পু-
নরায় স্বাধীন হইতে পারি, তবে ক্ষত্রিয়প্র-
বর ! আর একদিন আপনার সহিত সা-
ক্ষাৎ করিব, আর একদিন পিতার চরণো-
পাশ্বে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিব ।”



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

দুর্গবিজয় ।



“ চৌদিকে এবে সময়ভরজ
উখলিল,সিদ্ধু যথা স্বম্বিবাসুসহনির্ঘোষে ।”

মধুসূদন দত্ত ।

শীত্ৰই সন্ধিস্থাপন হইল । শিবজী
মোগলদিগের নিকট হইতে যে যে দুর্গ
জয় করিয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া দিলেন,
বিলুপ্ত আহমদনগর রাজ্যের মধ্যে যে
ছাত্রিংশৎ দুর্গঅধিকার বা নিৰ্ম্মাণ করি-
য়াছিলেন তাহার মধ্যেও ২০টা ফিরাইয়া
দিলেন, অবশিষ্ট দ্বাদশটীমাত্র আবংজী-
বের অধীনে জায়গীর স্বরূপ রাখিলেন ।
যে প্রদেশ তিনি সত্ৰাটিকে দিলেন তাহার
বিনিময়ে বিজয়পুর রাজ্যের অধীনস্থ ক-
তক প্রদেশ সত্ৰাট শিবজীকে দান করি-
লেন, ও শিবজীর অষ্টমবর্ষীয় বালক শ-
জুজী পাঁচ হাজারীর মনসবদারপদ প্রাপ্ত
হইলেন ।

শিবজীর সহিত যুদ্ধ সমাপ্তির পর রাজা
জয়সিংহ বিজয়পুরের রাজ্য হংস করিয়া
সেই প্রদেশ দিল্লীশ্বরের অধীনে আনিবার

যত্ন করিতে লাগিলেন । শিবজীর পিতা
বিজয়পুরের সহিত শিবজীর যে সন্ধিস্থা-
পন করিয়াছিলেন, শিবজী তাহা লঙ্ঘন
করেন নাই, কিন্তু শিবজীর বিপদকালে
বিজয়পুরের মুলতান সন্ধি বিন্ধরণ হইয়া
শিবজীর রাজ্য আক্রমণ করিতে সঙ্কচিত
হয়েন নাই । সুতরাং শিবজী এক্ষণে জয়-
সিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়া বিজয়পুরের
মুলতান আলী আদিলশাহের সহিত যুদ্ধা-
রম্ভ করিলেন, এবং আপন মাউনী সৈন্য-
দ্বারা বহুসংখ্যক দুর্গ হস্তগত করি-
লেন ।

জয়সিংহের সহিত শিবজীর সম্ভাব
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ও পর-
স্পন্দনের মধ্যে অতিশয় স্নেহ জন্মাইল ।
উভয়ে সর্বদাই একত্র থাকিতেন, ও যুদ্ধে
পরস্পরের সহায়তা করিতেন । বলা বা-
হুল্য, যে শিবজীর একজন ভকণ হাবেল-
দার সর্বদাই জয়সিংহের একজন পুরো-
হিতের সদনে যাইতেন । নাম বলিবার
কি আবশ্যক আছে ?

সরলস্বভাব পুরোহিত জনার্দনও
ক্রমে রত্ননাথকে পুত্রবৎ দেখিতে লাগি-
লেন, সর্বদাই গৃহে আশ্রয় করিতেন ;
রত্ননাথও যখন পারিতেন পুরোহিতের
আবাসস্থান আপন আবাসস্থান করিতেন ।
এরূপ অবস্থায় রত্ননাথ ও সরযুর সর্বদাই
দেখা হইত, সর্বদাই কথা হইত, উভয়ের
জীবন, মন, প্রাণ-প্রথম প্রাণের অনির্ব-
চনীয় আনন্দলহরীতে প্লাবিত হইতে লা-

গিল। জগতে রঘুনাথ ও সরযু অপেক্ষা কে সুখী? সরলচিত্ত জ্ঞানদীন তাহা-দিগের জীবনের ভাব কিছুই বুঝিতেন না, কখন কখন তাহাদিগকে একত্র দেখিতেন বা কথা কহিতে দেখিতেন, কিন্তু রঘুনাথ “বাড়ীর ছেলে”, নিষেধ করিতেন না। রঘুনাথও জ্ঞানদীনকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

কএক মাসের মধ্যে বিজয়পুর অধীনস্থ অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিয়া শিবজী অবশেষে একটি অতিশয় দুর্গম পর্বতদুর্গ লইবার মানস করিলেন। তিনি কবে কোন্ দুর্গ আক্রমণ করিবেন, পূর্বে শত্রুকে তাহার সংবাদ দিতেন না, নিজের সৈন্যেরাও পূর্বে কিছুমাত্র জানিতে পারিত না। দিবাভাগে সেই দুর্গ হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে জয়সিংহের শিবিরের নিকটই তাহার শিবির ছিল, মায়ংকালে এক সহস্র মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনাকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন, এক প্রহর রজনীর সময়, গভীর অন্ধকারে প্রকাশ করিলেন যে কত্মগুণ দুর্গ আক্রমণ করিবেন। নিঃশব্দে সেই এক সহস্র সেনাসময়ে দুর্গাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন।

অন্ধকার নিশীথে নিঃশব্দে দুর্গতলে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে সমভূমি, তাহার মধ্যে একটি উচ্চ পর্বতশৃঙ্গের উপর কত্মগুণদুর্গ নির্মিত হইয়াছে। পর্বতে উঠিবার একমাত্র পথ আছে, একগণে বুদ্ধকালে সেই পথ বন্ধ হইয়াছে;

অত্যাঁত্র দিকে উঠা অতিশয় কষ্টসাধ্য, পথ নাই, কেবল জঙ্গল ও শিলামাণি পরিপূর্ণ। শিবজী সেই কঠোর দুর্গম স্থান দিয়া সেনাসাংগকে পর্বত আরোহণ করিবার আদেশ দিলেন; তাহার মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনা যেন পর্বত-বিড়ালের ন্যায় সেই বৃক্ষ ধরিয়া, শৈল হইতে শৈলাস্তরে লক্ষ দিতে দিতে পর্বত আরোহণ করিতে লাগিল। কোন স্থানে দাঁড়াইয়া, কোন স্থানে বসিয়া, কোথাও বৃক্ষের ডাল ধরিয়া লম্বমান হইয়া, কোথাও বা লক্ষ দিয়া, সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে লাগিল, মহারাষ্ট্রীয় সেনা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সৈন্য এরূপ পর্বত আরোহণে সমর্থ কি না সন্দেহ। সহস্র সেনা এই রূপে পর্বত আরোহণ করিতেছে, কিন্তু শব্দমাত্র নাই, নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর নিশীথে কেবল নৈশবায়ু এক একবার সেই পর্বত-বৃক্ষের মধ্য দিয়া মর্ম্মর শব্দে বহিয়া যাইতেছে।

অর্ধেক পথ উঠিলে পর শিবজী সহসা দেখিলেন, উপরে দুর্গপ্রাচীরের উপর একটি উজ্জ্বল আলোক। চিন্তাকুল হইয়া ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন; শত্রুরা কি তাহার আগমন-বার্তা শুনিতে পাইয়াছেন? নচেৎ প্রাচীরের উপর এরূপ আলোক কেন? আলোকের কিরণ দুর্গের নীচে পর্য্যন্ত পতিত হইয়াছে, যেন দুর্গবাসিগণ শত্রুপ্রতীক্ষা করিয়াই এই আলোক জ্বালিয়াছে যে অন্ধকারে আরত

হইয়া কেহ দুর্গ আক্রমণ করিতে না পারে। ক্ষণকাল চিন্তাকুল হইয়া সেই আলোকের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পট্টের নিজ সৈন্যগণকে আরও সতর্কভাবে রক্ষণ ও শৈলরাশির অন্তরাল দিয়া ধীরে ধীরে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। নিঃশব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ সেই পর্বত আরোহণ করিতে লাগিল, যেখানে বড় রক্ষণ, যেখানে ঝোপ, যেখানে শৈলরাশি, সেই সেই স্থান দিয়া বুকে হাঁটুরা উঠিতে লাগিল, শব্দমাত্র নাই, অন্ধকারে নিঃশব্দে শিবজী সেই পর্বতে উঠিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পর একটী পবিষ্কার স্থানের নিকট আসিয়া পড়িলেন, উপর হইতে আলোক তথায় স্পষ্টরূপে পতিত হইয়াছে, সে স্থান দিয়া সৈন্য বাইলে, উপর হইতে দেখা যাওয়ার অতিশয় সম্ভাবনা। শিবজী পুনরায় দণ্ডায়মান হইলেন; রক্ষকের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া এদিকে ওদিকে দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে দেখিলেন প্রায় ১০০ হস্ত পরিমাণ স্থানে রক্ষণমাত্র নাই, পরে পুনরায় রক্ষণশীল রহিয়াছে। এই ১০০ হস্ত কিরূপে যাওয়া যায়? পার্শ্বে দেখিলেন, বাইবার কোন উপায় নাই, নীচে দেখিলেন, অনেক দূর আসিয়াছেন, পুনরায় নীচে বাইয়া অন্য পথ অবলম্বন করিলে দুর্গে আসিবার পূর্বেই প্রাতঃকাল হইতে পারে। শিবজী ক্ষণেক নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন; পরে বাল্যকালের স্মৃতি বিধাতী মাউলী যোদ্ধা

তন্নজী মালিকীকে ডাকাইলেন; দুইজন সেই রক্ষকের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণেক অতি মূহুর্ত্তরে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে তন্নজী চলিয়া বাইলেন, শিবজী অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার সমস্ত সৈন্য নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে তন্নজী ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার শরীর সিক্ত, কেশ ও সমস্ত পরিচ্ছদ হইতে জল পড়িতেছে। তিনি শিবজীর নিকট আসিয়া অতি মূহুর্ত্তরে কি কহিলেন; শিবজী ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া বলিলেন, “তাঁহাই হউক, অন্য উপায় নাই।” তিনি পুনরায় সেনাদিগকে চলিবার আদেশ দিলেন, তন্নজী অগ্রে অগ্রে চলিলেন।

রুষ্টির জল অবতরণ ঘাটা এক স্থানে প্রস্তর কয় পাইয়া প্রণালীর ন্যায় হইয়াছিল। দুই পাখ' উচ্চ, মধ্য গভীর, রুষ্টির সময় সেই গভীর স্থান জলে পরিপূরিত হইত, এখনও তাহাতে জল আছে। সেই জল ভাঙ্গিয়া বুকে হাঁটুরা বাইলে পর দুই পাখ' উচ্চ পাড় থাকায় সম্ভবতঃ শত্রুরা দেখিতে পাইবে না, এই পরামর্শ স্থির হইল ও সমস্ত সৈন্য ধীরে ধীরে সেই জ্রোতের মধ্য দিয়া পর্বত আরোহণ করিতে লাগিল। শত সহস্র শিলাখণ্ডের উপর দিয়া নিস্তক্ক অন্ধকার রজনীতে অনন্তমাদে পর্বতজল অবতরণ করিতেছে, সেই শিলাখণ্ডের উপর দিয়া, সেই জল

ভাল্লিরা সহস্র সেনা নিঃশব্দে পর্বত আরোহণ করিতে লাগিল। অচিরে উপরিস্থ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিল, শিবজী মনে মনে ভবানীকে ধন্যবাদ করিলেন।

সহস্রা তাঁহার পার্শ্ব একজন সেনা পতিত হইল, শিবজী দেখিলেন, তাহার বক্ষস্থলে তীর লাগিয়াছে। আর একটা তীর, আর একটা, আরও বহু সংখ্যক তীর! শত্রুগণ জাগরিত হইয়া রহিয়াছে, শিবজীর সৈন্য জলপ্রণালী দিয়া আরোহণ করিবার সময় তাহাদের সন্দেহ হওয়ার তাহারা সেই দিকে তীর নিক্ষেপ করিয়াছে।

শিবজীর সমস্ত সৈন্য বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইল, তীর নিক্ষেপ থামিয়া গেল, শিবজী বুঝিলেন শত্রুরা সন্দেহ করিয়াছে মাত্র, এখনও স্পর্শে বুঝিতে পারে নাই। তিনি দুর্গের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটা আলোকের স্থলে দুই তিনটা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, সময়ে সময়ে প্রহরীগণ এদিক ওদিক ঘাইতেছে; তখন তিনি দুর্গপ্রাচীর হইতে কেবল মাত্র ৩০০ হস্ত দূরে। বুঝিলেন সৈন্যগণ সতর্কিত হইয়াছে, ভীষণ যুদ্ধ বিনা অদ্য দুর্গ হস্তগত হইবার নহে!

শিবজীর চির সহচর তন্নজী মালজীও এ সমস্ত দেখিলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন “রাজনু! একণ ও নামিয়া যাইবার সময়; অদ্য দুর্গ হস্তগত না হয় কল্য

হইবে, কিন্তু অদ্য চেষ্টা করিলে সকলের বিনাশ হইবার সম্ভাবনা আছে।” বিপদরাশির মধ্যে শিবজীর সাহস ও উৎসাহ সহস্র গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। তিনি বলিলেন “জয়সিংহের নিকট যাহা বলিয়াছি তাহা করিব, অদ্য কত্ৰমণ্ডল লইব অথবা এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিব।” শিবজীর নয়নধর উজ্জ্বল, স্বর স্থির ও অকম্পিত, তন্নজী দেখিলেন অত্র পরামর্শ রূপা, বলিলেন “বিপদের সময় প্রভুপার্শ্ব ভিন্ন তন্নজীর অস্ত্র স্থল নাই, অগ্রসর হউন।”

শিবজী নিস্তব্ধে সেই বৃক্ষশ্রেণীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শত্রুকে ভুলাইবার জন্ত এক শত সৈন্যকে দুর্গের অপর পার্শ্বে যাইয়া গোল করিতে আদেশ করিলেন। এক দণ্ড কালের মধ্যে দুর্গের অপর পার্শ্বে গোল শুনা যাইল, সেই দিক হইতে শিবজী দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া দুর্গস্থ প্রহরী ও সৈন্য সকলে সেই দিকে ধাবমান হইল। এ দিকে প্রাচীরোপরি যে দুই তিনটা আলোক জ্বলিতেছিল তাহা নিবিয়া যাইল। তখন শিবজী বলিলেন “মহারাজ্ঞীরগণ! শত যুদ্ধে তোমরা আপন বিক্রমের পরিচয় দিয়াছ, শিবজীর নাম রাখিয়াছ, অদ্য আর একবার সেই পরিচয় দাও! তন্নজী! বাল্যকালের সৌহৃদ্যের পরিচয় অস্ত্র প্রদান কর।” পরে রঘুনান্দজীউকে পার্শ্বে দেখিয়া বলিলেন “হাবেলদার! এক

দিন আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছিলে, অন্য বাঁচাও ।” প্রভুবাক্যে সকলের হৃদয় সাহসে পরিপূরিত হইল, নিঃশব্দে সেই গভীর অন্ধকারে সকলে অগ্রসর হইলেন, অচিরে দুর্গপ্রাচীরের নিকট পহুছিলেন । রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, আকাশে আলোক নাই, জগতে শব্দ নাই, কেবল রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু সেই পর্বত বৃক্ষের ভিতর দিয়া মর্ধুর শব্দে প্রবাহিত হইতেছে ।

কত্মগলের প্রাচীর হইতে শিবজী পঞ্চাশৎ হস্ত দূরে আছেন, এমন সময় দেখিলেন প্রাচীরের উপর এক জন প্রহরী ;—বৃক্ষের ভিতর শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রহরী পুনরায় এই দিকে আসিয়াছে । একজন মাউলী নিঃশব্দে একটী তীর নিক্ষেপ করিল,—হতভাগা প্রহরীর মৃত শরীর প্রাচীরের বাহিরে পতিত হইল ।

সেই শব্দ শুনিয়া আর এক জন, দুই জন, দশ জন, শত জন, ক্রমে দুই তিন শত লোক প্রাচীরের উপর ও নীচে জড় হইল ; শিবজী রোষে ওষ্ঠের উপর দস্ত স্থাপন করিলেন, আর লুক্কানিত থাকিবার উপায় দেখিলেন না, সৈন্যকে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন ;

তৎক্ষণাৎ মহারাষ্ট্রীয়দিগের “ হর হর মহাদেও ” ভীষণবাদ গগনে উল্লিখিত হইল, এক দল প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার জন্য দৌড়াইয়া গেল, আর এক দল বৃক্ষের ভিতর থাকিয়াই কিপ্রহস্তে প্রাচী-

রারোহী মুসলমানদিগকে তীর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল । মুসলমানেরাও শত্রুর আগমনে কিছু মাত্র ভীত না হইয়া “ আ-ল্লাহু আকবর ” শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিল, কেহ বা প্রাচীরের উপর হইতে তীর ও বর্ষা নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ বা উৎসাহপরিপূর্ণ হইয়া প্রাচীর হইতে লক্ষ দিয়া আসিয়া বৃক্ষ-মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিল ।

শীঘ্রই সেই প্রাচীরতলে ও বৃক্ষমধ্যে ভীষণকাণ্ড হইয়া উঠিল । প্রাচীরের উপরিস্থ মুসলমানেরা সবল বর্ষাচালনে আক্রমণকারীদিগকে হত করিতে লাগিল, তাহারাও অব্যর্থ তীর সঞ্চালনে মুসলমানদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল । রাশি রাশি মৃত দেহে প্রাচীর-পার্শ্ব পরিপূর্ণ হইল, যোদ্ধৃগণ সেই মৃত দেহের উপর দণ্ডায়মান হইয়া খজা বা বর্ষা চালন করিতে লাগিল, বক্তে আক্রান্ত ও আক্রমণকারীদিগের শরীর রক্তিত হইয়া যাইল । শত শত মুসলমানেরা বৃক্ষের ভিতর পর্ষন্ত আসিয়াছিল ; শিবজীর মাউলীগণ একেবারে ব্যাঘ্রের ন্যায় লক্ষ দিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, কেবলপ্রতাপ আফগানেরাও যুদ্ধে অপটু নহে, রক্ত-স্রোত সেই পর্বত দিয়া বহিয়া পড়িতে লাগিল । বৃক্ষের অন্তরালে ঝোপের ভিতর, শিলারানির পার্শ্ব শত শত মহারাষ্ট্রীয়গণ দণ্ডায়মান হইয়া অব্যর্থ তীর ও বর্ষা সঞ্চালন করিতে লাগিল, বৃক্ষপত্র ও

রক্ষাধার ভিতর দিয়া অব্যাহত স্রোতে সেই তীর আক্রান্তদিগের সংখ্যা ক্রীণতর করিতে লাগিল, আক্রমণকারী ও আক্রান্তদিগের ঘন ঘন সিংহনাদে ও আত্মদীনের আত্মনাদে সেই নৈশ গগন কম্পিত হইতে লাগিল।

সহসা এ সমস্ত শব্দকে ডুবাইয়া প্রাচীর হইতে “ শিবজী কি জয় ” এইরূপ বজ্রনাদ উদ্ভূত হইল। মুহূর্তের জন্য সকলেই সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া, মৃতদেহরাশির উপর দাঁড়াইয়া, রক্তাপ্লুত বর্ষার উপর ভর দিয়া একজন মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা এক লক্ষ রক্তমণ্ডলের প্রাচীরের উপর উঠিয়াছেন; তথায় পঠানদিগের পতাকা পদাঘাতে ফেলিয়া দিয়াছেন, পতাকাধারী ও দুই একজন প্রহরীকে বর্ষা ও খজা চালনে হত করিয়াছেন, প্রাচীরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া সেই অপূর্ব যোদ্ধা বজ্রনাদে “ শিবজী কি জয় ” শব্দ করিয়াছিলেন, সেই যোদ্ধা রঘুনাথজী হাবেলদার।

হিন্দু ও মুসলমান এক মুহূর্তের জন্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া বিন্ময়েৎফুল লেচনে তারকালোকে সেই দীর্ঘ মূর্তিরদিকে দৃষ্টি করিল। যোদ্ধার লৌহনির্মিত শিরস্ত্রাণ তারকালোকে চক্ মক্ করিতেছে, হস্ত, বাহু, পদঘর রক্তে আধ্বুত, বিশাল বক্ষের চর্মে দুই একটী তীর লাগিয়া রহিয়াছে, দীর্ঘ হস্তে রক্তাপ্লুত, অতি দীর্ঘ বর্ষা, উজ্জল নয়ন গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকেশে আরত। শত্রু-

রাও পোন্তের সম্মুখে উর্ধ্বাশির ন্যায়, এই যোদ্ধার দুই পাশ্বে মুহূর্তের জন্য সচকিতে সরিয়া গেল, সেই দীর্ঘ বর্ষাধারীর নিকট সহসা কেহ আসিল না, মুহূর্তের জন্য বোধ হইল যেন স্বয়ং রণদেব দীর্ঘ বর্ষা হস্তে আকাশ হইতে প্রাচীরোপরি অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ক্ষণকাল মাত্র সকলে নিস্তব্ধ রহিল; পরেই আকগাগগণ, শত্রু প্রাচীরে উঠিয়াছে দেখিয়া, চারিদিক হইতে বেগে আসিতে লাগিল; রঘুনাথকে চারিদিকে শত্রুদল রক্ষমেঘের ন্যায় আসিয়া বেষ্টিত করিল। রঘুনাথ খজা ও বর্ষাচালনে অরিতীয়, কিন্তু শত লোকের সহিত যুদ্ধ অসম্ভব, রঘুনাথের জীবন সংশয়।

কিন্তু মাউলীগণও ক্ষান্ত রহিল না। রঘুনাথের বিক্রম দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া সকলে সেই প্রাচীরের দিকে ধাবমান হইল; বাস্ত্রের ন্যায় লক্ষ দিয়া প্রাচীরে উঠিল, রঘুনাথের চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, দশ পঞ্চাশ, দুই তিন শতজন সেই প্রাচীরের উপর বা উভয় পাশ্বে আসিয়া জড় হইল, ছুরিকা ও খজাঘাতে পাঠানদিগের সারি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পথ পরিষ্কার করিল, মহানাদে দুর্গ পরিপূরিত করিল! সহস্র মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত দুই তিন শত পাঠানের যুদ্ধ করা সম্ভবনহে, তাহার মহারাষ্ট্রীয়ের গতিরোধ করিতে পারিল না কিন্তু তখনও সিংহবীর্য প্রকাশ করিয়া গতিরোধের চেষ্টা করিতেছে।

সেই তুঘল হতাকাণ্ডের মধ্যে আর একটা বজ্রনাদ উত্থিত হইল; শিবজী ও তরঙ্গী প্রাচীর হইতে লক্ষদিয়া দুর্গের তিতরদিকে ধাবমান হইতেছেন; সৈন্তগণ বুঝিল, আর এখানে যুদ্ধের আবশ্যকনাট, সকলেই প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুর্গের তিতর দিকে ধাবমান হইল। পাঠানগণ প্রায় হত কি আহত, মহারাষ্ট্রীয়দিগের পশ্চাৎকাবন করিতে অসমর্থ!

শিবজী সিদ্ধান্ত-গতিতে কিল্লাদারের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, সে প্রাসাদ অতিশয় কঠিন ও সুরক্ষিত, সহস্র মহারাষ্ট্রীয়ের বর্ষাধাতে প্রাচীর ও দ্বারদেশ কল্পিত হইল, কিন্তু ভাঙ্গিল না। শিবজীর আদেশ অনুসারে মহারাষ্ট্রীয়েরা সেই প্রাসাদ বেষ্টিত করিল ও বাহিরের প্রহরী সকলকে হত করিল। শিবজী তখন বজ্রনাদে কিল্লাদারকে বলিলেন “ দ্বার খুলিয়া দাও, নচেৎ প্রাসাদ দাহ করিব, প্রাসাদবাসী সকলে বিনষ্ট হইবে। ” নির্ভীক পাঠান উত্তর করিলেন “ অগ্নিতে দগ্ধ হইব, কিন্তু কাফেরের সম্মুখে দ্বার খুলিব না। ”

তৎকালে শত মহারাষ্ট্রীয় মশাল আনিয়া দ্বারে ও জানালায় অগ্নিদান করিতে লাগিল। উপর হইতে কিল্লাদার ও তাঁহার সঙ্গীগণ তীর ও বর্ষা নিক্ষেপে প্রাসাদে অগ্নিদান নিবারণ করিবার চেষ্টা পাইলেন, শত মহারাষ্ট্রীয় মশালহস্তে ভূতলশায়ী হইল, কিন্তু অগ্নি জ্বলিল।

প্রথমে দ্বার, গণাক, পরে কড়িকাট, পরে সেই বিস্তীর্ণ প্রাসাদ সমস্ত অগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিল, সেই প্রচণ্ড আলোক ভীষণনাদে আকাশের দিকে ধাবমান হইল, ও রজনীর অন্ধকারকে আলোকময় করিল। দুর্গের উপরে নীচের পল্লিগ্রামে, বহুদূর পর্য্যন্ত পর্নভে ও উপত্যকায় সেই আলোকস্তম্ভ দৃষ্ট হইল, সেই দাহের শব্দ শ্রুত হইল, সকলে জানিল শিবজীর দুর্গ-মনীয় ও অপ্রতিহত সেনা মুসলমান-দুর্গ জয় করিয়াছে!

বীরের বাহা সাধা, পাঠান কিল্লাদার রহমৎ খাঁ তাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সঙ্গের যোদ্ধার সহিত বীরেরজায় মরিতে বাকি ছিল। যখন গৃহ অগ্নিপূর্ণ হইল, রহমৎ খাঁ ও সঙ্গীগণ লক্ষ দিয়া ছাদ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন, এক এক জন এক এক মহাবীরেরজায় খজা চালনা করিতে লাগিলেন, সেই খজা চালনায় বহু মহারাষ্ট্রীয় হত হইল।

সকলে সেই মুসলমানদিগকে বেষ্টিত করিল, তাঁহার শত্রুর মধ্যে চন্দ্রকার পরাক্রম প্রকাশ করিয়া একে একে হত হইতে লাগিলেন। একজন, দুইজন, দশজন হত হইলেন। রহমৎ খাঁ আহত ও ক্ষীণ, তখনও সিংহবীর্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে চারিদিকে বেষ্টিত করিয়াছে, চারিদিকে খজা উত্তোলিত হইয়াছে, তাঁহার জীবনের আশা নাই, এরূপ সময় উল্লেস্বরে শিবজীর

আদেশ প্রদত্ত হইল “কিল্লাদারকে বন্দী কর, বীরের প্রাণসংহার করিও না।” ক্রীণ আহত আকগানের হস্ত হইতে খড়া কাড়িয়া লইল, তাঁহার হস্ত বন্ধন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিল।

মহারাজ্ঞীরেরা প্রাসাদের অগ্নি নিরূপণ করিতেছে এমন সময় শিবজী দেখিলেন দুর্গের অপর পার্শ্ব হইতে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় প্রায় ছয়শত আকগান সৈন্য রাশীকৃত হইয়া আনিতোছে। শিবজী দুর্গপ্রাচীর আক্রমণ করিবার পূর্বে যে একশত সেনাকে অপর পার্শ্বে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহারা সেইদিকে গোলকরাতে দুর্গের অধিকাংশ সেনা সেই দিকেই গিয়াছিল; ধূর্ত মহারাজ্ঞীরগণ ক্রমে ক্রমে পলায়ন করিতে লাগিল, তাহাতে মুসলমানেরা উৎসাহিত হইয়া পর্বতের তল পর্বান্ত সেই একশত মহারাজ্ঞীরের পশ্চাৎগমন করিয়াছিল, অপর দিকে শিবজী আক্রমণ করিয়া যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন তাহা তাহারা কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই।

পরে যখন প্রাসাদের আলোকে ক্ষেত্র, গ্রাম, পর্বত ও উপত্যকা উদ্ভীণ হইয়া উঠিল, তখন সেই অধিকাংশ মুসলমানগণ আপনাদিগের ভ্রম জানিতে পারিয়া পুনরায় দুর্গারোহণ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কপ হইল। শিবজী অল্প সংখ্যক সেনাকে পরাস্ত করিয়া দু-

র্গজয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে অপর পার্শ্ব হইতে পাঁচ কি ছয়শত যোদ্ধা আনিতোছে দেখিয়া তাঁহার মুখ গভীর হইল।

মুতীক নয়নে দেখিলেন দুর্গের মধ্যে কিল্লাদারের প্রাসাদই সর্বাপেক্ষা দুর্গমস্থান। চারিদিকে পরিখা, তাহার পর প্রস্তরময় প্রাচীর, অগ্নিতে সে প্রাচীরের কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। তাহার মধ্যে প্রাসাদ, প্রাসাদের দ্বার ও গণ্ডাঙ্ক জুলিয়া গিয়াছে, কোথাও বা ঘর পড়িয়া প্রস্তর রাশি হইয়াছে, তীক্ষ্ণনয়ন শিবজী মুহূর্তের মধ্যে দেখিলেন অধিক সংখ্যক সৈন্যের বিকল্পে যুদ্ধ করিবার স্থল ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর হইতে পারে না।

মুহূর্তের মধ্যে মনে সমস্ত ধারণা করিলেন; স্বয়ং তন্নজী ও দুইশত সেনা সেই প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, প্রাচীরের পার্শ্বে তিরন্দাজ রাখিলেন, দ্বার গণ্ডাঙ্কের পার্শ্বে পার্শ্বে তিরন্দাজ রাখিলেন, ছাদের উপর বর্ষাধারী যোদ্ধাগণকে সন্নিবেশিত করিলেন; কোথাও প্রস্তর পত্রিকার করিলেন, কোথাও অধিক প্রস্তর একত্র করিলেন, মুহূর্ত মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত। তখন হাস্য করিয়া তন্নজীকে কহিলেন “এই আমাদের শেষ উপায়, কিন্তু শত্রুকে এই স্থানে আনিতো দিবার পূর্বেই বোধ হয় পরাস্ত করা যাইতে পারে, অন্ধকারে সহসা আক্রমণ করিলে তাহারাতদ দিয়া পলায়ন করিবে। তন্নজী, দুইশত সৈন্যসহিত এই স্থানে অবস্থিত কর,

আমি একবার উদ্যোগ করিয়া দেখি।”

তন্নজী । “ তন্নজী এখানে অবস্থিতি করিবে না, একজন মহারাষ্ট্রীয় ও এখানে অবস্থিতি করিবে না! কত্রিররাজ! সম্মুখ যুদ্ধে সকলেই অপটু, কিন্তু যদি এখানে আক্রান্ত হয় তবে আপনি না থাকিলে কাহার কৌশল-বলে এ প্রাসাদ রক্ষিত হইবে? ”

শিবজী দ্বিধা-হাস্য করিয়া বলিলেন “ তন্নজী! তোমার কথাই ঠিক! আমি সম্মুখে শত্রু দেখিয়া যুদ্ধলুপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু না, এই স্থানেই আমার থাকা কর্তব্য। আমার হাবেলদারদিগের মধ্যে কে তিন শত মাত্র সেনা লইয়া ঐ আফগানগণকে অন্ধকারে সহসা আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিতে পারিবে? ”

পাঁচ, সাত, দশ জন হাবিলদার একে বারে দণ্ডায়মান হইলেন, সকলে গোল করিয়া উঠিল। রঘুনাথ তাহাদের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে মৃত্তিকারদিকে চাহিয়া রহিলেন।

শিবজী ধীরে ধীরে সকলের দিকে চাহিয়া, পরে রঘুনাথকে দেখিয়া বলিলেন “ হাবেলদার! তুমি ইহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ, কিন্তু ঐ বাহতে অন্তরবীৰ্য্য ধারণ কর, অদ্য তোমার বিক্রম দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমিই অদ্য দুর্গবিজয় আরম্ভ করিয়াছ, তুমিই শেষ কর। ”

রঘুনাথ নিঃশব্দে তুমি পর্য্যন্ত শির

নমাইয়া তিন শত সেনার সহিত বিদ্যুৎগতিতে নরনের বহির্গত হইলেন।

শিবজী তন্নজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন হাবেলদার রাজপুত্র জাতীয়; উহার মুখমণ্ডল ও আচরণ দেখিলে কোন উন্নত বীরবংশোদ্ভব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু হাবেলদার কখন বংশের বিষয় একটী কথাও বলে না, আপনি অসাধারণ সাহস সম্বন্ধে একটী গর্ভিত বাক্যও উচ্চারণ করে না, কেবল যুদ্ধকালে, বিপৎকালে, সেই সাহস ও বিক্রম কার্যে পরিণত করে। এক দিন পুনঃ আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, অদ্য রঘুনাথই দুর্গবিজয়ে অগ্রসর,—আমি এপর্য্যন্ত কোনও পুরস্কার দিই নাই, কল্যা রাজসভায় রাজ্য জয়নিঃস্বের সম্মুখে রঘুনাথ সাহসের উচ্চিৎ পুরস্কার পাইবেন। ”

রঘুনাথজী যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা করেন নাই, করিতে চেষ্টাও করেন নাই; একেবারে তিন শত মাউলীর সহিত বর্ষা-হস্তে দুর্দমনীর ভীষণ বেগে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিলেন। ত্রিংশৎ হস্ত দূর হইতে সকলে অব্যর্থ বর্ষা নিক্ষেপ করিল, পরে “ হর হর মহাদেও ” ভীষণ নাদে ব্যাঘ্রের মত লক্ষ দিয়া মুসলমানদিগের মধ্যে বাইয়া পড়িল। সে বেগে অমানুষিক ও অনিবার্য্য, যুদ্ধের মধ্যে প্রবল পরাক্রান্ত আফগানশ্রেণীও ছারখার ও ভিন্ন হইয়া গেল, উন্নত মাউলীদিগের অব্যর্থ ছুরিকা ও খজা

আঘাতে আফগানগণ নিপতিত হইতে লাগিল।

কিন্তু আফগানগণও যুদ্ধবিষয়ে অ-পটু নহেন; জেগীচাত হইয়াও হটিল না, পুনরায় উঠিঃস্বরে যুদ্ধনিবাদের করিয়া মা-উলীদিগকে বেঁচন করিল, মুহুর্ত মধ্যে যে দৃশ্য দৃষ্ট হইল তাহার বর্ণনা দুঃসাপ্য। নিবিড় অন্ধকারে শত্রু মিত্র দেখা যায় না, আপন হস্তের অসি ভাল দেখা যাইতেছে না, মৃতদেহে সেই স্থান পরিপূর্ণ হইল, রক্ত স্রোতরূপে ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল, বর্ষা, ঋজা, ছুরিকা অব্যাহত পরিচালিত হইতেছে, যুদ্ধনিবাদের মেদিনী ও গগন পরিপূর্ণিত হইতেছে; বোধ হয় যেন এ মনুষ্যের যুদ্ধ নহে, শত সহস্র রক্তলোলুপ ক্ষুধিত ব্যাঘ্র পৈশাচিক শব্দে পরস্পরকে নখদ্বারা বিদীর্ণ করিতেছে।

যখন যখন ভীষণন্যাদে বেকনকারী আফ-গানগণ মুহুর্তঃ সেই তিন শত যোদ্ধাকে আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু সে অপূর্ব যোদ্ধৃশ্রেণী কম্পিত হইল না। সমুদ্রের ন্যায় ভীষণ গর্জনে মুসলমানেরা সেই বীর-প্রাচীরে আঘাত করিতেছে, কিন্তু প-র্বততুল্য সেই বীর প্রাচীর অনায়াসে সে আঘাত প্রতিহত করিতেছে। মৃতের শ-রীরে চারিদিক প্রাচীরের ন্যায় হইয়াছে, মাউলীদিগের সংখ্যা ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে, আফগানগণ পুনঃ পুনঃ অধিকতর বেগে আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু সে জেগী ভিন্ন হইল না।

সহসা “শিবজীক জয়” এইরূপ বজ্রনাদ হইল, সকলে চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, দুর্গের তিন চারি স্থলে রুহৎ রুহৎ অট্টালিকা অগ্নিতে ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে ও সেই দিক হইতে যুদ্ধনিবাদের করিয়া আরও মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য আসি-তেছে। যে একশত জন মহারাষ্ট্রীয় ধুর্ত-তার সহিত আফগান সৈন্য দুর্গের বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আফগানগণ দুর্গে প্রত্যাগমন করিলে তাহারাই পশ্চাৎ পশ্চাৎ একগণে সেইদিক হইতে আসিয়া কয়েকটি গৃহে অগ্নিদান করিয়া মুসলমান-দিগকে আক্রমণ করিল। আফগানদি-গের দুর্গ শত্রু হস্তগত হইয়াছে, প্রাসাদ জ্বলিয়া গিয়াছে, অন্যান্য অট্টালিকা জ্ব-লিতেছে, সম্মুখে শত্রু, পশ্চাতে শত্রু, মনুষ্যের যাছা সাধ্য তাহারাই করিয়াছিল, আর পারিল না, একেবারে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, মহারাষ্ট্রীয়গণ প-শ্চাৎদাবন করিয়া শত শত শত্রু বিনষ্ট করিল। রঘুনাথ তখন উঠিঃস্বরে আ-দেশ দিলেন “পলাতককে বন্দী কর, হত্যা করিও না; শিবজীর আদেশ পা-লন কর।” পলাতকগণ অত্র বিসর্জন করিয়া প্রাণ বাচুড়া করিল,—ভাঁহাদি-গের প্রাণরক্ষা হইল।

তখন রঘুনাথ দুর্গের অগ্নি নির্বাপন ক-রিয়া, প্রাচীরের স্থানে স্থানে প্রহরী সং-স্থাপন করিলেন; নোলা বাকদ ও অস্ত্র-শস্ত্রের ঘরে-আপন প্রহরী অগ্নিবৈশিত ক-

রিলেন, বন্দীদিগকে একটি ঘরে কক্ষ ক-
রিয়া রাখিলেন ; দুর্গের সমস্ত ঘর সমস্ত
স্থান হস্তগত করিয়া সুরক্ষার আদেশ দিয়া
শিবজীর নিকট বাইরা শির নমাইয়া স-
মস্ত সমাচার নিবেদন করিলেন ।

উবার রক্তিমাজ্জটা পূর্ব দিকে দৃষ্ট

হইল ; প্রাতঃকালের সুরম্য শীতল বায়ু
ঘীরে ঘীরে বহিয়া বাইতে লাগিল ; সমস্ত
দুর্গ শব্দশূন্য, নিস্তব্ধ ! যেন এই সুরম্য
শান্ত পাদপমণ্ডিত পর্বতশেখর যোগী
ঋষির আশ্রম,—যেন সুক্কের পৈশাচিক
রব কখন এখানে প্রুত হয় নাই !

কে গাহিল !

১
কে গাহিল—কি মধুর—ওই যে আবার—

ছুটিল সঙ্গীত-স্রোত ভাসারে গগণ,
একি—এবে ভেসে যায় ছদয় আমার,
নিশীথে কে করে হেম সুরা-বরিষণ !

আবার—আবার গায়
পুনঃ চিত্ত ভেসে যায় ;
নারীকণ্ঠ ? বটে তাই,
ছুটিয়া গবাক্ষে বাই—

দেখিলাম, কি দেখিনু কি বলিব হার,
ছিন্ন-সৌদামিনী-লতা পড়িয়া ধরায় !

২

জ্যোৎস্না-প্রাণিত-দূর সরসির তটে,
কৌমুদী-কিরণ-স্নাত পাবণ সোপানে,
পড়িয়া প্রতিমা ধানি যেন চিত্রপটে
বিস্তৃত নয়ন দুটি গগণের পানে ।

বাম গও বাম করে,
বাঁতাসে কুণ্ডল নড়ে,
নিশিগন্ধা বসন্তের
কিবা শশী শরদের—

ললিত সপ্তম গায় সঙ্গীত লহরী
পীযুষ প্রবাহে মত্তা নীরব শর্করী ।

৩

আবার সঙ্গীত-স্রোত উঠিল উখলি,
আবার প্রকৃতি-চিত্ত উঠিল আঁকুলি ;
নাচিল সরসিজল, নাচিল পবন,
নাচিল শাখায় পাতা লতার প্রস্থন ।
হরষিত নীলাঘরে
হাসিয়া কিরণ বদে,
মরি কি গভীর তান,
আকুল করিল প্রাণ ;

অবসে মূহল খাদে গড়ায়ে পড়িল,
ছদয়ের স্রোতসম সঙ্গীতে মিশিল ।

৪

শুনিয়াছি বসন্তের কোকিল-কুজল,
শুনিয়াছি বাঁশরীর মধুর নিকণ,
বসিয়া তবুর তলে, মাথার উপরি
ছুটিয়াছে পাণ্ডিত্যের সঙ্গীত লহরী,
হাসিপূর্ণ বিষাধরে
মর্জুকী মধুর সুরে

গাধিরাছে মূলভান,
শুনিয়াছি সেই গান
কিন্তু হেন উমাদিনী জীবন্ত রাগিনী,
শুনি নাই হেন গীত চিত্ত-বিপ্লাবিনী।

৫

শুনিলাম—কিন্তু কত শুনিবনা আর
সুধুই হারানু চিত্ত সঙ্গীত অবগে,
সুখের পিপাসা চিত্তে কেন হ্রস্বিবার,
স্বাধের সামগ্ৰী কেন হ্রস্ব জীবনে ?
ইচ্ছা করে দিবানিশি
এই গবাংকতে বসি,
ওই সুমধুর গান
শুনিয়া যুড়াই প্রাণ,

বুঝেনা স্বাধীন পাখী পখিকের মন,
যুড়ায়ে আপন চিত্ত করে পলায়ন।

৬

শুনিব না আর যদি গাহ একবার
হৃদয়-কবাট আমি করি উন্মাতন,
গাহ তুমি বরষিয়া সুখা-পারাবার,
রেখে দেই চিত্তে আমি করিয়া বন্ধন ;

কি শয়নে কি স্বপনে
উঞ্চলি উঠিবে প্রাণে,
বাজিবে তরঙ্গ বুকে
উঠিবে উঞ্চলি সুখে,

তুলিয়া সপ্তমে তুমি গাহ বিহঙ্গিনী
বেঁধে রাখি বন্ধঃস্থলে তব প্রতিধ্বনি।

✓ ভারবি ।

অসীম বারিধি-হৃদয়ে যেমন অনন্ত রত্ন-
রাজি, অমল কবিহৃদয়ে সেইরূপ অনন্ত
ভাবরাশি। বারিধি-হৃদয়ের রত্ন যেমন বহি-
র্ভঙ্গগতে অপূর্বশোভা বিকাশ করে, কবি-
হৃদয়ের ভাব সেইরূপ অন্তর্ভঙ্গগতে স্বর্গীয়
সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ দেখাইয়া থাকে।
কবির হৃদয়-সাগর অনন্ত মাধুর্যে আতট
পরিপূর্ণ। ইহাতে কোথাও পঙ্কের কা-
লিমা নাই, ফেণের আবিলতা নাই, এবং
পার্শ্বিক বিকারের মলিনতার সঞ্চার নাই।
ভূবার-ক্ষেত্রের অসীম বিস্তারে যেমন একই
ধবলতা ছাটিতে থাকে, নিরঙ্ক গগণের
অনন্তবন্ধে যেমন একই নীলিমা খেলিয়া

বেড়ায়, কবির হৃদয়ে সেইরূপ একই পবি-
ত্রতা, একই মাধুর্য প্রকাশ পাইয়া থাকে।
✓ কবি সকলস্থানেই মধুর ও উদাত্ত ভাবের
বিকাশ দেখিতে পান। তাঁহার হৃদয়
ক্ষুদ্রপ্রাণ সফরীর ন্যায় অস্পন্দিত জলেই
নাচিয়া বেড়ায় না, উহা অগাধ জলসঞ্চারী
রোহিতের ন্যায় গভীর জলেই থাকিতে
ভালবাসে। সাধারণে যাহা দেখিলে
বিস্ময় ও আতঙ্কে জড়ীভূত হয়, তরে শু-
কাইয়া যায় এবং ভাবনার ত্রিয়মাণ হইয়া
পড়ে, কবি তাহাতে অপূর্ব সৌন্দর্যের
অপূর্ব আভাস দেখিয়া অসীম আনন্দসা-
গরে নিমগ্ন হইলেন। তরঙ্গ-সীলাময়ী তর-

দিনীর বিকট হাস্য, জলধির প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস, অত্রংলিহ গিরিবরের ভয়ঙ্কর দৃশ্য, এবং স্থাপনসমাকীর্ণ গহন বনের ভীষণ পরিপূর্ণতাও তাঁহার হৃদয় আতঙ্ক, ভয় ও ভাবনায় অবশ হইয়া পড়ে না। তিনি প্রকৃতির এই চিত্রের অভ্যন্তরেও ভীমকান্ত সৌন্দর্যের রেখাপাত দেখিয়া আনন্দরস উপভোগ করেন, এবং নিজের হৃদয়-স্রোত সাধারণের অগমা, অচিন্ত্য, ও অপ্রাপ্য অমৃতপ্রবাহে মিশাইয়া দিয়া সারস্বতীশক্তির আরাধনায় প্রয়ুক্ত হইলেন। কবি এই সারস্বতী শক্তির রূপাবলে নরলোকে থাকিয়াও দেবলোকের পবিত্র সূত্র সন্তোষ করিয়া থাকেন। তাঁহার হৃদয়ের অনন্ত প্রস্রবণ হইতে পবিত্রসলিলা জাহ্নবীর খরস্রোতের ন্যায় নিরন্তর অমৃতধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। সেক-পীয়ার ও মিংটন এক সময়ে এই অমৃত প্রবাহে ইংলণ্ড প্লাবিত করেন, এবং কালিদাস ও ভবভূতি এক সময়ে এই অমৃত ধারায় ভারতের বিশুদ্ধ হৃদয় শীতল করিয়া লোকের হৃদয়গত অজ্ঞার পুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হইলেন। বহুযুগ অতীত হইয়াছে, বহুবৎসর অনন্ত কালসাগরে মিশিয়া গিয়াছে, তথাপি এই প্রবাহ বিশুদ্ধ হয় নাই।) ট্র্যাফোর্ড ও লাণ্ডক এবং উজ্জয়িনী ও পদ্মনগর হইতে যে ধারা উদাত্ত হইয়াছিল, তাহা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর মন প্রাণ শীতল করিয়া আসিতেছে।

ভারবির সম্বন্ধেও এই সকল কথা

প্রযুক্ত হইতে পারে। ভারবির কবিতা ওজস্বিনী, প্রথর দীপ্তিমতী ও মাধুর্য্যালিনী। কিন্তু কালিদাস যেমন বিশ্বসংসারের সকল মধুর সৌন্দর্য্যরাশি এক-হৃদ্রে গাঁথিয়া পাঠকের হৃদয় বিমুগ্ধ করেন, ভারবি সেরূপ কোন কৌশল অবলম্বন করেন না। তিনি পাঠকের সম্মুখে গভীর ও উদাত্ত বিষয় স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া রাখেন, সেই গভীর ও উদাত্ত বিষয়ে গভীর ও উদাত্ত ভাব সংযোজিত করেন। এবং সেই ভাবের সহিত এমন একটু তীব্র মদিরা, এমন একটু মনোমদ উগ্ররস ঢালিয়া দেন যে, তাহার আশ্বাদ-মাত্র শরীর কটকিত হয়, হৃদয় ওজস্বিতায় বিকশিত হয় এবং ধমনীমধ্যে প্রতপ্ত শোণিত-স্রোত তীব্রবেগে প্রবাহিত হইয়া উঠে। কালিদাস স্বীয়চিত্রে ধীরে ধীরে মাধুর্য্যের রেখাপাত করেন, এবং যেখানে যে রং ফলাইলে সেই মাধুর্য্য অধিকতর বিকশিত হয়, তদনুসারে ধীরে ধীরে আপনার তুলি সঞ্চালিত করিতে থাকেন; ভারবি স্বীয়চিত্রে উৎকট বিষয়ের সমাবেশ করেন, এবং যে ভাবে সেই বিষয় গুলি সাজাইলে তাহার উৎকটতা বিকশিত হয়, তজ্জন্ম যত্ন করিতে থাকেন। কালিদাসের কবিতা মনন-বাত-দ্রুতিয়া বাসন্তীলতা, ভারবির কবিতা ফলাবনত পত্র-স্রোতিত বিশাল ঠৈনদাঘতক; একটি ভয়-চুখিত, অপূর্ণ-বিকশিত প্রমত্তাকমল, অপ-২টি প্রস্ফুটিত বাতসঞ্চালিত স্থলারবিন্দু;

একটি সুশীতল সুবিশুদ্ধ শারদী জ্যোৎস্না, অপরটি জ্বালাময়ী পবিত্র বহ্নিশিখা। একটি কলশাদিনী গিরি-নির্ঝরিণীর ন্যায় মৃদু মধুর স্বনিতে কর্ণ পরিতৃপ্ত করে, অপরটি ক্ষেণায়মানা তরঙ্গমানিনী তরঙ্গিণীর ন্যায় উদাত্ত ভাবের সঞ্চার করে। একটি ব্রীড়াময়ী তরুণীর ন্যায় মৃদু মধুর ভাবে অঙ্গলতিকা দুলাইয়া হৃদয়ের প্রতিপ্রাঙ্ঘি অমৃতরসে পরিপ্লুত করে, অপরটি প্রৌঢ়া কামিনীর ন্যায় তীব্র রস বিকাশ করিয়া হৃদয়ের প্রতিস্তুর অভিষিক্ত করিতে থাকে; একটি “ফুটে অখচ ফাটিয়া পড়ে না, তবে অখচ বিগলিত হয় না,” হাसे অখচ স্বনি করে না; অপরটি ফাটিয়াই শোভা বিকাশ করে, বিগলিত হইয়াই শিরায় শিরায় তীব্রতেজ সঞ্চারিত করে, এবং অট্টহাস্যে হাসিয়াই দশ দিক্ পরিপূর্ণ করে! সংক্ষেপে কালিদাসের কবিতা কোমল মাধুর্যময়ী, ভারবির কবিতা উগ্র মধুরতাশালিনী।

ভারবির কবিতার সহিত ভবভূতির কবিতার অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। উভয়েই ওজস্বিনী, তর্কাত্মিকতাবিনী ও আপনার গৌরবে আপনি গৌরবিনী; উভয়েই সমানবেগে সমান দক্ষতার সহিত তীব্র মদিরা ঢালিয়া দিয়া হৃদয় মাতাইয়া তুলেন; উভয়েই হিমালয়-কন্দর-নিঃসৃত ভাগীরথীর ন্যায় খরতরবেগে ছুটিয়া এক এক সময়ে সমস্ত বিপ্লাবিত করে, এবং বাহা সমুখে পার, তাহাকেই আপনার লোকা-

তীত তেজোমহিমা প্রদর্শন করিয়া ডুবাইয়া ফেলে। ভারবি কোন নাটক রচনা করেন নাই, ভবভূতি ও কোন মহাকাব্য প্রণয়ন করেন নাই। নাটকের সহিত মহাকাব্যের তুলনা হয় না। ভিন্ন পঙ্কতির বলে নাটক ও মহাকাব্য উভয়েই ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত। তথাপি আমরা সাধারণতঃ কবিতার উপর নির্ভর করিয়াই ভবভূতি ও ভারবির সম্বন্ধে এই সাদৃশ্য দেখাইলাম। ইহাতে ভবভূতি ও ভারবির কবিতা এক শ্রেণীতে সমাবেশিত ও একসূত্রে গ্রথিত হইতে পারে। ফলে মধুরতায় যেমন কালিদাস প্রধান, উগ্রতায় সেইরূপ ভবভূতি ও ভারবি শ্রেষ্ঠ।

ভারবি, ব্যাসের সংগৃহীত উপকরণ লইয়া নিজের কাব্য রচনা করিয়াছেন। মহাভারতের বনপর্বে অর্জুনাভিগমন কৈরাত ও ইন্দ্রলোকাভিগমন পর্বাধ্যায়ে যে যে বিষয় সন্নিবেশিত আছে, ভারবিশ্রুত কীরাতাঅর্জুনীয়েও ঠিক সেই সেই বিষয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এইরূপ পরপ্রবর্তিত পথানুবর্তি হইলেও ভারবির কীরাতাঅর্জুনীর কোন অংশে ছেদ বা অপদার্থ নহে। কালিদাস বাল্মীকির পথানুসরণ করিলেও রসুবৎস জগতে একখানি অভূল্য ও অমূল্য কাব্যরত্ন। ভারবি ব্যাসের উপকরণ লইয়া চিত্র প্রস্তুত করিলেও কীরাতাঅর্জুনীর একখানি অপূর্ব মহাকাব্য। আমরা ক্রমশঃ এই মহাকাব্যের সৌন্দর্যের আলোচনার প্রবৃত্ত হইব।

ঐহারা প্রাচীন কবিদের বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করেন, তাঁহাদের সেই কাব্যে কাব্যকার্যেরই সমধিক প্রবলতা দেখা যায়। প্রাচীন কবিগণ অবশ্যে অনাগ্রাসে যে চিত্র প্রস্তুত করেন, আধুনিক কবিগণ তুলী ঘসিয়া, লতা পাতা আঁকিয়া ও রং ফলাইয়া সেই চিত্রে অধিকতর শিল্প-কুশলতার পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন। প্রাচীন কবিগণের লেখনী হইতে যে স্বভাবশালিনী চিত্রহারিণী কবিতা অবলীলায় অসঙ্কোচে নির্গত হয়, আধুনিক কবিগণের লেখনী ধীরে ধীরে সেই কবিতামালা সজ্জিত ও অলঙ্কৃত করিতে থাকে। ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক কোন কাব্যেরই দোষ গুণের নির্ণয় হইতেছে না, কাব্যের শ্রেণীভাগ হইতেছে মাত্র। এই উভয় শ্রেণীর কাব্যের একশ্রেণী রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি, অপর শ্রেণী রঘুবংশ ও কিরাতার্জুনীয় প্রভৃতি। এক শ্রেণীতে স্বভাবের সমধিক বিলাস, অপর শ্রেণীতে শিল্পচাতুরীর সমধিক প্রাদুর্ভাব। এক শ্রেণী অবতরনিকতা, অনাগ্রাসবর্জিতা আরণ্যলতা, অপরশ্রেণী প্রযত্নপরিরনিকতা, আগ্রাসপালিতা উদ্যান-ব্রতভী। এক শ্রেণী তাপসকুমারীর ন্যায় বনবিহারিণী, পবিত্রদেহা, নিরাতরগা, বিলাসানভিচ্ছা অথচ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যমহিমায় জগতে অতুলনীয়; অপরশ্রেণী রাজকুমারীর ন্যায় বিলাসভবনবাসিনী, অলঙ্কৃতদেহা ও সৌন্দর্য্যগৌরবিনী।

ভারবি ব্যাসের অবলম্বিত পথে পা দিয়া স্বীয়কাব্যে এইরূপ শিল্পচাতুরীর পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কিরাতার্জুনীর প্রথমেই রাজ্যানির্বাণিত, ঠৈতবনবাসী বুদ্ধিষ্টির সহিত সাক্ষাৎলাভ হয়। বুদ্ধিষ্টির এখন কপট দ্রাক্ষীড়ায় পরাজিত হইয়া বনেচর, এবং রাজচিহ্ন, রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া মুনিবেশধারী। দুর্খোধন কিরূপে রাজ্যাশাসন করিতেছে, কিরূপে সামদণ্ডাদি রাজনীতির প্রয়োগ করিতেছে, জানিবার নিমিত্ত এই মুনিবেশী বনেচর একজন কিরাত-শ্রেষ্ঠকে হস্তিনাপুরে পাঠাইয়া দেন। কিরাত বতিবেশধারণ করিয়া হস্তিনাপুরে যায়, এবং দুর্খোধনের রাজ্যাশাসন-ব্যাপার অবগত হইয়া ঠৈতবনে বুদ্ধিষ্টিরের নিকট প্রত্যাগমক করে। এই কিরাত যাহা জানিয়া আইসে, কিরাতার্জুনীর প্রারম্ভেই তৎসমুদয়ের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনায় ভারবির কবিও কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, আমরা তাহার সমালোচনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারবির কবিতা শিল্পকুশলতার অভিচিত্রিত। এই শিল্পের গুণে তাঁহার বনেচর কিরাত, সাধারণ কিরাতগণ অপেক্ষা উচ্চতর প্রাণে আরোহিত হইয়াছে। ভারবির কিরাতে কিরাতগণের সে প্রাণত্যাগ নাই, সে মুঢ়তা নাই, সে আরণ্যভাব নাই। ভারবির কিরাত পণ্ডিত, রাজনীতিজ্ঞ ও তদ্বাহুস-

দ্বারা । কিরূপে কোন্ নামে, কোন্ বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, কিরূপে কথার আরম্ভ ও উপসংহার করিতে হইবে, তাহা ভারবির কিরাতের মৰ্যদর্পণে স্থিত। ভারবির কিরাত বিপৎপাতে অধীর হয় না, যাতনায় অবসন্ন হয় না এবং মন্ত্রসাধনার পরাঙ্মুখ হয় না । অধিকন্তু ভারবির কিরাত ভয়ের জন্য মিথ্যা কথা কহে না, মনস্তঙ্কিতর জন্য তোষামোদ করে না, এবং পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য আত্মলাভের প্রবৃত্ত হয় না । এ কিরাত সভাবাদী, ধর্মশীল ও নীতিপরায়ণ,—এ কিরাত গুণচরের সম্যক উপযুক্ত এবং গুণচরের গুণক্রমে সম্যক অন্তর্ভুক্ত ।) এই বনবিহারী ধর্মপরায়ণ গুণচর যুদ্ধিত্তিরের সমক্ষে কিরূপ গভীরভাবে এবং কিরূপ সৌচ্য ও কিরূপ উদারের সহিত স্ববক্তব্যের অবতারণা করিতেছে, পাঠক অখণ কখন । বনেচর অভিবাদন পূর্বক কহিতেছে :—

“ ক্রিয়ানু যুক্তৈহুঁপ চারচক্ষুবো,
ন বঞ্চনীয়াঃ প্রভবোহনুজীবিত্তিঃ ।
অতোহঁসি কস্তমসাধু সাধু বা,
হিতং মনোহারি চ হুলভং বচঃ ।

(অনুবাদ) মহারাজ ! চারচক্ষু (১) প্রভুদিগকে প্রভারণা করা, কার্যে নিয়োজিত অনুজীবীগণের উচিত নয় । এই

(১) চরই রাজাদিগের চক্ষুঃস্থানী । অর্থাৎ চর অরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র বেড়াইয়া বাহা দেখিয়া আইসে, রাজাদিগকে তদনুসারেই কার্য করিতে হয় ।

জন্য (আশীর বাক্য) অপ্রিয়ই (হউক), প্রিয়ই (হউক), আপনি কমা করিবেন । হিতকারি অথচ মনোহারি বাক্য দুর্ভেদ । স কিংসখা সাধু ন শাস্তি যোহধিপং হিতান্ন বঃ সংশৃণুতে স কিংপ্রভুঃ । সদানুকূলেহু হি কুর্কতে রতিং হৃপেষমাভোহু চ সর্কসম্পদঃ ॥

(অনুবাদ) । যে (অমাত্য) প্রভুকে হিতোপদেশ দেয় না, সে দুর্ভেদ্যতা বন্ধু, এবং যে (রাজা) হিতকর কথা শুনে না, তিনিও দুর্ভেদ্যতা প্রভু । রাজা ও অমাত্য (ইহার সাক্ষ্যেই পরস্পর) এক মত হইলে সম্পত্তি (সেই রাজ্যে) অচলা হয় ।

নিসর্গদুর্কৌধমবোধবিক্রমঃ
ক ভূপতীনাঞ্চ চরিতং ক জন্তবঃ ।
তবানুভারোহয়মবেদি যশ্মরা,
নিগুঢ়তত্ত্বং নয়বস্ত্রবিদ্বিমাং ॥”

(অনুবাদ) ভূপতিদিগের স্বভাব দুর্কৌধ কার্যপ্রণালীই বা কোথায়, আর যুটমতি মাদৃশ ণাগিগণই বা কোথায় । (তথাপি যে) আমি শত্রুপক্ষের রাজনীতির গুঢ়তত্ত্ব জানিয়া আসিয়াছি, সে কেবল আপনার ক্ষমতার বলে ;

✓এ উক্তি চরের উপযুক্ত, এ উক্তি প্রারম্ভ গভীর ও নীতি-বিশুদ্ধ । চর বাহা দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাই বলিবে, মিথ্যা কহিয়া অথবা অনুচিত বাগাড়ম্বর করিয়া সত্যের অপলাপ করিবে না । সত্য কথা বলিতে গেলে যদি তাহা প্রভুর অপ্রিয়

হয়, এই জন্য চর পূর্বেই কমা প্রার্থনা করিয়াছে। আমাদের নীতিশাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন “সত্যং ক্রমাৎ, প্রিয়ং ক্রমাৎ ন ক্রমাৎ সত্যমপ্রিয়ম্” (সত্য কথা ও প্রিয় কথা কহিবে, অপ্রিয় সত্য কথা কহিবে না)। কিন্তু চর কর্তব্যমুহুরোধে সকল স্থলেই সত্য কথা কহিবে, উহা প্রিয়ই হউক, অপ্রিয়ই হউক, তদ্ব্যয়ে সে বিচার করিবে না। সুতরাং প্রভুর অপ্রীতিসাধন ও নীতিশাস্ত্রের অবমাননা-অপরাধের ফালন জন্য কমা প্রার্থনাই যুক্তিসিদ্ধ। যদি সত্য কহিলেও প্রভুর অপ্রিয়পাত হইতে হয়, তাহা হইলে নীরবে থাকাই ভাল; যাহারা এই সিদ্ধান্তের অনুবর্তী হইয়া সত্য কহিতে ইতস্ততঃ করে, চর দ্বিতীয়মাক্যে তাহাদিগকে নিকন্তর করিয়াছে। এই বাক্যে চর দেখাইয়াছে যে, সত্য কথা অনুজীবদিগের যেমন কর্তব্য, সেই সত্যের অনুবর্তী হওয়াও প্রভুদিগের তেমন কর্তব্য। ইহার পর চর তৃতীয় বাক্যে আপনার অহঙ্কার ও অতিমান পরিভাগ করিয়া বিনয় ও নম্রতার পরিচয় দিয়াছে। ভারবি যে দশদিক দেখিয়া কবিতাকুশুম গঙ্ঘিত করেন, এইরূপ পূর্বাঙ্গের লক্ষ্যই তাহার প্রমাণ।

চর, এইরূপ উদারভাবে ও বিনয়মাত্রতার সহিত স্ববক্তব্যের অবতারণা করিয়া, দুর্ঘোষনের রাজ্যশাসনের বর্ণনার প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভারবি, দুর্ঘোষনের শাসন-কার্যের সোমোসোবাধণ করেন নাই।

ভারবির দুর্ঘোষন যদিও বর্ণনাবলে রাজ্য-আধিকার করিয়াছে, তথাপি রাজকার্যে কখনও উদারনীতি বা অব্যবস্থিততা দেখায় নাই। শাসনকার্যে ভারবির দুর্ঘোষন অনেক উন্নত। যুদ্ধিষ্ঠিরের গুণগ্রাম ও স্নকীর্ষিমহিমা ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য ভারবির দুর্ঘোষন অনেক সংকার্যের অনুষ্ঠানে নিরস্তর ব্যাপৃত। চর গভীরভাবে যুদ্ধিষ্ঠিরের সমক্ষে এই দুর্ঘোষনের শাসন-শৃঙ্খলা ও উদার ভাবের বর্ণনা করিয়াছে।

আমরা এই বর্ণনার দেখিতে পাই, দুর্ঘোষন, গুণে ও যশে যুদ্ধিষ্ঠিরকে পরাস্ত করিবার জন্য সুরাজনীতির বলে পৃথিবী শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার দয়াকীর্ণাদির গুণে যশ বাড়িয়া উঠিয়াছে, পৌত্রব বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং স্ন-শাসন-মহিমা উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত হইতেছে। দুর্ঘোষন একগুণে অতন্ত হইয়া দিবারাত্রি ভাগ করিয়া যথাসময়ে যথা-বিধি রাজনীতির প্রয়োগ করিতেছে; অহঙ্কারশূন্য হইয়া লোকের সমক্ষে ভ্রাতাদিগকে বক্রুরন্যায় দেখিতেছে, বক্রুদিগকে ভ্রাতারন্যায় স্নেহ ও আদর করিতেছে, এবং ভ্রাতাদিগকে রাজ্যাধিপতি বলিয়াই পরিচিত করিতেছে। তাঁহার রাজ্যে শত্রুগণ নিষ্কিঁর্ত হইয়াছে, মিত্র রাজগণ নাও নিষ্কিঁর্তি না করিয়া স্বাভাৱ্য প্রতিপালন করিতেছে, অশকপাতে ব্যানাসুসারে বিচরণ কার্যে নিষ্কিঁর্তি হইতেছে। সৈন্য-গণ প্রাণপণে রাজ্যরক্ষা করিতেছে, পু-

ধিবী-রূপা-দাক্ষিণ্যে পরিভুক্ত হইয়া নিরন্তর ধনপ্রদানে পরিতোষ জঘাইতেছে, হতাশম যজ্ঞস্থলে যথাবিধি সংকৃত ও অভ্যাখিত হইতেছেন এবং নদীমাতৃক ক্ষেত্রসকল শস্যসম্পত্তিতে অণুকণ শোভা পাইতেছে। ভারবির দুর্ঘোষন এইরূপ সুরাজনীতি ও সঙ্কল্পপরায়ণ; চর অবলীলায় ও অসঙ্কোচে এই দুর্ঘোষনের শাসনমহিমার এইরূপ বর্ণনা পরিসমাণ্ড করিয়াছে। এই বর্ণনা প্রগাঢ়তা ও অর্থগাভীর্যে পরিপূর্ণ। ইহার অধিকাংশ উদ্ধৃত না করিলে মৌল্যার্থ্য পরিষ্কৃত হয় না।) কিন্তু প্রবন্ধের অবয়ব অতিশয় বাড়িয়া উঠিবে ভাবিয়া আমরা সমুদয় অংশ উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম। (যে কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে শাসন-শৃঙ্খলা যেরূপ অভিব্যক্ত হইবে, সেইরূপ কবির রাজনীতিজ্ঞতা ও আভ্যন্তরীণ অবস্থায় অভিজ্ঞতাও জানা যাইবে।) দুর্ঘোষনের রাজ্যে কিরূপে দণ্ডবিধি প্রয়োজিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে যুধিষ্ঠির-প্রেরিত চর কহিতেছে—

“বহুনি বাঞ্জর বশী ন মনুনা

শ্বধর্ম ইত্যেব নিরুক্তকারণঃ।

গুরূপদিষ্টেন রিপৌ স্মতেহপি বা

নিহস্তি দণ্ডেন স ধর্মবিপ্লবম্ ॥

(অনুবাদ) সেই জিতেস্ত্রিয় দুর্ঘোষন ধনলোভে অথবা ক্রোধবশতঃ দণ্ডবিধান করেন না, রাজধর্ম [রক্ষার] জন্যই লোভাদি পরিত্যাগ করিয়া, শত্রুই হউক, (আর) নিজেয় পুত্রই হউক, অধর্মাচরণ

করিলে সকলকেই শ্রাড়া বিবাকের উপদেশানুসারে দণ্ডিত করেন *।

মূলান্তরে কৃষিকার্যের সম্বন্ধে চর বলিতেছে:—

সুখেন লভ্যাদধতঃ কৃষীবলৈ-

রক্ষমপচ্যা ইব শস্যাসম্পদঃ।

বিতস্ততি ক্ষেমমদেবমাতৃকা-

শ্চিত্রায় তস্মিন কুরবশ্চকাসতে ॥

(অনুবাদ) সেই দুর্ঘোষনের মঙ্গলকর কার্যের গুণে নদীমাতৃক কুরুজনপদ কৃষকদিগের এরূপ সুখলভ্য শস্য-সম্পত্তি ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে যে, বোধ হয় যেন ঐ শস্য বিনা কর্ষণেই পরিপক হইতেছে †।

সন্ধিবন্ধন ও দানের প্রসঙ্গে চর এইরূপ বাক্য বিন্যাস করিয়াছে:—

* আধুনিক রাজ্যপালকগণ প্রাচীন ভারতের কবির নিকট এই উদারতা ও মহত্ব শিক্ষা কখন। প্রাচীন ভারতের শাসনকার্যে এরূপ উদারতা ও মহত্বের অনাদর ছিল না।

† এই বাক্যে প্রতিপন্ন হইতেছে, পূর্বে ভূমিসকল দেবমাতৃক ছিল না, কৃষকগণ কেবল পর্জন্ত দেবের উপর নির্ভর করিয়াই থাকিত না। পূর্তকার্যের গুণে শস্যক্ষেত্রের নিকট ঋণ প্রভৃতি থাকাতে কৃষিকার্যের বিশিষ্ট সুবিধা হইত। এক্ষণে ঋণীদের রাজ্য অনারুষ্টির জন্য বারম্বার দুর্ভিক্ষপ্রাপ্ত হয়, তাঁহাদের এবিধে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

নিরতায়ং সাম ন দানবর্জিত-

ন্ন ভূরি দানং বিরহস্য সংক্রিয়াম্ ।

প্রবর্ত্ততে তস্য বিশেষ-শানিনী

গুণানুরোধেন বিনা ন সংক্রিয়া ॥

(অনুবাদ) সেই দুর্ঘোষনের দান

ব্যতিরেকে নির্বোধ সন্ধি প্রবর্ত্তিত হয় না, সদম্বিবেচনা ব্যতিরেকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা সম্পন্ন হয় না * ।

স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রের রত্নান্ত সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে:—

মহীভূতাং সচ্চরিতৈশ্চরৈঃক্রিয়াঃ

স বেদ নিঃশেষমশেষিতক্রিয়ঃ ।

মহোদয়েস্তস্য হিতানুবন্ধিভিঃ

প্রতীর্ণতে ধাতুরিবেহিতক্ষণৈঃ ॥

(অনুবাদ) । ফলোদয় পর্য্যন্ত কা-

র্য্যকারী সেই দুর্ঘোষন সচ্চরিত্র চরদ্বারা রাজ্যদিগের সমস্ত কার্য্যই অবগত হইতেছেন । কিন্তু তাঁহার কার্য্য কেবল হিতকর ফল দেখিয়াই জানিতে পারা যায় † ।

* রাজ্যাদিপতিদিগের এই নীতিবাক্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করা উচিত ।

† কালিদাসপ্রণীত রঘুবংশে দিলীপ রাজার গুণবর্ণনেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা ;

তস্য সংরতমস্তস্য গূঢ়াকারেঞ্জিতস্য চ ।

ফলানুরোধৈঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তন্য ইবা ॥

(অনুবাদ) সেই রাজা দিলীপের

মন্ত্রণা এরূপ গোপনে থাকিত, এবং আকার ইঙ্গিত এরূপ নিগূঢ় ছিল যে, তাঁহার কার্য্য, জন্মান্তরীণ সংস্কারের ন্যায় ফল দেখিয়া অনুমান করা বাইত ।

দুর্ঘোষন কেন এইরূপ স্বরাজ্যতার প-

রিচয় দিতেছে ? কেন এইরূপ বিশুদ্ধ রাজ-

জনীতির অনুসারে শাসনকার্য্যের পরি-

চালনা করিতেছে ? কবি পূর্বেই তাহার

উত্তর দিয়াছেন । ✓ পূর্বেই বলা হইয়াছে

দুর্ঘোষন যুধিষ্ঠিরের গুণপ্রায় অতিক্রম ও

স্বরাজ্যতা বিলুপ্ত করিবার জন্য রাজ্য স্ব-

বাবস্থিত ও লুশাসিত করিবার প্রয়াস

পাইতেছে । সুতরাং দুর্ঘোষনের এইরূপ

স্বনীতিপ্রয়োগ কেবল যুধিষ্ঠিরের যশ চা-

কিয়া ফেলিবার জন্য । কবি এইরূপ দু-

র্ঘোষনের চরিত্রে একটুকু রং ফলাইয়া

যুধিষ্ঠিরের চরিত্র শতগুণে উজ্জ্বল করিয়া-

ছেন । দুর্ঘোষন দুর্ভাষা, দুর্ঘোষন মা-

য়াবী, দুর্ঘোষন কপটদূতে পর-রাজ্যাপ-

হারী ; এ দুর্ঘোষন যখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজ-

পদে সমাসীন হইয়া যুধিষ্ঠিরের গুণাতি-

ক্রমী—যুধিষ্ঠিরের কীর্ত্তিস্পর্ধী হইবার

জন্য সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বমান্য, সর্ব্বপূজিত

ধর্ম্মের অনুশাসন অনুসারে শাসনকার্য্য নি-

র্ব্বাহ করিতেছে, তখন যুধিষ্ঠির কতদূর

মহান, কতদূর উদারচেতা, কতদূর স্বনীতি-

পরায়ণ ! কবি যুধিষ্ঠিরের কাছেও গেলেন

না, তাঁহার চরিত্রপটে একটুকু রেখাপাত-

ও করিলেন না, অথচ অপূর্ব্বকৌশলে যুধি-

ষ্ঠিরের চরিত্র স্বরঞ্জিত করিয়া তুলিলেন,—

অপূর্ব্বপ্রতিভাবলে যুধিষ্ঠিরকে উচ্চ হইতে

উচ্চতর গ্রামে তুলিয়া দিলেন । ইহা ক-

বিষয়ের পরাকাষ্ঠা । }

দুর্ঘোষন সুনিয়ে প্রজ্ঞাপালন করি-

লেও যুধিষ্ঠিরের ভয় হইতে বিমুক্ত হয় নাই; অন্যাপি যুধিষ্ঠিরের নামে তাহার মর্যবেদনা উপস্থিত হয়, মস্তক অবনত হইয়া পড়ে এবং হৃদয়, আশঙ্কা ও আতঙ্কে অবসন্ন হইয়া উঠে। বনবিহারী কিরাত এসম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছে:—

প্রাণীনভূপালমপি স্থিরায়তি
প্রশাসনাবারিধিমণ্ডলভুবঃ।
সন্ধিস্তয়তোব ভিন্নশ্বদেঘাতী
রহো দুরন্তা বলবদ্বিরোধিতা ॥

(অনুবাদ) সমস্ত শত্রু পরাজয় করিয়া স্থিরোত্তর কালী, সমাগরা পৃথিবী শাসন করিলেও, সেই দুর্যোধন সর্বদা আপনার ভয়ে চিন্তিত রহিয়াছেন। অহো! প্রবলদিগের সহিত বিরোধ কি কষ্টকর!

কথাপ্রসঙ্গে জর্নৈকদাহতা,
দমুম্বতা খণ্ডলস্ববিক্রমঃ।
তবাভিধানাদ্ বাখতে নতাননঃ
স দুঃসহান্মজ্ঞপদাদিবোরগঃ ॥

(অনুবাদ) লোকে কথাপ্রসঙ্গে আপনার নাম করিলে সেই দুর্যোধন, সর্প যেমন দুঃসহ মস্ত্রে গাৰ্ভের পরাক্রম মনে করিয়া মতশির হয়, সেইরূপ অর্জুনের পরাক্রম শ্রয়ণ করিয়া ব্যথিতচিত্তে অবনত মস্তক হইয়া পড়েন।

✓এস্থলে কবির কোশল অধিকতর পরিষ্কৃত হইয়াছে। কবি এস্থলে দুর্যোধন অপেক্ষা যুধিষ্ঠিরের ঐর্ষ্যতা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। কবির কিরাত এস্থলে তোবা-

মোদ করিল না, ব্যাপকতা দেখাইল না, দুর্যোধনকে নরকে ফেলিয়া যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে তুলিল না; অথচ দুই একটি গভীর রেখায় যুধিষ্ঠিরের অপূর্ব তেজোমহিমা—, অপূর্ব দেবোপম ভাব স্পষ্ট আঁকিয়া দিল। যদি এই ভাব মানস-পটে অঙ্কিত করিতে চাও, তবে যুধিষ্ঠিরের কাছেও যাইও না; কম্পনারনেত্রে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের প্রতি একবারও চাহিয়া দেখিও না। অগ্রে দুর্যোধনের প্রতি নয়নপাত কর; অগ্রে দুর্যোধনের নৃশাসন, দুর্যোধনের ভয়, দুর্যোধনের আতঙ্ক, একে একে স্মৃতিপটে চিত্রিত কর; তাহা হইলেই যুধিষ্ঠিরের উজ্জ্বল কান্তিতে তোমার হৃদয় আলোকিত হইবে; তাহা হইলেই শারদী পৌর্ণমাসীর জ্যোৎস্না-বিধৌত নিবাত নিঃস্পৃ তরঙ্গিণী ন্যায়, অথবা চন্দ্রালোক-স্পর্শ পূর্ণ বিকশিত কুমুদস্থলীর ন্যায় যুধিষ্ঠিরের পবিত্রতাময়ী শুভ্রোজ্জ্বল কীর্তি তোমার সম্মুখে হাসিতে থাকিবে। দুর্যোধনের প্রতিবিশ্বিতচ্ছবির সম্মুখবর্তী না হইলে একীর্তির গরিমা, একীর্তির মধুরিমা বুঝিতে সমর্থ হইবে না। এই ছবিই একীর্তি সন্দর্শনের অধিতীয় আলোকবর্তি, এবং এই ছবিই একীর্তি-মন্দিরের অধিতীয় সোপান। অগ্রে এই আলোকবর্তি হাতে কর, অগ্রে এই সোপানে পা দেও, তবেই একীর্তির মধুর আভা নয়ন ভরিয়া পান করিতে পারিবে।

ভারবি এইরূপে এক দুর্যোধনের চিত্রেই

যুধিষ্ঠিরের চারিজন-সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। “ অহো ! দুঃস্বপ্না বলবদ-বিরোধিতা ” এই কথাতেই কত অর্থ গাঞ্জীর্ষ্য ! এই একটি সামান্য কথার যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য কত পরিষ্ফুট হইয়াছে, পঞ্চমুখে স্ততিগীত গাইলে অথবা শত পৃথিবীর প্রশংসাবাদ লিখিলেও সেই ঔজ্জ্বল্য তত বিকশিত হইত না। প্রবাসে জীর্ণকূটীরে স্নসজ্জিত-হর্ষা-সুশোভিনী অলঙ্কৃতদেহা স্নন্দরী পদ্মাবতীর সমক্ষে বন-বিহারিণী নিরাভরণা স্নন্দরী কপালকুণ্ডলা যেমন অধিকতর স্নন্দরী হইয়াছিল, রাজা-সনস্তু দুর্ষোধানের চিত্রের সমক্ষে বনেচর যুধিষ্ঠিরের চিত্র সেইরূপ অধিকতর স্নন্দর হইয়াছে। দরায়ুস হুহিতা স্নন্দরী না হইলে সেকন্দর সাংহের ধর্ম কখনও পরম স্নন্দর বলিয়া পবিত্র ইতিহাসের বরণীয় হইত না ; কিরাতাজ্জু নীয়ে দুর্ষোধান স্নন্দর না হইলে কখনও যুধিষ্ঠিরের সৌন্দর্য্য স্পষ্ট অনুভব করা যাইত না।

কোন ক্ষুদ্র কবি হইলে হয়ত তিনি যুধিষ্ঠিরের প্রশংসাস্থানিতে দশদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া দুর্ষোধানকে একবারে নরকে ফেলিয়া দিতেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে কাব্যের গাঞ্জীর্ষ্য ও ঔদার্য্য একবারে বিনষ্ট হইয়া যাইত। দুর্ষোধান যুধিষ্ঠিরের প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমকক্ষেই হওয়া উচিত, এবং এই সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতাই সৌন্দর্য্য-জনক হইয়া থাকে। কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। সৌন্দর্য্যই কাব্যের

আত্মা এবং সৌন্দর্য্যই কাব্যের প্রাণ। যিনি সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিতে না পারেন, তিনি কখনও “ কবি ” নামের অধিকারী নহেন এবং তৎপ্রণীত গ্রন্থও কখনও “ কাব্য ” নামের যোগ্য নহে। তীমাজ্জুন-নকুলসহদেব-সহচর যুধিষ্ঠির যদি দুর্ষোধানের ন্যায় একজন ক্ষুদ্র-প্রাণ, ক্ষুদ্র-বুদ্ধি ও ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে কাব্যের গৌরব বা সৌর্ভব রক্ষা পাইত না। এবং তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের চরিত্র কখনও রমণীয় বা ঔজ্জ্বল্য-বিকাশক হইত না। স্তত্ত্বাৎ চিত্রকরের চিত্র আত্মাহীন, প্রাণহীন হইয়া অকিঞ্চিৎকর পদার্থের দলে মিশিয়া যাইত। ইহাতে কখনও কোন সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইত না।)

কুমন্ত্রণায় যদিও দুর্ষোধানের চিত্রের মালিন্য জন্মিয়াছে কুমন্ত্রীর পরামর্শে যদিও দুর্ষোধান ভ্রাতৃত্বরাজ্য হরণ করিয়াছে ; দুর্ঘটবুদ্ধিতে যদিও দুর্ষোধান ‘দুরাত্মা’ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, তথাপি কত্রিয়তেজ, কত্রিয় সাহস ও কত্রিয় দর্প দুর্ষোধানকে একবারে ছাড়িয়া পলায় নাই। এই তেজ, এই সাহস ও এই দর্প দুর্ষোধানকে যুধিষ্ঠিরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও যুধিষ্ঠিরের গুণাতিশ্রয়ী হইতে প্রবর্তিত করিয়াছে। এদৃশ্য-ও দেখিতে স্নন্দর। ‘ মহৎ লোকের সহিত দুর্ভাশয়ের এরূপ বিরোধ এবং মহৎলোকের গুণস্পর্শী হইতে দুর্ভাশয়ের এরূপ চেফাও কাব্যের উৎকর্ষ-সম্পাদক।)

অধিকন্তু, দুর্ঘোষনের চরিত্রে সুরাজ-
 গুণের আভাস লক্ষিত না হইলে কাব্যের
 ঘটনাগত উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইত।
 কিরাতাঅর্জুনের ঘটনাগত উদ্দেশ্য,
 কিরাতবেশধারী ভবানীপতি মহাদেবক-
 র্তৃক অর্জুনের বাজবলপরীক্ষা ও তদনন্তর
 অর্জুনের অরাতিদমন অন্তর্লভ।) এই উ-
 দ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে অর্জুনের অ-
 রাতিপক্ষকে বিশিষ্ট প্রবল ও সহায়স-
 ম্পন্ন করা উচিত। প্রতিদ্বন্দীকে বিলক্ষণ
 প্রবল না দেখিলে তাঁহার দমন জন্য দুষ্কর
 কার্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে না। দুর্ঘোষ-
 ধমকে রাজনীতি-কুশল, সমাগরা সতীপার
 অতীতীয় অধীশ্বর ও রণপণ্ডিত সেনাপতি-
 সমূহে পরিবৃত্ত দেখিয়াই অর্জুন অন্তর্ল-
 ভের নিমিত্ত ভ্রাতৃচতুষ্টি ও জায়া হইতে
 বিচ্ছিন্ন হইয়েন, একাকী হিম-গিরিতে
 দুষ্কর তপস্যা করেন, এবং পরিশেষে ভ-
 বানীপতিকে পরিভূষ্য করিয়া ধনুর্বেদ
 লাভ করেন। প্রবল অরাতিপক্ষের দমন

জন্ম ভঙ্গবরস্ক বীরপুত্রবের এরূপ উৎ-
 কট চেষ্ঠাও দেখিতে সুন্দর। দুর্ঘোষন
 কৌরবসাগরে নগণ্যজলবিষ হইলে তাহার
 বিলয়জন্য বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের সেই দুষ্কর
 কার্য, সেই কঠোর যত্ন অবশ্যই উপহাসকর
 ও কাব্যের অপকর্ষ-সম্পাদক হইত। ইহাতে
 কাব্যের কোথাও উদ্ভাবনার পারিপাটা
 থাকিত না, কোথাও সৃষ্টির রমণীয় বিকাশ
 প্রতিবিস্তৃত হইত না এবং কোথাও পবিত্র
 সৌন্দর্যের মদালস বিভ্রম লীলা করিত না।
 অনন্ত জলধরপটলের ছায়ার যেমন অনন্ত
 বারিধিবন্ধ কালীময় হইয়া যায়, একটি চ-
 রিত্রের কলঙ্কময় প্রতিবিম্ব সেইরূপ কা-
 ব্যের প্রতিচিত্রের প্রতিরেখা কলঙ্কময় হ-
 ইয়া যাইত। দুর্ঘোষনের রাজোচিত গুণ
 ও রাজোচিত গৌরব অস্থানে বা অসময়ে
 বিকশিত হয় নাই। কবি চিত্ররঞ্জিত ক-
 রিয়াই অনেক উদ্দেশ্যের সিদ্ধি ও অনেক
 সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।)

ক্রমশঃ

পৃথ্বীরাজচরিত।

পুরাণে কথিত আছে অবনী দৈত্য-
 দানব-দৌরাস্বা ও অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত
 হইলে ভগবান বিষ্ণু জীব-শরীর ধারণ
 পূর্বক ভূভার হরণ করিয়াছেন। ফলতঃ
 সময়ে সময়ে পৃথিবীতে এক এক জন মহা-
 পুত্রবের প্রয়োজন হয়, এবং সেই প্রয়ো-

জন সাধন জন্ম তাঁহারা অবনীতে জন্ম
 গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের স্বীয় জীব-
 নের পৃথক্ অস্তিত্ব আমরা দেখিতে পাইনা,
 কারণ তাঁহারা এক হইয়া অনেক,—তাঁ-
 হারা জাতীয় জীবনের আদর্শ-স্বরূপ।
 যে দেশে যখন তাঁহারা আবিভূত হন,

সেই দেশ ও তৎকালের ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা হইলে তাঁহাদিগের জীবন পাঠ করিলেই হয় ; পক্ষান্তরে তাঁহাদিগের জীবনচরিত জাতীয় ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নহে । নেপোলিয়ান বোনাপার্টী কহিতেন, ফ্রাঙ্ক ও আমি এক ও অভিন্ন, আমার জীবনই ফরাসিশ জাতির জীবন ! ইহা স্বপ্না গরু নহে, উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসিশ ইতিহাস নেপোলিয়নের জীবন চরিতের ছায়া মাত্র । আমরা উপরে যে মহাত্মার নাম স্থাপন করিলাম, তদীয় জীবনচরিতও তদুপ হাদশ শতাব্দীর হিন্দু জাতির ইতিহাস । আৰ্য্য জাতি কি ছিল, যদি কেহ জানিতে চান, তিনি পৃথ্বীরাজের চরিত পাঠ করুন । যদি কেহ আৰ্য্য জাতির পুনরুদ্ধার দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে পৃথ্বীরাজের উন্নতি ও পতনের বিষয় চিন্তা করুন ।

পৃথ্বীরাজের কাহিনী পাঠ করিতে করিতে সাহসে মন উৎসাহিত, আনন্দে উৎফুল্ল, ও অভিমানে উন্নত হয়, পৃথ্বীরাজ আৰ্য্যকুলগৌরবস্থল । আবার পক্ষান্তরে পৃথ্বী-চরিত পাঠে, মনে ক্ষোভ হয়, হতাশ বয়, লজ্জা হয়,—পৃথ্বী আৰ্য্য জাতির কলহ ।

পৃথ্বীচরিত ঐতিহাসিকদিগের প্রগাঢ় চিন্তার স্থল ; নীতিজ্ঞদিগের উপদেশের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল ; দেশ-হিতৈষীদিগের স্বদেশহিতৈষণা শিখিবার উৎকৃষ্ট স্থল ; এবং কবিদিগের অনুপম ক্রি-

ড়াস্থল । ফলতঃ ইহাতে ইতিহাস, নীতি, কাব্য প্রভৃতির অপৰ্য্যাপ্ত উপকরণ বিদ্যমান আছে । বিষয়টি এত গুরুতর যে, একটি প্রবন্ধে ইহার শেষ করা দুঃসাধ্য । অথচ এরূপ প্রস্তাব ক্রমশঃ প্রকাশ করিলেও সাময়িক পত্রিকার পাঠকবর্গের শ্রীতিকর হয় না । সুতরাং আমরা যথাসাধ্য এক প্রবন্ধেই ইহার শেষ করিব । এই জীবনীটি যে ভাবে লেখা উচিত, হয়ত আমাদের ক্ষমতার দোষে তাহার কিছুই পাঠক ইহাতে দেখিতে পাইবেন না । এস্থলে আর একটি কথা উল্লেখ-প্রয়োজন । পৃথ্বীরাজচরিত ইতিহাসে বিশেষ কিছুই লেখা নাই । কাব্য হইতে ইহার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয় । কিন্তু প্রকৃত বিষয়ের সহিত কবি-কল্পনার এত অধিক মিশ্রণ হইয়াছে যে, কতটুকু কাব্য আর কতটুকু ইতিহাস তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর । আমরা এই প্রস্তাবে কাব্যংশের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা যতদূর সম্ভব তাহা প্রদান করিতে চেষ্টা পাইব । কাব্যের উপকরণের আধিক্য দেখিয়া, আমরা একদা একখানি বৃহৎ কাব্য লিখিব বলিয়া স্থির করি, কিন্তু প্রথম সর্গের কিয়দূর রচনা করিয়া নানা কারণে বিরত হই । বর্তমান লেখকের দুটি প্রবন্ধের উপর নির্ভর করিয়া যিনি “ পলাসীর যুদ্ধ ” রূপ উপাদানের পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন ; তাঁহাকেই আমরা এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে প্রথমে আহ্বান করিতেছি ।

৩৩টি রাজপুত্র স্থপতিবংশের মধ্যে দ্বাদশ শতাব্দীতে ইন্দ্রপ্রস্থে তুমার, অজ্ঞ-নীয়ে চোহান, কান্যকুজের রাঠোর, এবং গুজ্জরাট্টে ভগিলা এই চারি বংশই প্রবল ছিল। খ্রীষ্টিয় ৭৯২ অব্দে অনঙ্গ পাল কর্তৃক তুমার বংশের স্থষ্টিপত্তন হয়। নর-সিংহদেব নামধারী * শেষ রাজা ১১৬৪ শাকে রাজত্ব করেন। এই বংশে সর্ব-শুদ্ধ ২৬ জন রাজা রাজত্ব করেন। অন-হল চোহান বংশের আদিপুরুষ। ৩৮ জন রাজার রাজত্বের পর সোমেশ্বরর আ-জমিরের সিংহাসনে আরোহণ করেন; ইনি তুমার রাজের সহায় হইয়া কান্যকুজ প্রভৃতি দেশের রাজাদিগকে দিল্লীর অধী-নতা স্বীকার করান। দিল্লীশ্বর নরসিংহ সোমেশ্বরের উপর ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় হুহিতাকে তদীয় হস্তে সম্প্রদান করেন। আমাদের নায়ক এই শুভ প-রিণয়ের ফল। ১১৫৯ শাকে শুভলগ্নে ইনি ভূমিষ্ঠ হন। রাঠোরপতি বিজয় পাল নরসিংহের দ্বিতীয় কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, এবং তদীয় গর্ভে কৃষ্ণে আর্ষাকুল-কালিমা কান্যকুজাধিপতি নরা-ধম জয় চন্দ্রের জন্ম হয়।

ইন্দ্রপ্রস্থের শেষ রাজা নরসিংহদে-বের পুত্রসন্তান জন্মে না। সুতরাং স্বীয় দৌহিত্র পৃথ্বীকে অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। তিনি মাতাম-

* টডসাংহেবের মতে ইহার নামও অনঙ্গপাল।

হের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে অভি-বিক্রম হন। * এবং এই হইতেই চোহান ও তুমার বংশের একীকরণ হইল, উভয় দে-শই এক অধিপতির শাসনাধীন হইল।

পৃথ্বীরাজ-জনক সোমেশ্বরের অপার এক পত্নী ছিল, সে অতি দুষ্টরিত্রা ছিল। কিন্তু সোমেশ্বর তাহাকেই প্রাণপণে ভাল-

* রাজাবলী নামক গ্রন্থে এই রূতা-স্তুটি অন্যরূপে বর্ণিত আছে। যথা— সোমেশ্বরের (প্রাচ দেশের রাজার) অ-পার এক রাক্ষসী স্ত্রী ছিল। সে নরসিংহের হুহিতার গর্ভজাত প্রথম পুত্রকে ভক্ষণ করে। এবং ক্রমে স্বীয় স্বামীকেও স্বীয় মতাবলম্বী করাইয়া দেশে নানারূপ অত্যা-চার আরম্ভ করে। নরসিংহ হুহিতা পতি ও স্বপত্নীর আচরণে ভীতা হইয়া স্বীয় ভ্রাতা জীবন সিংহের (নরসিংহের পুত্র) আলয়ে গমন করেন, তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। কালে পিত্রালয়ে পৃথুনামে তাঁহার এক পুত্রজন্মে। জীবন সিংহ অপুত্রক ছিলেন, সুতরাং ভাগিনেয় পৃথুকেই উত্তরাধিকারী রূপে স্থির করেন। কিছু কাল পরে রাজগিরির রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে জীবনসিংহ তথা গমন করেন, এই অব-কাশে পৃথু দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। সমরাস্ত্রে জীবন সিংহ স্বদেশে প্রত্য্যাগমন পূর্বক স্বীয় ভাগিনে-য়ের হুষ্ঠাচরণ জবণ পূর্বক কোন বাঙ-নিষ্পত্তি না করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। পৃথু নিষিদ্ধবাদে দিল্লীশ্বর হইলেন।

বাসিতেন । ফলতঃ সেই খলমতি কুহকিনীর প্রেম-কুহকে তিনি জড়িত হইয়া কিছুদিন মধ্যে তদীয়হস্তে ক্রীড়াপুস্তলবৎ হইয়া পড়িলেন । এইরূপে স্বামীকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করিয়া সেই নর-রাক্ষসী দেশে মানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল, ক্রমে দেশ উৎসন্ন হইল, প্রজা ও অধীন সর্দারেরা বিক্রোহী হইয়া উঠিল ফলতঃ কিছুদিন মধ্যে প্রাচীনদেশে সম্পূর্ণ-অরাজকতা উপস্থিত হইল । প্রধান কর্মচারী, সর্দার ও সাধারণ প্রজারস্বের ভাবগতি বুঝিয়া রূপাপাত্র সোমেশ্বরকে শত্রুহস্তে পরিত্যাগ পূর্বক সেই দুরাচারিণী রাজধানী হইতে রাজযোগে একদা পলায়ন করিল ।

পৃথ্বীরাজ অজ্জমীরের এই দুরবস্থার কথা শুনিতে পাইয়া সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলেন । এবং সামদানভেদদণ্ড চতুর্বিধ উপায়ে সর্দার, অমাত্য ও প্রজারস্বকে বশ করিয়া পিতাকে পুনর্বার পদস্থ করিতে মনন করিলেন । কিন্তু সোমেশ্বরের উপর প্রজাদিগের এরূপ বিজাতীয় হুণা ও বিদ্বেষ হইয়াছিল যে, পৃথ্বীরাজ বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত করিলেন, এবং দিল্লী ও অজ্জমীর সংযুক্ত রাজ্যে স্বীয় একাধিপত্য স্থাপন করিলেন । *

* রাজাবলীর মতে সোমেশ্বরের প্রার্থনারূসারে পৃথু তাঁহার মন্তকচ্ছেদন পূর্বক রাক্ষসী-সহবাস-পাপ হইতে উদ্ধার করেন ।

ঘটনাটকে পৃথ্বী দিল্লীর হইলেন, পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং অজ্জমীরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । এই উভয় ব্যাপারে তাঁহার অপরাধ কি ? মেপোলিয়ান কহিতেন আমি “ ঘটনার সম্বন্ধ ” † ফলতঃ মনুষ্য মাত্রেই ঘটনার অধীন । একথার কেহ যেন এরূপ মনে করেন না যে, আমরা মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছামতের বিরোধী । মনুষ্য যন্ত্র নহে, ইচ্ছা বিশিষ্ট জীব, সত্য ; কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহাকে এরূপ ঘটনাজালে পরিবেষ্টিত হইতে হয়, যে ইচ্ছার প্রতিকূলেও তাঁহাকে ঘটনাজোতে শরীর চালিয়া দিতে হয় । আমাদের মায়ককেও তাহাই করিতে হইয়াছিল ; কিন্তু “ উদয়মুখী প্রতিভার নিত্য-বিদ্রোহিণী সর্গা ” তদীয় অনিচ্ছ সাধনে ক্রুতসঙ্কপ হইল । ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন লোলুপ ক্রুরমতি জয়চন্দ্র সঙ্ঘাত অভিলাষপরামুখ হইয়া পৃথ্বীরঘোর বিদেহী হইয়া উঠিলেন ; অসুয়াপারবশ হইয়া তাঁহার নানারূপ দুর্গাম রটনা করিতে লাগিলেন ; কিছু দিনের মধ্যে দিল্লীর অধীন ও ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্বাধীন ভূপতিবর্গ পৃথ্বীরাজের ভয়ানক শত্রু হইয়া উঠিলেন । জয়চন্দ্রের মন্ত্রণার পত্তন আনহালরবার রাজা ও মন্দরের পুরিহর বংশীয় রাজারা পৃথ্বীর অধীনতা স্বীকার করিলেন । এই সময়ে হিন্দু ভূপতিগণ দুইটি দলে বিভক্ত হইলেন ।

† Child of circumstances.

লৌহ-দুর্গ-কলেবর পত্তনেশ্বর ভোলা-
ভীম দেব ; ঋবতারাসদৃশ সমরে অটল
প্রমরাবংশাবতংশ জীতমান ; দিল্লী-বি-
পক্ষদলের নিকট করগ্রাহী মেয়োরাদিগ
সমর সিংহ ও মন্দরাধীশ্বর মাককুল-পতি
নির্ভীক মহামানী নেহার রাও জয়চন্দ্রের
পক্ষ । চিতোর, নাগোর, সিন্ধু, জলবৎ,
পেশোয়ার, লাহোর, কাঙ্গারা, কাশী,
প্রয়াগ, ও দেবগড় প্রদেশসমূহের অধি-
পতিগণ পৃথ্বীরাজের পক্ষ । সিমারের রা-
জারাও ভয়ে পৃথ্বীরাজের পক্ষাবলম্বন ক-
রিতাছিলেন । তদ্ব্যতীত বীরকেশরী যো-
গীন্দ্র চিতোরাদিগের কিকিৎ বিবরণ
এই স্থলে বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যিক ।

১২০৬ খ্রীষ্টিয় শাকে সমরশাস্ত্রী জন্ম-
গ্রহণ করেন । ইনি কুলদেবতা মহাদে-
বের পরমভক্ত ছিলেন । জনকরাজর্ষির
মাগ্ন শিরে জটাফুঁদে, ত্রীবাগ্ন কমল-পুষ্প-
বীজমালা ; ও কটীতটে রক্তাঙ্গুর ধারণ
করিতেন । ওদিকে সমরে অসম সাহস,
অপ্রতিমের ঠৈর্ঘ্য ও অদ্বুত নৈপুণ্য ছিল,
এবং মন্ত্রণায় পরিণামদর্শিতা, প্রাজ্ঞতা,
ও কৌশল ছিল । উদ্ভীপনাবিষয়ে প্র-
ধানবাগ্মী, আচরণে পরমধার্মিক ও সভ্য
ছিলেন । স্বীয় প্রজা ও অধীনবর্গের যার
পর নাই অমুরাগ-ভাজন ছিলেন । সমর-
শাস্ত্রী পৃথ্বীরাজের ভগিনীকে পরিণয়
করেন ; এবং তাঁহার সহিত ইহার অকু-
ত্রিম সৌহার্দ্য ও বন্ধুতা ছিল । পৃথু ই-
হাকে যথেষ্ট ভক্তি প্রজ্ঞা করিতেন, এবং

ইহার পরামর্শ তিন্ন কোন কর্ম করি-
তেন না ।

পূর্বেই উল্লেখ হইয়াছে যে মন্দরা
দিগ পুরিহর (বা, মাক) বংশোদ্ভাব নে-
হাররাও জয়চন্দ্রের পক্ষাবলম্বী ছিলেন ।
পুরিহর বংশীরেরা তুমার ও চোহান বংশ-
শীয়দিগের করদ প্রজা ছিলেন । নেহার
জয়চন্দ্রের কুমন্ত্রণায় বার্ষিক কর প্রদানে
বিরত ও স্বাধীন হইতে উদ্যত হন । মহা-
বীর পৃথ্বীরাজ অচিরে তদীয় মর্ক খর্ব্ব ক-
রিয়া নিয়মিত কর প্রদানে বাধ্য করিলেন ।

ষাদশ শতাব্দীতে কাটীরাজপুত্রেরা
যুদ্ধ বিষয়ে অতি প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে । ই-
হার পৃথু ও জয়চন্দ্রের অধীনে থাকিয়া
বহুযুদ্ধ করে । ঝালার রাজপুত্রেরাও উ-
ভয় পক্ষেই যোগ দেয় । পৃথু দর বা দদ
নামা ঝালার রাজাকে সমরে পরাভূত
করিয়া তদ্বংশে এক কীর্ত্তিস্তম্ব স্থাপন
করেন । ফলতঃ কিছুদিনের মধ্যে মহা-
বীর অথচ মন্ত্রণাকুশল পৃথ্বীরাজ সমস্ত
রাজপুত্রদিগকে একপ্রকার বশতাপন্ন ক-
রেন । কেহ ভয়ে, কেহ মৈত্রিতে, কেহবা
যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, তদীয় প্রাধান্য স্বীকার
করিতে বাধ্য হন । পরিশেষে কান্যকু-
জাদিগের জয়চন্দ্র তিন্ন আর কেহই তাঁ-
হার সমকক্ষ ছিল না । এই জয়চন্দ্রের
সহিত ক্রমাগত কলহে উভয় পক্ষ হীনবল
হইয়া পড়ে, সেই সুযোগে ভারতের সর্ব-
নাশ উপস্থিত হয় ।

বারেনার দাধিম নামক রাজার দুই

কন্যা ও তিন পুত্র ছিল। এক কন্যাকে পৃথ্বীরাজ বিবাহ করেন, এই কন্যার নাম পৃথা। অপর কন্যা মেওয়ারের রাজা বিবাহ করেন। চাঁদ কবি কছেন যে, পৃথার যৌতুকস্বরূপ দিল্লীখর আটজন পৱন রূপবতী সখী, জিব্বীটিংদাসী, পারস্য দেশজাত একশত অশ্ব, দুইটি গজ, দশটি চর্ম, ও একটি স্বর্ণরৌপ্যখচিত বহুমূল্য শয্যা প্রাপ্ত হন। তদ্ব্যতীত পৃথাকে কাষ্ঠ-নির্মিত শত পুত্রলিকা, শত রথ, ও শত স্বর্ণযুগ্ম প্রদত্ত হয়। কিন্তু দাহিমতনয়-ক্রমকে সহায় পাইয়া দিল্লীখরের যে মহোপকার হয়, তাহার সহিত তুলনার এসকল বহুমূল্যবত্ত্ব অতি অকিঞ্চিৎকর। সর্বজ্যেষ্ঠ কায়মসকে পৃথু প্রধান সচিবের পদে নিযুক্ত করেন; ইনি মন্ত্রণায় বৃহস্পতিতুলা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় যে অন্যান্যরূপে স্বীয় পত্নীর সতিত্বের উপর সন্দেহ হওয়াতে অকালে আত্মহত্যা করেন। পুন্দির নামা দ্বিতীয় জাতা একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। ইনি প্রথমে রাজসমীপে অমাত্য রূপে নিযুক্ত থাকেন, পরে লাহোরের শাসনকর্ত্ব পদে বরিত হন। ইহার সহিতই সাহাবুদ্দিনের প্রথম যুদ্ধ হয়, এবং সেই যুদ্ধেই ইনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন। সর্বকনিষ্ঠ চাঁদরাও খানেখরের যুদ্ধে প্রধান সেনানী ছিলেন, ইহার বিবরণ পরে বর্ণিত হইবে। মুসলমানেরা ইহাকে খাতীরাও বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং

কেরেলা ইহার শৌৰ্য্য বীর্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সাহাবুদ্দিনের সহিত সমরই পৃথু-নাটকের শেষ অঙ্ক। তাহার অভিনয়ের পূর্বে পৃথ্বীর জীবনচরিত সম্বন্ধে আমরা আরো দুই একটি বিবরণের উল্লেখ করিব। পৃথুর সহিত জয়চন্দ্রের মনোবাদের প্রথম কারণ পৃথুর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ ও অচির উন্নতি। ইহার যথাযথ বিবরণ বিস্তৃত হইয়াছে। নাগোরকোটস্থ প্রভূত সঞ্চিত ধনলাভ দ্বিতীয় কারণ; রাজহুময়জে পৃথ্বীরাজের অধোগমন তৃতীয় কারণ; এবং পৃথ্বীরাজের সহিত জয়চন্দ্র-দুহিতার পরিণয় দিতে অসম্মতি চতুর্থ কারণ। আমরা ক্রমে এই জিন্টি কারণের সংক্ষেপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

নাগরকোটনগরে পূর্বতম কোন নৃপতির সঞ্চিত সপ্ততিলাক্ষ স্বর্ণযুগ্মা নিহিত ছিল। পৃথ্বীরাজ তাহা হস্তগত করিতে বাসনা করেন। কিন্তু জয়চন্দ্র যবনরাজ সাহাবুদ্দিন ও পাতনরাজ ভীমদেবকে সহায় করিয়া তাহার প্রতিবন্ধকতা করিতে চেষ্টা করেন। তখন দিল্লীখর স্বীয় কুটুম্ব ও সচিব পুন্দিরকে চিতোরনগরে দূত স্বরূপে প্রেরণ করেন, এবং সমরশায়ীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। সমরশায়ী স্বীয় প্রিয়তম তনয় কর্ণের হস্তে রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভারাপণ করিয়া পৃথ্বীরাজের সাহায্যার্থ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করেন। প্রায় ৪ কোশ দূরে থাকিতে পৃ-

পৃথ্বীরাজ অমাত্যবর্গসহ অগ্রসর হইয়া সম্রাটের সমরশালীকে প্রবেশ করেন। উভয়ে মন্ত্রণাপূর্বক এই স্থির করিলেন যে পৃথ্বীরাজ ভীমদেবের বিক্রমে যাত্রা করিবেন, সমরশালী সাহাবুদ্দিন ও জয়চন্দ্রের প্রতিকূলে গমন করিবেন। এই মন্ত্রণার পর সমরশালী নাগরকোটে উপস্থিত হইয়া প্রবল শত্রুদলের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুদিন যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কোন পক্ষেই জয় পরাজয়ের সম্ভাবনা কিছু দৃষ্ট হইল না। ইতিমধ্যে পৃথ্বীরাজ ভীমদেবকে পরাস্ত করিয়া নাগরকোটে বাইরা সমরশালীর অনুবল হইলেন। প্রজ্বলিত ভীষণ দাবানলে প্রবল-প্রভঞ্নের সংযোগ হইল; আর কার সাধ্য যে সে অনলপ্রবাহের সম্মুখে ভিত্তিতে প'রে? জয়চন্দ্র ও সাহাবুদ্দিন সড়রই পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়নপরায়ণ হইলেন। নাগর কোটের বিপুল সম্পত্তি বিক্রয়দিগের হস্তগত হইল; কিন্তু সমরশালী তাহার কপর্দক ও স্পর্শ করিলেন না, সকলই পৃথ্বীকে অর্পণপূর্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

দ্বিতীয়তঃ জয়চন্দ্রের অনঙ্গমুঞ্জরী নামে এক পরমল্পপাত্তী দুহিতা ছিল। কন্যা বয়স্ক হইল, কিন্তু মনোমত বর জুটে না। তখন রাজস্বরযজ্ঞব্যাপদেশে পাত্র নির্বাচন করিতে মনস্থ করিলেন। সেই মহাযাগের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। নিমন্ত্রণ পাইয়া দিগ্ দিগন্তর হইতে ভূপতি-

রূপ কান্যকুজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেবল জয়চন্দ্রের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া পৃথ্বীরাজ তথায় গমন করিলেন না। এই ব্যাপারের নিয়ম এই যে হোমোক্তের সমস্ত কার্য মুকুটধারিদিগের দ্বারা নির্বাহিত হওয়া প্রয়োজন। পৃথ্বীরাজের অনুপস্থিতিবিবন্ধন হোমের অঙ্কহানির আশঙ্কা হইল। পরে পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা লইয়া পৃথ্বীরাজের এক স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইলেন; এবং তাঁহার উপর জাতক্রোধ বশতঃ তাঁহাকে ধারণানোর স্থানীয় করিয়া যজ্ঞসভার দ্বারে স্থাপন করাইলেন। লোকপরম্পরায় এই সংবাদ পৃথ্বীরাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি শ্রবণমাত্র ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া সর্বৈশ্বর্যে কান্যকুজে উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। বীরকেশরী দিল্লীশ্বরের হস্তে ক্ষয়কোপম জয়চন্দ্র শীঘ্রই পরাজিত ও হতমান হইলেন। দ্বারস্থিত কাঞ্চন-প্রতিমা লইয়া পৃথ্বীরাজ জয়োল্লাসে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজস্বয় যজ্ঞ অঙ্গহীন হইয়া কোনমতে সমাপ্ত হইল; পৃথ্বীরাজের প্রতি জয়চন্দ্রের বিশেষ ভাব অধিকতর প্রবল হইল। বিজয়ী পৃথ্বী যখন পরাস্ত হৃপতিরূপে পরিবেষ্টিত হইয়া হোমপ্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান হইয়া স্বদেশগমননিমিত্ত স্বীয় সৈন্যদিগকে অনুমতি করিতেছেন, এমন সময়ে তদীয় মস্তকে পার্শ্ববর্তী প্রাসাদ হইতে পুষ্পরক্ষি

হইল; পৃথু উর্দ্ধতাগে নয়নপাত করিলেন, অমনি এক অমুপমা সুল্লরীর চক্রে আপন চক্ষু মিলিত হইল ।

জয়চন্দ্র যে অভিপ্রায়ে রাজস্বর ব-জ্ঞানুষ্ঠান করিলেন তাহা নিষ্ফল হইল ; নিমজ্জিত রাজন্যবর্গমধ্যে অনঙ্গমুঞ্জরীর ম-নোমত্ত বর মিলিল না। হোম-প্রাজ্ঞনে যে বিজয়ী সুবকের প্রতি নয়ন আকৃষ্ট হ-ইয়াছিল, মন তাঁহার পশ্চাতে গিয়াছে, ম-মের মত বরকে মনে মনে বরণ করিয়াছেন, অন্যবরে মন আর যাইবে কেন ? যজ্ঞ স-মাগ্ন হইল, জয়চন্দ্র একদা দুঃখিত হইয়া তনয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভূমি কাহাকে পতিভে বরণ করিবে ? অনঙ্গমুঞ্জরী প্রথ-মতঃ কোনও উত্তর করিলেন না। পরি-শেষে পিতার নিবন্ধাতিশয় অতিক্রম ক-রিতে নাপারিয়া যে একটি নাম করিলেন, তাহা শুনিবামাত্র জয়চন্দ্রের আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া গেল। চিরশত্রু পৃথ্বীরা-জকে কন্যাসম্প্রদান অপেক্ষা তাহাকে জলে নিমজ্জনও শ্রেয়ঃ। হুহিতাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন ; অনঙ্গমু-ঞ্জরী পিতৃ-নিষ্কাষিতা হইয়া কোন আত্মী-য়ের গৃহে রহিলেন। কিছু দিন মধ্যে এই কথা পৃথুরায়ের কর্ণগোচর হইল। তিনি বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পত্রসহ চন্দ্রতা-টকে কান্যকূজে প্রেরণ করিলেন। তিনি জানিতেন প্রাণসত্যে জয়চন্দ্র এ পরিণয়ে সন্মত হইবেন না, অতএব স্বদলবলে স্বঃ২ও দুতের অনুগমন করিলেন। এবৎ জয়-

চন্দ্রকে গৃহে পরাতব করিয়া অনঙ্গমুঞ্জ-রীকে স্বীর রাজধানীতে লইয়া আসিলেন। মহাসমারোহে পরিণয় সমাধা হইল। বিধাতার চক্র বুঝাতার। কোন দুর্লভ্য স্ত্রে কি ঘটে লোকে তাহা স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারে না।

নবপ্রণয়ীর রূপলাবণ্যে বীরকুলধ্বত প্রজারাজক পৃথ্বীরাজ মোহিত হইয়া শৌর্ধ্য বীর্ধ্য বিন্মুত হইলেন, প্রজাপালন ও রাজ্য-শাসনে বিরত হইলেন। অমাত্যবর্গের হস্তে সমস্ত কার্য্য মাস্ত করিয়া সমস্ত দিন অন্তঃপুরেই অতিবাহিত করিতেন। রাজ-কার্য্যে স্থপতির ঈদৃশ ওদাস্যাবলোকনে রাজ্যমধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা লটিতে লা-গিল। পশ্চিমে যে বিতস্তিপ্রমাণ যেষ দেখা দিয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে বৃহদা-কার ধারণ পূর্বক ঘোরতর ঘনঘটাংরূপে, প্রচণ্ড প্রভঞ্জনরূপে ভারতাকাশে সহসা উদয় হইল। ভারত-শত্রু সাহাবুদ্দিন-যবন ভারতবন্ধে দিগ্বিজয়িরূপে পদার্পণ করিল। ইতিপূর্বেও একদা নাগরকোট নগরে উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে অনাত্যাবে। অর্থলোভে জয়চন্দ্রের মন্ত্রণার আসিরাছিল, অরুতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। কিন্তু অরুত-কার্য্য হইলেও তখনই জানিয়া যার যে পৃথুও জয়চন্দ্রের গৃহবিবাদে ভারত ক্রমে দুর্বল ও বীরশূন্য হইতেছে। এতদিন ধূর্ত শূণ্যালের মায় স্বযোগ অধেষণ করিতে-ছিল, এইক্ষণ কুলদ্বার জয়চন্দ্রের আয়-

ক্রমে ভারতবিজয় সৰূপে করিয়া উপস্থিত হইল।

যে গৃহ-বিবাদে দশাননের সৰ্বনাশ হইয়াছিল; যে গৃহ-বিবাদে কুব্জকুল নি-
খুল হইয়াছিল; পুনশ্চ ভারতে সেই
সামাজিক রোগ যে দিন উপস্থিত হইল,
সেইদিনেই ভারতবাসী হিন্দুগণের সতর্ক
হওয়া উচিত ছিল। সেই দিনই জানা
কর্তব্য ছিল যে সেই ভয়ানক রোগ চরমে
কি শোচনীয় ফল প্রসব করিবে। কিন্তু
হায়! কাহারই চৈতন্য হয় নাই! সেই
পাপে অদ্য পবিত্র ভারতবর্ষে স্নেহের
পদাঘাত! কুলজার জয়চন্দ্র, কি করিলে?
এ পাপের ভোগ্যুকি তোমার ভোগিতে
হইবেনা? কিন্তু, আমরা কি লিখিতে কি
লিখিতেছি? পাঠক, মার্জনা কর, শুন
তৎপর কি হইল।

সাহাবুদ্দিন লাহোরের সীমার আ-
সিয়া উপস্থিত হইলে, তত্রতা শাসনকর্তা
মহাবীর পুন্দির সৈন্যে তদীয় পথাবরোধ
করিলেন। যোরতর সংগ্রামের পর পু-
ন্দির নিহত হইল, বিরয়োৎকুল যবন
সেনা “আল্লাহ আকবর”! যোর রণ-
নাদে দিগন্ত কম্পিত করিয়া সগর্বে পু-
র্কীভিন্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই
বিবরণ পৃথ্বীরাজের কর্ণগোচর হইল,
কিন্তু তাহাতেও তিনি বিপদ অনুভব ক-
রিতে পারিলেন না। সাহাবুদ্দিন দিল্লির
সীমার পদার্পণ করিলেন, তখনও পৃথ্বী
মোহ নিত্রায় মিত্রিত। ক্রমে ধামেধ-

রের নিকটবর্তী নারায়ণ গ্রামে * উপস্থিত
হইয়া শিবির সংস্থাপন করিল। পৃথ্বী-
রাজের প্রিয়পাত্র চন্দ্র ভাট বাইরা এই
কুমংগদ তাঁহাকে প্রদান করিল। ত-
খন নিম্নিত শার্দূলের জায় শূঁড়-সিংহ
পৃথ্বীরাজ গর্জিয়া উঠিলেন। ইজিত মাত্র
ঘোর রোলে রণশঙ্খ ও রণভেদী বা-
জিয়া উঠিল; নানা দিকে অদীনরাজব-
র্গকে আহ্বান করিতে দূত প্রেরিত হইল;
শিক্ষিত সৈন্যদলের আক্ষালনে নগর
টলমল করিতে লাগিল। তখন রাজ-
পুতনার সৈনিক-শাসন-প্রথা † প্রচলিত
ছিল, সুররাং দেশে যত লোক, সকলেই
সৈনিক, সকলেই সমর-কুশল, সকলেই
সামরিক বিদ্যায় শিক্ষিত। সুররাং দুই
এক দিনে লক্ষাধিক সৈন্য সংগ্রহ হইল;
এবং ক্রমেই অদীন মূপতিবর্গও আসিয়া
উপস্থিত হইলেন। পৃথ্বী জয়চন্দ্রের গৃহ-
বিবাদে বাঁহারা পৃথ্বীরাজের বিপক্ষ ছি-
লেন, ভারতের সাধারণ শত্রুদমন ক-
রিতে হইবে বলিয়া, তাঁহারা শক্রতা বি-
স্মৃত হইয়া একত্রে বন্ধুভাবে মিলিত হই-
লেন। আহা! ভারতের সে এক সুখের
দিন গিয়াছে।

চিত্ররথ গন্ধর্বকর্তৃক দ্রাব্যোধন স-

* বোধ হয় এলফিনস্টোন প্রভৃতি
ইংরাজ ইতিহাসলেখকেরা ইহাকেই
“টরোরি” নামে অভিহিত করিয়াছেন।

† Feudal system. টড সাহেব কৃত
রাজস্থানের ইতিহাস দেখ।

ক্রীক বন্দীকৃত হইলে, সুখিষ্ঠির তাহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য ভীমার্জুনকে আদেশ করিলেন। ভীমার্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “ মহারাজ, আপনকার এ কিরণ ধর্মবুদ্ধি, আমরা বুঝিতে পারি না। যে শত্রু আমাদের আশ্রয় দিল, সে বিনষ্ট হইলেও পরম আত্মাদের বিষয়। তাহাকে কিজন্য উদ্ধার করিতে যাইব ? ” উদারচরিত্র-প্রশস্তমণি ধর্মতনয় সৌন্দর্যরকে সাস্থনা করিয়া কহিলেন—

“ কহিলা যতক পার্থ অন্যথা নাকরি ।
সে মম পরম শত্রু আমি তার অরি ॥
আত্ম পক্ষে যেরে হৃদয় করিব যখন ।
তার শত সৌন্দর্য আমরা পঞ্চজন ॥
সেই হৃদয় হয় যদি পরপক্ষগত ।
তখন আমরা ডাই পঞ্চোত্তর শত ॥ ”

কাশীরাম দাস । *

ধন্য সুখিষ্ঠির ! ধন্য আর্ষাসন্তান !
ধন্য ভারতবর্ষ ! আত্ম ! একরূপ উদার ভাব
এইক্ষণ আর দেখা যায় না। তাহাতেই
ভারতের এতদূর্দশা। জয়চন্ডের সহিত
অস্ব-কলহে পৃথ্বীরাজের অসংখ্য সৈন্য
নাশ হইয়াছিল ; ১০৮ জন সৈন্যাধ্যক্ষের
মধ্যে মাত্র ৬৪ জন জীবিত ছিল। বাহা
হউক, তথাপি ছিলক পদাভী, ছিলক
অশ্বারোহী, এবং তিনসহস্র সমর-মাতঙ্গ
* “ প্রাচীন রোমের গীতি ” নামক
লর্ডমেকলের প্রথম প্রবন্ধের চরমভাগ
দেখ ।

লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। চি-
তোরাধিপ সমরশাস্ত্রী প্রধান সেনানীপদে
বরিত হইলেন। তিন দিবস উত্তর পক্ষ
পরস্পরকে কিছুই বলিলেন না। চতুর্থ
দিবস প্রভুবে যুদ্ধারম্ভ হইল।

সাহাবুদ্দিন স্বীয় সৈন্যের পুরোভাগে
অশ্বপৃষ্ঠে উপবেশন পূর্বক, তাহাদিগকে
সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, “ বীরগণ !
তোমরা জয়লাভু হইয়া স্বদেশ পরি-
তাগ পূর্বক, শ্রীপুত্র আশ্রিত স্বজন পরি-
তাগ পূর্বক, এই কাফেরের দেশে অ-
সিয়া উপস্থিত হইয়াছ। তোমরা প-
ঞ্জাব জয় করিয়াছ, লাহোর জয় করিয়াছ,
এবং সিন্ধুদেশও জয় করিয়াছ সত্য; কিন্তু
সে সকল স্থান তোমাদের স্বদেশ মধ্যেই
বলিতে হইবে। এবং যেসকল বিপকের
সহিত যুদ্ধ করিয়াছ, তাহারাও আমাদের
সমধর্মী এবং একইরূপ রণকৌশলসম্পন্ন।
অদ্য তোমরা প্রবল সিন্ধু নদের পর পারে
উপস্থিত হইয়াছ, পৃষ্ঠদেশে ঋজ্রোতা
কাগার নদী বহিতেছে; যদি তোমরা
কাফের সৈন্য দেখিয়া ভীত হইয়া পলা-
য়নে চেষ্টা কর, পলায়ন করিতে পারিবে
না। কাগার তোমাদের পথ রোধ ক-
রিবে, এবং কাফেরের হস্তে একজনও
বন্দী পাইবে না। যুদ্ধ করিয়া যদি পরা-
ভূত হও, তাহাতেও যে ফল, যুদ্ধ না
করিয়া প্রস্থানপারায়ণ হইলেও সেই ফল।
পুত্রসং শৃগালের ন্যায় প্রস্থান না করিয়া
সিংহ-বিক্রমে প্রাণপণে যুদ্ধ করাই আ-

মাদের উচিত। জয় পরাজয়ের ছিন্নতা নাই, যদি আল্লার দোওয়ার জয় লাভ করিতে পার, তবে এই সম্মুখস্থিত বিশাল রাজ্য, ও ভারতের মণিকাঞ্চন তোমাদিগেরই। আমি তোমাদিগের প্রভু বটি, কিন্তু এসকল আমার হইলে তোমরা যথাযোগ্য অংশলাভে কেহই বঞ্চিত হইবে না। আমার পরিশেষে বক্তব্য এই যে এই যুদ্ধে জয়ী হইলে তোমাদের পরমারাধ্য মুসলমান ধর্মেরই জয়। এই ধর্ম-যুদ্ধে যদি প্রাণও যায়, তথাপি স্বর্গে যাইয়া সুরমা-নয়না পৈরীদিগের সহবাসে থাকিয়া শত্রু-করোড়িতে সুস্বাদু সুরাপান করিতে পারিবে। মনোহর আলয়ে বাস; সুমিষ্ট খাদ্য; শত শত সুলভী রমণী; এসকলই অনন্তকাল পর্য্যন্ত ভোগ করিতে পারিবে।* এপৃথিবীর মুখ অল্পকাল স্থায়ী, কিন্তু স্বর্গীয় মুখ অনন্তকাল স্থায়ী। অতএব এ যুদ্ধের মৃত্যুও মঙ্গল। সুতরাং সাহসকর, অগ্রসর হও, শত্রুযুগুচ্ছেদন কর।” ইহা কহিয়া শরাসন হইতে একটি শর নিক্ষেপ পূর্বক পশ্চাত্তাণে সরিয়া গেলেন। শত্রুধারী যবন-অস্বারোহীগণ “আল্লাহু আকবর!” বলিয়া গগন কাঁপাইয়া নক্ষত্রবেগে শত্রুর অভিমুখে ধাবিত হইল।

পৃথ্বীরাজ স্বীয় সৈন্যগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। দক্ষিণ-পা-

* সেলুকোরাণ ৭০, ১৪০, ১৪৯, ১৫১, ২৭৮, ৪৪৯ পৃষ্ঠা দেখ।

র্ষিক সৈন্যের ভার স্বহস্তে রাখিলেন, বাম পার্শ্ব মহাবীর চাঁদরাওয়ার হস্তে ন্যস্ত করিলেন; অধিকাংশ-অস্বারোহী-সম্মিলিত সৈন্যের মূলভাগ বীরকুলচূড়ামণি সমরে অটল সমরশায়ী অদীনে ছিল। নির্ধারিত হইল যে সমরশায়ী বিপক্ষ সৈন্যের কেন্দ্রস্থান লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইবেন, এবং সাহাবুদ্দিন ও অপরাপর মহামুদীর সেনাপতিদিগকে কেন্দ্র রক্ষা করিতে নিযুক্ত রাখিবেন। ঠিক সেই সময়ে পৃথ্বীরাজ ও চাঁদরাও বিপক্ষের উভয় পার্শ্ব আক্রমণ করিবেন। এইরূপ সুর্য্যবস্থা করিয়া পৃথ্বীরাজ এক ভীষণ সমর-মাতঙ্গ আরোহণ করিলেন। এবং অসিচর্চ তিনবার ভাঙিতবেগে দোলায়মান করিয়া সৈন্যগণের চিত্তাকর্ষণ করিলেন। সকলই নীরব, নিস্তব্ধ, স্থির ও অটল। তখন জলদান্তীর ঞ্চতিসুখকর অথচ চিত্ত-উত্তেজী স্বরে কহিলেন “রাজপুত্রকুল ললামবীর-রন্দ। তোমরা প্রাতঃস্বর্গীর বাপ্পারাও ও মহাবীর খুমানের বংশধর, এই কথাটি যেন স্মরণ থাকে। হুর্নাস্তা ব্রহ্মহুঁরাচার একবার নাগরকোটে তোমাদের অসির তেজ অনুভব করিয়াও পুনরায় পতঙ্গবৎ জ্বলন্ত অগ্নিশিখার দগ্ধ হইতে আসিরাছে। এবার বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া তোমাদিগকে পরাস্ত করিতে; তোমাদিগের স্ত্রীপুত্রকে অনাথ করিতে; স্বর্গাদপি গরিয়সী জননী জন্মভূমিকে জয় করিতে আসিরাছে। একি সামান্য আপ্সর্ক। বীরপ্রহু রাজ-

ছায়েন স্ববনের পদার্পণ। অশ্চর্যা, বেনমাতা
 রাক্ষসী ইহাদিগকে এখনও গ্রাস করেন
 নাই। অশ্চর্যা, কুলদেবতা একলিঙ্গ মহা-
 দেব স্বীয় সর্বসংহারক শূলে ইহাদিগকে
 নির্মূল করেন নাই। দেবতারা দেখিবেন
 রাজস্থানে বীর আছে কি না? তাঁহারা
 তোমাদের শূরত্বের পরীক্ষা করিতেছেন?
 তবে কি আর এখনও নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডা-
 সমান থাকিবে? আর এক মূর্ত্তও কি
 পবিত্রা ভ্রমভূমিকে স্নেহপানরেণুতে ক-
 লঙ্কিত দেখিবে? স্বীয় স্ত্রী পুত্রদিগকে
 ভীকরাও রক্ষা করে। কংপুৰযেরাও স্বীয়
 কুলদেবতাদিগকে রক্ষা করে। আর অগ্নি-
 কুলসন্তৃত দেবসন্তান রাজপুত্র কি ভীক
 হইতেও অধম? বাম্পারাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে
 খুমানের সঙ্গে সঙ্গেই কি রাজস্থানের বী-
 রত লোপ পাইয়াছে? পৃথ্বীরাজের শ-
 রীরে প্রাণ থাকিতে, তোমাদিগের ন্যায়
 সমরবজ্রী বীরকুল তাঁহার সহায় থাকি-
 তে সে আশঙ্কা নাই। ঐদেখ শত্রুর
 তীক্ষ্ণশর শন্ শন্ করিয়া আসিতেছে, আর
 বিলম্ব কেন? দৃঢ় মুষ্টিতে অসি ধারণ
 কর; কটী বন্ধন কর; অগ্রসর হও। জয়
 অনুর-নাশিনী বেনমাতা! জয় হর হর এক
 লিঙ্গ।* “ইহা বলিয়া পৃথ্বীরাজ হকার

* আমরা এখানে চরিতাখ্যায়কদিগের
 পদ্ধতি পরিভাষা পূর্বক কবিদিগের অনু-
 সরণ করিয়াছি। ডাক্তার ক্রিমেন সেন্সা-
 কের মুদ্রের পূর্বে উইলিয়ম ও হেরলুডের
 মুখে বেরুপ বক্তৃতা দিয়াছেন, (নর্থাম-

ছাডিলেন, সেই হকারের সহিত মহত্ব স-
 হস্র বীরগর্জন মিশিল, রণভেদী বোর-
 রোলে বাজিল। চতুর্দিকে “জয় অনুর
 নাশিনী বেনমাতা,” “জয় হর হর এক
 লিঙ্গ” ভয়ঙ্কর রগনিমাদ উত্থিত হইল,
 অসি ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল, দিগ্-
 মণ্ডল বোর কোলাহলে পরিপূর্ণ। হস্তীর
 রুংহিত, অশ্বের হ্রেষারব, পদাভিক ও অ-
 শ্বারোহীদিগের আক্ষালনে যুগ্মপ্রলয়ের
 ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। চতুর্দিক ধূলী
 ও কলহকুলে আচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে কেবল
 “মার্ মার্” “কাট্ কাট্” শব্দ শুনা যা-
 ইতে লাগিল, কিন্তু কয়েক দণ্ড আর কি-
 ছুই জ্বলণ বা দর্শন হইল না।

পূর্বনির্দেশ মতে সমরশায়ী শত্রু
 সৈন্যের কেন্দ্রভাগ, ও পৃথ্বীরাজ ও চাঁদ-
 রাও উভয় পার্শ্ব যুগ্মপৎ আক্রমণ করি-
 লেন। সমর-মাতঙ্গ ও রাজপুত্র সেনার
 বিক্রম দেখিয়া মহম্মদীয় পার্শ্বিক সৈ-
 ন্যারা ভীত হইল; এবং ক্রমে পৃষ্ঠভঙ্গ
 দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কেন্দ্রস্থ মে
 তখন সাহাবুদ্দীন ও সমরশায়ীতে বোরতর
 যুদ্ধ চলিতেছে। বহুকণ পরে সাহাবু-
 দ্দীন সমরশায়ীর উপর এরূপ বেগে বর্ষা-
 কঙ্কোরেস্ত ও খানাম ৪৫৫ ও ৪৬৮ পৃষ্ঠা)
 আমরা তাহারই অনুকরণ করিয়াছি।
 বোধ হয় ইহাতে ঐতিহাসিক সত্যের
 কোন অপমান হয় নাই। ইহাতে আমরা
 যদি দোষী হই, তবে অনেক চরিতাখ্যায়ক
 ও ঐতিহাসিকই দোষী।

ঘাত করিলেন যে, সেই আঘাতেই তাঁহার
প্রাণনাশ হইত, সহসা তাঁহাকে পশ্চাৎ
করিয়া মহাবীর চাঁদরাও অগ্রসর হইলেন।
তাঁহার রণকৌশলে মহামদীয় সেনারা ব্য-
তিব্যস্ত হইয়া পড়িল। তিনি এরূপ লবুহস্তে
অসিচালন করিতে লাগিলেন যে, এক
এক আঘাতে এক এক জনের মুণ্ড ভূমি-
সাৎ করিতে লাগিলেন। এমন সময় দক্ষিণ
পার্শ্ব পরাস্ত করিয়া পৃথ্বীরাজ সেইস্থানে
উপস্থিত হইলেন। কিন্তু চাঁদরাওয়ের
অস্ত্রত বুদ্ধকৌশল দেখিয়া পৃথ্বী ও সমর-
শায়ী নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁ-
হার প্রশংসা করিতে এবং একএকবার
উৎসাহ দিতে লাগিলেন। হৃপতিও মহা-
বীর সমরশায়ীর উৎসাহ পাইয়া বিগু-
ণিত বিক্রমে চাঁদরাও যুদ্ধ করিতে লাগি-
লেন। একজন বীরের ভেঙ্গে স্বীয় বহু
সৈন্যের নাশ দেখিয়া সাহাবুদ্দিন চাঁদরা-
ওয়ের প্রতি এরূপ বেগে আঘাত করিলেন
যে, ছিন্ন শির হইয়া সেই শূরশ্রেষ্ঠ রণভূ-
মিতে পতিত হইলেন। প্রিয়তম সেনানীর
মৃত্যু দেখিয়া শোক ও ক্রোধে পৃথ্বীরাজ
স্বয়ং সাহাবুদ্দিনকে আক্রমণ করিলেন।
দুই এক মুহূর্ত্ত মধ্যে তদীয় বিশাল খড়্গের
আঘাতে যবনরাজ অধ্বপূর্ণ হইতে ভূমিতে
পতিত হইলেন। ভারতের নিতান্ত ক-
পাল ভাবিয়াছে, ভারতের সর্বনাশ হ-
ইবে, তাই বলিয়াই কেবল তাঁহার প্রাণ-
বিরোধ হইলনা। স্বীয় সৈন্যেরা অচেতন
সাহাবুদ্দিনকে ফেলাইয়া যুদ্ধ তল দিয়া

যেবপালের ন্যায় পলায়নপরায়ণ হইল।
সমরশায়ী বিংশতি ক্রোশ পর্য্যন্ত তাহা-
দিগকে অনুসরণপূর্ব্বক ইস্ত্রপ্রান্তের সীমা
হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। লজ্জা ও
ক্লেভে সাহাবুদ্দিন অবশিষ্ট কতিপয়
সৈন্য লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

ধামেশ্বর সমরক্ষেত্র হইতে পরাস্ত ও
হতমান হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর
সাহাবুদ্দিন আমোদ প্রমোদে প্ররুত হই-
লেন বটে, কিন্তু সে অপমান দগ্ধ অঙ্গার-
বৎ তদীয় হৃদয়ে ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া সর্ব্বদা
জ্বলিত। কেহেরস্তা কহেন “একদিনের
তরে তিনি স্মৃথে নিদ্রা যান নাই; এবং
জাগ্রত হইয়া ও কেবল শোকে ও লজ্জায়
দগ্ধ হইতেন।” * যে সকল সৈন্য ও সৈ-
ন্যপতি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া-
ছিল, তাহাদিগকে নানামতে অপমান ক-
রেন এবং লাঞ্ছনা দিয়া অনেককে দেশ
হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দেন। এইরূপে
দুই বৎসর গত হইল।

এই সময়মধ্যে তুরস্ক, তাজিক, আ-
ফগান প্রভৃতি মুশিকিত ১২০,০০০ অশ্বা-
রোহী ও বহুসংখ্যক পদাতিক সংগ্রহ ক-
রিয়া দ্বিতীয়বার ভারতভিমুখে যাত্রা ক-
রিলেন। এই সৈন্যদিগের মধ্যে অনেকের
উক্ৰীয় মগিন্দ্রক্য খচিত, ও বর্ষ রঞ্জভকা-
কনে সুশোভিত ছিল। † দিল্লীধরও

* ত্রিগুস কেহেরস্তা ১ম বালম ১৭৩ পৃ।

† ঐ । মাস হৈমকৃত ভারত ইতি-
হাসে ১ম বালম ৩০ পৃ।

সাহাবুদ্দিনের অভিসংকার করিতে অপ্রস্তুত ছিলেন না। সার্বজন্য হিন্দু স্থপতি দিলীখরের অনুবল হইলেন, সর্বশুদ্ধ তিনলক্ষ অশ্বারোহী, তিন সহস্র সময়মাতঙ্গ, এবং অসংখ্য পদাতি সমস্তিবিদ্যাহারে পুনর্কার্যে ধানেশ্বর সময়ক্ষেত্রে কাগার নদীর পূর্বপারে হইয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। ভারতীয় ভূপতিগণের জয় বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস, যবন বলিয়া ক্রম্বেপ নাই। ভাগিরথীর পবিত্র সলিল স্পর্শ করিয়া সকলেই শপথ করিয়াছেন, হয় যুদ্ধে জয়ী হইব, নতুবা প্রাণত্যাগ করিব *। হিন্দু স্থপতিগণ সাহাবুদ্দিনকে বলিয়া পাঠাইলেন, “যদি তোমার স্বীয় জীবনের প্রতি ঝিকার জন্মিয়া থাকে, তথাপি এতগুলি লোকের পরিবারদিগকে কেন অনর্থক অশাথ করিবে? যদি প্রস্থান করিতে চাও, পথ পরিষ্কার আছে। যদি নিতান্তই মরিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে অগ্রসর হও। আমরা দেবতার নাম করিয়া শপথ করিয়াছি, রজনীমধ্যে প্রস্থান না করিলে নিশি অবসান মাত্র শক্রবৃহৎ-ভেদী সময় মাতঙ্গ, আহবামোদে-উদ্বৃত্ত বুদ্ধাধ, এবং শোণিত-পিপাসু সৈনিক লইয়া তোমাকে আক্রমণ করিব।* এবং তোমার হস্তত্যাগ সৈন্যকে পদে দলিত করিব।”*

ধূর্ত যবন যেন এই সপর্ক বাক্যে ভীত হইয়াছে। এই ভাণ্ড করিয়া নতৃত্যবে উত্তর করিল, আমি জাতক্ৰোধে যুদ্ধ করিতে

* মারেক্ত ভারভেতিহাস ১৭৫ পৃ।

আসিয়াছি। আশনাদিগের সহিত যুদ্ধ করা আমার অভিপ্রেত নহে। তবে জাতার অনুমতি ভিন্ন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারি না। বাহাউক জাতার নিকট আপনাদের আদেশ লিখিয়া পাঠাইলাম, উত্তর আসাপর্ষ্যন্ত যুদ্ধ ক্ষান্ত রাখিবেন। † এই চাতুরিপূর্ণ উত্তরে হিন্দু-জগণ আক্লাদে অধীর হইলেন। দ্বারে কালসর্প রাখিয়া গৃহমধ্যে স্রুণে স্রুণ্ডি সম্বোগে নিবিষ্ট হইলেন।

মহাসমারোহে ভোজ ও হৃত্য গীতে প্রস্তুত হইলেন। সকলেই নিরস্ত্র, সকলেই অমোদে মত্ত, সকলেই অপ্রস্তুত। নিস্ত্রক্কে নিশীথ সময়ে ধূর্ত যবন-পতি সসৈন্ত কাগার নদী পার হইয়া অতর্কিত রূপে বিপক্ষ শিবির আক্রমণ করিল। ক্রমমারে হৃত্য গীত স্থগিত হইয়া শিবির মধ্যে মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কিছু বহুসংখ্যক সেনানী সেই অল্প সময় মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া শিবির রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন, ইতিমধ্যে অবশিষ্টেরাও প্রস্তুত হইল। তখন সমস্ত হিন্দুসৈন্য চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া চতুষ্কোণবাহ রচনা করিল। সাহাবুদ্দিন বৃহৎ ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া পুনর্কার্য এক প্রত্যারণাপরিপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করিলেন। বৃহৎ পরিত্যাগ পূর্বক হিন্দুসৈন্তগণ ছিন্ন ভিন্ন হইবে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে

† এলকিনেস্তোন ৩১১ পৃ, ও মারে ১৭৫পৃ।

প্রস্থান করিতে ইচ্ছিত করিলেন। তাহার প্রস্থানের ভাগ করিয়া উল্লেখ্যে পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠা বাইতে লাগিল। হতবুদ্ধি হিন্দুসৈন্যগণ সেই হুরভিসন্ধির মর্ঘভেদ করিতে না পারিয়া বাহ ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। রণজয়ুক সাহাবুদ্দিন এই অবসরে স্বীয় শরীররক্ষক বর্ষধারী দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে সেই ছত্রভঙ্গ হিন্দু সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। এইরূপে প্রত্যর্জিত হইয়া অধিকাংশ হিন্দুসৈন্য হত নিহত ও বন্দীকৃত হইল; অবশিষ্ট প্রস্থান করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। দিল্লীখর অল্প বন্দীকৃত ও হত হইলেন। কিন্তু সেই ভয়ানক দুর্দশাপ্রাপ্ত হইয়াও চিতোরাধিপ সময়শায়ী ও তদীয় তনয় কল্যাণ বীরের ম্যায় বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া সাহাবুদ্দিনের অধিকাংশ সৈন্যসামন্ত সংহার করেন। অবশেষে স্বীয় অধীনস্থ ত্রয়োদশ সহস্র সৈন্য ও পুত্র সমভিব্যাহারে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া রণভূমিতে বীরশয়নে শায়িত হইলেন।

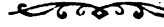
খানেশ্বরের যুদ্ধের সহিত সেন্দ্বাকের যুদ্ধের অনেক বিষয়ে তুলনা করা বাইতে পারে। প্রথমতঃ সাহাবুদ্দিনের সহিত উইলিয়ম কঙ্কারের, পৃথ্বীরাজের সহিত হেরল্ডের; পরন্তু সময়শায়ী ও তদীয় তনয় কল্যাণের সহিত গাঁথ ও মোয়েন-উল্ল শেখোর স্তম্ভর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ গৃহ-বিবাদ, এবং

হেরল্ড ও টক্টিগের পরস্পর কলহে সাজ্জনেরা যেরূপ দুর্বল হইয়া পড়িয়া ছিল; পৃথু ও জরুচেশ্বের আত্মকলহে রাজপুত জাতির ও তজ্জপ দুর্দশা হয়। তৃতীয়তঃ পোপের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া উইলিয়ম যেরূপ ধর্মযুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, এবং হেরল্ড তাঁহাকে উচিত স্বয়ং হইতে বঞ্চিত করিতেছেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল; সাহাবুদ্দিন ও তজ্জপ মুসলমান ধর্ম প্রচার করিতে ও পূর্ব পুত্রব গজাননপতির অধিকৃতস্থান উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ উইলিয়মের শুল্কিত মর্দাণ সৈন্যের সহিত দেশহিতৈষী সাজ্জনেরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও যেরূপ কিছু করিতে পারিয়াছিলনা; সাহাবুদ্দিনের শিক্ষিত সৈন্যের অগ্রেও রাজপুত সৈন্যগণ সেইরূপ পরাস্ত হইয়াছিল। পঞ্চমতঃ সেন্দ্বাকের যুদ্ধেই যেমন সাজ্জনেরা সিংহাসনচ্যুত হন ও ইংলণ্ডে নর্যাণাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়; খানেশ্বরের যুদ্ধেও তজ্জপ স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের ধ্বংস ও স্বেচ্ছাধিকারের স্বত্র পাতি হয়।

আমাদের আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল। কিন্তু যবনিকাপতনের পূর্বের দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন হইতেছে। পৃথ্বীরাজের মৃত্যু হইলে তদীয় পত্নীভগ্ন জ্বলন্ত চিত্রায় আরোহণপূর্বক তাঁহার অন্তিমূর্তা হন। সাহাবুদ্দিনকে করপ্রদানে স্বীকৃত হওরাতে পৃথুর জর্জরিত পুত্র সিংহাসনে অধি-

ষ্টিত হন । কিরূপে জয়চন্দ্রের পাপের প্রারম্ভিত্য হইয়াছিল—তদীর পাপে ভারতের অপরাপর হিন্দু রাজত্বের কি দশা হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসেই বর্ণিত আছে,

এস্থলে তাহার পুনরুদ্ধার নিশ্চয়োজন। ইহাতেই কি ভারতবাসীর চক্ষু দান হইয়াছিল ? ইতিহাসই একথার উত্তর প্রদান করিবে ।



যবন

“ যবন ” শব্দের উৎপত্তি কি এবং কোন্ দেশবাসিরাই বা “যবন” নামে অভিহিত হইত, এপর্যন্ত ইহার স্থির মীমাংসা কেহই করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির বাস ; তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান হইতে অধিক। “হিন্দু” এই শব্দের মীমাংসা এক প্রকার হইয়াছে। সিদ্ধুর অপভ্রংশ ইণ্ডু হইতে হিন্দুশব্দের উৎপত্তি। হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে যবনশব্দে অভিহিত করেন। এবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মত। কেহ কেহ বলেন “যবন” শব্দের সহিত গ্রীক আওনিয়া (Ionia) শব্দের সৌসাদৃশ্য আছে; অতএব পূর্বে গ্রীকদিগকেই যবন কহিত। কিন্তু এই কথাই যে ঠিক তাহার প্রমাণ কি ?

এবিষয়ের সত্য অনুসন্ধান করা একান্ত দুঃস্বপ্ন কার্য। অনুমান আমাদিগের প্রধান সম্বল। কিন্তু অনুমানের উপর নির্ভর করা যুক্তিসিদ্ধ বোধহয় না। প্রথমে যবন শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে পারিলে,

যবনদিগের আদিমস্থান কোথায়ছিল সহজেই স্থির করা যাইবে, এবং তাহাদের আচার ব্যবহার জানিলে অনেক বিষয়ের সত্য আপনিই প্রকাশ হইবে।

(১) ধাতু—যু (মিশ্রিত করা) + অন—যবন।

“ যৌতি মিশ্রয়তি, মিশ্রীভবতি বা জাতিভেদাদানাদিতি যবনঃ ”। যাহাদিগের জাতিভেদ নাই তাহারাই যবন।

তবে কেবল মুসলমান কেন, অনেক জাতিকেই যবন বলা যাইতে পারে।

(২) (Synonymy) সমবাঁকা—স্নেচ্ছ=স্নিচ্ছ-অ। স্নিচ্ছ মিশ্রিত করা।

“ গোমাংসখাদকো যশ্চ বিকল্পং বহুভাষতে। ধর্মাচারবিহীনশ্চ স্নেচ্ছইতাভিধীয়তে ॥ ” বৌধায়ন সূত্র।

যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে, বহু ভাষায় কথাবার্তা কহে এবং যাহাদিগের কোন ধর্মানাই, তাহাদিগকে স্নেচ্ছ কহে।

ইংরেজাদি ইউরোপীয় মুসলমান জাতিদিগকেও তরে স্নেচ্ছবলা যাইতে পারে।

ইহাতে বোধ হইতেছে পূর্বে হিন্দুভিন্ন সমস্ত জাতিকে স্বেচ্ছ বা যবনশব্দে অভিহিত করিত। কিন্তু এক্ষণে সেই শব্দে কেবল মুসলমানদিগকেই বুঝায়।

(৩) যবনের আদিনিবাস—

(ক) মধ্য আর্ধ্যাবর্তের দক্ষিণপশ্চিম দিকে যবনদেশ। পরাশর।

(খ) যে রেখা লঙ্কাবীপকে বিভাগ করে তাহার ৬০° পশ্চিমে যবনদেশ। বরাহ মিহির।

(গ) ভারতবর্ষের পশ্চিমে যবনদেশ। বিষ্ণুপুরাণ।

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে কাবুল, টাটরী, পারস্য, ব্যাক্ত্রিয়া ইত্যাদি দেশ সকল পূর্বে যবনদেশ এবং তদ্রূপ অধিবাসিদিগকে যবন কহিত। দেখা যাইতেছে “যবন” শব্দ নূতন নহে। বহু পূর্বকাল হইতে ইহার ব্যবহার আছে। তবে কেবল মুসলমানদিগকে যে যবন বলিতনা, তাহা একপ্রকার স্থির নিশ্চয়, যেহেতু মুসলমান জাতির উদয়ের পূর্বহইতে একথা প্রচলিত দৃষ্ট হয়।

(৪) যবনদিগের আচার ব্যবহার—

(ক) “যবনান্ মুণ্ডিতশিরসোহর্ধ্ব-মুণ্ডান্ শকান্ প্রলম্বকেশান্ পারদান্ পল্ল-বাংশচ শ্মশ্রুপারিণঃ” । বিষ্ণুপুরাণ।

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ রচনার কাল নিকপণ করা অতীব দুঃস্বপ্ন কার্য। যদি এখানিকে বহুকালের রচিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে নিঃসন্দেহই মুসলমানদিগকে যবন

বুঝায় ; কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ পুরাণ গ্রন্থ নহে।

অভিজ্ঞান শকুন্তলার কালিদাস লিখিয়াছেন—

“এসো বাণাসগ হৃৎখ্যাহিং জবগীহিং বণপুষ্পমালাধারিণীহিং পরিবৃন্দো ইন্দো একর আঅস্তুদি পিনবঅশ্মো।”

দ্বিতীয় অঙ্ক পাঠান্তর।

মহারাজ হৃৎকেশের পরিচারিকাগণ যবনকন্যা ছিল। ইহাতে বুঝা যাইতেছে কালিদাস মুসলমানদিগকে যবন বলিয়াছেন। যেহেতু মুসলমানমহিলারা উত্তম নৃত্যকী, এবং প্রায় হৃৎপতিগণ তাহাদিগকে রাখিতেন।

রঘুবংশে লিখিত আছে, রঘু দিবিজয়ে নির্গত হইয়া পারস্যাদিপতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এখানকার স্ত্রীলোকদিগকে কালিদাস যবনী বলিয়াছেন,—

“পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতপ্তে স্থল-বস্বনা।

ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপুং শুভুজ্ঞানেন সংযমী ॥ যবনীমুখং স্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।

বালাতপমিবাজ্ঞানামকালজলদোদয়ঃ ॥”

পাগিনীপ্রণীত সিদ্ধান্ত কৌমুদী নামক ব্যাকরণে যবনবর্গ বুঝাইবার নিমিত্ত একটি সূত্র দেওয়া হইয়াছে। যথা—

ইন্দ্র বধন তব সর্ব কত্র যুড় হিমমারগ, যব যবন মনুলাচার্য্যায়ণ আনুক্, (যবনাং লি পত্যান্) যবনানাং লিপিবর্ষবনানী।। ১। ৪। ৪৬।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যবনগণ হিন্দু-
দিগের চিরপরিচিত ।

ভোক্তরাজসভাসদ কবি কালিদাস
প্রণীত (শকুন্তলারচয়িতা কালিদাস নহে)
মালবিকায়মিত্র গ্রন্থে উল্লেখ আছে,
যে মহারাজ পুষ্পমিত্র অশ্বমেধযজ্ঞ করি-
য়াছিলেন । তাঁহার অশ্ব সিদ্ধুনদী উ-
ত্তীর্ণ হইয়া অপরকূলে উপস্থিত হইলে
একদল যবন তাহাকে আক্রমণ করিয়া-
ছিল ।

যদিও ইহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত যে
গ্রীক আইওনিয়া শব্দ হইতে যবন শব্দের
উৎপত্তি, কিন্তু সংস্কৃতবিন্দু পণ্ডিতগণ এ-
কথা বিশ্বাস করেন না । পুরাণে ইহার
যেরূপ মীমাংসা আছে তাহাই তাঁহার
সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন ।

শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় নৈবম্বতমযুপুত্র পিসম্বু
তাঁহার ঠকর গাভী হরণ করেন এবং এই
নিমিত্ত তাঁহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত
করিয়া দেওয়া হয় । কিন্তু যদিও তাঁহার
সন্তানসন্ততিগণ বেদমিথি অনুসারে ধর্ম-
কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন, তথাপি তাহাদিগকে
যবন বলিত ।

একদা সগররাজ্য হৈ হৈ ভালজজব-
দিগকে সমরে পরাস্ত করেন এবং যোর
অবমাননার চিহ্নস্বরূপ তাহাদের মস্তক
মুণ্ডন করিয়া বাড়ী হইতে নির্বাসিত ক-
রিয়া দেন । যথা—

“ অর্ধমুণ্ডশিরসঃ কাংশ্চিৎ সর্ষমুণ্ডাম
নথাপরাম । ”

কাংশ্চিৎ শ্বশ্রমরান্ কাংশ্চিৎ মুক্তকচ্ছা-
নথাপরাম ॥ ”

এস্থলে প্রতিপন্ন হইতেছে প্রজাতি-
চ্যুত ব্যক্তিদিগকে যবন কহিত ।

মহাভারতে দেখিতে পাই যবনজাতি
বশিষ্ঠধেমু নন্দিনীর কন্যা হইতে উৎপন্ন
হইয়াছে ।

কিন্তু বদ্যাপি আইওনিয়া দেবী, মহা-
ভারত এবং অন্যান্য সংস্কৃতগ্রন্থ বাহাতে
যবন শব্দের উল্লেখ আছে তাহাদের কাল
নিকপণ করা যায়, তাহা হইলে এবিষয়ের
মীমাংসা সহজ হইয়া পড়ে । কিন্তু একার্থ
একপ্রকার অসাধ্যসাধন ।

(৬) “ যবনানাং শিরঃ সর্ষং কাশ্চ-
জানাং তথৈবচ । ”

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ।

যবনজাতি তাহাদের সমস্ত মস্তক
মুণ্ডন করে ।

(৭) যবনঃ পরানো ভুংক্তে । পাণিনী ।
যবনজাতি পরনাবস্ত্রায় ভোজন করে ।

যবনশব্দ ।—

যবন-দ্বিষ্ট—ধূমা

যবনপ্রিয়—কালমরিচ

যবনালজ—সোরা

যবনিকা—তাঁবু

যবনেষ্ঠ—রসুন

যবনেষ্ঠা—খৈজুর

যবনাশ্ব—যবনদেশীর ঘোড়া ।

উপরি উক্ত বিষয় গুলি স্মরণচিহ্নে
বিবেচনা করিয়া দেখিলে সপ্রমাণ হইবে

ব্যক্তির সমীপবর্তী কোন দেশ যবন-দিগের আদি নিবাস। আমাদের শাস্ত্রে বর্ণিত আছে এই জাতি পূর্বে ক্ষত্রিয় ছিল; কিন্তু কালক্রমে স্বধর্ম হইতে পতিত হইলে ইহাদিগকে যবন নাম দেওয়া হয়। একথা প্রমাণ করা নিতান্ত কঠিন কার্য্য নহে যেহেতু আজ পর্য্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে; যদি কোন ব্যক্তি হিন্দু-শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য না করে তাহাকে সমাজ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। কেহ তাহার বাটীতে আহার করে না এক ছ'কাণ ধূমপান করে না সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। তবে এক্ষণে আর তাদৃশ হিন্দুধর্মের মান সম্ভব নাই। ইংরেজী শিক্ষা হিন্দুধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। যদি এই ব্যক্তি কোন সুরোগে পুনর্ব্বার স্বপদ উদ্ধার করিতে পারিলেন ভাল, নতুবা ইহার সম্ভান সম্ভতিগণ কালক্রমে নিজ ব্যবসায় অবলম্বন করিলে তাহারাই যবন হইবে।

মহাভারতে যবন শব্দের উল্লেখ আছে। এই প্রমুখ ত্রীকজাতির অজুশ্বানের বহু-পূর্বে রচিত। বিশেষতঃ পুরাণে প্রমাণ পাওয়া যায় যে যবনগণ তুর্কস্বর সম্ভান সম্ভতি। পূর্ককালে সিকুন্দীর পশ্চিম পার্শ্বিত দেশসমূহ হিন্দুদিগের অধিকার ও আবাসস্থান ছিল। তাঁহাদের মধ্যে এক দল ভারতবর্ষ জয় ও অধিকার পূর্কক ভাখায় আপনাদিগের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। তাঁহারা এই দেশের সৌন্দর্য্য রমণীয়তা

ও উর্ব্বরতা সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আর স্বদেশ প্রত্যাগমন করেন না। ক্রমে ক্রমে সমস্ত আদিম নিবাসিদিগকে পরাস্ত ও দূরীকৃত করিয়া সমগ্র আর্ধ্যাবর্ত্তে আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তারিত করিলেন। তাঁহাদিগের যে অংশ স্বদেশে রহিয়া গেল তাঁহাকেই ইহার যবন নামে অভিহিত করিলেন।

এখানে ইহাদিগের প্রভুত্ব বিস্তারের সহিত জানেরও বিস্তার হইতে লাগিল। স্বর্গীয় সংস্কৃত ভাষা বাহাদিগের মাতৃ-ভাষা হইয়া তাঁহারা যে স্বল্প কালমধ্যে জ্ঞানবিখ্যাত হইবেন তাহা বিচির কি? ক্রমে ক্রমে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ের আলোচনায় সকলে মনোনিবেশ এবং তৎ-বিষয়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিলেন। ওদিকে তাঁহাদের ভ্রাতৃগণের দিন দিন অধঃপতন হইতে লাগিল; তাহারাই আপনাদিগের তেজ ও বীর্ষ্য বিন্মৃত হইয়া নীচ ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন, স্বধর্ম্মে অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং গোমাংস ইত্যাদি অখাদ্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন; ইহাতে ভারতবর্ষবাসী হিন্দুগণ যে তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। সুতরাং তাঁহারা এককালে তাঁহাদের সহিত আদান প্রদান বন্ধ করিয়া দিলেন। এবং তাহাদের নাম ম্লেচ্ছ ও যবন রাখিলেন।

পূর্ক যবনশব্দ দ্বারা যে কেবল মুস-

লম্বান জাতিকে বুঝাইত না চক্ষু কণ্ঠ বি-
শিষ্ট মনুষ্য মাত্রই ইহা বুঝিতে পারিবেন ।
ইংরেজ ফরাস ওলন্দাজ ইত্যাদি সমস্ত জা-
তিকেই যখন বলা যাইত। ইহাতে কি বু-
ঝায় ? যে সকল জাতি হিন্দু ধর্ম্মাভিমানী
কার্য্য করিত না তাহাদিগকেই যখন বলিত।

হিন্দুগণ অতি বিশুদ্ধাচারী এবং সত্য
ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন । এবং আপনাদিগের
অন্ততঃ ক্ষমতাবলে কি রাজনীতি, কি সা-
মাজিক নীতি, কি বীরত্ব, কি যুদ্ধকৌশল,
কি শিল্প বিদ্যা, সর্বাবিদ্যায় ভূমণ্ডলে অ-
দ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন । বাসু, মিহির, বা-
ল্মিকী, বরাহ, কালিদাস, বশিষ্ঠ, পরাশর,
নারদ, মনু, জীকৃষ্ণ ইত্যাদি অসামান্য ধী-
শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সেই কূলে জন্ম-
গ্রহণ করিলেন, সুতরাং জাত্যতিমান ও
জাত্যতিমান তাঁহাদের স্বরূপকে একে আ-

চ্ছন্ন করিয়া ফেলিল । স্বজাতির ও স্বধ-
র্ম্মের প্রতি তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তি, ভাল
বাসা ও সহানুভূতি জন্মিল ; এবং তাঁহা-
দের অন্তঃকরণে যের অহঙ্কারের উদয়
হইল ; এমন কি তাঁহারা পৃথিবীর অন্যান্য
জাতিকে মনুষ্য বলিয়া গণনা করিতেও
অস্বীকার করিতেন । স্বধর্ম্মের প্রতি তাঁ-
হাদের এত ভক্তি জন্মিয়াছিল যে তাঁহারা
ভাবিতেন—ভাবিতেন যথার্থই, তাহা-
দের ভ্রম ছিল না—সেই ধর্ম্মই সকল
ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ । তাহারা সেই ধর্ম্ম মানিত
না তাহাদিগকে অসভ্য, স্বেচ্ছ ও যখন ব-
লিতেন । সুতরাং যখন নামে কোন একটি
জাতি ছিল না । আর্ধ্যগণ হিন্দু ভিন্ন স-
মস্ত জাতিকেই যখন বলিতেন ।

জীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় ।

ভালমানুষ।

—

কেহ বলিতে পার, কি করিলে “ভাল মানুষ” হওয়া যায়? চলিত কথার বাহ্যকে ‘ভালমানুষ’ বলে, অর্থাৎ সদস্য বিবেকশূন্য, মৃৎপিণ্ডসদৃশ নিস্তেজ-হৃদয়, ‘গো বেচারী’ ভালমানুষের কথা বলিতেছি না। পূর্বজন্মের বিশেষ পুণ্য না থাকিলে এরূপ ভালমানুষ হওয়া যায় না। যিনি সমস্ত বুঝিয়া, সমস্ত জানিয়া শুনিয়া ‘ভালমানুষ,’—যিনি রঘুবংশের “জ্ঞানে মৌনং, ক্রমা শক্তৌ, তাগে স্নান-বিপর্যায়ঃ” ইত্যাদি গুণে বিভূষিত হইয়া ‘ভালমানুষ,’ তাঁহার কথা বলিতেছি। যিনি বাক্যে সত্যবাদী, মনে অহমিকান্দীনা, কার্যে ফলপ্রিয়ানী,—যিনি পৃথিবীতে অজ্ঞাত, সমাজে অনাদৃত, পরিবার মধ্যে অবহেলিত হইয়াও সদানন্দ;—যিনি বিপদে প্রসন্ন এবং সম্পদে ধীর, তাঁহার কথা বলিতেছি।—যিনি কর্তব্যানুষ্ঠানে হিতাহিত বিবেচনা করেন না, যিনি সময়ের গতি অনুসারে স্বীয় কার্যের গতি নিয়মিত করেন না,—যিনি আশাবাক্যে বন্ধুকে উৎসাহিত করিয়া কার্যকালে পলায়ন করেন না, সেই সূচদয় মহাত্মার কথা বলিতেছি।

কি করিলে ভালমানুষ হওয়া যায়?

নীতিশাস্ত্র পাঠ করিলে? কত কত নীতি পড়িলাম, কত নীতিশাস্ত্রবেত্তা দেখিলাম, কিন্তু কখনও দেখিলাম না যে, জ্ঞানের উন্নতির সহিত নীতির উন্নতি হইল। “সত্যকথা বলিও, মিথ্যা বলিও না” ইহাত কত কত প্রকার পড়িলাম, মিথ্যাকথার কত কতবার ভুলিলাম, কতবার দেখিলাম; কিন্তু কখন সত্যবাদী হইতে পারি-য়াছি কি? কার্যকালে দেখিয়াছি যে, সর্বদা হিতোপদেশকারের কথাই সত্য হয়।

“ন ধর্মশাস্ত্রে পঠতীতি কারণং

ন চাপি বেদাদ্যয়নং দুরাত্মনঃ।

স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচাতে

যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পরঃ ॥”

আরিস্ততলের সময় হইতে ইয়ুরোপে নীতিশাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে; কিন্তু ইউরোপের নীতি কিছুমাত্র বিশুদ্ধ হইয়াছে কি? সেই মিথ্যাকথা, সেই প্রভারণা, সেই স্বার্থপরতা, সেই নীচাশয়তা, এখনও আছে। তবে একমাত্র প্রভেদ এই যে, পূর্বকার অধিবাসীরা মনোরক্তি গোপনের এত কৌশল জানিত না। সত্যতার সঙ্গে তণামিরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। সত্যতাং নীতির অবনতিই ঘটিয়াছে।

তবে কিসে ভালমানুষ হওয়া যায় ?
 ধর্মালোচনা দ্বারা ? কত হিন্দু দেখিলাম,
 কত প্রাতঃস্মারী, নিরামিষাশী, চন্দনচর্চিত,
 কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলাম ; কত মেও-
 রাজওয়ালার সুদীর্ঘ দাঁড়িবিশিষ্ট মুসলমান
 দেখিলাম ; রবিবারের সন্ধ্যাকালে কত
 অশ্রুবারিপরিলুত ব্রাহ্মভাতা দেখিলাম ;
 কত “ ফুক কোটেড ” মিসনরী ‘পারসন’
 দেখিলাম ; কখনও ধর্মের সঙ্গে নীতি মিশ্রিত
 দেখিলাম কি ? খ্রীষ্টানেরা বলেন,
 এবং ব্রাহ্মেরাও দেখাদেখি বলিতে শি-
 খিরাছেন, যে মনুষ্য জগদীশ্বরের ‘গ্র্যাচ’
 (Grace) ‘ দয়াময়ের দয়া ’ না পাইলে
 ধার্মিক অথবা নিশ্চরিত্র হইতে পারে
 না। এই জগদীশ্বরের ককণা পাইবার প্র-
 ধান উপায় ‘ উপাসনা ’। এ ‘ উপাসনা ’
 ও ত অনেককাল করিলাম। উপাসনা-
 গৃহে বসিয়া জগদীশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া
 কতবার আন্তরিক প্রতিজ্ঞা করিলাম, ক-
 খনও প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিলাম
 কি ? পৃথিবীর দাক্ষণ প্রেলোভনের সা-
 ক্ষাতে, সমস্ত প্রতিজ্ঞা, সমস্ত জগদীশ্বর,
 সমস্ত উপাসনা, কোথায় উড়িয়া গেল।
 ইংরাজীতে এক প্রবচন আছে যে, “ যদি
 জগদীশ্বরের সাহায্য চাও, তবে অগ্রে
 আপনি আপনার সহায় হও ”। এ প্র-
 বচন সাংসারিক উন্নতিসম্বন্ধে যেরূপ সত্য,
 নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধেও সেইরূপ। শুদ্ধ
 উপাসনার সংসারে অন্ন মিলিবে না ;
 শুদ্ধ উপাসনার চরিত্রের উন্নতিও হইবে ।

না। “ উপাসনা ” অর্থাৎ সম্ভোষকর
 বাক্যে মনুষ্য ভুলিতে পারে। আপনি
 বড় ধনী, আপনি বড় বিদ্বান আপনি বড়
 সুন্দর, এ সকল কথায় মনুষ্য ভুলিতে
 পারে। কিন্তু জগদীশ্বর কথায় ভুলিবার
 পারি নহেন। তাঁহাকে কার্যে ভুলাইতে
 হইবে। চক্ষু মুদিয়া তুমি বড় সুন্দর, তুমি
 বড় জ্ঞানী, তুমি বড় মহৎ বলিলে চ-
 লিবেনা। *

তবে কি করিলে ভালমানুষ হইবে ?
 এক উপায় আছে। যুক্ত করিলে। প্র-
 ত্যেক মুহুর্তে, প্রত্যেক কার্যে স্বার্থভাগ
 করিতে হইবে। স্বার্থভাগ চারিত্র-উন্ন-
 তির মূলমন্ত্র। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে
 স্পষ্ট বোধ হইবে যে, সকল প্রকার দো-
 ষের মূলেই এই স্বার্থানুরাগ আছে। লো-
 কের মনে স্বকীয় ক্ষমতার আধিকা স্পৃষ্ঠী-
 ভূত করিবার জন্য মিথ্যাকথার সৃষ্টি
 লোকের নিকট ধার্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন
 হইবার জন্য মিথ্যা কার্যের সৃষ্টি। যত
 কিছু দুর্কর্ম করি, সকলই আত্মাকে সন্তুষ্ট
 করিবার জন্য। জনসন্ বলেন যে, কেহ
 কেহ বিনা অভিপ্রায়ে, বিনা স্বার্থপ্রত্যা-
 শায় দুর্কর্ম করে। কিন্তু আত্মাদিগের দৃঢ়

* এস্থলে এরূপ বলা হইতেছে না যে
 উপাসনার কোন কার্যকারিতা নাই। উ-
 পাসনার অন্য অসেক প্রয়োজন থাকিতে
 পারে। কিন্তু শুদ্ধ উপাসনার চরিত্র উ-
 ন্নত হয় না এই কথা বলা লেখকের অ-
 ভিপ্রায় ।

বিখ্যাস যে, তাহা তোমার আমার নিকট বিনা অভ্যর্থনায়, বিনা স্বার্থপ্রত্যাশায়, দুঃস্বপ্নকারীর নিকট তাহা স্বার্থানুসন্ধান ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এই স্বার্থপরতার যে কত প্রকার মূর্তি আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের প্রধান দেবতা বিহুর দশ অবতার : কিন্তু স্বার্থানুরাগের লক্ষ্যকোটি অবতার। পরের উপকারে কিংবা পরের অপকারে এই একই দেবতার পূজা হয়। কেহ কর্তৃপক্ষের পদানুসরণ করিয়া, কেহবা তাহার অবাধ্যতাচরণ করিয়া এই এক দেবতারই পূজা করেন। ধর্মের প্রবন্ধ ও নাস্তিকতার প্রবন্ধ এই একই দেবতার চরণে উৎসর্গীকৃত হয়। ইনি কখন বা সত্যের বেশ ধরিয়া, কখন বা মিথ্যা কথার বেশ ধারণ করিয়া, কখন বা ভীকতার বেশে, কখন বা নির্ভীকতার বেশে, ইহার সেবকদিগের নিকট উপস্থিত হইয়েন।*

ইউরোপের আধুনিক দার্শনিকেরা নীতির ভিত্তি স্বার্থানুসন্ধানের উপর স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, বুঝিয়া দেখিলে পরহিতৈষিতা ও স্বার্থচিন্তা একই প্রকার কার্যপ্রণালীর উপযোগী বলিয়া বোধ হইবে। তাঁহাদের মতে স্বার্থে ও পরার্থে অবশ্যস্বাভাবী বিস-

* এতৎ সঙ্ক্ষে আরও অনেক কথা বলা হইতে পারে। অন্যত্র বলিবার ইচ্ছা রহিল।

স্বাদিতারাধা অল্প বুদ্ধির কার্য। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে পরের হিত করিলে প্রকারান্তরে আপনাই হিত করা হয়। মিলের (Utilitarianism) এই মূল ভিত্তির উপর সংস্থাপিত।

এইমত সঙ্ক্ষে দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, যে বুদ্ধি বা যে জ্ঞান থাকিলে পরার্থের মধ্যে ও স্বার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, সে বুদ্ধি বা সে জ্ঞান অধিকাংশেরই দুঃপ্রাপনীয়। মিলের মত দুই চারি জন অমানুষপ্রতিভাশালী ব্যক্তি ভিন্ন পরার্থে ও স্বার্থে একত্ব প্রতিপাদন অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য। এই মত সঙ্ক্ষে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে পরার্থ ও স্বার্থের ভবিষ্যৎ একত্ব বুঝিলেও স্বার্থ ত্যাগ করা বড় সহজ নহে। বুঝিতে পারি যে গ্রামস্থ বিদ্যালয়ের সাহায্য করিলে ভবিষ্যতে আমাদেরই হিত হওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু এই কথাটি বুঝিয়া কল্পনে স্ত্রীর অলঙ্কার হইতে টাকা বাঁচাইয়া বিদ্যালয়ের সাহায্য করিয়াছেন? সংস্কৃতে এক প্রবচন আছে। “কাচঃ কাচঃ মণির্মণিঃ” সহস্র মুক্তি প্রয়োগ করিলেও কাচ কাচই থাকিবে এবং মণি মণিই থাকিবে। সেইরূপ যতই কেন মুক্তি প্রয়োগ ককন না, মনুষ্যের মধ্যে আস্ত্র পর বলিয়া যে একটা প্রভেদ, তাহা থাকিবেই থাকিবে। যত দিন মনুষ্যের মনে ধর্ম বিখ্যাস প্রবল ছিল, ততদিন পরার্থের মধ্যে স্বার্থানুসন্ধান অনায়াসেই করা যা-

ইতে পারিত। তখন পর কালের দো-
হাই দিয়া স্বার্থে ও পরার্থে একত্ব প্রতি-
পাদন করা যাইতে পারিত। কিন্তু এখন
আমাদের মধ্যে এরূপ কোন পর কালের
উপর বিশ্বাস নাই। সুতরাং এক্ষণে প-
রার্থের মধ্যে ও স্বার্থবলোকম করা বড়
কঠিন ব্যাপার। তবে স্বাহারা “বন্দুধেব
কুচুবকম্” বলিয়া মনে করিতে পারেন,
ঔহাদের কথা স্মরণ। ঔহাদের নীতি-
শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে; ঔহাদিগের জন্ম
এ প্রস্তাব লিখিত হইতেছে না। অন্য
দেশে বাহাই হউক, আমাদের দেশে
স্বার্থ ও পরার্থ এক বলিয়া বুঝা অত্যন্ত
কঠিন। শুদ্ধ কঠিন কেন, একরূপ অস-
ম্ভব। যে জাতির মধ্যে ঐক্যজাত্য নাই,
স্বাহাদের চরিত্র গঠনে কাপুরুষতাই প্রবল,
ক্রীর জন্ম অলঙ্কার নির্মাণই স্বাহাদের
পৌকষের পরাকাষ্ঠা, ঔহারা যে কখন
পরার্থে ও স্বার্থে একত্ব দেখিবেন, ইহা
আশা করা ও বাতুলের কার্য। আত্ম
পরের প্রভেদ যত আমাদের মধ্যে, এত
আর অন্য কোন জাতিতে আছে কি না
সন্দেহ।

তবে স্থির হইল, স্বার্থ ত্যাগেই নী-
তির উন্নতি সম্ভব। কিন্তু স্বার্থ ত্যাগ
শিখিবার উপায় কি? নীতিশাস্ত্র পাঠ
করিয়া বা ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া স্বার্থ
ত্যাগ শিখিতে পারিব না। সংসারের
প্রলোভন জয় করিব কিরূপ? এক উ-
পায় আছে; সংসার হইতে বিজিন্ন ধা-

কিয়া। প্রলোভন জয় করিতে পারি-
লাম না, সুতরাং প্রলোভন হইতে আত্ম-
রক্ষার একমাত্র উপায় প্রলোভন হইতে
পলায়ন। সংসার হইতে দূরে, বিজ্ঞান
অরণ্যে কৃষ্টির নির্মাণ করিয়া প্রযুক্তি দমন
কর। যদি প্রযুক্তি দমন করিয়াছ বলিয়া
বুঝিতে পার, তবে পুনরায় সংসারে আ-
সিয়া মিশিও। নতুবা বিজ্ঞান অরণ্যমধ্যে
এই অনন্ত জগতের অনন্তলীলা ধ্যান ক-
রিতে করিতে জীবন কাটাইও।

যদি কেহ কখন এ প্রবন্ধ পাঠ করেন,
তবে তিনি বলিবেন “হাঁ এ নীতি বাঙ্গা-
লির ছেলের বটে। ‘পলায়ন কর’ এ মহা-
মন্ত্র বাঙ্গালির একচেটিয়া।” কিন্তু আ-
মরা জিজ্ঞাসা করি যদি জয় করিতে না
পারি, পলায়ন করিব না কেন? জয়ের
উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা, আমার পলায়নের উ-
দ্দেশ্যও তাহাই। তবে যে জয়কে পলা-
য়ন অপেক্ষা ভাল বলি, তাহার কারণ স্ম-
রণ। শত্রুকে জয় করিলে ভবিষ্যতে
তাহা হইতে বিপদের সম্ভাবনা অল্প।
কিন্তু শত্রুর নিকট হইতে পলায়ন করিলে
শত্রুকর্তৃক পুনরুপাড়ন অধিকতর সম্ভব।
কিন্তু যেখানে পলায়নই প্রাণরক্ষার এক
মাত্র উপায়, সেখানে পলায়নই শ্রেয়ঃ।
পলায়ন করিতে জানিত না বলিয়া রজপু-
তের ধ্বংস হইয়াছে; পলায়ন করিতে
জানেন বলিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য জাতি
ভূমণ্ডলে আধিপত্য করিতেছে। যদি তো-
মরা কেহ এমন থাক যে, শত্রুর সহিত

বুদ্ধ করিতে পার, বুদ্ধ কর; আমার তা-
হাতে আপত্তি নাই। কিন্তু যদি কেহ আ-
মার মত দুর্বল, আমার মত ভীক ভয়,
তবে সে পলয়ন করিয়া আত্মরক্ষা ককক,
তাছাড়া আপত্তি করিও না। সকলে ভো-
মাদের মত বীরপুরুষ হইয়া জগৎ গ্রহণ
করে নাই।

কেহ হয়ত আপত্তি করিবেন যে, যদি
সকলেই এইরূপ করিতে যায়, তবে সংসার
চলিবে কিরূপে? দুর্গেশনন্দিনীর তিলো-
ত্তমার মত আমি বলি, “চলিয়া কাজ
কি? এতকাল যে চলিল এই দুঃখ।” সং-
সার চলিবে কি না তাহা আমি কি জানি?
আমি আপনাকেই বাচাইতে পারি না। সং-
সার ষাঁহার সৃষ্টি, সংসার পালন ষাঁহার
কর্তব্য কর্তৃ, তিনি সংসারের কথা ভাবি-
বেন। তুমি আমি সংসারের পরমাণু
মাত্র। আপনার কর্তব্য সাধন করিতে
পারি না, আবার সংসার। আর এক কথা;
সংসারের অসারতা বুঝিলেই সংসার
ছাড়া যায় না। সংসারে যে রাশি রাশি
প্রলোভন রহিয়াছে, তাহারাই সংসার
চালাইবে। যে শিল্পকুশল নির্মাতা এ
সংসার সৃষ্টি করিয়াছিল, সে ইহার রক্ষার
জন্য অগ্রেই সমস্ত উপাদান প্রস্তুত রাখি-
য়াছিল। সংসার রক্ষার জন্য ভোমার
আমার মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিবার প্রলো-
ভন নাই।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সমাজ হইতে
বিস্কিন্ন থাকাই ভালমানুষ হইবার এক

প্রধান উপায়। এ সম্বন্ধে আরও একটি
গভীর তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে। যদি
প্রলোভন জয় করা ভালমানুষের অর্থ হয়,
তাহা হইলে সমাজশূন্য স্থানে থাকিয়া ভা-
লমানুষ হওয়া যাইতে পারে না। কারণ
যেখানে প্রলোভন নাই, সেখানে প্রলো-
ভনজয় কি প্রকারে সম্ভবিত্তে পারে? ^৬
আর এক কথা, কেহ স্থলে থাকিয়া সম্ভ-
রণ শিক্ষা করিতে পারে না। শিশু চির
কাল মাতৃকোড়ে শয়ান রহিয়া সঞ্চার
শিখিতে পারে না। তবে প্রলোভন হ-
ইতে দূরে থাকিয়া কি প্রকারে প্রলোভন
জয় শিক্ষা করা যাইতে পারে? যদি কেহ
কখন জিতেঞ্জিয় হইতে পারেন, তবে
তাহা কেবল সমাজে থাকিয়াই সম্ভব হ-
ইতে পারে। বালক, সঞ্চারক্রিয়া শিক্ষা
করিবার পূর্বে অনেকবার ভূপতিত হইবে,
অনেকবার দাক্ষণ ব্যথা প্রাপ্ত হইবে, অ-
নেকদিন খাড়ীর কর-ধারণ করিয়া চলিবে।
সম্ভরণশিক্ষার্থী অনেকবার জলে নিমজ্জিত
হইবে, অনেকবার হাবুডুবু খাইবে, অনেক
বার অন্যের পুষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া
সাহসের সহিত গভীর জলে যাইবে। সে-
ইরূপে যিনি বিশুদ্ধচিত্ত হইতে চাহেন,
তঁাহাকেও অনেকবার অনেক প্রকার লো-
ভন সহিত বিশিতে হইবে, অনেকবার
তঁাহারও পদ-স্বলন হইবে, অনেকবার
তঁাহাকেও দাক্ষণ মনস্তাপ পাইতে হইবে,
অনেকবার তঁাহাকেও “সাধুসঙ্গ নামে
আছে পান্থদাম” ইহা বুঝিতে ও তথায়

আশ্রয় লইতে হইবে । সর্বত্র শিক্ষার নি-
রমই এই ।

এ তর্কটি বড় আত্মসমায়ক, বড় সা-
স্তুনা-প্রদ । প্রতিদিন যে এই অসংখ্য দু-
হুর্কণ ও দুশ্চিন্তা করিতেছি, এ সমস্তই কি
তবে কেবল চারিত্র-উন্নতির সোপানমাত্র?
এখানেও কি জগদীশ্বর মন্দরূপ হইতে সু-
ন্দররূপে নিষ্কাশন করিতেছেন? যেমন
তিক্ত ঔষধ সেবন না করিলে কঠিন রো-
গের উপশম হয় না, সেইরূপ কি দুহুর্কণ না
করিলে চারিত্র-উন্নতি হইতে পারে?
চারিত্র-সুবর্ণ বিশুদ্ধ করিতে হইলে তাহ ক
কি দুহুর্কণ-অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে?

কথাগুলি বড় মিষ্ট । শুনিলে ন-
রাশ্য অন্তর্হিত হয়; হৃদয়ের কঠোরতা ত্র-
বীভূত হয়; মলিন চিত্ত প্রফুল্ল হয় । কিন্তু
দুর্ভাগ্যক্রমে কথাগুলি অন্যত্র সত্য হইলেও
চারিত্র-উন্নতি সম্বন্ধে সত্য হইতে পারে

প্রথমে দেখাযাউক, আমরা হুতন বি-
ষয় শিক্ষা করি কেন? যতদিন আমরা আ-
মাদিগের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকি, ততদিন
কোন বিষয় শিক্ষা করিবার ইচ্ছা আমা-
দের হৃদয়ে স্থান পায় না । চীনের
বাসীরা হুতন বিষয় শিক্ষা করে না; কারণ,
তাহারা জানে যে তাহাদের শি-
বাবশ্যকতা নাই । যেহেতু তাহারা পাঠ
হাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট আছে । বালকের
সঞ্চারণ শিক্ষা করে, কারণ তাহাদের শা-
রীরিক রক্ত তাহাদিগকে তাহাদের অব-
স্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে দেয় না । এই অর্থাৎ

বলিষ্ঠ বালক অধিক পরিমাণে ও দুর্বল
বালক অল্প পরিমাণে সঞ্চারণ-ক্রিয়া স-
ম্পাদন করে । নৈসর্গিক প্রকৃতি বলে
বলিষ্ঠ বালক আপন অবস্থায় সহজে স-
ন্তুষ্ট হইতে পারে না । আবার নৈস-
র্গিক কারণ বলতঃই দুর্বল বালক সহজে
আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট হয় । এইরূপে
স্বাভাবিক বোধ হইবে যে, অভাব ও অস-
ন্তোষই শিক্ষার প্রধান নিয়ামক । বড়
মানুষের সন্তানেরা লেখা পড়া শিখিতে
পারে না । কারণ তাহাদের মনে অভাব
ও অসন্তোষ বিদ্যমান নাই ।

পাপ ছাড়িয়া পুণ্য করিতে হইলেও
এইরূপ অভাবও অসন্তোষের আবশ্যক
হইবে । কিন্তু পাপের সঙ্গে অভাবের
কোন সম্পর্ক নাই । যেখানে যে সুখ
আছে, পাপী তাহা অমানবদনে অধিকার
করে; যতক্ষণ তাহাদের শক্তি থাকে,
ততক্ষণ সেই সুখভোগ করে, এবং সুখের
প্রীতিকারিণী শক্তির হ্রাস হইলেই অন্যত্র
সুখের আশায় ধাবমান হয় । এইরূপ
সুখ হইতে সুখান্তরের অন্বেষণে তাহার
জীবন অতিবাহিত হয়; সুতরাং সে কখন
অভাবের মুখ দেখিতে পায় না । সুতরাং
কখন তাহার অসন্তোষও হয় না । সত্য
বটে, সে অনেক সময়ে সুখলাভে বঞ্চিত
হয়, সত্য বটে সে অনেক সময়ে সুখের
পরিবর্তে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, সত্য বটে অনেক
সময়ে দুঃখই তাহার সুখের পরিণাম হয়;
কিন্তু এ সুখবীভূতে সর্বদা সুখী কে? এই

যে ধার্মিক পুরুষ ধীরপদে মন্দ মন্দ গমনে সংসারের বিচরণ করিতেছেন, ঐ যে উনি সর্বত্রই বিচার করিয়া করিয়া কার্য করিতেছেন, উনিই কি সর্বদা সুখী? উহারও কি সুখের পরিবর্তে দুঃখলাভ হয় না? যদি সাংসারিক সুখের কথা বল, সে বিষয়ে পাপী ও পুণ্যবান উভয়েই সমান। পুণ্যবাণের ও দুঃখ সুখ দুইই হয়; পাপীরও দুঃখ সুখ দুইই হয়। জরী সিঙ্গার ও পরাজিত কেটো, জরী ওয়াশিংটন ও পরাজিত নেপোলিয়ন, দক্ষীকৃত ল্যাটিমার ও সিংহাসনাভিষিক ক্রমওয়েল, এবিষয়ের সাক্ষ্যস্থল।

আর একটি আপত্তি হইতে পারে যে, সাংসারিক সম্পদ সম্বন্ধে পাপীর অভাব না থাকিতে পারে, কিন্তু পাপীর মানসিক শাস্তিসম্বন্ধে নিশ্চয়ই অনেক অভাব আছে। আন্তরিক নিকষণ, পাপীর অভাব; এই অভাবের জন্ত সে অন্তঃসুখের আশায় ধাবিত হয়। যখন সমস্ত সুখের অধিকারী হইয়াও পাপী মনের উবেগ দূর করিতে পারে না, তখনই তাহার মনে পুণ্যশিক্ষার চিন্তা বলবতী হয়। একথাটির মধ্যে অল্প পরিমাণে সত্য আছে। কিন্তু পাপীর মনে অশান্তিও অধিক লক্ষিত হয় না। আমাদের মনে ধর্ম জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু তাহা কাহাকেও দাক্ষণ যন্ত্রণায় ফেলে না। যদি আমাদের ধর্মজ্ঞান (Conscience) প্রবল হইত; তাহা হইলে সকলেই, অন্ততঃ জনে-

কেই, পুণ্যপথে চলিত। যে দেশে শান্তির নিয়ম বলবৎ, সেদেশে পাপের সংখ্যা অল্প। দণ্ডবিধি প্রবর্তিত হওয়া অবধি আমাদের দেশে চুরি ডাকাতি অনেক কমিয়াছে। সেইরূপ যদি অন্তরের দণ্ডবিধির কোন ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে পাপের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতে পারিত না। গোল্ডস্মিথ বলেন, "Conscience is a coward" আমাদের ধর্মজ্ঞানের কোন সাহস নাই। পাপের পূর্বে ইহার নিবর্তনা এত অক্ষুট বলিয়া বোধ হয় যে, লোকে ইহাকে অক্লেশে ত্যাগিয়া ফেলিতে পারে। আবার পাপের পরেও ইহার তিরস্কার কোনরূপ যন্ত্রণাদায়ক হয় না। সুতরাং মানসিক শান্তি সম্বন্ধে যে অভাব তাহাও পাপীর বড় অধিক নয়।

অতএব দেখা যাউতেছে যে শিক্ষার প্রধান নিয়ামক যে অভাব, তাহা পাপীর নাই। এই জন্যই পাপের ও হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি এরূপ কোন প্রধান অভাব থাকিত, তাহা হইলে এতদিনে পৃথিবীতে সত্যযুগের আবির্ভাব হইত।

আর এক কথা, শিক্ষার অন্য এক নিয়ামক দৃষ্টান্ত। যদি দেখিতাম যে অনেকে পাপ ছাড়িয়া পুণ্য করিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যের অবশ্যস্বাবী ফল ভোগ করিতেছে; তাহা হইলে পুণ্য শিক্ষা করিতে অস্বীকার হইত। কিন্তু সত্যক্ষে এরূপ পুণ্যের দৃষ্টান্ত করাট দে-

ধিতে পাওয়া যায় ? যিনি বাহ্য দৃশ্যে তারি পুণ্যাত্মা, তাঁহাকেও বিশেষ করিয়া দেখিলে ভণ্ড সন্ন্যাসী বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত হয় ।

এই সকল কারণে পুণ্যকে শিক্ষার বস্তু বলিয়া গণনা করা উচিত হয় না । এতলে শিক্ষার প্রথম নিয়ামক যে অভাব ও দুর্ভাগ্য সে দুইটিই নাই । সুতরাং যদি কেহ মনে করেন যে পাপ করিতে ক্রমে-ক্রমে পুণ্য শিক্ষা করিব, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছা কখনই সফল হইবে না । একটি গল্প আছে যে, একজন মাতাল তাহার পিতাকে বলিয়া ছিল, “ বাবা তুমিও একদিন মদ খাইয়া দেখ, পরে আমাকে তিরস্কার করিও ” পিতা তদনুসারে একদিন মদ খাইয়া নিজেই মাতাল হইয়া উঠিলেন । সেইরূপ যিনি পাপ করিতে করিতে পুণ্য শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি অবশেষে নিজেই যেরূপ পাপী হইয়া উঠিবেন । অতএব প্রলোভন হইতে দূরে থাকাই পুণ্য শিক্ষার প্রথম উপায় ।

সংসারে থাকিয়া ভাল মানুষ হইয়া যে এক প্রকার অসম্ভব তাহা অনেক দার্শনিক স্বীকার করেন । বহুকাল হইতে এই পুণ্য শিক্ষা সম্বন্ধে দুইটি মত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । একটির নাম স্বাতন্ত্র্যবাদ (Freewill) অপরটির নাম নিযুক্তিবাদ (Predestination) । স্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে মানুষের নিজ ইচ্ছাই স-

কল কর্ণের নিয়ামক । নিযুক্তিবাদ মতে মানুষ কর্ণস্থত্রের অধীন । স্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলেন, আমি ইচ্ছা করিলে পাপও করিতে পারি, পুণ্যও করিতে পারি ।

নিযুক্তিবাদীরা বলেন যে পাপ পুণ্য আবার ইচ্ছার অনধীন । আমি জগদীশ্বরের করমুত জীবিতপুত্র মাত্র । তিনি আমার শিরে পাপ পুণ্যের ভার যেরূপ নাস্ত করিয়াছেন, তাহা আমি ইচ্ছা না করিলেও ঘটিবে, ইচ্ছা করিলেও ঘটিবে না ।

“ ভয়া স্ববীকেশ স্বদিশ্বিতেন,

যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি । ”

এই দুইটি মতের মধ্যে কোনটি সত্য এবং কোন্টি মিথ্যা তাহা নির্ণয় করা আমাদের কঠোর অসাধ্য । এক্ষণে ইহা বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে, যে পৃথিবীতে এরূপ একদল দার্শনিক ছিলেন, যঁহারা পাপ পুণ্য মনুষ্যের ইচ্ছার বহির্ভূত বলিয়া মনে করিতেন । ইহঁারা যে পুণ্য শিক্ষা অসম্ভব বোধ করিতেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে । মিল স্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন ; কিন্তু তিনিও স্বীকার করিয়াছেন, যে পুণ্য শিক্ষা অতীব কঠিন ব্যাপার । যাহা মার্জিতবুদ্ধি, নির্লোভ, জ্ঞানী মহাপুরুষের নিকট অতীব কঠিন, তাহা যে তোমার আমার নিকট এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি ?

জনস্ব বলেন, “ যে অধিক কথা বলে, সে কতকগুলি অনর্থক বলিবেই ব-

লিবে।' কথা সঘন্থে যে মিয়ম, কার্য্য সঘন্থেও তাহাই। 'যে অনেক কার্য্য করে, সে কতকগুলি কার্য্য অনায়াস করিবেই করিবে।' এমতটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাংসারিক যে সন্ন্যাসী অপেক্ষা অধিকতর পাপী হইবেন, তাহা সহজেই বোধ হইতে পারে।

এস্থলে, আমরা কি বলিলাম একবার তাহা স্মরণ করিয়া দেখা আবশ্যিক বোধ হইতেছে। আমরাইগের যুক্তির প্রণালী নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(১) স্বার্থত্যাগ শিক্ষাই ভাল মানুষ হইবার প্রধান উপায়।

(২) স্বার্থ ত্যাগ শিক্ষা সংসারে থাকিয়া হইতে পারে না। একজন্য সংসার ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু সংসার ত্যাগ সঘন্থে কএকটি আপত্তি আছে। যথা—

(ক) সকলে সংসার ত্যাগ করিলে সংসার চলিবে না।

(খ) সংসার ত্যাগ করিলে স্বার্থ ত্যাগ শিক্ষা করা যায় না। স্বার্থত্যাগ শিক্ষা সংসারে থাকিয়াই সম্ভব।

(৩) আপত্তিখণ্ডন। (আমরা যথা সাধ্য দেখাইয়াছি যে, সংসারে থাকিলে কোনরূপেই পুণ্য শিক্ষা করা যায় না।)

যদি কেহ এ প্রবন্ধ এতদূর পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, কিজন্য আমরা স্বার্থত্যা-

গকে দুর্জর্ষ ও অদ্ভয় শত্রু বলিয়া মনে করি। আমাদের অন্য এক প্রবল প্রমাণ এই যে, এতকাল পৃথিবী চলিয়া আসিতেছে, তথাপি পৃথিবীতে ভাল মানুষের সংখ্যা অতি অল্পই বৃদ্ধি হইয়াছে। যদি সংসারে থাকিয়া ভাল মানুষ হওয়া যায়, তাহা হইলে এতদিন ভাল মানুষের সংসার পূরিয়া উঠিত।

অন্য কথা বলিবার পূর্বে আমরা ভাল মানুষের কি অর্থ করি, তাহা আরও একটুকু বিশদ করিয়া বলা উচিত বোধ হইতেছে। 'ভাল মানুষ' এ কথাটিতে প্রশংসাবাচক কিছুই নাই। সংসারের উপকার করিব, পৃথিবীর জ্ঞান বর্দ্ধন করিব, এসকল উদ্দেশ্য ভাল মানুষের নহে। ভাল করিতে পারি, না পারি, কাহারও অনিষ্ট করিব না; সংকার্য্য করিতে পারি না পারি, কোন অসংকার্য্য করিব না; মহৎকার্য্য করিতে পারি না পারি, অন্যান্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব না; ইত্যাদি ভাল মানুষের উদ্দেশ্য। 'ভালমানুষ' চাহেন না যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার নাম প্রতিধ্বনিত হউক; চাহেন না যে দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে তাঁহার কীৰ্ত্তি বিধোষিত হউক। 'ভালমানুষ' চাহেন নির্মল, প্রসন্ন, রাগঘেববিবর্জিত, শান্তভাবাপন্ন হৃদয়বৃত্তি। মনস্তৃষ্টি জ্ঞানিত পুথই ভাল মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। (ক্রমশঃ)

জীবনপ্রভাত ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।

বিজ্ঞতার পুরস্কার ।

—০০০—

‘ছিন্ন তুষ্কারের ন্যায় বালা বাঞ্জা দূরে যায়,
তাপদন্ধ জীবনের ঝঞ্জাবাস্তু প্রহারে !
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত,
ছিন্ন পতাকার মত ভঙ্গ হুর্গ প্রাকারে ।’

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

পর দিন অপরাহ্নে সেই হুর্গোপরি
অপরূপ সভা সন্নিবেশিত হইল । রৌপ্য-
খিনির্শিত চারি স্তম্ভের উপর রক্ত বর্ণের
চক্রোতপ, নীচেও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত
রাজগদীর উপর রাজা জয়সিংহ ও রাজা
শিবজী উপবেশন করিয়া আছেন । চারি
পার্শ্বে সৈন্যগণ বন্দুক লইয়া শ্রেণীবদ্ধে দ-
ণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই বন্দুকের কিরীচ
হইতে রক্তবর্ণের পতাকা অপরাহ্নের বায়ু-
ছিল্লোলে হৃত্য করিতেছে । চারিদিকে শত
শত লোক দিল্লীখরের ও জয়সিংহ ও শি-
বজীর জয়বাদ করিতেছে ।

জয়সিংহ সহাস্য বদনে বলিলেন ‘আ-
পনি দিল্লীখরের পক্ষাবলম্বন করিয়া অ-
বধি তাঁহার দক্ষিণহস্ত অরূপ হইয়াছেন ।
এ উপকার দিল্লীখর কখনই বিস্মৃত হই-

বেন না, আপনার সকল চেষ্টার জয়
হইয়াছে ।’

শিবজী । ‘যেখানে জয়সিংহ সেই
খানে জয় !’

সভাসদৃগণ সকলে সাধুবাদ করিল ।
জয়সিংহ আবার বলিলেন ‘বোধ করি
আমরা শীঘ্রই বিজয়পুর হস্তগত করিতে
পারিব, আপনি এক রাত্রির মধ্যে এই
হুর্গ অধিকার করিবেন তাহা আমি কখনই
আশা করি নাই ।’

শিব । ‘মুসলমানদিগকে সুশ্রু পা-
ইব বিবেচনা করিয়াছিলাম, দেখিলাম স-
কলে জাগ্রত ও সসজ্জ ! পূর্বের কখনও
হুর্গজয় করিতে এরূপ যুদ্ধ করিতে হয়নাই ।’

জয় । ‘বোধ করি একদণ্ড যুদ্ধের
সময় বলিরা রজনীতে সর্বদাই শত্রুরা স-
সজ্জ থাকে ।’

শিব । ‘সত্য, কিন্তু এত হুর্গ জয়
করিয়াছি, কোথাও সৈন্যগণকে এরূপ প্র-
স্তুত দেখি নাই ।’

জয় । ‘শিক্ষা পাইয়া ক্রমে সতর্ক
হইতেছে । কিন্তু সতর্কই থাকুক অথবা
নাই থাকুক, রাজা শিবজীর গতি অবা-
রিত, শিবজীর জয় অনিবার্য ।’

শিব । ‘সহস্রাজের প্রসাদে হুর্গ

জয় হইয়াছে বটে, কিন্তু কল্যাণরঞ্জনের ক্ষতি জীবনে পূরণ হইবে না। সহস্র আক্রমণকারীর মধ্যে পঞ্চশত জনকে আমি আর এ জীবনে দেখিব না, সেরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ বিশ্বস্ত সেনা বোধ হয় আর পাইব না।’ শিবজী ক্ষণেক শোকাকুল হইয়া রহিলেন। পরে বন্দীগণকে আনয়নের আদেশ করিলেন।

রহমৎখাঁর অধীনে সহস্র সেনা সেই দুর্গম দুর্গ রক্ষা করিত, কল্যাকার যুদ্ধের পর কেবল তিনশত মাত্র জীবিত আছে। সকলের হস্তধর পশ্চাৎ দিকে বদ্ধ, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সকলে সভাসম্মুখে উপস্থিত হইল।

শিবজী আদেশ করিলেন ‘সকলের হস্ত খুলিয়া দাও। আফগান সেনাগণ! তোমরা বীরের নাম রাখিয়াছ, তোমাদের আচরণে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমরা স্বাধীন। ইচ্ছা হয় দিল্লীশ্বরের কার্যে নিযুক্ত হও, নচেৎ আপন প্রভু বিজয়পুরের স্বলতানের নিকট চলিয়া যাও,—আমার আদেশে কেহ তোমাদিগের কেশাগ্রে স্পর্শ করিবে না।’

শিবজীর এই সদাচরণ দেখিয়া কেহই বিস্মিত হইল না; সকল যুদ্ধে, সকল দুর্গজয়ের পর তিনি বিজিতদিগের প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রকাশ ও সদাচরণ করিতেন, তাঁহার বহুগণ কখন কখন তাঁহাকে এজন্য দোষ দিতেন, কিন্তু তিনি প্রোহা করিতেন না। শিবজীর সদাচরণে বিস্মিত হইয়া আফগানগণ অনেকেই দিল্লী-

শ্বরের বেতমভোগী হইতে স্বীকার করিল।

পরে শিবজী কিলানার রহমৎখাঁকে আনিবার আদেশ দিলেন। তাঁহারও হস্তধর পশ্চাৎ দিকে বদ্ধ, তাঁহার ললাটে খঞ্জের আঘাত, বাহুতে তীর বিদ্ধ হইয়া ক্ষত হইয়াছে, কিন্তু বীর তখনও সদর্পে সভাসম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, সদর্পে শিবজীর দিকে চাছিলেন।

শিবজী সেই বীরশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া স্বয়ং আসন ত্যাগ করিয়া খঞ্জের দ্বারা হস্তের রক্ত কাটিয়া ফেলিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—

‘বীরপ্রধান! যুদ্ধের নিয়মানুসারে আপনার হস্তধর বদ্ধ হইয়াছিল, আপনি এক রজনী বন্দীরূপে ছিলেন, আমার সে দোষ মার্জনা করুন, আপনি এক্ষণে স্বাধীন! আপনার বীরত্বের কথা কি বলিব; জয় পরাজয় ভাগ্যক্রমে ঘটে, কিন্তু আপনার ন্যায় যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমিই সম্মানিত হইয়াছি।’

রহমৎখাঁ প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাশা করিতেছিলেন, তাহাতেও তাঁহার দ্বিরগর্ভিত নয়নের একটি পত্রও কম্পিত হয় নাই; কিন্তু শিবজীর এই অসাধারণ জ্ঞেয়তা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল। যুদ্ধসময়ে শক্রমধ্যে কেহ কখনও রহমৎখাঁর কাতরতা-চিহ্ন দেখেন নাই, অদ্য হৃদয়ের দুই উজ্জ্বল চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। রহমৎখাঁ মুখ ফিরাইয়া

তাঁহা মোচন করিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন—

‘কজিয়-রাজ! কল্যা নিশীথে আপনার বাহুবলে পরাস্ত হইয়াছিলাম, অদ্য আপনার ভক্তাচরণে তদধিক পরাস্ত হইলাম। যিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের অধীশ্বর, যিনি পাদসাহের উপর পাদসাহ, জমীন ও আসমানের মুলতান, তিনি এই জন্য আপনাকে নূতন রাজ্য বিস্তারের ক্ষমতা দিয়াছেন।’ বুদ্ধের নয়ন হইতে আর দুই বিন্দু জল পড়িল।

রাজা জয়সিংহ কহিলেন ‘পাঠান-রাজ! আপনারও উচুপদের যোগ্যতা আপনি প্রমাণ করিয়াছেন। দিল্লীশ্বর আপনার ন্যায় সেনা পাইলে আরও পদ-রুদ্ধি করিবেন সন্দেহ নাই। দিল্লীশ্বরকে কি লিখিতে পারি যে আপনার ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠ তাঁহার সৈন্যের একজন প্রধান কর্মচারী হইতে সম্মত হইয়াছেন?’

রহমৎখাঁ উত্তর করিলেন ‘মহারাজ! আপনার প্রস্তাবে আমি যথেষ্ট সম্মানিত হইলাম, কিন্তু আজীবন বাঁহার কার্য্য করিয়াছি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব না; বস্তু দিন এ হস্ত ধক্ষা ধরিতে পারিবে, বিজয়পুরের জন্য ধরিবে।’

শিবজী বলিলেন ‘তাঁহাই হউক। আপনি অদ্য রাজি বিজায় ককন, কল্যা প্রাতে আমার একদল সেনা আপনাকে বিজয়পুর পর্য্যন্ত নিরাপদে পহুঁছিয়া দিবে।’ এই বলিয়া রহমৎখাঁকে যথো-

চিত সম্মান ও শুক্রবা করিবার জন্য ক-একজন প্রহরীকে আদেশ দিলেন।

রহমৎখাঁ স্থিরনেত্রে কণেক শিবজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন ‘কজিয়বর! আপনি আমার সহিত ভক্তাচরণ করিয়াছেন, আমি অভক্তাচরণ করিব না, আপনার নিকট কোন বিষয় গোপন রাখিব না। আপনার সেনার মধ্যে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন সকলে প্রভু ভক্ত নহে। কল্যা ভূর্গাক্রমণের গোপনানুসন্ধান আমি পূর্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই জন্যই সমস্ত সেনা সমস্ত রাজি সমস্ত ও প্রস্তুত ছিল। অনুসন্ধানদাতা আপনারই একজন সেনা। ইহার অধিক বলিতে পারি না, সত্য লজ্জন করিব না।’ রহমৎখাঁ ধীরে ধীরে প্রহরীগণের সহিত প্রাসাদান্তিমুখে চলিয়া গেলেন।

রোষে শিবজীর মুখমণ্ডল একবারে ককবর্ণ ধারণ করিল, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার বক্ষুগণ বুঝিলেন এক্ষণে পরামর্শ দেওয়া রূপা; তাঁহার সৈন্যগণ বুঝিল অদ্য প্রমাদ উপস্থিত।

জয়সিংহ শিবজীকে এতদাবস্থায় দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, ‘কাস্ত হউন, একের দোষে সমস্ত সৈন্যের উপর কোপ অনুচিত।’ পরে শিবজীর সৈন্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

‘এই ভূর্গ আক্রমণ করা হইবে, তোমরা কখন জানিয়াছিলে?’

সৈন্যগণ উত্তর দিল 'এক প্রহর রজনীতে।'

জয়। 'তাহার পূর্বে কেহই এ কথা জানিতে না?'

সৈন্য। 'রজনীতে কোন একটি দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে জানিতাম; এই দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে তাহা জানিতাম না।'

জয়। 'ভাল, কোন সময়ে তো-নরা দুর্গে পৌঁছিয়াছিলে?'

সৈন্য। 'অনুমান দেড় প্রহর রজনীর সময়।'

জয়। 'উত্তম। এক প্রহর হইতে দেড়প্রহর মধ্যে তোমরা সকলেই কি একত্র ছিলে? 'অমুক উপস্থিত নাই,' 'অমুক কোথায় গিয়াছে?' 'অমুক আসিল না কেন?' তোমাদিগের মধ্যে এরূপ কথা হয় নাই? যদি হইয়া থাকে প্রকাশ কর। দেখ একজনের জন্য সহস্র জনের শ্মানি অশুচিত; তোমরা দেশে দেশে পূর্বতে পূর্বতে গ্রামে গ্রামে মহাবীর রাজা শিবজীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছ, রাজা তোমাদিগকে বিশ্বাস করেন, তোমরাও এরূপ প্রভু কখনও পাইবে না। আপনাদিগকে বিশ্বাসের যোগ্য প্রমাণ কর, যদি কেহ বিক্রোহী থাকে তাহাকে আনিয়া দাও যদি সে কল্যা রজনীর যুদ্ধে মরিয়া থাকে তাহার নাম কর, অন্যায় সন্দেহে কেন সকলের মাম কলুষিত হইতেছে? ,

সৈন্যগণ তখন কল্যাণের কথা শ্রবণ

করিতে লাগিল, পারস্পরের কথা কহিতে লাগিল; শিবজীর রোষ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল, কিঞ্চিৎ মৃদু হইয়া বলিলেন 'মহা রাজ! অত্র যদি সেই কপট যোদ্ধাকে বাহির করিয়া দিতে পারেন আমি চিরকাল আপনার নিকট শ্রুণী থাকিব।'

চন্দ্ররাও নামে একজন জুমলাদার অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—

'রাজনু! কল্যা এক প্রহর রজনীর সময় যখন আমরা যুদ্ধযাত্রা করি, তখন আমার অধীনস্থ একজন হাবেলদারকে অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই, যখন দুর্গ-তলে পৌঁছিয়া তখন তিনি আমাদের সহিত যোগ দিলেন।'

ভীষণস্বরে শিবজী বলিলেন 'সে কে, এখনও জীবিত আছে?'

বিক্রোহীর নাম শুনিবার জন্য সকলে নিশ্চক্ৰ।—একটি নিশ্বাসের শব্দ ও শব্দ যাইতেছে না, সত্যতলে একটি মূর্চিকা পড়িলে বেঁধে হয় তাহার শব্দ শব্দ যায়। সেই নিশ্চক্ৰতার মধ্যে চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে বলিলেন,—'রঘুনাথজী হাবেলদার।'

সকলে নিশ্চক্ৰ, বিস্ময়স্তম্ভ!

চন্দ্ররাও একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু রঘুনাথের আগমনাবধি সকলে চন্দ্ররাওয়ের নাম ও বিক্রম বিস্মৃত হইয়া ছিলেন। মানবপ্রকৃতিতে ঈর্ষ্যার ন্যায় ভীষণ বলবতী প্রকৃতি আর নাই।

শিবজীর মুখমণ্ডল পুনরায় ক্রমবর্ধন হইয়া উঠিল, ওঠে দস্ত স্থাপন করিয়া চন্দ্র-

রাওকে লক্ষ্য করিয়া সরোষে বলিলেন—

‘নিম্নুক, কপটাচারি! তোমার মিন্দায় রঘুনাথের যশোরূপি স্পর্শ করিবে না, রঘুনাথের আচরণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কিন্তু মিথ্যা নিম্নুকের শাস্তি সৈন্যেরা দেখুক।’

সেই বজ্রহস্তে শিবজী লৌহবর্ষা উত্তোলন করিয়াছেন সহসা রঘুনাথ সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—

‘মহারাজ! প্রভু চন্দ্ররাওয়ের প্রাণ সংহার করিবেন না। তিনি মিথ্যাবাদী নহেন, আমার দুর্গতলে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল।

আবার সভাস্থল নিশ্চক্ৰ। নিঃশব্দে সমস্ত সৈন্য রঘুনাথের দিকে অবলোকন করিতেছে!

শিবজী কণকাল প্রস্তর-প্রতিমূর্তির স্তায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদবিন্দু মোচন করিয়া বলিলেন,—‘উঃ! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? তুমি! রঘুনাথ তুমি এই কার্য করি-
য়াছ! তুমি যে প্রাচীরলঙ্ঘনের সময় অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া একাকী অগ্রসর হইতেছিলে, পরে তিনশত সেনা মাত্র লইয়া বিত্তল সংখ্যক আক্রমণকে পরাস্ত করিয়াছিলে, তুমি বিক্রোহাচরণ করিয়া কিলদারকে পূর্বে আক্রমণ-সংবাদ দিয়াছিলে?’ শিবজীর মন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল

রঘুনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, ‘প্রভু, আমি সে দোষে নির্দোষী।’
দীর্ঘকাল নির্ভীক তরুণ যোদ্ধা শিবজীর অমিদৃষ্টির সম্মুখে নিরুদ্ভঙ্গ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, চক্ষের পলক পড়িতেছে না, একটি পত্র পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে না সভাস্থ সকলে, চারিদিকে অসংখ্য লোক সমূহে, রঘুনাথের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিতেছে। রঘুনাথজী স্থির, অবিচলিত, অকম্পিত; তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল কেবল গভীর নিখাসে স্ফীত হইতেছে! কল্য যেরূপ অসংখ্য শত্রুসমূহে প্রাচীরোপরি একাকী দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, অদ্য তদপেক্ষা অধিক সঙ্কট মধ্যে যোদ্ধা সেইরূপ ধীর, সেইরূপ অবিচলিত।

শিবজী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—
‘তবে কি জন্য আমার আঞ্জা লঙ্ঘন করিয়া এক প্রহর রজনীর সময় অনুপস্থিত ছিলে?’

রঘুনাথের গুণ্ঠ দ্বয় কম্পিত হইল, কোন উত্তর না করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রঘুনাথকে নির্বাক দেখিয়া শিবজীর সন্দেহ বৃদ্ধি হইল, মনঃকম্পিত পুনরায় রক্ত বর্ণ হইল, ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিলেন—

‘কপটাচারি! এই জন্য এরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলে? কিন্তু কৃষ্ণগে শিবজীর নিকট ছলনা চেষ্টা করিয়াছিলে।’

রঘুনাথ সেইরূপ ধীর অকম্পিত স্বরে বলিলেন,—‘মহারাজ! ছলনা, কপটাচরণ

আমার বংশের রীতি নহে,—বোধ হয় প্রভু চন্দ্ররাত তাহা জানিতে পারেন।’ অদ্য প্রথমে রঘুনাথ আপন বংশের উল্লেখ করিলেন।

রঘুনাথের স্থির ভাব শিবজীর ক্রোধে আচ্ছত্তি স্বরূপ হইল, তিনি কর্কশভাবে বলিলেন—

‘পাপিষ্ঠ ! নিষ্কৃতি চেচা রুধা ! কু-ধার্ম সিংহের গ্রাসে পড়িয়া পলায়ন করিতে পার, কিন্তু শিবজীর জ্বলন্ত ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ নাই।’

রঘুনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, ‘আমি মহারাজের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করি না, মনুষ্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি না, জগদীশ্বর আমার দোষ মার্জনা ককন !’

কিণ্ডপ্রায় শিবজী বর্ষা উত্তোলন করিয়া বজ্রনাদে আদেশ করিলেন,—

‘বিজ্রোহাচরণের শাস্তি প্রাণদণ্ড।’

রঘুনাথ সেই বজ্রমুক্তিতে সেই তীক্ষ্ণ বর্ষা দেখিলেন, সেই অবিচলিত স্বরে বলিলেন,—‘যোদ্ধা মরণে প্রস্তুত আছে, বিজ্রোহাচরণ সে করে নাই।’

শিবজী আঁর সহ করিতে পারিলেন না, অব্যর্থ মুক্তিভে সেই বর্ষা কম্পিত হইতেছে এরূপ সময়ে রাজা জয়সিংহ তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন।

তখন শিবজীর মুখমণ্ডল ক্রোধে রিক্ত হইয়াছিল, শরীর কম্পিত হইতেছিল, তিনি জয়সিংহের প্রতিও সমুচিত সম্মান

বিস্মৃত হইলেন, কর্কশ স্বরে কহিলেন—

‘হস্ত ত্যাগ ককন ; রাজপুত্রদিগের কি নিয়ম জানি না, জানিতে চাহি না, মহারাজীয়দিগের সনাতন নিয়ম—বিজ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড ; শিবজী সেই নিয়ম পালন করিবে।

জয়সিংহ কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন “কজ্জিয়রাজ ! অদ্য যাহা করিবেন, কল্যা তাহা অন্যথা করিতে পারিবেন না। এই যোদ্ধার অদ্য প্রাণদণ্ড করিলেন চিরকাল সে জন্য অনুতাপ করিবেন ! যুদ্ধ-নিয়মে আপনি পারদর্শী কিন্তু রুদ্ধ যে পরামর্শ দিতেছে তাহা অবহেলা করিবেন না।’

শিবজী জয়সিংহের শুভ্রতা দেখিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেন, কহিলেন ‘তাৎ ! আমার পক্ষ বাক্য মার্জনা ককন, আপনার কথা কখন ও অবহেলা করিব না ; কিন্তু শিবজী বিজ্রোহীকে ক্ষমা করিবে তাহা কখন মনে ভাবে নাই।’ পরে রঘুনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন—

‘হাবেলদার ! রাজা জয়সিংহ তোমার জীবন রক্ষা করিলেন, কিন্তু আমার সমুখ হইতে দূর হও, শিবজী বিজ্রোহীর মুখদর্শন করিতে চাহে না।’ তৎকরণে পুনরায় বলিলেন ‘অপেক্ষা কর ; দুই বৎসর হইল তোমার কোষের ঐ অসি আমিই তোমাকে দিয়াছিলাম, বিজ্রোহীর হস্তে আমার অসির অবমাননা হইবে না। প্রহরীগণ ! অসি কাড়িয়া লও, পরে বি-

জ্যোতীকে দুর্গ হইতে নিক্রান্ত করিয়া দাও।' প্রহরীগণ সেইরূপ করিল।

রঘুনাথের বধন প্রাণদণ্ডের আদেশ হইরাছিল, রঘুনাথ সে সময়ে অবিচলিত ছিলেন, কিন্তু প্রহরীগণ বধন অসি কাড়িয়া লইতেছিল, তখন তাঁহার শরীর ঈষৎ কম্পিত হইল, নয়নধর অরক্ত হইল। কিন্তু তিনি সে ভীষণ উদ্বেগ সংযম করিলেন। শিবজীর দিকে একবার চাহিয়া স্মৃত্তিকা পর্য্যন্ত শির নমাইয়া, নিঃশব্দে দুর্গ হইতে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া জগৎ আরুত করিতেছে, একজন পথিক একাকী নিঃশব্দে পর্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রান্তরাভিমুখে গমন করিলেন। প্রান্তর পার হইলেন, একটি গ্রামে উপস্থিত হইলেন, সেটি পার হইয়া আর একটি প্রান্তরে আসিলেন। অন্ধকার গভীরতর হইল, আকাশ মেলাচ্ছন্ন, রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু বহিয়া যাইতেছে, অন্ধকারে সে পথিককে আর দেখা গেল না, তাহার পর আর কেহ সে পথিককে দেখিতে পাইল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্ররাও জুমলাদার।

'আমা হইতে অন্য যদি কেহ অধিক গৌরব ধরে, দেখে যেন দেখে, ক্ষেপে যেন হলাহল।———'

বেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চন্দ্ররাও জুমলাদারের সহিত আমাদের এই প্রথম পরিচয়, তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি, অসাধারণ বীর্ষা, অসাধারণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তাঁহার বয়স রঘুনাথ অপেক্ষা ৫। ৬ বৎসর অধিক মাত্র, কিন্তু দূর হইতে দেখিলে সহসা তাঁহাকে পঞ্চত্রিংশৎ বৎসরের লোক বলিয়া বোধ হয়। প্রশস্ত ললাটে এই বয়সেই দুই একটি চিত্তার গভীর রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, মস্তকের কেশ দুই একটি শূন্য। নয়ন অতিশয় উজ্জ্বল ও তেজোব্যঞ্জক, কিন্তু চন্দ্ররাওকে ষাঁহারা বিশেষ করিয়া জানিতেন তাঁহারা বলিতেন যে চন্দ্ররাওয়ের তেজ ও সাহস যেক্ষণ দুর্দমনীয়, গভীর দূরদর্শী চিন্তা এবং ভীষণ অনিবার্য্য স্থির প্রতিজ্ঞাও সেইরূপ। সমস্ত মুখমণ্ডলে এই দুইটি ভাব বিশেষরূপে ব্যক্ত হইত। দেখে যেন লৌহবিন্দিত ও অসীম পরাক্রান্ত; ষাঁহারা চন্দ্ররাওয়ের অসীম পরাক্রম, বিজাতীয় কোথ গভীর বুদ্ধি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বিষয় জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা কখনই সেই অপত্যাবী স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভয়ানক জুমলাদারের সহিত বিবাদ করিতেন না। এ সমস্ত ভিন্ন চন্দ্ররাওয়ের আর একটি গুণ বা দোষ ছিল তাহা কেহই বিশেষরূপে জানিত না। বিজাতীয় উচ্চাভিলাষে তাঁহার হৃদয় দিব্যরাজ জ্বলিত। অসাধারণ বুদ্ধিসঞ্চালনে আত্মোন্নতির পথ আবিষ্কার করিতেন। অতুল দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত সেই পথ অবলম্বন করিতেন, থকাহন্তে সে পথ পরিষ্কার

করিতেন ; শত্রু হউক, মিত্র হউক, দোষী হউক, নির্দোষী হউক, অপকারী হউক বা পরম উপকারী হউক, সে পথের সম্মুখে যিনি পড়িতেন, উচ্চাভিলাষী চন্দ্ররাও নিঃসঙ্কোচে পতঙ্গবৎ তাহাকে পদ-দলিত করিয়া নিজ পথ পরিষ্কার করিতেন। অগ্র বালক রঘুনাথ ঘটনাবশতঃ সেই পথের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন, তাহাকে পতঙ্গবৎ দলিত করিয়া জুমলাদার পথ পরিষ্কার করিলেন। এরূপ অসাধারণ পুরুষের পূর্ব রূত্তান্ত জানা আবশ্যিক ; সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথের বংশরত্তান্তও কিছু কিছু জানিতে পারিব।

ঠাঁহার জন্মরত্তান্ত তিনি প্রকাশ করিতেন না, আমরাও জানি না, অতি উন্নত রাজপুত্রকুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণপুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন। রাজা যশোবন্ত সিংহের একজন প্রধান সেনানী গজপতি সিংহ চন্দ্ররাওকে বাল্যকালে লালনপালন করিয়াছিলেন। অন্যথ বালক গজপতির গৃহের কার্য করিত, গজপতির পুত্র কন্যাকে বৃত্ত করিত, ও সেই সংসারের মধ্যে থাকিয়া কালযাপন করিত।

যখন চন্দ্ররাওয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ যাত্র, তখনই গজপতি ঠাঁহার গভীর চিন্তা ও বুদ্ধি, দুর্দমনীয় তেজ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন, নিজ পুত্র রঘুনাথের ন্যায় চন্দ্ররাওকে ভাল বাসিতেন, ও এই কোমল বয়সেই আপন অধীনে সৈনিক কার্যে প্রবৃত্ত করেন।

সৈনিকের ব্রত ধারণ করিয়া অবধিই চন্দ্ররাও দিন দিন যে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহা দেখিয়া প্রাচীন যোদ্ধাগণও বিস্মিত হইত। যুদ্ধে যে স্থানে অতিশয় বিপদ, যে স্থানে প্রাণনাশের অতিশয় সম্ভাবনা, যে স্থানে শত্রু ও মিত্রের শব রাশীকৃত হইতেছে, রক্তস্রোত বহিয়া যাইতেছে, খুলি ও ধূমে গগন আচ্ছাদিত হইতেছে, যোদ্ধার ভীষণ হুকুরে ও আর্তের আর্তনাদে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে,—তথায় অন্বেষণ কর, পঞ্চদশ বর্ষের বালক নিঃশঙ্কে অশুর-বীর্য প্রকাশ করিতেছে ; মুখে রব নাই, কিন্তু ময়ন অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত, ললাট কুঞ্চিত ও বিজাতীয় ফোদাচ্ছায়ার কৃষ্ণবর্ণ! যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে যে স্থানে যুদ্ধজয়ী সেনাগণ একত্র হইয়া রজনীতে গীত বাদ্য করিতেছে, হাস্য ও আমোদ করিতেছে,—চন্দ্ররাও তথায় নাই ; অস্পৃশ্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালক শিবিরের অন্ধকারে একাকী বসিয়া রহিয়াছে, অথবা কুঞ্চিত ললাটে প্রান্তরে বা নদীতীরে একাকী সায়ংকালে পাদচারণ করিতেছে। চন্দ্ররাওয়ের উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সাধিত হইল, তিনি এক্ষণে অজ্ঞাত ব্রাহ্মণ শিশু নহেন, ঠাঁহার পদবুদ্ধি হইয়াছে, গজপতি সিংহের অধীনস্থ সমস্ত সেনার মধ্যে চন্দ্ররাও এক্ষণে একজন অসাধারণ সাহসী তেজস্বী বীর বলিয়া পরিচিত। মর্যাদারূদ্ধির সহিত চন্দ্ররাওয়ের উচ্চাভিলাষ ও গর্ব্ব অধিকতর বৃদ্ধি পাইল।

একদিন একটি যুদ্ধে চন্দ্ররাওয়ের বিক্রম দেখিয়া গজপতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন, বিজয়ের পর চন্দ্ররাওকে নিকটে ডাকিয়া সকলের সম্মুখে বধোচিত সম্মান করিয়া বলিলেন ‘চন্দ্ররাও ! অদ্য তোমার সাহসেই আমাদিগের যুদ্ধে জয় হইয়াছে, ইহার পুরস্কার তোমাকে কি দিতে পারি ?’ চন্দ্ররাও মুখ অবনত করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন ‘প্রফুল্ল সাধুবাদে নাম যথেষ্ট পুরস্কৃত হইয়াছে, আর অধিক সে কি চাহিতে পারে ?’ গজপতি সন্তোষে বলিলেন ‘মনে ভাবিয়া দেখ, যাহা ইচ্ছা হয় প্রকাশ করিয়া বল । অর্থ, ক্ষমতা, পদবৃদ্ধি,—চন্দ্ররাও ! তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই ।’ চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে নয়ন উঠাইয়া বলিলেন,—

‘রাজপুত্র বীর কখনও অঙ্গীকার অনাথা করেন না জগতে বিদিত আছে । বীরশ্রেষ্ঠ ! আপনার কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে আমার সহিত বিবাহ দিন ।’

সত্যাহু সকলে নির্ঝাঁকু নিস্তব্ধ । গজপতির মাথায় যেম আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, কোথো তাঁহার শরীর কম্পিত হইল ; অসি কোব হইতে অর্ধেক নিষ্কোষিত করিলেন, কিন্তু সে কোথ কথঞ্চৎ সংযম করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন—

‘অঙ্গীকার পালনে স্বীকৃত আছে, কিন্তু তোমার মহারাষ্ট্র দেশে জন্ম, রাজপুত্রহিতানিগের দন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত পর্ত্তকন্দরে ও জঙ্গলমধ্যে থাকি-

বার অভ্যাস নাই । অগ্রে লক্ষ্মীর উপযুক্ত বাসস্থান নির্মাণ কর, পরে মহারাষ্ট্রীয় ভৃত্যের সহিত রাজবংশীয়া বালিকার বিবাহ দিবার কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করা যাইবে । এখন অন্য কোন যাজ্ঞা আছে ?’

সত্যাহু সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে বলিলেন ‘অন্য কোন যাজ্ঞা এক্ষণে নাই, যখন থাকিবে প্রভুকে জানাইব ।’

সত্যাহু ভঙ্গ হইল, সকলে নিজ নিজ শিবিরে গমন করিল, উদারচেতা গজপতি চন্দ্ররাওয়ের প্রতি ক্রোধ অতিরিক্ত বিস্মৃত হইলেন, সেদিনকার কথা শীঘ্র বিস্মৃত হইলেন । চন্দ্ররাও সে কথা বিস্মৃত হইলেন না, সেই দিন সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে আপন শিবিরে পাদচারণ করিতে লাগিলেন, প্রায় দুই দণ্ড এইরূপে পাদচারণ করিলেন, শিবির অন্ধকার, কিন্তু তাহা অপেক্ষা হৃৎদেয় অন্ধকার চন্দ্ররাওয়ের হৃদয় ও ললাটে বিরাজ করিতেছিল । তাঁহার সে সময়ের ভাব বর্ণনা করিতে আমরা অশক্ত, সে সময়ে তাঁহার যুদ্ধের ভীষণ আকৃতি দেখিলে বোধ হয় স্বয়ং যুতুও চকিত হইতেন ।

দুই দণ্ডের পর চন্দ্ররাও একটি দীপ জ্বালিলেন,—একখানি পুস্তকে সবত্র কি লিখিলেন, পুস্তকখানি বন্ধ করিলেন, আবার খুলিলেন, আবার দেখিলেন, আবার বন্ধ করিলেন । ঈষৎ বিকট হাস্য মুখমণ্ডলে দেখা গেল ।

তঁাহার একজন বন্ধু ইতিমধ্যে শিবিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ‘চন্দ্র! কি লিখিতেছ?’ চন্দ্ররাও সহজ অবিচলিত স্বরে বলিলেন ‘কিছু মতে, হিসাব লিখিয়া রাখিতেছি, আমি কাহার নিকট কি ধারি তাহাই লিখিতেছি।’

বন্ধু চলিয়া গেল! চন্দ্ররাও পুনরায় পুস্তকখানি খুলিলেন। সেইটি যথার্থই হিসাবের পুস্তক, চন্দ্ররাও একটি ঞ্ণের কথাই লিখিয়াছিলেন। পুনরায় পুস্তক বন্ধ করিয়া দীপ নিৰ্বাণ করিলেন।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে আরং-জীবের সহিত যশোবন্তের উজ্জয়িনী সন্ধি-ধানে মহাযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গজপতি সিংহ হত হইলেন, কিন্তু যে ভীর তঁাহার বক্ষ বিদৌর্ণ করে তাহা শক্রহস্ত নিক্ষিপ্ত নহে।

তাঁহার পর যখন যশোবন্তের রাজী সেই যুদ্ধে পতির পরাজয়ের কথা শুনিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া দুর্গধার কন্ধ করিলেন, তখন একজন সংবাদ দিল যে গজপতি নামক একজন সেনানীর ভীকতা ও কপটাচারিতাতেই পরাজয় সাধন হইয়াছে। রাজী সে সময়ে বিচার করিতে অসমর্থ, আদেশ করিলেন যে কপটাচারীর সন্তান সম্ভতি মাড়ওয়ার হইতে দূরীকৃত হয়, ও সমস্ত সম্পত্তি রাজাধীনে নীত হয়। গজপতির কপটাচারিতার সংবাদ কে দিল তাহা লুক্ক প্রকাশ হইল না।

গজপতির অমাখা বালক ও বালিকা

মাড়ওয়ার হইতে দূরীকৃত হইয়া পদ-ব্রজে অন্য দেশে বাইতেছিল, রঘুনাথের বয়ঃক্রম ছাদশ বর্ষ, লক্ষ্মীর নয় বৎসর মাত্র, সঙ্গে কেবল একমাত্র পুরাতন ভূতা। রাজীর ভয়ে হতভাগাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেও কেহ সাহস করিল না। পশ্চিমধ্যে একদল দস্যু সেই ভূতাকে হত্যা করিয়া বালকবালিকাকে মহারাষ্ট্রদেশে লইয়া যাইল। বালক অল্পবয়সেই ভেজস্বী; রজনীবোগে দস্যুদিগের শিবির হইতে পলায়ন করিল, বালিকাকে দস্যুপতি বলপূর্বক বিবাহ করিলেন। তিনি চন্দ্ররাও!

তীক্ষ্ণবুদ্ধি চন্দ্ররাওয়ের মনোরথ কতক পরিমাণে পূর্ণ হইল। গজপতির সংসার হইতে প্রভূত অর্থ ও মণি মাণিক্য আনিয়াছিলেন, বিস্তীর্ণ জায়গীর কিনিলেন, মহারাষ্ট্রে একজন সমাদৃত সম্রাট লোক হইলেন। ‘টাকা থাকিলে সব সাজে,—’ চন্দ্ররাওয়ের বংশ এক পুরাতন রাজপুত-বংশ হইতে উদ্ভূত, এ কথা কেহ অ বিশ্বাস করিল না, তিনি প্রসিদ্ধনামা রাজপুত গজপতি সিংহের একমাত্র হুহিতাকে বিবাহ করিয়াছেন সকলে দেখিতে পাইল, তাঁহার যথার্থ সাহস বিক্রম দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে জয়লাদারের পদ দিলেন, তাঁহার বিপুল অর্থ জায়গীর ও বাহ্যাদেশের দেখিয়া সকলে তাঁহাকে সমাজে সমাদর করিলেন। চন্দ্ররাও আরও দুই তিনটি বড় ঘরে বিবাহ করিলেন, বড় লোকের স-

হিত নিশিতে লাগিলেন, বড় রকম চাল
অবলম্বন করিলেন। আর কি করিলেন
বলার আবশ্যিক কি? যে সমস্ত স্মরণ
কোর্শলে আমরাই 'বড় লোক' ছই,
সমাজের শিরোভূষণ ছই, পদ মর্যাদা
রক্ষি করি, সঙ্গে সঙ্গে দস্ত ও গাভীর্বাও
রক্ষি করি,—চন্দ্ররাত্ত ও তাহাই করিলেন।
তবে চন্দ্ররাত্ত অসত্য, তিনি স্বহস্তে পি-
তাম্বরূপ গজপতিকে হনন করিয়া সে
উন্নত বংশের সর্কমাশ করিয়াছিলেন—
আমরা স্নসভা, আমরা চাতুরী ও মোক-
দ্দমা স্বরূপ স্মরণ উপায়ে কত সোণার
সংসার ছার খার করি, কেহ নিন্দা ক-
রিতে পারে না, কেননা এ সত্য 'আইন
সম্মত' উপায়। চন্দ্ররাত্ত অসত্য, যুদ্ধে
ভীষণ বিক্রম প্রকাশ করিয়া রাজাকে স-
ম্মত করিয়া আপন পদরক্ষির চেফ্টা পাই-
তেন, দেশে দেশে যশোবিস্তারের চেফ্টা
পাইতেন। আমরা স্নসভা, বস্তুতা স্ব-
রূপ বাগ্যুদ্ধে বা সংবাদপত্র স্বরূপ লেখ-
নীযুদ্ধে ভীষণ বিক্রম দেখাইয়া রাজার
নিকট উপাধি প্রাপ্ত হইবার চেফ্টা করি,
অচিরে 'দেশর্হিতৈবী মহম্মোক' হইয়া
উঠি। চারিদিকে জয়ধ্বনি বাজিতে থাকে,
সংবাদপত্রের ভেরী বাজিতে থাকে,
দেশে দেশে সে ধনি প্রতিধ্বনিত হইতে
থাকে—আমরা 'বড়লোক'।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সফীবাঈ ।

“স্বামী বনিতার পতি, স্বামী-বনিতার গতি,
স্বামী বনিতার যে বিধাতা।
স্বামী বনিতার ধন, স্বামী বিনা অমাজন,
কেহ নহে সখ মোক্ষদাতা।”

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ।

ষাটশব্দ বয়ঃক্রমের সময় রঘুনাথ-দ-
স্বাবেশী চন্দ্ররাত্ত ঙ্গারা আক্রান্ত হইয়া রা-
জস্থান ছইতে মহারাষ্ট্রদেশে নীত হইয়া-
ছিলেন। এক দিন রাজনীযোগে তিনি
পলায়ন করেন, পর্বতকন্দরে, বনমধ্যে,
প্রান্তরে, বা গৃহস্থের বাটিতে, কয়েক দিন
লুকায়িত থাকেন, স্মরণ অনাথ অস্পবরস্ব
বালককে দেখিয়া কেহই মুষ্টিভিক্ষা দিতে
পরামুখ হইত না।

তাহার পর পাঁচ ছয় বৎসর রঘুনাথ
নানা স্থানে নানা কষ্টে অতিবাহিত ক-
রিল। সংসার স্বরূপ অনন্ত সাগরে অ-
নাথ বালক একাকী ভাসিতে লাগিল।
নানা দেশে পর্বাটন করিল, নানা লো-
কের নিকট ভিক্ষা বা দাসত্বস্বত্তি অবলম্বন
করিয়া জীবন যাপন করিল। পূর্বে গৌ-
রবের কথা, পিতার বীরত্ব ও সম্মানের
কথা, বালকের মনে সর্কদাই জাগরিত
হইত, কিন্তু অতিমানী বালক সে কথা,
সে দুঃখ, কাহাকেও বলিত না, কখন ক-
খন দুঃখতার সূচ্য করিতে না পারিলে
নিঃশব্দে প্রান্তরে বা পর্বতশৃঙ্গোপরি উ-

পবেশন করিয়া একাকী প্রাণ তরিন্না যৌ-
দন করিত, পুনরায় চক্ষের জল ষোচন
করিতা অকার্য্যে বাইত।

বরোত্ত্বঙ্গির সহিত বংশোচিত তাব
হৃদয়ে যেন আপনাই জাগরিত হইতে লা-
গিল। অল্প বয়স্ক ভৃত্য গোপনে কখন
কখন প্রভুর শিরস্রাণ মস্তকে ধারণ করিত,
প্রভুর অসি কোবে খুলাইত। সঙ্কার স-
ময় প্রাস্তরে বলিয়া দেশীয় চরণদিগের
গান উঠেঃশ্বরে গাইত, নৈশপথিকেরা
পর্কতগুহার সংগ্রাম সিংহ বা প্রতাপের
গীত শুনিয়া চমকিত হইত। যখন অ-
ষ্টাদশ বৎসর বয়স তখন রঘুনাথ শিবজীর
কীৰ্ত্তি, শিবজীর উদ্দেশ্য, শিবজীর বীৰ্য্যের
কথা, চিন্তা করিতেন। রাজস্থানের স্ত্রায়
মহারাজীরদেশ স্বাধীন হইবে, শিবজী দ-
ক্ষিণদেশে হিন্দুরাজ্য বিস্তার করিবেন,
চিন্তা করিতে করিতে বালকের হৃদয় উৎ-
সাহে পূর্ণ হইল, তিনি শিবজীর নিকট
বাইয়া একটি সামান্ত সেনার কার্য্য প্রা-
ৰ্থনা করিলেন।

শিবজী লোক চিনিতে অধিতীয়, ক-
য়েক দিনের মধ্যে রঘুনাথকে চিনিলেন,
একটি হাবেলদারী পদে নিযুক্ত করিলেন,
ও তাহার কয়েক দিবস পরেই তোরণমুর্গে
পাঠাইলেন। পথে রঘুনাথের সহিত আ-
মাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

রঘুনাথ হাবেলদারী পদ পাইয়া-
ছিলেন বলা হইয়াছে। রঘুনাথের শিব-
জীর নিকট আগমনের সময় চন্দ্ররাও জুয়-

লাদারের অধীনে একজন হাবেলদারের
যুতা হয়, তাহারই পদ রঘুনাথ প্রাপ্ত হ-
য়েন। রঘুনাথ চন্দ্ররাওকে পিতার পুরা-
তন ভৃত্য ও আপন বাল্যস্বহৃৎ বলিয়া চি-
নিলেন; পিতৃহস্তা, বা দম্মারপী, বা ভগি-
নীপতি বলিয়া জানিতেন না, স্মৃতরাং
তিনি মানন্দে তাঁহার সহিত আলাপ ক-
রিতে বাইলেন। চন্দ্ররাও রঘুনাথকে অ-
ভাৰ্থনা করিলেন, কিন্তু অস্পাতাবী জুয়-
লাদারের ললাট অস্ত্র পুনরায় কুঞ্চিত
হইল।

দিনে দিনে রঘুনাথজীর সাহস ও বি-
ক্রমের বশ অধিক বিস্তার হইতে লাগিল,
চন্দ্ররাওয়ের চিন্তা গভীরতর হইল। প-
তঙ্গ বা কীট আমাদের পথের সম্মুখে
আসিলে আমরা পদসঙ্কালন দ্বারা দুৰ্ভা-
গাকে হত করিয়া পথ পরিষ্কার করি—
চন্দ্ররাও ও কোনদিন গোপনে রঘুনাথকে
হনন করিয়া আপন পথ পরিষ্কার করিবেন
ভাবিলেন। কিন্তু যখন রঘুনাথের যশো-
রাশি তাঁহার নিজের যশকেও স্তান করিল,
যখন লোকে বালকের সাহস দেখিয়া
বিক্রমশালী চন্দ্ররাওয়ের বিক্রম ও বিন্মুত
হইতে লাগিল, চন্দ্ররাও তখন মনে মনে
প্রতিজ্ঞা করিলেন ‘এ বালককে ভীষণ-
তর শাস্তি দেওয়া আবশ্যিক,—ইহার বশ
বিনষ্ট করিব।’ চিন্তা করিতে করিতে
চন্দ্ররাওয়ের নয়ন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া
উঠিল, যুত্কার ছাড়া যেম সেই কুঞ্চিত ললা-
টকে আকৃত করিল।

চন্দ্ররায়ের দ্বিধা প্রতিজ্ঞা কখনও বিচলিত হইত না, গভীর মন্ত্রণা কখনও ব্যর্থ হইত না। অল্প রঘুনাথজী দৈবযোগে প্রাণে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু বিক্রোহী কপটাচারী বলিয়া শিবজীর কার্য হইতে দূরীকৃত হইলেন।

চন্দ্ররায়ও শিবজীর নিকট কয়েক দিনের বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটী বাইলেন। পাঠক চল চল, আমরাও এক বার বড়লোকের বাটী সভয়ে প্রবেশ করি।

জুমলাদার বাটী আসিলেন, বহির্দ্বারে নহবৎ বাঞ্জিতে লাগিল, দাস দাসী শশবাল্ডে প্রফুর সম্মুখে আসিল, গৃহিণীগণ পতিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বেশ ভূষা করিতে লাগিলেন, প্রতিবাসীগণ সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, অচিরে চন্দ্ররায়ের আগমন বার্তা সমগ্র প্রাণে রাঙি হইল।

সায়ংকালে চন্দ্ররায় অন্তঃপুরে আসিলেন, লক্ষ্মীবাই ভক্তি ভাবে স্বামীর চরণে প্রণত হইলেন, পরে আহারাদির আয়োজন করিয়া স্বামীকে আহ্বান করিলেন। চন্দ্ররায় আহ্বারে বসিলেন, লক্ষ্মীবাই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মীবাই যথাধর্ম লক্ষ্মীস্বরূপা, শান্তা, দীরা, বুদ্ধিমতী, পতিব্রতা। বাল্যকালে পিতার আদরের কন্যা ছিলেন, কিন্তু কোমল বয়সে বিদেশে অপরিচিত লোক-

কের মধ্যে অস্পৃহ্য কঠোরস্বভাব স্বামীর হস্তে পড়িলেন, বন্ধ হইতে উৎপাটিত কোমল পুষ্পের ন্যায় দিন দিন শুষ্ক হইতে লাগিলেন। নয় বৎসরের বালিকার জীবন শোকাক্ষয় হইল, কিন্তু সে শোক কাহাকে জানাইবে? কে হুটা কথা বলিয়া সাস্তুনা করিবে? বালিকা পূর্ব কথা স্মরণ করিত, পিতার কথা স্মরণ করিত, প্রাণের সহোদরের কথা স্মরণ করিত, আর গোপনে অশ্রুবর্ষণ করিত।

শোকে পড়িলে, কষ্টে পড়িলে, আমাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, আমাদের হৃদয় ও মন শান্ত, সহিষ্ণু হয়। বালিকা দুই এক বৎসরের মধ্যেই সংসারের কার্য করিতে লাগিলেন, স্বামীর সেবার রত হইলেন। হিন্দু-রমণীর পতি তির্য আর কি গতি আছে? স্বামী যদি সঙ্কল্প ও সদয় হইলেন, নারী আনন্দে ভাসিয়া তাঁহার সেবা করেন, স্বামী নির্দয় বা বিমুখ হইলেও নারীর পতিসেবা তির্য আর কি উপায় আছে? চন্দ্ররায়ের হৃদয়ে প্রণয় বলিয়া কোন পদার্থ ছিল না, অভিমান, জিহ্বাংসা, উচ্চাভিলাষ, অপূর্ব বিক্রমে সে হৃদয় পূর্ণ; তথাপি তিনি ত্রীর প্রতি নির্দয় ছিলেন না, দাসী লক্ষ্মীবাইয়ের প্রতি সদয় ব্যবহারই করিতেন, লক্ষ্মীও দাসী স্বরূপ স্বামীর যথেষ্ট সেবা করিতেন, স্বামীর স্বভাব জানিয়া সর্বদা ভীত থাকিতেন, একটি দিষ্ট কথা শুনিলে আপনাকে পুরমা ভাগ্যবতী বিবেচনা ক-

রিতেম, আদীর একান্ত প্রণয় কি কখন জানিতেম না, সুতরাং কখন আশা করেন মাই।

এইরূপে সংসারকার্যে ও পতিসেবায় এক বৎসরের পর আর এক বৎসর অভি-
বাহিত হইতে লাগিল, ধীর শান্ত লক্ষ্মী
যৌবনপ্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সে যৌবন কি
শান্ত, নিকষেগ! পূর্বের কথা প্রায় ভূ-
লিয়া গেলেন, অথবা যদি সায়ংকালে ক-
খন রাজস্বানের কথা মনে উদয় হইত,
বাল্যকালের স্মৃতি, বাল্যকালের ক্রীড়া ও
প্রাণের জ্বালা রঘুনাক্ষের কথা মনে হ-
ইত, যদি মিশ্রক্ষে হই এক বিন্দু অশ্রু
সেই স্মরণ রক্তশূন্য গণ্ডস্থল দিয়া গড়ইয়া
বাইত, লক্ষ্মী সে অশ্রু বিন্দু মৌচন করিয়া
পুনরায় গৃহকার্যে প্রবৃত্ত হইতেম।

ক্রমে চন্দ্ররাজ আরও চারি পাঁচটি দার
পরিগ্রহ করিলেন, কাহারও উচ্চবংশের
জন্ম, কাহারও বিপুল অর্থের জন্ম, কা-
হারও বিস্তীর্ণ জায়গীরের জন্ম, এই সকল
কম্যা গ্রহণ করিলেন। চন্দ্ররাজ বালক
নছেন, প্রণয় বা সৌন্দর্যের জন্ম কাহাকেও
বিবাহ করেন মাই। তথাপি লক্ষ্মীবাই ব-
রের গৃহিণী বটে,— তাঁহার অপরূপ সৌ-
ন্দর্যের জন্ম নহে, তিনি প্রথম স্ত্রী ও প্র-
সিদ্ধ রাজপুত্রবংশ-সমৃদ্ধতা এই জন্ম। চ-
ন্দ্ররাজ সকলকে ভূরি ভূরি গহনা, ভূরিভূরি
অর্থ ও বহুমূল্য বস্ত্রাদি দিতেম, কেহ কো-
থাও বাইলে অনেক দাস দাসী, অথ, হস্তী
পদাতিক ও বায়াকর সঙ্গে দিতেম, সক-

লেই জানিতে পারিতেম চন্দ্ররাজের প-
রিবার বাইতেছেন, এ সমস্ত আড়ম্বর
তাঁহার আপনার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্ম,
রমণীদিগের মনস্তাক্তির জন্ম তত নহে।
বাটিতে সকল রমণীই পতিকে সমান ভয়
করিতেম, দাসীর ন্যায় সকলেই প্রভুর
সেবা করিতেম।

চন্দ্ররাজ আহারে বসিরাছেন, লক্ষ্মী-
বাই পাশে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যজ্ঞন করি-
তেছেন। লক্ষ্মীবাইয়ের বয়ঃক্রম এক্ষণে
সপ্তদশ বর্ষ। অবয়ব কোমল, উজ্জ্বল ও
লাবণ্যময়, কিন্তু দৈবৎ ক্রীণ। জয়ুগল কি
সুন্দর সূচিকণ, যেম সেই পরিষ্কার শান্ত
মলাটে তুলী দ্বারা মাস্ত। শান্ত, কোমল,
কৃষ্ণ নয়ন দুটিতে যেম চিত্তা আপনার আ-
বাসস্থান করিয়াছে। গণ্ডস্থল স্মরণ, সূ-
চিকণ, কিন্তু দৈবৎ পাণ্ডুবর্ণ, সমস্ত শরীর
শান্ত ও ক্রীণ। যৌবনের অপরূপ সৌ-
ন্দর্য বিকাশিত রহিয়াছে, কিন্তু যৌবনের
প্রফুল্লতা, উন্নততা কৈ? আহা! রাজস্বানের
এই অপূর্ব পুষ্পটি মহারাষ্ট্রে সেইরূপ
সৌন্দর্য ও সুরাজ্য বিতরণ করিতেছে,
কিন্তু জীবনাতাবে শুষ্ক, মতশির। পদ্মা-
সনা লক্ষ্মীর ন্যায় লক্ষ্মীবাইয়ের চাঁক নয়ন,
সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কেশভার, কোমল সুরগোল
দেহ দেখিতেছি, কিন্তু যৌবনের প্রফুল্ল
স্বর্যাকিরণ মাই, জীবনাকাশ চিত্তামেঘা-
চ্ছন্ন।

চন্দ্ররাজ গজপতিকে হনন করিয়া-
ছেন, লক্ষ্মী ততদূর জানিতেম না, কিন্তু

স্বার্থসাধনের জন্য পিতার বংশের সর্ব-
নাশ করিয়াছেন তাহা চন্দ্ররাওয়ের আচ-
রণে ও কখন কখন দুই একটি কথা হইতে
বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিতে পারিয়াছিলেন,
তবে সে বিষয় কোন কথা জিজ্ঞাসা ক-
রিতেন না ।

একদিন চন্দ্ররাও লক্ষ্মীকে জানাইলেন
যে তাঁহার জ্ঞাতা চন্দ্ররাওয়ের অধীনে
হাবেলদার হইয়াছে ও যশোলাভ করি-
য়াছে । কথাটি সাল হইলে চন্দ্র ঐহৎ
হাসিলেন ; লক্ষ্মী স্বামীকে জানিতেন,
সে হাসি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ শুক হ-
ইয়া গেল ।

রঘুনাথ কেমন আছেন, কি করিতে-
ছেন, ইত্যাদি নানা ভাবনা সর্বদাই ল-
ক্ষ্মীর মনে জাগরিত হইত, কিন্তু স্বামীকে
তবে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না,
স্বামী বাটি আসিলে তাঁহার অধীনস্থ
পদাতিক বা ভৃত্যদিগকে অর্থে বশ ক-
রিয়া গোপনে সংবাদ জানিতেন । তাঁ-
হার মনে সর্বদাই ভয় হইত পাছে
স্বামী জ্ঞাতার অনিষ্টসাধন করেন ।
কি জন্য এক্ষণে ভয় হইত তিনি জানি-
তেন না ।

একদিন স্বামীর দুই একটি মিষ্টবাক্যে
প্রোৎসাহিত হইয়া লক্ষ্মী স্বামীর পদযু-
গলের নিকট বসিয়া বলিলেন—, দা-
সীর একটি নিবেদন আছে কিন্তু বলিতে
স্বয়ং করো ।

চন্দ্ররাও শ্রম করিয়া তাবুল চর্ষণ

করিতেছিলেন, সম্মুখে বলিলেন—‘ কি
বল না ।’

লক্ষ্মী বলিলেন ‘ আমার জ্ঞাতা বা-
লক অজ্ঞান ।’

চন্দ্ররাওয়ের মুখ গভীর হইল ।

লক্ষ্মী ভীত হইলেন, কিন্তু তথাপি
ভাবিলেন কপালে যাহা থাকে আজ ব-
লিব । প্রকাশ্যে বলিলেন—

‘ সে আপনার ভৃত্য, আপনারই অ-
ধীন ।’ চন্দ্ররাও ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—

‘ না, সে আমা অপেক্ষাও সাহসী
বলিয়া পরিচিত ।’

বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিতে পারিলেন তিনি
যাহা ভয় করিতেছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে,
—চন্দ্ররাও রঘুনাথের উপর যৎপরোনাস্তি
ক্রুদ্ধ ! তবে কল্পিত হইয়া বলিলেন—

‘ বালক যদি দোষ করে, আপনি
না মার্জন্য করিলে কে করিবে ?’

চন্দ্ররাও পকস্বরে বলিলেন, ‘ নি-
র্কোষ ত্রীলোকের নিকট চন্দ্ররাও পরামর্শ
লন না, বিরুদ্ধ করিও না ।’

লক্ষ্মী বুঝিলেন চন্দ্ররাওয়ের শরীরে
ক্রোধের উদ্বেক হইতেছে ; অন্য বিষয়
হইলে আর একটি কথা কহিতেও সাহস
করিতেন না, কিন্তু জ্ঞাতার জন্য স্নেহ-
ময়ী ভয়ী কি না করিতে পারে ? চন্দ্র-
রাওয়ের পদে লুণ্ঠিত হইয়া রোদন ক-
রিয়া বলিলেন ‘ দাসীর নিকট প্রতিজ্ঞা
ককন রঘুনাথের আপনি কোন অনিষ্ট
করিবে না ।’

চন্দ্ররাজের ময়ম আরক্ত হইল, তিনি লক্ষ্মীকে সঙ্গে লইয়া পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে নিক্ষেপ হইলেন।

তাঁহার পর চন্দ্ররাজ অসহ্য প্রথম বাঁটি আসিয়াছেন, রঘুনাথের ষাড়া ঘটিয়াছে লক্ষ্মী তাঁহা জানেন না, কিন্তু তাঁহার হৃদয় চিন্তাকুল, যুগ ফুটিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, রজনীতে স্বামী নিমিত্ত হইলে ভূতাদিগের নিকট জ্ঞাতায় সংবাদ লইবেন মনে স্থির করিয়াছিলেন।

চন্দ্ররাজের আহার দয়াপন হইল, তিনি শয়নাগারে যাইলেন, লক্ষ্মী তাঁহুল হস্তে তথায় যাইলেন। চন্দ্ররাজ তাঁহুল লইয়া বলিলেন—

‘এখন যাও, আমার বিশেষ কার্য আছে, যখন ডাকিব, তখন আসিও।’ লক্ষ্মীর সহিত এই তাঁহার প্রথম সস্তাষণ। লক্ষ্মী ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহিরে যাইলেন, চন্দ্ররাজ সতর্ক ভাবে দ্বারকন্ড করিলেন।

ধীরে ধীরে একটি গুপ্তস্থান হইতে একটি বাস বাহির করিলেন, সেটি খুলিলেন, একখানি পুস্তক বাহির করিলেন। দেখিতে হিলাবের পুস্তক। প্রায় দশ বৎসর পূর্বে গজপতি কর্তৃক যে দিন

সভায় অবমানিত হইয়াছিলেন, সে দিন সেই পুস্তকে একটি স্থানের কথা লিখিয়া ছিলেন, সেই পাত খুলিলেন, সুন্দর লক্ষ্য হস্তাকর সেইরূপ দেনীপায়াম রহিয়াছে:—

‘মহাজন... গজপতি ;

ঋণ..... অবমাননা ;

পরিশোধ হইবে তাঁহার হৃদয়ের শোণিতে
তাঁহার সম্পত্তি নাশে, তাঁহার বংশের অবমাননায়।

একবার, দুইবার, এই আক্ষরগুলি পড়িলেন ; ঈষৎহাস্য সেই বিকট মুখমণ্ডলে দেখা দিল, সেই স্থানে লিখিলেন।

‘অদ্য পরিশোধ হইল।’

তারিখ দিয়া পুস্তক বন্ধ করিলেন।

ঘর উদ্ঘাটন করিয়া লক্ষ্মীকে ডাকিলেন, লক্ষ্মী তত্ত্বি ভাবে স্বামীর নিকটে আসিলেন ; চন্দ্ররাজ লক্ষ্মীর হস্ত ধারণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন ‘অনেক দিনের একটি ঋণ অদ্য পরিশোধ করিয়াছি।’

লক্ষ্মী লিহরিয়া উঠিলেন !

চন্দ্ররাজের সুন্দর অনিচ্ছনীর হিসাবে অদ্য একটি তুল হইল। এ ঋণ পরিশোধকার্য অদ্য সমাপ্ত হয় নাই,—অ’র এক দিন হইবে।

শিক্ষা ও মানসিক পরিবর্তন

কোন পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে, সমাজের জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য পনের আনা শিক্ষাপ্রসাদাৎ । কৃষকসন্তানে এবং বিজ্ঞানবিৎ তনয়ে এমন কোন পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না, যাঁহাকে আমরা স্বভাবজাত পার্থক্য বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি । যখন উভয়েরই পঞ্চমবর্ষীয় বালক মাত্র, তখন উভয়েরই স্বভাব প্রায় একরূপ । একই খুলাখেলা, প্রায় এক প্রকার ত্রব্যেই অভিকচি, ঈপ্সিত ত্রব্য না পাইলে উভয়েরই ক্রন্দন ইত্যাদি নামা প্রকার একতা লক্ষিত হইয়া থাকে । কিন্তু বয়োপ্রাপ্ত হইবা মাত্রই একজন গরু লইয়া মাঠে লাঙ্গল দিতে চলিল, আর অপর বিদ্যালয়ে ঢুকিয়া লেখা পড়া শিখিয়া নিউটন ও হকের আবিষ্কার সকল পরীক্ষা করিতে লাগিল । এই সন্ধিস্থান হইতেই ভাষাদিগের বিভিন্নতার সূত্রপাত । ত্রিশ বৎসর পরে দেখ একজন আকাশস্থ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর নিয়মানুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল, আর অপরের সেই মাঠে সেই গরু লইয়া জ্বালাতন । স্মৃতরাং ইহাদিগের স্বভাবজাত বৈলক্ষণ্য যে কিছু ছিল, ইহা কোন অংশে সপ্রমাণিত হইভেছেনা । কৃষককেও যদি পণ্ডিত সন্তানের

সহিত একত্রে লেখা পড়া শিখান যাইত, হয়ত তাহা হইলে সেও ভাষার মত বিজ্ঞ হইতে পারিত । প্রতিভার কথা স্বতন্ত্র, কারণ কৃষককে ছাড়িয়া দিয়া সভ্যসমাজ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাই যে, এক পণ্ডিতের দুই পুত্র সমান সৌভাগ্যশালী হইতে পারে না । তবে ইহা স্থির হইবে যে সকল অসভ্যজাতিরা মুর্থ হইয়া থাকিব বলিয়া জন্মিয়াছে, এটি ঠিক কথা নহে । সভ্যজাতিদের সহিত যদি তাহারাও লেখা পড়া শিখিতে পার, সম্ভবতঃ তাহারাও সভ্যদের সহিত সমান আসন অধিকার করিতে পারে । এই জন্যই উক্ত পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, সমাজের জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য পনের আনা শিক্ষাপ্রসাদাৎ । এই মতাবলম্বীরা আরও বলিয়া থাকেন যে বিধাতার পক্ষপাতিত্ব আমরা দেখিতে চাহি না ; এবং যাঁহাতে তাঁহাকে পক্ষপাতী প্রমাণ করে, তাহা বিশ্বাস করিতে ও চাহি না । মূল কথা, শিক্ষাই আঘাদিগের জ্ঞানগত বৈলক্ষণের কারণ ।

এই মতটি ঠিক সভ্য মহে ইহা আমরা দেখাইব । প্রথমতঃ এতৎসম্বন্ধে দুই একটি আনুমানিক কথার অবতারণা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে ।

সকলেই জানেন যে, আমাদের মানসিক ভাবের সহিত কতকগুলি শারীরিক অঙ্গতন্ত্রের সম্বন্ধ আছে। হৃৎকম্প হলে আমরা ক্রন্দন করি। ক্রন্দন না করিলেও মুখের অনেকটা বিকৃতি হয়—চক্ষু ছোট হইয়া যায়; চক্কের তারা প্রায় অদৃশ্য হয়; নিশ্বাস প্রাশ্বাস প্রবলবেগে বহিতে থাকে; কপোল কুঞ্চিত হয়; মস্তকে ভার বোধ হয় এবং সাধারণতঃ হস্তোপরি মস্তক রাখিয়া থাকি। আত্মাদ হইলে চক্ষু দীর্ঘ হয়; হৃৎকম্প উচ্চ হইয়া উঠে এবং অল্প অল্প দস্ত বাহির হইয়া পড়ে। এইরূপ বিশেষ বিশেষ মানসিক ভাবের সহিত বিশেষ বিশেষ অঙ্গপ্রক্রিয়ার সম্বন্ধ। * অভ্যাসবশে এই সম্বন্ধ ক্রমে দৃষ্টিভূত হইয়া যায়। কখন কখন আবার কোম কোম অঙ্গচালনা কোম কোম ভাবের সহিত আমরা ইচ্ছা পূর্বক সংলগ্ন করিয়া থাকি। এবং এই অঙ্গচালনাগুলি তাহাদিগের নির্দিষ্ট মানসিক ভাবের সহিত সময়ে এরূপ জড়িত হইয়া যায় যে, যখন মনে কোন ভাব উদয় হয়, তখন যেন ওদারুণিক অঙ্গচালনাটি আপনি আসিয়া পড়ে। পূর্বে যেটি চেতনামাধ্য ছিল এখন সেটি স্বভা-

* সুবিজ্ঞ ডার্বিন সাহেব তাঁহার কৃত "Expressions of the Emotions" নামক পুস্তকে মানসিক ভাবের সহিত শরীরের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বজাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকের অঙ্গতন্ত্রী সম্বন্ধে কতকগুলি কু অভ্যাস আছে, সেগুলি এরূপ স্বাভাবিকমত বোধ হয়, যে কর্তার অজ্ঞাতে এবং কখন কখন অনিচ্ছায় তাহারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, ইহা বোধ করি সকলেই দেখিয়াছেন।

আমর এক কথা। পাঠক যাজেই জানেন, যে আমাদের ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা আমরা বহির্জগতের জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। তাহার উপায় এইরূপ। মস্তিষ্ক হইতে আমাদের শরীরের চারিদিকে ধমনী সকল (Nerves) প্রবাহিত হইয়াছে। মস্তকটি যেন কেন্দ্র স্বরূপ। পৃষ্ঠ দণ্ড হইতে কতকগুলি ধমনী বাহির হইয়াছে, সে গুলিরও কার্য প্রায় মস্তিষ্ক নিঃসারিত ধমনীর মত। ইহারা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বহির্জগতের সংবাদ মস্তিষ্কে লইয়া যায়। এবং মস্তিষ্ক হইতে সংবাদ লইয়া আসিতে হইলে অপর গুলির প্রয়োজন। হস্তে কোন আঘাত লাগিলে প্রথম শ্রেণীর ধমনী মস্তিষ্কে সংবাদ লইয়া গেল যে, কষ্ট হইতেছে; মন বলিল হস্তকে সরাইয়া লও, এই আজ্ঞা দ্বিতীয় শ্রেণীর ধমনী কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পেশী সকলকে কুঞ্চিত করিল—ফল হস্ত নড়িল।

আমরা ধমনী বা অন্য কোন শরীর-যন্ত্রের কার্য তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান

করিতে আরোজন করিয়া বলি নাই। * আমাদিগের ঘোট কথা এই যে আমাদিগের প্রত্যেক কার্যে ধমনী, পেশী প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রের সহায়তা আবশ্যিক করে। এক্ষণে হস্ত পাঠক বুঝিয়াছেন যে, মনে কোন ভাব উদয় হইলে আমাদিগের শরীরের যে বিকৃতি জন্মে, তাহার কারণ এই যে, শরীরভাঙ্গুরে পেশীর কৃৎসন প্রভৃতি কতকগুলি কার্য হইতে থাকে।

সেই কৃৎসন প্রভৃতি কার্যগুলি সময়ে এরূপ অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, ভবিষ্যতে সেই পূর্বের ভাব উদয় হইতে না হইতেই সেই কার্যগুলি দেখা দেয়। পূর্বের যেখানে চেষ্টার আরোজন হইত, এখন তাহা স্বতঃই হইয়া পড়ে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে শারীরিক যন্ত্র সকল এক কর্তৃক করিতে করিতে কালক্রমে কিছু পরিবর্তিত হইয়া যায়। বহু বহু বৎসরের পরে এই পরিবর্তন স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে।

পেশী, ধমনী প্রভৃতি হইতে মস্তিষ্কের পরিবর্তন হইলেই প্রকৃত মানসিক পরিবর্তন হইল। ইহাতে কেহ যেন না বুঝেন, যে আমরা ঘন এক মস্তিষ্ক এক পদার্থ বলিতেছি। হইতে পারে, ঘন মস্তিষ্কের বিকার বা কার্যকারিতা যাত্র, কিন্তু সে মত সমর্থন করা আমাদিগের

* বহির্জগতের জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে অবশ্য-জ্ঞাতব্য-বিষয় সকল শীঘ্রই স্বতন্ত্র প্রস্তাবে প্রকাশ করা যাইবে।

উদ্দেশ্য নহে। তবে কথা এই যে, মস্তিষ্কের পরিবর্তন হইলে আমরা অনুমান ও চাক্ষুব প্রমাণের দ্বারা স্থির করিতে পারি যে পরিবর্তনটি সম্পূর্ণ হইয়াছে।

এই পরিবর্তন সম্বন্ধে অনেক অনেকরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে, এরূপ পরিবর্তন সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অবিদ্বাস্য। সহস্র বৎসর পূর্বে আমরা যে রূপ হিলাম, এখনও তাহাই আছি—পরিবর্তিত দেখি না। বৃক লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এখন যে রূপ দেখিতেছি সহস্র বৎসর পূর্বেও তাহার সে রূপ ছিল, তাহার কি সম্ভব আছে? আমরা এই আপত্তি নিরাকরণের জন্য দুই একটি কথা বলিব; এবং তরসা করি তাহাতেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। বৃক লতার পরিবর্তন সম্বন্ধে আমরা অধিক বাক্য ব্যয় করিয়া প্রস্তাবটিকে পল্লবিত করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ ইহাদিগকে সজীব বলিয়া স্বীকার করিতে অনেকে কুণ্ঠিত। এবং সজীবের পরিবর্তন প্রমাণ করাই আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে ঐহাদের অভিকচি হয়, তাহার পণ্ডিতবর ডার্বিন সাহেবরূত এতৎসম্বন্ধীয় পুস্তক * পাঠ করিবেন। পশুদিগের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে। পৃথিবীর গভীরতম গহবরে এরূপ অনেক অস্থি

*The Variation of Animals and Plants under Domestication.

পাওয়া গিয়াছে, যাঁহা আধুনিক কোন প্রাণীর অস্থি বলিয়া বোধ হয় না। ইহা হইতে কি এই অনুমান যুক্তিসিদ্ধ মতে, যে, কতকগুলি প্রাণী কতকগুলি নূতন জীবের জন্ম দিয়া এ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে? অনেকে জানেন বন্যপশুকে গৃহপালিত করিতে পারিলে তাহাদিগের স্বভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। ‘কোন ব্যক্তি একটা ব্যা-জ্রশাবক ধৃত করিয়া কিয়ৎকাল শস্য ভক্ষণ করাইয়া রাখিয়াছিল। তাহাতে সেই ব্যাজ্রের জীবাংশা প্রকৃতি এইপ্রকার দমন হইল যে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলে, সে গৃহের পাশে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিত, এবং হস্তে করিয়া খাদ্য দ্রব্য দিলে আহাৰ করিত, তাহাতে কাহারও হিংসা করিত না।†’ এইরূপ ব্যাজ্রের বংশাবলী লক্ষ বৎসরের পরে যে বন্য ব্যাজ্র হইতে তিন্ন সৃষ্টিধারণ করিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? মনুষ্য সম্বন্ধেই যে পরিবর্তন হয় নাই, তাহাই বা কেমন করিয়া বলি? অনেকেই জানেন উত্তাপের আদান প্রদানেই এই সংসার চলিতেছে। একথণ্ড উত্তপ্ত লৌহ কিয়ৎক্ষণ বাতাসে রাখিয়া দিলেই উহা শীতল হইয়া যায়। বায়ু লৌহকে উত্তাপ দিতেছে, লৌহ ও বায়ুকে উত্তাপ দিতেছে। কিন্তু লৌহ

† বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ‘ব্যবস্থার সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার’ প্রথমভাগ—আমিষ ভক্ষণ।

যে পরিমাণে উত্তাপ দিতেছে সে পরিমাণে পাইতেছে না—এই জন্যই উহা শীতল হইয়া যায়। পৃথিবীর সর্বত্রই এই নিয়ম—উত্তাপের আদান প্রদান। সূর্য্য পৃথিবীকে উত্তাপ দিতেছে, পৃথিবীও সূর্য্যকে উত্তাপ দিতেছে। সূর্য্যতঃ ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব যে এমন সময় আসিবে যখন সূর্য্য অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া যাইবে এবং পৃথিবীও অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত হইবে। সূর্য্যের ও পৃথিবীর তখন সমান উত্তাপ হইবে। তখন আর উত্তাপের আদান প্রদানে পৃথিবী চলিবে না। সূর্য্যতঃ তখন আমাদের মত প্রাণী আর এ পৃথিবীতে নীলা খেলা করিবে না। এই সংসার তখন কোন নূতনজীবের জন্মস্থল হইবে। আমরা তাহাদিগের জন্ম দিয়া এ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িব। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যে জীব ভবিষ্যতে আমাদের মত প্রাণী হইবে, তাহারা যদি আমাদের মত হইতে তিন্ন হয় তাহা হইলে আমরা তাহাদিগের ভবিষ্যত, তাহাদিগের হইতে আমরা কেন তিন্ন না হইব? বিজ্ঞানবিৎ টিন্ডল্ সাহেব বলিয়াছেন, যে যখন দেখা যাইতেছে মনুষ্যের আকার কমিতেছে, পরমাণু কমিতেছে, কিন্তু বুদ্ধি বাড়িতেছে, ইহাতে কি অনুমান হয় না, যে ভবিষ্যতে শরীর শূন্য জ্ঞানময় জীব সকল (Intellectual beings) এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে?*

* টিন্ডল্ সাহেবের অনুমানের স-

একপেছন হয় ত পাঠক বুঝিয়াছেন যে, সম্পূর্ণ পরিবর্তন অসম্ভব নহে । আমরা আর একটি আপত্তির উল্লেখ করিব। সেটি এই,—কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পশ্চিম, শিক্ষার, বা অন্য কোন উপায়ে যেন একজনের মানসিক পরিবর্তন সম্ভব-
 তিত হয়, কিন্তু কোন্ হিসাবে সম্ভানের মানসিক গঠন পিতার মত হয় ? ব্যাক্তকে শস্য খাওয়াইয়া, গৃহপালিত করিয়া তাহার জিহ্বাসা প্রকৃতিকে বলহীন করিলাম যেন, কিন্তু কোন হিসাবে তাহার সম্ভান, স্বাভাভীয় স্বাভাভিক হিংসাপ্রকৃতিকে লাভ না করিয়া জন্মদাতার কোমল মনস্তত্ত্বনিচয়কে অসুক্রমণ করিবে ? বিবেচ্যাসভ্যতা সম্বন্ধে পাঠক স্বয়ং বিচার করিবেন। মনুষ্যের আকার ও পরমাসু সম্বন্ধে আমরাদিগের দেশীয় দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিলাম । সত্যসুগে “ মজ্জাগতাঃ প্রাণাঃ ইচ্ছাসুভূতাঃ একবিংশতি হস্তপরিমিতো মানবদেহঃ দশবর্ষং পরমাসুঃ । ” ত্রেতার “ অস্থিগতাঃ প্রাণাঃ চতুর্দশহস্তপরিমিতো মানবদেহঃ । দশম সহস্রবর্ষং পরমাসুঃ ” ষাণ্মেরে বক্তৃগতাপ্রাণাঃ সপ্তহস্তপরিমিতো মানবদেহঃ সহস্রাব্দ পরমাসু । ” কলিযুগে “ অন্নগতাঃ প্রাণাঃ সার্কত্রিহস্তপরিমিতো মানবদেহঃ বিংশত্যাধিকশতবর্ষ পরমাসু । ” ভাগবতে লিখিত আছে, কলিতে “ অর্থ একপাদঃ । অর্থশততুপাদঃ । আসুঃ শতবর্ষাণি । রাজানশ্চ প্রজাত-
 ক্যঃ । ” শেষ কথাটি বড় মিথ্যা নয় ।

চনা করিলে পাঠক দেখিবেন, এই আপত্তিতে কিছুমাত্র সার নাই । সম্ভান পিতার মানসিক বৃত্তিনিচয়ের উত্তরাধিকারী হইবে, ইহা কিছু সূতন কথা নহে । সম্ভানের আন্তরিক গঠন জন্মদাতার আন্তরিক গঠনের মতই হইয়া থাকে, ইহাই সংসারের নিয়ম । আমরা উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । কোন ভ্রমলোকের এইরূপ অভ্যাস ছিল যে, যখন সে গভীর নিদ্রা যাইত, সেই সময়ে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধীরে ধীরে উঠিত । এবং অত্যন্ত উচ্চ হইলে প্রবলবেগে তাঁহার নাসিকার উপরে পড়িত । মাঝে মাঝে এইরূপ ঘটিত, এমন কি, ইচ্ছাতে প্রায়ই নাসিকাতে আঘাতজনিত বেদনা হইত এবং বেদনা বৃদ্ধির ভয়ে সময়ে সময়ে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার হস্ত বাধিয়া দিতে বাধ্য হইতেন । এই ভ্রমলোকের একপুত্র কলির শেষে মনুষ্য “ ব্রহ্মকায় ” হইবে ইহাও লিখিত আছে । পুনশ্চ “ ত্রিংশ-
 ষ্টিশতবর্ষাণি পরমাসুঃ কলৌ সৃগাং । ” আমরাদিগের দেশে “ এর পরে বেগুন গাছে আঁকশী (কোটা) দিতে হবে ” বলিয়া একটি পৌরাণিকী কথা (কাহার কাহার মতে প্রবাদ) যে প্রচলিত আছে, তাহা বোধ করি মিতান্ত অশ্রদ্ধের নহে । টিনডল সাহেবের মত তাঁহার উত্থাপ সম্বন্ধীয় বক্তৃত্যচরে বিশিষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; বাহার ইচ্ছা হয় খুলিয়া দেখিবেন ।

শিক্ষার এই কুসভ্যাসের উত্তরাধিকারী হয়। এই পুঞ্জের আবার এক কন্যা জন্মে, সেও গভীর নিদ্রাকালে ঐরূপ অভ্যাসের বশবর্তী হইত (১)। এইরূপ আরও অনেক ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং দ্বিতীয় আপত্তির মূলচ্ছেদ হইল।

অতএব ইহা সপ্রমাণিত হইতেছে যে, সময়ে মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন একবারে বা একপুঙ্খবে ঘটিতে পারে না। একজন সভ্য ব্যক্তির পরিবর্তন তাঁহার পূর্বতন শত শত পুঙ্খ কর্তৃক সমগ্রায়ুসারে সংঘটিত হইয়া আসিয়াছে; আর আমেরিকার একজন অসভ্যের এরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই, কারণ তাঁহার পূর্বতন শত শত পুঙ্খ লেখা পড়া করিয়া বা অন্য কোন প্রকারে মানসিক পরিবর্তনের চেষ্টা করে নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে সেই সভ্য ও সেই অসভ্য মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা কোনরূপেই একপুঙ্খবে লোপ পাইবার নহে। অসভ্য যতই কেন চেষ্টা করুক না, সভ্যের মত তাঁহার মানসিক পরিবর্তন কখনই হইবে না। কারণ যাহার জন্মকর্ত শত বংশের প্রয়োজন, তাহা

(১) এই গল্পটি ডারউইন কৃত "Expressions of the Emotions" নামক পুস্তকে পাওয়া গিয়াছে। গল্পটিও তাঁহার নিজের নহে। পুস্তকখানি আমাদের মত একটু এক্ষেত্রে নাই; থাকিলে অবিকল অনুবাদ করিয়া দিতাম।

কি একজন্মের চেঁচায় ঘটা সম্ভবপর? সুতরাং সভ্য ও অসভ্য যে প্রভেদ, সে প্রভেদ আমরা দেখিলাম শিক্ষাজনিত প্রভেদ। কিন্তু সে শিক্ষা ব্যক্তিগত নহে, পুঙ্খগত।

এই জন্যই আমরা পূর্বে যে পণ্ডিতের মত উল্লেখ করিয়াছি, সেটিকে ঠিক সভ্য নহে বলিয়াছি। সে মতটিকে আমরা মিথ্যা বলি নাই; কারণ আমাদের বিখ্যাত সমাজের বৈলক্ষণ্য শিক্ষাপ্রসাদাৎ—কিন্তু সে শিক্ষা ব্যক্তিগত নহে, বংশগত।

আমাদিগের কথার যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য আমরা কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

(৩) সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী লেপ্টেন্যান্ট ওয়ালপোল সাহেব লিখিয়াছেন যে, স্যাণ্ডউইচ দ্বীপবাসী ছাত্রদিগের সম্বন্ধে তাহাদিগের শিক্ষকেরা এইরূপ বলেন;—প্রথম প্রথম তাহাদিগকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়। যতদিন সাধারণ এবং সহজ বিষয় সকল শিক্ষিত হইতে থাকে, ততদিন সকল কথাই তাহাদিগের কণ্ঠস্থ হয়। কিন্তু যেমন শিক্ষিত বিষয়গুলি গভীরতর হইতে থাকে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের বুদ্ধির এবং চিন্তার লব্ধতা সপ্রমাণিত হয় *।

* সকল দৃষ্টান্তগুলি স্পেন্সার কৃত "Principles of Psychology" দ্বিতীয় মুদ্রাকরণ, প্রথমখণ্ড হইতে গৃহীত হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়া সঙ্ঘেও এই বিষয় লিখিত আছে ।

(২) আমেরিকার নিগ্রোবালক এবং ইংরাজসম্ভানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় নির্দিষ্ট আছে । ইহার বিশেষ কারণ এই যে, প্রথম প্রথম নিগ্রোরা ইংরাজতনের সঙ্গে শিক্ষাসঙ্ঘে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেও কিসদূর গিয়া তাহাদের বুদ্ধির আর বিকাশ পায় না । এমন স্থলে আ-

সিয়া দাঁড়ায় যে, সেই স্থল হইতে ইংরাজ-সম্ভানের সহিত একত্রে আর পদক্ষেপ তাহাদের পক্ষে সুকঠিন হয় ।

আণ্ডামান ও মবজিলাও সঙ্ঘেও এই রূপ কথিত আছে ।

অন্যদেশীয় হিন্দুদিগের বিদ্যালয় সঙ্ঘেও এইরূপ একটি অপবাদ আছে ।



বিষকন্যা ও বিধবা রমণী ।

আমরা ‘মুক্তারাক্ষস’ পড়িবার সময় একটি আশ্চর্য্য কথা পাঠিয়াছিলাম ।

‘রাক্ষসমন্ত্রী, চন্দ্রগুপ্তের বধার্থ এ-কটি পরম সুন্দরী কন্যা প্রেরণ করিলেন, চাণক্য তাহাকে দূরীভূত করিয়া দিলেন । রাক্ষসের অভিসন্ধি যে, রাজা সেই কন্যার রূপ লাভণো মোহিত হইয়া তাহাতে আসক্ত হইবেন, সুতরাং শীঘ্র শীঘ্রই তাঁহার দেহ জীর্ণশীর্ণ হইয়া রক্ত হইবে । এদিকে চাণক্য পণ্ডিতও ভেমনি ;—সেই সুবভি-শরীরের স্বর্ণ পান করিয়া একটি শ্বেদতুক মক্ষিকা প্রাণত্যাগ করিল, তাহা দেখিয়া তিনি তাহাকে ‘বিষকন্যা’ স্থির করিয়া তৎকণাৎ দূরীভূত করিয়া দিলেন ।’

এই অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব অসম্ভবপ্রায় অংশটুকু পাঠ করিয়া মন চমকিয়া উঠিল । ভাবিতে লাগিলাম, এ কি অসম্ভব

কথা !—নাটকের মধ্যেও এত অসম্ভব বলি বিন্যাস !—অপার ভাবনা-সমুদ্র গ-জ্জন করিয়া উঠিল, অনবরত চিন্তা-স্রোত বহিতে লাগিল, আর কত রকমের কল্পনা ভাসিয়া আসিতে লাগিল । কতক পরি-তাগ করিলাম, কতক সঞ্চয় করিলাম, কতক আরও বা ধরিতে পারিলামনা, ভা-সিয়া গেল । যেগুলি সঞ্চয় করিয়াছিলাম, কোন আত্মীরের অনুরোধে আজ তাহা প্রকাশ করিলাম । ‘বিষকন্যা ও বিধবা রমণী’ এই মুকুট পরাইয়া বাহির করিলাম । ইহাতে যদি কাহারও অস্ত্রে আঘাত লাগে, কি করিব ? উদ্বৃত্ত যৌবন-রস যাহাদের শরীরে ধরিতেছে না ; যেন ওষ্ঠ, গণ্ড কাটিয়া বাহির হইতে আসি-তেছে, তাঁহাদের কিছুতেই বেদনা লাগে না । সুতরাং আমার এই প্রাণপতুল্য প্র-

বন্ধুটি তাঁহাদিগের নিকট নিরপরাধী।

১ম।—যখন ধমনীতে যৌবনরসের স্রোত বহিতে থাকে, তখন নহে; এক-টুকু বেগ হ্রাস হইয়া আসিলে অনেকেরই অনুভব হয় যে শরীরটা কেবল মলময়। কতকটা খাণ্ড জ্বরের বিকার মাত্র; শ্বেদ, ক্লেশ, দৌর্গন্ধা, শিঙ্ঘাণ প্রভৃতি বিবিধ বিকৃত মলে পরিপূর্ণ। সেই জন্যই বৌদ্ধ দার্শনিকেরা ইহাকে ‘পুন্দাল’ সংজ্ঞা দিয়াছেন। কখন পুড়িতেছে কখন বা গলিতেছে।

২য়।—শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, যে মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার মলেই ক্ষতিকারক পদার্থ আছে। অভ্যন্তরের দূষিত বা বিবাক্ত পদার্থ সকল ঘর্ম্ম দ্বারা, নিশ্বাস দ্বারা ও বিষ্ঠা মুত্রের দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়। দৈহিক উষ্ণতাও অন্যের শরীরে ক্ষতিকারক বা ধাতু দূষক হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রবেশ করিলে তাহাও ক্রমে ক্রমে শরীরের হানি আনয়ন করে! অধিক কি—‘দেহাঙ্কেব চূতা মলাঃ’ বাহা বাহা দেহ হইতে প্রচ্যুত হয়, তাহা তাহাই মল এবং তাহা তাহাই ক্ষতিকারক। তবে যে আপনার মল আপনার অনিষ্টকারক হয় না, আত্মদেহের পুত্তিত্ব আত্মার হানি আনয়ন করেনা তাহার কারণ আছে। কি কারণ? স্বাস্থ্য প্রাপ্তি। বৈদ্যাশাস্ত্রে লিখিত আছে, ‘বিষযপি স্বাস্থ্যাগতং হস্তাৎ’ বিষও স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইলে নাশক

হয় না। স্বাস্থ্য শব্দের অর্থ কি? দৃঢ় অভ্যাস। যাহাকে ভাষায় সহ্য হওয়া বলে তাহারই সংস্কৃত নাম স্বাস্থ্য। এই স্বাস্থ্যের মহিমা বুঝা ভার।

স্বাবর বিষে (কাঠ বিষে) কীট জন্মে। কিন্তু সে বিষ তাহার হানি করেনা। কেননা তাহা তাহার স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই বিষ যদি অন্য কীটের শরীর স্পর্শ করিতে পায় তবে সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আত্ম প্রভাব দেখাইবে মন্দেহ নাই। অতএব বিষ যখন স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইলে ক্ষতিকারক হয় না, তখন আর স্বাস্থ্য প্রাপ্ত শ্বেদ, দৌর্গন্ধা, উষ্ণনিশ্বাস প্রভৃতি ক্ষতিকারক হইবে কেন? অন্যেরই বা না হইবে কেন? ৩য়।—পলাণ্ডুকদিগের শরীরে এক প্রকার গন্ধ, মাংসাদ মনুষ্যদিগের গাত্রে এক প্রকার গন্ধ, উদ্ভিজ্জৈতাজীদিগের শরীরে আর এক প্রকার গন্ধ, তাহা শ্বেদজ গন্ধ—সকলকারই স্ব স্ব শ্বেদ গন্ধাদি সহ্য হইয়া গিয়াছে। এই নিমিত্ত তাহা তাহাদের অনিষ্ট করিতে পারে না। বিষ্মুত্রের গন্ধ মৈত্রহর (মেথর) দিগের স্বাস্থ্য হইয়া গিয়াছে। সেই কারণে উহা তাহাদিগকে ক্লেশ দিতে পারে না। কিন্তু যাহা তাহার স্বাস্থ্যাগত হয় নাই, অবশ্যই তাহা তাহার হানিকারক হইবে।

৪র্থ।—মনুষ্যদেহের রস রক্তাদি ও অন্ন মলাদির পরিণামে দোষ জন্মে। তাহা ঘর্ম্মাদি দ্বারা বাহির হইয়া যায়,

ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু মমু ও শূদ্রগত বলেন যে, কোন কোন মমুয়ের মূলে অর্থাৎ শূদ্র শোণিতের সংযোগ কালে এমন কোন দোষ ঘটনা হইতে পারে যে তাহার প্রভাবে মমুয়ের আমরণ দেহের বিবাক্ততা থাকিতে পারে। এমন অনেক দেখা গিয়াছে যে, উদ্ভিজ্জ মাত্র ভোজন করে, অমুলেপন সেবা করে, তথাপি তাহার দেহের বিকট গন্ধ দূর হয় না। কাহার কাহার গাত্র হইতে কার গন্ধ বহির্গত হয়। কাহার গাত্রে পাখীর গন্ধ, কাহার ও বা মুখে, নিশ্বাসে, কক প্রভৃতি বর্ষজীব অঙ্গে পুতি গন্ধ থাকে। তাহা কিছুতেই যায় না। কেন? তাহা তাহাদের বর্তমান অন্ন-পানাদি পরিণামের ফল নহে। বৈজ্ঞিক, গর্ভিক পরিণামের ফল। এইরূপ দোষ না ঘটে এই অভিপ্রায়ে হিন্দুদিগের মধ্যে শরীরের উপর দশবিধ সংস্কার করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

৫ম।—শ্বেদ, ক্লেদ, তাপ, নিশ্বাস, জ্বন্তগ, নেত্রতেজ * প্রভৃতিতে যদি শরীরের ক্ষতিকারক পদার্থ থাকিল—তবেইত

* মেন্দ্র তেজ ও প্রাণনাশক আছে। আশীবিধ আর দৃষ্টিবিধ এই দ্বিবিধ জীব তীর্থাক-বোনি মধ্যেই দৃষ্ট হয়। দৃষ্টিবিধ জীবের নেত্রতেজ অসহ্য। ইহার সংযোগ-মাত্র তর, কণ্ঠ, জড়তা প্রভৃতি সমস্তই ঘটনা থাকে।

সর্বনাশ। কেমন করিয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করা যায়।

৬ষ্ঠ।—‘ একজনের গাত্রে আর একজনে নিশ্বাস ফেলিলে দোষ হয়।’ ‘ হাঁই তুলিয়া দিলে দোষ হয়।’ ‘ নিত্রিত ব্যক্তি গাত্রে অগ্নিষ্ট হইয়া পড়িলে দোষ হয়।’ ‘ অন্যের গাত্রে ঘাম পুঁছিয়া দিলে তাহার পীড়া হয়’ এই সকল জনপ্রবাদ কি সত্য? হইতে পারে।

৭ম।—এরূপ দেখা গিয়াছে যে, একজনের গাত্রমার্জ্জনী ব্যবহার করিয়া অন্যজনের কণ্ঠ দক্ষ বা বিচর্চিকা রোগ জন্মিয়াছে। একজনের সহিত নিতা সহবাস করিয়া অন্যজন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। একজনের সহিত সর্বদা চোকো চোকি থাকিয়া আর একজন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। শাস্ত্রেও দেখা যায় ‘ যানৎবস্ত্র মলকারং জায়াহপত্যং কমণ্ডলুম্। আত্মনঃ শুচিরে তানি ন পরেষাং কদাচন।’ ‘ দর্শনারিত্যসংবাসান্দোষমাক্রম্য তিষ্ঠতি’ ‘ সংসর্গজা দোষ গুণা ভবন্তি’ ‘ শরীর-তৈজঃকর্ম্মদোষরণ্যোহপি ক্লিশ্যতে কচিৎ’ ইত্যাদি।

৮ম। এক শরীরের সহিত অন্য শরীরের এরূপ কঠোর সম্বন্ধ যদি সত্য সত্য হইত, তবে ত অন্যের শরীর লইয়া আশ্রয় ক্রীড়া করা বড় সাবধানের কার্য। আমরা যে নারী দেখ লইয়া, পুত্র দেখ লইয়া সর্বদাই আশ্রয় ক্রীড়া করি, তাহাতে কি আমাদের কোন ক্ষতি হইতেছে

না? জগদীশ্বর কি রোগ, তাপ, জ্বর, জীর্ণতা প্রবেশ করাইবার জন্যই নারীদেহ-সমালোচকরূপ অলক্ষ্য দ্বার প্রস্তুত রাখিয়াছেন? এসকল যদি অংশতঃ সত্য হয়, তাহা হইলে মুদ্রারাক্ষসের বিধকন্যাও সত্য হইতে পারে। মুদ্রারাক্ষসের কথা সত্য হইলেই বিজাট।

১৫। আমি বাল্যকালে বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম। বাল্যবিবাহের একদিকে দোষ একদিকে গুণ। দোষ এই যে,—

‘উনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদাধতে পুমান্গর্ভং কুক্ষিভঃ স বিপত্নতো।
জাতো বা ন চিরঞ্জীবেৎ জীয়েষা দুর্ভ-
লেস্তিন্নঃ।
তস্মাদত্যশুবানায়ঃ গর্ভাধানং ন কার-
য়েৎ ॥’

ষোড়শ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা নারীর অপ্রাপ্ত পঞ্চবিংশবর্ষ বয়স্ক পুরুষের বিজ্ঞে গর্ভ হইলে সে সন্তান বাঁচে না। যদি বাঁচে দীর্ঘজীবী হয় না। যদিও দীর্ঘজীবী হয়, তথাপি তাহার ইন্দ্রিয় সকল অতি দুর্কল অবস্থার হইবে। এই ত বাল্যবিবাহের দোষ। কিন্তু গুণ কি? না স্বাস্থ্য-লাভ। আমি ১৬ বৎসর বয়সে অষ্টম বর্ষীয়া কুমারী বিবাহ করিয়াছিলাম। তাহার বঙ্গ, শয্যা, নিশ্বাস, গাত্রতাপ, নেত্রভেজ, শর্মা প্রভৃতি আমার ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ্য হইয়া গিয়াছিল। আমার শরীরের দোষগুণও তাঁহার স্বাস্থ্য হইয়াছিল।

তাঁহার দোষ তীব্র হইলে হয়ত তাহা আমার সহ্য হইত না এবং আমার দোষ তীব্র হইলেও হয়ত তাঁহার সহ্য হইত না। এরূপ পরস্পর সামঞ্জস্য না হইলে হয়ত তাঁহাকে পতিঘাতিনী বিধবা হইতে হইত, নতুবা আমাকে ‘মাগ খেকো দোজোবর’ বলিয়া গালি খাইতে হইত। অন্ততঃ মলিন, ক্লশ, জীর্ণ শীর্ণ হইয়া থাকিতে হইত। এমন দেখা গিয়াছে, পূর্বে ভাল ছিল, পরে দোষবহুল নারীর নিশ্বাসে শুকাইয়া গিয়াছে। না হয়, বিবর্ণ, বিশীর্ণ, কম্পম্ভাব, মতিচ্ছন্ন, হইয়া গিয়াছে। আবার ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে, পূর্বে কম ভূম ছিল, বিবাহের পরে সে দিব্য নৈকজ্যা লাভ করিয়াছে এবং বুদ্ধিমানও হইয়াছে। শরীরের দোষের ন্যায় গুণও আছে। বিধকন্যা এবং অমৃতকন্যাও আছে। বিষপুঙ্ঘ ও অমৃতপুঙ্ঘও আছে। যাহা হউক, আমরাদিগের এক প্রকার সহ্য হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যাহারা বিধবা বিবাহ করিবেন, তাহাদের কি এই বিষয় একটুকু সাবধান হওয়া উচিত নয়? স্বামী, নীজের দোষেও মরিতে পারে, ভার্যার দোষেও মরিতে পারে। যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বামী তাহার ভার্যার বিষাক্ততা প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে, তবেই ত শকার বিষয়। অতএব বিবাহের পূর্বে অন্ততঃ ইহা দেখা উচিত যে বিধবার স্বামী কিরূপ অবস্থায় কত দিন ভোগ করিয়া মরিয়াছে। অনুপভুক্ত্য সুবতী বিধ-

থাকে বিবাহ করিতে ভয় হয়,যেহেতু তাদৃশ সম্পত্তির দোষ গুণের স্বাস্থ্যাসম্পাদন করিবার সময় নাই । নিশ্চিন্তিবন্ধক বিশেষতঃ সে অবস্থাটি অর্থের্ষ্যের অবস্থা । যদি কাহারও ভীতদোষ থাকে, তাহা হইলে হয় ত Honeymoon এর মধ্যেই অন্যতরের অনিষ্ট ঘটনা উঠিবে ।

১০ম । যদি বিধবা বিবাহ করিতে হয়, একটুকু সাবধান হইয়া করাই উচিত। বিধবা রমণী দেখিতে অপসার মত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার গুণে হয় ত বিষ মিশ্রিত থাকিতে পারে । শাস্ত্রকারেরা বলেন, ‘তাসামমৃতভোজিত্বাৎ শ্বেদ-ক্লেদ-সৌন্দর্য্য-বিষ-খাসাদিরাহিত্যম্ ।’ অপসারার অমৃতভোজিনী বলিয়া তাঁহাদের শ্বেদ ক্লেদাদি নাই, তাঁহাদের নিখাসেও বিষ নাই । কিন্তু মনুষ্যরমণীদিগের তাহা আছে । অতএব সাবধান—যেন বিধবাক্রমে পতিষাতিনী বিবাহ না কর । পতিপুত্রষাতিনীকে শাস্ত্রকারেরা ‘অবীরা’ সংজ্ঞার আস্থান করিয়া থাকেন ।

যে রমণীর বাতাসে স্বামী শুকাইয়া যায়, জীর্ণশীর্ণ হইয়া দেহভাগ করে, যাহার জোড়ের শিশু মূর্ছশুক হইয়া জীবন বিসর্জন করে,ভুবনমোহিনী হইলেও তিনি

অবীরা, পতিষাতিনী, পুত্রষাতিনী । শাস্ত্রকারেরা ইহার হস্তের অন্ন খাইতেও নিষেধ করিয়াছেন ।

যে নারীর দেহে বিষাক্ততাদোষের অস্পতা আছে, অথবা কিঞ্চিৎ অমৃতত্ব আছে, শাস্ত্রকারেরা অনুমান করিয়া তাহার কতকগুলি লক্ষণ লিখিয়া গিয়াছেন । বিষ থাকিলেও তাহা কেমন পুরুষে সহ্য করিতে পারিবে তাহাও লিখিয়া গিয়াছেন ।

“নোহহেৎ কপিলাং কন্যাং

নাথিকাদীং ন লোমিনীম্ । ইত্যাদি ।

বড় দুঃখিত হইলাম যে, শ্লোকগুলি সংগ্রহ করি নাই । যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, আবার সংগ্রহ করিয়া উপহার দিব । একগুণে নিবেদন এই যে, যদি কেহ গর্ভিতা অবীরা পার্ঠিকা থাকেন, তাঁহারা যেন প্রবন্ধলেখকের উপর ক্রোধ না করেন । দুঃখিনী পার্ঠিকা থাকেন, আমি তাঁহাকে বেদনা দিলাম এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি । সকলই স্বভাবের কার্য । পতিপ্রণয়িনী পার্ঠিকাদিগকেও বলিতেছি, বিষ নাই বলিয়া অহঙ্কারে তুৎকারে মীটমটে হইবেন না !

শ্রীক।—

হিন্দুভূগোল।

প্রথম প্রস্তাব—পৌরাণিক।

বকল বিলক্ষণরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, দেশের নৈসর্গিক অবস্থা, অর্থাৎ জল বায়ুর উষ্ণতা ও শীতলতা, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, প্রকৃতির দ্বারা দেশস্থ লোকের চরিত্র গঠিত হয়। ভারতে সর্বকালে প্রকৃতি অতি উদার—প্রকৃতি যেন কম্পিতক হইয়া শত হস্তে ভারতকে স্বীয় সম্পত্তি বিতরণ করিয়াছেন। এদেশস্থ ভূমি এত উর্বর যে অল্পমাত্র পরিশ্রমেই প্রত্যেক পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হইয়া থাকে। এইক্ষণ নানা কারণে এদেশ নিরন্ন ও দরিদ্র হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্বে এদেশ প্রভূত ধনের আধার ছিল; এমনকি ঐশ্বর্য্য প্রভাবে এদেশ ‘স্বর্গভূমি’ ও ‘রত্ন গর্ভা’ প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়াছিল।

যখন দেশে প্রভূত ধন সঞ্চিত হয়, তখন সর্ব শ্রেণীস্থ সকল লোকের পরিশ্রম করিবার আবশ্যতা থাকেনা। তখন স্বতন্ত্র এক শ্রেণীর লোক হন, তাঁহারা জীবনের অধিকতর সময়ই আমোদ আক্লাদে অতিবাহিত করেন; তন্মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি জ্ঞানচর্চার মনোনিবেশ করেন। ভারতবর্ষস্থ প্রাচীন

স্ববিগণ এই শ্রেণীস্থ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা বিদ্যার উন্নতি বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া, বাহ্যজগত পরিভ্রমণ পূর্বক অন্তর্জগতেই মানসিক শক্তির পরিচালনা করিতেন। এরূপ করিবার যথেষ্ট কারণও ছিল। কারণ যেদেশে অল্প পরিশ্রম বা বিনা পরিশ্রমে জীবিকা নির্বাহ হইতে পারে, সেদেশে বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা সম্পাদনে লোকের তত প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইলেই বৈজ্ঞানিক সম্বলের প্রয়োজন, যেদেশে প্রকৃতি বিনা যুদ্ধে পরাজিতা দাসীর ন্যায় আজীবন, সেদেশে তদ্রূপ সম্বলের আবশ্যিকতা কি? আর একটি কারণ আছে। বকল স্পেন দেশের অবস্থা বিচার করিতে যাইয়া তথায় ধর্মভাবের এত প্রাধান্য ও যাজক সম্প্রদায়ের এত আধিপত্যের কারণ এই নির্দেশ করিয়াছেন যে, সেখানে প্রকৃতির মূর্তি এত ভয়াবহ যে লোকে স্বভাবতঃই ভীত হয়, এবং সেই সকল মূর্তিকে সাক্ষাৎ দেবমূর্তি বলিয়া নির্দেশ করে। যে কারণে স্পেনে অর্থাৎ ধর্ম বিখ্যাসের এত প্রাবল্য, তাদৃশ কারণ এখানে বহুল পরিমাণেই পূর্বাধি বর্তমান,

নৃত্যরূপে প্রাচীন মহর্ষিগণ বিজ্ঞানের চর্চা না করিয়া ধর্মশাস্ত্র ও মনস্তত্ত্বেরই উন্নতি সাধনে জীবন যাপন করিয়াছেন। শুদ্ধ বিজ্ঞান নহে, বিজ্ঞানের সহিত নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতির প্রতিও তাঁহারা কিছুমাত্র মনোযোগ করেন নাই। পুরাণাদিতে এই দুই বিষয়ের যে কিস্তিও চেষ্টা দেখা যায়, তাহা এত কুসংস্কার ও কল্পিতভাবে পরিপূর্ণ যে তাহা হইতে সত্য উপলব্ধি করা যায় না।

এস্থলে একটি কথা বলা প্রয়োজন। আজ কালি এদেশে অনেক স্বদেশহিতৈষী জন্মিয়াছেন, তাঁহারা ন্যায় হৌক বা অন্যায় হৌক, সঙ্গত হৌক, বা অসঙ্গত হৌক, সর্ববিষয়ে এদেশের গৌরব বাড়াইতে ক্রটি করেন না। যে কোন নূতন তত্ত্বের কথা হৌক না কেন, তাঁহারা অস্বাভাবিকভাবে কহিবেন, ইহা ভারতে অনেক পূর্বে প্রচলিত ছিল। অধিক কি ভারতে মুদ্রায়ন্ত্র ও কামানের ব্যবহার পর্যন্ত প্রমাণ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না। তাঁহাদিগের চেষ্টা মহতী, মনের ভাব উৎকৃষ্ট, তজ্জন্য তাহাদিগকে সম্বাদন করি। কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন না হওয়াতে তাহাদিগের পশ্চাদনুসরণে সাহসী হইতে পারি না। আমরা অন্য যে প্রস্তাবটির অবতারণা করিতেছি, অনেক দিন তাহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু আধুনিক বাস্তব-বৃত্তান্তের সহিত এগুলির সামঞ্জস্য প্রদ-

র্শনে এতদিন রূপা চেষ্টা করিয়াছি। যাহা হৌক, প্রাচীন পণ্ডিতদিগের ভৌগোলিক মতের সারাংশ নিম্নে একটন করা যাইতেছে; যদি ভারতহিতৈষীগণ আধুনিক ভূগোলের সহিত হইার সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন, পরম আপায়িত হইব।

পুরাণে সপ্ত সর্গ ও সপ্ত পাতাল অর্থাৎ চতুর্দশ ভুবনের * বর্ণনা আছে। তন্মধ্যে সর্বলোকের অধিষ্ঠানভূতা এইয়ে পৃথিবী, ইহাই ভুলোক নামে খ্যাত। বিষ্ণুপুরাণে ভুলোকের এইরূপ বর্ণনা আছে;—

‘পঞ্চাশৎকোটিবিস্তারা সেরমুর্কি মহামুনে।
সপ্ততিশ্চ মহজাগি বিষ্ণোচ্ছারোপি ক-
থাতে ॥’

অর্থাৎ পৃথিবীর বিস্তার পঞ্চাশৎ কোটি যোজন, এবং ইহার উচ্চায় (উচ্চতা) সপ্ততি মহজ যোজন। পরন্তু লিঙ্গপুরাণে—
‘পঞ্চাশৎকোটিবিস্তীর্ণা সমমুদ্রাধরা স্মৃতা।
দ্বীপৈশ্চ সপ্তভিযুক্তা লোকালোকায়তা
শুভা।’

অর্থাৎ এই পঞ্চাশৎ কোটি যোজনের †

* ভুলোকোথ ভুবলোকঃ স্বলোকশ্চ
প্রকীর্তিতঃ। মহর্জনস্তুপশ্চৈব সত্যালোকশ্চ
সপ্তমঃ। ইতি শিব পুরাণে ॥ অতলং
বিতলং তলাতলং মহাতলং রসাতলং পা-
তালমিতি ॥ ইতি ঐমস্তাগবতে।

† চতুর্হস্তীধনুস্তস্য মহজাগে ক্রোশ উ-
চ্চাতে। ক্রোশধরস্ত গনুতিদ্বয়ং যো-
জনং বিদুঃ ॥ ইতি যোগিনীতন্ত্রে।

মধ্যেই সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্র আছে। পু-
নশ্চ বৈষ্ণব পুরাণে—

‘পাদগম্যাক্ত যৎকিঞ্চিৎস্বস্তি ধরনীময়ং ।
সৰ্ভুলোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোস্য ম-
য়োদিতঃ ॥’

অর্থাৎ পূর্বোক্ত আয়তনের মধ্যে যে যে
বস্তু পদচালনের যোগ্য ও পৃথিবীময়
আছে, তাহারই নাম ভুলোক। অতঃপর
পৌরাণিকেরা প্রাণুক্ত সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বী-
পের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার বিবরণ
করা যাইতেছে। তৎপূর্বে একটি কথা
বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। পৌরা-
ণিক ভূরতাস্ত্রের সহিত আধুনিক ভূরতাস্ত্রের
ভুলনা করা যে বিড়ম্বনা মাত্র, একটি
মাত্র দৃষ্টান্তের দ্বারাই পাঠক তাহা বু-
ঝিতে পারিবেন। আধুনিক গণনানু-
সারে পৃথিবীর ব্যাস ৭৯১২ মাইল, বা
৩৯৫৬ কোশ, স্তত্রয়াং উহার বিস্তার প্রায়
১১৭১৯ কোশ, কিন্তু পৌরাণিক গণনা-
নুসারে ২,০০০,০০০,০০০ কোশ। এরূপ
স্থলে ভুলনা করিতে যাওয়াই বাতুলতা
মাত্র।

কম্পনা-নিমগ্ন ধ্যানরত মহর্ষিগণ নয়ন
মুদ্রিত করিয়া, নিবিড় নিভৃত বনমধ্যে উ-
পবেশন পূর্বক, পৃথিবীর জল ও স্থলভা-
গের যে বিবরণ প্রকটন করিয়াছেন, তাহা
ড্রেক কুক, প্রকৃতির জানিবার সম্ভাবনাকি ?
ফলকথা, তাহা আকাশকুপুমবৎ অলীক
পদার্থ, বর্থাৎ ভূগোলের সহিত তাহার
কোনও সম্বন্ধ নাই। যদি কেহ বলিতে

চাহেন যে এশিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা,
আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, পলিনেশিয়া ও
ওসনিকা, এই সপ্তভূভাগের সহিত পৌ-
রাণিকদিগের সপ্তদ্বীপের মিল আছে;
তাঁহাকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া আ-
মরা অনাস্থানে চলিয়া যাইব। কারণ
উদ্ঘাটের নিকটস্থ হওয়া অবিধেয়। আ-
মরা কেন যে এরূপ কথা বলিতেছি, পা-
ঠক একবার সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্রের বিব-
রণ পাঠ করুন, তবেই বুঝিতে পারিবেন।

সপ্তদ্বীপের নাম যথা,—জম্বু, প্লক,
শ্যামলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর।
আর লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও
জল এই সপ্তসমুদ্র।*

‘জম্বুদ্বীপঃ সমস্তানামেতেবাং মহ্যসংস্থিতঃ।’

জম্বুদ্বীপ সপ্তসমুদ্র ও ছয় দ্বীপের ম-
ধ্যভাগে সংস্থাপিত। এই দ্বীপে একটি
জম্বুরক্ষ আছে, তাহার ফলের নামানু-
সারে এই দ্বীপের নাম হইয়াছে—

‘জম্বুদ্বীপস্য সাজম্বুর্নামেহেতুর্মহামুনে।’
অপর ছয়টি দ্বীপের নামও তত্তৎদ্বীপস্থিত
রক্ষবিশেষের নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
শৈবপুরাণে যথা—

* জম্বুপ্লকাস্বয়ৌ দ্বীপৌ শাম্যালি-
শ্যাপরোবিজ। কুশঃক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ
পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ ॥ এতেদ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্ত
সপ্ত সপ্তভিরাবতাঃ। লবণেক্সু সুরাসর্পি
দধোদানাম নামতঃ। দুগ্ধোদশ্চ প্রসং-
খ্যাত শুভঃ স্বাদুদ উত্তরঃ ॥

† ইতি বৈষ্ণবে।

‘প্লক্ষদ্বীপে প্লক্ষরুকঃ শাল্মলী শাল্মলিঃ
মৃতঃ ।

কুশদ্বীপে কুশস্তম্বঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহা-
গিরিঃ ॥

শাকদ্বীপে শাকরুকঃ পুঙ্করে পুঙ্করঃ
মৃতঃ ॥’

অতঃপর বিষ্ণুপুরাণে সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমু-
দ্রের এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় ।

‘জম্বুদ্বীপং সমারতা লক্ষযোজনবিস্তরঃ ।
মৈত্রেয় বলয়াকারঃ স্থিতঃ কারোদধি-
বর্হিঃ ॥’

লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ লবণসমুদ্র বল-
য়াকারে জম্বুদ্বীপের বর্হির্ভাগ বেষ্টিত ক-
রিয়া আছে । মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত
আছে যে, জম্বুদ্বীপ রত্নাকার ও তাহার
বাস লক্ষযোজন * । লবণসমুদ্রের পর
পারে ছিল লক্ষ যোজন প্লক্ষদ্বীপ, তাহা ল-
বণ সমুদ্রকে বেষ্টিত করিয়া আছে ।

‘ কারোদেন যথা দ্বীপো জম্বু সংজ্ঞোত্তি-
বেষ্টিতঃ । সংবেষ্টি কারোদধিং প্লক্ষদ্বী-
পস্তথা স্থিতঃ ॥ জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারঃ শত
সাহস্রসম্মিতঃ । সএব দ্বিগুণো ব্রহ্মণ
প্লক্ষদ্বীপেহ প্যাদাহতঃ ॥ ’

প্লক্ষদ্বীপের তুল্যায়তন অর্থাৎ ছিল লক্ষ
যোজন ইক্ষুসমুদ্র উক্ত দ্বীপকে বেষ্টিত ক-
রিয়া আছে । আবার চতুর্লক্ষ যোজন
বিস্তৃত শাল্মলি দ্বীপ ঐ ইক্ষু সমুদ্রকে বে-
ষ্টিত করিয়াছে ।

* লক্ষমেকং যোজমানাং রতোবিস্তার-
দৈর্ঘ্যয়ো ॥

‘প্লক্ষদ্বীপপ্রমাণেন প্লক্ষদ্বীপঃ সমারতঃ।
তথৈবেক্ষুরসোদেন পরিবেশামুকারিণা ॥

শাল্মলেন সমুদ্রোমৌ দ্বীপেনেক্ষুরসো-
দকঃ ।

বিস্তার দ্বিগুণেনায়ং সর্বতঃ সংরতঃ
স্থিতঃ ॥’

এইরূপে শাল্মলি দ্বীপ চতুর্লক্ষযোজন
বিস্তৃত সুরা সমুদ্রের দ্বারা ; সুরা সমুদ্র
অষ্টলক্ষ যোজন বিস্তৃত কুশদ্বীপ দ্বারা ;
কুশদ্বীপ অষ্টলক্ষ যোজন বিস্তৃত সর্পিস-
মুদ্রের দ্বারা ; স্তম্বসমুদ্র ষোল্লক্ষ যোজন
বিস্তৃত ক্রৌঞ্চদ্বীপ দ্বারা ; ক্রৌঞ্চদ্বীপ
ষোল্লক্ষ যোজন বিস্তৃত দধিসমুদ্রের
দ্বারা ; দধিসমুদ্র বত্রিশলক্ষ যোজন বি-
স্তৃত শাকদ্বীপ দ্বারা ; শাকদ্বীপ বত্রিশ
লক্ষ যোজন বিস্তৃত ক্ষীরসমুদ্র দ্বারা ;
ক্ষীরসমুদ্র চৌষট্টিলক্ষ যোজন বিস্তৃত
পুঙ্কর দ্বীপ দ্বারা ; পরিশেষে পুঙ্করদ্বীপ
স্বাহ জলসমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া
আছে । ঐ জলসমুদ্রের বিস্তারও চৌ-
ষট্টিলক্ষ যোজন । *

* সুরোদকঃ পরিহৃতঃ কুশদ্বীপেনসর্বতঃ ।
শাল্মলস্যতু বিস্তারাদ্বিগুণেন প্রমাণতঃ ॥

তৎপ্রমাণেন সদ্বীপো মৃতোদেন সমারতঃ ।
স্বতোদশচসমুদ্রোমৌক্রৌঞ্চদ্বীপেনসংরতঃ ॥

কুশদ্বীপস্য বিস্তারাদ্বিগুণোযস্যবিস্তরঃ ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপসমুদ্রেণ দধিমণ্ডোদকেনচঃ ॥

আরতঃ সর্বতঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপ তুল্যেন মানতঃ
দধিমণ্ডোদক শচাপি শাকদ্বীপেন সংরতঃ ॥

ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য বিস্তারাদ্বিগুণেনপ্রমাণতঃ ।

এস্থলে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। ঋষিগণ শুদ্ধ যে ভৌগোলিক বিবরণেই কম্পনার ছড়াছড়ি করিয়াছেন, তাহা নহে। সপ্তদ্বীপ এবং সপ্তসমুদ্রের যেরূপ আয়তন ও সংস্থিতির বর্ণন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আরব্য উপজাতি বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ গণিতেও ইহাদের অগাধ বিদ্যা ছিল। কৃত্তিবাস পণ্ডিত যেমন রামের সৈন্যসংখ্যার গণনা করিতে বাইয়া, উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম চারিদিকের সৈন্যসংখ্যার সমষ্টির বলা 'বারান্নছাজার' বলিয়া, শুভকরের পিতৃশ্রদ্ধ করিয়াছেন, প্রাচীন মহর্ষিগণও তদ্রূপ, প্রথমে পৃথিবীর পরিমাণ পঞ্চাশকোটি যোজন নির্দেশ করিয়া, পরে সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপের পরিমাণে এত গোল করিয়াছেন যে, একটির সহিত অপরের কোনও মিল নাই। আমরা ঠিক দিয়া দেখিতেছি যে, সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপের পরিমাণ সমষ্টি প্রায় ষোলকোটি যোজনের অধিক হয় না। যদি বল, স্বাহ জলসমুদ্রের পরে একটি দ্বিখণ্ড

শাকদ্বীপে সপ্তমৈত্রের ক্ষীরদেন সমস্ততঃ।

শাকদ্বীপ প্রমাণেন বলয়েনৈব বেক্ষিতঃ ॥

ক্ষীরাক্ষিঃ সর্বতোত্রান্ পুষ্করাখ্যেণ বেক্ষিতঃ।

দ্বীপেন শাকদ্বীপান্ত বিণুণেন সমস্ততঃ ॥

স্বাহদকে নোদধিনা পুষ্করঃ পরিবেক্ষিতঃ।

সমেন পুষ্করস্যৈব বিস্তারান্ গুলাতথা ॥

বিশিষ্ট দেবতার আলয়স্বরূপ স্বর্গভূমির ও তৎপার লোকালোক পর্বতের উল্লেখ আছে, তাহা লইয়া ভূমণ্ডলের পরিমাণ সম্পূর্ণ; কিন্তু সাতটি দ্বীপ ও সাতটি সমুদ্রের আয়তন ১৬কোটি আর একটি ভূমি ও একটি পর্বতের আয়তন ৩৪ কোটি হইবে, একথা আমরা সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। অথবা একথা বলাই বাহুল্য, কেন না যাহার আয়ল অবিশ্বাসনীয়, তাহাতে আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা কি? মহর্ষিগণ কেবল সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্রের আয়তন ও স্থিতি নিরূপণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এই সকল দ্বীপের অধিবাসী, এবং তাহাদের অবস্থা ও ধর্ম প্রভৃতিরও বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রথমতঃ জম্বুদ্বীপস্থ জম্বুবৃক্ষ হইতে যে ফল পতিত হয়, তাহার রস একত্রীভূত হইয়া সেখানে জম্বুদ্বীপ নামে এক মহতী নদী হইয়াছে; সেই নদীর জল 'অমৃতস্বাদ্রূপচাতে' * অমৃতের ন্যায় মিষ্ট স্বাদ বিশিষ্ট। জম্বুদ্বীপনিবাসীরা ঐ নদীর জম্বুরসরূপ জলপান করে। তাহাতে—

'নখেদোচ্চ দৌর্গন্ধাং ন জরা ন স্ত্রিয়ক্ষয়ঃ।

তৎপানস্বস্থমনসাং জনানাং তত্র জায়তে ॥' ইতি বৈষ্ণবে।

তত্তীরবাসিদিগের মন সর্বদা সুস্থ থাকে, কখনও অন্তঃকরণে খেদের উদ্ভেদ হয় না, শরীরে দুর্গন্ধ হয় না, পুংশক্তির ভ্রাস হয় না ও জরা হয় না। স্রমেক পর্বতপ্রভাবে

* শৈবপুরাণে

এইস্থল সাধারণ লোকদিগের অনধিগমা,
কেবল

‘ তত্রযান্তি জিতক্রোধা জিতলোভা জি-
তেশ্চিন্নরাঃ । ’ ইতি শৈবে ।
জিতক্রোধ, জিতলোভ এবং জিতেশ্চিন্নর
লোকদিগেরই ইচ্ছা অধিগমা ।

প্লাক্ষদ্বীপে চারি বর্ন বাস করে । যথা
বৈষ্ণবে—

‘ আৰ্য্যকাঃ কুরবশ্চৈব বিবিংশা ভা-
নশচয়ে ।

বিপ্রশ্চত্রিয়বৈশ্যাশ্চৈ শূদ্রাশ্চ মুনিস-
ত্তম ॥

ইজাতে তত্র ভগবান্শৈববর্ণৈর্নার্য্যকাদি-
ভিঃ ।

সোমরূপী জগৎঅষ্টা সর্কঃ সর্কেশ্বরে-
হরিঃ ॥’

অর্থাৎ আৰ্য্যক, কুরব, বিবিংশ ও ভাবি ;
ইহারা জম্বুদ্বীপে ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
বৈশ্যা ও শূদ্র নামে প্রসিদ্ধ । এই সকল
জাতি চন্দ্রকে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্তা
সর্কেশ্বররূপে পূজা করে ।

‘ শাল্মলে যেতু বর্নাশ্চ বসন্তোভে মহা-
মুনে ।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব যজ-
ন্তিতং ॥

বাস্তুভূতং মুখশ্চৈঠৈর্ষজ্জিনোযজ্ঞসংজিতং ।’

শাল্মলি দ্বীপেও ব্রাহ্মণাদি চতুবর্ন
অবস্থিতি করেন, তাঁহারা বায়ুকে ঈশ্বর ব-
লিয়া মামেন, এবং তাহাকেই বজ্রেশ্বর ব-
লিয়া ভয়দ্রোশো যাগযজ্ঞ করেন ।

এইরূপে কুলদ্বীপে ও চারিবর্ন আছে,
তাহারা নিজামুষ্ঠানতৎপর ।

“তত্রতেতু কুলদ্বীপে ব্রহ্মরূপং জন্মানং ।

যজ্ঞস্তঃ ক্ষয়য়জ্ঞাণা মধিকার ফলপ্রদং ॥”

ইহারা ব্রহ্মরূপি পরমেশ্বরকে হোমাদি
দ্বারা যজ্ঞ করিয়া স্ব স্ব অধিকারানুরূপ
কর্মকল সমস্তোগপূর্বক কর্ম ক্ষয় করেন ।

ক্রৌঞ্চদ্বীপবাসিগণ ‘ যাগৈকরুদ্র স্বরূ-
পস্থ ইজাতে যজ্ঞ সন্নিধৌ ।’ ব্রহ্মরূপি
ঈশ্বরকে হোমদ্বারা অর্চনা করে ।

‘ শাকদ্বীপেতু তৈবিস্বঃ স্বর্ষ্যরূপ ধরো-
মুনে ।

যথোক্তৈরর্চাতে সম্যক্ কর্মভিনির্য়তা-
ভিঃ

শাকদ্বীপস্থ অধিবাসিগণ কর্ম দ্বারা
স্বর্ষ্যরূপি ভগবানকে অর্চনা করে ।

“শশবর্ষ সহস্রাণি তত্র জীবন্তি মানবাঃ ।

নিরাময় বিশোকাস্চ রাগদ্বেষবিবর্জিতাঃ ॥

তুল্যরূপাস্তু যমুজা দেবৈশ্চত্বৈত্রকরূপিণাঃ ।

বর্ণাশ্রমাচারহীনং ধর্ম্মাহরণ বর্জিতং ।

* * * *

ভোজনং পুষ্করদ্বীপে তত্রশ্বয়মুপস্থিতং ॥”

পুষ্করদ্বীপে অধিবাসীদের আয়সংখ্যা
দশসহস্র বৎসর ; তাহারা নিরাময়, অ-
শোক ও রাগদ্বেষহীন । তাহারা সকলেই
তুল্যরূপ এবং দেবতাদিগের সদৃশ । সে-
খানে বর্ণভেদ নাই, আশ্রমভেদ নাই,
আচার নাই, বা কোমণ্ড ধর্ম্ম নাই । সে-
খানে আহারের জন্য চিন্তিত হইতে হয়
না, কারণ আহার স্বয়ং উপস্থিত ।

অতঃপর কোন কোন পর্বত ও নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের ক্রিষ্টিয় বিবরণ নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে।

“সর্ব্ব্বাষ্টাৎ বীপানাং সপ্ত সপ্তৈব প-
র্ব্বতাঃ।

সপ্তৈব নদাস্তেষাম্ বর্ষানি সপ্ত সপ্তৈব ॥
নতু রোগা ন জরা ন শোকা ন পরিশ্রমঃ।
নান্যাং স্ত্রিয়ং বিজ্ঞানন্তি চক্রবাক সদর্শিণঃ।
ত্রৈতাযুগ সমঃকালঃ সর্ব্বদৈব মহামতে।
প্লক্ষদ্বীপাদিসু ব্রহ্মন্ শাকদ্বীপান্তকেষুৈব ॥
পঞ্চবর্ষ মহত্ৰাণি জনাজীবন্ত্য নামরাঃ ॥”

প্লক্ষদ্বীপ অবদি শাকদ্বীপ পর্য্যন্ত প-
ঞ্চদ্বীপে সপ্তসপ্ত পর্ব্বত, সপ্তসপ্ত নদী ও
সপ্তসপ্ত বর্ষ আছে। ঐ সমস্ত বর্ষবাসিগণ
অরোগ, অশোক, অজর ও অপরিশ্রম।
ইহারা অন্যত্রীসঙ্গ করে না, স্বামী স্ত্রী চ-
ক্রবাক মিথুনের ন্যায়। ত্রৈতাযুগে লো-
কদিগের যেরূপ আয়ুসকাল ছিল, ইহাদে-
রও তদ্রূপ পঞ্চমহত্ৰবর্ষ পরমায়ু।

“একস্তত্র মহাভাগ প্রখ্যাতো বর্ষপর্ব্বতঃ।
মানসোত্তর সংজ্ঞাসৌ মধ্যতো বলয়া-
কৃতঃ ॥

* * * * *

বর্ষদ্বয়স্ত মৈত্রৈঃ ভৌমঃ স্বর্গোহয়মুত্তমং ॥”

শাক-দ্বীপের মধ্যভাগে বলয়াকারে
মানসোত্তর নামে এক বর্ষ পর্ব্বত আছে।
উহাতে দ্বীপটীকে বর্ষদ্বয়ে বিভক্ত করি-
য়াছে, এবং ঐ বর্ষদ্বয় এক নৃন্দর যে তাহা-
দিগকে ভূস্বর্গ বলা যাইতে পারে।

পূর্বে যে স্বাহ জল সমুদ্রের উল্লেখ
করা গিয়াছে, তাহার পর পারে, “সর্ব্ব-
জন্ত বিবর্জিতা” দ্বিখণ্ড এক “কাঞ্চনী-
ভূমিঃ” আছে। তাহার পর পৃথিবীর
সীমারূপে এক বৃহৎ ঠৈল আছে—

“অর্ধাটীনেতু তস্যাকৌ চরন্তিরবিরশ্রয়ঃ।
পরাকৌতু তমোনিত্যং লোকালোকস্ততঃ-
স্মৃতঃ ॥” ইতিৈলৈঙ্গে।

উহার এক পার্শ্বে রবি রশ্মির গমন, অপর
পার্শ্বে সূর্য্য কিরণের গমনাভাব। উৎ-
প্রযুক্ত ঐ ঠৈলের নাম লোকালোক
পর্ব্বত।

অনেকে অনুমান করেন যে, আধুনিক
এসিয়াখণ্ডকেই প্রাচীন আর্ঘ্যেরা জম্বু-
দ্বীপ কহিতেন; অপর ছয় দ্বীপের বিব-
রণ কল্পিত হইলেও জম্বুদ্বীপের বিবরণ
তাহারা সম্যক্ প্রকারে অবগত ছিলেন,
এবং জম্বুদ্বীপ সম্বন্ধে অনেক বৃত্তান্ত প্রকটন
ও করিয়া গিয়াছেন। এই অনুমান নির-
বচ্ছিন্ন ভ্রান্তিমূলক না হইলেও সম্পূর্ণ অ-
ভ্রান্ত নহে। কারণ জম্বুদ্বীপের বিষয়ে
আর্ঘ্যেরা অনেক কথা কহিয়াছেন বটে,
কিন্তু তাহার অধিকাংশেরই আধুনিক ভদ্রের
সহিত ঐক্য নাই। যাহা হউক সে সকল
বিচারে প্ররত্ত মা হইয়া পুরাণে যেরূপ
বর্ণন আছে, তাহাই অবিকল উদ্ধৃত করি-
তেছি। জম্বুদ্বীপ নববর্ষে বিভক্ত-বিষ্ণু-
পুরাণে যথা—

“ভারতং প্রথমং বর্ষং ততঃ কিম্পুরুষং-
স্মৃতং।

হরিষর্ষৎ তথৈবান্যথেরোর্দক্ষিণতোষিজ ॥
 রম্যককোত্তরং বর্ষং তথৈবান্যথৈরন্যয়ং ।
 উত্তরাঃ কুরবর্ষেচব যথাবৈভারতং তথা ॥
 ইলান্নতঞ্চ তন্মধ্যে সৌবর্ণোমেঘকক্জিত্তঃ ।
 মেরোঃপূর্বেগভদ্রাশ্বং কেতুমালঞ্চ প-
 শ্চিমে ।

নবসাহস্র মৈকৈকমেতেষাং দ্বিজসত্তম ॥”
 জম্বুদ্বীপের দক্ষিণাংশে হিমালয় প-
 র্ব্বত পর্য্যন্ত এই ভারতবর্ষ, তদন্তরে কিন্ধু-
 কন, তদন্তরে হরিষর্ষ, তদন্তরে সুরমেকর চ-
 তুঃপার্শ্বে ইলান্নতবর্ষ, ইলান্নতের পূর্বে
 ভদ্রাশ্ববর্ষ ও পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ, এই
 তিনবর্ষের উত্তরে রম্যকবর্ষ, তদন্তরে হির-
 ঞয়বর্ষ, এবং তদন্তরে কুরবর্ষ । এই নয়
 বর্ষের প্রত্যেকের পরিমাণ নয় সহস্র যো-
 জন !

উপরে যে হিমালয় ও সুরমেক পর্ব্ব-
 তের উল্লেখ হইল, তন্মধ্যে হিমালয়ের বর্ণনা
 স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে ; সুরমেকর বিবরণ
 বিষ্ণুপুরাণে এই রূপ আছে—

“ তস্যাপি মেকর্মৈত্রের মধ্যে কনক প-
 র্ব্বতঃ ।

চতুরশীতি সহস্রো যোজ্ঞনৈস্তস্যোচোঙ্গুরঃ ॥
 প্রবিষ্টিঃষোড়শাধস্তা দ্বাত্রিংশদ্বীক্লি বিস্তৃতঃ ।
 মূলে ষোড়শসহস্রো বিস্তরাস্তস্য ভূতুতঃ ॥”

অর্থাৎ জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে সুরমেক
 নামে এক কাঞ্চনময় পর্ব্বত আছে । তা-
 হার উচ্চতা চৌরাশি সহস্র যোজন, এবং
 পৃথিবীর অভ্যন্তরে ষোল সহস্র যোজন
 প্রোথিত ; ইহার শিরোভাগের বিস্তার ব-

ত্রিশ সহস্র যোজন ; এবং মূলের বিস্তার
 ষোলসহস্র যোজন । লিঙ্গপুরাণে আছে—
 “ নতত্র স্বর্ষাস্তপতি নচজীর্ষ্যস্তিমানবাঃ ।
 চন্দ্রস্বর্ষো সনক্ষত্রৌ প্রকাশেতেনতত্রবৈ ॥”
 শৈবেচঃ—

‘ নচবর্ষতি পর্জন্ম্যাগিরেস্তস্য প্রত্যাবতঃ ।’

এই পর্ব্বতে স্বর্ষ্য প্রথর রশ্মিধারা
 তাপদানে অসমর্থ ; এবং ইহার অধিবা-
 সীরা জরাজীর্ণ নহে । চন্দ্র স্বর্ষ্য নক্ষত্র
 প্রভৃতি তথা প্রকাশ হইতে পারে না ;
 এবং মেঘ পর্য্যন্ত সেখানে বারি বর্ষণ
 করে না ।

পুলশ্চ বৈক্ষবে—

‘ মেরোশ্চতুর্দিশং তত্রনবসাহস্রবিস্তৃতং ।
 ইলান্নতং মহাতাগ চত্বারশ্চত্রে পর্ব্বতাঃ ॥
 বিষ্ণুস্তারচিতামেরোষোজনায়ুত মুচ্ছিতাঃ ।
 কদম্বস্তেহু জম্বুশ্চ পিপ্পলো বট এবচ ।

একাদশ শতায়ামাঃ পাদপাগিরিকেতবঃ ॥’

সুরমেকর চতুর্দিকে নয় সহস্র যোজন
 বিস্তৃত ইলান্নতবর্ষ । ঐ বর্ষের চতুঃপার্শ্বে
 চারিটি পর্ব্বত । সেই প্রাচীর স্বরূপ ঠৈল
 চতুষ্কয়ের উপরিভাগে ক্রমে পূর্ব্ব, দক্ষিণ,
 পশ্চিম এবং উত্তরদিকে কদম্ব, জম্বু, অশ্বখ,
 ও বট বৃক্ষ আছে । ইহার এক এক ব-
 কের উচ্চতা একাদশ সহস্র যোজন ।

মহর্ষিগণ তৎপরে নববর্ষের সীমাপ-
 র্ব্বতগুলির এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন যে,
 হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, নীল, খেত,
 শূলবান, মাল্যবাণ ও গঙ্গামাদন, ঐ অষ্ট
 মহাহ্রলংঘ্য পর্ব্বতের দ্বারা নববর্ষ বিভক্ত

হওয়াতে, একবর্ষের লোক অপার বর্ষে
বাইতে পারে না। ভারতবর্ষ, কম্পু-
কবর্ষও হরিষর্ষের উত্তর সীমায় ক্রমে হি-
মালয়, হেমকূট, এবং নিষধ নামক অত্রি-
ত্রয় অবস্থিত, ইহাদের দৈর্ঘ্য ক্রমে, ৮০,
৯০, ও ১০০ সহস্র যোজন। কেতুমাল,
ইলান্নত, ও ভদ্রাশ্ব এই বর্ষত্রয়ের উত্তর সীমা
নীল পর্বতের দৈর্ঘ্য ও নিষধের ন্যায়
লক্ষ যোজন। রমাকবর্ষের উত্তর সীমা
শ্বেত পর্বত নবতি সহস্র যোজন দীর্ঘ ও
হিরণ্ময় বর্ষের উত্তর সীমা শৃঙ্গবান্ অশীতি
সহস্র যোজন দীর্ঘ। এই ছয় পর্বতের
প্রত্যেকটি দ্বিসহস্র যোজন উচ্চ ও দ্বিসহস্র
যোজন বিস্তৃত। এবং দৈর্ঘ্যে ইহারা
পূর্ব পশ্চিম সমুদ্র স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু
জম্বুদ্বীপের গোলতা নিবন্ধন কোথাও
দৈর্ঘ্য কিঞ্চিৎ অধিক, কোথাও কিছু
নূন। *

* জিমস্তায়তে। যন্মিন্নব বর্ষাণি নব-
যোজন সহস্রায়ামান্যচ্চতির্মর্ষাদা গি-
রিভিঃ সবিতস্তানি ভবন্তি ॥ বৈকবেচ।
হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধাশ্চ সা দক্ষিণে।
নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গীচ উত্তরে বর্ষপর্বতাঃ।
লক্ষ প্রমাণে হোমধ্যে দশহীনাস্তথা
পরে। সহস্রদিতয়োক্ত্যায়ান্ত্যবদিস্তারিণ
শ্চতে ॥ বারীহে। জম্বুদ্বীপ প্রমাণেন নি-
ষধঃ পরিকীর্ষিতঃ তন্ম্যাচ্চ দশভাগেন হেম-
কূটঃ প্রহীরতে। হিমবান্ বিংশভাগেন
তন্ম্যাদেব প্রহীরতে। অশীতি হিমবান্
শৈল আয়াতঃ পূর্বপশ্চিমে। নীলঃ শ্বেতশ্চ

বিষ্ণুপুরাণের স্থলান্তরে লেখা আছে
যে, মাল্যবাণ ও গন্ধ মাদন পর্বত, উত্তরে
নীল পর্বত ও দক্ষিণে নিষধ পর্বত পর্যাস্ত
বিস্তৃত, এবং প্রত্যেকে চল্লিশ সহস্র যো-
জন উচ্চ।

‘আনীল নিষধায়ানৌ মাল্যবদ্ গন্ধমা-
দনৌ।
চত্বারিংশৎ সহস্রাণি পরিব্রজৌ মহীতলাৎ’

তদন্তর লিঙ্গপুরাণে এই সকল পর্ব-
তের শোভা ও ঐশ্বর্য ইত্যাদি এইরূপে
বর্ণিত আছে:—

‘হিমবৎপ্রমুখাশ্চাফৌ মর্ষাদাপর্বতাইমে।
নানাধাতু পিন্ধাশ্চ নানারত্নাকরা শ্চবৈ ॥
নানাপুষ্প ফলোপেতা নানারুকগাৱতাঃ।
ভূষর্গা দেবভোগ্যাশ্চ ভূষ্যাপ্যা মানবৈব-
ভূবি।

হেমকূটেতু গন্ধর্বা বিজেরা শ্চাপ্সরো
গণাঃ ॥

সর্বৈ নাগাস্ত্ৰ নিষধে শেষ বাসুকি তক্ষকাঃ ॥
নীলেষু বৈদূর্ঘ্যাময়ে সিদ্ধ ত্র স্মর্ষরো মলাঃ।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ শ্বেত পর্বত উচ্চতে ॥
শৃঙ্গবৎ পর্বতে চৈব পিতৃণাং নিলয়াঃ
শুভাঃ।

হিমবান্ দক্ষ মুখ্যানাং ভূতানামীশ্বর সাচ।
সর্বাশ্চিষু মহাদেবো হরিণা ত্রক্ষণা সুরৈঃ ॥’

গন্ধমাদন পর্বত সম্বন্ধে স্বন্দ পুরাণে
লিখিত আছে—

শৃঙ্গীচ ক্রমেনৈবৎ প্রমাণকাঃ। অবগাতাত্ৰা-
ভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্ব পশ্চিমৌ। দ্বীপস্য
মণ্ডলীভাবাদভ্রাস রুকি প্রকীর্ষিতে ॥

‘সস্তি বিদ্যাধরাণাঞ্চ পৰ্ব্বতে গন্ধমাদনে ।
উদ্যানানি বিচিত্রাণি ভবমানি বহুনিচ ॥
তেষু বিদ্যাধর বরা বিদ্যাধৰ্যাশ্চ কৌতু-
কাৎ ।
বিহরন্তি স্রুথং যত্রবায়ুৰ্বহতি গন্ধবান ॥
স্রগন্ধি পুষ্প সন্তুতান্ গন্ধানাদায় সৰ্ব্বতঃ ।
দেবার্দ্দৈত্যানাদানবাশ্চ কদাচিদ্ যান্তিত-
ত্রবৈ ॥’

উপরি উদ্ধৃত সংস্কৃত পদগুলি এত
সরল যে সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠক স্নেহের ও
সহজে মৰ্ম্ম গ্রহ হইবে, এই বিশ্বাসে আ-
মরা বাঙ্গলায় অনুবাদ করিলাম না । এবং
বর্তমান শ্রেণীর প্রবন্ধ দীর্ঘ হইলে অনেক
পাঠকের নিকটই নীরস বোধ হয় । অত-
ত্রব এস্থলেই প্রথম প্রস্তাবের উপসংহার
করিলাম ।



সংক্ষিপ্তসমালোচন ।

১ । “মনোরঞ্জন-স্বপ্ন । জীযোগেস্কনাথ
দ্বাৰা প্রণীত ও প্রকাশিত ।” গ্রন্থ-
কার এই মনোরঞ্জন-স্বপ্নে বেদ বেদাঙ্গ
প্রভৃতি বহুশাস্ত্রের মূল সত্য এবং সমাজ-
রহস্য ও ধৰ্ম্মনীতি প্রভৃতি বহুনিয়মের মূল
তত্ত্ব দিব্যচক্ষে দর্শন করিতে চেষ্টা পাই-
য়াছেন,—কিন্তু তিনি যেসকল দেখিতে
পাইয়াছেন, সেইসকল দেখাইতে পারেন
নাই । তিনি শেষ দেখিয়াছেন এই,—
“নিরাকার নির্ঝিকার পদার্থ ভাবিতে
চেষ্টা করিয়া তাহাতে অপারগ হইলে
মন যেমন নীচকার্য্যে রত হয়, দেবদেবীর
চিন্তা করিলে মন তেমন হয় না । * * * *
অতএব ভক্তির উদয় হইলে যে সাকার
মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহার আর স-
ন্দেহ নাই । ভক্তিসেবক ধৰ্ম্মপারায়ণ ম-
হাত্মারা অনাদি, অমন্ত ও অসীম পদার্থকে
কল্পনাবাহিত্ত বিদ্যাভিত্তিক সীমাবিশিষ্ট

মনে ও পরিমিতবুদ্ধিতে ধ্যান বা ধারণা
করা অসম্ভব বিধায় সৃষ্টি স্থিতি লয় দর্শন
দ্বারা ঈশ্বরের তিন গুণের উল্লেখ করতঃ
তঁাহার প্রতিকল্পস্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহে-
শ্বর ও তঁাহাদিগ হইতে অপর দেবদেবী
কল্পনা করিয়া তঁাহাদিগকে ঈশ্বরজ্ঞানে
দৃঢ়ভক্তি করিবার সূক্ষ্ম ও সূচ্যরূপ প্রদ-
র্শন করিয়াছেন । ”

এই উদ্ধৃত অংশের শেষভাগটি পড়ি-
বার সময় ইহাকে আদালতের রোবকারি
কিংবা পুলিশের রিপোর্ট বলিয়া ভ্রম জ-
ন্মিতে পারে । কারণ প্রচলিত বাঙ্গলায়
একই বাক্যে করিয়া করতঃ, হইয়া হওতঃ
ইত্যাদিরূপ অনন্তকোটি অসমাপিকা ক্রিয়া
এইকণ আর স্থান পায় না, এবং বিধায়
প্রভৃতি অৰ্ধগূত্র শব্দও ব্যবহৃত হয় না ।
রিপোর্ট ও রোবকারিতেই এইরূপ ক্রিয়া-
পদবৈচিত্র্য ও বিধায় প্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হইয়া

ধাকে। উদ্ধৃত অংশে কল্পনাবাহিত পদটি কি অর্থে কাহার বিশেষণ তাহা আবাদিগের বুদ্ধিগম্য হইল না। আমরা অবশ্য একত্র চুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছি। কেমন না, যাহা বুঝি না, তাহার সমালোচনা করা অনুচিত।

২। “শূরবালা—সুরবালা। স্বর্গীয়া স্বর্ণলতা বিরচিত। হরিনাভি সাহিত্য-উৎসাহিনী সভা হইতে প্রকাশিত।” গ্রন্থকর্ত্তী যখন জীবিত নাই, তখন আমরা নিন্দা করিলেও তাহা তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না, প্রশংসা করিলেও সে প্রশংসায় তিনি পুলকিত হইবেন না। সুতরাং আমরা কাহাকে আর কি বলিব? তিনি জীবিত থাকিলে, তাঁহাকে এইমাত্র বলিতাম যে, নাটক কাহাকে বলে তাহা না বুঝিয়া থাকিলেও তিনি মূল্যবান পদ্য রচনার নিপুণ। অর্দ্ধশিক্ষিত বালিকার পক্ষে ইহাই বিস্তর প্রশংসা।

৩। “আর্য্য-সংগীত।” এখানি কে আমাদের উপহার দিলেন, তাহা জানি না। কারণ গ্রন্থকার তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই। কবিতাটি পড়িয়া বোধ হইল, হেমবাবুর কবিতাবলী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছে। তবে কথা এই, অন্যদীয় কবিতার পদ্যবলী যেরূপ কণ্ঠস্থ হয়, রস ও মাধুর্য্য সেইরূপ সহজে ছন্দগত হয় না।

৪। “নিষ্কলতক। কোল্লগর নিবাসিনী জীমতী তরঙ্গিনী দাসী বিরচিত।

জীভুবনমোহন ঘোষকর্ত্তক প্রকাশিত।”—পূর্নিয়ার শশী, প্রিয়তমের প্রতি, বিধবার স্বপ্ন এবং বসন্তসমাগম প্রভৃতি কতিপয় গদ্য ও পদ্য রচনার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি গ্রন্থিত, গ্রন্থকর্ত্তী বর্ত্তমান কালের নভেল নাটকীয় বাঙ্গালার মন্দ শিক্ষিত নহেন। তিনি শব্দের সহিত শব্দ গাঁথিবার কৌশল যেরূপ শিখিয়াছেন, যদি সেইরূপ গাঢ় শিক্ষা পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার লেখা এইরূপ এলান এলান এবং অনেক স্থলেই অর্থশূন্য ও উদ্দেশ্য শূন্য না হইয়া,—যে সকল কথা ইদানীং সকলেই সকল পুস্তকে পড়িতে পায়, শুধু তাহাতেই পরিপূর্ণ না রহিয়া, অধিকতর পাঠযোগ্য হইত। তিনি পিঞ্জর বন্ধ সারিকার ছায়ার পরের কথা না কহিয়া নিদ্রের কথা কহিলে, শুনিবার জন্ম লোকের অধিকতর আগ্রহ জন্মিত, এবং লোকে বঙ্গীর কুলবালাদিগের শিক্ষার পরিমাণ বুঝিতে পাইত। এই পুস্তক সেই সকল আশার সাফল্য বিষয়ে,—“নিষ্কল তক।”

৫। “প্রণয়পাগল, প্রথমখণ্ড। জীরজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।”—রচনার নমুনা,—

“কামিনি!

পাগল করিলি আমারে

এমন সৌরভ-মধু কে দিল তোমারে?

একটু নয়নাস্তর হইলে অমনি

কেমন পাগলিনী তুমি হয়ে সুবদনি!

মধুগন্ধ আবাছনে ডাক বারে বারে

পাগল করিলি আমারে।”

পূর্ব বান্ধালার কতিপয় ভূস্বামী এই গ্রন্থের মুদ্রণ সাহায্য করিয়াছেন, এবং বান্ধালী সাহিত্যের অরুচিম বন্ধু বলিয়া পরিচিত এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইহা উপহার লইয়াছেন । সকলেরই কচি পরিমার্জিত !!

৬ । “মেয়েলী অর্ণাৎ বঙ্গীয় কামিনী-দিগের ব্যবহৃত গার্হস্থ্য শ্লোক ও পদাবলী । প্রথম ভাগ । জীললিতমোহন রায় কর্তৃক সংকলিত ।” এই গ্রন্থ হইতে দুই চারিটি মেয়েলী কথা পাঠকবর্গের জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল ।

“ কড়ি দিয়া কিনব দই ।

গোয়ালিনী আমার কিসের সই ॥”

“ জামাইর বড় কোচার ফের ।

ছয়বুড়ি কড়ি স্ততার সের ॥ ”

“ মাসিমার আদরে ।

পরান আমার বিদরে ॥ ,,

“ যদি থাকে নড়িবে ।

আপনে আপনে আসিবে ॥ ”

ইতার মধ্যে কতকগুলি উক্তি নিতান্ত অশ্লীল, ও অশ্রাব্য । নিতান্ত জঘন্য জাতীয় স্ত্রীলোক কি পুরুষের মুখে ভিন্ন একরূপ কথা প্রায় কোথাও শুনা যায় না । সংগ্রহকার তাঁহার ২৩৮, ২৩৯ প্রভৃতি নম্বরের উক্তি কোন্ শ্রেণি মেয়েদের মুখে শুনিয়াছেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন । অন্য কতকগুলি নিতান্ত প্রোমা ও বীভৎস, যথা ৮৭নম্বর । আর এক কথা এই, যে

কথায় ঘোটক অথবা মেল আছে, তাহাই যে মেয়েলী ইহা তাঁহাকে কে বলিয়াছে । এই গ্রন্থ ময়মনসিংহের এক অতি প্রধান ভূমাদিকারীকে উৎসর্গ দেওয়া হইয়াছে । একরূপ গ্রন্থ উৎসর্গ দেওয়া বঙ্গদেশ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোত্রাপি প্রচলিত আছে কি না, তাহা আমরা জানি না । উৎসর্গ পত্রের প্রথমেই লেখা আছে,—“ আর্ষ্য ! মেয়েলী চিরদিনই আপনার নিকট আদরের জিনিস ।” বান্ধালি গ্রন্থকার বঙ্গীয় ভূস্বামীকে ইহা না কহিয়া আর কি কহিবে ? কিন্তু বাঁহাকে এই গ্রন্থ উপহার দেওয়া হইয়াছে, তিনি উচ্চতর বিষয়ে অনুরাগী বলিয়াই সর্বত্র পরিচিত ।

৭ । “ বিজ্ঞনসংগীত । কাব্য, জীবদ্ভূনাথ পালিত কর্তৃক প্রণীত ।” এখানি সম্প্রতি মুদ্রিত না হইলেই ভাল ছিল । বঙ্গদেশের অমেক বুদ্ধিমান যুবা—জ্ঞানিনা কি এক প্রেলোভনে পড়িয়া, শিক্ষার সময়কে গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত করিতেছেন । সময়ের এইরূপ অপব্যবহার সমাজের অনিষ্টকর । যশঃস্পৃহার অক্লান্ততাড়না অবশ্যই অনেকের পক্ষে অসহ্য, কিন্তু বাঁহাদিগের সঙ্কল্পিত নাই, তাঁহারা জগতে প্রায়শঃই যশস্বী হন না । বিজ্ঞনসংগীত রচয়িতাও যদি আর দশ বৎসরকাল অপেক্ষা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃত উপকার হইত ।

জীবনপ্রভাত।

—

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ঈশানী-মন্দির।

হেরিলা অদূরে
সরোবর, কুলে তার চণ্ডীর দেউল।”
মধুসূদন দত্ত।

পরাক্রান্ত জায়গীরদার ও জুমলাদার চন্দ্ররাণ্যের বাটী হইতে কএক ক্রোশ দূরে ঈশানীর একটি মন্দির ছিল। অনতি-উচ্চ একটি পর্বত-শৃঙ্গে সেই মন্দির অতি প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দির-সম্মুখে প্রস্তররাশি সোপানরূপে খোদিত ছিল, নীচে একটি পর্বততরঙ্গিনী কুল কুল শব্দ করিয়া সেই সোপানের পদ প্র-কালন করিয়া বহিয়া যাইত। পুরাকাল অবধি অসংখ্য যাত্রী ও উপাসক এই পুণ্য-নদীতে স্নান করিয়া সোপান আরোহণ করিয়া ঈশানীর পূজা দিত, অর্থাৎ পর্য্যন্ত মন্দিরের গৌরব বা যাত্রীসংখ্যা হ্রাস হয় নাই। মন্দিরের পশ্চাতে, পর্বতের পৃষ্ঠ-দেশ বহু পুরাতন রক্ষ দ্বারা আবৃত, চূড়া হইতে নীচে সমতল ভূমি পর্য্যন্ত সেই র-ক্ষত্রগণী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। দিবাযোগেও সেই বিশাল রক্ষ-ত্রগণী দীর্ঘ অন্ধকার করিত, সেই সুরক্ষিত

ছায়াতে ঈশানী-মন্দিরের পূজক ও ব্রাহ্ম-ণেরা নিজ নিজ কুটীরে বাস করিত। সেই পুণ্য সুরক্ষিত স্থান দেখিলেই বোধ হয় যেন তথায় শান্তিরস ভিন্ন অন্য কোন ভা-বের উদ্বেক হয় নাই, ভারতবর্ষের পবিত্র পুরাণ কথা বা বেদমন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শব্দ সেই পুরাতন পাদপ-রুদ্ধ শ্রবণ করে নাই। বহু যুদ্ধ, অসংখ্য হতাকাণ্ডে মহা-রাষ্ট্রদেশ ব্যক্তিবাস্ত ও বিপর্য্যাস্ত হইতে-ছিল, কিন্তু হিন্দু কি মুসলমান কেহই এই ক্ষুদ্র শান্ত পর্বতমন্দির আহবের ভীষণ স্মরে কলুষিত করেন নাই।

রজনী এক প্রহরের সময় একজন প-থিক একাকী সেই শান্ত কাননের মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। পথিকের হৃদয় কি উদ্বেগ-পরিপূর্ণ। প্রশস্ত ললাট কু-ঞ্চিত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, নয়ন হইতে উদ্ভা-ততার অস্বাভাবিক ছোঁাতিঃ নির্গত হই-তেছিল। পথিক কণেক ক্ষতবেগে এ-দিক ওদিক পদচারণ করিতেছিলেন, ক-ণেক বা স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া অ-কাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রোষে ওষ্ঠের উপর দন্তস্থাপন করিতেছিলেন, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইতেছিল। রোষে, জিঘাংসায়, বিবাদে, অর্থাৎ রঘুনা-থের হৃদয় একেবারে দক্ষ করিতেছিলেন।

অনেকক্ষণ পদচারণ করিতে লাগিলেন, শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়াছে। তথাপি হৃদয়ের উৎসাহ নিবারণ হয় না ; আত্মবিশ্বাসঃ কখন পাদপে ভর দিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করেন, পুনরায় হুতন চিন্তায় উত্তেজিত হইয়া আশ্রিত বিস্মৃত করেন, পুনরায় শীঘ্র বেগে পদচারণ করেন। রঘুনাথ উদ্বৃত্তপ্রায় ! এ ভীষণ চিন্তার আশু উপশম না হইলে রঘুনাথের বিবেচনাশক্তি বিচলিত বা লুপ্ত হইবে ! প্রকৃতি ভীষণ চিকিৎসক ! এই বিষম সংসারে শেলসম স্বেদঃ ক্রম বিদীর্ণ করে, অগ্নিসম যে চিন্তা শরীর শোষণ ও দাহ করে, যে মানসিক রোগের ঔষধ নাই, চিকিৎসা নাই, প্রকৃতি চিন্তাশক্তি লোপ করিয়া তাহার উপশম করে। উন্নততাই কত শত হতভাগীর আরোগ্য ! কত সহস্র হতভাগী এই আরোগ্য দিবানিশি প্রার্থনা করে, কিন্তু প্রাপ্ত হয় না !

শরীর অবসন্ন হইল, রঘুনাথ অগত্যা একটি পাদপতলে উপবেশন করিলেন,— নিশ্চেষ্টভাবে রুদ্ধ ভর দিয়া উপবেশন করিলেন।

সেই পাদপের অনতিদূরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পুরাণ পাঠ করিতেছিলেন। আহা ! সেই সঙ্গীতপূর্ণ পুণ্যকথা যেন শাস্ত্র নিশীথে শাস্ত্র কাননে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল, নক্ষত্র-বিভূষিত নৈশ গগন-মণ্ডলে ধীরে ধীরে উদ্ভিত হইতেছিল। এখনও কাশী বামপুরীর পুরাতন মন্দিরে স্বর্ঘ্যো-

দয়ে বা স্মৃত্তিক সাংস্কালে সহস্র ব্রাহ্মণে সেই অনন্ত পুরাণ কথা বা বেদমন্ত্র পাঠ করেন ; যখন সেই পুণ্যধামে বঙ্গদেশের বহুযাত্রীর সমাগম দেখি, সনাতন মন্দিরে সনাতন-ধর্মের গৌরব দেখি, সাংস্কালের আরাতিশব্দ বা শত মন্দিরের ঘটা ও শঙ্খ-রব গগনে স্রুগপৎ উদ্ভিত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের ব্রাহ্মণেরা চারিদিকে উপবেশন করিয়া গভীরস্বরে বেদপাঠ বা পুরাণ অধ্যয়ন করিতে থাকেন, তখন আমি নৈশকাল বিস্মৃত হই, আধুনিক সময় ও আধুনিক জীবনের ভীষণ গণ্ডগোল বিস্মৃত হই, হৃদয়ে নানা স্বপ্নের উদয় হয়, বোধ হয়, যেন সেই প্রাচীন আর্ধ্যবর্তের মধ্যে বাস করিতেছি, চারিদিকে সেই পুরাকালের লোক, পুরাকালের সমাজ ও সভ্যতা, পুরাকালের শাস্ত্র ও স্মৃত্তিকতা।

সেই সমস্ত মহৎ কথা,—পুণ্যকথা ; শাস্ত্রব্রাহ্মণমুখোচ্চারিত হইয়া সেই শাস্ত্র নৈশ কাননে প্রঃস্থিত হইতে লাগিল, অচেতন পাদপকেও যেন সচেতন করিতে লাগিল, শাখাপত্র যেন সেই গীত কৃত্ত্ব হলে পান করিতে লাগিল, বায়ু সেই গীত বিস্তার করিতে লাগিল, মানবহৃদয় কখন বা প্রফুল্লিত, কখন বা উৎসাহিত, কখন বা গলিত হইতে লাগিল।

কত সহস্র বৎসর হইতে এই পুণ্যকথা ভারতবর্ষে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে ! স্মরণ বঙ্গদেশে, তুম্বারপূর্ণ কৈলাসবেষ্টিত দূর কাশ্মীরে, বীরপ্রহ রাজ-

স্থান ও মহারাষ্ট্রভূমিতে. সাগরপ্রক্ষালিত
কর্ণাট ও জ্যোতিড়, সহস্র বৎসর অবধি
এই গীত ধ্বনিত হইতেছে। যেন চিরকাল
নই এই গীত ধ্বনিত হয়, আমরা যেন এ
শিক্ষা কখন বিস্মৃত না হই। গৌরবের
দিনে এই অনন্ত গীতে আমাদের পূর্ব-
পুরুষদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল,
ও অযোধ্যা, মিথিলা, হস্তিনা, মগধ, উজ্জ-
য়িনী, দিল্লী প্রভৃতি দেশ বীরত্বে ও যশে
প্লাবিত করিয়াছিল। হৃদ্দিনে এই গীত
গাইয়া সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপ-
সিংহ, হৃদয়ের শোণিত দিরাছিলেন, এই
মহামন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া শিবজী পুনরায় পুরা-
কালের গৌরব সাধনে যত্নবান হইয়াছি-
লেন। অদ্য ক্ষীণ দুর্বল হিন্দুদিগের আ-
খ্যাসের স্থল, ক্রন্দনের স্থল, এই পূর্ব গীত
মাত্র, যেন বিপদে, বিবাদে, দুর্বলতায়
আমরা পূর্বকথা না বিস্মৃত হই, যতদিন
জীবন থাকে যেন হৃদয় যত্ন এই গীতের
সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হইতে থাকে!

নব্য পাঠক! তুমি ইলিয়দ পাঠ ক-
রিয়াছ, দাস্তে, মেগাপীরয়, মিটন্ পাঠ
করিয়াছ, সাদী ও ফরহুসী পাঠ করিয়াছ,
কিন্তু হৃদয় অন্বেষণ কর, হৃদয়ের অগুরে
কোন কথামূলি সরসতাবপূর্ণ বোধ হয়?
হৃদয় কোন কথায় অধিকতম আলোড়িত,
প্রোৎসাহিত বা মুগ্ধ হয়? ভীষ্ম চার্ব্যের
অপূর্ব বীরত্ব-কথা! দুঃখিনী সীতার অ-
পূর্ব পতি-ভক্তিকথা! এই কথা হিন্দুমা-
ত্রেরই হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত রহি-

য়াছে,—এ কথা যেন হিন্দুজাতি কখন
বিস্মৃত না হয়!

পাঠক! একত্র বসিয়া এক এক বার
প্রাচীন গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক
সময়ের রাজপুত্র ও মহারাষ্ট্রীয় বীরত্বের
কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে এই
অকিঞ্চিৎকর উপগ্রাম আরম্ভ করিয়াছি।
যদি সেই সমস্ত কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম
হইয়া থাকি তবেই বহু সফল হইয়াছে,—
নচেৎ পুস্তক দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক
তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে না।

শান্ত কাননে পবিত্র পুরাণকথা ও সঙ্কীত
রঘুনাথের তপ্ত ললাটে বাসির্বার্ণ করিতে
লাগিল। উদ্বিগ্নহৃদয় শান্তি সেনন করিতে
লাগিল। হতভাগীর উন্নততা ক্রমে হাস
পাইল, সেই মহৎ কথার নিকট আপনার
শোক ও দুঃখ কি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল!
আপনার মহৎ উদ্দেশ্য ও বীরত্ব কি ক্ষুদ্র
বোধ হইল! ক্রমে চিন্তাহারিণী নিদ্রা রঘুনা-
থকে অঙ্কেগ্রহণ করিলেন। রঘুনাথের শ্রান্ত
অবসর শরীর সেই বৃক্ষমূলে শয়িত হইল।

রঘুনাথ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।
আজি কিসের স্বপ্ন? আজি কি গৌর-
বের স্বপ্ন দেখিতেছেন, দিন দিন পদো-
ন্নতি, দিন দিন বিক্রম ও যশোবিস্তারের
স্বপ্ন দেখিতেছেন? হয়! রঘুনাথের
জীবনের সে স্বপ্ন তন্ন হইয়াছে, সে চিন্তা
শেষ হইয়াছে, মরীচিকা-পূর্ণ সংসারের
সে একটি মরীচিকা বিলুপ্ত হইয়াছে।

রঘুনাথ কি বৃক্ষক্ষেত্রের স্বপ্ন দেখি-

তেছেন ? শত্রুকে বিনাশ করিতেছেন, দুর্গ জয় করিতেছেন, যোদ্ধার কার্য্য করিতেছেন, সেই স্বপ্ন দেখিতেছেন ? রঘুনাথের সে উদ্যম শেষ হইয়াছে, সে স্বপ্নও বিলুপ্ত হইয়াছে ।

একে একে যৌবনের উদ্যমগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, আশাদীপ নিৰ্ব্বাণ হইয়াছে, এই অন্ধকার রজনীতে শান্ত বন্ধুহীন যুবকের হৃদয়ে বহু দিনের কথা পূৰ্ব্ব জীবনের স্মৃতির ন্যায় জাগরিত হইতেছে ; শোক-ভারে হৃদয় আক্রান্ত হইলে, আশা, সুখ, গৌরব আমাদের নিকট বিদায় লইলে, বন্ধুহীন জনের যে কথা স্মরণ হয়, রঘুনাথ সেই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন । স্নেহময়ী মাতার স্নেহসিক্ত মুখখানি মনে জাগরিত হইল, পিতার দীর্ঘ অবয়ব ও প্রশস্ত ললাট মনে হইল, বাল্যকালে সেই দূর মাড়গুনারে ক্রীড়া করিতেন, হাস্যরসিত চারি দিক্ প্রতিধনিত করিতেন, সেই কথা স্মরণ হইল । সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকালের সহচরী, শান্ত, ধীর, প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মীকে মনে পড়িল ; আচ্ছা সে স্নেহময়ী ভগিনীকে কি আর এ জীবনে দেখিতে পাইবেন ? আজি সে সোণার সংসার কোথায়, সে প্রফুল্ল আশালহরী কোথায়, এই শোকের দিনে, সন্তাপের দিনে, বাহার সাস্ত্রনা বাক্যে প্রাণ জুড়াইবে, এরূপ হৃদয়ের সহোদরা কোথায় ? নিদ্রিতের মুদিত নয়ন হইতে একবিন্দু অশ্রু ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল ।

নিদ্রিত রঘুনাথ সেই স্নেহময়ীর মুখ

খানি চিন্তা করিতে করিতে নয়ন উন্মীলিত করিলেন । কি দেখিলেন ? বোধ হইল যেন লক্ষ্মী স্বয়ং জাতার শিরোদেশ আপন অঙ্কে স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, কোমল শীতল হস্ত জাতার উষ্ণ ললাটে স্থাপন করিয়া হৃদয়ের উষ্ণেগ দূর করিতেছেন, সহোদরার স্নেহ-পূর্ণ নয়নে যেন সহোদরের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন । আহা ! বোধ হইল যেন শোকে বা চিন্তায়, লক্ষ্মীর প্রফুল্ল মুখখানি শুষ্ক হইয়াছে, নয়ন দুইটা সেইরূপ স্থির, প্রশস্ত, শিষ্ক, কিন্তু শোকের আবা-সস্থান !

রঘুনাথ নয়ন মুদ্রিত করিলেন, আর এক বিন্দু অশ্রুদর্ষণ করিলেন,—বলিলেন ‘ভগবন্ অনেক সহ্য করিয়াছি, কেন রুগা আশায় হৃদয় বাধিত করিতেছ ?’—

যেন কোমল হস্তে রঘুনাথের অশ্রু-বিন্দু বিমুক্ত হইল ! রঘুনাথ পুনরায় নয়ন উন্মীলিত করিলেন, এ স্বপ্ন নহে,—তাহার প্রাণের সহোদরাই তাঁহার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া সেই স্নানমূলে বসিয়া রহিয়াছেন !

উঃ ! রঘুনাথের হৃদয় আলোড়িত হইল ; তিনি লক্ষ্মীর হাত দুইটা আপন তপ্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সেই স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে চাহিলেন ;—তাহার বাক্-স্পৃষ্টি হইল না, নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল, অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া চীৎকার শব্দ করিয়া

রোদন করিয়া উঠিলেন । বলিলেন, 'লক্ষ্মী ! লক্ষ্মী ! তোমাকে কি এ জীবনে আবার দেখিতে পাইলাম ? অন্য স্মৃতি দূর হউক, অন্য আশা দূর হউক, লক্ষ্মী তোমার হস্তভাঙ্গা ভ্রাতাকে নিকটে স্থান দিও, সে এজীবনে আর কিছু চাহে না।' লক্ষ্মী ও শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না, ভ্রাতার হৃদয়ে আপন মুখ লুকাইয়া একবার প্রাণভরে কাঁদিলেন । আহা ! এ ক্রন্দনে যে স্মৃতি, জগতে কি রক্ত আছে, স্বর্গে কি স্মৃতি আছে যাহা অভাগাগণ সে স্মৃতির নিকট তুচ্ছজ্ঞান না করে ?

পরস্পরকে বহুদিন পর পাইয়া পরস্পরে অনেকক্ষণ বাকশূন্য হইয়া রহিলেন । বহুদিনের কথা, বাল্যকালের কথা রহিয়া রহিয়া হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল, স্মৃতির লহরীর সহিত শোকের লহরী মিশ্রিত হইয়া হৃদয় উছলিতে লাগিল ; থাকিয়া থাকিয়া দরবিগলিত ধারায় উভয়ের হৃদয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল ।

ভাগিনীর ত্রায় এজগতে আর স্নেহময়ী কে আছে, ভ্রাতৃস্নেহের ত্রায় আর পবিত্র স্নেহ কি আছে ? আমরা সে ভাল-বাসা বর্ণন করিতে অশক্তি, সঙ্কল্প পাঠক রঘুনাথ ও লক্ষ্মীর মনের ভাব অনুভব করুন ।

অনেকক্ষণ পরে দুইজনের হৃদয় শীতল হইল ; তখন লক্ষ্মী আপন অঞ্চল দিয়া ভ্রাতার নয়নের জল মোচন করিয়া বলি-

লেন, 'দৈশানীর ইচ্ছার কত অনুসন্ধানের পর আজ তোমাকে দেখিতে পাইলাম, আহা, আজ আমার কি পরম স্মৃতি ; দুঃখিনীর কপালে কি এত স্মৃতি ছিল !' কণেক পর আপন অশ্রুবিন্দু বিমোচন করিয়া বলিলেন, 'ভাই, এই শীতল বাতাসে আর থাকিলে তোমার অনর্থ হইবে, চল মন্দিরের ভিতর যাই ; আমি আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না।' উভয়ে গাঃত্রাণ্থান করিয়া মন্দিরা ভাস্তরে প্রবেশ করিলেন ।

ভ্রাতা ভাগিনী মন্দির-সভ্যস্তরে আসিলেন, লক্ষ্মী একটি স্তম্ভের পাশে উপবেশন করিলেন, ভ্রাতা রঘুনাথ পূর্ববৎ লক্ষ্মীর অঙ্কে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিলেন, মৃদুস্বরে উভয়ে গভীর অঙ্ককার রস্বানীতে পূর্ব কথা কহিতে লাগিলেন । ধীরে ধীরে ভ্রাতার ললাটে ও দেহে হস্ত বুলাইয়া লক্ষ্মী কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, রঘুনাথ তাহার উত্তর করিতে লাগিলেন । দক্ষা-হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া অমাখা বালক কোন কোন দেশে বিচরণ করিয়াছিলেন, কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তাহাই বলিতে লাগিলেন । কখন মহারাজীর কৃষ্ণকদিপের সহিত চাষ করিতেন, কখন গৌ বৎস বা মেঘপাল রক্ষা করিতেন, মেঘের সঙ্গে সঙ্গে পর্বতে, উপত্যকায়, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেন বা নিঃস্বপনে বসিয়া চরণদিগের গীত গাইতেন । কখন সায়ংকালে নদীকূলে এ-

কাকী বসিয়া উঠিলেঃস্বরে সেই গীত গাইয়া হৃদয়কে শাস্ত করিয়াছেন, কখন প্রভুবে অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্নবাস্থায়ন করিয়া উঠিলেঃস্বরে রোদন করিয়াছেন । পর্বতসঙ্কুল কঙ্কণ-প্রদেশে কএক বৎসর অবস্থিত করিয়াছেন, একজন মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকের অধীনে কার্য্য করিতেন, ত্রাহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেন । বয়োবৃদ্ধির সহিত যুদ্ধ-ব্যায়ামে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অবশেষে মহানুভব শিবজীর নিকট উপস্থিত হইয়া সৈনিকের পদ গ্রহণ করেন । আজি তিনি বৎসর হইল সেই কার্য্য করিয়াছেন, জগদীশ্বর জানেন তিনি কার্য্যে ক্রটি করেন না, কিন্তু সেই চন্দ্রবাগের ষড়্ভুজ্ঞে অত্যুপমানিত হইয়া দেশে দেশে নিরাপত্তারূপে ভ্রমণ করিতেছেন । এক্ষণে জীবনে তাঁহার উদ্দেশ্য মাত্র নাট, পিতার ন্যায় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া এ অসার জগৎ পরিত্যাগ করিবেন ।

জাতার দুঃখ-কাহিনী শুনিতে শুনিতে স্নেহময়ী ভগিনী নিঃশব্দে অব্যবহিত আশ্রয় করিতেছিলেন ; তিনি নিজের শোক সহ্য করিতে পারেন, জাতার দুঃখে একবারে ব্যাকুল হইলেন । যখন সে কথা শেষ হইল কথক্ৰমে শোক স্মরণ করিয়া আপনাকে পরিচয় দিবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন । চন্দ্রবাগের উপর জাতার যে বিজাতীয় ক্রোধ তাহা তিনি বুঝিলেন, চন্দ্রবাগের স্ত্রী বলিয়া পরিচয়

দিলে জাতার হৃদয়ে কি কষ্ট হইবে, তাহাও বুঝিলেন । ধীরে ধীরে আশ্রয়লাভ করিয়া বলিলেন ;—

‘মহারাষ্ট্রদেশে আনিবার অনতিপরেই একজন সম্রাট মহারাষ্ট্র জায়গীরদার তাঁহাকে বিবাহ করেন । নারী স্বামীর নাম করে না, কিন্তু গগনের শশধরের নামই তাঁহার স্বামীর নাম, গগনের শশধরের ন্যায় তাঁহার ক্ষমতা ও গৌরবজ্যোতি চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে । তাঁহার বিপুল সংসারে লক্ষ্মী সুরে আছেন, প্রভুও দাসীর উপর অনুগ্রহ করেন, সে অনুগ্রহে দাসী সুরে আছেন । এ জীবনে তাঁহার আর কোন বাসনা নাট, কেবল প্রাণের জাতাকে সুরে থাকিতে দেখিলেই তাঁহার জীবন সার্থক হয় ।

হৃদয়নাথের সংবাদ তিনি মধ্যে মধ্যে পাইতেন, তাঁহাকে একবার দেখিবার জয় কত চেষ্টা করিয়াছেন । অদ্য সেই কামনা মন্দিরে পূজা দিতে আসিয়াছিলেন, সহসা মন্দির পার্শ্বে বৃক্ষমূলে প্রাণের জাতাকে পুনরায় পাইলেন ।

এইরূপে আশ্রয়লাভ করিয়া লক্ষ্মী জাতার হৃদয়ে শেলসম দুঃখ উৎপাটন করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন । লক্ষ্মী দুঃখিনী, দুঃখের ব্যথা জানিতেন । লক্ষ্মী নারী, দুঃখ সান্ত্বনা করিতে জানিতেন । সহিষ্ণু হইয়া নিজ দুঃখ সহ্য করা ও সান্ত্বনা দিয়া পরের দুঃখ দূর করাই নারীর ধর্ম্ম ।

অনেক প্রকার প্রবোধ বাক্য দিয়া জা-

তার মন শান্ত করিতে লাগিলেন। বলিলেন আমাদের জীবনই এইরূপ, সকল দিন সমান থাকেনা। ভগবান্ যেসুখ দেন তাহা আমরা ভোগ করি, যদি একদিন দুঃখ পাই তাহা কি সহ্য করিতে বিমুখ হইব? মানব জন্মই দুঃখময়, যদি আমরা দুঃখ সহ্য না করিব তবে কে করিবে? সুদিন দুর্দিন সকলেরই আছে,—দুর্দিনে যেন আমরা সেই বিধাতার নাম লইয়া নিজ শোক বিস্মৃত হই। তিনিই একদিন পিত্রালয়ে আমাদের সুখ দিয়াছিলেন, তিনিই অদ্য কষ্ট দিয়াছেন, তিনিই পুনরায় সে কষ্ট মোচন করিবেন।

লক্ষ্মী পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

‘ভাই! এ নৈরাশ দূর কর; এরূপ অবস্থায় থাকিলে শরীর কত দিন থাকিবে? আহার নিত্রাণ ভাগ করিলে মনুষ্য-জীবন কত দিন থাকে?’

রঘুনাথ। ‘থাকিবার আবশ্যক কি? যে দিন বিদ্রোহী বলিয়া সৈনিকের নামে কলঙ্ক পড়িল, সেই দিন সৈনিকের জীবন গেল না কি জন্য?’

লক্ষ্মী। ‘তোমার ভগ্নী লক্ষ্মীকে চিরদুঃখিনী করিবে এই কি ইচ্ছা? দেখ ভাই আমার আর এ জগতে কে আছে? পিতা নাই, মাতা নাই, জগৎ সংসারে কেহ নাই। তুমিও কি দুঃখিনী লক্ষ্মীর প্রতি সমস্ত মমতা তুলিলে? বিধাতা কি এ হতভাগিনীর উপর একেবারে বিমুখ

হইলেন?’ লক্ষ্মীর মনন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রঘুনাথ ক্ষুব্ধ হইয়া সম্মুখে লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া বলিলেন, ‘লক্ষ্মী! তুমি আমাকে ভাল বাস, তাহা জানি, তোমাকে যে দিন কষ্ট দিব’সে দিন যেন ঈশ্বর আগার প্রতি বিমুখ হন। কিন্তু ভগিনি! এ জীবনে আর আমার সুখ নাই,—তুমি স্ত্রীলোক, সৈনিকের শোক বুঝিবে কি রূপে, জীবন অপেক্ষা আমাদের মৃত্যু অশুভে কষ্টকর! সেই কলঙ্কে রঘুনাথের নাম কলুষিত হইয়াছে।’

লক্ষ্মী। ‘তবে সেই কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টায় কেন বিমুখ হও? মহানুভব শিবঙ্গীর নিকটে যাও, তাঁহার ক্রোদ দূর হইলে তিনি অবশ্যই তোমার কথা শুনিবেন, তোমার দোষ নাই, বুঝিবেন।’

রঘুনাথ উত্তর করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিলেন পিতার অভিমান, পিতার দর্প, পুস্ত্রে বর্তমান। তিনি প্রাণ থাকিতে অনায়াচারীর নিকট আবেদন করিবেন না। ভীক্স বুদ্ধিমতী জাতার অন্তরের ভাব বুঝিয়া সেইরূপ প্রস্তাব করিলেন। বলিলেন, ‘মার্জনা কর, আমি স্ত্রীলোক, সমস্ত বুঝি না। কিন্তু যদি শিবঙ্গীর নিকট যাইতে অস্বীকার কর, কার্যধারা কেন আপন বশ রক্ষা কর না?’

শিতা বলিতেম সেনার সাহস ও প্রভু-
ভক্তি সমস্ত কার্যে প্রকাশ হয়, যদি বি-
ক্রোহী বলিয়া তোমাকে কেহ সন্দেহ ক-
রিয়া থাকে, অসিহস্বে কেন সে সন্দেহ
খণ্ডন কর না?'

উৎসাহে রঘুনাথের নয়ন ধক্ পক্ ক-
রিতে লাগিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,
'কি রূপে?'

লক্ষ্মী। 'শুনিয়াছি শিবজী দিল্লী
বাইতেছেন, তথায় সহস্র ঘটনা ঘটিতে
পারে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিকের আত্মপরিচয়
দিবার সহস্র উপায় থাকিতে পারে।
আমি ত্রিলোক, আমি কি জানিব, বল?
কিন্তু তোমার পিতার নাম সাহস, তাঁহা-
রই মায় বীরত্ব-প্রতিজ্ঞা করিলে তো-
মার কোন্ উদ্দেশ্য না সফল হইতে
পারে?'

রঘুনাথের যদি অন্য চিন্তার সময় থাকিত তবে বুঝিতেন কনিষ্ঠা লক্ষ্মী মানব-
হৃদয়-শাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহেন; যে
ঐবধি আজি রঘুনাথের হৃদয়ে ঢালিয়া-
ছিলেন, তাহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে শোকস-
স্তাপ দূর হইল, সৈনিকের হৃদয় পূর্ব্ববৎ
উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল।

রঘুনাথ অনেককণ নিম্পন্দে চিন্তা
করিলেন, তাঁহার নয়ন উল্লাসোৎফুল্ল, মুখ-
মণ্ডল সহসা নব গৌরব ধারণ করিল।
অনেককণ পরে বলিলেন—

'লক্ষ্মী! তুমি বালিকা, কিন্তু তোমার
কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনে যুতন

ভাবের উদয় হইল। আমার জীবন আর
নিকশেষ্য নহে, আমার হৃদয় উৎসাহশূন্য
নহে। ভগবান সহায় হউন, রঘুনাথজী
বিক্রোহী নহে, ভীক নহে, একথা জগতে
এখন প্রচার হইবে। কিন্তু তুমি বালিকা,
তোমার নিকট এসমস্ত কহি কেন, তুমি
আমার হৃদয়ের ভাব কি বুঝিবে?'

লক্ষ্মী দ্বয়ৎ হাসিলেন, তাবিলেন
'রোগ নির্ণয় করিলাম আমি, ঐবধি দি-
লাম আমি, তথাপি কিছু বুঝি না?'
প্রকাশ্যে বলিলেন, 'ভাই! তোমার উৎ-
সাহ দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইল। তো-
মার মহৎ উদ্দেশ্য আমি কিরূপে বুঝিব?
কিন্তু যাহাই হউক তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী
যত দিন বাঁচিবে, তুমি পূর্ণমনোরথ হও,
জগদীশ্বরের নিকট ইহাই প্রার্থনাকরিবে।'

রঘুনাথ। 'আর লক্ষ্মী! আমি যত
দিন বাঁচিব, তোমার স্নেহ, তোমার ভাল-
বাসা কখন বিস্মৃত হইব না।'

অনেককণ পরে লক্ষ্মী অধোবদনে
দীরে দীরে কহিলেন,—

'আমার আর একটি কথা আছে,
কিন্তু কহিতে ভয় হইতেছে।'

রঘু। 'লক্ষ্মী! আমার নিকট তোমার
কি কথা বলিতে ভয় হয়? আমি তোমার
সহোদর, সহোদরের নিকট কি ভয়?'

লক্ষ্মী। 'চন্দ্ররাও নামে একজন জ-
মলাদার বোধ হয় তোমার অপকার করি-
য়াছেন।'

রঘুনাথের হাত দূর হইল, রোষে জি-

বাৎসর্য ওষ্ঠের উপর দস্ত স্থাপন করিলেন। বাক্সফুর্জি হইল না।

কম্পিতস্বরে দুঃখিনী লক্ষ্মী বলিলেন, 'ক্রিছাৎসা মহম্বোকে অশুচিত। ভাই, অজীকার কর তাঁহার অনিষ্ট করিবে না।'

রঘুনাথ কর্কশ ভাবে বলিলেন—

'তিনি যদি আমার সহোদর ভ্রাতা হইতেন তথাপি কপটাচারীকে মার্জনা করিতাম না,—এই অসি দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিব। সে পামরের নাম করিয়া কেন তোমার পবিত্র মুখ কলুষিত করিতেছ ?'

লক্ষ্মী স্বভাবতঃ স্থিরপ্রকৃতি, শান্তা, ও বুদ্ধিমতী, কিন্তু স্বামীনিন্দা সহ করিতে পারিলেননা। সজল নয়নে সরোষে বলিলেন।

'ভ্রাতার নিকট পূর্বে কখনও আমি কোন ভিক্ষা করি নাই; একটি কথা বলিলাম তাহা রাখিলে না; আমি পাপীয়া, আমরা সকলে পামর; বিদায় দাও, আর জন্মের মত ভগিনীকে দেখিতে পাইবে না।'

সম্মেহে, সজলনয়নে রঘুনাথ বলিলেন,

'লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! তোমাকে কবে আমি মন্দ কথা বলিয়াছি? চন্দ্ররাগকে আমি মার্জনা করিতে পারি না, কেন সে ভিক্ষা করিতেছে?'

লক্ষ্মী ঝর্ ঝর্ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন,—'অবাধা ভগিনীর প্রতি কত ভালবাসা আছে তাহাই জানিবার জন্য। ভাই! তাহা জানিলাম।

এক্ষণে বিদায় দাও, দুঃখিনীর অন্য ভিক্ষা নাই।'

রঘুনাথ সজলনয়নে অনেক ক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, 'লক্ষ্মী! চন্দ্ররাগের জন্ম তুমি কেন বাচুণা করিতেছ জানি না, তাহাকে কখনও মার্জনা করিব মনে করি নাই; কিন্তু তোমার নিকট অদেয় আমার কিছু নাই। এই ঈশানী-মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করিতেছি চন্দ্ররাগের অনিষ্ট করিব না। আমি তাহার দোষ মার্জনা করিলাম—জগদীশ্বর তাহাকে মার্জনা করুন।'

লক্ষ্মী হৃদয়ের সহিত বলিলেন 'জগদীশ্বর তাঁহাকে মার্জনা করুন।'

পূর্বদিকে প্রভাতের আলোকছটা দেখা যাইল। লক্ষ্মী তখন অনেক অশ্রুবর্ষণ করিয়া সম্মেহে ভ্রাতার নিকট বিদায় লইলেন, বলিলেন—'আমার সঙ্গে বাটার অন্য লোক মন্দিরে আসিয়াছে এখনও সকলে নিদ্রিত আছে, এইক্ষণেই আমি না যাইলে জানিতে পারিবে। এখন চলিলাম, পরমেশ্বর তোমার মনোরথ পূর্ণ করুন।'

'পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন।' এই বলিয়া সম্মেহে লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইয়া রঘুনাথও মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইলাম, পাঠক! চল আমরা হতভাগিনী সরসুর নিকট বিদায় লইয়া আইসি।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

“যাও যুদ্ধে, তোমা অদ্য করি অভিশেক,

* * * *

“যাও যশোবিমণ্ডিত হইয়া আবার
“এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে।”

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কত্ৰমগুল হুর্গ আক্রমণের দিন রঘুনাথের যাইতে কি জন্য বিলম্ব হইয়াছিল পাঠক অবশ্যই উপলব্ধি করিয়াছেন। সে যুদ্ধ, সে আক্রমণ, অতিশয় সফটাপন্ন, রঘুনাথ জানিতেন। সফটের সময় পশ্চাতে থাকা রঘুনাথের অভ্যাস ছিল না, স্মৃতরাং সে যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিবেন কি না, সন্দেহ। যুদ্ধে যাইবার পূর্বে একবার প্রাণভরে হৃদয়ের সরযুকে দেখিবার ইচ্ছা করিলেন,—জীবনের মত একবার সরযুর নিকট বিদায় লইবেন।

সন্ধার সময় ছাদে সরযু বালা ভ্রমণ করিতেছিলেন,—ধীরে ধীরে পশ্চাতে আসিয়া রঘুনাথ ডাকিলেন ‘সরযু!’ সে শোকপূর্ণ স্বর শুনিয়া সরযু শিহরিয়া উঠিলেন, রঘুনাথের অশ্রু-আপ্ত চক্ষু হুটী দেখিয়া ভীত হইলেন। উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে রঘুনাথের নিকটে আসিয়া হুই হস্তে রঘুনাথের হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—

‘ছি রঘুনাথ! তোমার চক্ষুতে জল কেন? তোমার কোন কষ্ট হইয়াছে? আমার মাথা খাও, বল না, চক্ষের জল ফে-

লিতেছ কেন?’ নিজের অঞ্চল দিয়া রঘুনাথের চক্ষু মুছাইয়া দিলেন,—কিন্তু অগত্যা আপনার চক্ষুতে জল আসিল।

রঘুনাথ যখন আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন,—‘না সরযু, কিছু নহে। তোমাকে যখন দেখি তখনই আমার হৃদয় পূর্ণ হয়, আমি কথা কহিতে পারি না। যে দিন প্রথমবার তোমাকে ভোরণ-দুর্গে দেখিয়াছিলাম, সে দিন যেরূপ আমার শরীর হইতে প্রাণ তোমার দিকে ধাবিত হইয়াছিল,—এখন শতবার তোমাকে দেখিয়াছি, দিবানিশি তোমার মুখখানি মনে মনে দেখি,—এখনও প্রাণ সেইরূপ তোমার দিকে ধায় এখনও শরীর সেইরূপ অবসন্ন হয়। জগদীশ্বর! এমন পুণ্য কি করিয়াছি যে এ আনন্দময়ী পুষ্পকে হৃদয়ে ধারণ করিব!’

সরযু কথা কহিতে পারিলেন না,—রঘুনাথের হস্তে, তাঁহার হস্ত সন্নিবেশিত ছিল, কেবল সেই হস্ত ঘর্মান্ত ও কম্পিত হইল, দেহযষ্টি বায়ুতাড়িত পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল, কমনীয় লজ্জায় রঞ্জিত মুখমণ্ডল হেঁট করিলেন, অর্থে চক্ষু হুটী জলে প্লাবিত হইল। উঃ! রঘুনাথের কথায় সরযুর হৃদয়ে যে আনন্দলহরী বহিতোছিল কে বর্ণনা করিতে পারে? জগতে কি আনন্দ আছে, স্বর্গে কি স্বর্থ আছে, যে জন্য সরযু সে মুহূর্তের আনন্দ বিনিময় করিতে চাহেন?

হুই জনে কণেক পরস্পরের হস্তধারণ

করিয়া শুদ্ধ হইয়া রহিলেন; শেষে রঘুনাথ বলিলেন—

‘সরযু! এখন বিদায় দাও।’

সহজ স্বরে এই কথাগুলি কহিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কণ্ঠস্বর কম্পিত হইল,—সরযু পুনরায় রঘুনাথের হৃদয়ের উদ্বেগ বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন—

‘রঘুনাথ, তোমার মনে কি কথা আছে অ'মাকে বলিতেছ না; তাহা না হইলে সন্ধ্যার সময় হঠাৎ আমাকে দেখিয়া চক্ষুর জল ফেলিলে কেন,—তাহা না হইলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াই বিদায় চাহিতেছ কেন? ছি ছি তুমি আমার নিকট মনের কথা লুকাইতেছ, রঘুনাথ! সরযুর মনে এমন কথা কি আছে যে তুমি না জান?’

রঘুনাথ অদ্য নিশীথের যুদ্ধকথা গোপন করিবেন বিবেচনা করিয়াছিলেন, আর পারিলেন না, বলিলেন—

‘না সরযু, তোমার নিকট লুকাইবার রঘুনাথের কি আছে,—আজ,—আজ, আজ রাত্রিতে একটি সামান্য যুদ্ধে যাইতেছি সেই জন্য বিদায় লইতে আসিলাম, চিন্তা করিও না, পুনরায় কাল দেখা হইবে!’

সরযু শিহরিয়া উঠিলেন, দাঁড়াইতে না পারিয়া রঘুনাথের শরীরের উপর হেলিয়া পড়িলেন এবং তাঁহারস্বন্ধে আপন মস্তক স্থাপন করিলেন; কথা কহিতে পারিলেন না; রঘুনাথ দেখিলেন সরযু নিরব,

অজ্ঞ অশ্রুতে তাঁহার স্বন্ধ, বাহ ও বকঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে!

রঘুনাথ অনেক কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—ছি সরযু, তুমি কেন মিথ্যা ভয় করিতেছ; আমি কত যুদ্ধে গিয়াছি, পুনরায় ত তোমার পার্শ্বে আসিয়াছি, অদ্য এটি অতি সামান্য যুদ্ধ মাত্র। আর দেখ, আমরা পরাধীন, যুগিত, অপদার্থ, মুসলমানেরা আমাদের রাজা, আমরা দাস; একথা স্বরণ করিলে কাহার অন্তঃকরণ না বিদীর্ণ হয়, কে না নীরবে রোদন করে? পুনরায় হিন্দুরাজ্যের জন্য আমরা যুদ্ধ করিতেছি, যিনি মিরাজ্ঞয়ের আশ্রয়, দুর্কলের বল, তিনি আমাদের সহায় হইবেন। আর যদিই এ যুদ্ধে হত হই, মনুষ্যভাণ্ডে ইহা অপেক্ষা কি মুখ হইতে পারে? তুমি রাজপুত্র কন্যা, রাজপুত্রের ন্যায় অদ্য আমাকে বিদায় দাও।’

স্বগে কয়েকদিনে সরযুর হৃদয়ের উদ্বেগ শান্ত হইল, তিনি মস্তক তুলিয়া শান্ত নির্মল পবিত্র নয়নে রঘুনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—‘রঘুনাথ তোমার মহৎ উদ্দেশ্য জানি, যে দিন অবদি তুমি সেই উদ্দেশ্যের কথা আমাকে বলিয়াছ, সেই দিন অবদি কখনও তোমাকে যুদ্ধে যাইতে বিরত করি নাই। অদ্যও করিব না, কিন্তু নারীর প্রাণ, কখন কি ভাব উদয় হয় কে বলিবে, সহসা আমার মনে কেন ব্যথা পাইলাম, সহসা কেন চক্ষুতে

জল আশিল জানি না। যাও রঘুনাথ বিলম্ব করিওনা; ভোমার হৃদয় সাহসী, আশয় মহৎ ও উন্নত, যুদ্ধে চিরস্বরী হও, দেশ দেশান্তরে ভোমার বশ, ভোমার নাম প্রচারিত হউক, সরযু ও একাকিনী বসিয়া সেই যশোগীত গাইবে! জগদীশ্বর তোমাকে জয়ী করুন! তিনি জগতের রাতা, যিনি যোদ্ধার চিরবন্ধু, তাঁহাকে প্রণাম করি।'

'তিনি তোমাকে নিরাপদে রাখুন এই বলিয়া রঘুনাথ চলিয়া গেলেন। ছাদে সরযু একাকিনী দণ্ডায়মানা, রাজপুতবালা সাহস বাক্যে হৃদয়বলভকে বিদায় দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় শান্ত হইতেছে না, ঝর্ ঝর্ করিয়া নয়ন হইতে নীরবে অশ্রুচিবিন্দু পড়িতেছে।

কতক্ষণ পর অন্ধকার প্রান্তরে অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল; দূরে নিবিড় অন্ধকারে একজন অস্বারোহীর উন্নত আকৃতি বিলুপ্ত হইল। সরযু চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া আর কিছু দেখিতে পাইলেন না, সমস্ত নিস্তব্ধ ও অন্ধকার; তাঁহার হৃদয় শূন্য ও অন্ধকার! দীরে ধীরে ছাদ হইতে নামিলেন।

সেদিন অন্ধকারে সরযু নয়নের-মণি হারাইলেন, সেই দিন জীবনের জীবন হারাইলেন।

এক দিন, দুই দিন অতিবাহিত হইল, রঘুনাথের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। আশা প্রথমে কাণে কাণে বলিতে

লাগিল—'রঘুনাথ যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছেন, রঘুনাথ রাজসম্মানিত হইয়াছেন, বিজয়ী শীত্র উল্লাসিত হৃদয়ে সরযুপার্শ্বে আনিবেন, পরম কুতূহলে সরযুর হস্ত পরিয়া যুদ্ধের গণ্ডি বলিবেন।' অশ্বের ক্ষুরশব্দ হইলেই 'সরযুর হৃদয় উদ্বোধপূর্ণ হইত, তিনি গবাক্ষ দিয়া চাহিয়া দেখিতেন, পুনরায় দীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিতেন। যুদ্ধে দ্রুত পদবিক্ষেপ শুনিলে সরযু চমকিয়া উঠিতেন, পুনরায় নীরবে বসিয়া থাকিতেন।

দিন গেল রজনী আসিল, পুনরায় দিবস আসিল, এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল, রঘুনাথ আর আসিলেন না। সরযু সেই পথ চাহিয়া চাহিয়া আস্ত হইলেন, আশা চিন্তায় পরিণত হইল, বালিকার গণ্ডস্থল ক্রমে শুষ্ক হইল, চক্ষুদ্বয় ক্ষণে ক্ষণে জ্বলপূর্ণ হইতে লাগিল; রঘুনাথ আসিলেন না।

সে চিন্তার অবাক্তব্য যাতনা প্রকাশ করা যায় না; বালিকা কাহাকে সেকথা বলিবেন? নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, নীরবে গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন, অথবা সায়াংকালে সেই ছাদে উঠিয়া সেই অন্ধকার পরিপূর্ণ প্রান্তরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আস্ত হইতেন। সেই উন্নত দেহ কি দূরে দেখা যাইতেছে? সরযুর যোদ্ধা কি যুদ্ধ-উল্লাসে সরযুকে বিস্মৃত হইলেন? যুদ্ধে কি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে? সহসা অপ্রতুলে সর-

বুঝে মনন আশ্রিত হইল, শুধু গণ্ডস্থল দিয়া
ধারা বহিয়া পড়িতে লাগিল।

সহসা বজ্রেরন্যায় সংবাদ আসিল রঘুনাথ
বিজ্রোহী, বিজ্রোহাচরণের জন্ম অবমানিত
হইয়া দূরীকৃত হইয়াছেন! প্রথম মুহূর্ত্তে
সরযু চকিতের ন্যায় রহিলেন, কথার অর্থ
তাঁহার বোধগম্য হইল না। ক্রমে ল-
লাট রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, রক্তোচ্ছ্বাসে
মুখমণ্ডল রঞ্জিত হইল, শরীর কাঁপিতে
লাগিল, মনন হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হ-
ইতে লাগিল। দাসীকে বলিলেন “ কি
বলিলি, রঘুনাথ বিজ্রোহী? রঘুনাথ মু-
সলমানদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন?
কিন্তু তুই নিরর্থক, তোকে কি বলিব,
সম্মুখ হইতে দূর হ! ” শান্ত মীর-স্বভাব
সরযুকে এবিধ ক্রুদ্ধ দেখিয়া দাসী বি-
স্মিত হইল, শশব্যস্তে সরিয়া গেল।

ক্রমে যুদ্ধ হইতে একে একে অনেক
সৈন্য আসিতে লাগিল, সকলে বলিতে
লাগিল ‘রঘুনাথ বিজ্রোহী!’ বার বার
সরযু এই কথা শুনিতে লাগিলেন, তাঁহার
সখীগণ সরযুকে এই কথা বলিলেন; রুদ্ধ
জনার্দন সাশ্রুলোচনে বলিতে লাগিলেন
যে, কে জানে সেই স্বন্দর উদারমূর্ত্তি বাল-
কের মনে এরূপ ক্রুরতা ছিল? সরযু
সমস্ত শুনিলেন, কোন উত্তর করিলেন না,
রঘুনাথের বীরত্বে ও সত্যব্রততার সরযুর
যে স্থির অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, মুহূ-
র্ত্তের জন্য তাহা বিলুপ্ত হইল না। তিনি
কাহাকেও কোন উত্তর দিলেন না, তাঁ-

হার মুখমণ্ডল অজ্ঞ আরক্ত, মনন জল-
শূন্য!

এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হ-
ইলে পর এক দিন সন্ধ্যার সময় সরযু
সরোবরতীরে বাইলেন; হস্ত পদ প্রক্ষা-
লন করিয়া ধীরে ধীরে চিন্তিত ভাবে গৃ-
হাভিমুখে আসিতে লাগিলেন।

সহসা পশ্চিমধ্যে সেই নৈশ অন্ধকারে
জটাজুটধারী দীর্ঘকায় একজন গোশ্বা-
মীকে দেখিতে পাইলেন, ঈষৎ বিস্মিত
হইয়া দাঁড়াইলেন। যত গোশ্বামীর দিকে
দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার তেজঃ
পূর্ণ অবয়ব দেখিয়া সরযুর হৃদয়ে ভক্তির
আবির্ভাব হইতে লাগিল।

ক্ষণেক পর একটি বিষয় চিন্তা করিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘প্রভু! একজন অসহায় নারী আ-
পনার আশ্রয় বাচুঞা করিতে আসিয়াছে,
তাহাকে ক্ষমা করুন।’

গোশ্বামী সরযুর দিকে চাহিলেন,
ক্ষণেক স্থির ভাবে দেখিয়া গভীরস্বরে
বলিলেন।

‘রমণি, আপনার উদ্দেশ্য আমি
অবগত আছি, কোন সুবক যোদ্ধার কথা
জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছেন!’

সরযু অধিকতর ভক্তি সহকারে ব-
লিলেন,—

‘ভগবন্ আপনার গণনাশক্তি অসা-
ধারণ,—যদি অমুগ্রহ করিয়া আরও কিছু
বলেন তবে বাধিত হই।’

গোশ্বা । ‘জগতে সকলে তাহাকে বিদ্রোহী বলিয়া জানে ।’

সরযু । ‘প্রভুর অজ্ঞাত কিছুই নাই । প্রকৃত অবস্থা কি ?’

গোশ্বা । ‘মহরাজ শিবজী তাঁহাকে বিদ্রোহী জানিয়াই দূর করিয়া দিয়াছেন ।’

সরযুর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, আরক্ত নয়নে কহিলেন, ‘তপস্যা প্রবন্ধনা বিশ্বাস করিব, কিন্তু রঘুনাথকে বিদ্রোহী বিশ্বাস করিব না ! গোশ্বামিন্ আমি বিদায় হই ।’

গোশ্বামীর নয়ন সহসা জ্বলপূর্ণ হইল;—ধীরে ধীরে বলিলেন, ‘আরও কিছু আমার বক্তব্য আছে ।

সরযু । ‘নিবেদন করুন ।’

গোশ্বা । ‘মনুষ্য হৃদয় অবগত হওয়া মনুষ্যাগণনার অসাধ্য, যোদ্ধার হৃদয়ে কি ছিল জানিবার এক মাত্র উপায় আছে ।

“শাস্ত্রে লিখে প্রগল্বিনীর হৃদয় প্রগল্বীর হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ ; যদি রঘুনাথের বসর্ষ প্রগল্বিনী কেহ থাকে, তাঁহার নিকট গমন করুন, তাঁহার হৃদয়ের ভাব কি প্রিজ্ঞাসা করুন, তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা মিথ্যাবাদিনী নহে ।’ গোশ্বামী তীব্রদৃষ্টিতে সরযুর দিকে চাহিতে ছিলেন ।

সরযু । আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ‘জগদীশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ

।। করি, তুমি আমার হৃদয়ে এতক্ষণে শান্তি

দান করিলে । সেই উন্নত চরিত্র যোদ্ধার প্রগল্বিনী হইবার যে আশা করে, জীবন থাকিতে রঘুনাথের সত্যব্রতকে তাহার স্থির বিশ্বাস বিচলিত হইবে না । হৃদয়েশ ! জগতে তোমার অন্যান্য নিন্দা ককক, কিন্তু একজন দুঃখিনী বিপদে সম্পাদে চিরকাল তোমার যশোগান গাইবে ।’ সরযুর নয়ন যুগল এতক্ষণে জ্বলপূর্ণ হইল, গোশ্বামী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়াছিলেন,—তাঁহার দুই নয়ন শুষ্ক ছিলনা, তাপসের শান্ত হৃদয় উৎক্লিষ্ট হইতেছিল ।

ক্ষণেক পর কষ্টে আত্মসংযম করিয়া গোশ্বামী বলিলেন,—

‘ভয়ে ! আপনার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, যে আপনিই সেই যোদ্ধার প্রকৃত প্রগল্বিনী । আমি দেশে দেশে পর্যটন করি, সম্ভবতঃ রঘুনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে পারে;—আপনার তাঁহাকে কিছু বক্তব্য আছে ?’

গোশ্বামীর সম্মুখে রঘুনাথকে হৃদয়েশ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, স্মরণ করিয়া সরযু দ্বৈবে লজ্জিত হইলেন ; কিন্তু সে ভাব স্মরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—

‘প্রভুর সহিত তাঁহার সম্ভ্রতি সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?’

গোশ্বা । ‘কল্যা রজনীতে দেশানী মন্দিরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল ।’

সরযু । ‘রঘুনাথ আপাততঃ কি

করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, প্রভু কি অবগত আছেন ?

গোশ্বা। 'নিজ বাহুবলে নিজকার্য-
গুণে অন্যান্য অপযশ তিরোহিত করিবেন
অথবা সেই চেষ্টিয়া প্রাণদান করিবেন।'

সরযু। 'ধন্য বীরপ্রতিজ্ঞা ! প্রভু !
যদি তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়,
বলিবেন, সরযু রাজপুত্রবালা, জীবন অ-
পেক্ষা যশ অধিক জ্ঞান করে ! বলিবেন,
সরযু যতদিন জীবিত থাকিবেন রঘুনাথ কে
কলঙ্ক শূন্য বীর বলিয়া তাঁহারই চিন্তা
করিবে, তাঁহারই যশোগীত গাইবে,।
ভগবান অবশ্য রঘুনাথের যত্ন সফল করি-
বেন

গোশ্বা। 'ভগবান তাহাই কল্পণ
কিন্তু ভজ্রে ! সত্যের সর্বদা জয় হয় না,—
বিশেষ রঘুনাথ যে দুর্ভেদ উদ্যমে প্রবৃত্ত হই-
তেছে, তাহাতে তাঁহার প্রাণসংশয় ও
আছে।'

সরযুর নয়নদ্বয় সহসা জলপূর্ণ হইল,
কিন্তু তৎক্ষণাৎ সদর্পে সে জল মোচন
করিয়া বলিলেন,—

'রাজপুত্রের সেই ধর্ম ! আপনি তাঁ-
হাকে জানাইবেন যদি কর্তব্য সাধনে
হৃদয়শের প্রাণ বিয়োগ হয়,—তাঁহার
দাসী তাঁহার যশোগীত গাইতে গাইতে
উল্লাসে নিজপ্রাণ বিসর্জন দিবে।'

উভয়ে ক্ষণেক নিশ্চল হইয়া রহিলেন ;
গোশ্বায়ীর বাক্যশক্তি ছিল না। অনেক-
ক্ষণ পরে সরযু জিজ্ঞাসা করিলেন,

'রঘুনাথ আর কিছু আপনার নিকট বলি-
য়াছিলেন ?'

গোশ্বায়ী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া উত্তরে
কম্পিতস্বরে বলিলেন—“আপনাকে জি-
জ্ঞাসা করিয়াছেন, বিদ্রোহী বলিয়া জ-
গৎ বাহাকে স্মরণ করিবে আপনি কি তা-
হাকে হৃদয়ে স্থান দিবেন ? জগতে তা-
হার নাম উচ্চারণ করিবে না, আপনি
কি মনে মনে তাহার নাম স্মরণ করিবেন ?
জগতে কি একজনমাত্র বিদ্রোহী রঘুনাথকে
নির্দেষী বলিয়া জানিবেন ;—স্মৃতি, অ-
বমানিত, দূরীকৃত রঘুনাথকে ঐ শীতল
হৃদয়ে স্থান দিবেন ?’ সন্যাসীর কঠোরোধ
হইল

সরযু বলিলেন 'প্রভু ! সে বিষয় কি
জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? সরযু রাজপুত্র-
বালা, অনিশ্চাসিনী নহে।'

গোশ্বা। 'জগদীশ্বর ! তবে আর
তাঁহার হৃদয়ে কষ্ট নাই, লোকে যদি মন্দ
বলে তিনি জানিবেন একজন এখনও রঘু-
নাথকে বিশ্বাস করে !

এক্ষণে বিদায় দিন ; আমি এই কথা-
গুলি বলিলে রঘুনাথের হৃদয়ে শান্তিসেচন
হইবে !'

সজল নয়নে সরযু বলিলেন, 'আরও
বলিবেন তাঁহার উন্নত উদ্দেশ্য আমি প্র-
তিরোধ করিব না, অসিহস্তে যশের পথ
পরিষ্কার করুন, যিনি জগতের আদি পু-
ত্র তিনি তাঁহার সহায় হইবেন ! আর যদি
এই উদ্যমে তাঁহার কোন অমঙ্গল ঘটে,

জানিবেন, তাঁহার চিরবিধ্বাসিনী সরযু ও এ অকিঞ্চিৎকর জীবন বিসর্জন করিবে ।’

উভয়ে পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন । সরযু বলিলেন ‘প্রভু ! আমার হৃদয় শাস্ত করিয়াছেন, প্রভুর নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি ?’

.গোস্বামী চিন্তা করিয়া বলিলেন, ‘সীতাপতি গোস্বামী ।’

রজনী জগতে গভীরতর অন্ধকার ঢালিতে লাগিল ! সেই অন্ধকারে একজন গোস্বামী একাকী রায়গড় দুর্গাভিমুখে গমন করিতেছে ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ।

রায়গড় দুর্গ ।

“ দিক্ দেব ঘৃণাশূনা, অক্ষুদ্র হৃদয়,
এত দিন আছ এই অন্ধতমপুরে,
দেবত্ব, বিভব, বীর্ঘা, সর্ব ভোগাগিণী,
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জ্বলি ?’

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

পূর্বোক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর, শিবজীর তদানিস্তন রাজধানী রায়গড়ে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটি সভা সম্মিলিত হইয়াছে । শিবজীর প্রধান প্রধান সেনাপতি, মন্ত্রী, কৰ্মচারী ও দূরদর্শী বিচক্ষণ পুরোহিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সভায় উপস্থিত হইয়াছেন । পরাক্রান্ত যোদ্ধা, ধীশক্তি সম্পন্ন মন্ত্রী, শীর্গভ্রু ওরুকেশ

বহুদর্শী ন্যায়শাস্ত্রী, সভ্যতল শ্রুশোভিত করিয়াছেন ; যুদ্ধব্যবসায়, বুদ্ধিসঞ্চালনে বা বিদ্যাবলে ইহারাই শিবজীর চিরসহায়তা কবিয়াছেন, শিবজীর ন্যায় ইহাদের ও হৃদয় স্বদেশাতুরাগে পূর্ণ, হিন্দুদিগের গৌরবসাধন জন্য ইহারা দিনে দিনে মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে অনিচ্ছ হইয়া চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্তু অদ্য সে চেষ্টা কোথায়, সেই উৎসাহ কোথায় ? সভাস্থল নীরব, শিবজী নীরব, মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ অদ্য মহারাষ্ট্রীয় গৌরবলক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইবার জন্য সমবেত হইয়াছেন ।

অনেক্ষণ পর শিবজী মুরেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

‘পেসওয়ারী ! আপনি তবে এই পরামর্শ দিতেছেন, সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়াছি, তাঁহার অধীন জায়গীরদার হইয়া থাকিব ? মহারাষ্ট্রীয় গৌরবরবি চিরাক্ষকারে মগ্ন হইবে ?’

মুরেশ্বর । ‘মনুষ্যের ব্যাধি সাধা আপনি তাহা করিয়াছেন, বিধির নির্বন্ধকে লঙ্ঘন করিতে পারে ?’

পুনরায় সভাস্থ সকলে নীরব ।

পুনরায় শিবজী বলিলেন—

‘স্বর্গদেব ! যখন আপনি আমার আদেশে এই সুন্দর প্রশস্ত রায়গড় দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তখন ইহা রাজার রাজধানী স্বরূপ নির্মাণ করেন, না সামান্য জায়গীরদারের আবাসস্থান বলিয়া নির্মাণ করেন ?’

আবাজী স্বর্ণদেব ক্ষুধাশ্বরে উত্তর করিলেন—

‘কত্রিয়রাজ! ভবানীর আদেশে এক দিন স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, ভবানীর আদেশে সে চেফ্টা হইতে নিরস্ত হইয়াছেন, তাহাতে আক্ষেপ অবিধেয়। যখন রায়গড় নির্মাণ করিয়াছিলাম তখন কে জানিত হিন্দুসেনাপতি জয়সিংহ সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইবেন? ঈশানী স্বয়ং হিন্দুসেনাপতির সহিত যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন।’

অন্নজী দত্ত কহিলেন, ‘মহারাজ! পূর্বেই আমরা দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজ্য জয়সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছি, সে বিষয় অদ্য পুনরুস্থাপন করিয়া আক্ষেপ করিলে ফল কি? যাহা অনিবার্য তাহা হইয়াছে, অধুনা আপনার দিল্লীগমনের কর্তব্যাকর্তব্যতা বিবেচনা করুন।’

শিবজী কহিলেন, ‘অন্নজী! আপনার কথা সত্য, কিন্তু যে আশা, যে উৎসাহ, যে চেফ্টা হৃদয়ে বহুকালাবধি স্থান পাইয়াছে, তাহা সহজে উৎপাটিত হয় না;’ ক্রমে চিন্তার পর বলিলেন, ‘ঐ যে উন্নত পর্বতশ্রেণী চন্দ্রালোকে দৃষ্ট হইতেছে, বালা-রক্ষদ্ব অন্নজী মালজী! ঐ পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া বা উপত্যকার ভ্রমণ করিয়া হৃদয়ে কত স্বপ্নের আবির্ভাব হইত তাহা কি স্মরণ হয়? পুনারয় মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন হ-

ইবে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে, যুদ্ধিষ্ঠির বা রামচন্দ্রের ন্যায় সমাগরা ধরার অধিপতি, হিমালয় হইতে সাগর কূল পর্যন্ত সমগ্রদেশ শাসন করিবেন! ঈশানী! যদি এ আশা অলীক স্বপ্নমাত্র, তবে এরূপ স্বপ্নে কেন বালকের হৃদয় চঞ্চল করিয়াছিলে?’

এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইল; সকলে নীরব, সভায় শব্দ মাত্র নাই,—সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘরের এক প্রান্তে ঈষৎ অঙ্গকার স্থান হইতে একটি গম্ভীর-স্বর প্রসৃত হইল, ‘ঈশানী প্রবঞ্চনা করেন না; রাজ্য! তীক্ষ্ণ হস্তে অসি ধারণ করুন, অধাবসায় সহিত এই উন্নত পথ অনুসরণ করুন,—স্বপ্ন এখনও সফল হইবে!’

চকিত হইয়া শিবজী চাহিয়া দেখিলেন, জটাভূটধারী, বিভূতি-ভূষিত-অঙ্গ, নবীন গোস্বামী সীতাপতি!

উৎসাহে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল, বলিলেন, ‘গৌসাক্ষিকী! তুমি বালা-উৎসাহ আমার হৃদয়ে পুনরুদ্রেক করিতেছ,—বালা-কথা পুনারয় স্মরণ হইতেছে! তাত, দাদাজী কানাইদেব মৃত্যুশয্যায় শয়িত হইয়া আমাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন ‘বৎস! তুমি যে চেফ্টা করিতেছ তদপেক্ষা মহত্তর চেফ্টা নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা সাধন কর, ব্রাহ্মণ গোবৎসাদি ও কৃষকগণকে রক্ষা কর, দেবালয় কলুষিতকারীকে শাস্তি প্রদান কর, ঈশানী

যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিয়া-
ছেন, সেই পথ অনুগ্ৰহণ কর । ’ বিংশতি
বৎসর পরে অদ্যাপি দাদাজীর গম্ভীরস্বর
আমার কর্ণ-কুহরে শব্দিত হইতেছে,—দা-
দাজী কি প্রবঞ্চনা বা ক্য উচ্চারণ করিয়া-
য়াছিলেন ? ’

পুনরায় সেই গোস্বামী সেই গম্ভীর
স্বরে বলিলেন,—‘ কানাইদেব প্রবঞ্চনা
বা ক্য উচ্চারণ করেন নাই, উন্নত পথ
অনুসরণ করিলে অবশ্যই উন্নত ফললাভ
হইবে,—পথমধ্যে যদি আমরা ভ্রমোৎ-
সাহ হইয়া উদ্দেশ্য হারাইয়া নিরস্ত হই,
সে কি ভাত, দাদাজী কানাইদেবের প্রব-
ঞ্চনা না আমাদের ভীকতা ? ’

‘ ভীকতা ’ শব্দ উচ্চারণ মাত্র সভাতে
গোলযোগ উপস্থিত হইল, বীরদিগের
কোষে অসি বান্ধনা শব্দ করিল,—
ক্রোধী চন্দ্ররাত্ত জুমলাদার গোস্বামীর
গলদেশ সজোরে ধারণ করিলেন । সী-
তাপতি ধীর, ভগ্নশূন্য,—দীরে ধীরে আ-
পন বজ্রহস্তে চন্দ্ররাত্তের হস্ত ছাড়াইয়া
যেন পতঙ্গবৎ সেই জুমলাদারকে দূরে
নিক্ষেপ করিলেন । বিস্মিত হইয়া স-
কলে বুঝিলেন গোস্বামীর চিরজীবন কে-
বল যাগযজ্ঞে অতিবাহিত হয় নাই !

গোস্বামী পুনরায় গম্ভীরস্বরে বলি-
লেন,—

‘ রাজন্ ! ব্রাহ্মণের বাচলভ্রা কমা
ককম, যদি অন্যায় কথা উচ্চারণ করিয়া
থাকি কমা ককম ! কিন্তু মদীয় উপদেশ

সত্য কি অলীক, কত্রিররাজ ! আপন
বীর হৃদয়কে জিজ্ঞাসা ককম ! যিনি জার-
গীন্দাদের পদবী হইতে রাজপদবী গ্রহণ
করিয়াছেন, যিনি অসিহস্তে বহু বিপদ,
বহু সঙ্কট হইতে স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার
করিয়াছেন, যিনি পর্ষভে, উপত্যকার,
গ্রামে, অটবীতে, বীরবেদর চিহ্ন অঙ্কিত
করিয়াছেন, তিনি কি সে বীরত্ব বিস্ম-
রণ হইবেন, সে স্বাধীনতার জলাঞ্জলি
দিবেন ? বালসূর্য্যের ন্যায় যে হিন্দুরা-
জোর তেজ চারিদিকে অঙ্ককার বিদীর্ণ
করিয়া উদয় হইতেছে,—সে সূর্য্য কি
অকালে অস্ত যাইবে ? রাজন্, হিন্দু-
গৌরব-লক্ষ্মী আপনাকে বরণ করিয়াছেন,
আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে ত্যাগ ক-
রিবেন ? আমি ধর্ম্মব্যবসায়ী মাত্র, আ-
মার পরামর্শ দিবার অধিকার নাই, স্মরণ
বিবেচনা ককম । ’

সভাস্থ সকলে নীরব,—শিবজী নী-
রব, কিন্তু তাঁহার নয়ন ধক্ ধক্ করিয়া
জ্বলিতেছিল !

অনেক কণ পরে শিবজী গোস্বামীর
দিকে চাহিয়া বলিলেন—

‘ স্বামিন্ ! আপনার সহিত অঙ্গ-
দিনই আমার পরিচয় হইয়াছে,—আপনি
দেব কি মনুষ্য জানি না কিন্তু দৈববাণী
হইতে আপনার কথা অধিক মিষ্ট, হৃদয়ে
গভীরতর অঙ্কিত হইতেছে ! একটি কথা
জিজ্ঞাসা করি ;—হিন্দু-সেনাপতির তু-
মুল প্রতাপ, তীক্ রণকৌশল, অস্ত্রধা

রাজপুতসেনা, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করে এক-
রূপ সৈন্য আমাদের কোথায় ?'

সীতাপতি। রাজপুতগণ বীরাশ্র-
গণ্য, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণ ও দুর্বল হস্তে
অসি ধারণ করে না, জয়সিংহ রণপণ্ডিত,
কিন্তু শিবজীও ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ ক-
রিয়ান্ছেন। পরাজয় আশঙ্কা করিলেই
পরাজয় হয়। পুরুষসিংহ! বিপদ তুচ্ছ-
করিয়া, দৈব সংহনন করিয়া, কার্যসামান
ককন, ভারতবর্ষে একরূপ হিন্দু নাই যে
আপনার যশোগান না করিবে, আকাশে
একরূপ দেবতা নাই যিনি আপনার সহা-
য়তা না করিবেন!' সভাপ্তল পুনঃশুভিত।

শিবজী। 'মানিলাম, কিন্তু হি-
ন্দুতে হিন্দুতে যুদ্ধ করিয়া কথিরজ্ঞাতে
দেশ প্লাবিত করিবে, সেকি মঙ্গল, সে
পুণ্যকর্ম?'

সীতাপতি—'না—কিন্তু সে পাপে
কে পাতনী? যিনি স্বজাতির জন্য, স্বধ-
র্মের জন্য যুদ্ধ করেন, না যিনি মুসলমান
অর্থতুকু হইয়া স্বজাতির বৈরতাচরণ করেন,
তিনি?'

শিবজী পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন,
প্রায় এক দশ কাল নীরবে চিন্তা করিতে
লাগিলেন, তাঁহার বিশাল হৃদয় কত ভী-
ষণ চিন্তালহরীতে আলোড়িত হইতে ছিল,
কে বলিবে? এক দশ কাল পর দীরে২
মস্তক উঠাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—

'সীতাপতি! অদ্য জানিলাম মহা-
রাষ্ট্র দেশ এখনও বীরশূন্য হয় নাই, এ-

খনও পরাধীন হইবে না। পুনরায় যুদ্ধ
হইবে,—সে যুদ্ধের দিনে আপনা অপেক্ষা
বিচক্ষণ মন্ত্রী বা সাহসী সহযোগী আমি
আকাঙ্ক্ষা করি না। কিন্তু সে যুদ্ধের দিন
এখনও আইসে নাই। আমি পরাজয়
আশঙ্কা করিতেছি না, স্বধর্মি-নাশ আ-
শঙ্কা করিতেছি না, অন্য একটি কারণে
আপাততঃ যুদ্ধে বিমুখ হইতেছি, অবগ
ককন।

'যে মহৎব্রত ধারণ করিয়াছি তাহা
সামান্য কত বড়যন্ত্র, কত গুপ্ত উপায়
অবলম্বন করিয়াছি, আপনার নিকট অ-
গোচর নাই। কত হত্যা করিয়াছি, কত
সন্ধিবাক্য বিস্মরণ হইয়াছি, কত গর্হিত
কার্যে শিবজীর নাম কলুষিত রহিয়াছে!
দেব দেব মহাদেব জানেন আপনার লা-
ভের জন্য এ সমস্ত করিনাই,—হিন্দু-গৌ-
রব পুনরুদ্ধার হইবে, শিবজীর কেবল এই
এক মাত্র উদ্দেশ্য।

'অদ্য হিন্দুধর্মের অবলম্বনস্বরূপ,
হিন্দু প্রতাপের প্রতিমূর্তিস্বরূপ মহারাঞ্জ
জয়সিংহের সহিত সন্ধি করিয়াছি,—শি-
বজী সে সন্ধি লঙ্ঘন করিতে অপারগ!
বিধর্মীর সহিত কপটাচরণ করিয়াছি,—
ভাগবান্ সে পাপ ক্ষমা ককন,—মহানু-
ভব রাজপুতের সহিত কপটাচরণ শিবজী
জীবন থাকিতে করিবে না।

'ধর্মাস্বা এক দিন আমাকে বলিয়া
ছিলেন, সভাপালনে যদি সনাতন হিন্দুধ-
র্মের রক্ষা না হয় সভ্য লঙ্ঘনে হইবে!'

সেকথা অদ্যাপি আমি বিস্মৃত হইনাই,
—সে কথা অদ্য বিস্মরণ হইব না।

‘সীতাপতি! আরংজীব যদি আ-
মাদের সন্ধির কথা লঙ্ঘন করেন, তখন
আপনার পরামর্শ গ্রহণ করিব, তখন
শিবজী দুর্বল হস্তে খজা ধরিতে না।
কিন্তু জয়সিংহের সহিত এই সন্ধি লঙ্ঘন
করিতে শিবজী অপারগ।’

সত্যমদ সকলে নীরব হইয়া রহি-
লেন। ক্ষণেক পর অন্নজী বলিলেন—

‘মহারাজ! আর একটি কথা আছে
—আপনি কি দিল্লি যাওয়া স্থির করিয়া-
ছেন?’

শিবজী। সে বিষয়েও আমি জয়-
সিংহকে বাক্য দান করিয়াছি।’

অন্নজী। ‘মহারাজ! আরংজীবের
চতুরতা জানেন, তাঁহার কথা বিশ্বাস ক-
রিবেন? তিনি আপনাকে কি মনো-
রথে আক্রমণ করিয়াছেন তাহা কি আ-
পনি অনুভব করিতে পারেন না?’

শিবজী। অন্নজী! জয়সিংহ স্বয়ং
বাক্য দান করিয়াছেন যে দিল্লী গমনে
আমার কোনরূপ অনিচ্ছা ঘটিবে না।’

অন্নজী। ‘কপটাচারী আরংজীব
যদি আপনাকে বন্দী করেন বা হত্যা ক-
রেন, তখন জয়সিংহ কিরূপে আপনাকে
রক্ষা করিবেন?’

শিবজী। সন্ধি লঙ্ঘনের ফল তিনি
অবশ্যই ভোগ করিবেন। দস্তজী! মহা-
রাষ্ট্রভূমি বীরপ্রসবিনী, আরংজীব এরূপ

আচরণ করিলে মহারাষ্ট্র দেশে যে যুদ্ধানল
প্রজ্জ্বলিত হইবে সাগরের জলে তাহা
নিবারিত হইবে না, আরংজীব ও সমস্ত
দিল্লীর সাত্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যা-
ইবে! পাপের ফল নিশ্চয়ই ফলিবে!’

শিবজীকে স্থির প্রতিজ্ঞ দেখিয়া আর
কেহ নিবেদন করিলেন না। ক্ষণেক পর
শিবজী বলিলেন—

‘আর একটি কথা আছে, পেশও-
রাজী মুরেশ্বর! আবাজী স্বর্গদেব! অন্নজী
দস্ত! আপনাদিগের ন্যায় প্রকৃত বন্ধু
আমার অতি বিরল,—আপনাদিগের
ন্যায় কার্যক্ষম বিচক্ষণ পণ্ডিত মহারাষ্ট্র
দেশে বিরল। আমার অবর্তমানে মহা-
রাষ্ট্র দেশ আপনারা তিন জনে শাসন
করিবেন, আপনাদিগের আদেশ আমার
আদেশের ন্যায় সকলে পালন করিবে,
এরূপ আজ্ঞা দিয়া যাইব।’

মুরেশ্বর, স্বর্গদেব ও অন্নজী শাসনভার
গ্রহণ করিলেন। অন্নজী মালজী তখন
বলিলেন, ‘ক্ষত্রিয় রাজ! আমার একটি
আবেদন আছে। বাল্যকাল হইতে আ-
পনার সঙ্গ ত্যাগ করি নাই, অনুমতি ক-
কন, আপনার সহিত দিল্লী যাত্রা করি।’

সকল নয়নে শিবজী বলিলেন, মা-
লজী! তোমার নিকট আমার আদেশ কি-
ছুই নাই,—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।’

সীতাপতি ক্ষণেক পর বলিলেন ‘রা-
জন্! তবে আমাকে বিদায়শদিন, আ-
মার ব্রত সাধনার্থ বহুতীর্থে যাইতে হ-

ইবে। জগদীশ্বর আপনাকে নিরাপদে রাখুন।'

শিবজী। 'নবীন গোস্বামিন! ক্র-
শলে তীর্থযাত্রা করুন! যুদ্ধের সময় আ-
পনাকে পুনরায় স্মরণ করিব, আপনা অ-
পেক্ষা প্রকৃত যোদ্ধা আমি দেখিতে আ-
কাজ্জ্বল্য করি না। আপনার মত অস্পষ্ট ব-
য়সেই এরূপ ভেজস, সাহস ও বীরত্ব আমি
আর কাহারও দেখি নাই।'

পরে, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া
অপরিস্ফুটস্বরে বলিলেন—'কেবল আর
এক জনকে জানিতাম!'

সভা ভঙ্গ হইল। শিবজী শরণাগারে
বাইয়া বহুকক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন,
নবীন গোস্বামীর উৎসাহবাক্য বার বার
মনে উদ্ভেক হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ
পর নিদ্রিত হইলেন, নিদ্রায়ও যেন সেই
উৎসাহবাক্য শুনিতো লাগিলেন, সেই বী-
রভঙ্গী দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বপ্নে
সকল ঠিক দেখা যায় না, অবস্থা ও রূপের
পরিবর্তন হয়। শিবজী স্বপ্নে সেই উত্তে-
জনা বাক্য শুনিতো লাগিলেন, কিন্তু বক্তা
যেন সে নবীন গোস্বামী নহে, বক্তা রশু-
নাথজী হাবেলদার।



আর্য্যায়র্বেদ

অভাব ও প্রয়োজনীয়তাই বাবতীর
বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের জনক জননী।
অনাথা নদীমাতৃক মিলন দেশে জ্যামি-
তির বহুল প্রচার ও রূপণ-প্রকৃতি শীতক-
টীবন্ধে কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পযজ্ঞাদির
আদি উদ্ভাবন দৃষ্ট হইত না। জগতে যথ-
নই যে জাতি পরিত্যক্ত অপরায় জাতি অ-
পেক্ষা উন্নত হইয়াছে, তখনই সেই জাতি,
দেশ কাল ও জলবায়ুর ক্রিয়াভেদে, স্বীয়
বিশেষ বিশেষ অভাব মোচনার্থ নূতন উ-
পায় উদ্ভাবন করিয়া, অপেক্ষাকৃত অসভ্য
জাতির শিক্ষক হইয়াছে। উপরে যে শা-
স্ত্রের নামাঙ্কিত হইল, তাহা যে কোন জাতি
বিশেষের প্রয়োজনীয় মাত্র এমত নহে;

উহা শরীরমাত্রের সাধারণ প্রয়োজনতঃ।
প্রাচীনকালেও, যে সকল জাতি অতীব
অসভ্যাবস্থায় ছিল, তাহাদেরও তৎকালে
এইশাস্ত্র কিয়ৎপরিমাণে বিদিত ছিল।
যাহার শরীর আছে, তিনিই ইহার জন্য
কখনও না কখন ব্যাকুল হইয়াছেন। আ-
য়ুর্বিদ্যা ও তৎক্রিয়াধিকরণতঃ মানবশরীর
এইরূপ অখণ্ডা নিয়মে সংবদ্ধ যে, একের
অস্তিত্ব অপরের পরিচায়ক। কিন্তু তাদৃশ
আবহমান অকিঞ্চিৎকর অসংবদ্ধ ভেদজ-
ত্ব একটী বিজ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হইতে
পারে না।

ইতিহাসালোকবর্তী হস্তে করিয়া কা-
লের অন্ধকারপথে যে পর্য্যন্ত গমন করা

যায়, তন্মধ্যে ভারতের বেদ ও পরস্থানো-
দীচা প্রদেশের নিম্নরূপই প্রাচীনতম । এত-
দূরপেক্ষা দূরগতকালে কি ছিল, ভাষা ভা-
ষার কিছু পরিচয় দেয় না । আমরা
আদৌ প্রাচীনতম ঋগ্বেদের কয়েকটি প্রা-
র্থনা অবলম্বন করিয়া দেখাইব যে পৃথিবীর
প্রাচীনতম জাতি আৰ্য্যগণ তখনই প্রায়
শাস্ত্রনামোচিত আয়ুর্বিজ্ঞান উদ্ভাবন ক-
রিয়াছিলেন ।

উপাসনারূপে যেমন মনুষ্যের প্রকৃতি-
গত, মনুষ্য ইহা একেবারে ছাড়িতে পারে
নাই, বোধ হয় পারিবেও না, রোগোৎ-
পত্তিও তদ্রূপ মানবপ্রকৃতির আদিবিকার-
জনিত; এজন্যই বেদকবি বলিয়াছেন, বে-
দ নিত্য ও আদিপুরুষ ব্রহ্মার কীর্তিত । আ-
বার তাদৃশ হেতু নিবন্ধনই আৰ্য্যগণ ব্রহ্মা-
কেই আয়ুর্বেদের আদিব্রহ্মা বলিয়া বি-
শ্বাস করেন ।

পুরাণাদি হিন্দুশাস্ত্রে এরূপ প্রথিত
আছে যে, সত্যযুগে লোকসকল নিরোগী
ছিল । দ্বৈতার প্রারম্ভে ও সত্যের শেষ-
ভাগে রোগ সঞ্চার হয় । অনেক নবা-
শিক্ত পাশ্চাত্য সভ্যতাবিদ্যায়, হরত,
প্রোক্ত পৌরাণিক বাক্য শুধু কল্পনাস-
ম্মৃত ও একেবারে অন্তঃসারশূন্য বলিয়া
উপহাস করিবেন ; কিন্তু একটুকু প্রীতির
সহিত চিন্তা করিয়া দেখিলে, তিনি নিশ্চ-
য়ই উহার সারবত্তা অনুভব করিতে পা-
রিবেন । আমরা ভ্রমেও একথা বলিব না
যে, সেইকালে সমস্ত মনুষ্য একেবারে

মুক্ত ছিল ; কদাপি কাহারও স্বাস্থ্যভঙ্গ-
জনিত ক্লেশ পাইতে হয় নাই ; বরং ইহাই
দেখাইব যে অতীত প্রাচীন ভারতসমাজেও
রোগ শোক বর্তমান ছিল ; কিন্তু, কথা
এই যে, সত্যে নিরাময়ত্ব সৰ্ব্বদে পৌরাণিক
বাক্য একেবারে তাৎপর্যবিহীন নহে ।
যখন মানবসমাজ শিশু, যখন পল্লীগ্রামে
প্রতি বর্গকোশে দ্বিসহস্র লোকও থাকে
নাই ; যখন মানবজাতি প্রাচীন বলিয়া
জগতে পরিচিত হয় নাই ; বালাবিবাহ,
মদ্যপান ও অপরাপর সভ্যতাসূচক বি-
লাসসামগ্ৰী যখন ভারতক্ষেত্রে দুর্লভতার
বীজ বপন করে নাই, যখন ঢাকার অতি
সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র বিলম্বে দৃঢ়তর বস্ত্রকল,
বাসুশৌভন ছত্রবিনিময়ে রক্ষচ্ছায়া সেবন
করিয়া আৰ্য্যস্বাধি ক্লাস্ত হইয়া নাই, সেই
সময়ে নিশ্চয়ই বর্তমান উনবিংশ শতাব্দির
বহুবিধ রোগের অস্তিত্ব ছিল না, অতি
সাধারণ রকমের কোন কোন পীড়া ব্য-
তীত প্রায়ই রোগ প্রাচুর্য ছিল না । এ-
স্থলে 'নিরোগী' এই পদটি রোগহীনত্ব-
সূচক নহে ; নঞের অল্পত্ব অর্থই এস্থলে
প্রযোজ্য ।

মানব সমাজের বিলুপ্তির সঙ্গে অ-
নেক স্বথ ও আসিয়াছে, অনেক দুঃখ ও
আসিয়াছে । যে দেশ যত জনাকীর্ণ হই-
য়াছে, সাধারণতঃ সেই দেশই তত পীড়ার
জ্বালায় জ্বলিয়াছে ।

ঋগ্বেদের পূর্বে ও তৎসম কালে যে

অপ্পে ২ আয়ুর্বেদ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে-

ছিল বেদের বহুবিধ প্রার্থনা তাহার পরিচয় দিতেছে। এই কালে আয়ুর্বেদ একটি শাস্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল এমত বোধ হয় না। যাহা হটক ইহাই আয়ুর্বেদের ভিত্তি ভূমি। আমরা এই কালকে বেদায়ুর্বেদ বা দেবায়ুর্বেদ নামে অভিহিত করিলাম। এই কালের আদি গুরু ব্রহ্মা শেষ গুরু ইন্দ্র। ইন্দ্র হইতে ভরষাজ ও ধনুস্তরি আয়ুর্বেদ লাভ করেন; ইহারাই দ্বিতীয় কালের প্রবর্তক; ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য প্রমাণতঃ চিকিৎসক ছিলেন বলিয়া, ইহার নাম ব্রাহ্মণ বৈদ্যায়ুর্বেদ বা মিশ্রায়ুর্বেদ। মিশ্রায়ুর্বেদই কাল ক্রমে বৈদ্যায়ুর্বেদ রূপে পরিণত হয়। শেষ কাল বা সর্বাযুর্বেদ মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়; এবং আজ পর্য্যন্ত উন্নতি বা অবনতির সোপানে বিচরণ করিতেছে।

আমরা পরবর্ত্তি কয়েক পৃষ্ঠায় এই চারিটি বিভাগের যথা প্রাপ্ত বিবরণ প্রকটিত করিব। সত্য বটে স্থানে বর্তমান কালের বিখ্যাসাতীত দুই একটি প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইবেক; কিন্তু কি করিব, ভারতের কোন ও ঐতিহাসিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে জানিয়া শুনিয়া ও এই কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। পাঠক এতাদৃশ স্থলে, অতিপ্রায় গ্রহণ করিবেন, প্রকৃত ঘটনা বলিয়া ইহার প্রতি অক্ষয় গ্রহণ করিতে যাইয়া ক্ষুণ্ণ হইবেন না।

দেবায়ুর্বেদ ।

বা

বেদায়ুর্বেদ ।

ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত আয়ুর্বেদ-বিৎ পণ্ডিত ব্রহ্মাকে আয়ুর্বেদের আদি গুরু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; এরূপ বিবৃত আছে যে তিনি দক্ষ শ্লোককে সমস্ত আয়ুর্বেদ প্রণয়ন করেন, ও সহস্র অধ্যায়ে বিভাগ করিয়া ইহাকে অগর্ভ বেদের উপাঙ্গ রূপে নিবেশিত করেন। কালান্তরে, যখন মানব গণ অণ্ডায়ুর্ভু ও অণ্ড মেদন্তু নিবন্ধন, তদদায়নে অক্ষয় হইয়া উঠিল, পরঃখকাতর পিতামহ অঘনি অতি সংক্ষেপে সমস্ত আয়ুর্বেদতত্ত্ব আট ভাগে প্রণয়ন করে *। ব্রহ্মা হইতে দক্ষ প্রজাপতি, দক্ষ হইতে আশ্বিন হয়, আশ্বিন হ-

* ইহ খল্বায়ুর্বেদো নাম যদুপাস্ত ম-
থর্কবেদস্যায়ুর্পাদৈব্য প্রজাঃ শ্লোক শত
সহস্রমধ্যায়সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ঃ। ত-
তোহণ্ডায়ুর্ভুমণ্ডমেদন্তু ষ্ণাবলোক্য ন-
রাগাং ভূয়োঽধা এণীতবান্। স্মৃশ্চ ৩ ১ অ
সুত্রস্থান।

ব্রহ্মা প্রোবাচ ততঃ প্রজাপতিরধি-
জগে। তস্মাদশ্বিনাবশ্বিভামিস্রঃ ইন্দ্রা-
দহং, ময়াত্বিহ প্রদেয়মর্থিভাঃ প্রজাভিত-
হেতোঃ। ব্রহ্মণাহি যদা প্রোক্তমায়ুর্বেদং
প্রজাপতিঃ জগ্রাহ নিখিলেনাদাশ্বিনৌতু
পুনস্ততঃ অশ্বিভ্যাং ভগবান্ শক্রঃ প্রতি-
পেদেহ কেবলম্। চরকসংহিতায়ং।

ইতে ইন্দ্র আয়ুর্বেদ লাভ করেন । আখিঁন
দিগের অপর নাম সনতকুমার । প্রথিত
আছে ইহারাই স্বর্গবৈদ্য ছিলেন । ধনুস্তরি
ও ভরষাজ ইন্দ্র হইতে আয়ুর্বেদ শিক্ষা ক-
রিয়া পৃথিবীতে শাস্ত্রীর বিজ্ঞানের আদি প্র-
চারক হইলেন । আয়ুর্বেদের ঐশ্বে পঁচ জন
গুরু পরম্পরা পর্যান্ত, স্বর্গে আয়ুর্বেদ প্র-
চারিত থাকার উল্লেখ পাওয়া যায় । পরে
দৃষ্ট হইবে যে ঋগ্বেদ কালে ইহারাই বৈদ্য
বলিয়া পূজিত হইয়াছেন । সুতরাং স্বর্গ-
আয়ুর্বেদ কালকে বৈদিক কাল বলাতে বোধ
হয় সত্যের অপলাপ হয় নাই । প্রকৃত
প্রস্তাবে, দীর্ঘ বৈদিক কালে যে সকল
ভেষজতত্ত্ব বেদকবিদের বহু গবেষণাতে
আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাই অস্পষ্ট ধনু-
স্তরি ও ভরষাজ কর্তৃক এক অত্যাৎকৃষ্ট
শাস্ত্র রূপে পরিণত হয় । বেদকবি মে-
ধাতিথি বলিয়াছেন “ জলেতেই অমৃত,
জলেতেই সমস্ত রোগনাশক ওষধি বর্ত-
মান । ” * “ হে সোম তুমিই আমা-
দের প্রশংসার পাত্র, তুমিই ওষধি তরুর
প্রভু । ” এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে
জলের অসাধারণ রোগনিবারিণী শক্তি
অতি প্রাচীন কালেই ভারত সমাজে বি-
দিত ছিল ।

পুনশ্চ, ষাটশ ও ত্রয়োদশ শ্রেণীতে সো-
মকন্দের নিকট রোগদূটকরণার্থ প্রার্থনা
বিদ্যমান দেখা যায় । সোমকন্দ যে শুদ্ধ
অপ্‌সস্তরমৃতমস্তুভেষজমপায়ুত প্র-
শস্ত্রে । ঋগ্বেদসংহিতায়াং ।

বলকর ও মাদক এমত নহে. ইহা যে বহু-
বিধ জরাজীর্ণপহারক তাহাও সেই পুরা-
কালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল । কেহ এরূপ
মনে করিবেন না যে, এই প্রার্থনা সোম-
দেবের নিকট, কারণ পরবর্ত্তিত্বোচ্চ্রেই
‘ হে সোম তুমি অমৃততরুর সহিত বহু আ-
বর্ত্তনে পরিবর্জিত হও ’ এরূপ বাক্যে সো-
মপদ কদাপি চন্দ্র নামান্তর নহে । সো-
মকে আয়ুর্বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ স্থানক্রি-
য়াদিভেদে চতুর্বিংশতিভাগে বিভক্ত ক-
রিয়াছেন * । তাঁহারাও ইহার অসা-
ধারণ জরাপহারিণী শক্তি দেখিয়া ইহাকে
ওষধিপতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন † ।
পুনরাপি ২০ শ সূক্তে “ সোম আমাকে
বলিয়াছেন যে জলেতেই সমস্ত ওষধি *
*** । হে জল তুমি আমাদের শরীরের
নিমিত্ত রোগ নিবারক ভেষজ সৃষ্টিকর ।
২১ সূক্ত । † এতদ্বারা অনুমিত হয়
যে তৎকালে অধিকাংশ ভেষজই জলজ
ছিল; জল যে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত
* এক এব ভগবান্ সোমঃস্থানক্রি-
য়াভেদেন চতুর্বিংশতিধাভিদাতে যথা অং-
শমান্ ভৃঞ্জবাংশৈশ্চ ব চন্দ্রম। রজতপ্রভঃ । **
† ঔষধীনাং পতিং সোমমুপভূজ্য বিচ-
ক্ষণঃ । সূক্তত
দশবর্ষ সহস্রাণিনবান্ ধরিয়তি তনুম্ ॥ ঐ
‡ অপমুমে সোমোহত্রবীদস্তর্বিধানি
ক্বেষজাঃ । অগ্নিক্বে বিশ্বশঙ্কুবমাপশ্চ বিশ্ব
ভেষজীঃ । আপপূণীত ভেষজং বরুথং
তম্বেষম । * * *

হইত তাহারত সন্দেহই নাই। এস্থলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বেদ-ক-বিগণ সোমলতার অধিষ্ঠানভূত দেবের ও কল্পনা করিয়াছেন ; কারণ অনেক স্থলে সোমদেবের প্রার্থনা ও বিদায়ান আছে * আয়ুর্বেদবিদ পণ্ডিতগণ অগ্নি কত্রা-দির ন্যায় সোমকে কদাপি চিকিৎসক বলিয়া বর্ণন করেন নাই ; শুক্র ওষধিপতি বলিয়াই পরিচূষ্ট হইয়াছেন। ঋকে স্থানে স্থানে স্মৃতি ও বললাভের নিমিত্ত কত্রদেবের প্রার্থনা বর্তমান দেখা যায় ; পরবর্ত্তিগ্রন্থাদিতে “স্বয়ং কত্রেন ভাবিতম্” বলিয়া অনেক তৈলবটিকার প্র-শংসাস্থানিও বিদায়ান আছে। অন্যতর বেদ কবি গৃৎসমদ বলিয়াছেন ‘হে কত্র ! ত্বৎপ্রদত্ত স্মাস্থ্যক্ষক ঔষধি দ্বারা যেন আমরা শত শত শীত বাঁচিয়া থাকি। ওষধিতক দ্বারা তুমি আমাদের সন্তানগ-ণকে বলায়িত কর। কারণ শুনিতে পাই তুমিই চিকিৎসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ’। এস্থলে স্মৃতি এই যে আত্রের দ্বন্দ্বিত্তি, স্মৃতি এমন কি বাতটগু পর্ধাস্ত ইহাকে অগ্নি ইন্দ্রাদির ন্যায় বৈদ্যশ্রেণীভুক্ত ক-রেন নাই। কিন্তু রসেন্দ্র সারসংগ্রহাদি

* মানঃ শংসো অবক্রযো ধৃতিঃ
প্রগুর্মর্তস্য রক্ষাণো ব্রহ্মগম্পতে। সধা-
বীরো ন বিঘাতি যমিস্ত্রো ব্রহ্মগম্পতিঃ
সোমো হিনোতি মর্ত্যং রেবানো অ-
যীবহা বসুবিৎ পুষ্টির্জানঃ মনঃসিবক্তু-
যন্তরঃ। ঋগ্বেদ সংহিতায়ঃ।

অনেক আধুনিক গ্রন্থে ইহার ভূরি স্বনি-
প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ অনুমিত হয় যে ত-
ত্রকারগণ পূর্বাচার্য্যদের এই ভ্রমাসুদ্ধান
পাইয়া বেদোলিখিত কত্রদেবকে আয়ু-
র্বেদ ব্যবসায়ী ও মহাদেবকে পরম বৈদ্য
বলিয়া আপনাদিগের আরাধ্যদেবমাহাত্ম
কীর্তন করিয়াছেন।

হৃপতিগণ যে অতি প্রাচীন কাল হ-
ইতে এতদব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে নিযুক্ত
হইতেন ঋকেই তাহার আভাস পাওয়া
যায় * বাস্তব, যে প্রাণীতে ভারতীয়
আয়ুর্বিজ্ঞান পদপল্লবফল পুষ্পাদিতে সূ-
শোভিত হইয়া একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরি-
ণত হইয়াছে, তাহার মূল সূত্র—আধার
উর্ধ্বরতা বিধায়ক সার বীজাদি ঋকের স-
ময়েই নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ইয়ুরোপীয় প-
ণ্ডিতগণ স্বাভিপ্সিত গণনানুসারে ঋকের
কাল ঋঃ জ্যেষ্ঠের পূর্ব ২০০০ বৎসরের
অন্যন বলেন। সূত্রাৎ যে আয়ুর্বেদের
দুই একটি গলিত পত্র আজও প্রাপ্ত হই-
তেছি, অন্ততঃ ৪০০০ বৎসর পূর্বে তাহার
বীজ বপন সম্পন্ন হইয়াছিল। রোগ মাত্র
সাধারণতঃ জলের উপাদেয়তা, বহুবিধ
জলজ পদার্থের রোগাপহারিনী শক্তি,
উর্দ্ধক্রমগত রোগচিকিৎসা, বিশেষতঃ চক্ষু-
রোগাপনয়ন, ও রাজ্যর আয়ুর্বেদ ব্যব-
সায়ের উন্নতিকল্পে তত্ত্বাবধানের আবশ্য-
* শতশ্রে রাজন্ ভিষজঃ সত্ত্বশুক্রী
গতীরী স্মৃতিষ্ঠে অস্ত * * * বচৌশু-
বাকঃ।

কতা, সেই পুরাকালেই আৰ্য্যমনষিদের নি-
 ঝুল জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। তখন জাতি-
 ভেদও হয় নাই, ব্যবসায় ভেদও হয় নাই।
 একই ব্যক্তির সন্তান স্ব স্ব কচি অনুসারে
 উপজীবিকার উপায় অবলম্বন করিতেন।
 জর্নৈক বেদ কবি এই বলিয়া আত্মপরিচয়
 দিয়াছেন, ‘আমার পিতা চিকিৎসক,
 মাতা তপুস প্রস্তুতকারিণী এবং আমি
 কবি।’ ভারতে ব্রাহ্মণ সন্তান কেবল
 বাজনাধারনাদি ব্যতীত ব্যবসায়ত্তর অবল-
 ম্বন করিতে পারিবেন না, তৎকালে এমন
 কোনও সামাজিক অনুশাসন ছিলনা।
 কে কি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা
 নির্বাহ করিল, সমাজ তদনুসন্ধানে কা-
 হাকে প্রশংসা বা নিন্দা করিবার জন্য
 আকুলিত হইত না।

ব্রাহ্মণ বৈদ্যায়ুর্বেদ

বা

মিশ্রায়ুর্বেদ ।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সত্যের শেষভাগে
 ত্রেতার প্রারম্ভে রোগোৎপত্তি হয়। পূর্বে
 উক্ত হইয়াছে, যে সত্যের অনারম্ভ, রোগ-
 হীনত্ব বোধক নহে, রোগের বিরলত্ব ব্য-
 গ্নক; এস্থলেও রোগোৎপত্তি রোগবা-
 হুল্য বোধক জ্ঞান করিতে হইবেক। এই
 সময়েই ভগবান্ ধ্বস্তুরি জন্মগ্রহণ করেন।
 ধ্বস্তুরির জন্ম বিবরণ পৌরাণিক কল্পনা
 মিশ্রিত হইলেও উহার কাপ্পনিকাংশে
 কবি প্রতিভা (Poetical genius) ও
 সমুদায়ে ঐতিহাসিক সারবত্তা বিলক্ষণ

বিদ্যমান আছে। আৰ্য্যভূমিতে ধ্বস্তুরিই
 আদি বৈদ্য।

ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে
 যে যে কালে সমস্তগ্রাম, নগর, উপনগর,
 নানাবিধ মহামারিতে ব্যতিব্যস্ত, নিক-
 পায় আতুর অসহ্য ব্যাধিযুক্তগণ হইতে
 মুক্তহইবার কোনও পন্থা না দেখিয়া এ-
 কেবারে হতাশ, সেই সময়েই অতি কুশল
 করণাপরায়ণ বৈদ্যালাত, সমস্ত প্রাণীর
 ভয়ানক পীড়া নিবারণের অঘোষপ্রায় উ-
 পায় লাভ, ভারতক্ষেত্রের ধর্ম্মশীল মনুষ্য
 হৃদয়ে দয়ারনিধান নক্ষলময় ঈশ্বরের বিশেষ
 ককণা বলিয়া প্রতীত হওয়া বিশ্বাসের বি-
 বয় নহে। ভারতবাসী এই জন্মাই ধ্বস্ত-
 রিকে অযোনিসম্ভব বলিয়া বিশ্বাস
 করেন। ধ্বস্তুরির অমামুষী প্রতিভাই
 তাঁহাকে নারায়ণরূপী বলিয়া ভার-
 তের পুত্রোপহার প্রদান করিয়াছিল।
 একই ব্যক্তির দ্বারা এক সময়ে বহুস্থান-
 ব্যাপক মারী নিবারণ অসম্ভব; সুতরাং
 বাধ্য হইয়াই শীত্র শীত্র অনেক আৰ্য্যকৃষি
 আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তদ্ব্যবসায় অবল-
 ম্বন করিয়া বহু লোকের বিপদশান্তি ক-
 রিতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণ বৈদ্য
 ক্ষত্রিয় দ্বিজ মাত্রই আয়ুর্বেদ ব্যবসায় অ-
 বলম্বন করিতেন; কিন্তু কালাহরে ধ্বস্ত-
 রির সন্তান পরম্পরা বংশবাহুল্য হওয়াতে
 ও ব্যবহারজীবীদের অনুশাসন তরে ব্রাহ্ম-
 ণক্ষত্রিয়াদি তদ্ব্যবসায় পরিভাগ করেন।
 বাহ্য হউক এই সময়ের প্রথমভাগ ব্রাহ্ম-

গাদি ষ্টিজগণ ও পরভাগে বৈদ্যগণ ভষা-
বসায়ী ছিলেন বলিয়া ইহাকে মিশ্রকাল
নামে অভিহিত করা গেল ।

ধন্বস্তুরি অমৃতার্থ্য ।

হৃদয়, গাওর ও মার্কণ্ডেয় পুরাণানু-
সারে ভগবান্ ধন্বস্তুরি ত্রেতাযুগের প্রা-
রম্ভে সমুদ্ভূত হইলেন । এইরূপ প্রথিত আছে
যে, একদা মহর্ষি গালব * সমিংকুশাহ-

*** যুগিষ্ঠির উবাচ ।**

ধন্বস্তুরিমহাভাগ অমরেশঃ কথং পুরা ।
অভবচ্ছর্ষতো বিজ্ঞস্তম্বে বদ মহামুনে ॥
মৈত্রেয় উবাচ ।

ভোরাজেস্ত্র যথা জাতো ধন্বস্তুরিহৈবতু ।
মহর্ষিগালবো নাম কাষ্ঠদভীহরোবনম্ ॥
জগাম তত্রজমগাদতিশ্রাস্তোবভূব সঃ ।
ততোনিদীক্ষয়ামাস তৃষ্ণাতুর কলেবরঃ ॥
বনস্যচ বহির্ভাগে কন্যামেকাং দদর্শ সঃ ।
জলপূর্ণ ঘটং নীড়া গচ্ছন্তীং পিতৃমন্দিরং ॥
তাংদৃষ্টাক্ষচৈতোহসৌ বভাসে মুনিপুঙ্গবঃ ।
হে কন্যে ত্বংজলং দেহি প্রাণরক্ষাং কুৰ-
শ্বমে ।
ততঃসা কলশং ভূমৌ নিধার্য্যতিষ্ঠতুতমা ।
গালবশচাক্ষতোয়েন স্নাত্বা তোল্লং পপৌ-
চতৎ ।
প্রোবাচ চাপি হে কন্যে ত্বং সম্পূজ্যবতী-
ভব ॥
ততঃপ্রোক্তবতী কন্যা ন মে পাণিগ্রহোহ-
ভবৎ ।
ততোমুনিবরশচাহ কাঙ্ক্ষং কিং নাম তে বদ ।

রণার্থ জ্রমণ করিতে করিতে এক বনো-
পান্ত্রে উপস্থিত হইলেন । অধ্বশান্ত মুনি
তৃষ্ণাতুর হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিষ্কোপ করিয়া
দেখিলেন যে, বনবহির্ভাগে একটি কন্যা
জলপূর্ণকুম্ভ কক্ষে করিয়া থিহে বাইতেছে ।
মুনিবর তদর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিলেন
হে কন্যে ! আমি নিতান্ত তৃষ্ণাতুর,
জলদান করিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর ।
ব্রাহ্মণভক্তিপরায়ণা জলকুম্ভ প্রদান ক-
রিলে মহর্ষি গালব স্নান করিয়া যথেষ্ট
উবাচ পুনরন্যেথা বৈশ্যাকন্যাহাহং বিভো ।
বীরভদ্রাভিধানাচ জ্ঞানীহি মুনিপুঙ্গবঃ ॥
ততো বিচিন্ত্য স মুনি স্তামাদায় জগামহ ।
ঋষীগমপ্রতো নীড়া ব্রহ্মান্ত মবদন্তদা
আকর্ণ তে মহারাজ উচুর্হর্ষিত মানসঃ
তত্রং কৃতং মনে নুনমানীতেরং যতস্তুরা ।
বৈশ্যায়ানং বীরভদ্রায়ানং ধন্বস্তুরির্ভবিষ্যতি
ইতাক্ৰুা তেহপি মনুরঃ কুসপুতলিকাহ ততঃ
কুহা ক্রোড়ে দহস্তস্য্য বেদমুচ্চাৰ্য্যাতংকুশে
প্রাণপ্রতিষ্ঠা মপ্যাসাচক্রুঃ পুরুষকারুতিম্ ।
ততোহভবৎ কাঞ্চীনরাশি গৌরং
বালোতি সৌম্যাকুতিরব তস্য্যঃ
ক্রোড়ে বিলোটক্যব স্রুতং মুনীশ্রাঃ
প্রাপুর্মুদং বেদতঃ এষ জাতঃ ।
ঐবদ্য স্ততোহয়ং জননী কুলেচ
স্থিত স্ততোহয়ং ইতি প্রদিকঃ
এবমুক্ত্বা ততঃসর্কেমুনয়ো দেবরূপিণঃ
অমৃতার্থ্যমস্যাখ্যাং চক্রু বৈশ্য্যভিধানকম্ ॥
* * * অশ্বঠাচারচক্ষিকোকৃত
পুরাণ বচনানি ।

জল পান করিলেন । এবং অতি পরি-
তোষ লাভ করিয়া বলিলেন হে কন্যা
আমার পরিতোষ হেতু তোমার সংপূত্র
লাভ হউক । কন্যা নিশ্চিত হইয়া বলি-
লেন, ভগবান্ আমার যে বিবাহ হয় নাই ।
গালব পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, বৈশ্য-
কন্যা বলিলেন, আমার নাম বীরভদ্রা,
আমি বৈশ্যকন্যা । ঋষিবর তাঁহাকে সঙ্গে
নিয়া মুনিসমাজে সমস্ত রত্নাস্ত বর্ণন করি-
লেন, সকলে হর্ষিত হইয়া বলিলেন, মুনি-
বর, আপনি বড় মঙ্গল করিয়াছেন এই
বীরভদ্রার গর্ভে ধন্বন্তরি জন্মগ্রহণ করি-
বেম এই বলিয়া সকলে কুশপুত্রনিকা
নির্ধারণকরতঃ বীরভদ্রার ক্রোড়ে অর্পণ
করিলেন ও বেদমন্ত্র জপ করিয়া ইহার
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন । অমনি অতি
সৌম্যাকৃতি কাঞ্চনরাশি গৌর বীর-
বালক বীরভদ্রার ক্রোড়দেশ আলোকিত
করিল । মুনিগণ হৃষ্টচিত্তে বেদ হইতে
জাত বলিয়া ইহার নাম বৈদ্য রাখিলেন,
এবং জননীক্রোড়ে স্থিত বলিয়া ইনি অ-
শ্বর্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন ।

সহস্রদয় সন্ধিবৈচক পাঠক সহজেই বু-
ঝিতে পারিবেন যে অশ্বর্ষ বংশ প্রবর্তক
ভগবান্ ধন্বন্তরির জন্মবিবরণ কেন পুরাণ
কবি এবম্বিধ অলৌকিক উপাখ্যাস ও অ-
লঙ্কারমিশ্রিত করিয়া বিবৃত করিয়াছেন ।
যিনি অসাধারণ অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন,
সকলেই তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় অলৌ-

কিক বলিয়া মনে করে । পুরাণ কবি
এজন্যই ধন্বন্তরিকে অমোহনিসম্ভব ও না-
রায়ণাংশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন * ।
যাহা হউক এবম্বিধ পুরাণ ইতিহাস হ-
ইতে সার গ্রহণ করিলে সংক্ষেপতঃ এই
মাত্র জানা যায় যে তৃষ্ণাতুর মহর্ষি গা-
লবের পিপাসা শান্তি করিয়া সুশীলা বৈ-
শ্যকন্যা গালব দত্ত পুঞ্জলাভরূপ বর প্রাপ্ত
হয়েন † । কিন্তু স্বয়ং অবিবাহিত এবং
মহর্ষি বাক্যও মিথ্যা হইবার নহে, সু-
তরাং সমাজ কলঙ্ক অবশ্যস্তাবী ; ইত্যা-
কার চিন্তা করিয়া সবিময়ে সমস্ত মনঃ-
শুদ্ধি গালবকে নিবেদন করিলেন । গা-
লব অপরাপর মহর্ষিদিগের পরামর্শানু-
সারে বীর ভদ্রাকে বিবাহ করিলেন ।
বলা বাহুল্য যে তৎকালে ব্রাহ্মণাদির অ-
স্তরজাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ শাস্ত্র
সঙ্গত ছিল । ধন্বন্তরি এই বীর ভদ্রার
গর্ভে ও গালব ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন ।
ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহর্ষিগণ একত্র হইয়া
ইহাকে আত্মবেদ ব্যবসায় দান করেন ।
যহৌজা অমৃত্যুচার্য্য এইরূপ ইন্দ্র হইতে
আত্মবেদ শিক্ষা করিয়া বৈদ্য বংশের মূল
সংস্থাপক হয়েন ।

* ঐষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদোহানা-
রায়ণঃস্বরম্ ।

† পাঠক মনে রাখিবেন যে সেই-
কালে কন্যাগণ সর্বদাই অল্প বয়সে বি-
বাহিত হইতেন না ।

বয়ঃসন্ধি ।



So our lines glide on : the river ends we don't
know where, and the sea begins, and then there is
nomore jumping ashore.
George Eliot.

একাকী বসিয়া সান্ধ্যাগগণের মধুর শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। সূর্যবর্ণ রঞ্জিত সহস্র মেঘখণ্ড আকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। নীলাকাশে দুষ্কফেণ শুভ্র বলাকাপংক্তি কালিন্দীর নির্ঝাঁত বন্ধে ঋতকুমুদামবৎ ভাসিয়া যাইতেছিল। মুহূ পবনসঞ্চারে মেঘখণ্ড বিশেষ ঈষৎ অপসারিত হইল। পাঠক, স্বর্ণ-সীমি নিভূষিত কোন প্রিয় শ্যামাদীর মুখ-কাস্তি অতৃপ্ত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছ? নিটোল ললাট প্রদেশে, যেখানে উজ্জ্বল স্বর্ণকাস্তি শ্যাম মাধুরীতে মিশিয়া যায়, সেই স্থানের সেই শোভা কি কখনও দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক, তবে আমি সেই আসন্ন প্রদোষ সময়ে গজা পুলীনে বসিয়া মেঘপ্রান্তে নীলাকাশের যে প্রশস্ত শোভা দেখিতেছিলাম তাহার আভাস পাইবে।

আরও তো অনেকবার সান্ধ্যাকাশের এই পরম রমণীয় শোভা দর্শন করিয়াছি; তবে আজি এ বিস্মলতা কেন? চিত্তের এ মুহূ চাঞ্চল্য, চকুর এ অপূর্ব

রাগব্যক্তি কেন? বহুদিন গত হইল আর একবার এই শোভার নবীনড়ে মোহিত হইয়াছিলাম। সে দিবস আমার জীবনে এক চিরস্মরণীয় পরিবর্তন সংঘটিত হয়। গভীর নিশিথে তমসারত কক্ষের গবাক্ষ উন্মুক্ত করিলে যেমন কু-রংচন্দ্রিকারাশি অকস্মাৎ কক্ষ আলোকিত করে;—অদূরবিকশিত কুমুমসৌরভ-বাহী মুহূবায়ুপ্রোত কক্ষ আমোদিত করে; সে দিবস আমার হৃদয়ের নিগুঢ় প্রদেশে সেইরূপ শারদচন্দ্রমাসিক, কুল-কুমুদ-সুরভিত, অব্যক্তপ্রকৃতি এক নূতন ভাবের সঞ্চারণ হয়। সে দিবস আমি কৈশোর-সীমা অতিক্রম করিয়া, যৌবরাজ্যে প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছিলাম; সে দিবস আমার জীবনে নির্ঝরনদীসঙ্গমবৎ অপূর্ব ঘটনা সংঘটিত হয়। নীলাকাশে বিদ্যায়-রেখাবৎ আজি তাহার মধুর স্মৃতি লগনকালের জন্য হৃদয় আলোকিত করিয়াছে।

এখন আমি কৈশোরসীমা অতিক্রম করিয়া যৌবরাজ্যের অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি। আমার জীবনের এক অল্প

অভিনীত হইয়াছে, দ্বিতীয় অঙ্ক এখনও শেষ হয় নাই । উচ্ছলরুতি ভাবরাগ লইয়া এখনও রঙ্গভূমিতে বিচরণ করিতেছি । সাধু প্রকৃতির যুগ্মশাসনে প্রকার্যা করিয়া কখনও নরজীবনে দৈব-সুখমা প্রদর্শন করিতেছি ; এবং গভীর রজনীতে হৃদয়ের নিগুঢ়প্রদেশে আত্মপ্রসাদের বিমলজ্যোতি অতীব করিয়া একাকী আমোদোৎসব করিতেছি ; কখনও বা কুট প্রকৃতির দুর্ব্বার প্ররোচনার ক্রম পরিচালিত হইয়া মানবচরিত্রে নরক-মূলত কলঙ্কক্ষেপ করিতেছি, এবং অনুভূতাপের মুখু রদাছে বিদগ্ধ হইতেছি, এই ভাবে জীবন যাইতেছে । কিন্তু হৃদয় আজি কিছু বিচলিত হইয়াছে ; ভূতকালের এক মধুর দৃশ্য আজি অকস্মাৎ উ-হাতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে ।

কোটি কোটি লোকেরতো কিশোর বয়স চলিয়া গিয়াছে । কিন্তু কেহ কি বিরলে নীরবে মনোমগ্নযোগে একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, কোন্ অলক্ষ্য স্ত্র অবলম্বন করিয়া যৌবনভাব তোমার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে? তোমার অজ্ঞাতসারে কোন্ সময়ে তোমার হৃদয় কুটু-লভাব পরিহার করিয়া যৌবন কুসুমের নববিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে? আজি তোমার হৃদয় যৌবনগর্ষণোদ্ভাসিতা ভাঙ্গ গ-দ্যার উরুভঙ্কে বিহ্বল; কিন্তু তুমি কি বলিতে পার, কোন্ সময়ে নবপ্রান্তের প্রথম স্নান তোমার চিত্তভূমি সিক্ত ক-

রিয়া প্রথমে ক্ষীণ প্রবাহিত হইয়াছিল? অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, তাই বলিয়া কি জীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা স্বরূপ এই সরিৎসাগরসঙ্গম কখন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান করিবে না?

মানব জীবনে বয়ঃসন্ধি নিরূপিত করিবার কি কোন নির্দিষ্ট রেখা আছে? এমন কি কোন নির্দিষ্ট কাল, চিহ্ন কিম্বা কার্য আছে যে, বাহ্য লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক জীবনের এই অভূতপূর্ব্ব, অপুনঃ-সম্ভাবী সন্ধিহুল নির্দেশ করা যাইতে পারে? বয়োধিকাতা প্রকৃত যৌবনের পরিচায়ক নহে; তুমি বিংশতিবর্ষ অতিক্রম করিয়াছ বলিয়াই যে তুমি যৌবরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছ এমত নহে । সংসারে নির্জীব, ক্ষীণায়তন, এবং আজন্মরোগাক্রান্ত লোক আছে, কিন্তু কেহই তাহাদিগকে যৌবনশালী বলিয়া উপহাস করিবে না । শরীরপুষ্টি যৌবনসূচক নহে । কেহবা পঞ্চবিংশতবর্ষ বয়সে নৈসর্গিক কারণে পঞ্চদশবর্ষের বালকের ন্যায় ক্ষীণাঙ্গ ; কেহবা পঞ্চদশবর্ষ বয়সেই সর্ব্বপ্রকার শারীরিক সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে । তবে কি বিদ্যা এবং বুদ্ধিকেই যৌবনের আনন্দতা বলিব? তাহাও বুদ্ধিসঙ্গত হয় না । একবিংশতি বর্ষে কেহ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষার সমুষ্ঠীর্ণ হইতেছেন; কেহবা আবার্দ্ধকা নিবিষ্টমনে জীবন উৎসর্গ করিয়াও অভিলষিত সিদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না । তখন কি বলিব যে

পশ্চাত্তরু হতভাগা আমরণ যৌবরাজ্যে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় নাই? কেহ কেহ বলিবেন যে, জীবনে ধর্মভাবের গভীরতা লাভই যৌবনপ্রাপ্তিসূচক, এ নির্দেশও নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল। তাহা হইলে দ্রুত এবং প্রহ্লাদ অপগণ্ড বয়সেই প্রাপ্ত যৌবন হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। আর উদ্যত শৃঙ্গ, উজ্জতবিক্রম রত্নাকরকে বালক বলিতে হয়! তবে দেখা যাইতেছে যে, বয়স, বিদ্যা, বুদ্ধি কিংবা ধর্মভাব প্রভৃতি মানবজীবনে যৌবনভাব আনয়ন করে না।

তবে সর্বজন স্পৃহণীয় এই কমণীয়া সময়ের আনন্দতা কে? কোন্ ঘটনা, কোন্ চিহ্ন অবলম্বন করিয়া আমরা এই মধুর রসসঞ্চার গণনা করিব।

আমি নরনারীর জীবনে যৌবনভাব সঞ্চারের এক মাত্র কারণ ও সময় অবধারণ করিয়াছি; তাহা সম্পূর্ণ আকস্মিক। স্ত্রী কিংবা পুরুষ বিশেষের প্রতি অকপট দৃষ্টিতে চর্চাৎ যখন একের হৃদয়ে অন্যতরের প্রতি কোন অভূতপূর্ব, অজ্ঞাত প্রকৃতি নবভাবের সঞ্চায় হয়, তখন হইতেই যৌবন প্রারম্ভ গণনা করিতে হইবে। সে ভাব, না প্রীতি সম্ভূত, না প্রেম প্রণোদিত; তাহা কেহ হইতে স্বতঃনির্গত নহে, কিন্তু ভক্তিপ্রসূত অথবা ভীতিনীপ্ত নহে, অথচ তাহাতে পরম্পর গাঢ় সংস্রিক্ত এই সকল স্বস্তি পরিলক্ষিত হয়। তাবুক সেই-নবোদিত ভাবের প্রকৃতি বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

অন্তে এই ভাবের কি সংজ্ঞা প্রদান করিবে, বলিতে পারি না; কিন্তু আমি ইহাকে পূর্বরাগ বলিয়া থাকি। পূর্বরাগ বলিলে আধুনিক সংস্কৃত সমাজে অনেকের নিকট কেবল প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীর মধ্যে অন্যান্যের প্রতি প্রেমভাষণ বলিয়া প্রতিঃসমান হয়। আমি পূর্বরাগের এ ব্যাখ্যায় সঙ্কট নহি। পূর্বরাগ প্রণয়ে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু পূর্বরাগ প্রণয় নহে। প্রীতি সঙ্কোচভাব পরিশূন্য। কিন্তু পূর্বরাগ অন্যান্যের মধ্যে লজ্জার মূহ প্রভাব অনুভূত করাইবে। যে কখনও পূর্বরাগের আভাস অনুভব করে নাই, সে ভাবি প্রণয়পাত্রের নিকট গমন করিতে, তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আত্মীয়স্বজন জ্ঞানে নিয়মিত এবং সরল আচরণে সে কখন লজ্জার অমুপ্রভাবেও আকৃষ্ট হইবে না। কিন্তু যখনই কোমারমূলত স্বচ্ছহৃদয়ে পূর্বরাগের আভাস আদিয়া পতিত হইবে, তখনই তাহার মুখলাবণ্য অস্বস্তিত প্রভাসিত হইয়া উঠিবে। অনির্দীর্ঘকাল মূহ লজ্জার কম আবরণে অকৃত্রিম মননবিভ্রম লুক্কায়িত হইবে। এবং হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রশান্ত প্রদেশে এই আকস্মিক আবেগের সাক্ষাৎ কারণ আবিষ্কার করিতে সে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইবে। প্রকৃত প্রণয়ে লজ্জার আদিপতা নাই। প্রণয়ী অজ্ঞানচিত্তে, স্মিতমুখে প্রণয়ভাজনের সম্মুখীন হইবে এবং অন্যান্যের

প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার করিতে সঙ্কচিত হইবে না। সংসারের বাধা, গুণগঞ্জনা, সমাজের লাঞ্ছনা তাহাকে বিরত করিতে পারিবে না। জ্যোতিষতী পর্ত্ত প্রাপ্ত হইতে যদি একবার বেগে প্রধাবিতা হয়, তুঙ্গশৈল সংবাধা প্রাপ্ত হইলেও দুর্জয়ার বেগ জলপ্রপাতরূপে তাহা অতিক্রম করিয়া সহজোত্তর বিক্রমে পুনর্বার নিজ পন্থার অনুসরণ করে। আমি এমত বলিতেছি না যে, সকল প্রণয়ীই কুল, মান আত্মীয় কুটুম্ব, গৃহ সংসার পরিভ্যাগ করিয়া অভিলষিত পাত্রের অনুসরণ করিবে। কিন্তু হৃদয় আত্মবশ নহে, প্রণয়ের অধীন। প্রণয় যেখানে, হৃদয় সেখানে স্তঃ প্রধাবিত হইবে। শরীর শিঞ্জরবদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের স্বপ্নসংবিহার নরশাসনবহির্ভূত। তবে এমন মহাপ্রণয়ী থাকিতে পারেন, যিনি প্রণয়োৎসবে আত্মরথোৎসর্গ করিয়াও চিত্তের ঠৈর্ঘ্য এবং শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হন। যিনি পূর্করাগ অনুভব করিয়াছেন, তিনি রাগ ভাজনকে স্তম্ভিতর জ্ঞানে মনে মনে তাঁহার আরাধনা করিবেন; আর যিনি প্রণয়ী হইয়াছেন, তিনি প্রণয় পাত্রের সমকক্ষ, অথবা তাঁহাকে সমকক্ষ বলিয়া বিশ্বাস করেন। পূর্করাগ ঘেরণ প্রীতি কিম্বা প্রেম নহে, তেমনি উহা সুখ তৃপ্তি, ভীতি কিম্বা স্নেহসমুত্তও নহে।

নর নারীর জীবনে কখন যে এই মাত্রেয়মূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার

কোন নির্দ্ধারিত সময় নাই। কেহবা লৌকিক যৌবন অনেক দিন লাভ করিয়াও এই অপূর্কভাবের অধিকারী হয় না। আবার কেহবা অতি অল্প বয়সেই উহার মোহন প্রভাবে উন্মোক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু যে বয়সেই হউক না কেন, মানব যে মুহূর্ত্তে ইহার আভাস অনুভূত করে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার স্বপ্নপ্রসব জীবন-জ্যোতি মূহসংলাপী নির্বারপ্রকৃতি পরিভ্যাগ করিয়া উত্তালতরঙ্গক্ষুদ্রা পূর্ণ গঙ্গার কল-প্রবাহে উল্লেলিত হয়। কৈশোর মূলভ মুগ্ধতাব, অক্ষুটপ্রকৃতির পরামুর্কণ, যৌবনোদ্যমে সংসারপর্যাবেক্ষণে এবং স্বাবলঙ্কনে পরিণত হয়। আশু সন্তুষ্টি কোমারভাব নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ভূতকালে বিলীন হইয়া যায়; এবং সংসারভার মস্তকে ধারণ করিয়া হাস্যামুখে নবযৌবন মানবহৃদয় অধিকার করে। কলা বালক ছিলে, আজি যুবা হইলে! আজি হইতে শারদচন্দ্রমার কলক থাকিবে না; এবং শিতরশ্মী শীতলতর অনুভূত হইবে। আজি হইতে ক্ষুটকুম্বে নবরাগব্যক্তি ও গভীরতর সুরভি নিঃসৃত হইবে; এবং বনবিহঙ্গ নিনাগে নৃতন তন্ত্রী মধুরালাপ ক্রত হইবে।

যদি পুংকব হও, তাহা হইলে কামিনীর মুখমণ্ডলে নৃতন শোভা দেখিতে পাইবে। এত দিন যেখানে সাধারণ সৌন্দর্য দেখিতে, আজি প্রকৃতির শিরোভূষণ ক-

পিণী সেই স্ত্রীমূর্তিতে স্বর্গীয় মহিমা, ঠৈদবৈবতব. লোকোত্তর মাধুরী, অলৌকিক লাবণ্যলীলা প্রথম দেখিতে পাইবে। সেই সর্বলোকসম্পূর্ণনীরা যোহিনীমূর্তির সম্মুখে তোমার পুরুষমূলত উদ্ধতা, অহঙ্কার প্রভৃতি সমুদায় চলিয়া যাইবে; তোমার উন্নত মস্তক তোমার অজ্ঞাতসারে অতঃ অবনত হইবে। আর যদি স্ত্রী হও, পুরুষের সৌভাগ্যগন্তীর মুখচ্ছবি দেখিয়া তোমার অক্ষু টক্কর প্রমোদোৎকৃষ্ট হইয়া উঠিবে; প্রেমপ্রীতি, স্বর্ণশাস্তি, ভূত এবং ভবিষ্যৎ একত্রে মিশিয়া তোমার নয়নসম্মুখে আশার সমোজ্জ্বল স্নিগ্ধকিরণরঞ্জিত সুন্দর ইন্দ্রচাপ রচনা করিবে।

আজি এই শুভদিবসে তানিজীবনের মধুর প্রারম্ভই তোমার নয়ন সম্মুখে

নাস্ত করিলাম। ভবিষ্যৎগর্ভে পরকৃত্যকারে তোমার জন্ম যে কত পরীক্ষা—হঃখ দারিদ্র, ভীতি আশঙ্কা, কত প্রলোভন—রূপগুণ, ধন সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহার বিশদ চিত্র অঙ্কিত করিয়া তোমার উৎসাহপূর্ণ, আবেগশালী হৃদয় হৃদয় সন্ন করিতে চাই না। বীচিবিকিণ্ডা কল্লোলিনীর ভীষণ মূর্তি দেখিয়া যে নাবিক বহিঃ পরিভ্যাগ করিয়া, অদৃষ্টে নির্ভর করে, সে কাপুরুষ। অনিশ্চিতপ্রকৃতি ভাবি বিপদ স্মরণ করিয়া সুখের সময় অবসাদতমসান্বিত করি ও না। অথচ যে স্বচ্ছ প্রসন্ন হৃদয় লইয়া আজি এ হৃদয় জীবনে প্রবেশ করিলে, সংসারের ঘূর্ণাবাতে পড়িয়া তাহা আবিলময় করিও না।

সোমরস ও তাহার সেবনবিধি

ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ সমূহ আলোচনা করিলে, “সোমরস” নামে এক প্রকার পদার্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের অতি প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ হইতে, আর আধুনিক তন্ত্র ও পুরাণ পর্ষান্ত বিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যে, “সোমরস” শব্দের তুরি ব্যবহার দেখা যায়। এই সোমরস প্রাচীন ভারতে এরূপ আদৃত ও প্রচলিত ছিল যে, উপন্যাস লেখক, নাটককার, কবি এমন কি ইতি-

হাসবেত্তা ও আলঙ্কারিকেরা পর্ষান্ত ইহার উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। এই সোমরস কি, এবং কোথায় পাওয়া যায় এ বিষয় লইয়া বহু দিন পর্ষান্ত প্রশ্নতত্ত্বসমাজে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। ইংলণ্ড, জার্মানি, এবং কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ভাষাবিদ পণ্ডিতেরা এবিষয়ে ৫। ৭ বৎসর কাল ক্রমিক তর্ক বিতর্ক করেন, এবং এই অজ্ঞাত পদার্থের স্বরূপ নির্ণয়ার্থ বহুস্থান পর্ষাটন করেন।

সম্প্রতি কলিকাতার আসিয়াটিক সোসাইটির সভ্যেরা সোমরস সম্বন্ধে পুনরায় বাদানুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । এ বিষয়ে তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন, তাহা উক্ত সোসাইটির সাময়িক পত্রিকার * প্রত্যেক পৃষ্ঠাই সমগ্রাণ করিয়া দিতেছে । এবং বর্তমান আন্দোলনে তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য হইবেন, তাহা ভবিষ্যতের তমসাময়ী গুহায় নিহিত । সে যাহা হউক, আমরা বহু দিন হইতে বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা এবং নানা স্থান পর্যাটন করিয়া, সোমরস সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এই সুযোগে, বর্তমান প্রস্তাবে, তাহা বিশেষ করিয়া প্রতীপাদ্য করিতে প্ররম্ব হইলাম । বহুদিনের অপ্রতিহত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ের পর, সোমরস সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহা বান্ধবের পাঠকগণ এবং আসিয়াটিক সোসাইটির সভ্যদিগের নিকট উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত হইবে, এই ভরসার আমরা এ গুরুতর প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম ।

সোমরস, আর্ষাঋষিদিগের একপ্রকার পানীয় জব্য । ইহা সকল জ্রেণীর লোকদিগেরই সেব্য ছিল । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণই ইহা পান করিত । সংসারভ্যাগী, যোগী, সন্ন্যাসী-

দিগেরও ইহা পান করিতে নিষেধ ছিল না, বরং যোগসাধনে ইহার ব্যবহার ছিল । যথা—

“ যুগে যুগেহপি কর্তব্যে যোগিনো যোগসাধনে । পিয়েৎ সোমরসং তত্রে আত্মর্থেধাবলপ্রদং ॥” (শিবসংহিতা)

পূর্বকালে সোমরস যজ্ঞস্থলে ব্যবহৃত হইত । সোমরস কাহারও গৃহে পান করিবার নিয়ম ছিল না । দেবতা মন্দিরে, কোম পীঠ স্থানে, না হয় যজ্ঞস্থলে ইহা পান করিতে হইত, তন্নিম্ন অমাত্রে পান করিবার নিষিদ্ধ নিয়ম ছিল । যদি কেহ কোম স্থলে, সোমরস পান করিবার জন্য অভিলাষী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই স্থলে দেবারাধনা করিয়া সেই স্থানটিকে পবিত্র করিয়া লইতে হইত । অথবা যজ্ঞের আয়োজন করিয়া লইতে হইত । যজ্ঞে যে সকল জব্য দেবোদ্দেশে প্রদান করা হইত, তাহার মধ্যে সোমরস প্রদান । অগ্রে সোমরস প্রদান না করিলে যজ্ঞক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত না । সকল যজ্ঞেই যে সোমরস প্রদান করা হইত এমত নহে । কোন্ কোন্ যজ্ঞে দেওয়ার রীতি ছিল, তাহা পরে বলা হইতেছে ।

আর্ষাঋষিদিগের মধ্যে নানা প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের রীতি প্রচলিত ছিল । তন্মধ্যে দেখা যায় প্রাচীন ভারতে ৬৭ প্রকার যজ্ঞ ছিল । সেই সকল যজ্ঞ আবার ১০৩ ভাগে বিভক্ত ছিল, তাহাদের নাম ‘ব্রত’ । এই ৬৭ প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের

* Journal of the Asiatic Society, Bengal.

জন্ম বিশেষ বিশেষ বেদী ছিল। সেই সকল বেদীর আকার মোটে ৬ প্রকার, যথা, এককোণী, ত্রিকোণী, চতুষ্কোণী, অষ্টকোণী, বৃত্তা এবং দন্তী। বেদীর আকার এই ছয় প্রকার। ইহার মধ্যে এককোণী, ত্রিকোণী, চতুষ্কোণী ও দন্তী এই ৪ প্রকার বেদী যে যে যজ্ঞে নিৰ্মিত হইত, তাহাতেই সোমরসের ব্যবহার ছিল। অন্য যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত না। বেদীর মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড থাকে। ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) বেদীর এক পাশে উপবেশন করিয়া সৰ্ব্বপ্রথমে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি মধ্যে সোমরস নিক্ষেপ করিতেন। তদনন্তর সোমরসের পূজা ও সোমদেবতার আরাধনা করিবার অন্যান্য অনুষ্ঠান আরম্ভ হইত। যজ্ঞানুষ্ঠান শেষ হইলে, আৰ্ঘ্যাগণ সকলে মিলিয়া * সোমরস পান করিতেন। সোমরস একটি পাত্রে ফেলিয়া, তাহাতে বেদী মধ্যস্থ অগ্নিকুণ্ডের কিঞ্চিৎ উদ্ভাবনেষ মিঞ্জিত করা হইত, তাহার পরে তাহা পান করা হইত।

যজ্ঞের পুরোহিত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড মধ্যে সোমরস নিক্ষেপ করিয়া সোমদেবতার আরাধনা করিতেন, এবং অপরাপর দেবতার নামোচ্চারণ করিতেন। কোন দেবতার উদ্দেশ্যে যে উপাসনা করা হইত; তাহার অৰ্থ এইরূপ 'হে সোম! তুমি আমাদের রক্ষক, তুমি আমাদের প্রভু। তুমি যজ্ঞস্থলে দিয়া রথসহ উপস্থিত হও।

* শুক্লবেদী পত্রিকা।

আমরা সোমরস গ্রহণ করি।' ইত্যাদি। এই সকল হৃদ্যবাক্য শ্লোক বা উপাসনার শ্লোক ভক্তিরসার্জিত্তে উচ্চৈঃস্বরে গান করা হইত। উপনীতমান স্বরপ্রায়ের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। অতি শুদ্ধ স্বরসংযোগে উচ্চারণবৈষম্য সংঘটিত হইলে, তাঁহারা আপনাদিগকে প্রত্যাবরণ্ত ও প্রনয়ন-শক্তি মনে করিতেন এবং তজ্জন্তু সোমরস পানে তাঁহাদের তৃপ্তি হইত না। * এই উপাসনার গানে তাঁহারা তিন প্রকার বৈদিক মন্ত্র ব্যবহার করিতেন। তাহা এই—উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত। এখনকার উদারা, মুদারা ও তারাকে ইহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। উদাত্ত—নিগম, অনুদাত্ত—শ্লগম এবং স্বরিত—সা ও ম, এই ত্রিনির সহিত ঐক্য হয়।' স্বরিত কখন কখন বড়্জ ও পঞ্চমের সহিত ঐক্য হয়। এইরূপ একটি চিহ্ন (।) বেদের যজ্ঞের উপরে থাকিলে উদাত্ত সঙ্কেত বুঝিতে হইবে। এইরূপ একটি চিহ্ন (—) যদি বৈদিক যজ্ঞের উপরে থাকে তাহা হইলে স্বরিত এবং যদি নিম্নে থাকে তাহা হইলে অনুদাত্ত বুঝিতে হইবে। আবার এই গান করিবার সময় বাদ্যেরও প্রচলন ছিল। তখন যদিও বিশুদ্ধ বাদ্যের স্থিতি হয় নাই, কিন্তু ঋগ্বেদে দেখা যায় তৎকালীন মর্ষিরা সোমরস আরাধনাকালীন এবং

* Muir's Sanskrit Text.

সোমরস পানকালীন পুলোকিত চিতে গীত বাদ্য করিতেন। বৈদিক বাদ্যের তালের কিছু নমুনা আমরা দিতেছি।—
যথা হা, হী হী হা ; হা হী হী হী হী হা ;
হাং হীং বুহা ! পম্ পশো পং পং ; হাং
উং হুং, ইত্যাদি। এই প্রকার গীত বাদ্য
করিতে করিতে আয়োনে সোমরস পান
করা হইত।

যাহা হউক, এক্ষণে, সোমরস জি-
নিষটা কি এবং কোথায় পাওয়া যায়,
দেখা আবশ্যিক। এ বিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর
মধ্যে নানা প্রকার মত ভেদ হইয়াছে।
কেহ কেহ ইউরোপীয় কুলও স্বভাবের
বশবর্তী হইয়া গতানুগতিক পাণ্ডিত্য
প্রকাশ করিতে ও ছাড়াই নাই। আবার
কেহ কেহ বা একেবারে হাস্যকর মতা-
বলীর সৃষ্টি করিয়া হাস্যান্দ হইয়াছেন।
যাহা হউক, সোমরসসম্বন্ধে কতিপয়
সংস্কৃতশাস্ত্রবিৎ জগৎবিখ্যাত পণ্ডিতের
মত এ স্থলে কিয়ৎ পরিমাণে আলোচনা
করিলে বোধ হয় অযুক্তিসঙ্গত হইবে না।

পণ্ডিতবর সারউইলিয়ম জোন্স ও
হোরেশ উইলশন সাহেব বলেন, সোমরস
এক প্রকার বৃক্ষের পাতার রস। মুম্বাই
রাজস্থানইতিহাসলেখক টড সাহেব নি-
র্দেশ করেন যে, ইহা এক প্রকার বৃক্ষের
মূলের রস *। মাজাজবাসী জনৈক
তৈলান্ধী পণ্ডিত বলিয়াছেন, ‘ওড়ুচী’

* ভারতীয় গ্রন্থাবলী। ১ম খণ্ড।
১৮ পৃষ্ঠা।

প্রাচীন কালে সোমরস বলিয়া অভিহিত
হইত। আয়ুর্বেদীয় ত্রব্যাত্তিধানে, বা-
মুনচাটী অথবা ত্রস্তীশাক সোমলতা ব-
লিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কাহারও মতে
সোমরস ফলবিশেষের রস মাত্র। সু-
যোগ্য ইংলিশম্যান্ সম্পাদক বলেন, রক্ত-
বর্ণের এক প্রকার লতা সোমলতা বলিয়া
উল্লিখিত হয়। ঐ লতার রস স্নিগ্ধ, সু-
গন্ধ, এবং অন্নমধুর * অধ্যাপক গ্ন সা-
হেব ত্রীসদেশীয় সূর্যালতার (Sunplant)
সহিত এই সোমলতা ও সোমরসের
তুলনা করিয়াছেন। এই রসে মাদকতা
শক্তির বৃদ্ধি হয়, ইহা উত্তেজক এবং
প্রচণ্ড সুরার (Strong wine) ন্যায়
কার্য করে। † একজন অধ্যাপক ব-
লিয়াছেন, সোমরস কল্পিত ত্রব্য মাত্র।
আর একজন মহাত্মা বলেন, সোমরস—
চন্দ্র কিরণ !! বেদে লিখিত আছে, সোমল-
তার রস তৃপ্তিকর, মাদক, হর্ষজনক পুষ্টিকা-
রক, রোগ নাশক এবং সুরমিক। যথা—

* “ The ‘ some ’ plant of the Vedas
was the Asclepias Acida of Roxburgh,
now known as the twining plant with
few leaves ; and with clusters of small
and fragrant flowers. It yields a
mild, acid, milky juice, and grows
in various parts of India.” The Eng-
lishman, 23rd July, 1873. And also
Vide “ Lecture on the Religious sects
of India ” P 32. by R. N. Datta.

† Green's Vedio literature. V, I P 2.

(ক) প্রবোমিরস্তু ইদং বোমংসরা মা-
দয়িকবঃ। ত্রপ্যা মধ্বশ্চ যুবদঃ।

(খ) গয়ক্ষানো অমিহা বসুবিৎ পু-
ষ্টিবর্ধনঃ।

পণ্ডিত কালীকমল সার্কভৌম ব-
লেন, “ সোমলতা নামক লতা বিশে-
ষের মূল হইতে সোমরস নির্গত হয়। ইহা
দ্রুষ্ণের ন্যায় শ্বেত ও তরল। * * * ইহা
দ্রীতিমত সেবন করিলে, মনুষ্য লাভণ্যযুক্ত
ও দৌর্ভঙ্গীবি হয়। এবং প্রতুল ক্ষমতা
শালী ও পুষ্টিকার হয়।” অধ্যাপক ও-
য়েবর কহেন, “ দ্রীতিমত ঔষধের ন্যায়
সোমরস সেবন করিলে শরীর কন্দর্পের
ন্যায় কাঙ্ক্ষি ধারণ করে এবং শরীরে প্র-
ভূত বল হয়। একবার সোমরস সেবন
করিয়া এক দমে ৫।৬ ক্রোশ যাওয়া
যায়।” * বেদ পাঠে জানা যায়,
সোমরসের বর্ণ জলের ন্যায় তরল এবং
দ্রুষ্ণের ন্যায় গাঢ়। বেদের “ সন্তে প-
রাংসি সমুচ্ছ রাজা ” এবং “ রাজ্জো-
নুতে বকগসা ত্রতানি বৃহস্পাতেবং তব
সোমধাম ”— প্রভৃতি শ্লোক দ্বারা ইহার
দ্রুষ্ণের ন্যায় গাঢ় এবং জলের ন্যায় তর-
ল প্রতাপন্ন হইতেছে।

সোমরস যে সোমনামধেয় এক প্র-
কার লতার রস এ বিষয়ে সন্দেহ থাকি-
তেছে না। এই লতা পার্শ্বতা প্রদেশে
জন্মিয়া থাকে। বেদে ও ইহা পার্শ্বতীয়
বলিয়া কথিত আছে যথা;—“যংসানোঃ

মানুমান্বহৎ কুর্ষা স্পষ্ট কর্ত্বং। তদি-
শ্রোার্থং চেততি যুথেন বৃষ্টি রেজতি।”
এই সোমরস উজ্জল (Sparkling) এবং
দেখিতে সুন্দর। মহর্ষি বাল্মীকি, রাম
চন্দ্রের রূপ বর্ণনার স্থলে বলিয়াছেন,
“ সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।” অর্থাৎ সো-
মের ন্যায় দেখিতে সুন্দর। এতদ্বারা
সোমলতা ও সোমরসের সুন্দর শ্রীত্ব প্রতি
পাদ্য হইতেছে। হরিবংশ, মহাভারত
প্রভৃতি গ্রন্থে ও এইরূপ উল্লেখ আছে।
অথর্ববেদে লিখিত আছে, স্বর্গে যেরূপ
অমৃত, মর্ত্তে সেইরূপ সোমরস। যোগ
শাস্ত্রে আছে, “ পবনাত্মাসযোগ সা-
ধনা করিলে যে ফল পাওয়া যায়, একবার
সোমরস সেবন করিলে তক্রূপ ফল পা-
ওয়া যায়।”

কোন কোন পণ্ডিত বলেন, সোমলতা
বা সোমরস এখন আর পৃথিবীতে পাওয়া
যায় না। সোমাত্মাৎবে পার্থিবামৃতকে
তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করিতে
হয়। এই পার্থিবামৃত কি দেখ উচিত।
পার্থিবামৃত শব্দে পৃথিবীর অমৃত শাস্ত্রে,
পার্থিবামৃত শব্দে জল বলিয়া লিখিত
আছে। অমরকোষে এবং ঋগ্বেদে ইহার
প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা;—(ক) “ পঃ
কিলালমমৃত মিতামরকোষঃ। (খ) অপ্-
স্বস্তরমৃতমপ্পূ ভেবজমপ্পূ তেজঃপ্রশস্ত-
য়েদেবা ভবতবাক্তিনঃ। ঋগ্বেদ। ১।২৩।
১৯ (গ) অপ্পূস্মে সোমো অত্রবীদস্ত
বিধানি ভেবজা অমিঞ্চ বিশ্বজক্তবং আ-

পশ্চ বিশ্বভেদব্রজীঃ। ১। ২৩। ২০ংগেদ”
তবে, এত অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের পর
সোমরস কি জল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ?
ইহা বিশ্বাস করিতে বুদ্ধি প্রতিহত হয়,
হৃদয় সঙ্কুচিত হয়। শাংজ্রে, পার্থিবামৃত
অর্থে জল বলিয়া উল্লেখ আছে কিন্তু সো-
মরস যে জল তাহা কোথাও উল্লিখিত
হয় নাই। সোমাতাবে জলের ব্যবহারের
কথাও কোথাও দেখিনাই। অতএব এ
মতটি বিশ্বাস্য বা সংযুক্তিসঙ্গত নহে।

জর্জর্গ দেশীয় কতিপয় পণ্ডিত, Ascij:aa
Acidia কেই সোমলতা বলিয়া উল্লেখ ক-
রেন। ইহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বলিতে
পারি না। অপর কেহ কেহ সোমলতাকে
পুঁইশাক বলিয়া নির্দেশ করেন। সাম-
বেদের ষড়বিংশ ব্রাহ্মণের এক আখ্যানি-
কার উক্ত হইয়াছে যে, সোমলতা পৃথি-
বীতে আর উৎপন্ন হয় না। এজন্য অন্য
ক্রমকে ইহার প্রতিনিধি করিয়া যজ্ঞস্থলে
আনয়ন করিতে হয়। ঋতি গ্রন্থে সো-
মাতাবে পুস্তিকা (পুঁই) শাকের বিধি
আছে। যথা—“সোমাতাবে পুস্তিকা-
মভিস্কুরয়াৎ।” ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি
প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে সোমাতাবে পুস্তিকা-
বিধানের অনেক শ্লোক আছে। অথর্ব-
বেদের একস্থলে ‘পুস্তিকরঞ্জলতা’ সো-
মলতা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। বেদে
সোমলতার আকার যে রূপ বর্ণিত হই-
য়াছে, তাহা পুঁইশাক বলিয়াই আপাততঃ
বিশ্বাস জন্মে। পুস্তিকা শাকের যে রূপ

তক্ত (আশ) থাকে সোমলতার তাহাই
ছিল। ইহাকে সোমতক্ত কহে। যথা—
‘অপ্যায়স্ব মন্দিতম সোম বিশ্বেভিরং-
শতিঃ। ভবানঃ সুরশ্রবস্তনঃসদার্ষে।’
(১৪ অধ্যায়। ১০ সূক্তঃ।) অধ্যাপক
হাগ সাহেব পুনা হইতে যে সোমলতা
আনিয়া ছিলেন, তাহার আকার পুস্তিকা
শাকের সহিত অনেকটা ঐক্য হইয়াছিল।
কিন্তু তাহার আশ্বাদ অতীব তিক্ত এবং
দুর্গন্ধ যুক্ত। * অনেকে বলিয়াছেন
ইহা প্রকৃত বৈদিককালীন সোমলতা
নহে। †।

সে যাহা হউক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই
যে, সোমলতার আকার বন-পুঁই শাকের
ন্যায়। কিছুদিন পূর্বে আমি কতিপয়
পণ্ডিতের সহিত বেলগাছিয়ার গিরাছি-
লাম; তথায় সোমরসের উল্লেখ হওয়াতে,
বানিরালাল বাগ্গি নামধের জর্জর্গ পা-
র্কতা দেশীয় মোহান্ত আমাদিগকে এক
লতা দেখাইয়া ছিলেন, তাহা আকৃতিতে
কোমল পুস্তিকা শাকের মত। আমরা
৪। ৫ জনে উহা আশ্বাদন করিয়া ছিলাম,
তাহার স্বাদ ইষৎ অন্ন মধুর বলিয়া বোধ
হইল। উহার পত্র পুস্তিকা শাকের পা-
তার মত; কিন্তু তত রুচৎ নহে। আমি,
ক্রম বশতঃ, উহাকে প্রথমে পুঁইশাক বলিয়া
বিশ্বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু বাস্তবিক
তাহা নহে। উহা পুঁইজাতীয় বটে,।

* Aid. Br, Vol II P 439,

† Edinburgh Review Vol LX, No IV

বন-পুঁ ইয়ের সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। (*) ঐ মোহান্ত প্রতিদিন উহার রস প্রায় একছটীক পরিমাণে পান করেন, তাহাতে তাঁহার নেশা হয়। তিনি পূর্বে গাঁজা, চরস, এবং অহিফেন সেবন করিতেন, কিন্তু এই রস সেবন করা অবধি তাঁহার এ সকলের আর প্রয়োজন হয় না। মোহান্ত আমাকে উহা উপঢৌকন দিয়াছিলেন। আমি তাহা ভারতবর্ষীয় সুলিকোরতি সভার (†) বিলাতস্থ পৃষ্ঠপোষক জীযুক্ত মে সুরয়ার্স হুইট্‌নি বড্‌ এবং কোম্পানীকে লগুনে পাঠাইয়া ছিলাম। তাঁহারা বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা বলিয়াছেন ইহা প্রকৃত বৈদিক কালীন সোমলতা বটে। (‡) সম্ভ্রতি পাণ্ডুরা রেলওয়ে স্টেশনের নিকট-বর্তী এদিনা মসজিদের নিকট এক প্রকার লতা দৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ লতা তীক্ষ্ণত দেশীয় এক প্রকার লতার সহিত ঐক্য হয়। তীক্ষ্ণত দেশীয় লোকেরা ঐ লতাকে বৈদিককালীন লতা বলিয়া বিশ্বাস করে। তীক্ষ্ণত দেশে ঐ লতার নাম "মা-

নীর'। * তত্রতা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পণ্ডিতেরা মানিদের যেরূপ রূপ ও গুণ বর্ণনা করেন, পাণ্ডুরা প্রাপ্য লতা অনেকাংশে তজ্জপ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর জর্নেক গার্ড উহা প্রাপ্ত হইয়া তদীয় রস আশ্বাদন করিয়াছিলেন। উহার আকৃতি ও প্রকৃতি সোমরসের ন্যায় প্রতীত হয়। ইহার স্বাদ অল্পমধুর। ইহা মাদক, ক্ষুৎ-পিপাসোসৌন্দীপক, উদরের পীড়ানাশক, বিষয় এবং তৃপ্তিজনক। ইউরোপীয়েরা ইহাকে *Semita genia* কহিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে। আমি উহা রীতিমত আশ্বাদন এবং পরীক্ষা করিয়া উহাকে *Genus mointee* বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া ছিলাম। আশ্চর্যের বিষয় এই, বানিয়া লাল বাজির প্রদর্শিত সোমরসের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। যাহা হউক, সোমলতার আকার অনেকটা যে বনপুঁ ই শাকের মত সে বিষয়ে আমার কিছুই সন্দেহ নাই।

পূর্বকালে নানা প্রকার সোমলতা ছিল। এক্ষণে যতদূর অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে, তাহাতে দেখিয়াছি, এখনও ২৪ প্রকার সোমলতা পাওয়া যায়। অন্বেষণ করিলে ইহা মিলিতে পারে। এই ২৪ প্রকারের নাম এই,—অংশুমান, ভুঞ্জমান, চন্দ্রমা, রাজতপ্রভা, হর্ষালীম, কনৌয়ান, শ্বেতাঙ্ক, কণকপ্রভা, প্রতানবান,

* History of Thibet, by Colonel Rayne P 86, and Buddha in Thibet, P 17

† সোমপ্রকাশ। ৯ই আশ্বিন ১২৮৪।

‡ ভারতীয় প্রত্নাবলী। ১ম খণ্ড ১৯ পৃষ্ঠা এবং Proceedings of the preliminary meeting of the I. E. Improvement Society, P 7

* History of Thibet, by Colonel Rayne, P 93.

তালবৃক্ষ, করবীর, অংশবান, সরস্বত, মহাসোম, গাকড়াহুত, গারত্রাইষ্টেট, পাণ্ডুক, জাগত, শঙ্কর, অগ্নিষ্টোম, ঠৈবত, ত্রিপদীযুক্ত, গারত্রী, উড়ুপতি । এই সকল সোমলতার প্রত্যেকের ১৫টির অধিক পত্র হয় না । লতা ও আকায়ে বড় দীর্ঘ নহে কিন্তু বড় সুন্দর ও সরস । “মহাসোম” নামক সোমলতার বিংশতিটি পত্র দেখা গিয়াছে । এই সকল লতার পাতা শুরু পক্ষে জন্মে এবং কৃষ্ণ পক্ষে পতিত হয় । অমানসাতে সমুদায় পত্র নষ্ট হইয়া কেবল মাত্র লতাবশিষ্ট থাকে । এই সকল লতার তেজ শরৎকালে কিছু প্রথর হয় ।

শান্ত্রে আছে, হিমালয়, গহ্ব, মাহেশ্বর, মলয়, স্রী, দেবগিরি, পারিপাত্র, বিষ্ণু এবং বিতস্তা নারী নদীর উত্তরে যে

সকল পার্বত আছে, তথায় সোমলতা পাওয়া যায় । সিন্ধু নামক মহানদে, কাশ্মীরের মানসসরোবর, দেবগুপ্ত নামক হ্রদে সোমলতা প্রাপ্ত হইবার কথা অথবা বেদে দেখা যায় । তন্মধ্যে আছে, দাক্ষিণাত্যের কোন কোন পার্বত্য প্রদেশে এবং ভারতবর্ষের অনেক স্থানে, বিশেষ মহাবনে কিম্বা কোন বনময় প্রদেশে ইহা পাওয়া যায় । আয়ুর্বেদে আছে, ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে সোমলতা জন্মায় । পশ্চিম ভারতে সোমতীর্থ নামে একটি স্থানও প্রসিদ্ধ আছে । কিন্তু তথায় অনুসন্ধান করিয়া সোমলতা পাওয়া যায় নাই । ফলতঃ যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, সোমলতা জল এবং স্থল উভয় স্থানেই জন্মায় । (ক্রমশঃ)

ভারতে আৰ্য্যজাতি

যে আৰ্য্যজাতির গৌরব-প্রভায় অদ্যাপি ভারত গৌরবান্বিত, যে আৰ্য্যজাতির বিদ্যা ও নীতিজ্ঞান জগৎপ্রথিত, যে আৰ্য্যজাতির বিন্দুমাত্র বিবরণ অদ্যাপি অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞের হৃদয়ে কৌতূহল-শিখা প্রদীপ্ত করে, যে আৰ্য্যজাতির তমসাম্বল ইতিহাসের কলিকামাত্র উদ্ধারার্থ কত কত মহামনীষী জীবনের সার সমগ্র অকাতরে ব্যয় করিতেছেন, এবং যে আৰ্য্যজাতির সম্ভান ব-

লিয়া আমরা সংসারে চিরদিন সমাদৃত রহিয়াছি, সেই আৰ্য্যজাতি কোথা হইতে কিরূপে ভারতবর্ষে শুভাগমন করিলেন তাহা জানিতে কাহার না প্রবৃত্তি জন্মে ? সেই প্রবৃত্তি কথঞ্চিৎ চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করাই উপস্থিত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বহুতর গ্রন্থে আৰ্য্য শব্দের উল্লেখ আছে । তৎসমস্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আৰ্য্য এবং শূ-

হেঁরা অনাৰ্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।
যথা, কাঁতাগন-কৃত স্ত্ৰের ভাষা—

“শূঁত্রচতুর্থাবর্ণঃ আৰ্য্যৈশ্চবর্ষিকঃ।”

এবস্থিধ বর্ণ-বিভাগ দৃষ্টিে অনুমান হয় যে, আৰ্য্যদিগের আগমনের পূর্বে ভারতে যে সমস্ত জাতি বাস করিত, তন্মধ্যে শূঁত্রেরাই প্রধান। আৰ্য্যেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ইহার প্রাচীন অধিবাসীদিগকে বিজিত ও বিদূরিত করেন; সম্ভবতঃ শূঁত্র-দিগের নিরীহতা বা অন্যগুণে বশীভূত হইয়া তাহাদিগকে হিন্দুসম্প্রদায় মধ্যে গ্রহণ করেন। সে যাহাইকি হিন্দুশা-স্ত্রের নাম অন্যান্য অনেক জাতির গ্রন্থা-দিতে আৰ্য্যনামের উল্লেখ দেখা যায়, এবং ঐসমস্ত জাতিরাও আপনাদিগকে আৰ্য্যনামে পরিচিত করেন। হিন্দু, পারসীক, গ্রীক, রোমক, জর্মন, কেল্ট প্রভৃতি কয়েকটি জাতিকে আৰ্য্য-বংশোদ্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। উল্লিখিত জাতিসমূহের ভাষা পর্যা-লোচনা করিলে তন্মধ্যে কতকগুলি শব্দের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তদ্বন্দেই এইরূপ অনুমান সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত গণের গবেষণাধারা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সংস্কৃত, আবস্তীক, গ্রীক, ল্যাটিন, জর্মন প্রভৃতি কতিপয় ভাষা এক মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন। যদিও ঐ মূল ভাষা অ-জ্ঞাপি বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায় না, ত-থাপি ঐ কয় ভাষার সাদৃশ্যদর্শনে উহাদি-গকে একবীজোৎপন্ন বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। অনেকে এরূপ কহিতে পারেন যে, সংস্কৃত

হইতেই ঐ ভাষা সমস্তের উৎপত্তি হই-য়াছে; তাহাই হইলে অবশ্যই সকলে আপন আপন ভাষার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে যত্ববান হইবে এবং পরিশেষে উদ্দেশ্যবিষয়ের সি-দ্ধান্ত করা দুঃস্বপ্ন হইয়া উঠিবে। পূর্বেবক্ত ভাষাগুলির পারস্পরের সৌসাদৃশ্য দর্শনে এক হইতে অন্যের উৎপত্তি প্রতীয়মান হয় না। ঐহারা ঐ ভাষাগুলির সমাক্ অনু-শীলন করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা নিঃ-সংশয় বুঝিতে পারেন যে, উহারা একই ভাষা, কেবল স্থানভেদে উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য জন্মিয়াছে। এসম্বন্ধে অধিক স্থানব্যয় বা অধিক বাগাড়ম্বরের প্রয়ো-জন নাই সুতরাং আমরা এবস্থিধ দুইটিমাত্র শব্দ উল্লেখ করিব।

সম্পর্কবাচক	সংখ্যাবাচক
সংস্কৃত— পিতৃ	সপ্তন্
ল্যাটিন—পাটর্	সেপ্টেম্
গ্রীক—পাটর্	হেপ্টা
জর্মন—ফাতের	সেপ্ত্
আবস্তীক * পৌতর	হপ্তন্

আৰ্য্যদিগের যে সময়ের কথা হই-তেছে তখন তাঁহারা উক্ত সভ্যতার আদর্শ ছিলেন না; কিন্তু মানব সমাজ যতই কেন

* পারসীকদিগের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের নাম অবস্তা। কেহ কেহ উহাকে জেন্দা-বেস্তা বলেন। উহা যে রূপ ভাষায় লি-খিত তাহা পারসীক ভাষা হইতে বহুল বি-ভিন্ন। অবস্তার ভাষা আবস্তীক বলিয়া উল্লিখিত হইল।

অসভ্য হউক না, ভাষা-সৃষ্টির প্রথমেরই তা-
হাদের সম্পর্কসূচক ও সংখ্যাগণক শব্দের
প্রয়োজন হইবে । এই কারণে আমরা স-
ম্পর্ক ও সংখ্যা প্রতিপাদক দুইটি মাত্র শ-
ব্দের উল্লেখ করিলাম ।

এতক্রমে ভাষার প্রকৃতি আলোচনা
করিলে উপলব্ধি হয় যে, যুগে উক্ত জাতি-
সমূহ একস্থানে থাকিয়া এক ভাষায় ক-
থোপকথন করিতেন । ক্রমশঃ জনসংখ্যা
বৃদ্ধি হওয়ায় স্থানের অসংকুলান জন্য তাঁ-
হারা নানা দিগদেশে প্রস্থান করেন ।
স্থান পরিবর্তন সহ, ঘটনাপরম্পরা বীহা-
দের প্রতি যাদৃশ অনুকূল হয়, তাঁহারা তা-
দৃশ জাতীয়োন্নতি সাধনে সমর্থ হন । জা-
তীয়উন্নতিসহ জাতীয়ভাষাও বিশ্বরূপা-
স্তরিত হইয়া থাকে । অধুনা এই সমস্ত
ভাষার যে বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, উহাই
তাঁহারা হেতু । যৎকালে প্রাচীন জাতি
একান্তভুক্ত পরিবারের ন্যায় একস্থানে
বাস করিতেন, সে সময় তাঁহাদের ভাষার
যে সকল শব্দের বহুল প্রয়োজন ছিল, অ-
ধুনা দেখা যায় তক্রপ শব্দ নিশ্চয়ই দূর-
দেশগত আর্ষ্যগণের ভাষাসমূহে সমভা-
বেই রহিয়াছে । সুতরাং শব্দবিদ্যার
অপার মহিমা বলে * ইহা স্থির হইয়াছে
যে, প্রাচীন কালে আর্ষ্যজাতি একস্থানেই
বাস করিতেন । এক্ষণে দেখা আবশ্যিক
সেই স্থান কোথায় সন্নিবিষ্ট ছিল ।

* শব্দ-বিদ্যা বা ভাষাতত্ত্বের অসাধা-
রণ চমৎকারিতা জদয়জয় করাইবার নি-

ইহা সর্ববাদিসম্মত যে, আসিয়াখ-
ণ্ডেই মনুষ্যজাতির আদিম নিবাস স্থল । এ-
খান হইতেই অন্যান্য খণ্ডে মনুষ্য অবতার
হইয়াছে । যদি এক জাতি মনুষ্যই ইউ-
রোপখণ্ডে গ্রীস, ইটালী, জর্মানি প্রভৃতি
দেশে এবং আসিয়াখণ্ডের পারস্য ও তা-
রতবর্ষে অবতারিত হইয়া থাকেন, তাহা
হইলে অবশ্যই তাঁহারা এই সমস্ত বিভিন্ন
দেশের মধ্যবর্তী কোন স্থানে বাস করি-
তেন । সে স্থান কোথায় ? আর্ষ্যগণ আ-
সিয়াখণ্ডের অন্তর্ভূত কোন শীতপ্রধান
দেশে বাস করিতেন, তাহার সম্ভেদ
নাই । এখনও দূরদেশবাসী আর্ষ্যগ-
ণের ভাষায় শীতবাচক শব্দের সমধিক
বাল্য ও সাদৃশ্য লক্ষিত হয় । ঐ স্থান
ভারতবর্ষের উত্তরদিকে সংস্থিত । কারণ,
ভারতীয় বহুগ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, ভারতের
পশ্চিমোত্তরদিক দিয়াই আর্ষ্যেরা এখানে
আসিয়াছিলেন । ইহা প্রতিপাদিত হই-
য়াছে যে গ্রীক ও রোমকেরা উত্তরপূর্ব
দেশ হইতে গমন করিয়া গ্রীস ও ইটালী
দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন * সু-
তরাং আর্ষ্যদিগের আদিম বাসস্থান নির্ণয়
করিতে হইলে, আসিয়া মহাদেশে ভার-
মিত্ত আমরা পাঠকগণকে Maxmuller's
Lectures on the Science of Languages
নামক ২খণ্ড মনোহর পুস্তক অধ্যয়ন ক-
রিতে অনুরোধ করি ।

* Prichard's Physical History of
mankind Vols. III & VI দেখ ।

ত্তর উত্তর পশ্চিমস্থ এবং খ্রীস ইটালীর পূর্বোত্তরস্থ কোন শীতপ্রধান স্থান নিরূপিত করা আবশ্যিক। সম্ভবতঃ বেলুটাগ পর্বতের পশ্চিমে ও অসু নদীর প্রভবগণের সন্নিধানে যে শীতপ্রধান ও উন্নত ভূভাগ দৃষ্ট হয়, তাহাই আৰ্য্যগণের আদিম নিবাসভূমি। প্রাথমিকসহ ভূচিত্র দর্শন করিলেও একথা মনে উদয় হয়। সেই হিমালীপরিবৃত্ত মানবকুলের আদিম বাসস্থান হইতে আৰ্য্যগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমশঃ দেশ দেশান্তরে অবস্থান করেন।

কোন পথ দিয়া আৰ্য্যেরা প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন তাহাই এক্ষণে নির্ণয় করা বিধেয়। পারসীক পূর্বাংশে আইর্মণ-বক্রজো নামে একস্থান স্থষ্টির প্রথম দেশ বলিয়া কীর্তিত আছে। ঐস্থান আমু ও সাইলুন নদী সন্নিহিত। আৰ্য্যেরা প্রথমে যে দেশে বাস করেন তাহাই সূফ স্থান মধ্যে প্রথম বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। আৰ্য্যেরা ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া ক্রমে তিন্ন তিন্ন স্থানোদ্দেশে প্রস্থান করেন। উক্ত গ্রন্থে সেরূপ অনেক স্থানের নামোল্লেখ আছে। সেই গ্রন্থেই ভারতীয় অম্যান্য স্থানের প্রসঙ্গ করিবার পূর্বে, হপ্তহিন্দু ও হরখইতি নামক দুইটি ভারতবর্ষীয় স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। সপ্তসিন্দু ও সরস্বতী আধুনিক হপ্তহিন্দু ও হরখইতি নামদ্বয়ের রূপান্তর তিন্ন কিছুই নহে। সুতরাং পঞ্জাব প্রদেশেই যে আৰ্য্য-

গণ প্রথম পদার্পণ করেন তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। বেদে অন্যান্য স্থানের নামোল্লেখের পূর্বে সপ্তসিন্দু নাম পাওয়া যায় * পঞ্চাবের পশ্চিমে গান্ধার ঠ ও উত্তরে বাহ্লীক দেশে প্রাচীন কালে হিন্দু সমাগম ছিল তাহার নিদর্শন আছে। অদ্যাপি হিন্দুগণ পূর্বে সিরাপোশ নামে এক হিন্দুজাতি দৃষ্ট হয়। এতদ্বারা আৰ্য্যগণের ভারতের উত্তরপশ্চিমদিক দিয়া প্রথমে পঞ্জাবে অধিবাস স্থাপন ঘটনা সূচকরূপে সমর্থিত হইতেছে।

পঞ্জাবে আৰ্য্যসম্প্রদায় মধ্যে ধর্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে ষোরতর মতান্তর উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য তাঁহাদের মধ্যে দারুণ কলহ ও বিচ্ছেদের আবির্ভাব হয়। পুরাণে ও কয়েকখানি বৈদিক ব্রাহ্মণে যে দেবানুরের যুদ্ধপ্রসঙ্গ বর্ণিত আছে, তাহা আৰ্য্যগণের এই গৃহকলহ তিন্ন আর কিছুই নহে। এই কলহ

* সিন্দু, তাহার পঞ্চ শাখা এবং স্রস্বতী এই সপ্ত নদীর বিদ্যমানতা হেতু পঞ্জাবের সপ্তসিন্দু বা হপ্তহিন্দু নাম হইয়াছে।

† গান্ধার অধুনা কাণ্ডাহার। হুত্তরাষ্ট্রী গান্ধাররাজ তনয়া গান্ধারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

‡ বাহ্লীক অধুনা তন বাহ্লক। এই দেশে শাস্ত্রু রাজার ভ্রাতা রাজত্ব করিয়াছিলেন।

জনা কতকগুলি মতান্তরিত আর্থা, ভারত ভাগ করিয়া, পারস্য দেশে গমন করেন; তাঁহারা পারসীক নামে খ্যাত। অবশিষ্ট আর্থেরা ক্রমশঃ ভারতবর্ষে বসতি বিস্তার করিয়া, জ্ঞান, ধর্ম ও বিদ্যার আলোচনার ধন-ধান্যে পরিবৃত্ত হইয়া মুখসচ্ছন্দে কাল যাপন করেন।*

কালের কি অপরিমিত ক্ষমতা! প্রকৃতির কি বিস্ময়াবহ আবর্তন! পরিবর্তনের কি অমোঘ গতি! কোথায় গঙ্গা-যমুনা ভয়ীভয়ের লীলাভূমি আর্থাবর্ত, কোথায় টাইবার-সলিলবির্দোত রোম রাজ্য! কোথায় চির-ভুষারান্নত অত্রক্ংশ হিমা-ক্ষির মালভূমি, কোথায় গিরিবর আঙ্গুস-বিশোভিত জাখনি দেশ! কোথায় পুণা সলিল-সংশেক্তিত, জ্ঞানধর্মনিকেতন পবিজ্ঞ বারণাসী ক্ষেত্র, কোথায় বিলাস-আবাস-ভূমি প্রকৃতির প্রিয় বজ্রমূল সিরাজ মগর! কি আশ্চর্য! কি বিস্ময়জনক! সুবিলীর্ণ বীচিমালা বিকোভিত অনন্ত সাগর, সমুদ্রত মৃদূর বিস্তৃত ভূগর, দূরব্যাপী ছুরন্ত মকভূমি, ভয়াল জন্তু সমাকুল গহন কামিন, কলমাদিনী জ্যোতস্বতী, প্রকৃতির পরম রমণীয়তার ভাণ্ডার স্বরূপ মনোহর হ্রদ সমূহ আর্থা জাতির অধুনাতন নিবাস-ভূমি সকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কলতঃ তৎসমস্তই একজাতীয় লোকের নিবাসস্থল। তত্রত্য অদিকাংশ মানবের পিরায় একই শোণিত প্রবাহিত। একই স্থান হইতে সেই মানবরস্ম সঞ্চা-

রিত। তাঁহারা একই ভাষার কথোপকথন করিতেন, একই সামাজিক নিয়মে সঞ্চালিত হইতেন, একই রাজ-শাসনের অধীন ছিলেন, একইরূপ কার্যে সকলের আসক্তি ছিল। কিন্তু কি ভয়ানক পরিবর্তন! অন্য আর সে মানবগণ মধ্যে কয়েকটি শব্দের সাদৃশ্য ভিন্ন আর কিছুই সাম্য নাই। আজ আমরা কেহ কাহাকে আপনার বলিয়া চিনি না। আজ আমরা পরস্পর পরস্পরকে পর হইতেও পর বলিয়া মনে করি। আজ আমাদের ধর্ম, সমাজনিয়ম, রীতি, নীতি, সমস্তই বিজাতীয় পরিবর্তন পরিগ্রহ করিয়াছে। এখন তাঁহাদের ভাষা শুনিলে আমরা পক্ষীর ভাষা মনে করিয়া শ্বির নয়নে চাহিয়া থাকি, তাঁহাদের উন্নতি ভাবিলে স্তম্ভিত হই। আমাদের অধোগতি স্মরণ করিলে ব্যথিত হই। আজ পরস্পর আর্থা-শোণিত-সমুৎপন্ন জাতি সমূহ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আজ তাঁহাদের মধ্যে সহায়ুভূতি নাই, ভ্রাতৃত্ব নাই। অধিক কথা কি, আমাদের বোঘাট ও মাস্ত্রাজস্থ পারসীক ভ্রাতৃগণের সহিত আমাদের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; তাঁহারা তাহাই জানেন কই? আমরাই বা তাহা জানি কই? কিন্তু এ সকল জাতিতে স্থানের বিভিন্নতা ব্যতিত অন্য কোন পার্থক্য নাই, থাকাত উচিত নহে। হিন্দু, জাখণ, গ্রীক, পারসীক প্রভৃতি জাতি সমূহ একই জাতি। আমাদের সকলের পরস্পর চির কালের

নিমিত্ত প্রাতৃত্বাবে বন্ধ থাকিবার সম্পর্ক।
আমাদের সম্পর্ক উচ্ছেদ করিবার নহে,
অস্বীকার করিবার নহে, বিলুপ্ত হইবার
নহে। তবে এ ভিন্নতাব কেন? আইস
স্বদেশীয়গণ আমরা আমাদের বিদেশস্থ
স্বজাতীয় জাতীগণের সহিত মমতা সংস্থাপনে
প্রযত্ন করি, তাঁহাদের সহিত মিশিয়া

যাই, তাঁহাদিগকে আমাদের সহিত মিশাইয়া
লাই, আমাদের সহিত মিশাইয়া তাঁহাদিগকে
হাস্যাত্মক, তাঁহাদিগের বিপদে আমরা কাঁদি।
আইস সকলে মিলিয়া আর্থ্য নামে পুনরায়
জগত মাতাইয়া তুলি,—বন্দুখা আমরা দি-
গকে বক্ষে ধারণ করিয়া স্নান্য মনে ক-
কন।



জয়পুর।

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজপুত্রদিগের
শাসনসময়াবধি একটি কুপ্রথার প্রচলন
হইয়া আসিতেছে। তদনুসারে রাজধানী
কি প্রধান নগরের নামেই রাজ্য বা প্রদেশ-
শের নামকরণ হইয়া থাকে। করদ বা
মিত্ররাজ্যগুলি ইংরেজশাসনের সম্পূর্ণ
অধীন না হইয়াও তাহাদের সংক্রমে ঐ
কুপ্রথার হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পায় নাই।
রাজপুতানা প্রদেশে মাড়বার ও মিরার
রাজ্য যথাক্রমে তত্তৎ প্রদেশের রাজ-
ধানী যোধপুর ও উদয়পুর নামে সর্ব-
সাধারণ সমীপে পরিচিত। জয়পুর নগ-
রের নাম হইতে যে রাজ্যটিকে জয়পুর
রাজ্য বলিয়া সকলে অবগত আছেন, তা-
হার প্রকৃত নাম চুণ্ডার। অক্ষয়ধর মহা-
দেবের নাম হইতে উহার আর একটি নাম
অক্ষর হইয়াছে। ফলতঃ রাজপুতগণের
মধ্যে চুণ্ডার ও অক্ষর নামই সমধিক প্র-
সিদ্ধ।

চুণ্ডার বা জয়পুর মিরাররাজ্য সদৃশ
প্রাচীন নহে সত্য, কিন্তু মানসত্ৰম সম্বন্ধে
উদপেক্ষা কোন অংশেই নূন নহে। উ-
ভয় রাজ্যের অধিনায়কই সূর্য্যবংশাবতংশ
রঘুকুলভিলক রামচন্দ্রের বংশজাত। ল-
ববংশীয় নরপতিবর্গ মিরার রাজ্য সংস্থাপন
পূর্ব্বক চতুর্দিকে অধিকার বিস্তার
করিয়া বাস করেন এবং কুশবংশীয় সূপতি
বিশেষদ্বারা চুণ্ডার রাজ্য সংস্থাপিত হ-
ইয়া অত্ৰাপি কালের উপর রাজত্ব ক-
রিতেছে।

রাজপুত্রকুলাচার্য্যদিগের প্রস্থান-
সারে নিরূপিত হইতেছে যে কুশবংশীয়
সূপতিবিশেষ পৈতৃক রাজধানী পরি-
ত্যগ পূর্ব্বক শোনিদীর তটে রোটসু
নামে এক দুর্গ সংস্থাপন করিয়া বাস
করেন। কিন্তু কোন সময়ে ঐ দুর্গ
সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহার কোন নিদ-
র্শন পাওয়া যায় না। ঐ দুর্গে কতিপয়

পুরুষ পরম্পরা বাসের পর ৩৫১ সন্থ-
সরে (খৃঃ ২৯৫) কুশসন্তানগণের মধ্যে
মল * নামে জনৈক প্রসিদ্ধ নাম। তুপতি
নিষধ নামে এক নগর সংস্থাপন করেন,
অধুনা ঐ নগর মরবার নামে প্রসিদ্ধ।
ঐ প্রদেশে এরূপ কিম্বদন্তীও প্রচলিত
আছে যে, কুশসন্তানগণ কর্তৃক রোটস্
চুর্গ এবং নিষধ নগর সংস্থাপনের মধ্যবর্তী
কালে তাহারা আর দুইটি নগর সংস্থাপন
করিয়াছিলেন। প্রথমটির নাম লাহার
এবং দ্বিতীয়টির নাম গৌয়ালিয়র। এই
কিম্বদন্তী নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। এক
জনের বহু পরিবার কখনই চিরদিন এক-
স্থানে একত্রে বাস করিতে পারে না।
তন্মধ্যে কাহারও স্বতন্ত্র বাসের ইচ্ছা হই-
লেই তিনি স্থানান্তর অনুসন্ধান করিবেন
ইহাতে বিচির কি? সে যাহা হউক,
কোন্ ব্যক্তি দ্বারা লাহার ও গৌয়ালিয়র
সংস্থাপিত হয়, তাহার কোন সংবাদ পা-
ওয়া যায় না। নিষধ নগরে নলরাজ হ-

* সংস্কৃত ভাষায় নলরাজ ও তদীয়
মহিষী দমরস্তীর যে অপূর্ব উপাখ্যান প্র-
চারিত আছে, আক্বর বাদশাহের আ-
জানুসারে আবুল ফজলের ভ্রাতা কৈফি
ঐ উপাখ্যান পারসী ভাষায় অনুবাদ ক-
রেন। বার্লিন নিবাসী পণ্ডিতাশ্রয়ণা
বপু ঐ অনুবাদ দৃষ্টে ঐ অপূর্ব উপাখ্যান
ইউরোপে প্রথম প্রচার করেন। সংস্ক-
ভাষায় ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ তাহার
পর মূলগ্রন্থ প্রাপ্ত হন।

ইতে ত্রয়োত্রিংশ পুরুষ পাল উপাধি ধারণ
পূর্বক মৃত্যে বাস করেন। কোন্ মরপতি
এই নূতন উপাধি স্বীয় নামে সংযোজিত
করেন, তাহা কোন ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া
যায় না। * কিন্তু কুশসন্তানগণ কচুবহু †
বংশ নামে বিখ্যাত। কচুবহেরা প্রতি
বৎসর মহাসমারোহে স্বর্ঘ্যের আরাধনা
করিয়া থাকে। নিয়মিত দিবসে তাহারা
অষ্ট-অশ্ব-সংযোজিত রথে স্বর্ঘ্যমূর্ত্তি আ-
রোহণ করাইয়া নগর মধ্যে অতি সমা-
রোহ পূর্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে।

নলরাজ হইতে ত্রয়োত্রিংশ পুরুষ নর-
পতি সোরা সিংহ একটি অপগণ্ড পুত্র
সন্তান রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ ক-
রিলে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই শিশুকে
বঞ্চনা করিয়া মরবার রাজসিংহাসন অ-
হরণ করিলেন। সোরা সিংহের মহিষী পু-
ত্রের ভাবি অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহাকে
মস্তকে লইয়া অতি দীনবেশে নগর হইতে

* লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল টড বলেন, অতি
প্রাচীন রাজপুত জাতিদেরা পাল উপাধি
দ্বারা অভিহিত হইতেন।

† কচ্ছপ হইতে 'কচুবহু' নামের
উৎপত্তি হইয়াছে। কুশসন্তান দিগের
মধ্যে কোন্ প্রাচীন পুরুষ কচ্ছপের সং-
জ্ঞাপন্ন হইয়াছিলেন তাহা আমরা অব-
গত নহি। টড কছেন অন্নমীরের রাজ-
পুত্রেরা ঐ নামে বিশেষ বিখ্যাত। বোধ
হয় বিবাহ স্ত্রে ঐ নাম অস্বকেশ্বরে সং-
লগ্ন হইয়া থাকিবে।

বহির্ভিত হইলেন। রাজমহিষী এইরূপ দীনভাবে বহুদূর ভ্রমণ করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত বোধ হওয়ার খোগং নগরের নিকট পথপ্রান্তে শিশু সন্তান রক্ষা করিয়া কথ-
ক্লেৎ ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণমানসে ফল মূল আহরণে চেষ্টিত হইলেন। ইত্যবসরে এক কাল সর্প আসিয়া বালকের শিরে ফণা বিস্তরণ পূর্বক ছত্রবৎ আচ্ছাদন করি-
য়াছে। রাজমহিষী হঠাৎ আসিয়া এই ভীষণ অবস্থা দর্শনে ভীতিসংবলিত চিৎ-
কার ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। এই ব্যাপার এক ব্রাহ্মণেরও নয়নপথে পতিত হইয়া-
ছিল। তিনি ইহাকে কোনমতে দুলক্ষণ মনে করিলেন না। তিনি ভয়ান্তী শিশু-
জননীকে সম্বোধন করিয়া করিলেন “ক-
ল্যাণি! এই ব্যাপারকে দুর্নিমিত্ত মনে ক-
রিয়া ভীত হইও না। এ সুলক্ষণ সকলের
ভাগ্যে ঘটয়া উঠে না। ইহাকে সম্পূর্ণ
সুলক্ষণ মনে করিয়া পুলকিত হওয়া উ-
চিত। এই লক্ষণ দর্শনে প্রতীতি হই-
তেছে যে, ভবিষ্যতে এই বালক রাজা ও
তুমি রাজমাতা হইবে। *” মহিষী ক-

* যাহার মস্তকে সর্পে ছত্রধারণ করে
সে রাজা হয়, অনেকেই এরূপ একটি
সংস্কার বদ্ধমূল আছে। এই শুভলক্ষণের
কিছুই মূল পাওয়া যায় না। অনুমান
হয় যখন বসুদেব কৃষ্ণকে নন্দালয়ে রা-
খিতে যাইতেছিলেন সেই সময় যে পা-
তাল হইতে অনন্ত দেব আসিয়া তাঁহার
মস্তকে ফণা বিস্তরণ পূর্বক ছত্রধারণ করি-

ছিলেন “ উপস্থিত বিপদে আমি যার পর
নাই ব্যাকুল হইয়াছি, ক্ষুধা তৃষ্ণায় মুমূর্ষু
প্রায় হইয়াছি, ভবিষ্যতের ভাবনায় আ-
মার কি হইবে। আপাততঃ প্রাণ রক্ষার
কোন উপায় দেখিতেছি না” দয়াজ-
চিত্ত ব্রাহ্মণ, মহিষীর এবিধ কাতর বচন
শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে খো-
গং নগরের পথ দেখাইয়া দিলেন। রাজ-
মহিলা পুত্রসহ খোগং নগরে উপনীত
হইয়া পথিমধ্যে তত্রতা রাজমহিষীর পরি-
চারিকার সাহায্যে পাইয়া তৎসঙ্গে রাজ-
বাটীতে উপনীত হইলেন এবং আপনার
অত্যন্ত হীনাবস্থা জ্ঞাত করিয়া তথায় দাসী
রাছিলেন, সেই অবধি এই লক্ষণের স্মৃতি
হইয়া থাকিবে। বনবিষ্ণুপুরের রাজাদের
সম্বন্ধেও ঐরূপ একটি গল্প শুনিতে পা-
ওয়া যায়। এ প্রদেশের অনেক শ্রীমন্ত
লোক সম্বন্ধেও ঐ রূপ গল্প প্রচলিত
আছে। নাটোরের রাজা ও নড়াইলের
রতন বাবুদের সম্বন্ধেও অনেক অসম্ভব
কথা শুনা গিয়াছে। মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য
ও নিতান্ত অবিশ্বসনীর ব্যাপারযদি প-
রিণাম শুভ ঘটনা সন্দর্শনে এরূপ গল্পের
স্মৃতি হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। ন-
ক্ষত্রপাত দর্শনে অশুভ, ভেকে সর্পগ্রাস
করিতেছে তদর্শনে শুভ প্রভৃতি ব্যাপার
সমূহে যে শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়,
সর্পের ছত্র ধারণে রাজসিংহাসন লাভ
সেই শাস্ত্রেরই পত্রান্তরে অঙ্কিত বলিয়া
বিবেচিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে।

দ্রুতি অবলম্বনে দিন ব্যাপন করিতে লাগিলেন । এই সময়ে রঞ্জুসি নামক অসভ্য মীনা জাতীয় এক রাজা খোগংএর রাজসিংহাসনের শোভা সম্পাদন করিতেছিলেন । সেই অসভ্য মীনারাজার গৃহে সূর্য্যবংশীয় রাজপুত্র প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন ।

একদা মীনারাজের পাঁচক অনুপস্থিত থাকায় ঐ রাজপুত্রমহিলা পাঁচক কর্মে নিযুক্ত হন এবং মীনারাজ সেই সূপক স্রব্যাদি আহাৰ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া পাঁচিকাকে নিজ সমীপে আস্থান করত তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন । রাজমহিষী মীনারাজ সমীপে কিছুই গোপন করিলেন না । তিনি তাঁহার দুঃস্বপ্নের সকল কথাই প্রকাশ করিয়া কহিলেন । মীনারাজ সেই পরিচয়ে সান্তিশয় সন্মুক্ত হইয়া তাঁহাকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এবং তদবধি নরবার রাজমহিষীও তৎপুত্রকে ভগিনী ও ভাগিনেররূপে সম্বন্ধে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । এই বালকের নাম চোল রায় । বালক বয়োযুক্রিসহকারে নিজ সভাবহার দ্বারা মীনারাজ ও অপরাপর পৌরজনের তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিলেন ।

এই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে তুয়ারবংশীয় সূপতিবিশেষ উপবিষ্ট ছিলেন । ভারতবর্ষীয় অন্যান্য রাজবর্গ ঐ তুয়ারবংশীয় দিল্লীধরকে রাজ্যধিরাজ বলিয়া

পূজা করিতেন, এবং তাঁহার তুষ্টির জন্য অনেকে কর প্রদানও করিতেন । মীনারাজও যথাযোগ্য কর প্রদানপূর্ব্বক সূখে রাজ্য ভোগ করিতেন । একদা মীনারাজ স্বয়ং দিল্লী গমনে অসমর্থ হওয়ায় রাজকর প্রদানের জন্য প্রিয়তম চোল রায়কে প্রেরণ করিলেন ।

মীনারাজ কি অন্ততর্কণেই কচুবহুবক চোল রায়কে দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন । নিমেষের জন্যও তাঁহার মনে এরূপ ভাবের উদয় হয় নাই যে, কিছু দিন পরে ঐ সুবককর্তৃক তাঁহার সর্শনাশ সাধিত হইবে । তিনি দুঃস্থ দিরা কাল সর্প পোষণ করিয়াছিলেন ! তিনি অমৃতত্রে কালকূট পান করিয়াছিলেন !

কচুবহুবক একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর কাল দিল্লীনগরে মীনারাজের প্রতি নিধিস্বরূপ বাস করেন । এই সময়ে তিনি খোগংএর সিংহাসনের প্রতি লোলুপ হন । মীনারাজ যে তাঁহাকে অপভ্রান্তিক্রমে প্রতিপালন করিতেছেন তাহা একবারে বিস্মৃত হইয়া, তিনি তাঁহার দুঃবতিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কতকগুলি স্বজাতীয় উদ্ধতস্বভাব সহচর সংগ্রহ করেন । এই পররাজ্যাপহারক দস্যু চোল রায় সেই সকল অনুচর সমভিব্যাহারে খোগং নগরে আসিয়া উপস্থিত হন । চোল রায়ের দলবল দেখিয়াও মীনারাজের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই । সংকল্পের সহচর সহচর মিলিয়া উঠে

না, কিন্তু দুর্কর্মে প্রবর্তিত করিতে লোকের অভাব নাই। মীনরাজের কুলাচার্য্য অসিয়া অরুতজ্জ চোল রায়ের মন্ত্রী হইল। তাহারই—সেই মহাপাষণ্ডেরই—মন্ত্রণায় দিবালীর দিন সেই দুর্ভিতসন্ধি সিদ্ধ করিবার সংকল্প স্থির হইল। প্রাচীন প্রথা-মুসারে রলুনসিরাজ দিবালীপর্ব্বোপলক্ষে স্বাগণসমভিবাচারে এক সরোবরে জল-ক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি জন্মেও জানিতে পারেন নাই যে তাঁহার জন্মের মত কলক্রীড়া শেষ হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এদিকে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া অরুতজ্জ কচুবহুবক স্বাগণ-সমভিবাচারে ঐ সরোবরে সমুপস্থিত হইলেন এবং হঠাৎ আক্রমণ পূর্ব্বক মীনরাজকে সবংশে নিৰ্ব্বংশ করিয়া খোগং নগর অধিকার করিলেন। বিশ্বাসঘাতক কুলাচার্য্যও তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। “যে ব্যক্তি একজন উপকারকের প্রতি অবি-খ্যাসী হইতে পারে, সে অপরের নিকট কোন অংশেই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।” এই কথা বলিয়া চোল রাজ স্বহস্তে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। আমরা বলি কুলাচার্য্য মহাশয়ের উপযুক্ত পুরস্কার হইয়াছিল। তিনি যেমন নড়াদম, তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে পরিণামে বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। সহস্র সংকর্ষেও এ কলক্রীড়া অপনীত হইবার নহে। চোলরাজ এবস্ত্রকারে কলঙ্ক-ডালি শিরে ধারণ করিয়া চুণ্ডার রাজ্যের স্বত্রপাত করিলেন।

চুণ্ডারের অধিকাংশ স্বয়ং প্রধান মীনাজ্য-তীর অধ্যাকের অধীন ছিল, খোগং পতনে সমগ্র রাজ্যের মূলভিত্তি কম্পিত হইয়া উঠিল।

বর্তমান জয়পুর নগরের প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে বানগঙ্গা নদীতটে দেওসা নগরে একজন ব্রহ্মর বংশীয় রাজপুত্র রাজা রাজ্য করিতেন। তাঁহার একমাত্র দুহিতা ছিল, চোলরাজ তাঁহার পাণিগ্রহণ প্রার্থনায় তৎসম উপস্থিত হইলেন। দেওসারাজ এই বলিয়া চোল রায়ের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন, ‘আমরা উভয়েই সূর্য্যবংশীয়, এবং অকাম্পি এক শত পুরুষ অতিক্রান্ত হয় নাই। অতএব এবিবাহ শাস্ত্রনিবদ্ধ। আমি এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কৰ্ম্ম অনুমোদন করিতে পারি না।’ * পরিশেষে বিচার দ্বারা শাস্ত্র বি-

* ব্রহ্মর বংশীয়েরা রামচন্দ্রের জেষ্ঠ্যপুত্রলবের বংশ বলিয়া পরিচয় দেয়। ব্রহ্মর কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে রাম হইতে বিক্রম পর্য্যন্ত ছাপ্পান পুরুষ এবং নল হইতে চোল রাজ পর্য্যন্ত তেত্রিশ পুরুষ বলিয়া লিখিত আছে। পূর্ব্ব লিখিত হইয়াছে, ৩৫১ সংবৎ অর্থাৎ বিক্রমের ৩৫১ বৎসর পরে নলরাজ নিষদ নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এক্ষণে দেখা উচিত যে বিক্রম হইতে নল পর্য্যন্ত কয় পুরুষ হইতে পারে। যদি প্রত্যেক রাজার রাজত্ব কালের গড়পড়তা বাইশ বৎসর ধরা যায় (এই রূপই প্রায় সমস্ত রাজ্যে ধরা হইয়া থাকে)

রোধিতার অপনয়ন হইলে দেওসাধিপতি চোল রায়ের সহিত আপনার রূপলাবণ্য-বতী কন্যার বিবাহ দিলেন, এবং পুত্র সন্তানের অভাবপ্রযুক্ত জামাতাকে রাজ্য পর্যন্ত সমর্পণ করিলেন। এক্ষণে চোল রায় খোংগে ও দেওসা উভয় সিংহাসনের অধিকারী হইলেন। সুতরাং তাঁহার দল-বলও অত্যন্ত প্রবল হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যলাভ লাগিল। এই সময়ে মীনাজাতীর মেরো সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ নাথুরাও মৌচ নগরে রাজপাট স্থাপন করিয়া স্থখে রাজ্য করিতেন। তৎপ্রতি চোল রায়ের লোভ পড়িল। দলবলসহ মৌচ নগর আক্রমণ করিয়া জয়ী হইলেন, এবং খোংগে অপেক্ষা মৌচ নগরের সমদিক শোভা দর্শনে তথায় রাজপাট সংস্থাপন করিলেন, এবং পূর্ব-পুরুষ পুরুষ-প্রধান রামচন্দ্রের নামে ঐ নগরের নাম রামগড় রাখিলেন। এক্ষণে চোল রায় চুণ্ডার রাজ্যের মধ্যে খোংগে, দেওসা ও মৌচপ্রদেশের অধিকারী হইলেন।

ইহার পর চোলরায় আজমীরাদি-পতির রূপলাবণ্যবতী দুহিতা মরোণীর পা-নিগ্রহণ করিলেন। তাঁহার পূর্ব পত্নী তাহা হইলে ষোড়শ পুরুষ মাত্র ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ৫৬+১৬+৩৩=১০৫ পুরুষ হইল। রাম হইতে চোল রায় পর্যন্ত একশত পাঁচ পুরুষ ব্রহ্মজর বংশে বিবাহ শাস্ত্র বিকল্প হইতে পারে না।

এ সময়ে জীবিতা ছিলেন কিনা তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। আমরা তাঁহার গর্ভস্থ কোন সন্তানের ও পরিচয় পাই নাই। একদা চোল রায় মরোণী মহিলাসহ জম্বাহী-মাতা দেবীর পূজাবন্দ-নাদি করিতে গমন করিয়া ছিলেন। মীনা-জাতিদিগের তাঁহার উপর জাতক্রোধ ছিল তাহারা উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া একাদশ সহস্র সৈন্য সমবেত করিয়াছিল। তাহারা সকলে প্রত্যাগমন কালে চোল রায়কে আক্রমণ করিল। তাঁহার সহিত অধিক সৈন্যসামন্ত ছিলনা, তথাপি পলায়নপরায়ুথ হইয়া রাজপুত্রবীর্ষা শত্রু-দলে সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। শত্রুশোণিতে সমরাজন প্ৰা-পিত করিয়া অবশেষে তাহাদের হস্তেই জীবনলীলা সমাপন করিলেন। মরোণী স্বামীশোকে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া অবশিষ্ট সন্তরগণ সমভিব্যাহারে স্বদেশে পলায়ন করিলেন। তৎকালে তিনি অ-সুস্থ হইলেন। কনকল নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া চুণ্ডারদেশের অনেক অংশ মীনাদিগের হস্ত হইতে অপহরণ করেন। তাঁহার পুত্র মৈদল রাও পিতৃদুস্তান্ত্রায়ুসারে চুণ্ডারের অনেক অংশ হস্তান্তর করেন। মীনাজা-তীর প্রধান সম্প্রদায়ের নাম সুসাবত। ঐ সুসাবতসম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ ভট্টরাও অধরে বাস করিতেন, তিনিই মীনাজাতীর সর্বময় কর্তা ছিলেন। মৈদলরাও তাঁ-

হাকে পরাজিত করিয়া অধর অধিকার করেন এবং মীনা জাতীয় নন্দল সম্প্রদায়কে পরাভূত করিয়া গাটুরঘাটা প্রদেশ নিজ অধিকারে সংযোজিত করিলেন।

মৈদনরাও পরলোক গমন করিলে পর তদীয়পুত্র জনদেব সিংহাসনে আরোহন করিলেন। তিনিও পিতৃপুত্রদিগের দৃষ্টান্তানুসারে অনেক মীনাসম্প্রদায়ের সর্বনাশ করিলেন। তদীয় পুত্র কুন্তলদেব রাজধানীর চতুর্পার্শ্ববর্তী পার্শ্বত্যা প্রদেশ স্বাধিকার ভুক্ত করিয়া ছিলেন। তিনি ভট্টবর প্রদেশের চোহান বংশীর নরপ-

তির কন্যার পাণিগ্রহণাভিলাষে তথায় গমন করিতে উদাত হইলে তাহার মীনা প্রজারা একবাক্যে কহিল যে অধিকারের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইলে নহ-বৎ প্রভৃতি রাজচিহ্ন তাহাদের হস্তে নাশ করিতে হইবে। কুন্তলদেব এতবাক্যে অস্বীকৃত হইলে একটি সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে মীনা জাতীর সমগ্র ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া গেল। এই সময় হইতে সমগ্র চুণ্ডার রাজ্য মধ্যে চোলরায়ের বংশীয়দিগের আর দ্বিতীয় প্রতিবন্দী রহিল না। (ক্রমশঃ।)

অমৃত গরল

জগতের নিয়ম অতি অদ্ভূত। যাহা যত আবশ্যকীয় সংসাবে তাহার তত অনাচার, আর যাহা যত অপ্রয়োজনীয় তাহার মূল্য ও আদর তত অধিক। মৃত্তিকা তুণ লৌহ এবং হীরক, কাচ ও মূল্যবান প্রস্তর তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। আমরা মুহূর্ত্ত জনা মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিতে পারি না, ভূমি আমাদের আশ্রয়, অবলম্বন ও চিরসঙ্গী। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া মানব গণ আঞ্জীবন ভূমিতেই বিচরণ করে, গৃহ নির্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া আহার্য বস্তুর উৎপাদনাদি জীবন ধারমোপযোগী সমস্তই মৃত্তিকার সম্পন্ন হয়, অথচ মৃত্তিকার কত অনাদর। স্থগনীয়

বস্তু সকলের উপায়ের 'মাটি বা কাদা' অনাদৃত পদার্থ 'লৌহ'। প্রকৃতি প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্তিকাকে পদ মর্দিত ও অনাদৃত হইবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। লৌহ আর একটি উপকারী বস্তু। যে গৃহে বসিয়া আছি তাহা প্রস্তুত করিতে, যে অঙ্গে শরীর রক্ষা করিতেছি তাহা ভূমি হইতে উৎপাদন করিতে, যাহাতে আশ্রয় রক্ষা হয় এমন অস্ত্র গঠনে, এমন কি যে লেখনীটি হস্তে লইয়া লিখিতেছি, যে বাক্যটির উপর কাগজ রাখিয়াছি, যে কাষ্ঠাসনে বসিয়া আছি এ সমস্ত বস্তু প্রয়োজনোপযোগী করিতে লৌহই প্রধান সাধন। অথচ লৌহের মূল্য অল্প, লৌহ

অপরিষ্কৃত ও অনাদৃত। কুরূপ পুরুষ 'লো-
হার কাঠিক!' কঠিন হৃদয় 'লৌহ হৃ-
দয়!' এইরূপ তৃণ ও আবাদের প্রত্যেক
মুক্তের অবলম্বন হইয়া ও অনাদৃত ও অব-
মানিত হইয়া আছে। তৃণ এত সামান্য
যে বাহা আমরা সামান্য বোধ করি তা-
তা হাই তৃণ। আবার অন্যদিকে হীরকা-
দির বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেখ।
হীরক দুপ্রাপ্য ও বহু মূল্য। বাহ্যিক
সৌন্দর্য্য ভিন্ন তাহার গুণ নাই, কাচ কাটা
ভিন্ন কার্য্য নাই; অথচ সম্রাটগণ পরম
যত্নে তাহা মস্তকে ধারণ করেন। কাচ
এবং মরকতাদি প্রস্তরের ও সেই অবস্থা।

অতি প্রয়োজনীয় বস্তুর অনাদর দে-
খিয়া চিন্তাশীল চিত্ত ব্যথিত হয়, এইমাত্র।
তা হাতে সমস্ত জগতের ক্লেণ হয় না।
কিন্তু অমৃত গরল উৎপাদন হইলে তা-
হাতে পৃথিবীর সকলেরই ক্ষোভ ও পরি-
তাপের কারণ হয়। কবিগণ প্রস্ফুটিত
গোলাপ পুষ্পের সৌন্দর্য্যে ও স্নগন্ধে
মোহিত হইয়া সরল হৃদয়া গুণবতী ললনার
হাসিত মুখত্রীর সহিত তুলনা করেন, আ-
বার হৃদয়ে ও রস্তুে কটক নিরীক্ষণ করিয়া
তাঁহার হৃদয় পরিচিন্তা হয়। সৌদামিনীর
ভুবনমোচিনী রূপরাশি মেঘ মধ্যে লীন
হইলে, পূর্ণচন্দ্র রাহুগ্রস্ত দেখিলে, অথবা
সবুজ শোভিত ক্ষেত্র সকল নৈদঘ তাপে
দগ্ধ ও হতজী হইয়া গেলে তাঁহার হৃদয়
নিভাস্ত ব্যথিত হয়। প্রান্তরের পূর্ণ স-
রোবর হইতে জল কমিয়া গেলে তিনি

মনে কষ্ট অনুভব করেন, শিশিরে বৃষ্টি-
সকল পারহীন হইলে তাঁহার মন ক্লিষ্ট
হয়। গাঢ় অন্ধকার রজনীর অথঙ্ক গভীর
গিরিগর্ভের গভীর ভাব যখন তাঁহার
হৃদয়কে উন্নত চিন্তায় নিমগ্ন করে, তখন তিনি
দূর নিকৃঞ্জের কোকিল কুঞ্জে কণপাত
করিতে অনিচ্ছুক হন, এবং প্রকৃতির স্ব-
তন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থায় নূতন নূতন সুখ ও
বিবিধ প্রকার ক্লেণ অনুভব করেন। তিনি
কবি, বাহু জগৎ ও অন্তর্জগৎ উভয়ই তাঁ-
হার ক্রীড়ার নিকেতন। তাঁহার চিন্তা
ও ভাব সকল সামান্য বুদ্ধির অগম্য।
কিন্তু কিষ্কিৎ বিবেচনা করিয়া দে-
খিলে, কাবোর সাহ'য্য না লইয়া কবির
প্রদর্শিত পাপ অনুসরণ না করিয়া, এই
গদাময় পৃথিবীর কার্যকলাপের প্রত্যেক
অধ্যায় পদ্যময় মহাকাব্য অপেক্ষা অনেক
শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ, অনেক আমোদজনক ও
দুঃখ জনক বিষয় ইত্যন্তঃ বিকিণ্ড রহি-
য়াছে একথা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে।
এই স্বখাগার সংসারামৃত কত গরল
আছে তাহার পরিমাণ করিয়া উঠা ক-
ঠিন। কিন্তু ভ্রান্ত মানব আত্মীবন সে
গরলই অমৃত বলিয়া সেবন করে।

দম্পত্য অপত্য লালসায় সর্বদা দৈখ-
রের উপাসনা করিতেছেন। দয়াময় প-
রমেশ্বর সদয় হইয়া একটি পুত্র সম্ভান
প্রদান করিলেন। বালকটি এক দুই তিন
দিন করিয়া বাড়িতে লাগিল। তাহার
শাস্ত্রোজ্জন রূপরাশি, স্বধাময়ী দৃষ্টি এবং

বিশ্ববিমোহন সহাসা বদন জনক জন-
নিকে প্রকুল করিতে লাগিল। প্রস্ফুটো-
মুখ পঙ্কজের মনোহারিণী শোভার ন্যায়
শোভমান বদনকমলে, স্বকোমল পলাস-
পুষ্পের পলাসবৎ রক্তিমাত্ত অধরে যখন
মৃদু মধুর আদ্য আদ্য ম', বা প্রভৃতি সুধা-
কণা প্রকাশ পাইতে লাগিল তখন তাহার
ভাগ্যবতী জননী ও সৌভাগ্যশালী জ-
নক যে কি অনির্বচনীয় সুখ সম্ভোগ ক-
রিতে লাগিলেন তাহা অভিনব কুমারলা-
ভকাসী ব্যক্তিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে
পারেন; আর ঈশ্বর য'হাদিগকে সেই
অপার্থিব রত্নে বঞ্চিত করিয়াছেন কম্পনার
অতুল্য-তুলীতে সেই চিত্র চিত্রিত করিয়া
তাঁহারা আরও অধিক বুঝিতে পারেন।
সেই পার্থিব স্বর্গ, সেই নন্দন কানন,
সেই জীবন-পারিজাত তাঁহাদের জীবনের
অমৃতসিদ্ধি,—অনন্ত, স্রোতময় এবং নিত্য।
কিন্তু হায়! সেই অমৃতসমুদ্র মণিত হইয়া
যে গরল উঠিতে পারে সংসারসার মান-
বগণের তাহা কি মনে হয়? নির্দয় কাল-
কীট তাঁহাদের হৃদয়নিহীত ঐ কুসুমটির
রস ছিন্ন করিলে তাঁহাদের যে কি অবস্থা
হইবে তাহা কি তাঁহারা স্বরণ করেন?
লোকে মক্ষিকার রূপা দোষ দেয়, মক্ষিকা
অমৃতভাণ্ডে অঙ্কের ন্যায় প্রবেশ করিয়া
লোভজন্য আত্মজীবন বিনাশ করে, মা-
নবগণ কি তাহা করে না? সংসার সেই
অমৃতভাণ্ড, ইহাতে যে প্রবেশ করিয়াছে
তাঁহারই জীবন মোহে পর্যাবসিত হইবে।

আবার দেখ, সেই তনয়টি বড় হইতে
লাগিল। জ্ঞান ও ধর্ম্যে তাহার আত্মা
উন্নত হইল। সুরুতজ্ঞ হৃদয়ে আপন জনক
জননীর সেবা করিতে লাগিল। তাঁহা-
দের হৃদয়ে কেমন সুখ! 'বালভাবিত'
ও 'পুত্রপণ্ডিত' উভয়ই অমৃত। কিন্তু
অমৃতের গরল আছে। চর্চা তাহার
হৃদয়ে হৃৎপ্ররতি ও হৃৎশাশর সঞ্চারণ হইল।
পিতৃভক্তি হৃদয়ে আর স্থান পায়না, রুত-
জ্ঞতা'র ভাব আর মনে হয় না। এই রূপে,
পাপাত্মা আরংক্রিয় যখন নিশীথ সময়ে
প্রজ্ঞাবৎসল শাস্ত্র স্বভাব ধার্মিক সত্রাট
আপন জনক রুদ্ধ মাজ্জেহানকে তাঁহার
অবশিষ্ট জীবনের জন্য কারাবদ্ধ করিয়া
ছিল তখন কি পিতৃহৃদয়ের অমৃতসমুদ্রে
গরল উদ্ভিত হয় নাই? যখন ভাস্করবুদ্ধি
উদ্ধতস্বভাব পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞা পা-
লন জন্য, দয়া, ধর্ম, রুতজ্ঞতা, ভক্তি, মমতা
বিনর্জন দিয়া আপন জননীর শিরে কুঠা-
রাঘাত করিয়াছিল; যখন পাপপরায়ণ
রোমসত্রাট অজ্ঞাতশ্বশ্রু অনাগতবুদ্ধি বা-
লক রাজ্যলালসায় আপন জননীর শির-
চ্ছেদ করিয়াছিল তখন কি অমৃতের গরল
প্রকাশ পায় নাই? যেমন প্রদীপের এক
পিঠ আলো, তেমনই জগতের একদিকে
অমৃত অন্য দিকে গরল। এই কষ্ট হইতে
অব্যাহতি পাওয়া অসাধ্য। বালক বা-
লিকাগণ পিতা মাতার স্নেহসাগরে ভাব-
মান হইয়া যে অপরিদ্রাঘ আনন্দ অমৃতভব
করে তাহাও সর্বদা অবিকৃত নয়। জগ-

ভের এই অঞ্চলীয় নিয়মের সভ্যতাপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ কতশত বালক বালিকা যে অসময়ে সংসারানলের অসহ্য তাপ ভাপিত হইয়াছে তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। বিমাতার বিপরীত মন্ত্রণায় উক্তিকাক্রম জনকের আজ্ঞাক্রমে মব যৌবনের প্রথম সময়, সূত্থের প্রত্যুষ-কাল, ত্রীয়াচন্দ্র অনুন্ন লক্ষণ ও তর্ক্যা জ্ঞানকীর সঙ্কিত মহারণো যাপন করিলেন। বে পিতা জানোপদেশ প্রদান পূর্বক তনয়ের হৃদয় কন্দর আলোকিত করিবেন, ধর্মবিষয় শিক্ষাদান করিয়া পার্থিব অমৃত পান করাইবেন তিনি কত সময়ে আপন সন্তানদিগকে হ্রাশামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এবং অসংবিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া তাহাদের সুখামৃতে গরল উৎপাদন করিয়াছেন। কুকক্ষেত্রের মহারুদ্ধে হুর্যো-ধনাদির পতন এবং হস্তীনার রাজবংশ বিনাশ এ সমস্তই ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রণার বিষয় ফল। সংসার এমনই আশ্চর্যান্বান যে ইহাতে জননী কর্তৃক পুত্রহত্যাও অনেক সময় প্রত্যক্ষ হয়।

বাল্যকাল অজ্ঞানাবস্থায় অতিবাহিত হয়। যদি বল “বালক সুখ হুখে কিছুই বুঝিতে পারে না, ক্ষুধাপাইলে ক্রন্দন করে, মতুবা অনেক হুত্থের সময় ও হাসিতে থাকে। সেই সর্কাপেক্ষা সুখী” তাহা হইলে যযুষো ও পশুতে প্রভেদ থাকে না। অন্তগমনোমুখ দিবাকরের ন্যায় হুত্থের জ্ঞান অপেক্ষাকৃত ছিন্ন, শান্ত

এবং সুন্দর হইলেও তাহা কণস্থায়ী বলিয়া এবং রত্নমাত মেঘমিশ্র কিরণ মালারনায় সেই অতিজ্ঞতা চিন্তামিশ্র বলিয়া সুখকর নহে। মানব জীবনে যদি সুত্থের সময় থাকে তবে সে যৌবনকাল। যৌবনই মানব জীবনের অমৃত। যখন জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল থাকে, মনোরুতি গুলি বিকাশ প্রাপ্ত হয়, মদ্যাহুর প্রকৃতির ন্যায় জীবনের চতুপ্পাশ্ব উজ্জ্বল বোধ হয় সেই সময়ই সর্কাপেক্ষা সুত্থের সময়। শরীর বলিষ্ঠ ও কার্যক্ষম, মন সতেজ ও প্রকুল, আশা অনন্ত, সকলই মনোহর, সুতরাং মানব জীবনে যৌবন সুত্থের কাল। যুবক যত্ন মনে করে তাহাই করিতে পারে, অসাধ্য সাধন করিতে পারে সুতরাং সে সুখীতাহার জীবন অমৃতময়।

কিন্তু যে কবি প্রমিথিয়সের ও ইপি-মিথিয়সের সহিত মানবজীবন নিরবচ্ছিন্ন হুঃখময় করিয়াছেন, যিনি আদমের ত্রী ইভের প্রলোভনে আদমের সহিত পৃথিবীহু সকলের জীবনের পাপ ও হুঃখ আনয়ন করিয়াছেন, তাহার জ্ঞানিতেন যৌবনামৃতেও গরল আছে। যেখানে যত সুখ সেখানে তত হুঃখ, যত হাসি তত কারা, অমৃত যত গরলও তত। যৌবনে সংপ্রকৃতি সতেজ হয় সত্য, কিন্তু কুপ্রকৃতি নি-জিত থাকে না। পাপপথ সহজ, সে-দিকের আকর্ষণও অধিক। এই জন্য-যৌ-বনে অধিকাংশ লোকের চিত্ত কলুষিত হয়। গ্রিসের রাজনীতিবিদ্যার পতিত

পেরিক্লিফ এল্‌সি‌বাইডেস নামক একটি রূপবান ও বুদ্ধিমান বালককে প্রতিপালন করেন। তাঁহাকে শিক্ষিত করিতে সঙ্ক্রে-
টিশের বিজ্ঞান, বুদ্ধি ও তাঁহার রাজনীতি শাস্ত্র উভয় মিলিত হইয়াছিল। এল্‌সি-
বাইডেসের ন্যায় বীর সম্বন্ধা, নৃত্যী, সুচতুর পুরুষ গ্রীসে আর ছিল না। তিনি যে-
খানে যাইতেন সেখানেই দেবোপম পূজালাভ করিতেন। তাহার সুখ সরো-
বর পূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। দেশশুদ্ধ সকলে একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে
লাগিল। কিন্তু সে সুখের সাগরে তরল-
বঁাদিল, সে চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইল, সে সুখ-
তরণী ডুবিয়া গেল। যে বুদ্ধি স্বপথে
ছিল তাহা কুপথে ধাবিত হইল; তিনি
আপন দেশের হিতব্রত পরিত্যাগ করিয়া
স্বজাতীয় সকলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করি-
লেন। পরিশেষে সেই গৌরবও পাপ-
ময় জীবন, কলঙ্কিত পূর্ণচন্দ্র কিঙ্কিয়ার
কুত্র পল্লিতে কদম্ববিদারিণী অবস্থায় পর্যাব-
সিত হইল। আগেল্লাবাসী টাইমন যে
ভাবে মনুষ্যাগণের বন্ধু হইয়াও পরিশেষে
তাঁহাদের শত্রু হইয়াছিলেন, তাহাও কা-
হারও অবদিত নাই। বাইরণের জীবন
আর একটি দৃষ্টান্ত। এইরূপে মামবজীব-
নের বসন্ত কালেও দুঃখশিশিরসম্পাত স-
ত্ত্বপন্ন। সেই পবিত্র অমৃতও গরল
উঠে।

বুদ্ধ পুত্র কন্যাাদি পরিধারবর্ণে বে-
কিত হইয়া গৃহস্থান্তরে যে কিছু সুখ ক-

প্পনা করা যায় সকলই সম্ভোগ করিলেন।
সম্মুখে যোগা পুত্র তাঁহার জীবনের অ-
জয়স্বরূপ, তাঁহার সমস্ত আশার সজীব
প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ। কিন্তু সহসা সেই সু-
খের আকাশে কাল মেঘ উঠিয়া চতু-
র্দিক আচ্ছন্ন করিয়া, মৃত্যু ভীষণবেশে
শয্যাপার্শ্বে দণ্ডারমান হইয়া দণ্ডাচালনা
করিতে লাগিল। পূর্বে স্মৃতি অজান্ত
দর্পণের ন্যায় জীবনের অনুষ্ঠিত পাপকার্য্য
গুলি একটি একটি করিয়া নরনের সম্মুখে
উপস্থিত করিতে লাগিল। ওঃ! কি শো-
চনীয় অবস্থা! জীবনের সহায়, চিরবিধ্বাসী
স্মৃতিশক্তি করি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা,
কি ভয়ঙ্কর কার্য্য। যে জীবন এককাল
শীরদীর রজনীর ন্যায় শরৎসখীর কো-
মুদে সম্ভোগ করিতেছিল, নিদাঘের পবন-
মাধুর্য্যে, বসন্তের কুমুমব্রষমায় প্রীত হ-
ইতোছিল তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন উপ-
স্থিত হইল। তাহার জীবনামৃত গরলময়
হইল। ‘উল্‌সি’ ‘ক্রমোয়েল’ ‘প্লুতরাই’
প্রভৃতির পরিণাম এইরূপই হইয়াছিল।

সমুদ্র মধ্যদিয়া অর্গবারোহণে গমন
সময়ে অনুকূল বায়ুতে যেরূপ সহায়তা
করে এই সংসার সমুদ্রে প্রণয়িণী সহধর্ম্মি-
ণীর পক্ষে অনুকূল স্থিরএসাদ স্বামী ও
উজ্জ্বল। প্রাণেশ্বর সরল ও সদয় হইলে
ত্রীর যে কত সুখ তাহা প্রতিকূল স্বামীর
সতী স্ত্রী ভিন্ন অন্যের বুদ্ধিগত হইবার
নয়। বাহার মর্ম্মস্থলে তদভাবজনিত ক্রেশ
অনুভূত হইয়াছে সে ভিন্ন অন্যে কেমন

করিয়া বুঝিবে ? যে চিরকাল অনুকূল স্বামীর স্নেহ-সুখ অনুভব করে, স্বামী প্রতিকূল হইলে যে তাহার কত ক্লেশ হইত সে তাহা বুঝিতে পারে না। সুখীর সুখ বুঝিতে দুঃখীর কম্পনাই উপযুক্ত মধ্যস্থ।

যে পুণাশীল মহাত্মা সুলক্ষ্মী সতী সহধর্মিণীর সারলাশোভিত হৃদয়রাজ্যের অধ্বিতীয় অদীশ্বর, যিনি প্রিয়বাদিনী ও প্রিয়কারিণী প্রণয়িনীর শরীরের ও মনের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত থাকেন, যাঁহার সুখ বিশুদ্ধ ও হৃদয় পবিত্র, তাঁহার কি দেব-জনকমনীয় অবস্থা। প্রসন্নমলিলা জাহ্নবীর অবিরামবাহিনী ধারাসকল তমাল-তালীবিরাজিত লবঙ্গলতাপরিবেষ্টিত নি-
 ক্ষুত্ন নিকুঞ্জ প্রকুল করিয়া যেমন তরতর নাদে প্রবাহিত হয়, সেই মলনার প্রণয়ধারা প্রবলকান্তের শাস্তি নিকেতন হৃদয় তেমনই স্নিগ্ধ ও উৎকল করিয়া অবিরামধারায় বহিতে থাকে। প্রকৃত দাম্পত্যপ্রণয় অপা-
 র্থিব মহাভঙ্গ। সেইরূপ রাজার গৃহেও দু-
 লভ, অগচ তাহাতে সময়ে সময়ে অতি সূ-
 যান্না পর্ণকুটীরও আলোকিত হয়। জায়া
 পতি উভয়ে উভয়ের সর্ব্বস্ব, উভয়ে উভ-
 যের শিরোরত্ন। “তত্তস্য কিমপিভ্রব্যং
 যোহহি যস্য প্রিয়োজনঃ।” যখন ন-
 বীন প্রণয়ের প্রমত্ত করমাদুর্গা নবপরি-
 গীত দম্পতীকে পৃথিবীতে স্বর্গসুখ প্রদান
 করে, যখন স্বাভিনবকত্রের বারিবিন্দুবৎ
 সামান্য কথা গুলিও পরস্পরের নিকট
 প্রত্যেক শব্দ মূল্যবান করিয়া তুলে, তখন

কি অনির্ব্বচনীয় সুখ ! প্রিয়তমার শরীর
 স্পর্শে প্রেমবিহ্বল রামচন্দ্র যেমন বলি-
 য়াছিলেন—

“বিনিশ্চেতুং শাকোন সুখমিতিবা দুঃখমি-
 তিবা
 প্রবোধং নিদ্রাবা কিমু বিষবিসর্পং কিমু-
 মদং ।

তবস্পর্শে স্পর্শে মমহি পারিমূঢ়েশ্চিন্ন-
 গণো
 দিকারশ্চৈতন্যং ভ্রমন্তি সমুদ্রীলয়তি চ ।”
 পবিত্র প্রণয়ী অর্দ্ধনির্মীলিত নয়নে সেই
 রূপ ভাব সর্ব্বস্বই অনুভব করেন ।

“অদৈতং সুখদুঃখয়োঃনুগুণং সর্ব্বাশ-
 বস্থাসু য
 বিশ্বামো হৃদয়সা যত্র জরসা যস্মিন্নতা-
 য়োরসঃ

কালেনাবরণহরা পরিণতে যৎস্নেহসারে-
 স্থিতং
 ভদ্রং প্রেম সুরমানুষসা কথমপোকং তি-
 তৎপ্রাপাতে ।”

এই দেবদুল্লভ প্রণয় কি অনির্ব্বচনীয় প-
 দার্থ ! প্রণয়ীস্বাগলের শরীর ভিন্ন হইয়া
 ও মনের মিলনে দুইকে কেমন এক করিয়া
 ফেলে ! পরস্পরের অস্তিত্ব কেমন পর-
 স্পরে লীন ! যেমন তারসংযুক্ত বাগা
 যন্ত্রের একটি তার করস্পৃষ্ট হইলে সমী-
 পস্থ অপরাটিও ধ্বনিত হইয়া উঠে, শোক,
 দুঃখ, সুখ, সন্তোষ, হর্ষ, বিবাদ, আমোদ,
 প্রমোদ প্রভৃতি সেইরূপ উভয়ের হৃদয়
 এক ভাবে যুগপৎ ব্যাণ্ড করে । বিদ্রা-

তের গতি, চক্ষুর নিমেষ, কম্পনার রথ কিছুই তত দ্রুত নয়। এরূপ সুখের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কাহার স্বর্গ লাভের বাসনা হয়? পার্শ্ববসুখের চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া কে আর অন্য বিষয় মনে করে? যখন প্রণয়ের গভীর নদী প্রশান্তভাবে প্রবাহিত হয়, তখন সৈকতস্থ চিত্তাকণা সকল কেন না বিধৌত ও বিদূরিত হইবে? সেই আতটপূর্ণা কল্মোলিনীর সৌম্যমুষ্টি নিরীক্ষণ করিয়া কে তাহার তটভিষ্কাতিনী মনে করে?

কিন্তু মনুষ্যের হুর্ভাগ্যক্রমে সে নদীতেও তরঙ্গ আছে, সে আকাশেও বজ্র আছে, সে অমৃতের গরল আছে।

মহারাজ রামচন্দ্র পার্শ্ব সমস্ত সুখের অধিকারী হইয়াও আপন প্রাণাদিকা প্রিয়তমা পত্নীর বিরহযন্ত্রণায় কত দম্ববিদম্ব হইয়াছিলেন, রোমাঞ্চরাজ টাইটস্ও লোকরঞ্জনারুরোধে প্রিয়া ইচ্ছদিতনয়াকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া অপরিসীম কষ্ট পাইয়াছিলেন।

প্রণয়ের রম্যকাননের পবিত্রপুষ্প স্নান হইলেও অনিত্য; সুগন্ধি হইলেও কণ্টকযুক্ত, মধুময় হইলেও বিষমিশ্র। সন্দেহ ও ঈর্ষার বায়ুতে অনবরতঃ আন্দোলিত এবং বিরহাদি নির্ধম কীট সকলের ভীষণ দংশনে জর্জরিত হইয়া সেই কুসুমগুলি অকালে শুক হইয়া যায়। আবিলার্ডের জন্ম সমস্ত সুখ উৎসর্গ করিয়া ইলাইজার কি অবস্থা হইয়াছিল। অথেলোর হৃদয়শশী ডেসি-

ডিমোনা কিরূপে অন্তর্মিত হইয়াছিল, এবং রোমিও ও জুলিয়েট কিরূপে অবস্থার জীবনের অবসাম করেন পাঠক মনে করিয়া দেখুন। অমৃতের প্রতিবিন্দুই গরলমিশ্র।

মৈসরললনা ক্লিয়োপেট্রার পরিলজীবনসরোবরের অচিরস্থায়ী মুখকমল শীতলী পর্যাসিত হইয়াছিল; রাজ্ঞী মেরীও আপাতমধুর পরিণামবিষে জীবন উৎসর্গ করিয়া পৃথিবীর নিকট অকালে বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একদিকে পবিত্র আদর্শ পতিব্রতা পদ্মিনী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন, অন্যদিকে সেরখা আফগানের স্নন্দরী ললনা স্বামীবধের কারণ হইয়া বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিলেন। কিন্তু যে যেরূপ ভাবেই অমৃতপান করুন না কেন পরিণামবিষ সকলের ভাগেই ঘটিল।

দৃষ্টান্তবাহুল্যে প্রয়োজন নাই। যে সকল শোচনীয় অবস্থা প্রতিদিন আমাদের নয়নগোচর হইতেছে, তাহাতে অমৃতের গরল কে না দেখিতে পান? বালবিধবার বারিশূন্য মঞ্চময়জীবনে মুখবারির অভাবে হৃদয়ভেদী ত্রাহি ত্রাহি শব্দে কাহার না চিত্ত ব্যথিত হয়। সেই অজুলা বেলপুষ্প নিদাঘরবির প্রচণ্ডকিরণে শুক দেখিয়া কে না ক্রেশ অমৃতভব করে। জীবনের সুখপ্রতিমা বিসর্জন দিয়া যে সমস্ত হতভাগা যুবক উন্মত্তবৎ দেশে দেশে বিচরণ করে, তাহাদের মুখময় অতীতজীবনের তুলনায় সেই ভরাবহ সময় কি গরলময় নয়?

কালের কঠোরশাসনে জীবনবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেলে প্রণয়ীযুগলমধ্যে যে জীবিত থাকে তাহার অবস্থা যত কষ্টকর, উভয়ে জীবিত থাকার সময় একে অন্যকর্তৃক পরিত্যক্ত ও অনাদৃত হইলে তাহা হইতেও অধিক কষ্ট। সে যন্ত্রণা অসহ্য,—ভীষণ মরুকাঞ্চি। শিখণ্ডক নানক আপন প্রণয়িণীকে পরিভাগ্য কহিয়াছিলেন, তাহাতে সেই হতভাগিনীর হৃদয়ে যত না কষ্ট হইয়াছিল, এটনিকর্তৃক পরিত্যক্ত অস্ত্রৈতিরার কষ্ট তদপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। ছেলেনের জগদ্বিখ্যাত রূপমাদুহীতে মেনিলসের জীবন যে পরিমাণে মধুময় হইয়াছিল, পেরিসের আচরণে তাহার সহিত তুলনার শতগুণাধিক ক্লেশ হইয়াছিল সম্ভেদ নাই। জীবনের সমস্ত সুখ উৎসর্গ করিয়া বাহাকে আপন বলিয়া উপাসনা করা যায়, যে অভীষ্ট দেবতার অমুগ্রাহের করে আত্মসমর্পণ করিয়াও তৃপ্তি জন্মেনা এবং বাহ্যিক প্রসাদ লাভ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়, সে অকারণে অমাদর কপিয়া অন্যের হইলে, উঃ কি ভয়ানক পরিভাপের বিষয় হয়!

“হার! সরযের কথা আমার স্মেহের লতা পতিভাবে অন্যভাবে প্রাণনাথ বলিল মরমের বাধা মম মরমেই রছিল।”

সংসারের এই অমৃতময় অংশের এক পার্শ্বে এইরূপ ভয়ানক গরল, অন্য পার্শ্বেও ছলাহল।

“সখি! কি কব মরম কথা।

প্রণয় ভাবিয়া পাষণ্ডাশিয়া
মরমে পাইনু বাধা।

ফুসুম কলিকা জিনিয়া বানিকা
ছিলাম যখন সেই

প্রণয় কেমন জানি নাই আমি
শৈশব আমোদ বই।

মধুকর ত্রমে বিকাশিনু দল
ভাসিয়া যৌবন জলে

নিদাকণ কীট পশিয়া মরমে
শুকাল বিকচ দলে।

সখি! যার প্রাণ যার দংশন জ্বালার
বাঁচিনে পরাণে আর
জীবন মৃগাল এই ছুরিকার
কাটিব করেছি সার।”

হুই পার্শ্বে বিষ, মধ্যস্থলে যে অমৃত তাহা নির্ঝিরে কে কতক্ষণ পান করিতে পায়? হতাশের আকোপ, বিরহীর বিলাপ, নিরাশ প্রার্থনের আর্তনাদ, বিধবার মর্ষঘাতি শোকবাক্য, অনাদৃত প্রণয়ীর পরিণাম, এ সমস্তই ইলাহল। কোমু সৌভাগ্যশীল পুরুষ অথবা সৌভাগ্যশালিনী রমণী এই সমস্ত যন্ত্রণার একটি ঘারাও পীড়িত না হইয়া সুখে জীবন যাপন করিতে পারেন? দূর হইতে এই রাজ্য শান্তি নিকেতন বোধ হয় সভ্য, কিন্তু সর্বা, ঘেব, অসঙ্কুচি, সন্দেহ, ভয়, বিশ্বাসঘাতকতা, কলহ প্রভৃতিতে এ রাজ্য এক উচ্চুৎখল, যে কণেকের জ্বালাই প্রণয়ীরো বিস্তার শান্তি মুখ সম্ভবে না। এ অমৃতে ছলাহল।

অমৃতের জ্বালা নিবারণ করিতে সৎ-
বন্ধুর আশ্রয় লইলাম। ঝটিকার সময়
নৌকা যেমন 'কোল' প্রাপ্তে নিরাপদ
হয়, প্রবল বাতাস আন্দোলিত সংসার
সাগরে বন্ধুব আশ্রয়ও তেমনই নিরাপদ
স্থান। যখন হৃদয় নামা কারণে উত্তাক্ত
ও উত্তপ্ত, তখন মুহুম্মদসদীরগবাহি পুষ্প
সৌরভের মধুরতার এবং মলয়ানিলের
শৈথিল্যে বন্ধুর বচনপরম্পরা হৃদয় স্নিগ্ধ
করিল। মাতা বাহা পারেম নাই, পিতা
বাহা করেন নাই, নিরুপম ভ্রাতৃস্নেহের
মধুময় ডাবেও বাহা সান্নিধ্য হয় নাই,
প্রণয়িনীর প্রণয়োপহারেও বাহা লাভ
করা যায় নাই, বন্ধুর সুরময় বচন মাধুর্যে
ভাষাই সম্পাদিত হইল। সে সুকোমল বাহু
যুগলের উচ্চভাবের সুরশীতল আলিঙ্গনে
শরীর শীতল হইয়া গেল। "দরিত্রাস্বন-
বন্ধিতং স্নেহে, নখলু প্রেমচসং স্নেহজ্ঞানে।"
হৃদয় সখার প্রেমালিঙ্গন জগতে অতুল্য
পদার্থ। স্নেহের তুলনা নাই। চক্ষু বা-
হাকে স্নেহের দেখে, বাহাকে প্রিয়ভাবী
জ্ঞানে কর্ণ সেই বচন সুরা সত্যুভাবের
পায় করে, হৃদয় বাহুর হৃদয়ের অনুপ-
মের মধুর চিত্র আশ্রয়ের সহিত ধারণ
করে, সে কতদূর রমণীয় পদার্থ। বন্ধুর
অশাস্ত্রও মধুময়।

"সুলভুষ্টি অনাদর, দেখায় না মনোহর
অনাদর যদিও কর্কশ

প্রেমমাখা অনাদর বড়ই মধুর।"

যে একপট প্রকৃত বন্ধু আশ্রয় তাৎ

কণেকের জন্মও হৃদয়ে ধারণ না করিয়া
সুহৃদকে অভিন্ন পরমাশ্রয় মনে করেন
এই পৃথিবীতে তাঁহার জন্ম হইলেও তিনি
স্বর্গবাসী। মর্ত্য লোকে ভাগ্যস্বীকার ক-
দাচিত্ত সম্ভবে। যে সৌভাগ্যশীল পুরুষ
সেই সুখ লাভ করেন, তিনিও দেব।

মনুষ্যের কপালদোষে সে মধুও বিধ-
মিত্র। বীরকুলাগ্রগণা জুঙ্গিরস সিজের
পবিত্র বক্ষঃস্থল তাঁহার আশ্রিত এবং তাঁ-
হার অনুগ্রহে প্রতিপালিত ক্রটস্ যখন
শানিত শস্ত্রে সিদীর্ণ করিয়াছিল; নিশীথ
সময়ে আপন গৃহে অতিথি ভাবে উপস্থিত
নিজিত স্বীর প্রভু উৎসাহকে যখন দুঃ-
চার ম্যাকবেথ্ অতি স্নেহসের নায় হত্যা
করিয়াছিল; যখন যুনানীর বীরকুঞ্জর কে-
শরী নিতান্ত নিকপার হইয়া আশ্রয় সমর্পণ
করিলে সেই কর্দ্মনিপতিত কেশরীকে
চিরদিনের জন্ম কোন দুঃচার স্বাধীন-
তার বঞ্চিত করিয়াছিল, তখন কি সে অ-
মৃতের গরল উঠে নাই? মির জাকরের
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করায় অদূরদর্শী সি-
রাজের পতন হইল; আরংজিবের প্রতি
সমর্থনা গল্লেখশূন্য সুতরাং অসতর্ক ধা-
কায় তাঁহার ভ্রাতৃগণ অকালে কাল স-
দনে গমন করিলেন।

ভ্রাতৃস্নেহ ও ভ্রাতৃবৎসলতা অমৃতের
সরোবর হইলেও তাহা হইতেও গরল
উৎপিত হয়। ঐরামচন্দ্র অমৃত লক্ষ্মণের
প্রতি অপরিমিত বাৎসল্য প্রদর্শন করিয়াও
যখন লঙ্কাসমরারবাসানে গৃহে গমন করিয়া-

ছিলেন, যখন সেই দক্ষিণ হস্ত সদৃশ, জীবনের অবলম্বন পরমোপকারী ভ্রাতার সাহায্য পূর্বের ন্যায় আর আবশ্যকীয় রহিল না তখন তাঁহাকে বর্জন করিয়া এই বিশুদ্ধ স্বধায়ও বিষ উৎপাদন করিয়াছিলেন।

মানবগণের অন্য একটি স্রুকের কারণ রাজার অনুগ্রহ ও রাজভক্তি। রাজার প্রতি প্রজার যত ভক্তি হইবে এবং প্রজার প্রতি রাজার যতই দয়া প্রকাশ হইতে থাকিবে ততই সেই সমৃদ্ধ স্রুকের হইবে। ধর্মময় যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাশাসনসময়ে প্রজাগণ অতিশয় স্রুখে সময় যাপন করিয়াছিল বলিয়া সেই পুত্র সময়ের কথা এখনও সকলের ক্ষুদ্রে অঙ্কিত আছে। আকবর ও মাজেহান বাদশাহের শাসন সময়ের উৎকৃষ্ট অংশের সহিত কোন ভূপতি না নিজের শাসনকাল বিনিময় করিতে বাসনা করেন? লর্ডক্যানিং মহোদয়ের সময়টি কেনা ভক্তির সহিত স্মরণ করে? আবার ঐ সমস্ত স্রুকের সময়ের সঙ্গে জঙ্গীস, তৈমুর, নাদীর, আমেদ প্রভৃতির এবং ভয়ানক বিপ্লব বিস্ত্রোহ অরাজকতা প্রভৃতির তুলনা করিয়া দেখ। শেষের অংশ গরল, প্রথমংশ অমৃত। যে সময়ে উন্নত উচ্চ স্থল ফরাসি জনসাধারণের মস্তিষ্ক শূন্য মস্তকের আলোড়নে এবং জাতি-বুদ্ধির পরিচালনায় সমস্ত ইরোপেপ কম্পিত হইল, সমস্ত পৃথিবী টল মল করিতে লাগিল; যখন ফরাসি সত্রাট

মোড়শ লুইর মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল, ফরাসির রাজসিংহাসন রেণু রেণু হইয়া উড়িয়া গেল তখন কি রাজা প্রজার মিলন স্রুধ রূপ অমৃতে গরল উঠে নাই? বিশ্বাস সেই অমৃতের জীবন। রাজা প্রজাকে বিশ্বাস না করিলে সেই অমৃত উভয়ের মধ্যে উৎপন্ন হইতে পারে না। অন্যদিকে প্রজা রাজাকে ভক্তি না করিলে সেই অমৃত কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। উভয়ের চেষ্টার উৎপাদিত স্রুধাকণা যেমন মধুর উভয়ের অশ্রুয়ে তৎসমুদয় আবার সেই পরিমাণে হলাহল।

এই রূপে দেখা যাইতে পারে যে, যাহা যত আদর ও আশ্রয়ের সামগ্ৰী তাহাতে তত অস্রুধ উৎপাদন করে। প্রথমে বলা হইয়াছে যে, আবশ্যকীয় বস্তুর জগতে অনাদর; এক্ষণে দেখা গেল যাহার আদর আছে তাহাতে সাময়িক স্রুধ হইলেও অস্রুধ উৎপাদন করে। মুখশ্রিয় স্বাদ্ৰবস্তুওদিন তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

শততন্ত্র শততন্ত্র দৃষ্টান্ত লইয়া প্রয়োজন কি? আঁধার থাকিলেই আলো আছে, দুঃখ থাকিলেই স্রুধ আছে, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। অদৃষ্টচক্রেয় নেমির আবর্তনে মানবতাগাও ভাল মন্দ দুই অবস্থারই উপনীত হয়। সংসারের এক পাশে পরমরমণীয় বিলাসগৃহে অথবা গভীর জামিনোচেনার পরিভ্রমণে সর্বত্র সর্বত্র ব্যক্তি যেমন আনন্দভ্রোতে ভাসিতেছে; জীবনের সমস্ত যন্ত্রণা, স-

মস্ত অসুখ বিস্মৃত হইয়া সেই অবিরামবাহি
 সুখস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া অনন্ত অতি-
 মুখে গমণ করিতেছে, অপর পার্শ্বে তেম-
 নই আবার ভীষণ ও ভীষণতর শ্বশান স-
 মুহু জগৎ আঁধার আঁধার আঁধার করিয়া
 মৃতের হৃদয়েও যেম ভীতি উৎপাদন করি-
 তেছে। একস্থানে নবপ্রসূত বালকের কল্যা-
 ণার্থ মাজল্যবাদ্য বাজিতেছে, নবদম্পতীর
 পরিণয় জন্য আমোদে, আমন্দমিশ্র কো-
 লাহলে দশদিক উল্লসিত ও ধ্বনিত করিয়া
 তুলিতেছে; আবার অন্যস্থানে পুঞ্জশো-
 কাতুরা জননীর হৃদয়বিদারক শোকসূচক
 ক্রন্দনধ্বনিতে অথবা নববৈধব্যবিদগ্ধবালি-
 কার হাছাকার শব্দে সংসার উদাস ক-
 রিয়া উঠাইতেছে। কোন স্থলে প্রণয়ের
 সুখময়মিলনপ্রতীকায় সুখের দিবাস্বপ্নে
 দিনযামিনীতে ইতর বিশেষ না করিয়া
 প্রণয়ীগণ সময় উদ্‌যাপন করিতেছে, অ-
 ন্যত্র নিরাশ প্রণয়ের হতাশ শব্দে অথবা
 অনাদৃত অবমানিত ও কলঙ্কিত প্রণয়ের
 পঙ্কিল পরিণামে কাহারও জীবন যুগায়
 অবসাদিত হইতেছে। একদিকে আশা
 যুগ্মমন্দ পাদক্ষেপে স্বর্গীয় বিদ্যাধরীর ন্যায়
 মধুর হাসি হাসিয়া ভালে ভালে হৃত্য
 করিতেছেন, পুলকবিষ্কারিত নয়নের মো-
 হিনী ভক্তিতে সকলের মন মোহন করি-
 তেছেন, অন্যদিকে কপোল দেশে হস্তা-
 পর্ণ করিয়া আকাশস্তম্ভনয়নে নিরাশার
 শীর্ণ বিশীর্ণ ধূসরিত কলেবর সকলের মনে
 ভীতি উৎপাদন করিতেছে। একদিকে

প্রকৃতির প্রিয়তম প্রদেশ সকল জাতি,
 জুতি, বকুল, মালতী, গোলাপ, পাকুজ
 প্রভৃতি মনোমদ কুসুম শব্যায় শ্রুশোভিত
 আছে, পুংস্কোকিলের মধুর কুঞ্জমে শাশা
 বুলবুলের মোহন ধ্বনিতে চতুর্দিক উৎকুল
 করিতেছে, অন্যদিকে সাহারার ভীষণ
 মক্ভূমিতে জল পিপাসায় ত্রাহি ত্রাহি
 শব্দে হত ভাগ্য পথিক আর্তনাদ করি-
 তেছে। নিদাঘের নির্খল দিবা ঝটিকায়
 বিজ্বী করিতেছে, শরতের সূর্য্যর কোমুদী
 কালমেঘে ঢাকিয়া কেনিতেছে। রজনী
 প্রভাত হইতেছে দিবাভাগ আবার তম-
 নীরঙ্গনীতে লীন হইতেছে। সংসারে চ-
 তুর্দিকে ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত অমৃত কণারও
 অভাব নাই, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে
 হলাহলও প্রচুর রহিয়াছে। ছায়া যেমন
 বস্তুর অনুগামী দুঃখও তেমনি সুখের অ-
 নুগামী। যে অর্কটীম ব্যক্তি এই প-
 রীক্ষা ভূমি সংসার ক্ষেত্রে অবিরত ভাবে
 বিশুদ্ধ সুখ সন্তোগের বাসনা করে তাহার
 চিত্ত কখনও সুখী হইতে পারে না। বাছা
 কখনও হইবার নয় এরূপ বিষয়ে আশা
 করিয়া জীবন শান্তিহীন করিলে পাশ
 ব্যতীত পুণা লাভ হয় না, ভূষণ বৃদ্ধি ব্য-
 তীত তাহার সমতা হয় না। যদি সুখ-
 পান করিতে বাসনা থাকে তবে সুদর্শন
 চক্র দেখিয়া ভীত হইওনা, তাহা হইলে

“সুখা সুরগণ ভোগ্য

অসুরের পরিভ্রম সার

বিকসিত ভায়রসে অলিগণ উড়ে বসে

ডেক ভাগ্যে কেবল টাঁকান।”
এই কবিতাটি সার্থক হইবে,—টাঁকান
করির জীবন ডেকবৎ অতিবাহিত
করিতে হইবে। যদি অমৃতপান করিতে

অভিলাষ থাকে তবে গরলপানে সঙ্গে
সঙ্গে প্রস্তুত হও। এই সংসারে সুধাপানী
ধৈর্যশীল মহাপুরুষ মাত্রই নীলকণ্ঠ।

শ্রী—

জীবনপ্রভাত ।

স্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

পৃথুংসের দুর্গ ।

“ চলেছে চাঙ্কিরা দেখ,

যোদ্ধা, যোদ্ধা এক এক

কাল পরাজয় করি দেবমুক্তি ধরিয়া ।

* * * *

জয়িবে পুরুষগণ,

বীর যোদ্ধা অগণন,

রাখিবে ভারত নাম কিতপুষ্ঠে আঁকিয়া।”

হে-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

১৬৬৬ খৃঃ অব্দের বসন্তকালে পঞ্চগত

অশ্বারোহী ও এক সহস্র পদাতিক মাত্র
লইয়া শিবজী দিল্লীর নিকটে উপস্থিত হ-
ইলেন। মগরের প্রায় ছয় কোশ দূরে
শিবির সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেনাগণ
বিশ্রাম করিতেছে শিবজী চিত্তিত মনে
এদিক ওদিক পরিভ্রমণ করিতেছেন। দিল্লী
আসিরা কি ভাল করিয়াছেন? মুঘলমা-
নেরা অধীনতা স্বীকার করা কি বীরোচিত
কার্য হইয়াছে? এখনও কি প্রত্যাযুক্তনের

উপায় নাই? এইরূপ সত্ত্ব [চিত্ত] শিব-
জীর মতং হৃদয় আলোড়িত করিতেছে।
বোদ্ধার মুখমণ্ডলও গভীর ললাট চিত্তা-
ধার অঁকত,—নিপদকালে, যুদ্ধকালেও
কেহ শিবজীর মুখমণ্ডল এরূপ চিত্তাকিত
দেখে নাই।

শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে কেবল তাঁহার
তেজস্বী উগ্রাশভাব নয় বৎসরের বালক
শম্ভুজী ভ্রমণ করিতেছেন, এক একবার
পিতার গভীর মুখমণ্ডলেরদিকে দৃষ্টিপাত
করিতেছেন, পিতার হৃদয়ের ভাব কতক
কতক বুঝিতে পারিতেছিলেন।

বহুনাথপুত্র নারায়ণী নামক শিব-
জীর পুরাতন মন্ত্রী কিছু পশ্চাতে পশ্চাতে
আসিতেছিলেন।

দুইজনে অমেককণ ভ্রমণ করিতেছি-
লেন। শিবজীর হৃদয় ভ্রমণ চিত্তার বা-
তিবাস্ত ও উৎকিণ্ড। অমেককণ পর তিনি
মন্ত্রীকে বিজ্ঞাসা করিলেন—

‘ ন্যায়শাস্ত্রী আপনি কখনও দিল্লীতে
আসিয়াছিলেন। ’

রঘুনাথ। ‘বাল্যকালে দিল্লীনগর দেখিয়াছিলাম।’

শিব। ‘তবে সম্মুখে ঐ বহু বিস্তীর্ণ প্রাচীরের মায় কি দেখা যাইতেছে বলিতে পারেন। আপনি অনন্যমনা হইয়া ঐদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন কি জন্য?’

রঘুনাথ। ‘মহারাজ! ভারতবর্ষের শেষ হিন্দু রাজ্য পৃথ্বীরের দুর্গ প্রাচীর দেখা যাইতেছে।’

শিবজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, ‘হার! এই সে পৃথ্বীরের দুর্গ! এই স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল! এই স্থানে তিনি একবার ঘোরীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। হা! নায়শাক্তী!

‘সেদিন ঐ প্রাচীরের প্রত্যেক স্তম্ভ হইতে বিজয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল ঐ মকতুমিন্দলে প্রশস্তনগর বিজয়বাদ্য শব্দিত হইয়াছিল, সমরবিজয়ী হিন্দুসেনার কোলাহলে গগনমার্গ বিদীর্ণ হইয়াছিল। সে দিন, হিমালয় হইতে কাবেরী পর্য্যন্ত হিন্দুীরগণ সবল হস্তে স্বাধীনতা রক্ষা করিত,—হিন্দুললনাগণ উল্লাসে স্বাধীনতা গান গাইত! কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় সেদিন গত হইয়াছে, ঐ পুরাতন দুর্গের নিকট পৃথ্বীরের অনায়াস সমরে হত হইলেন, পুণ্য ভারতস্থান অন্ধকারে আবৃত হইল! দিবসের আলোক গত হয়, পুনরায় দিবস আইসে, নীতকালে বিলুপ্ত পত্র কুসুম বনস্তে আবার দেখা যায়, ভারতের গৌরব দিন কি আর দেখা দিবে না? একদিন

ডবসা করিয়াছিলাম, সেই গৌরবের দিন আবার আসিবে, সে আশা কি কলবতী হইবে?’

শিবজী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন; তাঁহার কদম্ব চিত্তায় আলোড়িত হইতেছিল। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস তাগ করিয়া বলিলেন, ‘দেবদেব মহাদেব! যে দিন বননগণ জয়লাভ করিল, সে দিন তোমার হস্তে প্রচণ্ড ত্রিশূল নিশ্চেষ্ট বা নিস্ত্রিত ছিল? সংহারক! কেন ধর্মবিনাশিদীগকে সংহার করিলে না?’

রঘুনাথ। ‘কে বলিলে, কেন? যা-হারি হিন্দুরাজ্য বিনাশ করিলেন, তাঁহারি হিন্দু-দেবমণ্ডলীর ও অবমাননা করিতে ক্রটি করেন নাই;—সেই ভীষণপাতকের প্রমাণ অক্ষয় প্রস্তরে খোদিত আছে, সে পাপের প্রতিশোধ এখনও হয় নাই।’

কল্পিতস্বরে শিবজী জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘নায়শাক্তী! আপনার কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কোথায় সে প্রমাণ খোদিত আছে?’

রঘুনাথ, ‘সন্নিকটে’ এক বলিয়া অনতিদূরে একটি পুরাতন প্রস্তরনির্মিত দেবমন্দিরে শিবজীকে লইয়া গেলেন, বলিলেন, চারিদিক অবলোকন করুন।’

শিবজী। ‘দেখিতেছি মধ্য প্রাঙ্গণ, চারিদিকে স্মন্দর প্রস্তরস্তম্ভসার! একটি স্মন্দর দেবমন্দির ছিল,—কালে ভগ্ন হইয়াছে। দেবের অবমাননা-চিহ্ন কোথায় খোদিত আছে?’

রঘুনাথ। ‘তীক্ষ্ণদৃষ্টি ককন, এই সূ-
ন্দর স্তম্ভসারের একটি স্তম্ভ ভগ্ন হয় নাই,
—তাহার উপর অঙ্কিত দেবমূর্তিগুলিও
ভগ্ন হয় নাই, কিন্তু নিরীক্ষণ ককন,
একটা মূর্তির ও মুখমণ্ডল দৃষ্ট হইবে
না। কালে স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলিত,
ধর্ম-বিষেযী যবনেরা স্তম্ভগুলি রাখিয়াছে
কিন্তু সঙ্কল্প দেবমূর্তির মধ্যে প্রত্যেক মূর্তির
মুখমণ্ডল মাত্র স্বহস্তে ভগ্ন করিয়াছে।
বাসনা, যে দেশ বিদেশ হইতে লোক
আসিয়া চিরকাল দেখিতে পাইবে, যবন-
গণ হিন্দুদেবের অবমাননা করিয়াছেন,—
যত দিন এই অক্ষয় স্তম্ভসার থাকিবে, তত
দিন জগতে হিন্দুধর্মের অবমাননা ঘোষণা
করিবে।’

“অত্ৰাপি সেই পুরাতন মন্দিরের
সূন্দর স্তম্ভসার বিদ্যমান রহিয়াছে, অ-
ন্যাপি প্রতিস্তম্ভে বহু দেবমূর্তি অঙ্কিত রহি-
য়াছে,—প্রত্যেক মূর্তির মুখমণ্ডল বিকৃত
বা ভগ্ন, প্রথম মুসলমান আক্রমণকারী-
দিগের ভীষণ ধর্ম-বিষেসের পরিচয় দি-
তেছে।”

শিবজীর স্বভাবতঃই হিন্দুধর্মের অতিশয়
ভক্তি ছিল, এই স্তম্ভসার দেখিতে দেখিতে
তাঁহার নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল, শরীর
কাঁপিতে লাগিল। রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী
আরও বলিতে লাগিলেন,—

“এ দিকে হিন্দুর অবমাননা, অন্য
দিকে যবনের গৌরব। এই যে সম্মুখে উ-
ন্নত স্তম্ভ আকাশ ভেদ

এটা কুতবমিনার, কুতবদীনের বিজয় হিন্দু-
দিগের পরাজয় জগৎমণ্ডলে ঘোষণা ক-
রিতেছে! এই দেখুন আল্টমশ্ প্রকৃতি
যবন রাজাদিগের গৌরবস্থানের উপর কি
রূপ উন্নত সূন্দর প্রস্তর হর্মাদি নির্মিত
হইয়াছে; এই একটা মসজীদ প্রস্তর হই-
তেছিল, ঐ পুরাতন হিন্দু-দেবালয় ভগ্ন
হইয়া উহারই প্রস্তর দ্বারা মসজীদ উঠিতে-
ছিল! সমগ্র ভারতবর্ষে এইরূপ! সকল
স্থানে পরাকৃত হিন্দুদিগের গৌরবচিহ্ন
একে একে বিলীন হইতেছে, তাহার উ-
পর বিজয়ী যবনের গৌরবস্তম্ভ উঠিত হই-
তেছে। এই কুতবমিনারের উপর আ-
রোহণ ককন, মসজীদ, গৌরবস্থানের পরে
গৌরবস্থান,—দূরে দিল্লীর অপূর্ণ অত্যা-
শ্চর্য্য প্রাসাদ ও হর্মাবলী লক্ষিত হইবে
কিন্তু পুরাকালের হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস-
তুলা ইন্দ্রপ্রস্থ বিলীন হইয়াছে,—তাহার
একটা স্তম্ভ বা একটা মন্দিরও নয়নগোচর
হইবে না।”

নিঃশব্দে শিবজী ও শম্ভুজী ও রঘুনা-
থপুত্র কুতবমিনারের উপর উঠিলেন,—
সেরূপ উন্নত স্তম্ভ বোধ হয় জগতে আর
নাই। নিঃশব্দে পূর্ণহৃদয়ে শিবজী চারি
দিকে চাহিতে লাগিলেন;—এই স্থানে
কি জগৎবিখ্যাত হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থ
ছিল, এখানে কি প্রাতঃস্মরণীয় মূর্তি
দ্রাতৃসহ বাস করিয়াছিলেন,—এখানে
কি সেই পুণ্যকালে সেই পুণ্যালোক রাজত্ব
করিয়া সমাগরা ধরার আর্ষ্য-গৌরব বি-

স্তার করিয়াছিলেন, মহর্ষি বেদব্যাস কি এই স্থানে অধিবাস করিতেন? ভীষ্মাচার্য্য, শ্রোণাচার্য্য, অর্জুনের ভারতের অভুল বীরসম্মতি কি ইহারই নিকট আপন২ বীর্ষ প্রকাশ করিয়া অক্ষয় যশোলাভ করিয়াছেন,—কুন্তী, শ্রোপদী, গান্ধারী, ভারতের প্রাতঃস্মরণীয়া ললনীগণ কি এই স্থান পবিত্র করিয়াছিলেন?—শিবজীর বাকুশক্তি রোধ হইল, দুই নয়ন দিয়া জল বহিতে লাগিল,—গদগদস্বরে বলিলেন,—

‘দেবতুল্য পূর্বপুরুষগণ! আপনাদিগকে প্রণাম করি! আমাদের বাহু বলশূন্য, আমাদের নয়ন তিমিরারত, আমাদের হৃদয় ক্ষীণ! ঐ নীল নতোমণ্ডল হইতে প্রসন্ন হইয়া আলোক দান করুন,—যেন হিন্দু নাম পুনর্বীর উন্নত করিতে পারি,—নচেৎ সেই উদামেই যেন মৃত্যু হয়! এ জীবনে অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই!’

শম্ভুজীর হৃদয় ও পূর্ণ হইল, তাঁহারও নয়ন হইতে ঝর্ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

শিবজী চারিদিক দেখিতে লাগিলেন, ছয় শত বৎসরাবধি মুসলমানগণ রাজ্য করিয়াছেন, তাহার চিহ্ন যেন সেই স্থানে অস্তিত্ব রহিয়াছে! অসংখ্য মস্জিদ, অসংখ্য মুসলমান সত্ৰাটের গৌরহান, অথবা অসংখ্য ভগ্ন ও চূর্ণ প্রাসাদের অবশিষ্টাংশ সেই কুতবমিনার হইতে আধুনিক দিল্লী পর্কাস্ত্র ছয় ক্রোশ পথ ব্যাপিয়া

দেখা যাইতেছে। কয়াল কাল, হিন্দু ও যবনের মধ্যে বিভিন্নতা জানেন না,—শত শত বৎসরে সহস্র সহস্র মানবকীটে যে সমস্ত চর্ম্মাদি নির্মাণ করে, হেলায় ভূমিসাৎ করিয়া যায়।

সেদিক হইতে নয়ন ফিরাইয়া শিবজী পুনরায় সেই পৃথুর দুর্গ প্রাচীরেরনিকে দেখিলেন, অনেক ক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া রঘুনাথের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—

‘নারায়ণ! বাল্যকালে কল্পণ প্রদেশের কথা শুনিতাম, পৃথুরায়ের বিষয় যে যে কথা শুনিতাম, অচ্চ যেন তাহা মনে দেখিতেছি! বোধ হইতেছে যেন ঐ ভগ্ন দুর্গ প্রাসাদপূর্ণ, বহুক্ষমাকীর্ণ, পতাকা ও তোরণশোভিত একটি বিস্তীর্ণ নগর! যেন রাজসভায় পাত্রমিত্রবেষ্টিত হইয়া রাজা বসিয়া আছেন—বাহিরে যত দূর দেখা যায়,—পথে, ঘাটে, বাটীতে প্রাজ্ঞেন, নদী-তীরে নাগরিকগণ আনন্দে উৎসব করিতেছে! যেন বহুবিস্তীর্ণ বাজারে কেরবিক্রয় হইতেছে,—উজ্জ্বল লোকে আনন্দে নৃত্যগীত করিতেছে, সরোবর হইতে ললনীগণ কলস করিয়া জল লইয়া যাইতেছে, প্রাসাদ সম্মুখে সেনাগণ সসজ্জ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, অশ্ব, হস্তী, রথ দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও বাদ্যকর সানন্দে বাদ্য করিতেছে! যেন প্রভাতের সূর্য্য এই অপরাপ দৃশ্যের উপর সূন্দর রশ্মি বর্ষণ করিতেছেন,—যেন এমত সময়ে মহা-অনঘোরিত দৃঢ় রাজসভায় প্রবেশ করিল।

‘অন্যান্য কথার পর দূত বলিল,
‘মহারাজ ! মহম্মদ ঘোর আপনার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ মাত্র লইয়া সন্ধিস্থাপন করিতে সম্মত আছেন তাহাতে আপনার কি মত ?’

‘মহানুভব চোহান উত্তর করিলেন—

‘যবে সূর্য্যদেব আকাশে অন্য একটি সূর্য্যকে স্থান দিবেন,—পৃথুরায় সেই দিন স্বীর রাজ্যে অন্য রাজ্যকে স্থান দিবেন !’ রাজবাক্য শ্রবণে জয় জয় নাদে সেই প্রশস্ত প্রাসাদ শব্দিত হইল,—জয় জয় নাদে প্রশস্ত নগর পরিপূরিত হইল !

‘দূত পুনরায় বলিল ‘মহারাজ ! আপনার স্বশুর মহাশয় মহম্মদ ঘোরের সহিত সন্ধি করিয়াছেন,—আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান ও রাঠোর সৈন্য একত্রিত দেখিতে পাইবেন ।’

‘পৃথুরায় উত্তর করিলেন, ‘স্বশুর মহাশয়কে আমার প্রণাম জানাইবেন ও বলিবেন, আমিও স্বয়ং বাইতেছি,—অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিব ।’

‘অবিলম্বে চোহান সৈন্য ঐ প্রশস্ত ভূগর্গ হইতে নিক্রান্ত হইল,—তেমৌরীর যুদ্ধে যবন ও রাঠোর সৈন্য পৃথুরায়ের সম্মুখে, বাস্তুভাঙিত ধূলিবৎ উড়িয়া গেল,—আহত যোদ্ধী কক্ষে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন ।’

‘কণেক পরে দীর্ঘনিশ্বাস ভাগ করিয়া

বলিলেন—‘রথুনাথ ! সে দিন আমাদের গিয়াছে ; কিন্তু তথাপি এখানে দণ্ডায়মান হইলে, আমাদের পূর্বপুরুষদিগের অবিদ্যম্বর কীর্ত্তি স্মরণ করিলে স্বপ্নের ন্যায় নব নব আশা মনে উদয় হয় । এই বিশাল কীর্ত্তিক্ষেত্র চিরদিন তিমিরায়িত থাকিবে না ; ভারতের পূর্বদিন এখনও উদিত হইতে পারে । জগদীশ্বর কয়কৈ আরোগ্য দান করেন, দুর্বলকে বলদান করেন, জীর্ণ পদদলিত ভারতসন্তানকে তিনি উন্নত করিতে পারেন ।’

নিঃশব্দে সকলে কূতবমিনার হইতে অবতীর্ণ হইলেন ; নিঃশব্দে শিবিরান্তিমুখে বাইলেন ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।

রামসিংহ ।

‘বাণের সদৃশ বীর, সমান সমান’

কাশীরাম দাস ।

শিবজী ও তাঁহার পুত্র শম্ভুজী শিবের উপবেশন করিয়া আছেন এমত সময়ে একজন প্রহরী আসিয়া বলিলেন,—

‘মহারাজ জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ অন্য একজন সৈনিক সহিত সত্রাট-আদেশে মহারাজকে দিল্লিতে আহ্বান করিতে আসিয়াছেন । উত্তরে ঘরে দণ্ডায়মান আছেন ।

শিব । ‘সাদরে লইয়া আইস ।’

উগ্রস্বভাব শম্ভুজী বলিলেন, ‘পিতঃ,

আপনাকে আহ্বান করিতে আরংজীব কেবল দুইজন মাত্র দূত পাঠাইয়াছেন? এ অবমাননা সহ্য করিবেন?’

শিবজীও আরংজীবরূত এই অবমাননা মনে মনে জ্বলন্ত হইলেন, কিন্তু সে ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। ক্রমে ক্রমে পরই রামসিংহ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। রাজপুত্রযুবক পিতার ন্যায় তেজস্বী ও বীর, পিতার ন্যায় ধর্মপরায়ণ ও সত্যপ্রিয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী যুবকের যুগ্মশূল দেখিয়াই তাঁহার উদার ও অকপট চরিত্র বুঝিলেন, তথাপি আরংজীবের কোন কু-অভিসন্ধি আছে কি না, দিল্লী প্রবেশে বিপদ আছে কি না, কথাগুলো জানিবার প্রয়াস করিলেন। রামসিংহ পিতার নিকট শিবজীর বীর্ষ্য ও প্রতাপের কথা অনেক শুনিয়াছেন, সন্নিহিত নগরে মহারাষ্ট্র বীর পুরুষের দিকে অবলোকন করিলেন। শিবজী রামসিংহকে আলিঙ্গন ও যথোচিত সম্মানপুষ্পের অভ্যর্থনা করিলেন। ক্রমে ক্রমে রামসিংহ কহিলেন—

‘মহারাষ্ট্রকে পূর্বে আমি কখনও দেখি নাই, কিন্তু পিতার নিকট আপনার যশোবার্তা বিস্তর শুনিয়াছি, অত্যাচারিতার স্মরণে স্মরণপ্রিয় ধর্মপরায়ণ বীরপুরুষকে দেখিয়া আমার মনে সার্থক হইল।’

শিব। ‘আমার ও অত্যাচারিতার সৌভাগ্য। আপনার পিতার তুল্য বিচক্ষণ,

ধর্মপরায়ণ, সত্যপ্রিয় বীরপুরুষ রাজস্থানে ও বিরল, দিল্লী আগমনের সময় যে তাঁহার পুত্রের সতিত সাক্ষাৎ হইল ইহা সুলক্ষণ মনে হইল।’

রাম। ‘মহাশয় দিল্লী আগমন করিতেছেন শুনিয়াই সত্রাট আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, কখন নগর প্রবেশ করিতে অভিলষ করেন?’

শিব। ‘প্রবেশ সম্বন্ধে আপনি কি পরামর্শ দেন?’ শিবজী তীক্ষ্ণ নয়নে রামসিংহের দিকে চাহিতেছিলেন।

অকপট স্বরে রামসিংহ উত্তর করিলেন—

‘আমার বিবেচনায় এইক্ষণে প্রবেশ করা বিধেয়, বিলম্ব হইলে বায়ু উত্তপ্ত হইবে, গ্রীষ্ম সংসহনীয় হইবে।’

রামসিংহের সরল উত্তর শুনিয়া শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—

‘সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আপনি দিল্লীতে অধুনা বাস করিতেছেন, আপনার নিকটে কোন ও সংবাদ অবিদিতে নাই, আমার পক্ষে দিল্লীপ্রবেশ কতদূর সুবিধা কার্য্য তাহা আপনি অবশ্যই জানেন।’

উদারচেতা রামসিংহ এতকণ পর শিবজীর মনোগত ভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—

‘কথা কখন, আমি আপনার উদ্দেশ্য পূর্বে বুঝিতে পারি নাই। আমি আপনার অবস্থায় হইলে চিরকাল পরিত্রস্ত

বাস করিতাম, নিজের অসির উপর নির্ভর করিতাম, অসির তুলা প্রকৃত বন্ধু আর নাই । কিন্তু এ বিষয়ে অজ্ঞমাত্র,—পিতা আপনাকে যখন দিল্লী আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন তখন আপনি আসিয়া ভালই করিয়াছেন । তিনি অবিভীষণ পণ্ডিত তাঁহার পরামর্শ কখনও বার্থ হয় না ।

শিবজী বুঝিলেন দিল্লীতে তাঁহাকে কষ্ট করিবার জন্য কোনও কল্পনা হয় নাই, অথবা যদি হইয়া থাকে রামসিংহ তাহা জানেন না । তখন পুনরায় বলিলেন—

‘হঁা আপনার পিতাই আমাকে আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন,—আমার আসিবার সময় তিনি আরও বাক্য দান করিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় আপনি অবগত আছেন ।’

রামসিংহ,—‘আছি । দিল্লী আগমনে আপনার কোনও বিপদ হইবে না, কোনও অনিষ্ট হইবে না, সে বিষয়ে তিনি আপনাকে বাক্যদান করিয়াছেন, সে বিষয়ে তিনি আপনাকে ও আদেশ করিয়াছেন ।’

শিব । ‘তাহাতে আপনার কি মত ?’

রাম । ‘পিতার আদেশ অবশ্য পালনীয়, রাজপুত্রের বাক্য লঙ্ঘন না হয়,—পিতার বাক্য যাহাতে লঙ্ঘন না হয়, আপনি নিরাপদে স্বদেশে যাইতে পারেন, সে বিষয়ে দাসের যত্নের কোনও ক্রটি হইবে না ।’

শিবজীর মন নিকটবর্তী হইল । আর সন্দেহ না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—

‘তবে আপনারই পরামর্শ গ্রহণ করিব ; বিলম্ব করিলে বায়ু উত্তপ্ত হইবে, চলুন এইক্ষণই দিল্লী প্রবেশ করি ।’

অচিরে সকলে দিল্লীর অভিমুখে চলিলেন ।

সমস্ত পঞ্চ পুরাতন মুসলমান প্রাসাদের ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ । প্রথম মুসলমানেরা দিল্লী জয় করিয়া পৃথুরায়ের পুরাতন দুর্গের নিকট আপনারদিগের রাজধানী নির্মাণ করিয়াছিলেন, পরে প্রথম সম্রাটদিগের মসজিদ, প্রাসাদ ও সমাধি-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ সেই স্থানে দৃষ্ট হয় । কালক্রমে হুতন হুতন সম্রাট আরও উত্তরে হুতন হুতন প্রাসাদ ও রাজবাটী নির্মাণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে নগর উত্তরাভিমুখে চলিল ! শিবজী যাইতে যাইতে কত প্রাসাদ কত মসজিদ ও মিনার, কত স্তম্ভ ও সমাধি-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিলেন, তাহা গণনা করিতে পারিলেন না । রামসিংহ শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন ও নানা স্থানের পরিচয় দিতে লাগিলেন, উভয়ে উভয়ের গুণের পরিচয় পাইলেন, উভয়ের মধ্যে অচিরে মৌহন্দ্য জন্মিল । তীক্ষুবুদ্ধি শিবজী স্থির করিলেন, যদি দিল্লীতে কোনও বিপদ হয়, একজন প্রকৃত বন্ধু পাইব ।

পাশ্চাত্য লোদীবংশীয় সম্রাটদিগের

প্রকাণ্ড সমাদ্রিমন্দির সকল দৃষ্ট হইল, প্রত্যেক রাজ্যের কবরের উপর এক একটা গম্বুজ ও অটালিকা নির্মিত হইয়াছে। আফগানদিগের গোত্রব-সূর্য যখন অন্তর্মিত হয়, তখন এই স্থানে দিল্লী ছিল, পরে আরও উত্তরে সরিয়া গিয়াছে।

তাহার পর সম্রাটের প্রকাণ্ড সমাদ্রিমন্দির। তাহার পরে “চৌবটখদা” অর্থাৎ খেত-প্রস্তর-বিনির্মিত চতুঃকোণ স্তম্ভযুক্ত প্রকাণ্ড মন্দির অটালিকা। তাহার পশ্চাতে অসম্ভা গোরস্থান। পৃথুরায়ের দুর্গ হইতে আধুনিক দিল্লী পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে শিবজীর বোধ হইল যেন সেই পথেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। এক একটি প্রাণাদ বা অটালিকা সেই ইতিহাসের এক একটি পত্র, এক একটি গোরস্থান এক একটি অক্ষর, করাল কাল সেই ইতিহাসলেখক; ম-চেৎ এরূপ অক্ষরে ইতিহাস কেন লিখিত হইবে?

শিবজী আরও আসিতে লাগিলেন। দিল্লীর প্রাচীরের নিকটে আসিলে রামসিংহ সগর্বে একটি মন্দির দেখাইয়া বলিলেন,—

‘রাজন, ঐ যে মন্দির দেখিতেছেন,—পিতা জ্যোতিষ গণনার্থ ঐ মান-মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন; বহুদেশের পাণ্ডিত্যের ঐ মন্দিরে আসিয়া রজনীতে নক্ষত্র গণনা করেন।’

শিব। ‘আপনার পিতা যেরূপ

বিজ্ঞ, জগতে এরূপ সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন লোক অতি বিরল; শুনিয়াছি পুণা কাশীণামেধ তিনি এরূপ মান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।’

রাম। ‘যাহা আজ্ঞা করিলেন সত্য’ অচিরে দিল্লীর প্রাচীরের ভিতর সকলে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিবার সময় শিবজীর ঈষৎ হৃদকম্প হইল,—তিনি অশ্ব ধামাইলেন। একবার পশ্চাৎ দিকে চাহিলেন, একবার মনে চিন্তা উদয় হইল যে ‘এখনও স্বাধীন আছি, পরক্ষণেই বন্দী হইতে পারি!’ তৎক্ষণাৎ ধর্মপরাগণ জয়সিংহের নিকট যে বাক্যদান করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইল, জয়সিংহের পুত্রের উদার মুখমণ্ডল দেখিলেন,—ভবানীর নাম লইলেন ও নিজ কেষে ‘ভবানী’ নামক অসিকে মনে মনে স্মরণ করিয়া দিল্লীর প্রবেশ করিলেন।

স্বাধীন মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা সেই মুহূর্ত্তে বন্দী হইলেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

দিল্লীনগর।

‘যরে যরে বাজিছে বাজনা
নাচিছে নর্ত্তকী-রসদ, গাইছে সুরতালে
গায়ক; নাগকে লয়ে কেলিছে নাগকী—
খল খল খল হাসি মধুরঅধরে!

কেহ বা স্মরণে রত কেহ শীথুপানে ।
 ঘারে ঘারে কোলে মালা গাঁপা কলকুলে
 গৃহাশ্রয়ে উড়িছে রজ ; বাতায়নে বাতী ;
 জনস্রোতঃ রাজপথে বহিছে কলোলো।”
 মধুসূদন দত্ত ।

দিল্লী অদ্য মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে । আরংজীব স্বয়ং জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন না, কিন্তু রাজকর্ষা সাধনার্থ সময়ে সময়ে জাঁকজমক আবশ্যক, তাহা বিশেষরূপে জ্ঞানিতেন । অদ্য শিবজী দরিদ্র মহারাষ্ট্রদেশ হইতে বিপুল অর্থশালী মোগল রাজধানীতে আনিয়াছেন ; মোগলদিগের ক্ষমতা সম্পত্তি ও অর্থের প্রাচুর্য দেখিলে শিবজী আপন হীনতা বুঝিতে পারিবেন, মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের অসম্ভাবিতা বুঝিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে আরংজীব অদ্য প্রচুর জাঁকজমকের আদেশ দিয়াছিলেন । সত্রাটের আদেশে দিল্লীনগরী উৎসবের দিনে কুল-ললনার ন্যায় অপূর্ব বেশ ধারণ করিয়াছে !

শিবজী ও রামসিংহ একত্রে রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন । পথ দিয়া অসংখ্য অখারোহী ও পদাতিক গমনাগমন করিতেছে, নগর লোকারণ্য হইয়াছে । বহিঃগণ বাজারের দোকানে বহুমূল্য পণ্যক্রয় রানি করিয়া রাখিয়াছে ; উৎকৃষ্ট বস্ত্র, বহুমূল্য স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার, অপূর্ব খাদ্য সামগ্রী, অপর্বাণ্ড গৃহানুকরণ ক্রয় দেখিতে দেখিতে শিবজী রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন । কোথাও

গৃহের উপর দিয়া নিশান উড়িতেছে, কোথাও সুপাচ্ছন্দে গৃহস্থেরা বারন্দার বসিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা গণ্যক দিয়া কুল-কামিনীগণ অসিদ্ধ মহারাষ্ট্র যোদ্ধাকে দেখিতেছে । পথে অসংখ্য শকট, শিবিকা হস্তী ও অশ্ব ; রাজ্য মনসবদার, সেখ, আমীর ও ওমরাহগণ গমনাগমন করিতেছেন ; অখারোহীগণ তীব্রবেগে যেন নগর কাঁপাইয়া বাইতেছে ; সূন্দর অলঙ্কার ও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া শুণ্ড নাড়িতে নাড়িতে গজেন্দ্রগমনে গজেন্দ্রগণ চলিয়া বাইতেছে ; হস্তকার শব্দে শিবিকাবাহকগণ যেন আরোহীর পদমর্ধ্যাদা চৌকর শব্দের দ্বারা প্রচার করিয়া চলিয়া বাইতেছে ! শিবজী এক্রূপ নগর কখনও দেখেন নাই, কোথায় পুনা বা রায়গড় ! বাইতে বাইতে রামসিংহ দূরে তিনটি খেঁত গম্বুজ দেখাইয়া বলিলেন—

‘ ঐ দেখুন জুয়া মস্‌জীদ ! সত্রাট শাহজিহান জগতের অর্থ একত্র করিয়া ঐ উন্নত প্রশস্ত মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন—শুনিয়াছি ওরূপ মস্‌জীদ জগতে আর নাই ।’ শিবজী বিস্ময়োৎকুল-লোচনে দেখিলেন রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিনা মস্‌জীদেয় প্রাচীর দেখা বাইতেছে, তাহার উপর সূন্দর খেঁত-প্রস্তর-বিনির্মিত তিনটি গম্বুজ ও দুই দিকে দুই মিনার যেন গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে ।

এই অপূর্ণ মস্‌জীদেয় সম্মুখেই রাজ-

প্রাসাদ ও দুর্গের বিস্তীর্ণ রক্তবর্ণপ্রস্তর-
 বিনির্মিত প্রাচীর দৃষ্ট হইল। দুর্গের প-
 শ্চাতে যমুনা নদী, সম্মুখে দুর্গ ও মস্জি-
 দের মধ্যে, বিস্তীর্ণ রাজপথ শঙ্কপূর্ণ ও
 লোকারণ্য। সেই স্থানের ন্যায় আর এ-
 কটি স্থান ভারতবর্ষে ছিল না, জগতে ছিল
 কি না, সন্দেহ। দুর্গের প্রাচীরের উপর
 সহস্র নিশান বায়ুপথে উড়িতেছে, যেন
 জগতে মোগল সম্রাটের ক্ষমতা ও গৌরব
 প্রকাশ করিতেছে! দুর্গদ্বারে একজন প্র-
 ধান মনসুদাদারের প্রশস্ত শিবির; মনসুদ-
 দার দুর্গদ্বার রক্ষা করিতেছেন। সম্মুখে
 সেনা রেখায় রেখায় দৃশ্যমান রহিয়াছে,
 বন্দুকের কিরীচশ্রেণী সূর্য্যালোককে ঝকঝক
 করিতেছে, প্রত্যেক কিরীচ হইতে রক্তব-
 জ্রেণী নিশান বায়ুমাৰ্গে উড়িতেছে। দুর্গ
 সম্মুখে অসংখ্য লোক অসংখ্য প্রকার দ্রব্য
 ক্রয় বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, দুর্গপ্রা-
 চীর হইতে মসজিদপ্রাচীর পর্যন্ত ও উত্তর
 দক্ষিণে যতদূর পথ দেখা যায় সমস্ত শঙ্ক-
 পূর্ণ ও লোকারণ্য! অথারোহী, গজা-
 রোহী বা শিবিকারোহী ভারতবর্ষের প্র-
 ধান প্রধান পদাভিষিক্ত পুরুষ বহুলোক-
 সমন্বিত হইয়া বহু সমারোহে সর্বদাই দু-
 র্গদ্বার দিয়া ভিতর বা বাহিরে আসিতে
 ছেন। উঁহাদিগের পরিচ্ছদ-শোভায় মনন
 ঝলমিলিত হইতেছে, লোকের কলরবে কর্ণ
 বিদীর্ণ হইতেছে! সকল শব্দকে নিমগ্ন ক-
 রিয়া মধ্যে মধ্যে শিবিরের মধ্য হইতে কা-
 য়ানের শব্দ মগ্ন করিয়া দিতেছে ও

রাজাধিরাজ আলমগীর অর্থাৎ জগতের
 অধিপতির ক্ষমতাব্যাপ্তি জগৎসংসারে প্র-
 চার করিতেছে।

বিশ্বনাথকুম্ভ-লোচনে ক্ষণেক এই স-
 মস্ত ব্যাপার দেখিয়া শিবজী রামসিংহের
 সহিত দুর্গদ্বার অতিক্রম করিয়া দুর্গ প্র-
 বেশ করিলেন।

প্রবেশ করিয়া শিবজী যাহা দেখি-
 লেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন। চতুর্দিকে
 বিস্তীর্ণ “কারখানা” অসংখ্য শিল্পকা-
 রগণ রাজ-বাবহার্য্য নানানিধি দ্রব্য প্রস্তুত
 করিতেছে,—অপূর্ণ সুরবর্ণ ও রৌপ্য খচিত
 বস্ত্র, মণ্ডল মসলিন বা ছিট,—বহুমূল্য
 গালিচা, চম্ভ্রাতপ, তাম্বু বা পরদা, সুন্দর
 পরিধেয়, উষ্ণিষ, শাল, বা গাঁত্রাবরণ, অ-
 পরূপ সুরবর্ণ রৌপ্য ও মণিমাণিক্যের বে-
 গম-পরিধেয় অলঙ্কার, সুন্দর চিত্র, সুন্দর
 কাককার্য্য, সুন্দর কাষ্ঠ বা খেঁত প্রস্তুতের
 গৃহানুকরণ দ্রব্য, রাশি রাশি নীল, পীত,
 রক্তবর্ণ বা হরিদ্বর্ণ প্রস্তুতের নানারূপ খে-
 লনা দ্রব্য, কত বর্ণনা করিব! ভারতবর্ষে
 যত অপূর্ণ শিল্পকার ছিল, সম্রাট-আ-
 দেশে তাহার মাসিক বেতন পাঁচিয়া প্র-
 তিদিন দুর্গে কার্য্য করিতে আসিত। স-
 ম্রাট রাজকার্য্যার্থ বা নিজ প্রয়োজন্যের
 জন্য যে কোন বস্তু আবশ্যক বোধ করি-
 তেন, দিলাসিলী বেগমগণ যতরূপ অপূর্ণ
 ‘ফরমায়েশ’ করিতেন, প্রাসাদবাসিন্দি-
 গের বাহা কিছু প্রয়োজন হইত, সমস্ত এই
 স্থানে প্রস্তুত হইত।

শিবজী এ সমস্ত দেখিবার সময় পাইলেন না। অসখ্যা লোকের মধ্য দিয়া “দেওয়ান আম” নামক উন্নত প্রশস্ত রক্তবর্ণ প্রস্তর-বিনির্মিত প্রাসাদের নিকট আসিলেন। সত্রাট সচরাচর এই স্থানেই সভা অধিবেশন করেন,—কিন্তু অদ্য যেন শিবজীকে প্রাসাদের সমস্ত গৌরব দেখাইবার জন্যই,—আরও ভিতরে সুন্দর খেঁতপ্রস্তর-বিনির্মিত, নানারূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত জগতে অতুল্য “দেওয়ান খাস” নামক প্রাসাদে সভা অধিবেশন করিয়াছিলেন। শিবজী সেই স্থানে যাইলেন, দেখিলেন প্রাসাদের ভিতর রত্নমাণিক্য-বিনির্মিত স্বর্গারশ্মি প্রতিঘাতী ময়ূর-সিংহাসনের উপর সত্রাট আরংজীব উপবেশন করিয়া আছেন, সত্রাটের চারিদিকে রৌপ্যবিনির্মিত রেল, তাহার সম্মুখে ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য রাজা, মনসবদার, ওমর'হ ও বীরপুরুষ এবং অসংখ্য লোক নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রামসিংহ শিবজীর পরিচয় দান করিয়া রাজসদনে উপস্থিত হইলেন।

শিবজী অদ্য দিল্লীনাগরের অসাধারণ শোভা দেখিয়াই আরংজীবের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এক্ষণে রাজসদনে আসিয়া সেই বিষয় আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। যিনি বিংশতি বৎসর তুহুদ যুদ্ধ করিয়া আপনার ও স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সত্রাট-সত্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া

যুদ্ধে বধেষ্ঠ সহায়তা করিয়াছেন, যিনি এতদূর স্বীকার করিয়া মহারাষ্ট্রদেশ হইতে সত্রাটকে দর্শন করিতে দিল্লী পর্যন্ত আসিয়াছেন, সত্রাট তাঁহাকে এইরূপে আহ্বান করিলেন? সামান্য সেনাপতি-কেও ইহা অপেক্ষা সম্মান করিতেন, শিবজী অশ্রু একজন সামান্য কৰ্মচারীর ন্যায় নম্রভাবে রাজসদনে দণ্ডায়মান। শিবজীর পমনীতে উষ্ণ শোণিত বহিতে লাগিল,—কিন্তু এক্ষণে নিকপায়! সামান্য রাজকৰ্মচারীর ন্যায় সত্রাটকে ‘ওসলীম’ করিয়া রীতিমত ‘নজর’ দান করিলেন। আরংজীবের দূর উদ্দেশ্য সাধন হইল,—জগৎ সংসার জানিল, শিবজী জানিল, শিবজী ও আরংজীব সমকক্ষ নহেন, দাসের প্রভুর সহিত, কণ্ঠের বলিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করা মূৰ্খতা।

এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ আরংজীব ‘নজর’ গ্রহণ করিয়া কোন বিশেষ সমাদর না, করিয়া শিবজীকে ‘পাঁচ হাজারী’ অর্থাৎ পঞ্চ সহস্র সেনার সেনাপতিদলের মধ্যে স্থান দিলেন। শিবজীর নগ্ন তখন অগ্নিবৎ প্রজ্জ্বলিত হইল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি ওষ্ঠের উপর দস্তস্থাপন করিলেন, অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন শিবজী পাঁচ হাজারী? সত্রাট যখন মহারাষ্ট্রে যাইবেন, দেখিবেন শিবজীর অধীনে কত পাঁচ হাজারী আছে! দেখিবেন, তাহার দুর্বল হস্তে আসিধারণ করে না।’ শিবজীর পার্শ্বস্থ রাজকৰ্মচারীগণ

এই কথা শুনিতে পাইল, সত্রাটের কাণে
এ কথা উঠিল।

অস্বাভাবিক কার্য সম্পাদন
হইলে সভা ভঙ্গ হইল। সত্রাট গাত্রো-
স্থান করিয়া পার্শ্বস্থ উচ্চ শ্বেত-প্রস্তরবি-
নির্মিত বেগম মহলে গেলেন, নদীর স্রো-
তের স্মরণ হইতে অদৃশ্য লোকস্রোত
নির্গত হইতে লাগিল, যে যাহার আশ্রয়
স্থানে যাইল, সাগরের স্রোত বিস্তীর্ণ দ-
লীনগরেস্রোতের লোকস্রোত নীল হইয়া
গেল।

শিবজীর আশ্রয়ের জন্য একটি বাটি
নির্দিষ্ট হইয়াছিল; রোষে, অভিমন্যু স-
ন্ধার সময় শিবজী সেই বাটিতে আসি-
লেন, একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লা-
গিলেন।

ক্ষণেক পর রাজসদন হইতে সংবাদ
আসিল যে অদ্য সত্রাটের সমুখে শিবজী
যে কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সত্রাট
তাঁহা শুনিয়াছেন। সত্রাট শিবজীকে
অন্য দণ্ড দিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু ভ-
বিষাতে শিবজী রাজসাক্ষাৎ পাইবেন
না, রাজসভার স্থান পাইবেন না।

শিবজী বুঝিলেন ভবিষ্যৎ আকাশ মেঘা-
চ্ছন্ন হইতেছে; ব্যাধে যেরূপ সংকটের পরি-
বার জন্য জ্বালপাতে, ফুৎ ফুৎবুদ্ধি আরং-
জীব সেইরূপ দীরে ধীরে শিবজীকে বন্দী
করিবার জন্য মন্ত্রণাজাল পাতিতেছেন।
'এ জাল বিদীর্ণ করিয়া কি পুনরায় স্বা-
ধীনতা লাভ করিব?' পুনরায় দীরে

প্রায় এক দণ্ডকাল চিন্তা করিতে লাগি-
লেন।

শেবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহি-
লেন, 'হা সীতাপতি গোশ্বামিন্! মিত্র-
প্রবর! চির যুদ্ধের পরামর্শ তুমিই দিয়া-
ছিলে,—তখন তোমার পরামর্শ গ্রাহ্য ক-
রিতাম না, তোমার গরীরসী কথা এখনও
আমার কর্ণে শব্দিত হইতেছে!—আরং-
জীব! সাবদান! শিবজী এ পর্য্যন্ত তো-
মার নিকট সভা পালন করিয়াছে,—তা-
হার সঙ্কিত অসত্য বা খল অচরণ করিও
না, কেননা শিবজীও সে বিদ্যায় শিশু
নহেন। যদি কর, ভবানী সাক্ষী থাকুন,
মহারাজ্যেদেশে যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত ক-
রিব, তাহাতে এই সুন্দর দিল্লীনগর, এই
বিপুল মুসলমান সাম্রাজ্য দগ্ধ হইয়া যা-
ইবে!'

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিগীথে আগন্তুক।

“কে তুমি—

বিভূতি-ভূষিত অজ।”

মধুসূদন দত্ত।

কয়েক দিনের মধ্যে শিবজী আরং-
জীবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বুঝিতে পারিলেন; শিবজী আরং-
জীবের আশ্রয়ে না যাইতে পারেন, চিরকাল দিল্লীতে বন্দী হইয়া থাকেন, মহারাজ্যের আশ্রয় এখনও স্বাধীন না হইল, এই আরংজীবের উদ্দেশ্য! শিবজী সত্রা-

টের এই কপটাচরণে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইলেন, কিন্তু রোষ গোপন করিয়া দিল্লী হইতে প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

শিবজীর চিরবিষ্মত মন্ত্রী রঘুনাথ পন্ত ন্যায়শাস্ত্রী সর্বদা শিবজীর সহিত এই বিষয় আলোচনা করিতেন, ও নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেন ।

অনেক যুক্তি করিয়া উভয়ের স্থির করিলেন যে প্রথমে দেশ প্রত্যাগমনের জন্য সত্রাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করা বিধেয়,—অনুমতি না দিলে অন্য উপায় উদ্ভাবন করা যাইবে ।

ন্যায়শাস্ত্রী পশ্চিমপ্রবর, ও বাকৃপ-তুতায় অগ্রগণ্য, তিনি শিবজীর আবেদন রাজ-সদনে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন—

আবেদন পত্রে শিবজী যে যে কারণে দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিত হইল । শিবজী মোগল সৈন্যের সহায়তা করিয়া যে যে কার্য সাধন করিয়াছিলেন, আরংজীব যে যে বিষয় অস্বীকার করিয়া শিবজীকে দিল্লীতে আস্থান করিয়াছিলেন তাহাও স্পষ্টাক্ষরে দর্শিত হইল । তাহার পর শিবজী প্রার্থনা করিলেন যে, ‘আমি যে কার্য সাধন করিতে অস্বীকার করিয়াছি তাহা এখনও সাধন করিতে প্রস্তুত আছি, বিজয়পুর ও গলখন্দ-রাজ্য সত্রাটের অধীনে আনিতে যতদূর সাধ্য সাধায়া করিব । অথবা যদি

সত্রাট আমার সহায়তা গ্রহণ না করেন, অনুমতি দিন আমি নিজের জায়গীরে প্রত্যাবর্তন করি, কেন না হিন্দুস্থানের জল বায়ু আমার পক্ষে ও আমার সঙ্গীর সেনার পক্ষে যৎপরোনাস্তি অস্বাস্থ্যকর, এদেশে আমাদের থাকা সম্ভব নহে ।’ রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী এইরূপ আবেদন পত্র সত্রাটসদনে উপস্থিত করিলেন, সত্রাট উত্তর পাঠাইলেন, উত্তরে মানাকথা লিখা আছে কিন্তু শিবজীর প্রত্যাবর্তনের অনুমতি নাই । শিবজী স্পষ্ট বুঝিলেন তাঁহাকে চিরবন্দী করাই সত্রাটের একমাত্র উদ্দেশ্য । তখন দিন দিন পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

উপরি উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর এক দিন সন্ধ্যার সময় শিবজী গবাক্ষপার্শ্বে চিন্তিতভাবে উপবেশন করিয়া আছেন । সূর্য্য অস্ত গিয়াছে কিন্তু এখনও অন্ধকার হয় নাই, রাজপথ দিয়া লোকের স্রোত এখনও অবিরত বহিয়া যাইতেছে । কত দেশের লোক কতরূপ পরিচ্ছদে কত কার্যে এই রাজধানীতে আসিয়াছে ! দিল্লী অসংখ্য সৈনিকের বাসস্থান, সর্বদাই প্রশস্ত পথ দিয়া দুই এক জন সৈনিক যাইতে দেখা যাইতেছে । কখন কখন দুই এক জন খেতাজ মোগল সদর্পে যাইতেছেন, অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ শত শত দেশীয় হিন্দু বা মুসলমান সর্বদাই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, দুই এক জন কৃষ্ণবর্ণ কাকীও কখন কখন দেখা যাইতেছে । পারস্য আ-

রব, তাতার ও তুরস্ক দেশ হইতে বণিক বা
মসাহের এই সমৃদ্ধ নগরীতে গমনাগমন
করিতেছে, মুসলমান বা হিন্দু সেনাপতি
রাজা বা মনসবদার বহুলোকসমন্বিত হ-
ইয়া মহাসমারোহে হস্তী বা অশ্ব বা শি-
বিকার আয়োজন করিয়া যাইতেছেন, ত-
দপেক্ষা উচ্চরবে বিক্রেতাগণ আপন আ-
পন পণ্য দ্রব্য মস্তকে লইয়া চীৎকার ক-
রিতেছে, এতদ্ভিন্ন সহস্র অন্যান্য লোক
সহস্র কার্যে জলের স্রোতের ন্যায় যা-
তায়িত করিতেছে !

ক্রমে এই জনস্রোত হ্রাস পাইতে
লাগিল। দিল্লীর অসংখ্য দোকানদার
আপন আপন দোকান বন্ধ করিতে লা-
গিল। নগরের অনন্ত কলরব যেন ক্রমে
হ্রাস প্রাপ্ত হইল, দুই একটা বাটার গবাঙ্ক
ভিত্তর হইতে দীপশিখা দেখা যাইতে লা-
গিল, অনন্ত হর্ষাশ্রেনীর মধ্যে দূরস্থ অট্টা-
লিকাগুলি ক্রমে অন্ধকারে আবৃত হইতে
লাগিল। আকাশে দুই একটা তারা দেখা
দিল, পশ্চিমদিকে রক্তিমালচ্ছটা আর নাট,
শিবজী পূর্বদিকে চাহিলেন ;—দিল্লীর
উন্নত প্রাচীর, তাহার পর শান্ত বিস্তীর্ণ
দিগন্তপ্রবাহিনী যমুনা নদী সায়ংকালের
নিশুঙ্কতার অনন্ত সাগরাভিমুখে বহিয়া
যাইতেছে !

সেই নিশুঙ্কতার মধ্যে জুয়া মস্জীদ
হইতে আজানের পবিত্র শব্দ উদ্ভিত হইল,
যেন সে গম্ভীর শব্দ ধীরে ধীরে চারিদিকে
বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল, যেন ধীরে ধীরে

মানবের মন আকর্ষণ করিয়া গগনে উদ্ভিত
হইতে লাগিল ! শিবজী মুসলমান-ধর্ম-বি-
দ্বেষী, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও শুরু হইয়া সেই
সায়ংকালীন স্রুদর উচ্চারিত গম্ভীর শব্দ
শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অন্ধকারে পু-
নরায় চাহিলেন, কেবল জুয়া মসজীদের
শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্মিত গম্বুজ সুনীল আকা-
শপটে অম্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কেবল
প্রাসাদের রক্তবর্ণ উন্নত প্রাচীর যেন দূরে
পর্বতশ্রেণীর মত দৃষ্ট হইতেছে ! এতদ্ভিন্ন
সমস্ত নগর অন্ধকারে আচ্ছাদিত, নৈশ
নিশুঙ্কতার শুরু !

রজনী গম্ভীর হইল, কিন্তু শিবজীর
চিন্তাসূত্র এখনও ছিন্ন হইল না ! অন্য
পূর্ব কথা একে একে হৃদয়ে জাগরিত হ-
ইতেছিল। বাল্যকালের স্মরণ, বাল্য-
কালের আশা, ভরসা, উদ্যম ;—সাহনী
উন্নতচরিত্র পিতা শাহজী, পিতৃতুল্য বাল্য-
সুহৃদ দাদাজী কানাইদেব, গরীয়সী মাতা
জীজী !—যিনি মহারাষ্ট্রের জয়ের ভবি-
ষ্যদাণি বলিয়াছিলেন, যিনি বীরমাতার
ন্যায় বালককে বীরকার্যে ব্রতী করিয়া-
ছেন, বিপদে আশ্বাস দিয়াছেন, আহবে
উৎসাহ দিয়াছেন !

তাহার পর যৌবনের উন্নত আশা,
ভীষণ কার্য-পরম্পরা, দুর্গ-বিজয়, দেশ-
বিজয়, রাজ্য-বিজয়, বিপদের পর বিপদ,
যুদ্ধের পর যুদ্ধ, অপূর্ব জয়লাভ, দোর্দণ্ড
প্রতাপ, দুর্দমনীয় উচ্চাভিলাষ ! বিংশ
বৎসর পর্য্যালোচনা করিলেন, প্রতি বৎ-

সর অপূর্ণ বিজ্ঞে বা অমমসাহসী কার্যে
অন্ধিত ও সমুচ্ছল !

সে কার্য-পরম্পরা কি বার্থ ? সে
আশা কি যারাবিনী ?—না এখনও ভবি-
ষ্যৎ-আকাশে গৌরব-নক্ষত্র লীন রহি-
য়াছে, এখনও ভারতবর্ষে যখন রাজ্যের
অবসান হইবে, হিন্দুরাজতন্ত্রবর্তির মস্তকের
উপর রাজচ্ছত্র উন্মূলিত হইবে ?

এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, এ-
রূপ সময়ে দ্বিপ্রহর রজনীর ঘটা বাজিল,
রাজপ্রাসাদের নাগর্য্যাখানা হইতে সে শব্দ
উৎপিত হইয়া সমস্ত বিস্তীর্ণ নগর ব্যাপ্ত
হইল, নৈশ নিস্তন্ধতার গভীর শব্দ বহুদূর
পর্ষ্যন্ত প্রসৃত হইল।

আকাশগর্ভে সে শব্দ এখনও লীন হয়
নাই, এরূপ সময়ে শিবজী উন্মূলিত গবা-
ক্ষহারে একটি দীর্ঘ নুন্যমূর্তি দেখিতে
পাইলেন ; রক্তাঙ্গ অন্ধকার আকাশ-পটে
যেন দীর্ঘ-নিশ্চেষ্ট প্রতিকৃতি !

বিশ্মিত হইয়া শিবজী দণ্ডায়মান হই-
লেন, সেই আকৃতির প্রতি তীব্রদৃষ্টি করি-
লেন, কোষ হইতে অসি অর্ধেক বহির্গত
করিলেন। অপরিচিত আগন্তুক তাহা
গ্রাহ না করিয়া, লক্ষ্য না করিয়া, ধীরে
ধীরে গবাক্ষ ভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ
করিলেন, ধীরে ধীরে লম্বাট ও জুগলের
উপর হইতে নৈশ শিশির মোচন করি-
লেন।

শিবজী তীক্ষ্ণ-মনে দেখিলেন, আগ-
ন্তকের মস্তকে জটাভূট, শরীরে বিভূত ;

হস্তে বা কোষে অসি বা ছুরিকা বা কোন
ও প্রকার অস্ত্র নাই ;—তবে আগন্তুক
শিবজীকে হত্যা করিবার জন্য মস্ত্রো-
শ্রেণিত চর নহে। তবে আগন্তুক কে ?

তীক্ষ্ণমনে অন্ধকার ঘরের ভিতরও
শিবজীকে লক্ষ্য করিয়া আগন্তুক বলি-
লেন,—

‘ মহারাজের জয় হউক ! ’

অন্ধকারে আগন্তকের আকৃতি দে-
খিয়া শিবজী তাঁহাকে চিনিতে পারেন
নাই, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠশব্দ শ্রবণমাত্র চি-
নিতে পারিলেন। জগতে প্রকৃত বন্ধু
অতি বিরল, বিপদের সময়, চিন্তার সময়
এরূপ বন্ধুকে পাইলে হৃদয় হৃত্য করিয়া
উঠে। শিবজী সীতাপতি গোম্বামীকে
প্রণাম ও সম্মেহে আলিঙ্গন করিয়া নি-
কটে বসাইলেন, একটি দীপ জ্বালিলেন,
পরে অতিশয় উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা ক-
রিলেন।

‘ বন্ধুপ্রবর ! রায়গড়ের সংবাদ কি ?
আপনি তথা হইতে কেবে কিরূপে আসি-
লেন ?’ এতদূরেই বা কি প্রয়োজনে আ-
সিলেন, ও অদা নিশীথে সহসা গবাক্ষহার
দিয়া আসিবারই বা অর্থ কি ?’

সীতাপতি উত্তর করিলেন, ‘ মহা-
রাজ ! রায়গড়ের সংবাদ সমস্ত কুশল ;
আপনি যে সচিব প্রবরের হস্তে রাজা-
তার মাস্ত করিয়াছেন তাহাতে অমঙ্গল
হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এ বিষয় আমি
বিশেষ জানি না, কেন না আপনি রায়-

গড় পরিভাগ করিবার পরে অধিক কাল আমি ওখার ছিলাম না। পূর্বেই আপনাকে বলিয়াছিলাম, আমার কঠোর ব্রত সাধনার্থে আমাকে দেশে দেশে পর্যটন করিতে হয়—সেই প্রয়োজনেই মধুবা প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শনার্থ দিল্লী আসিয়াছি। প্রভুর সহিত যখন সাক্ষাৎ করি তখনই আমার সৌভাগ্য, দিবাই কি, নিশাই কি ?

শিব। 'তথাপি কোনও বিশেষ কারণ না থাকিলে গদ্যক দিয়া ছিপ্রহর নিশীথে আসিতেন না। কি কারণ প্রকাশ করিয়া বলুন।'

সীতা। 'নিবেদন করিয়াছি। কিন্তু পূর্বে জিজ্ঞাসা করি প্রভু আসিয়া অবধি কুশলে আছেন ?'

শিব। 'শারীরিক কুশলে আছি,—শক্রমধ্যে মনের কুশল কোথায় ?'

সীতা। 'প্রভুর সহিত ত সত্ৰাটের সন্ধিই আছে, আপনাদের শত্রু কোথায় ?'

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'সর্পের সহিত ভেকের সহিত সন্ধি কতক্ষণ স্থায়ী ? গীতাপতি ! আপনি অবশ্যই সমস্ত অবগত আছেন আর আমাকে লজ্জা দিবেন না। যদি রায়গড়ে আপনার বীরোপযোগী পরামর্শ শুনিতাম তাহা হইলে কঙ্কণদেশের ভীষণ পর্বত ও উপত্যকার মধ্যে হিন্দুধর্মের জন্য অদ্যাপি ও যুদ্ধ করিতে পরিতাম, খল সত্ৰাটের কথায় বিশ্বাস করিয়া আপনার মধ্যে পড়িতাম না,—দিল্লীনগরে বন্দী হইতাম না।'

সীতা। 'প্রভু আশ্চর্য্যকর করিবেন না, মধুবা-মাত্রই জাগ্রিত অধীন, এ জগৎ ভ্রমপরিপূর্ণ। বিশেষ এ বিষয়ে আপনাদের দোষ মাত্র নাই, আপনি সন্ধিবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সদাচরণ প্রদর্শন পূর্বক এ স্থানে আসিয়াছেন, তিনি অসদাচরণ ও কপটাচরণে দোষী, জগদীশ্বর অবশ্য তাঁহার সমুচিত দণ্ড দিবেন। প্রভু ! খলতার জন্ম নাই,—অদ্য আরংজীব যে পাপ করিয়া আপনাকে বন্ধ করিবার আশা করিয়াছেন সেই পাপে সবংশে নিদন হইবেন। মহরাজ ! আপনি রায়গড়ে যে কথা বলিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রদেশে সে কথা এখনও কেহ বিশ্বাসে কর নাই ;—আরংজীব যদি কপটাচরণ করেন তবে মহারাষ্ট্রদেশে যে যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইবে, সমস্ত মোংল সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে !'

উৎসাহে, উল্লাসে শিবজীর মনন জ্বলিতে লাগিল, তিনি বলিলেন,—

'সীতাপতি ! সে ভরসা এখনও লোপ হয় নাই। এখনও আরংজীব দেখিবেন মহারাষ্ট্রজীবন লোপ পায় নাই ! কিন্তু ভায় ! যে সময়ে আমার বীরোপগণা মৈনোরা মোংলদেগের সহিত তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইবে, সে সময়ে আমি কি দূর দিল্লীনগরে নিশ্চেষ্ট বন্দী স্বরূপ থাকিব ?'

সীতা। 'যবে গগনসঞ্চারী বায়ুকে আরংজীব জালদ্বারা বন্ধ করিতে পারি-

বেশ, তখন আপনাকে বন্দী রাখিতে পারিবেন, তাহার পূর্বে নহে ।’

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিলেন ; পরে ধীরে ধীরে বলিলেন ‘ তবে বোধ করি আপনি কোম পলায়নের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাই বলিবার জন্য এরূপ গুপ্তভাবে অদ্য রজনীতে আমার গৃহে আসিয়াছেন ।’

সীতা । ‘ প্রভু তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রভুর নিকট কিছুই গোপন রাখিতে পারি এরূপ সম্ভাবনা নাই ।’

শিব । ‘ সে উপায় কি ? ’

সীতা । ‘ অঙ্গকার রজনীতে প্রভু অনায়াসে ছদ্মবেশে গৃহ হইতে বাহির হইতে পারেন । দিনীর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, কিন্তু পূর্বদিকে একস্থানে সেই প্রাচীরে লৌহশলাকা স্থাপিত হইয়াছে, তদ্বারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা মহারাষ্ট্রীয় বীরের অসাধ্য নহে । অপর পার্শ্বে ক্ষুদ্র তরীতে অক্ষয়ন বাহক আছে নিমেষ মধ্যে মথুরার পল্লভিবেন । তথায় প্রভুর অনেক বন্ধু আছে, অনেক হিন্দু-দেবালয়ে অনেক ধর্ম্মাস্ত্র পুরোহিত আছেন, তথা হইতে প্রভু অনায়াসে স্বদেশে বাইতে পারিবেন ।’

শিব । ‘ আমি আপনার উদ্যোগে যথেষ্ট বাধিত হইলাম, আপনি যে প্রকৃত বন্ধু তাহার আর একটি নিদর্শন পাইলাম । কিন্তু মনে কক্ষম প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের সময় কেহ আমাকে দেখিতে পাইল, তখন পি-

লায়ন হুসোধ্য, — আরংজীব হস্তে নিশ্চয় মৃত্যু ।’

সীতা । ‘ প্রাচীরের যে স্থানে লৌহ-শলাকা দেওয়া আছে তাহার অনতিদূরে আপনার সেনার মধ্যে দশজন খস্মাহস্তে ছদ্মবেশে লুকায়িত আছে । যদি কেহ প্রভুকে দেখিতে পায় বা গতিরোধ করে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয় ।’

শিব । ‘ ভাল, নৌকায় গমন কালে তীরস্থ কোন প্রহরী যদি সন্দেহ প্রযুক্ত নৌকা ধরিতে চাহে ? ’

সীতা । ‘ অক্ষয়ন নৌকাবাহক ছদ্মবেশী আপনারই অক্ষয়ন যোদ্ধা । তাহা-দিগের শরীর বর্ষাচ্ছাদিত, তুণ পরিপূর্ণ । সহসা নৌকা কেহ রোধ করিতে পারে তাহার সম্ভাবনা নাই ।’

শিব । ‘ মথুরার পল্লভিবেন যদি প্রকৃত বন্ধু না পাই ? ’

সীতা । ‘ আপনার পেশওয়ার ভগিনীপতি মথুরার আছেন, তিনি আপনার চির-পরিচিত ও বিশ্বস্ত তাহা আপনিই জানেন । আমি অদ্য তাঁহার নিকট হইতে আসিতেছি, তিনি সমস্ত প্রস্তুত রাখিয়াছেন, তাঁহার পত্র পাঠ করুন ।’

বস্ত্রের ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া শিবজীর হস্তে দিলেন । শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া পত্র কিরাইয়া দিয়া বলিলেন—

‘ আপনি পাঠ করিয়া শুভাম ।’ সীতা পত্রটি লক্ষিত হইলে, তাঁহার তখন স্ব-

হল হটল যে শিবজী আপন নাম লিখিতেন জ্ঞানিতেন না, কখনও লেখাপড়া লিখেন নাই।’

সীতাপতি পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন। বাহা বাহা আবশ্যিক, মুরেশ্বরের কুটুম্ব সমস্ত স্থির করিয়াছেন পত্রে বিস্তীর্ণ লিখা আছে। শুনিয়া শিবজী বলিলেন—

‘গোস্বামিন্ ! আপনার সমস্ত জীবন বাগযজ্ঞে অতিবাহিত হইয়াছে কখনই বোধ হয় না, শিবজীর প্রধান মন্ত্রীও আপনার অপেক্ষা স্নহরূপে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিত না। কিন্তু এখনও একটি কথা আছে। আমি পলাইলে আমার পুত্র কোথায় থাকিবে, আমার বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথ পুত্র, প্রিয় স্নহৃদ অন্নজী মালজী,—আমার সেনাগণ কোথায় থাকিবে? ইহারা কিরূপে আরংজীবের কোপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে?’

সীতা। ‘আপনার পুত্র, প্রিয় স্নহৃদ ও মন্ত্রীর আপনার সহিত অদ্য রজমীতেই বাইতে পারে;—আপনার সেনাগণ দিল্লীতে থাকিলে হানি নাই,—আরংজীব তাহাদিগকে লইয়া কি করিবেন, অগত্যা ছাড়িয়া দিবেন।’

শিব। ‘সীতাপতি ! আপনি আরংজীবকে জ্ঞানেন না; তিনি ভাতৃদিগকে বধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।’

সীতা। ‘যদি আপনার সেনাগণের উপর কঠোর আদেশ দেন, কোন্ মহা-

রাষ্ট্র এরূপ ভীক যে আপনার নিরাপদ বার্থা গ্রহণ করিয়া উল্লেখের সহিত প্রাণ বিসর্জন না করিবে?’

শিবজী কণেক নীরবে চিন্তা করিলেন। পরে মহামুত্তব স্বীরে স্বীরে বলিলেন—

‘গোস্বামিন্ ! আমি আপনার চেষ্ঠা আপনার উদ্যোগের জন্য আপনার নিকট চিরবাহিত হইলাম, কিন্তু শিবজী তাহার বিশ্বস্ত ও চিরপালিত ভৃত্যদিগকে বিপদে রাখিয়া আপনার উদ্ধার চাহে না; এরূপ ভীকতার কার্য কখনও করিবে না। সীতাপতি ! অন্য উপায় উদ্ভাবন ককন, নচেৎ চেষ্ঠা ত্যাগ ককন !’

সীতা। ‘অন্য উপায় নাই।’

শিব। ‘তবে সময় দিন, শিবজীর এই প্রথম বিপদ নহে, উপায় উদ্ভাবনে কখনও পরাধুখ হয় নাই।’

সীতা। ‘সময় নাই ! অদ্য রজনীতে প্রভু পলায়ন ককন; নতুবা কল্য আপনার পলায়ন নিশ্চয়।’

শিব। ‘আপনি কোন্ যোগবলে এরূপ জ্ঞানিলেন জানি না, কিন্তু আপনার গণনা যদি যথার্থ ও হয় তথাপি শিবজীর অন্য উত্তর নাই;—শিবজী আগ্রিত প্রেতিপালিত লোককে বিপদে রাখিয়া আত্মপরিত্রাণ করিবে না। গোস্বামিন্ ! এ কত্রিয়ের ধর্ম নহে।’

সীতা। ‘প্রভু ! বিশ্বাসঘাতকের শাস্তিদান করা কত্রিয়ের ধর্ম, আরংজী-

বকে শাস্ত্রদান করুন,—সেইদূর মহারাষ্ট্র দেশে প্রজাবর্জন করুন, তথা হইতে সাগরতরঙ্গের ন্যায় সমরতরঙ্গ প্রবাহিত করুন, অচিরে আরম্ভজীবের সুখস্বপ্ন ভগ্ন হইবে, অচিরে এই পাপপূর্ণ মাত্রাজ্য অতল জলে মগ্ন হইবে ।’

শিব । ‘সীতাপতি ! যিনি জগতের রাজ্য তিনি বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিবেন, আমার কথা অবধারণা করুন, তাহার অধিক বিলম্ব নাই;—শিবজী আজ প্রত্যেকে ভাগ করিবে না।’

সীতা । ‘প্রভু ! এখনও এ প্রতিজ্ঞা ভাগ করুন, এখনও বিবেচনা করিয়া আদেশ করুন; কলা বিবেচনার সময় থাকিবে না,—কলা আপনি বন্দী !’

শিব । ‘তাহাই হউক;—শিবজী আজ প্রত্যেকে ভাগ করিবে না, শিবজীর প্রতিজ্ঞা অবিচলিত !’

সীতা । ‘তবে আদেশ দিন, আমি বিদায় চাই।’ অতিশয় ক্রোধে হৃৎথের স্বরে সীতাপতি এই কথাগুলি বলিলেন। শিবজী চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার নয়নে জল-বিন্দু ।

তখন সস্নেহে সীতাপতির হস্ত ধরিয়া বলিলেন—“গোশ্বামিন্ ! দোষ গ্রহণ করিবেন না; আপনার যত্ন, আপনার চেষ্টা, আপনার ভালবাসা আমি জীবন থাকিতে ভুলিব না; রায়গড়ে আপনার বীর পরামর্শ, দিল্লীতে আমার উদ্ধারার্থ আপনার এতদূর উদ্যোগ চিরকাল আ-

মার হৃদয়ে জাগরিত থাকিবে ! বিদায় কি জনা ? যতদিন দিল্লীতে থাকিবেন আমার এই অট্টালিকায় থাকুন, এখানে আমার বিপদ আছে, আপনার নাই।’

সীতা । ‘প্রভু ! আপনার মিষ্টবাক্যে যথোচিত পুরস্কৃত হইলাম; জগদীশ্বর জ্ঞানে আপনাকে সন্তোষিত করিবে; আমার আর অন্য অভিলষ নাই; কিন্তু আমার ব্রত অলঙ্ঘনীয়, ব্রত সাধনের জন্য নানাস্থানে নানাকার্য্যে যাইতে হয়, এখানে অস্থিতি অসম্ভব।’

শিব । ‘এ কি অসম্ভব ব্রত জ্ঞানি না। কিন্তু দিবসে এক দিনও আপনার সাক্ষাৎ পাইলাম না; রজনীতে গেল অন্ধকারে এইরূপ রক্তচন্দনারূত হইয়া জটা ধারণ করিয়া এক এক বার দেখা দেন, হই একটি বাক্যে আমার হৃদয় পর্যন্ত আন্দোলিত করেন, পুনরায় কোথায় চলিয়া যান আর দেখিতে পাই না ! সীতাপতি ! এ কি কঠোর ব্রত ধারণ করিয়াছেন ?’

সীতা । ‘সমস্ত এক্ষণে কিরূপে বিস্তার করিয়া বলিব, সাধনের একটি অঙ্গ এই যে, দিবসে রাজদর্শন নিষিদ্ধ !’

শিব । ‘ভাল এ ব্রত কি উদ্দেশ্যে ধারণ করিয়াছেন ?’

কণ্ঠে চিন্তা করিয়া সীতাপতি বলিলেন,—‘আমার ললাটে একটি অমঙ্গল লিখন আছে,—আমার ইচ্ছা দেবতা, যাঁহাকে আমি বাল্যকাল হইতে প্রাণের সহিত পূজা করিয়াছি, তাঁহার নাম জপ

করিয়া জীবন দিতে আমি আনন্দ বোধ করিব, বিধির নির্বন্ধে তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট! সেই অসন্তোষ খণ্ডনার্থ এই ব্রত ধারণ করিয়াছি।

শিব। ‘এ অমঙ্গল কে গণনা করিয়া আপনাকে জানাইল? কেবা আপনাকে অমঙ্গল খণ্ডনার্থ এ ব্রত ধারণ করিতে বলিল?’

সীতা। ‘কার্যাবশতঃ আমি স্বয়ংই প্রথমটি জানিতে পারিলাম; ঈশানী-মন্দিরে একজন সতী সান্বী যোগিনী আমাকে এই ব্রত ধারণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। যদি সফল হই, তবে সে ভগিনীসম স্নেহময়ী সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিব; যদি কৃতার্থ না হই তবে এ অক্লিষ্টকর জীবন ত্যাগ করিব। যাঁহার সন্তোষার্থ জীবনধারণ করিতেছি, তিনি অসন্তুষ্ট থাকিলে এ জীবনে আবশ্যিক কি?’

শিবজী দেখিলেন, গোস্বামীর নয়নে জলবিন্দু,—তাঁহার নিজেই চক্ষুও শুষ্ক রহিল না; বলিলেন—

‘সীতাপতি! যাহা বলিলেন যথার্থ; যাহার জন্য প্রাণপণ করি তাঁহার তিরস্কার, তাঁহার অসন্তোষ অপেক্ষা জগতে মর্যভেদী দুঃখ আর নাই।’

সীতা। ‘প্রভু কি এ যাতনা কখনও ভোগ করিয়াছেন?’

শিব। ‘জগদীশ্বর আমাকে মর্জনা কখন, আমি একজন নির্দোষী বীর-

পুরুষকে এই যাতনা দিয়াছি;—সে বালকের কথা মনে হইলে এখনও আমার সময়ে সময়ে হৃদয়ে বেদনা হয়।’

প্রায় উষেগ-কন্ধকণ্ঠে সীতাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তাঁহার নাম কি?’

শিবজী বলিলেন, ‘রঘুনাথজী হাবেলদার।’

শিবজী বলিলেন, ‘রঘুনাথজী হাবেলদার!’ ঘরের দীপ সহসা নির্বাক হইল।

শিবজী প্রদীপ জ্বালিবার উচ্চোগ করিতেছিলেন, এমন সময় অতি কষ্টোচ্চারিত স্বরে সীতাপতি বলিলেন, ‘দীপ অবশ্যক,—বলুন,—শ্রবণ করিতেছি।’

শিব। ‘আর কি বলিব! তিন বৎসর অতীত হইয়াছে সেই বালকবেশী পুরুষ আমার নিকট আইসে ও মৈনিকের কার্যে প্ররুত হয়। তাঁহার বদনমণ্ডল উদার। সীতাপতি! আপনারই ন্যায় তাঁহার উন্নত ললাট ও উজ্জ্বল নয়ন ছিল। বালকের বয়স আপনা অপেক্ষা অল্প; আপনার ন্যায় বুদ্ধির প্রখরতা ছিল না, কিন্তু সেই উন্নত হৃদয়ে আপনার ন্যায়ই দুর্দমনীয় বিরত ও অকৃতোভরতা সর্বদা বিরাজ করিত! আপনার বলিষ্ঠ উন্নত দেহ যখন দেখি,—আপনার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর যখন শুনি, আপনার বিরোচিত বিক্রম যখন আলোচনা করি, সেই বালকের কথা তখনই হৃদয়ে জাগরিত হয়।’

‘তাঁহার পর?’

‘সেই বালককে যে দিন প্রথম দেখি-

লাম, সেই দিন প্রকৃত বীর বলিয়া চিনিলাম ; সেই দিন আমার নিজের একখানি অসি তাহাকে দান করিলাম ;—রঘুনাথ সে অসির অবমাননা করে নাই । বিপদের সময় সর্বদা আমার ছায়ার ন্যায়' নিকটে থাকিত, যুদ্ধের সময় দুর্দমনীর তেজে শত্রু-বেধভেদ করিয়া মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া সিংহনাদে অগ্রসর হইত ! এখনও বোধ হয় তাহার সেই বীর আকৃতি সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কক্ষকেশ, সেই উজ্জ্বল নয়ন, আমি দেখিতে পাইতেছি ।

‘ তাহার পর । ’

‘ এক যুদ্ধে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল, অন্য এক যুদ্ধে তাহারই নিক্রমে দুর্গ জয় হইয়াছিল, কত যুদ্ধে আপন অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল ! ’

‘ তাহার পর ’

‘ আর জিজ্ঞাসা করেন কি জন্য ; আমি একদিন ভ্রমে পতিত হইয়া সেই চিরবিশ্বাসী অনুচরকে অবমাননা করিয়া কাঁধ হইতে দূর করিয়া দিলাম ; শেষ পর্যন্তও রঘুনাথ একটিও কর্কশ কথা উচ্চারণ করে নাই ; যাইবার সময়ও আমারদিকে মশুক মত করিয়া চলিয়া গেল ।’ শিবজীর কঠকন্ঠ হইল, নয়ন দিয়া অশ্রু বহিয়া পড়িতে লাগিল ।

অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিতে পারি-

লেন না ; অনেকক্ষণ পরে সীতাপতি বলিলেন—

‘ আশ্চর্যের কারণ কি ? দোষীর দণ্ডই রাজধর্ম । ’

‘ শিব । ‘ দোষী ! রঘুনাথের উন্নত চরিত্রে দোষ স্পর্শে না, আমি কি কক্ষণে ভ্রান্ত হইলাম, জানি না । রঘুনাথের যুদ্ধস্থানে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল, আমি তাহাকে বিজ্রোহী মনে করিলাম । মহানুভব জয়সিংহ পরে এ বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন,—জানিয়াছেন যে তাঁহার একজন পুরোহিতের নিকট রঘুনাথ যুদ্ধপূর্বে আশীর্বাদ লইতে গিয়াছিল, সেই জনাই বিলম্ব হইয়াছিল । নির্দোষীকে আমি অবমাননা করিয়াছিলাম, শুনিয়াছি সেই অবমাননার রঘুনাথ প্রাণত্যাগ করিয়াছে । যুদ্ধে সে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, আমি তাহার প্রাণ বিনাশ করিয়াছি । ’

শিবজীর কথা সাজ হইল ; তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন ; অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন ।

অনেকক্ষণ পরে ডাকিলেন—‘সীতাপতি ! ’ কোনও উত্তর পাইলেন না । কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া প্রদীপ জ্বালিলেন,—সীতাপতি ঘরের মধ্যে নাই ! সীতাপতি গোস্বামী সহসা অদৃশ্য হইলেন কি জন্য ? সীতাপতি গোস্বামী কে ?

জীর্ণোদ্ধার।

অর্থাৎ।

প্রাচীন আর্ষাজাতির জ্ঞান সমালোচনা

সলিল।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—

পুরাতন আর্ষাদিগের জ্ঞানানুসন্ধান মানসে আমরা 'জীর্ণোদ্ধার' ইত্যভিধের মুকুটার্ণ করিয়া একটি প্রস্তাব আরম্ভ করি। * নানা কারণে প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই। সম্ভ্রতি তাহার পুনরারম্ভ করিলাম।

তৎকালে উহা কি পর্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার আংশিক পরিচয় প্রদান করিতেছি; ফল, প্রস্তাবপাঠের পূর্বে পাঠকবর্গ একবার সেই প্রস্তাবটি দেখিয়া লইবেন ইহা আমাদের অনুরোধ। দ্বিতীয় অনুরোধ এই যে এরূপ আকারের অর্থাৎ খণ্ড প্রস্তাব বলিয়া অর্ধেক বা অবধীরণায় বশ হইবেন না।

স্বষ্টির কারণ, মেঘের স্তর ও স্তরীভূত মেঘের নাম ঐরাবত, এই সকল বিষয় পূর্ব প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে। 'মেঘ-সোপরি যো মেঘঃ স ঐরাবত উচ্যতে' এই শাস্ত্র বচন দ্বারা জানা যাইতেছে যে

* ১২৮৩ শালের কর্তিক। অগ্রহায়ণ মাসের বাঙ্কব দেখ।—

ঐরাবত হস্তির জল বর্ষণ আর স্তরীভূত মেঘের জল বর্ষণ অভিন্ন কথা। হস্তি শব্দটি স্তরীভূত মেঘের রূপক মাত্র। জল-বর্ষণকারী 'তাদৃশ মেঘেরই রূপক নাম ঐরাবত, অপর নাম 'অভ্রমাতঙ্গ'।

'জলানামাকরোরণবঃ'—জল মাত্রেরই প্রধান আকর সমুদ্র। ভূ—বাল্প্ত ও সামুদ্রিক জল সূর্য্যকিরণ দ্বারা বাষ্পীভূত ও মেঘরূপে পরিণত হইয়া কালে স্বষ্টিরূপে পৃথিবীতে নিপতিত হয়, এই ব্যাপার তৎকালীয় কোন আর্ষোরই অজ্ঞাত ছিল না।

তরল পদার্থ মাত্রেই নিম্নগামী; সুতরাং পর্ব্বতাদি উচ্চস্থানের প্রবিষ্ট জল রাশি একত্রিত হইয়া নিম্নে প্রধাবিত হয় বলিয়া তাহাদিগের নাম 'নিম্নগা।' প্রবাহের অম্পদ ও ঘনত্ব অনুসারে কেহ নদ কেহ নদী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইহা মনে করিবেন না যে স্বষ্টির জলই নদ নদীর একমাত্র কারণ। কোন কোন নদী, উৎস-প্রবাহ দ্বারাও উৎপন্ন

হইয়া থাকে। যেসকল জল, পৃথিবীর অন্তরাকর্ষণ শক্তি দ্বারা অভ্যন্তর-প্রবিষ্ট না হইয়া ছিদ্রময় পথে সর্বদা প্রবিত হয়, তাহাই কোন বিশেষ ছিদ্র দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইলে উৎস নামে অভিহিত হয়। এই উৎস কোন স্থানে ফোয়ারার ন্যায় উর্দ্ধে উঠিয়া ভূমিতে পুনঃপতিত হইয়া নিম্নে গমন করে, কোথাও বা কুণ্ডরূপে পরিণত হইয়া ওখা হইতে অধোগমন করে। পরন্তু যেস্থানে উৎস উৎপন্ন হয়, সেই স্থানটিই নদীর যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি ভূমি। নদীসকল যেস্থানে প্রথম উৎপন্ন হয়, সে স্থানে তাহার আয়তন অতি অল্প থাকে। ক্রমে অগ্রসারিণী হইয়া অন্যান্য প্রবাহের সংযোগ ও কোমল মৃত্তিকার ভেদ হেতু বিপুল বিস্তারতা লাভ করে।

কোন কোন নদী পশ্চিমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া কিয়দূর গমনকরতঃ পুনরায় প্রকাশ্য প্রবাহে আত্মশরীর প্রকাশ করে। পুরাকালের আর্যেরা এইরূপ নদীকে ‘অন্তর্বাহিনী’ এবং যেস্থান দিয়া উহার প্রবাহিত হয় সেই স্থানগুলিকে ‘বিনশন’ আখ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইন্ডোপীয় ভূতত্ত্ববেত্তারা বলিয়া থাকেন, যে নদী পশ্চিমধ্যে নিম্নে কোমল মৃত্তিকা ও উপরে অতি দৃঢ় পর্বতখণ্ড প্রাপ্ত হয়, সেই সকল নদীই তৎস্থানে নিম্নস্থ কোমল মৃত্তিকা ধৌত করিয়া পৃথিবীর অন্তর্ভাগ দিয়া প্রবাহিত হয়।

পুরাতন আর্যেরা যখন বিশেষ বি-

শেষ প্রবাহের নামকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রবাহের উপর নদী আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ‘যে জলপ্রবাহ উচ্চস্থান হইতে নির্গত হইয়া অষ্ট সহস্র ধনু অর্থাৎ অনুমান দুই ক্রোশ স্থান ব্যাপ্ত হইতেছে তাহার নাম নদী। এতদপেক্ষা হীন প্রবেশগামী প্রবাহ, নদী নামের যোগ্য নহে।’

নদী সমূহের গতি সরল নহে। ভূমির দৃঢ়তা ও তরল পদার্থের স্বভাব অনুসারে নদী সকলের গতি সর্পের ন্যায় কুটিল হইয়া থাকে। প্রবন্তী সমূহের গতি যদি কুটিল না হইত, তাহা হইলে তাহাদের বেগের একপ্ৰাথর্ষ্য জন্মিত যে তদ্বারা দেশের বহুতর অনিষ্ট সংঘটিত হইত।

বর্তমানকালীয় ঐতপায়ন পুস্তকের নদী সকলের বিশেষ বর্ণনার নিমিত্ত তদীয় প্রবাহের গতি বিশেষকৈ তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া থাকেন। এক পার্বত্যাংশ—ইহা পর্বত তটে পরিবেষ্টিত ও সম্মুখিক বেগ বিশিষ্ট; দ্বিতীয় মধ্যাংশ—ইহা সমভূমি স্থিত মধ্য বেগ বিশিষ্ট ও সর্পের ন্যায় কুটিলগামী। তৃতীয় সঙ্গমাংশ—ইহা লঘু বেগাঙ্কিত এবং গম্যস্থান সকল কোমল মৃত্তিকা বিশিষ্ট হওয়ার তাহার সঙ্গম কালে প্রায় বহুধারা-বিভক্ত ও তথায় ত্রিকোণ ভূমির উৎপাদক।

এতদ্দেশীয় পুরাতন পণ্ডিতেরা তিন ভাগ না করিয়া চারিভাগ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। শীতলবহা, তির্ষ্যকজ্যোতা, মূ-

দুবাহিনী ও অন্তঃসলিলবাহিনী বা বিনশন। ভারতবর্ষে—যত নদ নদী আছে, পুরাতন পশ্চিমের তত্তাবতের বিশেষ পরীক্ষা করিয়া ছিলেন। কোন্ নদী কি-রূপে স্বভাব বিশিষ্ট এবং কি-স্বিধ গুণাক্রান্ত তাহা তাঁহারা পর্যবেক্ষণদ্বারা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হিমালয়-প্রভব নদী সকলের জল অদ্রুত এবং বিজ্ঞা ও সহ্য প্রভৃতি পর্বত-প্রভব নদীর জল বিশেষ রোগজনক, ইত্যাদি গুণাগুণবর্ণনা শুভ্রতগ্রন্থের ৪৫ অধ্যায়ে বহুপরিমাণে আছে এবং কোন্ নদী কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও বর্ণিত আছে; বাস্তবিক ভয়ে উৎসমুদয় সংগ্রহ করিলাম না এবং সেরূপ সংগ্রহ প্রস্তাবের উদ্দেশ্যও নহে।

সলিলের সহিত চন্দ্রমণ্ডলের এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধ আছে। এই আশ্চর্য্য সম্বন্ধের প্রকৃত রূপ ও কারণ কি? ইহা আমরা জানি না। তিথি-বিশেষে যেমন সমুদ্রজল উচ্ছ্বসিত হয়, তেমনি মনুষ্য শরীরের রস নামক জলও উচ্ছ্বসিত হয়। সুস্থ ব্যক্তি ইহা অনুভব করিতে পাৰ্শ্বন বা না পাৰ্শ্বন, জলীয় পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। চন্দ্র-কলার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে সাগর-জলের হ্রাস বৃদ্ধি (স্ফী-তোপচরতা) হয়, পুরাতন আর্কোরা যে দিন ইহা জানিতে পারিয়া ছিলেন, সেই দিনেই জলরাশি সাগরের “সমুদ্র” এই আখ্যা প্রদান করিয়া ছিলেন। ইহা ‘সমুদ্র’ শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা অবগত হওয়া

যায়। পরন্তু চন্দ্রের সহিত সলিলের যে সম্বন্ধ আছে এবং কি-রূপে চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধানুসারে সিদ্ধ সলিলের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, ইহার স্পষ্ট বিবরণ আমরা সংস্কৃত গ্রন্থ মধ্যে অদ্যাপি দেখিতে পাই নাই। যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহা অলীক কল্পনা বলিয়াই উপলব্ধি হইল। শ্বেতদ্বীপের পদার্থবিৎ পশ্চিমের বলেন, চন্দ্রের আকর্ষণ দ্বারা সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হয়। ইহারা আরও বলেন যে, পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়েরই আকর্ষণ শক্তি আছে; চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আপন কক্ষায় পরিভ্রমণ করেন। পৃথিবী যেমন চন্দ্রকে আকর্ষণ করে, চন্দ্রও তেমনি পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। পরন্তু চন্দ্রের আকর্ষণেই পৃথিবীর গাত্র-লগ্ন সমুদ্রের-জল তরল পদার্থ বলিয়া উচ্ছ্বসিত হয়।

পৃথিবীর যে ভাগ যখন চন্দ্রের নিম্নে অবস্থিত করে, তখন সেই ভাগস্থিত সমুদ্র-জল উচ্ছ্বসিত হয়। পরন্তু ঠিক এই রূপ না হইলে অহোরাত্রের মধ্যে একবার মাত্র জোয়ার হইবার সম্ভাবনা। ফলতঃ উক্ত কালের মধ্যে দুইবার জোয়ার হওয়া সর্ব প্রত্যক্ষ। সুতরাং উহার মধ্যে অপর একটি সূক্ষ্ম কারণ থাকা নির্ণয় করিতে হইবে। তাহা এই—

পৃথিবীর যেভাগ যখন চন্দ্রের ঠিক নিম্নে থাকে, তখন তাহার সেইভাগ, অন্য ভাগ অপেক্ষা নিকট হয়; সুতরাং সেই ভাগস্থ জল চন্দ্রের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়

এবং তাহার নিম্নভাগস্থ জল আকর্ষণের অক্ষতা প্রযুক্ত মৃত হয়। এই নিমিত্ত উভয় স্থানেই এক সময়ে জোয়ার উৎপন্ন হয় এবং উক্ত জোয়ারের পার্শ্বের জল সরিয়া গেলেই পার্শ্বেরে তাঁটা হইয়া থাকে। এই রূপেই দিবারাত্তরের মধ্যে দুইবার জোয়ার হয়। অপিচ, যে সময়ে জোয়ার হয়, সেই সময়ে উক্তরূপে পৃথিবীর উভয় ভাগের জল মত ও উন্নত হইলে পৃথিবী অণুকৃতি ধারণ করিতে পারে বটে, কিন্তু চন্দ্রের নিম্নত গমন ও পৃথিবীর নিম্নত ঘূর্ণন হেতু সমুদ্রের এক স্থানের জল চন্দ্রমণ্ডলের আকর্ষণ দ্বারা স্ফীত হইতে হইতে চন্দ্র অন্য স্থানের উপর উদ্ভিত হয়; সুতরাং সমুদ্র জলের স্ফীততা কণকালের অধিক স্থিরীভূত হইতে পারেনা। এজন্যই তৎকালে পৃথিবী অণুকৃতি ধারণ করিতে পারেনা।

ঐশিয়ান জাতির এবস্থিৎ বর্ণনার অনুসরণ বর্ণনা বোধ হয় কোন সঙ্কত গ্রন্থে নাই। আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তদনুসারেই ইহা বলিতেছি। ফল, চন্দ্রমণ্ডল যে সমুদ্রজলস্ফীততার কারণ, তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জল ও চন্দ্রমণ্ডল বাটত অন্যান্য বিষয়গুলি ‘চন্দ্রমণ্ডল’ নামক প্রস্তাবে ব্যক্ত করিব। এক্ষণে চিকিৎসার উপযোগী কতিপয় জল গুণ বর্ণনা করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি।

চিকিৎসা শাস্ত্র, জলকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। আন্তরীক্ষ ও

ভৌম। আকাশাগত বৃষ্টি-জলের নাম ‘আন্তরীক্ষ’ আর তাহা ‘পৃথিবীস্থ হইলে ‘ভৌম’ বলিয়া আখ্যাত হয়। আন্তরীক্ষ জলের কি রস আছে, তাহা নির্দেশ করিয়া বলা যায় না। ফল, এই আন্তরীক্ষ জল, অমৃততুল্য উপকারক।—আয়ুর্বিদ্যাকর, তৃপ্তিকর, ধাতুপোষক, মনঃশৈথিল্যকারক, অমনাশক, এবং ক্রান্তি ও পিপাসাহর—ইত্যাদি বহুগুণসমায়ুক্ত। ভৌমজল স্থানবিশেষে, বিশেষ বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে; তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ করা নিঃস্পরোজন। সংক্ষেপে এইমাত্র নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে যে, মৃত্তিকাসংস্কৃত হয় বলিয়া অনেক পরিমাণে মৃত্তিকার গুণ বর্তে; সুতরাং যে দেশের বা যে স্থানের মৃত্তিকার যেরূপ গুণ, তদনুসৃত জল ও কিয়দংশে তদ্রূপ লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া জানিতে হইবেক। আন্তরীক্ষ জলই সর্বোত্তম হিতকারী, অভাবে আকাশ-গুণ-বহুল-স্থান জল স্রুপথা। আকাশ-গুণপ্রধান স্থানের জলে কোন বিশেষরূপ রসবত্তা অনুভব হয় না এবং তাহা লঘু হইয়া থাকে।

পূর্বেল্লিখিত ‘আন্তরীক্ষ’ জলের আবার চারি প্রকার প্রভেদ আছে। ‘ধার’ ‘কার’ ‘ভৌমার’ এবং ‘হৈম’।

ধার—বৃষ্টিধারার জল। কার—কৃত্রিম জল। * ভৌমার—কুয়াটিকা। হৈম

* এস্থলে কৃত্রিম জল কি! তাহা বুঝি না। প্রাচীন কালেও কি বাষ্প জমাইয়া জল করিবার প্রথা ছিল?

বরফের জল । এই চতুর্বিধ জলের মধ্যে 'ধারণ' জলই পথা ও সেবনীয় । অন্যগুলি অপথ্য ও প্রায়শঃই সেবার অযোগ্য ।

ধারণ জল দুই প্রকার । গাঙ্গ ও সামুদ্র । সমস্ত বর্ষাকাল ব্যাপিয়া যে রুক্ষি-ধারণা পতিত হয়, মনে করিবেন না সকল সময়ের রুক্ষির জল সমান । মেঘেরাও ভিন্ন ভিন্ন মাসে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জল বর্ষণ করিয়া থাকে । শাস্ত্রে লিখিত আছে যে মেঘেরা 'গাঙ্গজল' প্রায় আশ্বীন মাসেই বর্ষণ করিয়া থাকে ; এবং অন্যান্য মাসে কখনঃ বর্ষণ করে ।

'আশ্বিন মাসের রুক্ষির জল, গাঙ্গ-জল, আর ভাদ্র মাসের রুক্ষির জল সমুদ্রের জল, একথা কিরূপ বিশ্বাস হইবে । কিরূপেই বা জানা যাইবে ?

'দ্বয়োরপি পরীক্ষণং কুর্বীত'—দুই প্রকার জলেরই পরীক্ষা করিবে, পরীক্ষা করিলেই গাঙ্গজল কি সামুদ্রজল জানা যাইবে । রুক্ষিজলের গাঙ্গ ও সামুদ্র অবরোধের নিমিত্ত নিম্নলিখিত পরীক্ষা নির্বাচিত আছে । যথা—

শালি ধান্যের পরিষ্কার তণ্ডুল লইয়া তাহা না এঁবে যায় এরূপ করিয়া পাক কর । সেই অন্ন পিণ্ডাকৃতি করিয়া তাহা টাদিরূপার পাত্রে রাখ । টাট্কা থাকিতে থাকিতে তাহা রুক্ষির সময় বা-হিরে রাখিয়া দাও । এক মুহূর্ত্ত অর্থাৎ অনুন দুই দণ্ড রাখিলেও যদি সেই

অন্নপিণ্ডের রঙ ঠিক থাকে এবং অন্য কোন প্রকার ক্রন্দ ভাব লক্ষ্য না হয়, তবেই সেই রুক্ষির জলকে "গাঙ্গ" বলিয়া গ্রহণ কর । আর যদি শীত শীতই বিবর্ণ হইয়া যায় সিক্থ (মোম) ও ক্রদের মত কোন প্রকার পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সে রুক্ষির জল "সামুদ্র" জানিয়া পরিত্যাগ কর । গাঙ্গ বর্ষণের জল উপকারী আর সামুদ্র বর্ষণের জল অপকারী । কিন্তু অন্যান্য মাস অপেক্ষা আশ্বিন মাসের সামুদ্রজলবর্ষণ অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ হয় । এখন সকল মাসেই সামুদ্র জলবর্ষণ হয়, মেলেরাই এক্ষণে মলারিফ্ট বায়ু (ম্যালেরিয়া) ছইয়া দাঁড়াইয়াছে ।

শীত, গ্রীষ্মাদি কালের নিমিত্ত 'ধারণ' জল ধরিয়া রাখা আবশ্যিক । রাখিবার নিয়ম এইরূপ—রুক্ষির সময় উত্তম পরিষ্কার শুভ্র বস্ত্র টানাঁইয়া দাও । নীচে স্তবর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্র কি মৃৎপাত্র অথবা কাঁচপাত্র রাখ । জলপূর্ণ হইলে তুলিয়া রাখ, কোন-রূপ বিকার প্রাপ্ত হইবে না । সুপরিষ্কৃত হস্তাপৃষ্ঠ হইতে ধৃত করিলেও হইতে পারে ।

এরূপ জলের অভাবে কাষে কাষেই 'ভৌম' জল ব্যবহার করিতে হয় ; সুতরাং ভৌম জলের বিবরণও কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করা যাইতেছে । ভৌমজল প্রধানতঃ সপ্তপ্রকার । সপ্তবিধ ভৌমজলের দোষ গুণ ও জল পরিষ্কার নিয়মাদি আগামী প্রস্তাবে ব্যক্ত করা যাইবেক ।

প্রৈততত্ত্ব ।

(প্রথমপ্রস্তাব)

আজি কালি সভাসমাজে প্রৈততত্ত্ব লইয়া মহা গোলযোগ বাঁধিয়াছে। একদিকে ইরোরোপ ও অপরদিকে আমেরিকা এই ভৌতিক তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য কঠোর তপস্যার নিয়ম হইয়াছেন। যোগনিরত ঋষিগণও বড় সাধানে লোক নছেন। তাঁহারা মহামহোপাধায় পণ্ডিত ও সভাসমাজের আদর্শ স্থল। তাঁহাদিগের বিজ্ঞান ও দর্শনজ্ঞানে সভাজগৎ মুগ্ধ। সুতরাং শীত্ৰই যে তাঁহারা তাঁহাদিগের কঠোর তপস্যার ফল পাইবেন, এরূপ আশা বড় অসম্ভব নয়। তাঁহারা আশানুরূপ ফল পাউন বা নাই পাউন, কিন্তু যে টুকু পাইয়াছেন তাহাতেই মুগ্ধ ও আশ্চর্য্যাব্বিত হইতে হয়। দেহশূন্য আত্মার সহিত তাঁহারা কথা কহিতে পারেন। এবং সেই আত্মার সহায়েই ভূত, ভবিষ্যৎ ইহকাল ও পরকালের সমস্ত ঘটনা জানিতে পারেন। ব্যাপারটি বড় সাধারণ নয়। মুনি ঋষিগণ যে পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির করিয়া কখন বলিতে পারিলেন না যে, পরকাল আছে বা পরকাল নাই, সেই পরকালের নাড়ী নক্ষত্র পর্য্যন্ত এই সকল বিদেশীয় পণ্ডিতেরা অঙ্গুষ্ঠিনেই জানিতে পারিয়াছেন। কেবল তা-

হাই নহে; এই সকল আত্মারা উক্ত পণ্ডিতদিগের একান্ত বাধ্য। আহুত হইবা মাত্রই তাঁহারা পণ্ডিতদিগের সমক্ষে আবিভূত হন। এবং তাঁহাদিগের ইচ্ছানুরূপ প্রার্থের সহিতর দিয়া চলিয়া যান।

উপর্যুক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া অনেকেই যে সন্নিহান হইবেন, আশ্চর্য্য নহে। অনেকে ভাবিবেন, ঘটনা কিয়ৎপরিমাণে অতিরিক্ত হইয়াছে। হয় প্রস্তাবলেখক নয় প্রস্তাবের মূলপুস্তকলেখক, যাহা হউক, একটা কারখানা করিয়াছেন। বাঁহারা এরূপ মনে করিবেন, তাঁহাদিগকে এইমাত্র বক্তব্য, যে তাঁহারা কিছুকাল অপেক্ষা করুন। আমরাদিগের প্রস্তাবের সারার্থ ব্যাখ্যার জন্য আমরা যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিব, এবং প্রৈততত্ত্বীয় যে সকল দৃষ্টান্ত দিব, তাহাতেই তাহাদের এ ভ্রম দূর হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু একদিকে যেমন প্রৈতপক্ষসমর্থনার্থ আগ্রহ জন্মিয়াছে, অন্যদিকে আবার কতকগুলি ব্যক্তি এই মতের উচ্ছেদসাধন জন্য খড়াহস্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের কয়েকজন প্রৈততত্ত্ব সম্বন্ধীয় কতকগুলি ঘটনা অলীক বলিয়া নির্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। উভয় পক্ষেই কৃতি এবং

উভয় পক্ষেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ
আছেন। সুরতরাং তাঁহাদিগের কোন প-
ক্ষই অবলম্বন না করিয়া আমরা সাধারণতঃ
প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে কএকটি কথা বলিব।

অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রেতের অ-
স্তিত্বে বিশ্বাস জনসমাজে চলিয়া আসি-
তেছে বলিয়া বুদ্ধ, পণ্ডিত, মুর্খ সকলেই
সকল সময়ে সকল প্রদেশে প্রেতের প্রতি
যথেষ্ট সম্মান করিয়া আসিতেছেন। বিশেষ
বাজালীর ঘরে ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃ-
তির বড় অনুগ্রহ। অশ্মথ বৃক্ষ, বটবৃক্ষ
বা কোন নিম্ববৃক্ষ ইহাদিগের বাসস্থান।
এবং যে সকল বাটীতে এই প্রকারের বৃক্ষ
আছে সেবাটির স্ত্রীলোকদিগকে বড় মশ-
ক্কিত থাকিতে হয়। কোনরূপে অপদস্থ
হইলে ইহার গৃহস্থদিগের কাহারও না
কাহারও স্বন্ধে চাপিয়া এ অপমানের
প্রতিহিংসা লন। এইরূপ পিশাচা-
ক্রান্তদিগের রোজা নামধারী একপ্রকার
চিকিৎসকও আছেন। তাঁহারা মন্ত্রপ্র-
ভাবে গৃহের মঙ্গল স্থাপন করিতে পা-
রেন। এবং প্রেতের চতুর্দশ পুরুষ বা-
হাতে গৃহের জ্বিসীমায় আর আসিতে না
পারে সেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন।

কিন্তু সূত্বের বিষয় এই যে বঙ্গীয়ভূত এবং
রোজার বিশ্বাস শিক্ষিতদিগের মধ্যে নাই
বলিলেই হয়। তাঁহাদিগের একাধিপত্য
স্ত্রীলোক এবং অশিক্ষিতের মধ্যে। অ-
শিক্ষিতদিগের মধ্যেও অনেকে আবার ই-
হার মূলতত্ত্ব জানে। বঙ্গীয় ভূত যে বা-

স্তবিক দুষ্ঠ মনুষ্য, এবং রোজামহাশয়েরা
বঞ্চকহরি, ইহা অনেক পূর্বে হইতে বলের
সাধারণ বিশ্বাস*। বাটীতে ভূতের উৎপাৎ
হয় বলিলেই অনেকে বসিয়া থাকেন, বা-
টির স্ত্রীলোকদিগকে সাবধান করিও।

কিন্তু কোম ব্যাপার বড় কেন মিথ্যা
হউক না, তাহার অভ্যন্তরে কিছু না কিছু
সত্য থাকিবেই থাকিবেণ। সত্যশূন্য মিথ্যা
এজগতে সম্ভবে না। আমরা দেখিতেছি,
যেখানে একদল কোন মতকে ক্ষিপ্ত মস্তি-
ষ্কের উদ্ভাবনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চা-
হেন, আর দল সেই মতেরই বিশেষ পক্ষ-
পাতী। সুরতরাং সেই মতের মধ্যে কিছু
না কিছু সত্য অবশ্য আছে, নহিলে এত
লোক তাহারভক্ত হইত না।

এই জন্যই আমাদের জিজ্ঞাস্য যে,
বঙ্গীয় ভূতদিগের কোনরূপ অস্তিত্ব না থাকি-
লেও ইহাদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাসের
জন্ম কোথা হইতে থাকিল? এই বি-
শ্বাসের মূল আত্মার অমরত্ব। দেহমধ্যে

* কিছু দিবস পূর্বে কোন রোজা
এক গৃহে ভূত ছাড়াইতে গিয়া ভূতের আ-
হারের জন্য দক্ষি প্রার্থনা করিয়াছিল। গৃহ
স্বামী ভূতকে বিশেষ জঙ্ক করিবার জন্য দ-
খিতে পারা বিশাইয়া দিয়াছিল, পরদিবস
দেখিল যে রোজা মুখে লাল কাটিতেছে।
এই ঘটনাটি কোন সপ্তাহিক সংবাদ পত্রে
দৃষ্ট হয়। এরূপ ঘটনার অপ্রতুল নাই।

† “Falsity has a nucleus of real-
ity”——H. Spencer.

আমরা বলিমা কোন স্বতন্ত্র পদার্থ থাকে কিনা? যদি থাকে সে কোথায় থাকে, কেন থাকে, কি উদ্দেশ্যে থাকে? তাহার কোন প্রমাণ আছে কি না? এসকল প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাদেরই সময় নাই, সাধাও নাই। যাহা দর্শনশাস্ত্রের অতীত, তাহার মীমাংসা কে করিবে? এই কথা মীমাংসার জন্য কোন দুই পণ্ডিতের মত ঠিক মিলিল না। কথাই আছে ‘নার্দৌ মুনির্বসা মত্তং ন ভিন্নং’। এই জন্য আমাদের অস্তিত্বস্বত্বকে কোনরূপ প্রমাণ আমরা দিব না। তবে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে, আমাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস সাধারণ বিশ্বাস। সকল সমাজের অভ্যন্তরেই এই বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। হয়ত দুই চারি জন এই বিশ্বাসের শত্রু, কিন্তু দুই চারি জনের মত ধর্তব্য নহে। তাহা-দিগের মত সমাজের মত নহে। সমাজ তাহার জন্য দায়ী হইতে পারেন না। সাধারণের মতই সমাজের মত।

সুতরাং মৃত্যুর পর যদি আমরা থাকে, তবে সে কোন না কোন স্থানে থাকিবেই থাকিবে। যদি এতদূর হয়, তবে মানুষের সহিত সাক্ষাৎ কেন না করিবে? যে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মনুষ্যের সহিত আলাপ করিয়া এতদিন কাটাইল, সে কি একদিনে সব ভুলিয়া যাইবে। যেই ইহলোক ছাড়িল, অমনি কি সকলকে স্মৃতির অঙ্ককারগণের নিকশপ করিবে। মানুষ ডাকিলে সে কেন না আসিবে? কিন্তু

যে-সে ডাকিলে আসিবে না। সে যাহাকে ভাল বাসে সেই ডাকিলেই আসিবে। বাজারের রোজা না ডাকিলে আসিবে না; বিলাতে ও ইউনাইটেড স্টেটে মধ্যস্থ (Medium) না ডাকিলে আসিবে না। আবার যেমন তেমন করিয়া ডাকিলে আসিবে না। আরোজন করিয়া ডাকা চাই। এই কারণে প্রোভান্সের জন্য নানা স্থলে নানারূপ আরোজন হইয়া থাকে।

আমরা রোজাদিগকে পূর্বে যে পরিহাস করিয়াছি, ইহাতে হয়ত অনেকে মনে করিয়াছেন, রোজাদিগের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে বাজারীয় জন্মিয়াছে। বিলাতে জন্মিলে তাহারাও ‘গণ্ডার’ ‘গা’ দিয়া চলিয়া যাইত। লেখকের বিশ্বাস আছে যে, বিলাতের সকলই ভাল, বাজারীয় কিছুই ভাল নহে ইত্যাদি। বাস্তবিক তাহা নহে। বাজারীয়ও আমরা দুই চারি জন সন্ন্যাসীর কথা বিশ্বস্তস্থানে শুনিয়াছি, এবং আরও অনেকের কথা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি। ইহারা পিশাচসিদ্ধ নামে পরিচয় দিয়া থাকে। ইহাদিগের ঘটনাবলী দেখিলে শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আমরা যথাস্থানে ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিব। অন্যদিকে আবার বিলাতের সকলই যে ভাল তাহা নহে। ইচ্ছা করিলে আমরা ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আমরা একত্রীভূত রাজ্য (United States) হইতে একটিমাত্র ঘটনাবলী লেখ করিতেছি। ফ্রিট নামক একজন

সাহেব উক্তস্থানে একজন মধ্যস্থ বলিয়া পরিচিত । প্রেতের সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয়, এবং এই ব্যবসায়ের তিনি বিপুল অর্থোপার্জনও করিয়াছেন । তিনি পরলোক হইতে সংবাদাদি আনিয়া দেন । জীবিত মনুষ্যেরা যদি তাঁহাদিগের মৃত বন্ধু, পিতা, মাতা, প্রণয়িনী প্রভৃতি স্বজনদিগের সহিত কথোপকথন করিতে ইচ্ছা করেন, ফ্রিট সাহেব তাহার মধ্যস্থ হইয়া সহায়তা করিতে পারেন । তাঁহার সাহায্যের পদ্ধতিটা এইরূপ—যাহার কথা কহিবার প্রয়োজন, তিনি পরলোকস্থ আত্মীর নামে পত্র লিখিয়া উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া ফ্রিটের হস্তে দেন । পরদিন পত্র ফিরিয়া পান । পত্র বহির্দিকে পূর্ব-মৃত বন্ধ । কিন্তু পত্র খুলিয়া দেখেন যে, পত্রের সহিত মৃত আত্মীর উত্তর রহিয়াছে । কেহ প্রণয়িনীকে লিখিতেছেন, কেবে তোমার সঙ্গে দেখা হইবে; কেহ পিতাকে লিখিতেছেন, আমার জীবনপথ সুখপূর্ণ বা কষ্টকর ইত্যাদি; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার যথাসম্ভব উত্তর পাইয়া থাকেন । সম্প্রতি এই ঘটনার একটি ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে । এই ব্যাখ্যা প্রকাশের কারণ ফ্রিট সাহেবের সহিত তাঁহার বনিতির মনবিচ্ছেদ । বিশ্বাস-ঘাতিনী বনিতি একণে সাধারণকে জানাইতেছেন যে, তাঁহার স্বামী পত্র খুলিবার একটি অস্বৃত বস্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন ।

এবং তদ্বারা সকল পত্র খুলিয়া আপন

মনোমত উত্তর লিখিয়া পত্র পুনশ্চ পূর্ব-মৃত বন্ধ করিয়া পত্রপ্রেরককে ফিরিয়া দেন * । এইত গোল আধুনিক সভ্য-তম জাতিদিগের প্রেততত্ত্ব । যদি এতদূর হয়, তবে হুভাগ্য বঙ্গদেশে যে রোজাদিগের সময়ে সময়ে পশার হইবে তাহার আশ্চর্য্যতা কি ? বিদেশীয়দিগের সকলই ভাল, এ কথা আমরা বলি না, বাঁহারা বলেন তাঁহাদিগেরই জন্য এই দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম । ইচ্ছা থাকিলে এই মত আরও কতশত উদ্ধৃত করিতে পারিতাম ।

প্রেততত্ত্ববাদীরা ক্ষমা করিবেন, সকলেই যে এইরূপ এ কথা আমরা বলিতেছি না । বিলাতে ও ইউনাইটেড-স্টেটেও এক সম্প্রদায় আছে, বাঁহাদিগের শিক্ষা ও অধ্যবসায়ের বাস্তবিক আ-মরা মুগ্ধ । পৃথিবীতে ভাল মন্দ উত্তরই একত্র মিলে । ভাল মন্দ না হইলে কিছুই হইতে পারে না । যে হিন্দুধর্ম অবলম্বন করিয়া চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ অক্ষয় যশঃ রাখিয়া গিয়াছেন, সেই ধর্মের দোহাই দিয়া কতলোক পাপ সোপানে অবতরণ করিতেছে । যে তীর্থে ভক্ত পুজা করিতে যায়; সেইখানেই পাপের ছড়াছড়ি । দেবতা সান্নিধ্যে পাপ হয় না বলিয়া দুই ভক্তের নামে কালি দেয় । যেখানে মহাত্মা রামমোহন রায়ের নাম, সেখানে এখন কি বলিতে লজ্জা করে ।

কিন্তু বাঁহারা এই মন্দের জন্য ভালর নিন্দা করেন তাহাঁরাও জ্ঞাত । বাঁহারা তীর্থস্থানের পাপ দেখিয়া হিন্দুধর্মের নিন্দা করেন, বা আধুনিক গোঁড়া ব্রাহ্মদলের আচরণ দেখিয়া প্রকৃত ধর্মের উচ্ছেদ সাধন করিতে প্রস্তুত, তাহাদিগকে আমরা কি বলিয়া ডাকিব ? এই জন্মাই প্রেততত্ত্ব-মধ্যে এত ভণ্ডামি দেখিয়াও সকলেই যে এইরূপ ভণ্ড তাহা আমরা বলিতেছি না । রবার্ট হেরার *, সারজর্জ. ফ্রান্স, জে. ডেভিস প্রভৃতি মহাত্মারা যে সজ্ঞানে সাধারণকে বঞ্চনা করিবেন ইহা আমরা অশ্রদ্ধেও বিশ্বাস করি না ।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, প্রেততত্ত্ববাদীদিগের মূলমন্ত্র দেহশূন্য আত্মার সহিত কথোপকথন । এই তত্ত্ব-বিচারের প্রারম্ভেই ইউনাইটেড্‌ফোর্টে এক ভয়ানক আন্দোলন হয় । যখন মেসমার (Mesmer) সাহেব প্রথমতঃ ভৌতিক শক্তির দ্বারা মানুষকে অজ্ঞান করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন, সেই সময়ের আন্দোলনও প্রায় এইরূপ হইয়াছিল ; প্রথমে মেসমারকে কত লোকে কত কথা বলিয়াছিল, কত পরিহাস করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার উদ্ভাবিত মত এখন পর্য্যন্তও সমান অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে † । প্রেততত্ত্ববাদীরা বলেন দেখ

* Robert Hare M D. Professor of Chemistry in the University of Pennsylvania-

† সুবিখ্যাত ফ্রান্স সাহেব একটি

আমাদিগের মত প্রথমে ইউনাইটেড্‌ফোর্টে উদ্ভাবিত হয় ; তখন লোকে শুনিলে হাসিত, পরিহাস করিত । এখন সেইমত বিলাতে ইন্ডেন্ট হইয়াছে । মাল সাচ্চা না হইলে কি বিলাতে যার * এক দিন মেসমেরিসমের মত আমাদিগের প্রেততত্ত্ব ও পুঞ্জিত হইবে ।

যখন কেহ কোন ঘটনা দেখিয়া তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়, তখন প্রধানতঃ দেখা উচিত ঘটনাটি সত্য কি নী ? মৃত দার্শনিক হ্যামিলটন সাহেব † বলিয়াছেন যে, এক বার শিক্ষিতদিগের মধ্যে মহা ঝোলযোগ বাধিয়াছিল । জীবিত মৎস্য অপেক্ষা মৃত মৎস্য ওজনে ভারী কেন ? এই প্রশ্ন লইয়া নানা মূর্খের নানা রূপ মত প্রকাশিত হইল । কিন্তু কোন উত্তরই সন্তোষজনক হইল না । শেষে একজন সাহেব ঘটনাটি সত্য কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখেন সর্বমিথ্যা । মেসমেরিসম্ যখন আবিষ্কৃত হইল, তখন পণ্ডিত মণ্ডলী ঘটনা সত্য কিনা প্রথমতঃ পরীক্ষা সত্যার সভাপতি হইয়া মেসমেরিসম (Mesmerism) সম্বন্ধে কতকগুলি স্মরণ উপদেশ দেন । বাস্তব্য ভয়ে সেগুলি এখানে উদ্ধৃত হইল না । ত্রুটব্য The Indian Daily News —27th January-1877—Extracts.

* ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পরে ইউনাইটেড্‌ফোর্টে হইতে প্রেততত্ত্ব বিলাতে যার ।

† Lectures on metaphysics.

আরম্ভ করেন, যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, ঘটনা সম্বন্ধে আর কোন সম্ভব হইতে পারে না; তখন নানা মুনির নামারূপ ব্যাখ্যা প্রকাশ। পরিশেষে সুবিখ্যাত ব্রেড্ (Mr. Braid) সাহেবের ব্যাখ্যাই ইহার মূল কারণ প্রকাশ করিয়া দেয়।

প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনেকগুলি ঘটনা পরীক্ষিত হইয়াছে। কতকগুলি পরীক্ষার তীক্ষ্ণত্ব সহ্য করিতে পারে নাই। যেগুলি সহ্য করিয়াছে তাহার অনেকরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেততত্ত্ববা-

দীদিগের ব্যাখ্যা এই যে, সে সকল প্রেতের কার্য। আমরা অন্যান্য ব্যাখ্যাগুলির সারবত্তা ভবিষ্যতে বিবেচনা করিব। কিন্তু তাহার পূর্বে ঘটনাগুলি পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত। তাঁহারা দেখুন ঘটনাগুলি ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত, না কিন্তু মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা মাত্র। আমরা এপ্রবন্ধ শেষ করিলাম। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা বাহা বলিব, তাহা এই উত্তম সম্প্রদায়কেই বুঝাইবে। প্রবন্ধকদিগের সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই।

শ্রীম,লা,শেঠ।

সংক্ষিপ্তসমালোচন

১। “ ভারত গান। ভারতের প্রাচীন এবং বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধীয় এবং স্বদেশানুরাগোদ্দীপক একশত গীত। জি.রাজকুমার রায় বিরচিত। ”—এই গীতমালা একটি উপাদেয় বস্তু। ইহাতে যে সকল গীত নিবন্ধ হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই প্রশংসার্হ;—রচনা প্রাঞ্জল, শব্দবিন্যাস মধুর এবং সমস্তই অক্লেশ-রচিত। কিন্তু হৃৎস্থের বিষয় এই যে, এই গীতগুলি অন্যান্য অংশে এইরূপ প্রশংসনীয় হইয়াও, উদ্দীপনার অভাবে প্রাণশূন্য হইয়াছে। প্রেমুকার যদি কোন অপরিচিতনামা রুতন ব্যক্তি হইতেন, তাহা হইলে আমরা একথা বলিতাম না। তাদৃশ স্থলে শুধু প্রশংসা দ্বারাই আমরা প্রেমুকারের অভিবাদন করিতাম। কিন্তু আমাদের বহুদিনের পরি-

চিত স্মৃদ্ধ বাবু রাজকুমার রায় যখন এই প্রেমুকার রচয়িতা, তখন ন্যায়ের অনুরোধে এবং বোধ হয় প্রণয়েরও অনুরোধে, তাঁহাকে ইহা জ্ঞানান আবশ্যিক যে, ভারত-গানের কোথাও প্রকৃত উদ্দীপনার স্ফুর্তি নাই, এবং উদ্দীপনার অভাবে ইহার মাধুর্য্যে মদিরা নাই, ইহার বিলাপে বেদনা নাই, এবং ইহার ললিতপদাবলীতে প্রায় অধিকাংশস্থলেই কবিতার প্রকৃত প্রাণনাই।

বাগ্মী সকল সময়েই উদ্দীপনার উপাসক। কারণ যে বক্তৃতার উদ্দীপনা নাই, তাহা যার পর নাই অপ্রতিমধুর হইলেও প্রাণের মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। কবি সকল সময়ে উদ্দীপনার উপাসনা করেন না। সাধারণতঃ, সৌন্দর্য্যই তাঁহার আরাধা বস্তু, এবং স্বকীয় চিত্ততু-

লিকার সৌন্দর্য কলাইতে পারিলেই তিনি
আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। কিন্তু
যে সময়ে কবি, কোন বিষয়ের বর্ণনা ক-
রিতে না যাইয়া, জাতীয়জন্মের নির্বাণো-
দ্ভুত বহ্নিকে পুনরুদ্দীপন করিতে অভিলাষী
হন, তখন উদ্দীপনাই তাঁহার উপায় দে-
বতা। রাজকুমার বাবুর ভারতগানে উদ্দী-
পনার মোহময়ী মদিরা আছে কি না,
ভাষা পাঠকবর্গ নিম্নোক্ত গীতগুলি নি-
বিস্তৃতিতে পাঠ করিলেই অনুভব করিতে
সমর্থ হইবেন।

আড়ানা-বাহার—রূপক।

এখনো কি হেতু, শশী! মুখভরা মুহু হাসি
নিরখি তোমার, বল, কি এর কারণ ?
সপ্ত সত বর্ষ আগে তুমি যে উজ্জ্বল রাগে
রক্তিতে ভারত-কায় আচ্ছা কি তেমন ?
কথারখ, মাথাখাও, চিরতরে ফিরেবাও,
কাঁদিবার দিনেহাস, ছি ছি একেমন ?
কুকরেখা কিছু নয়, কলকের পরিচয়
এহাসে প্রকাশ হ'ল;—হেসনা এমম। ৬

সারঙ্গ—একতারা।

হে দিবাকর ! সর সর সর,
জলদে লুকাও নিজ কলেবর,
দিবা দ্বিপ্রহরে ভারত কাতর,
অধীর পরাগ, আহুল কার ;
একে আঁধি-বারি বর বর করে,
তাছে দেহে শ্বেদ করে তব করে,
বল দেখি, রবি ! কীপ কলেবরে
কেমনে ভারত বাঁচিবে, হার।

কণ্ঠ শুকা'য়েছে দাক্ষণ পিরাসে,
দেহ শুকা'য়েছে চিত্তার হতশে,
ছদি শুকা'য়েছে শোকের নিখাসে,
আশা শুকা'য়েছে নিরাশা-বায় ;
এ হেন বিপদে—এ হেন দশায়,
কেন তুমি, ভানু ! আকাশের গায় ?
সর সর সর ;—মর-মর-প্রায়
ভারত জননী কাতরে চায়। ১৬

ভৈরব—আড়চৌতাল।

যা উড়ে পাখি রে ! ডেক না, ডেক না
ও মধুর বোলে তমালে ;
জাগিবে ভারত, জাগিবে হত শোক,
ভাসিবে আঁধি জলজালে।
হৃথের প্রভাতে সুখের সঙ্গীত
কেন তোর গল, বল, ঢালে ;—
এবে রে তোমার সুধার সুধার
বিষহার ভারত-ভালে। ১১

রামকেলী—স্বখরিতালী (টিয়া তেতারা)।

অরি কুলকুলরাগি মধুমুখি কমলিনি !
ফুটিয়ে হেসনা আর সরসে রে সুহাসিনি।
তুমি যে সরসী-জলে হাসি'ছ বদন তুলে,
ও যে ভারতের অক্ষয়, উথলে দিম যামিনী।
মম অনুরোধে আজ, কর, কুল। এই কাজ,—
হাসির বদলে কাঁদ, মুদিরা মরম ;—
ভারতাক্ষসরসীতে, তোমার সুখাক্ষ ভা'তে
কেবল মিলিতে থাক ;—কাঁদ থাকি, রে
ননিনি ! ৪
এই শেবোক্ত গীত দুটি সুন্দর ও মূল্যবান

কবিতা। প্রথমোক্ত দুইটি কাব্যংশে নিত্যন্ত সিন্ধবীর নহে। কিন্তু ইহার একটিতেও কি উদ্দীপনার লেশমাত্র অনুভূত হয়? উদ্দীপনা অগ্নিস্কৃষ্ণিক, উহা জ্বলের মধু নহে;—উদ্দীপনা মূর্ত্তিবতী তাড়িত-শক্তি, উহা আবেশময়ী জ্যোৎস্বা নহে। যদি ভারতসংগীতেও সেই উদ্দীপনা পরিস্কৃষ্ট না হইল, তবে উহা আর কিসে স্কৃষ্টি লাভ করিবে? ভারতমাতার দুঃখ সমুজ্জের ন্যায় গভীর। সে গভীর দুঃখগীতি সমুজ্জের শোকোন্মত্ত তরঙ্গমালার ন্যায় গভীর নিঃশ্বনে বিলাপ করিবে;—সমুজ্জতটবাছি নৈশাসমীরণের ন্যায় অলৌকিক নিঃশ্বনে রোদন কবিত্তে রহিবে। নহিলে, তাহা ভারতগান নহে।

জাতীয় উদ্দীপনার এইরূপ সংগীত কোন দেশেই সকল সময়ে ফোটে না; বিরহের গীত, মানের গীত অথবা তরল দুঃখের তরল গীতের ন্যায়, সেই সকল অন্তর্ভেদি অপূর্ব গীত যখন তখন এবং যেখানে সেখানেই বাহির হয় না। কিন্তু তাদৃশ জাতীয় গীত, কবিশি রাষ্ট্রবিপ্লবের মার্শেলিস নামক গীতের ন্যায়, মনুষ্য কণ্ঠ হইতে যখনই নিঃসৃত হয়, তখনই তাহা হৃদয়ের পর হৃদয়ে আহত ও প্রতি-হত হইয়া, এমনত বহুশিখার ন্যায় সর্বত্র প্রসারিত হইয়া পড়ে, এবং বাহার অতি-পথে প্রবিক্ত হয়, তাহাকেই উদ্দীপিত করিয়া তুলে।

২। “কবিত্ব। মাসিক পত্রিকা।

পাইক পাড়া মর্শারি হইতে প্রকাশিত।” আমরা দুর্ভাগ্য বশতঃ এই পত্রিকা খানির প্রথম সংখ্যা দেখিতে পাই নাই। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় সংখ্যা যাত্র পড়িয়াই আমরা নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। আমাদিগের বিশেষণ ইহার কলেবর পরিবর্তিত হওয়া কর্তব্য, এবং বঙ্গদেশের সর্বত্রই এইরূপ প্রয়োজনোপযোগী সাময়িক পত্রিকার আদর হওয়া উচিত।

৩। “তত্ত্বকোমুদী, পাক্ষিক পত্রিকা। কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কার্যালয় হইতে প্রকাশিত।” আমরা এই পত্রের মতামত লইয়া আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু ইহার বা-জালা এমনই বিশুদ্ধ ও মধুর, শ্রাঞ্জল ও প্রীতিপ্রদ যে, আমরা সাধারণ সাহিত্য সমাজের নিকট ইহার যশোগান না করিয়া নিরন্ত থাকিতে পারিলাম না। শুনিয়াছি, বাবু শিবনাথ শাস্ত্রি প্রভৃতি কতিপয় সুনিপুণ লেখকের সহিত এই পত্রিকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যদি সেই সম্পর্ক স্থায়ী হয়, তাহা হইলে দিন দিন ইহার অধিকতর উন্নতি হইবে। তাদৃশ স্নকতিসম্পন্ন, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ইহার সম্পাদকতায় নিযুক্ত থাকিলে, ধর্ম-বিষয়ক সাম্প্রদায়িক পত্রিকাও সুপাঠ্য হইতে পারে।

৪। “দৈব-লতা। ঢাকা, হৃদময়্যে মুদ্রিত”। এই গ্রন্থে চরিত্র, কর্তব্য, রাজ-ভক্তি, ভ্যাগস্বীকার ও মধ্যমভূতি প্রভৃতি

বিবিধ বিষয়ের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ
নিবেশিত হইয়াছে। রচনা এইরূপ,—

“আরের আ এবং ময়েতে ব্রহ্ম ইকারে মি,
এই কি আমি?”—“বিশ্বাস-যানে, চিন্তার
অতীত, বুদ্ধিরঅগ্রাহ্য, কল্পনার অগোচর
ব্যাপার ইহলোকে পরলোকে আভ্যাগত্যা
করিতে লাগিল।”—পুনশ্চ, “সহানুভূতি
বিশ্বাসের ক্ষেত্রে চড়িয়া লোক হইতে লোকা-
ন্তরে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। বিশ্বাসের
যান না চলিলে সহানুভূতিও চলে না।”—

শ্রোতৃকারের মত ও উপদেশ এইরূপ,—

“এই যে আমরা ইংরেজগবর্ণমেন্টের
শাসনাধীনে অবস্থান করিতেছি, ইহাই আ-
মাদিগের সার্বভৌমিক উন্নতির প্রচুর নি-
দান। এতৎপ্রভাবে যদি আমাদের অ-
ন্তরে রাজভক্তির কুমুদনা কুটে, তবে আ-
মাদিগের কোন্ নরকে যে বসতি হইবে,
তাঁহা নরকাধিপই অবগত রহিয়াছেন।
আমরা যে এখনও তাঁহা জানি না, ইহাই
আমাদিগের তৃপ্তির হেতু।”

এইরূপ শ্রোতৃ, শ্রোতৃর এইরূপ রচনা এবং
রচনার এইরূপ ভাবাদি সম্বন্ধে সমালোচ-
কের অনেক কথা বক্তব্য থাকিতে পারে।
বক্তব্য কিছু না থাকুক, অন্ততঃ ‘আভ্যাগত্যা’
শ্রোতৃ শব্দের অর্থ কি,—এবং শ্রোতৃকার
কাহাকে নরকাধিপ বলেন, আর সেই নর-
কাধিপই বা কিরূপে ‘অবগত রহিয়াছেন’
ইত্যাদি বিষয়ে শ্রোতৃকারের নিকট উপদেশ

লইবারও প্ররতি করিতে পারে। কিন্তু
পরিণামদর্শী শ্রোতৃকার শ্রোতৃকার তাহারও পথ
রাখেন নাই। তিনি বিজ্ঞাপনে প্রথমেই
লিখিয়া রাখিয়াছেন যে,

“যে সমুদয় রচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট
হইয়াছে, তাহা অক্ষপোলকম্পিত বলিয়া
শ্রোতৃকার অনুভব করেন নাই। তাঁহার
দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, ঐশ্বরিক প্রক্রিয়া ভিন্ন
এমন রচনার উৎপত্তি হইতে পারিত না।”

এই কথাই উপর আর কথা নাই। য-
হমদ যেমন কোরাণকে ঐশ্বরিক প্রক্রিয়ার
রচনা বলিয়াছেন, শ্রোতৃকারও যখন তাঁহার
এই শ্রোতৃখানিকে সেইরূপ বলিয়া নির্দেশ
করিয়াছেন, তখন কে এমন সাহসী, কে
এমন উদ্ধত, কে এমন ধর্মভরশূন্য,—এবং
হার! কেই বা চক্ষুঃস্বপ্নে এইরূপ অন্ধ যে,
এবজুত অলৌকিক বস্তুর সমালোচনা ক-
রিতে গিয়া আপনা হইতে বিপদে পড়িবে?
কিন্তু তথাপি এই একটিমাত্র কথা আমা-
দিগের বক্তব্য যে, শ্রোতৃর নামটি সর্ব্বাৎ-
শেই সাহিত্যবিষয়ক শ্রোতৃর বিরুদ্ধ হই-
য়াছে। ইহা হারা লৌকিক সাহিত্য পড়িয়া
তাঁহা শিক্ষা করেন, তাঁহাদিগের বিবেচ-
নার দৈবলতার পরিবর্তে ইহার নাম দি-
বালতা হওরা উচিত ছিল। কারণ, যদিও
দৈবশব্দের এক অর্থ ‘দেবতাসম্বন্ধী’—
কিন্তু ইহার আর এক অর্থ উৎপাত, এবং
দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই অর্থই অধিকতর প্রচলিত।

অগ্নি।

কিতাপ্তেজমকদ্ব্যোম—অর্থাৎ মৃত্তিকা জল তেজ অগ্নি এবং আকাশ, এই কএকটি মূল বা অমিশ্র পদার্থ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। রসায়ণ শাস্ত্রের উন্নতির পূর্বে এ মহাত্মম কেবল যে হিন্দুদিগের ছিল তাহা নহে। হিন্দুরা ব্রহ্মার পূজা করেন, পারশিকেরা ও তাহারই উপাশক, গ্রিক বা রোমকেরাও অগ্নির পূজা করিতেন। পূর্বের লোকের বিশ্বাস ছিল এই ত্রয়োমুক পঞ্চভূত, ঈশ্বরের অবতার, এবং মুক্তিমান্ দেবতা। সম্ভবতঃ এই বিশ্বাস বা ইহাদিগের প্রবল স্বাভাবিক শক্তির উপর লক্ষ করিয়া আধুনিক মানব-গণের পূর্ব পুরুষগণ ইহাদিগের প্রতি মহা শ্রদ্ধা করিতেন। আমাদিগের কথা দূরে থাকুক, পেরিপেট্রমিয়ন * দিগের স্বক্ষম বুদ্ধিতেও ইহার আদ্যম, অবিনশ্বর অমিশ্র এবং মূল পদার্থ বলিয়া গণনা হইয়াছিল। এমন কি মিলটন্ পর্য্যন্তও ইহাদিগের মৌলিকত্ব এবং অমিশ্র স্বীকার করিতেন। পাঠকগণ ‘প্যারাডাইসলফের’ বিভিন্ন অধ্যায়ের ২৩৪ শ্লোকটি পাঠ করিয়া দেখিবেন। মেল সাহেবের অনুবাদিত, কোরাণের ২য় খণ্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠায়

* অরিস্টোটেল এবং তাঁহার অনু-
বর্তীগণ।

লিখিত আছে—“অবিখ্যাসীরা জানেনা, যে পৃথিবী কেবল একটি পরমাণুপুঞ্জ মাত্র, কঠিন পদার্থ সর্ব ব্যাপ্ত অনন্ত জলরাশীর এক পার্শ্বে পড়িয়া ছিল, এবং সেই জল দ্বারা স্বাক্ষাদি ও ভূচর ক্ষেচর প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীর মজ্জা আমি করিয়াছি”—ফলতঃ এ মহাত্মমের হস্ত হইতে মুসলমান দেবতা মহম্মদের ও নিকৃতি ছিলনা। কিন্তু কালের প্রবল তরঙ্গাতিঘাতে ক্রমেই এমকল কু-সংস্কার তিরোহিত হইতেছে। জল যে গর্ভ করিতেন আমি আদি, আমি অমিশ্র, অমর, এবং স্বাধীন, হাইড্রয়ান, এবং অকুসিযান ইহার জন্মদাতা বলিয়া আবিষ্কৃত হওয়াতে সে গর্ভ চূর্ণ হইয়াছে। যাহাহউক জল, বায়ু, পৃথিবী প্রভৃতি মিশ্র না হইলেও প্রকৃতিভূত পদার্থ। বুঝিলাম, জল তবে পদার্থ, স্বীকার করিলাম মৃত্তিকাও তবে পদার্থ, এবং বায়ুও বটে, কিন্তু অগ্নি কি? অগ্নির রহস্য ভেদ বহুকাল পর্য্যন্ত হয় নাই, আজিও এসম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত, তাহাতেই আমরা বলি অগ্নি তবে কি? যে অগ্নি ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেও জল মৃত্তিকাতির ন্যায় একটি পদার্থ ছিল,—এখন নাকি আর তাহা মূলে পদার্থই নয়। ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রজগণ বলেন, যে কোন প্রকারের অগ্নিই হউক না কেন, (স্বাভাবিক

কৃত্রিম, ঘর্ষিত, বা উত্তাপজ) উহা নিরতিশয় সূক্ষ্ম ভরল, বিক্রমশীল, সদা-গতিবান্ অত্যন্ত প্রসারণক্ষম, অতীব স্থিতিস্থাপক, পদার্থ মাত্রকেই সংকোচন বা বিস্তার করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন, সর্বশরীরে প্রবেশক্ষম, এবং তাহাদিগকে রূপান্তর করিবার গুণসম্পন্ন, ও তাহাদিগের যোগবিধানক্ষম, এবং তাহার পর প্রদর্শিত সমস্তগুণপরিহার ক্ষম। বাহ্য বস্তু সমূহের সহিত অগ্নির এই স্বভাবের নাম (Stahl) বা সাহেব (Phlogiston) নিত্যগ্নি রাখিয়াছেন, অপর পশ্চিমের (Fixed fire) বস্তু অগ্নি কহেন। বা সাহেবের মত এই, মনে কর একখানী চকমকী পাথর আছে উহাতে লৌহঘারা আঘাত করিলে অগ্নি নির্গত হয়, ঐ অগ্নি কোথা হইতে আসিল, যদি বল, আঘাতে পরমাণুর সংঘাত হইয়াছে তাহাতেই তেজকণার উৎপত্তি হইয়াছে। বা সাহেব বলিবেন তবে স্বীকার করিতে হইবে চকমকী জ্বলনীয় পদার্থ, তবে যে উহা জ্বলিয়া উঠে না, ইহার কারণ কি? সুতরাং উহা গৌণ অগ্নি, অর্থাৎ উহার পরমাণুসমূহ অগ্নিপূরিত। বা সাহেবের সমকালে এক দলে বলিতেন, উহা অগ্নির পরমাণু এবং এক প্রকার কাঁচ জাতীয় মৃত্তিকায় সংগঠিত, অপর দল বলিতেন উহা শুষ্ক অগ্নির অণুতে নির্মিত। আধুনিক পশ্চিমের বলেন যে উহা অগ্নি উৎপাদন করিবার আপেক্ষিক কারণ,—পরমাণুতে পরমাণুতে সংঘাত

লাগিয়া ভয়ানক বেগে যখন সেই সমস্ত পরমাণুর গতি হয়, সেই গতিজনিত উত্তাপই অগ্নি। যতক্ষণ পরমাণুগণ স্থির না হইবে ততক্ষণ তাহার কার্য প্রকাশ হইতে থাকিবে, সুতরাং যে পরিমাণ আঘাতে চকমকী হইতে অগ্নি নির্গত হয়, উহাতে উহার সমস্ত পরমাণুর ভুমূল গতি হয় না। ঐ চকমকীর একদেশে কর্ণ যতটুকু হয়, ক্রিয়া ততটুকু প্রমাণে প্রকাশ পায়। অল্প বা অধিক পরিমাণে সকল বস্তুতেই জ্বলন কার্য প্রকাশমান হইয়া থাকে। উহা তদ্ বস্তুর রাসায়নিক সংযোগের বৈলক্ষণ্য প্রযুক্তই ঘটিয়া থাকে।

বাহ্য হউক, বা সাহেবের (Phlogiston) কি তাহাই আগর বুঝাইবার চেষ্টা করিব। সকল বস্তুরই অধিক কি অল্প পরিমাণ অগ্নি উৎপাদন বা অগ্নি ধারণ করিবার স্বভাব আছে বস্তুর যে গুণ থাকিতে ঐরূপ হয় তাহারই নাম (Phlogiston) বাঙ্গলায় জ্বলনীয় কিম্বা রাসায়নিক রস বলিলেও উহার প্রকৃত অর্থ বোধ হয় না। বাহ্য হউক উহাকে আরো ভাল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। তীক্ষ্ণধার ভরল (Fluid) ব্যতীত কিছুই গলিত হইতে পারে না। কিন্তু স্বভাবে অগ্নি অপেক্ষায় জ্ববকারী আর কিছুই নাই। অতএব অগ্নিই জ্বব-বীজ, বা জ্বব-জীবন। জল যে জ্ববগুণসম্পন্ন, এবং অন্যকেও জ্বব করিতে পারে তাহাও কেবল মাত্র অগ্নি হইতে। অগ্নি ক্রিয়ায় ঐ

রূপ ফল যাহাতেই স্থিতি করে তাহাই Phlogiston বন্ধ অগ্নি। পারদ স্বর্ণের সহিত মিলিতে, জল লবণকে গুলিতে যাহা, ত্রবকে জ্বলনশীল করিবার জন্য ঐ সাহেবের Phlogiston ও তাহাই। ইহার কার্য গন্ধক, তৈল, এবং পাথরিয়ী কয়লাতে অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়, ত্তরায় উহারাই ঐ সাহেবের মতে অগ্নি-ধারণক। তবেই তাহার মতে, অগ্নি স্থায়ী, নিত্য, এবং পদার্থহীনবাসী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

(Boerhave) বোয়েরহেভে সাহেব অগ্নির দুইপ্রকার প্রকার-ভেদ করেন। একটি মূল অগ্নি, অর্থাৎ শুদ্ধ অগ্নি, এবং অনপেক্ষিক, অপারসী আপেক্ষিকী, অর্থাৎ অন্য বস্তুর যোগে কার্য প্রকাশ করে। তাঁহার মতে উত্তাপের মুখ্য কারণই মূল্যগ্নি। উত্তাপ অগ্নি হইতে বিভেদ্য নহে। উত্তাপের পরিমাণ, অগ্নির পরিমাণ বিশেষ। যাহা অগ্নি তাহাই উত্তাপ। কঠিন বস্তুর অনুপ্রসারণ, এবং ত্রব বস্তুর অনুসংকোচন, ক্রিয়া মূল্যগ্নির দ্বিতীয় ফল। একখানি লৌহ উত্তপ্ত হইলে, ইহার বিস্তৃতি বর্দ্ধিত হয়, এবং উত্তাপ অধিকপরিমাণে দিলে পুনরায় আরো বর্দ্ধিত হয়, আবার স্নিগ্ধ হইলে, সংকুচিত হয়। এবং পূর্বে যত বড় ছিল তাহাই হয়। স্বর্ণকে গলাইলে পূর্বে হইতে অধিক স্থান গ্রহণ করে। একটি সৰু নলের ভিতরে পারদ রাখিয়া উত্তাপ দিলে, পূর্বে যতটুকু

স্থান লইয়া ছিল, তাহার ত্রিশত ঞ্চ অধিক উচ্ছে উঠিবে।

বস্তুর এরূপ বিস্তৃতির কারণ বোয়েরহেভে সাহেবই আবিষ্কার করেন। প্রথমতঃ যথা। ত্রব ত্রব্য যতটুকু সময়ে, যে পরিমাণ অগ্নিতে যত অধিক বিস্তৃতি লাভ করিবে, কঠিন ত্রব্য, ঠিক সেই পরিমাণ সময়ে, এবং সেই পরিমাণ অগ্নিতে সেরূপ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিবে না। এই নিয়মের অন্যথা হইলে তাপমাপক যন্ত্র কার্যকারী হইতে পারিত না, কেননা, তাহা হইলে যে সময়ে এবং যে উত্তাপে পারদ বিস্তৃতি লাভ করিত, নলের অভ্যন্তরস্থ রন্ধু ও তবে ঠিক ঐ সময়ে এবং ঐ উত্তাপে আপনি বিস্তৃত হইত। দ্বিতীয়তঃ। ত্রব ত্রব্য যত লঘু হইবে, অগ্নি তাপে উহার তত বিস্তার হইবে। তিনি বলেন, বায়ুর ন্যায় লঘু বস্তু বিয়ল, অথচ উহার ন্যায় আর কোন ত্রব্য অধিক ছড়াইয়া পড়েন। বায়ুর পরেই ঐ ঞ্চ স্থাসার বা স্পিরিট্‌অব্‌ও-রাইনের অধিক। তিনি আরো বলেন, প্রকৃতিতে যত প্রকার শক্তি এবং গতির উৎপত্তি হয়, অগ্নিই তাহার কারণ। তাহা হইতে অগ্নিকে স্বতন্ত্র করিয়া লইলে সমস্ত যত পদার্থ অচল হইয়া পড়িয়া থাকিত। এবং অগ্নির অভাবে, জল, তৈল, স্থাসার জীব-দেহ, উদ্ভিদ সমস্তই কঠিন, জীবনহীন এবং অকর্মণ্য হইয়া যাইত। যদি অসাধারণ শীতপ্রবাহে, জগতের সমস্ত অগ্নি, বিনাশ হইয়া যায় তাহা হইলে, এই জড়-

জগৎ স্বর্ণ ও হিরকের ন্যায় মহা কাঠিগাময় একটি স্তম্ভাকার বস্তু হইয়া পড়িয়া থাকিবে । এবং অগ্নিপ্রয়োগে পুনরায় উহা প্রকৃতিস্থ হইবে ।

বোনেরহেভের কথিত, মূল্যমি সংরক্ষণ বা গ্রহণ করিতে হইলে, সে আঙণের আকার বা ব্যাস যোগাইতে হয় না । যদি কিয়ৎপরিমাণ কোন সৌগন্ধিক তৈলসার, শূন্য হইতে যবক্ষারিক সূর্য্য চালা যায়, তৎক্ষণাৎ (উহা হইতে ভয়ানক অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে । তিনি বলেন কতক গুলিন উপায়ে মূল অগ্নির ফল জানা যাইতে পারে । যথা সকলেই জানে, চক্ষুসকী ও লৌহের স্বর্ণণে, অগ্নি উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ এক দ্রব্যে অন্য দ্রব্য কর্তৃক বিষম সংঘাত পাইলেই তাহা হইতে অগ্নি উঠিবে, এই জন্য ব্রহ্ম টানিলে নবনীত তাহা হইতে স্বতন্ত্র হয় । ছুরি কি ক্ষুর সানাইবার সময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়,—এই সকল কারণ প্রদর্শন করিয়া তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন যে, অগ্নি মৌলিক পদার্থ । নতুবা বাহাতে অগ্নি ছিল না তাহা হইতে অগ্নি কখনই জাত হইবার সম্ভাবনা নহে ।

যদি অভ্যস্ত শীতের দিনে একখানি স্বর্ণখালী আর একখানি স্বর্ণখালীর সহিত বলপূর্ব্বক ঘর্ষণ করা যায়, তবে ঘর্ষণে স্বর্ণণে মহাউত্তপ্ত হইয়া রক্তবর্ণ এবং পরে গলিবার উপক্রম হইলেও কিঞ্চিৎস্মাত্ম্য ও তাহার গুরুত্বের ধংশ হইবে না, কেবল আয়তনে হ্রাস হইবে, বা ক্ষীণ হইবে, ই-

হাতে এই উপলব্ধি হয় যে, সংঘর্ষণে স্বর্ণের একটিমাত্র অণুও অমিক্রমে পরিণত বা পরিবর্তিত হয় না ।—কেন না অগ্নি উহাতে পূর্ব্ব হইতেই আছে । ঘর্ষণ মর্দনের ফলে এইমাত্র হয় যে, বাহা পূর্ব্ব হইতে স্থিতি করিতেছে তাহারই কিয়দংশ সংগ্রহ করিতে বা আনিতে পারা যায়, উহার ফল এরূপ নহে যে, উহা হইতে অগ্নি জন্মাইতে বা করিতে পারা যায় । তবে, আমরা এই পর্য্যন্ত করি যে অপ্রজ্বলিতকে জ্বালিত করি, এবং বস্তুরূপ হইতে সংগ্রহ করিয়া কোন সন্ধীর্ণস্থানে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য স্থাপন করি ।

এতদ্ব্যতীত বোনেরহেভে সাহেব আরো বলেন যে, যেরূপ নিত্যোগ্নি অনন্তকাল হইতে অহরহ সর্ব্বদ্রব্যে দ্রব্যে স্থিতি করিতেছে উহা মৃত্তিকার অভ্যন্তরেও তদনুরূপ অবস্থায় বিরাজিত আছে । তিনি বলেন ৪০ বা ৫০ ফিট মৃত্তিকার নিম্নদেশে এত উষ্ণ যে তথায় বরফ থাকিতে পারে না, তাহা হইতে আরো গভীরতর প্রদেশে এতাদিক উষ্ণ যে তথায় ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারা যায় না । মৃত্তিকার গভীরতম প্রদেশের এই উষ্ণ ভাব দৃষ্টে তিনি বলেন, যে ভূগর্ভে আর একটি অগ্নির আকার বা সূর্য্য আছে । তাহাতেই, বাহারী ভূগর্ভে বা পৃষ্ঠে জগৎ তাহাদের জীবন রক্ষা এবং গতি বিধান করিতেছে এমন কি ভূকেন্দ্রে কেবল অগ্নি ব্যতীত আর কিছুই নাই । এবং এই মহা অনল, অনন্ত কাল

হইতে বিরাজ করিতেছে। তিনি ইহাও বলেন, ভূচর, খেচর, জলচর, প্রভৃতির ন্যায় অগ্নিচর জীব পর্যন্ত আছে। বহুকাল পোষিত রুহৎ অনল কুণ্ড, অত্যাৎকৃষ্ট আতশ পাথর দ্বারা পরীক্ষা করিলে এই সকল জীব দেখা যায়, এই সকল অনলবাসী জীবের নাম (Salamander) সালামাণ্ডর। এখন দেখা যাইবে বোঁএরছেতে সাহেবের যুক্তি নিয়ম কতদূর সঙ্গত।

তাহার পরবর্তী রসায়নবিদেরা আশ্চর্য কার্যের চারিটি তাপাংশ পরিমাণ করিয়াছেন। প্রথমটি মানবশরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতার তুল্য, বা যে পরিমাণ উষ্ণত্রে কপোত ডিম্ব হইতে ছানা বাহির হয়। ডিম্বের সহিত একটি তাপ পরিমাপক যন্ত্র রাখিয়া তদুপরি একটি কপোতিনীকে বসাইয়া এই তাপাংশ পরিমিত হইয়াছে। কোন কোন রাসায়নিক আবার এই পরিমাণ উত্তপ্ত দায়ক আণ্ডন, কপোতিনীর পরিবর্তে ডিম্বের চতুর্দিকে রাখিয়া তদ্বারা ডিম ফুটাইয়াছেন। অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় সূর্য্য কীরণ শরীরে লাগিলে জ্বালা করে, বা যে পরিমাণ উত্তাপে চর্মে বেদনা হয়, অথবা যে পরিমাণ উত্তাপে চর্মে ফোঁস পড়ে, কিন্তু তদ্বারা শরীরের কোন অংশের স্থংশ বা অভাব হয় না, ইহাই তাপের দ্বিতীয় পরিমাণ। এই পরিমাণ তাপেই মনুষ্যরক্তে লেগ্নাবৎ এক পদার্থ (Serum) জন্মে এবং ডিম্বের—স্রবীভূত ধবলাংশ কঠিন হয়, সময়ে সময়ে এই পরিমাণ উ-

ত্তাপেই আবার ভয়ানক গাঁত্র দাহ হইতে পারে, ইহাও নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে পরিমাণ উত্তাপে জল অতিশয় গরম হয়, ইহাই উত্তাপের তৃতীয় পরিমাণ। তাহার বিবেচনা করেন উত্তাপের এই পরিমাণই সম্পূর্ণ অটল। কেন না, জল যত উত্তাপ সহিতে পারে অর্থাৎ পূর্ণমাত্রার উত্তাপে উৎক-রিলে (পাত্তের মুখ খুলিয়া বাষ্প উঠিতে দিলেও) যে পরিমাণ তাহার উত্তাপ বৃদ্ধি হইবে, আর হাজার কাঠ দগ্ধ করিলে, কি আরো উত্তাপ দিলে কিছুতেই তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে না। এই সকল প্রাচীন রাসায়নিক বোধ হয় জানিতেন না যে, সমুদ্র সমতল স্থানের উষ্ণ জলের উত্তাপ, বৃষ্টি গিরির উপরিভাগের উত্তপ্ত জলের উত্তাপ হইতে হ্রাস-তর। আর পোপিন* সাহেব উত্তাপের পরিমাণ সম্বন্ধে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহার যুক্তিনিচয় ও সম্ভবতঃ সিদ্ধ বা পরীক্ষিত নহে। যে উত্তাপে ধাতু বা অন্য কোন জব্যাকে স্থংশ বা স্রবীভূত করিতে পারে, তাহা উত্তাপের চতুর্থ পরিমাণ।

উত্তাপের চতুর্থ পরিমাণ যে কিরূপে নিরূপিত হইল বুঝিতে পারা যায় না। তাপপরিমাপক যন্ত্র ও বোধ হয়, এত প্রচণ্ড উত্তাপে বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। যে সময়ে এই সকল মত প্রচলিত হয় বোধ

* প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে এই ভয়ে উক্ত ভ্রমাত্মক মত অপ্রকাশিত রহিল।

হয় ও এজউডের অমলপরিমাপক ব-
স্ত্রের (Wedge wood's Pyrometer)
সঙ্কন, বা সেবিষয়ের চিত্রা কাহারও মনে
উদয় হয় নাই, ইহাতেই অনুমিত হইতে
পারে যে উত্তাপের চতুর্থ পরিমাণ কেবল
মাত্র অনুমান এবং ধাতুর জেবদাবস্থা দে-
খিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। উষ্ণ জলের
উত্তাপ যেমন রুদ্ধ হইতে পারে না, কিন্তু
জীবীভূত ধাতুর উত্তাপ-পরিমাণ জানিবার
যদি তাহাদিগের কোন উপায় ছিল না
তবে ইহা তাঁহার কিরূপে জানিলেন?—
যাহাহউক প্রাচীন রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ মণ্ডলীর
মতে উত্তাপের এই শেষ পরিমাণ। কিন্তু
তাহার পরবর্তী বিজ্ঞানতত্ত্বজ্ঞসম্প্রদায়, আর
একটি পরিমাণ রুদ্ধ করিয়া, উত্তাপের প-
ঞ্চম পরিমাণ স্থির করিয়াছেন। এই উ-
ত্তাপে, স্বর্ণ হইতে ধূম এবং বাষ্প নির্গত
করায়। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে মন্সুর সিরা-
স্কেহোসেঙ (M. Tschirnhausen) প্র-
মাণ করিয়াছেন যে, স্বর্ণ উত্তাপে একে-
বারে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতে পারে।
তাহার পর এই অগ্নিময় দৃশ্যে, তাপক
(Caloric) নামে এক সূক্ষ্ম জব্য
লীলা করিতে থাকে। সিরাস্কেহোসেঙের
পরে তাপকই অগ্নিজনক বলিয়া পণ্ডিতগণ
কর্তৃক নির্ণীত হয়। যাহাতে, উত্তাপের
অনুভূতি প্রকাশমান করে, তাহারই নাম
“ তাপক ” রাখা হইয়াছিল। এই তা-
পকই বরফকে গলিত করে, জল উত্তপ্ত
করে এবং পৌষকে রক্তোত্তপ্ত করিয়া

তুলে। তবে এই উত্তাপক কি? ইহাকে
কি তবে পদার্থ বলিব, না কি বলিব?
উত্তাপসম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে তন্মধ্যে
কেবল দুইটি পরীক্ষিত এবং প্রমাণ্য ব-
লিয়া, অদ্যাপি মানবের বিশ্বাসক্ষেত্রে স-
জীব রহিয়াছে। একটি (Theory of
Emission) উৎক্ষেপণ অনুমান, দ্বিতীয়টি
(Theory of Undulation) গতিতরঙ্গ
অনুমান।

প্রথম অনুমান। উত্তাপের কারণ ভূতা-
য়ক, বায়ুর ন্যায় বা বায়ু হইতে উহা সূক্ষ্ম
তরল এক শরীর হইতে শরীরান্তরে গমন-
ক্ষম, একই উহার পরমাণু নিচের অবিশ্রান্ত
অবাকর্ষণাবস্থাপন্ন (In a state of repul-
sion) এই সূক্ষ্ম ধার তরল, সকল জব্যেরই
মূল পরমাণুর সহিত বাস করে, অথচ কা-
হারও সহিত প্রকৃতরূপে সংযুক্ত হয় না।
এই হিসাবে উত্তাপক নামক যে সূক্ষ্ম ধার
তরল, তাহা বস্তু, কিন্তু ভৌতিক উত্তাপক
প্রমাণতঃ দিন দিন জীর্ণাবস্থা পাইতেছে।
তাপকের পরিমাণ বা মূর্তি পরিমাপনীয়
নহে। এমন মহা সূক্ষ্ম কোন মন্ত্র অদ্যাপি
মানববুদ্ধিতে প্রস্তুত হয় নাই যাহাতে উ-
হার পরিমাণ করা যাইতে পারে বা উহার
স্বরূপ অবগত হইতে পারা যায়। আমাদি-
গের ক্ষমতায় বখন উহার পরিমাণ করি-
বার সাধ্য নাই তখন আমাদিগের ইহাও
বলা উচিত নহে, যে উহার গুণকই নাই।
কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এখন অনে-
কেই বলেন যে মূলেই উহার গুণসংগতি।

গতি-তরঙ্গ, বা দ্বিতীয় অনুমান এই যে—পদার্থের পরমাণুর উত্তাল তরঙ্গাভিধাতে,—উত্তাপ উপস্থিত করে। সে তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া, অত্যন্ত লঘু, এবং স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট একটি তরল পদার্থের সাহায্যে অন্য বস্তুর পরমাণুতে প্রবিষ্ট হয়, ইহাকেই ইথর (Ether) বলে। যেরূপ বায়ু মণ্ডলে শব্দতরঙ্গ ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়, সেইরূপ ইথর মণ্ডলে পরমাণু তরঙ্গোৎপাদিত উত্তাপও হৃত্য করিয়া বেড়ায়। যে অব্যবের পরমাণুতরঙ্গ তবে যত বিস্তারময় এবং যত দ্রুতবেগবিশিষ্ট, সেই বস্তুর শরীর তত অধিক উত্তাপযুক্ত হয়। উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি কেবল পরমাণুতরঙ্গের গতির অনুপাতানুসারেই হইয়া থাকে, আর কিছুই নহে। প্রথম অনুমান মতে, উত্তাপক জড় পদার্থকে পরিত্যাগ করিলেই তাহার স্বিকৃৎ সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয় অনুমানসিদ্ধ ফল তাহা নহে। পরমাণুগণ তরঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত মুক্তি ধারণ করিলেই তত্তৎ শরীরের দেহ শীতল হয়। এই দ্বিতীয় অনুমানে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, শব্দের ন্যায়, অগ্নিও বস্তুত সম্পন্ন নহে। কেবল বায়বীয় তরঙ্গাভিধাতের অনুভূতি বা দমক মাত্র। ‘শব্দ’ ও গতি ব্যতীত কিছু নহে। যদিও প্রাচীন ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রে * শব্দ এবং গতির মূল নির্দিষ্ট

* এদেশীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রের কোম কথা আমি অবগত নহি। লেখক।

নাই—তথাপি ‘শব্দ’ গতি (Motion) মাত্র বলিয়া অনুমিত হওয়া সর্বথাই বুদ্ধি সম্ভব। অবগ সযস্কে যিনি কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ প্রদান করিবেন—উহার উৎপত্তি যে কেবল সাধারণ গতি হইতে, তাহারই মনে এরূপ একটি ভাব উপলব্ধি হইবে। যদিও শব্দ কেবল মাত্র গতি তথাপি আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি—শব্দ যাইতেছে, শব্দ উত্থিত হইতেছে। উত্তাপ, আলো, বিদ্যুৎ ইহারা যে কেবল গতি মাত্র এবং বস্তু নহে তাহা কাহারও মনে ধারণা করাইবার জন্য এখন বোধ হয় আর আমাদিগকে অধিক আয়াস স্বীকার করতে হইবে না।

গতিতরঙ্গিক, বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের মতে অগ্নি বস্তু নহে, কার্বা, পরিবর্তন, বা গতি। ইহা কি ভৌতিক পদার্থ, কি-রাসায়নিক পদার্থ, কি বৃহৎ, কি ক্ষুদ্র, কি তর, কি লঘু, কি তরল, কি দ্রব, কিছুই নহে। ইহার সংস্পর্শে ইথর (Ether) অনুতরঙ্গমালা হইতে উত্তাপকে বহন করিয়া তাহার সমষ্টিতে অনল রচনা করে।

অগ্নি বলিতে গেলেই একবারে স্বভাবের কতগুলিন প্রকৃতিকে বুঝায়—যথা—উত্তাপ, রূপান্তরক্রিয়া, বিস্তারক্রিয়া, এবং বাষ্পিয়ক্রিয়া প্রভৃতি। কাহারও মতানুসারে ইহা (Caloric) উত্তাপকের কার্য। এবং কাহারও মতে—কেবল পরমাণুর তরঙ্গে বা গতিতে এরূপ হইয়া

থাকে। দহনশীল পদার্থের দহন ক্রিয়াকেই অগ্নি বলিতে হইবে। যাঁহাতে ইধর সংমিশ্র অক্সিজান (অক্সিজেন) কিছু অধিক পরিমাণে থাকে, বা কৌশলে কোনও বস্তুকে উক্ত ধর্মাক্রান্ত করা যায় তাঁহাই দহনশীল পদার্থ।—তাই বলিয়া যে ঐ বস্তু বায়ুর মধ্যে রাখিয়া দিলে যে আপনি জ্বলিয়া উঠিবে তাঁহা নহে। যাঁহাতে এমন গুণ আছে যে অল্প বা অধিক ঘর্ষণে ইহার পরিপুষ্ট অক্সিজেন বায়ু শোষণ করিতে পারে, বা উহার ক্ষতি কিম্বা প্রজ্বলন ক্রিয়ার অভাব ঘটাইতে পারে, তাঁহাও এক প্রকার দাহ্য। এমন বস্তু কি সচরাচর আমরা দেখিতে পাই না যাঁহার প্রচণ্ড উত্তাপ আছে, অথচ বাঁহা ধীরেই এমন ভাবে জ্বলে যে তাঁহাতে শিখা, বা অন্য কোনরূপ জ্বলন ক্রিয়া প্রকাশ না পাইয়া কেবল মাত্র তাঁহার শারীরিক দহনীয় বস্তু টুকু নিঃশেষিত হইয়া যায়? তাঁহাতে অগ্নিশিখার অনুপস্থিতি স্বদেও তাঁহা সামান্য দহনশীল পদার্থ নহে।

এরূপ স্তিমিত দহন ক্রিয়া সমস্ত উষ্ণ রক্তসম্পন্ন জীব জন্তু শরীরেও হইতেছে। অন্যদ্বারা জীবদেহের উত্তাপকে ক্ষীণতর করে, এবং তাঁহারা দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিলেও, যত দিন দেহের দাহ্য পদার্থ নিঃশেষিত না হয়, ততদিন পুড়িতে থাকে, যখন দাহ্য সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয় তখনই জীবদেহ ভগ্নর শীতলভাব ধারণ করে তাঁহাই তাঁহার মৃত্যু। জীবদেহের

শক্তি ও কেবল, অজ্বারক (Carbon) এবং উদ্ভ্জান, (Hydrogen) তাঁহাদের, আহাঙ্গীয় দ্রব্যে প্রচুর থাকে বলিয়া স্তিমার কয়লাব্যতীত যেরূপ শক্তি বিহীন হইয়া পড়ে, ঘোটকেরও ঘাস এবং যব বা বুটের অভাবে তদবস্থাপন্ন হইতে হয়। এবং দস্তা না থাকিলে বোল্ভাইক * যন্ত্রেরও শক্তি লোপ হয়।—কোনই রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যেখানে ধাতু দ্রব্যাদি গলান যায়, সেখানে ১০ হইতে ২০ গুণ পর্যন্ত কাষ্ঠ দাহন করিয়া ঐ স্থান জীব দেহের তুল্য উত্তপ্ত হয়। মেচুসী (Methuici) সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বোল্ভাইক যন্ত্রে দস্তার অভাবেও তৎক্ষণাৎ একটি ভেক মারিয়া তাঁহা হইতে অধিক পরিমাণে রসায়নিক কার্য উৎপন্ন করা যাইতে পারে। (ভেক জীবিত থাকিলে কার্য আরো অধিক পরিমাণে প্রকাশমান করা যাইতে পারে) যাঁহা হউক ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দহনক্রিয়া হইতেছে অথচ অনেক সময় আমরা বস্তুর বাঁহ্য অবয়ব দেখিয়া বুঝিতে পারি না। দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়, যে রসায়ন প্রভাবে কেমন আশ্চর্য আলো বিকিষ্ট হইয়া দর্শকগণকে মুগ্ধ করে অথচ ঐ রসায়নিক অনল প্রকৃত পক্ষে কোনরূপ পদার্থ

* (Volta) বোল্ভা সাহেব যে বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রস্তুত করেন তাঁহারই নাম বোল্ভাইক ব্যটারী।

দহন করে না ইহা কেবলমাত্র রাসায়নিক যোগের এবং দাহের সহিত অস্বাভাবিক বা-সুর (অক্সিজনের) সামীপ্যাকর্ষণোৎপাদিত ফল।

অমি বস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, সূত্ররূপে আকর্ষণ বা শক্তি ইহার মূল কারণ। আমরা সচরাচর মাধ্যাকর্ষণেরই কার্য স্বভাব উপলব্ধি করিতে পারি, ইহা ব্যতীত অন্যান্য আকর্ষণশক্তির প্রভাব তত স্পষ্ট অনুভূত হয় না। বৈদ্যুতিক সাধন, রসায়ন উদ্ভাবন, এবং পরীক্ষা প্রভৃতি দ্বারা মাত্র বুঝা যায়।

তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ, চৌম্বক, রাসায়নিক সংযোগ, এবং গতি ইহারাই নৈসর্গিক শক্তি বলিয়া স্বীকার্য। সূত্ররূপে অমি এই সমস্ত শক্তির অন্যতরের পরিস্ফুট ক্রিয়া মাত্র। পণ্ডিতগণ আরও বলেন, যে এই সকল শক্তির যে কেবল বিশেষ পারস্পারিক সম্বন্ধ আছে তাহা নহে, ইহারা সকলেই এক সূত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এবং ইহাও অনুমিত হইয়াছে যে ইহাদের যে কোন একটি আপনায় সম-শক্তি আর একটি শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারে। বিদ্যুতে, রসায়ন যোগ, চুম্বকের শক্তি, উত্তাপ বা গতি, উৎপাদন করিতে পারে। আবার গতিতেও উত্তাপ জন্মাইতে পারে। যথা বর্ষণে, সর্কটচক্রে আ-গুণ লাগিতে পারে, পাথরে স্কুর সানাইলে স্কুলিঙ্গ নির্গত হয়; কলের সহায়তায় বা একটুকরা চামড়ায় কোটের (খা-

তুময়) বোতামের সহিত বর্ষণ করিলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আবার আলোকে বিদ্যুৎ, গতি, এবং শক্তি উৎপন্ন করিতে পারে। এবং উত্তাপেও যথাক্রমে আলো, বিদ্যুৎ এবং গতির উৎপাদন করিতে পারে। নৈসর্গিক শক্তি পরিবর্তন সহ-কারে যেরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, বীজ-গণিতের পরিবর্তন এবং যোগসাধন-প্রক্রিয়াতে (The Law of permutation and combination) তাহার সীমা নির্বাচিত হইতে পারে। আপাততঃ প্রস্তাব-বাহুল্য-ভয়ে আমরা তাহার প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিতে কান্ত রহিলাম, কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক পত্র ব্যতীত, উহা সাহিত্যিক পত্রিকার উপযুক্তও নহে।

এইকণ আবার বলিতেছি অমি কি? উত্তর। উহা প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়ের একটি প্রকাশমান ক্রিয়া মাত্র। উত্তাপের অভ্যন্তরিত হইলেই, এই উত্তাপের শক্তিও রুদ্ধ হয়, অবশেষে এই মহাশক্তি হইতে শিক্ষা এবং ধূম উদ্গীরিত হইতে থাকে।

আমরা শক্তির কারণ ব্যাখ্যা করি-লাম না বলিয়া যদি পাঠকগণ, এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়েন, তথাপি অন্ততঃ তাঁহাদি-গের এইটি ধারণা হইবে যে, বস্তু গুণ স-ম্পন্ন, নিত্যমি, ও তাপক প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীনগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ভ্রমসম্মূল।

আমরা যাহা জ্ঞানি বা দেখি সমস্তই আকর্ষণোৎপাদিত শক্তির ফল,—কিন্তু

আমরা শক্তি দেখি না। আমরা কেবল,
গতি এবং গতিজনিত কার্য দেখি। আ-
মরা কোন বস্তুর কোন বিশেষ পরিবর্তন
বা রূপান্তরিত অবস্থা জানিতে পারি—

এবং তাহারই একটি পরিবর্তন বা রূপান্তর-
শীলতার নাম সাধারণ উত্থাপন। সেই
উত্থাপনের প্রকৃত অরূপ অন্যাপি অপ্রকা-
শিত আছে—।

* মহামায়ার চিত্র পট ।

সুরভি পবন-রথে ধীরে ধীরে
করি আরোহণ,
উত্তরিল ব্রহ্মপুয়ে আরতির প্রতিধ্বনি
মধুর নিকরণ।
ভারতীর আসন বেড়িয়া,
সুরিয়া সুরিয়া,
ভ্রমিতে লাগিল পার্শ্বিক শব্দ
সেন পথ হারাঈয়া।
কল্পনা সুরন্দরী
আপনার করণায় দু'টি
ধীরে ধীরে একত্রিত করি, কহিল,
“ বৎসরান্তে পুনঃ, দেবি, ভারতে তোমায়
ভারত বাসীরা স্মরিল। ”
ভারতীর ইন্দ্রবর আঁখি দুটি
ঈষদ ফুটিল ;
অজুল অধরপ্রান্তে, উবার রেখার ন্যায়
হাসি প্রকাশিল।
উজ্জ্বলমুঃ যিনি বরণ
অমনি সানন্দ,
বন্ধে তুমি সে শুভ্র প্রতিমা খানি
অনন্ত শূন্যে ছুটিল শুধম।

জ্যোতিহীনা তারা ;
অত্র অঙ্গে বহিল গলিত অর্ণের শতধারা,
সুন্দর ;
মুহূর্তে নামিল রথ শ্যামলবসনা
চাক বজের উপর।
অগনি চৌদিকে কিরণ ছুটিল,
সংগীততরঙ্গে দিগন্ত ফুটিল,
অর্গীয় সৌরভে ভুবন ভরিল,
আহা কি আনন্দ আজ !
বহুদিন পরে অশ্রু-জল মুছি
পরেছে বঙ্গ মোহন সাজ !
সাজিল বঙ্গ কি সুন্দর সাজে !
মরি কি মধুর আরতি বাজে !
উল্লে বাজিছে ঝাঁকর শঙ্খ,
টিগ্ টিগ্ টিগ্ ঘনটা বোলে,
আহা মরি যেন মায়ের অঙ্গে
নিদ্রিত শিশুর সুপুত্র দোলে !
আহা কি আনন্দ আজ !
ভাজিয়া জীর্ণ মলিন বসন
পরেছে বঙ্গ কুসুমসাজ !

* ময়মনসিং সারস্বত উৎসব উপলক্ষে লিখিত।

বাছিন্না বাছিন্না অঞ্জলী ভরিয়া
চন্দনচর্চিত কুম্ব লইয়া,
তক্তিরসে গ'লে, ঢালিছে সকলে,
ভারতীর চাক চরণ কমলে-।
যরে যরে যেন জ্যোৎস্নাবসনা, শান্তি
সুধাময়ী করিছে বিরাজ।
আহা কি আনন্দ আজ!

মহামায়া মায়ী কপ্পনারে
করিয়া সহায়,
মুহূর্তে সে রত্নভূমি অপরূপ
করিয়া সাজায়।
পদ্মের আকারে
পদ্ম পুষ্পে গড়ে
পরিষ্কার করি স্নানর আসন,
লতা পাতা দিয়ে
স্নান করিয়ে
গড়ে স্তম্ভাবলী নয়নরঞ্জন।
তহুপরি নীল অপরাজিতার
শারদ নিশার আকাশের প্রায়
চাক চক্রাতপ ফুলাইল ;
মধ্যে মধ্যে তার গুচ্ছ গুচ্ছ বেলি
নক্ষত্রের ন্যায় বসাইল।
লইয়া গোলাপি গোলাপের কলি
তার চারি ধারে, সারি সারি,
বসাইয়া ফুটন্ত চামেলী
ফুল'ল ঝালর তার ;
নন্দন কুম্বমে নয়নান্তিরাম
শোভিলা মুহূর্তে বাণী
মায়ার মায়ার।

ওই শুন শুন। কে গাইছে গান।
তজ্জে তজ্জে নাচে তান লয় মান।
ছন্ন রাগ সহ ছত্রিশ রাগিনী
আহা কি স্নানর মিলিল রে।
জড়া মৃত্যু পাণ জঞ্জাল জড়িত
ভব মকভূমে কেরে আচম্বিত,
এহেন সুধার সংগীতলহরী
জুড়াইতে প্রাণ উঠাল—রে।

ভেজস্বী মুরতি, যেন ত্রিবাণ্ডুতি
মহাঋষি আসি প্রণাম করিলা,
দেবতাবাহিত পাদপদ্ম দু'টি
ধীরে মাতা তার শিরে ছোঁয়াইলা।
মহর্ষির শিরে শোভে জটাভার,
শুভ শঙ্কর আসি পড়েছে উরসে ;
মুখে রাম রাম শব্দ অনিবার,
ঢল ঢল দেহ যেন তক্তিরসে।
তাহার পশ্চাতে যেশ্বর বরণ
মহাকার এক মহর্ষি আসিলা
ধীরে বরদার বন্দিলা চরণ ;
আশীষিলা মাতা ঈবদ হাসিলা।
রসে অঙ্গ ভরা নয়ন চটুল,
সংগীত সলিলে স্নিগ্ধ করি প্রাণ
মুঞ্জরিয়া লতা ফুটাইয়া ফুল
দেখা দিলা পরে সুবক ধীমান্।
সাক্ষী লে সুবক প্রণাম করিলা।
আপনার বীণা স্নানর কমলে
তুলি বীণাপাণী সুবকে অর্পিলা।
ছে সুবক। তুমি ধন্য ধরাতলে।
মৃদল মধুর বীণা বাজাইয়া,

ভয়কণ্ঠে গায়ি বিরহ সংগীত,
কে আইল ? শোক ভরস্ব তুলিয়া
প্রকৃতির আজ করিল প্লাবিত ।
তাহার পশ্চাতে রক্তবর্ণ কাগর,
বিদেশীর বেশে ওকে দেখা দিল ?
অভিনব তানে কি মধুর গায় !
মৃত বঙ্গে যেন চেতনা ঢালিল !

সমন্বরে সবে বাঁধি স্বীর স্বীর
তন্ত্রী তার
গাইল হর্ষে, মহামায়ার মায়ার
বোকা ভার !

অমনি সম্মুখে শোভিল অতুল
সুখধাম বনস্থলী ।
সুবকে সুবকে কুল আছে ফুটি
শাখে শাখে কল ঝুলি ।
প্রকৃতির সেই সোহাগের বনে
একিরে একিরে হেরি !
ককভর্ত্ত ক্রব মনস্ত্রের প্রায়
ধরাসনে এক নারী ।
এদিকে দেখনা ঐ কি ভীষণ
রণস্থলে দেখা যায় !
ওই দেখ মহা জ্যোতিষ্মান যোদ্ধা
শুইয়া শরশয্যায় !
অন্যদিকে কিরাইয়া আঁধি, কর
একবার দৈরণন,
যোর বনে পরতি কুগমে যেরা
ওই শান্তি নিকেতন ।
অভাবের ছবি ভুবন মোহিনী

রক্তছালে তমু ঢাকা,
আলবালে জল করিছে সিঞ্চন
বননে লক্ষ্যার রেখা !
আবার এদিকে শ্যামলপুলিনা
যমুনা বহিছে ধীরে ;
পাগলিনী প্রায় ত্রৈক রমণী ওই
কাদে বসি তার তীরে !
মহামায়ার একি দেখালে অপন
এমনত দেখি নাই !
বাজি পূর্বে শত বীর্ষ্যবতী নারী
দেখে মনে ভয় পাই ।
কটীদেশে আঁটা শরাসন ; শিরে
রতন চূড়া নাচিছে ।
রহি রহি রোবে ধনুক টঙ্কারে
হস্তে শূল আশ্ফালিছে ।

মহামায়ার মায়ার বোকা ভার !
পরিবর্তিল দৃশ্য পুনর্বার ।
নিবিল দেউচী হ'ল আঁধার ।

হস্তে ভাঙ্গা লাঠি,
অঙ্গে মাখা মাটি,
উক খুক কেশ,
পাগলিনী বেশ,
অঞ্চল ধরায়,
হেলায় লুটার,
দেহ লতা শীর্ণ,
শরীর-বিবর্ণ,
জ্যোতিষ্মান তারা,
অপাঙ্গেতে ধারা,

কাঁপিতে কাঁপিতে,
পড়িতে পড়িতে,
একটি রমণী আইল তথায়।
সজ্জল নয়নে মুখাইলা বাণী ;—
'কে তুমি মা ? তুমি কাহার রমণী ?
তব দশা দেখে বুক ফেটে যায় !'

মুছি অশ্রু জল,
চাপি বক্ষস্থল,
যস্তির উপর,
রাখি-অঙ্গ তর,
ভগ্ন অরে মরি
কহিলা স্নান্দরী ;—

'আমার কাহিনী
শুনবে কি বাণী ?
আমার বেদনা
কেহত বোঝে না !

• তুমি কি বুঝবে ?
যোরে কি চিনিবে ?

'স্মৃতি' নাম ধরে এই অভাগিনী !'
যদি মোর প্রতি এত দয়া তব
এসো সঙ্গে মোর, এসো বীণাপাণি,
গত দৃশ্য কিছু তোমারে দেখাব।'
ঈষদ হাসিয়া, কহিলা ভারতী

'দেবতা আমরা ;

দিব্য চকু ধরি, এক দৃষ্টি ছেদি,
সসাগরা ধরা।

সেই দিব্য চকু তোমারেও আমি
করিনু প্রদান,
দূর দৃশ্য স্মৃতি দেখিবে এখন
যেন চক্রে বিদ্যমান।

অশ্রু জল মুছি ভগ্ন কণ্ঠে স্মৃতি
কহিলা বাণীর কাছে ;
'অলকা সদৃশ ভারত ভূমির
আর কি সেদিন আছে !
ওই দেখ মাগো যমুনা বহিছে
আঁধারে ঢাকিয়া কার।
বীচিরবচ্ছলে কালিন্দী কাতরে
বিবাদ সংগীত গায়।
এই যমুনার স্ফটিক সলিলে
প্রভাতে সঙ্ঘাত মরি,
মন্দাকিনী জলে বিদ্যাদরী প্রায়
ভেসেছে প্রবেদ-তরী !
এই যমুনার শ্যামল পুলিনে
বিচিত্র চিত্রিত কত,
শত সৌধমালা ছিল দাঁড়াইয়া
স্বর্গীয় পরীর মত !
সেই যমুনার সেই সে পুলিনে
আজি কি দেখিতে পাই।
মহা মকভূমি অনন্ত শ্মশান
শূন্য শূন্য সব ঠাঁই !
যেখানে সেখানে ভগ্ন অট্টালিকা
পড়ে আছে স্তূপাকার !
লতা পাতা ঘেরা এই স্তূপোপরি
কিরাও আঁখি তোমার।
ওই স্তূপে বসি অশ্রুসমরী শোক,
কাঁদিয়া জুড়ায় প্রাণ !
হির তন্ত্র কক্ষে ভগ্ন বীণে বাঁধি
ভগ্ন কণ্ঠে করে গান !
ওই দেখ মাগো মহা তীর্থ স্থান
হুককোত্র দেখ ওই,

কুকক্ষেত্র আছে বল মা আমার
 সে কুক পাণ্ডব কই ?
 কই সে অর্জুন ? বীর্য মূর্তিমান,
 ভীমসেন মহাকায় ;
 সত্য সত্য কি মা ভীষ্ম মহাবীর
 নিদ্রিত চির নিদ্রায় ?
 দেখে প্রাস্তরের প্রাস্তভাগে ওই
 অগ্নমান মহাবীর,
 ধূলার লুটার পর্নভেদে প্রায়
 তার অকাণ্ড শরীর ।
 ভীম শরাসম শতখণ্ড হয়ে
 পড়িয়া রয়েছে ভূমে ;
 কতু যেন বীর নয়ন মুদ্রিয়া
 অচেতন ঘোর ঘুমে !
 কতু যেন কোণে ভগ্ন কটি আঁটি
 উঠিয়া বলিতে চায় ;
 ভগ্ন বাহু ভাঙ্গি তখনি আবার
 ভূতলে পড়িয়া যায় !
 এই হতভাগ্য এক দিন মাগো
 ভারত দেখর ছিল !
 'বীর রস' নাম কালচক্রে পড়ি
 ইহার এদশা হলো !'

এই শোক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে
 অপাঙ্কে বাণীর অক্ষ দেখা দিল ;
 মাঝার মাঝার আঁধার নাশিতে
 জ্যোতির্ময়ী মূর্তি আসি দাঁড়াইল ।

ভুবন মোহিনী

আইলা রমনী

তনুয়র বেন মাধুরী মাখা !
 শতচক্র যিনি
 সে বদনখানি
 নিবিড় কুন্তলে অর্জেক ঢাকা !
 আস্য ভরা হাসি,
 হেন জ্যোৎস্না রাশি,
 অপাঙ্কে বিজলি জ্বলে !
 কোহিনুরে হার
 পরাজি প্রভায়
 একটি হীরক গলে !
 মহা মূল্য কত
 রত্ন শত শত
 জ্বলিছে সর্ব্বাঙ্গে তার ,
 খচিত রতনে
 কৌশিকি বসনে
 সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা বামার !
 স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না রাশি
 যেরে মুখশশি
 হস্তে বিদ্র্যত মশাল ।
 মুহূর্তে সে আলো
 দিশি উজলিল
 হরি আঁধার ভরাল !
 অন্য এক করে
 রত্ন বীণা ধরে,
 দাঁড়াল প্রতিমা স্থির ;
 অগ্নি পাদমূলে
 পুত্তিয়া মশালে
 ধীরে মোরাইল শির ।
 সম্মোহন যজ্ঞে
 বাঁধি বীণা যজ্ঞে

দিল সে তজ্জে স্বাকার ;

আরভিল গান

মোহিল পরাগ

মুচিল বিষাদ ভার।

‘উঠ উঠ মাগো !

ধরাসন ত্যাগো।

তব দশা হেরে হৃদি কেটে যায়।

চিরদিন কাক সমান না যায়।

ঝাড় ধুলি ঝাড়

নব বস্ত্র পড়

রাজরাণী তুমি কেন হেন বেশ।

কেন ধুলিমাখা এ চাঁচর কেশ !

জব পায়ে ধরি

মুছ অশ্রুবারি।

বিশুদ্ধ অধরে একবার হাসো !

একবার সুখ তরঙ্গতে তাসো !

উঠ উঠ মাগো !

দেখ পূর্বভাগো !

তপ্ত কাঞ্চনের আভার শোভিল !

কাল নিশি তব বুঝি মা পহাল !

বলি যা শোনো মা !

কৈদোনা কৈদোনা !

মোর কথা রাখ ‘আশা’ মোর নাম

ধৈর্যধর পূর্ণ হবে মনস্কাম।

নিরবিলা বীণা। ক্রোধ ভরে

ভগ্নবাহু যুগে করি বশ

ভগ্ন ধনুঃখণ্ড—ষোড়া দিয়ে

উঠিতে চাহিল বীর রস,

নির্দয় বিধির কি বিচার

হায় হস্ত ভাজি পড়ি গেল !

অন্তর্কাম আশা বাণী সব

যাঃ রে মায়ায় মায়া ফুরাল।

শ্রীদী—

জীবনপ্রভাত।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

আরংজীব।

‘আপনি কাটারি মারি আপনার পায়।

অহঙ্কার করে ডিঙ্গা ডুবালি দরিয়ার ॥

বুদ্ধিমান হয়ে জান হারালি হতভাগা।

শিরেকৈলে সর্পাঘাত কোথা বাঁধ্বি ভাগা

সর্বশাস্ত্র পড়ি বেটা হলি হতমূর্খ।

বলে কথা বুঝিস নাহি এই বড় হুঃখ ॥’

কীর্তিবাস ওঝা।

পর দিন প্রায় এক প্রহর বেলার স-
ময় শিবজীর নিজা ভবন হইল, জাগরিত
হইয়াই রাজপথে একটি গোলযোগ শুনি-
লেন, উঠিয়া গবাক দিয়া নিম্নদিকে চাহি-
লেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে চকিত ও
স্তম্বিত হইলেন,—

দেখিলেন বাটির পশ্চাতে দুই পার্শ্বে,
সম্মুখ দ্বারে অস্ত্রহস্তে প্রহরীগণ দণ্ডায়মান
রহিয়াছে, বিশেষ পরিচয় না পাইলে বা-
হিরের লোককে গৃহে প্রবেশ করিতে দি-

ভেছে না, গৃহের লোককে বাহিরে যাইতে দিতেছে না। দেখিয়া সীতাপতির কথা স্মরণ হইল, কল্যা তিনি পলাইতে পারিলেন, অন্য আরংজীবের বন্দী!

তখন বিশেষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; জানিলেন যে, তিনি সত্ৰাটের নিকট স্বদেশ যাইবার প্রার্থনা করিয়া অবধি আরংজীবের মনে সন্দেহের উত্থেক হইয়াছিল, সেই সন্দেহপ্রযুক্তই সত্ৰাট নগরের কোতোয়ালকে আদেশ করিয়াছিলেন, যে শিবজীর বাণীর চতুর্দিকে দিবান্নাজ প্রহরী থাকিবে, শিবজী বাটী হইতে কোথাও যাইলে সেই লোক সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিবে। শিবজী তখন বুঝিতে পারিলেন যে, হিতৈষী সীতাপতি গোশ্বামী গণনা দ্বারা বা কোনও অনুসন্ধানে আরংজীবের এই আদেশের কথা জানিতে পারিয়া পূর্বেই শিবজীর পলায়নের সমস্ত আয়োজন করিয়া রজনী দ্বিপ্রহরের সময় সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন। মনে সীতাপতিকে সহজ ধনাবাদ দিতে লাগিলেন।

আরংজীবের কপটাচারিতা এত দিনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। প্রথমে শিবজীকে বহু সমাদর পূর্বক পত্র লিখিয়া দিলিতে আস্থান করিলেন,—শিবজী আসিলে তাঁহাকে রাজ সত্যার অবমাননা করিলেন, পরে রাজসভায় যাইতে নিবেদন করিলেন, তৎপরে দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে নিবেদন করিলেন, তৎপরে প্রকৃত

বন্দী করিলেন। কোন কোন অজ্ঞান সর্প গো মহিবাতি-স্তম্ভণ করিবার পূর্বে যে রূপ আপন দীর্ঘ শরীর ভক্ষ্যের চতুর্দিকে জড়াইয়া জড়াইয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে, পরে ইচ্ছানুসারে দংশন করে, ক্রুর আরংজীবও সেইরূপ কপটতাজালে শিবজীকে ক্রমে সম্পূর্ণ অধীন করিয়া পরে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। মানসচক্ষে অতীত ও বর্তমান সমুদায় ঘটনা মুহূর্তমধ্যে দৃষ্টি করিয়া শিবজী শত্রুর নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া রোষে অভিমানে গর্জিয়া উঠিলেন। ক্রতপদনিক্ষেপে সেই গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার অপরোষ্ঠের উপর দস্ত স্থাপিত রহিয়াছে, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। অনেকক্ষণ পর অর্ধক্ষুণ্ট স্বরে বলিলেন—

‘আরংজীব! শিবজীকে এখনও জান না; চতুরতার আপনাকে অধিতীয় মনে কর, কিন্তু শিবজীও সে বিদ্যায় বালক নহে। * * এই ঋণ এক দিন পরিশোধ করিব,—দাক্ষিণাত্য হইতে হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে!’

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্থকে ডাকাইলেন। প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রী উপস্থিত হইলেন, শিবজীর আজ্ঞায় সম্মুখে উপবেশন করিলেন।

শিবজী বলিলেন—‘পণ্ডিত প্রবর! আপনি আরংজীবের খেলা দেখিতেছেন;—এই খেলা আমাদেরও খেলিতে হইবে;

আপনার প্রাসাদে শিবজী এ খেলার অপরিপক্ব নছে,—খেলিবে।

‘অন্য আমরা বন্দী হইয়াছি, আমি কল্যা রজনীতে ইহার সংবাদ পাইয়াছিলাম; কিন্তু অচ্যুতবর্গকে পূর্বে পরিজ্ঞান না করিয়া আমার আশ্রয়পরিজ্ঞানের উচ্ছানাই, সে বিষয়ে আপনার উপদেশ কি?’

নায়কশাস্ত্রী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—‘আপনার অচ্যুতদিগের স্বদেশ গমনের জন্য সত্রাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করুন, এক্ষণে আপনাকে বন্দী করিয়াছেন, আপনার অচ্যুতসংখ্যায়ত হ্রাস হয় তাহাতে সত্রাট আত্মসম্মতি হ্রাসিত হইবেন না। আমি বিবেচনা করি অনুমতি চাহিলেই পাইবেন।’

শিবজী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন—‘মজিবর, আপনার পরামর্শই শ্রেয়ঃ, আমারও বোধ হয় ধূর্ত আরংজীব এবিষয়ে আপত্তি করিবেন না।’

সেই মর্মে একখানি আবেদন পত্র প্রস্তুত হইল; শিবজী যাহা মনে করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল; শিবজীর অচ্যুত সকল দিল্লী হইতে প্রস্থান করিবে শুনিয়া সত্রাট আত্মসম্মতি হইয়া তাহাদিগের সকলকে এক একখানি অনুমতি-পত্র দান করিলেন। শিবজী কএক দিন মধ্যে সেই সমস্ত অনুমতি পত্র প্রাপ্ত হইলেন, মনে মনে বলিলেন,—

‘মুখ! শিবজীকে বন্দী রাখিবে? এখন একজন অচ্যুতের বেশ ধরিয়া ইহার

মধ্যে একখানি অনুমতিপত্র লইয়া দিল্লী ত্যাগ করিলে কি করিতে পারি? বাহা হউক অচ্যুতবর্গ এখন নিরাপদে মাইবে, শিবজী আপনার জন্য উপায় উদ্ভাবনা করিতে সক্ষম।’

* * * *

পাঠক! যিনি অসাধারণ চতুরতা বুদ্ধিকৌশল ও রণনৈপুণ্যে ভ্রাতৃগণকে পরাস্ত করিয়া, বৃক পিতাকে বন্দী করিয়া দিল্লীর ময়ূরসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, যিনি কাশ্মীর হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত সমস্ত আর্ঘ্যাবর্তের অধিপতি হইয়াও পুনরায় দাক্ষিণাত্যদেশ জয় করিয়া সমগ্র ভারতের একাধীশ্বর হইবার মহৎ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যিনি অদ্য চতুরতার দ্বারা মহাবীর শিবজীকেও বন্দী করিয়াছিলেন, চল একবার সেই জুর, কপটাচারী, অথচ সাহসী, দুরদর্শী আরংজীবের প্রাসাদান্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনের ভাবগুলি নিরীক্ষণ করি।

রাজকার্য সমাধা হইয়াছে, আরংজীব ‘গোসলখানা’ নামক সভাগৃহের পাখিল একটি ঘরে উপবেশন করিয়া আছেন। সেটি মজিবদিগের সহিত গুপ্ত পরামর্শের স্থল, কিন্তু অদ্য আরংজীব একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, কখন কখন ললাটে গভীর চিন্তার রেখা দেখা মাইতেছে, কখন বা উজ্জ্বল নয়নে ও ক্রম্পিত স্রবণের রোষ, অভিমান বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, কখন বা মন্ত্রণা-স-

ফলতাজনিত সন্তোষে সেই ওষ্ঠপ্রান্ত হা-
সারেখার অঙ্কিত হইতেছে। সত্রাট কি
করিতেছেন? আপন বুদ্ধিবলে সমস্ত
হিন্দুস্থানের একাধীশ্বর হইয়াছেন, সেই
কথা স্মরণ করিতেছেন? হিন্দু ধর্মের
আরও অবমাননা অথবা রাজপুত বা মহা-
রাষ্ট্রদিগকে আরও পদদলিত করিবার স-
ঙ্কল্প করিতেছেন? শিবজীকে বন্দী ক-
রিয়া মনে মনে উল্লাসিত হইতেছেন?
জানি না সত্রাটের কি চিন্তা। তাঁহার স-
ভার মধ্যে, ভারতবর্ষের মধ্যে কোমণ্ড
লোক, কোমণ্ড সেনাপতি, কোমণ্ড মন্ত্রীকে
সন্ধিগ্ধমনা আরংজীব কখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস
করিতেন না,—স্বনের ভাব বলিতেন না।
নিজের বুদ্ধি প্রার্থর্থে সকলকে পুতলিকার
ন্যায় চালাইবেন, সমগ্র দেশ সুন্দর শাসন
করিবেন, আরংজীবের এই উদ্দেশ্য। বা-
সুকী যেরূপ নিজ মস্তকে এই জগৎ ধারণ
করিতেছেন, বিজ্ঞান চাহেন না, কাহারও স-
হায়তা চাহেন না, আরংজীব নিজের অসা-
ধারণ মানসিক বলে ভারতসাত্রাজ্যের শা-
সনকার্য্য একাকী বহনকরিবার মানস করি-
য়াছিলেন, কাহারও পরামর্শ চাহিতেননা।

অনেককণ উপবেশন করিয়াছিলেন,
এরূপ সময় একজন সৈনিক তস্‌লীম ক-
রিয়া বলিল—

‘ সত্রাটের জয় হউক ! জর্হাঁপনা !
দানেশমন্দ্ নামক আপনার সভাসদ আপ-
নানার সাক্ষাৎ অভিলষী, স্বারদেশে দ-
ওয়ারমান আছেন ।’

সত্রাট দানেশমন্দকে আসিতে আজ্ঞা
দিলেন, চিত্তারেকাগুলি ললাট হইতে অ-
পস্থত করিলেন, সুন্দর হাস্য মুখে ধারণ
করিলেন।

দানেশমন্দ্ আরংজীবের মন্ত্রী ছিলেন
না, রাজকার্য্যে পরামর্শ দিতে সাহস ক-
রিতেন না। তবে তিনি পারস্য ও আ-
রবী ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত, সুতরাং স-
ত্রাট তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন,
কখন কখন কোন কোন কথায় বাকাচ্ছলে
পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। উদারচেতা
দানেশমন্দ্ প্রায়ই উদার সরল পরামর্শ
দিতেন; আরংজীবের জ্যেষ্ঠ দারা যখন
বন্দী হইলেন, দানেশমন্দ্ তাঁহার প্রাণর-
ক্ষার পরামর্শই দিয়াছিলেন। এবরিধ
পরামর্শ কুটিল আরংজীবের মনোগত হ-
ইতনা,—আরংজীব তাঁহাকে অপরূপ ও
অদূরদর্শী বলিয়া মনে করিতেন,—তথাপি
তাঁহার বিদ্যা ও ধন ও পদ-মর্যাদার জন্য
সম্যক্ আদর করিতেন। সরলস্বভাব বৃদ্ধ
দানেশমন্দ্ সত্রাটকে অভিবাদন করিয়া
উপবেশন করিলেন।

বলিলেন—

‘ এ সময়ে জর্হাঁপানার সহিত সাক্ষাৎ
করিতে আসা দাসের ধ্বংসতা,—কেন না
এ সময় সত্রাট রাজকার্য্যের পর বিজ্ঞান
করেন। তবে যে আসিয়াছি,—কেবল
আপনি অনুগ্রহ করেন এই নিমিত্ত; পারস্য
কবি সুন্দর লিখিয়াছে, ‘স্বর্ষের দিকে
জগতের সকল শ্রাণী সকল সময়ে চাহিয়া

দেখে, সূৰ্য্য কি তাহাতে বিরক্ত বা কিরণ দানে বিরত হয়? ”

সত্ৰাট সছাস্য বদনে বলিলেন, ‘দা-
নেশমন্দ্! অন্যের সখ্যকে যাহাই হউক,
আপনি সৰ্ব্ব সময়েই সমাদরের পাঁত্র।’

এইরূপ মিষ্টালাপ ক্রমে হইলে পর
দানেশমন্দ্ অন্য কথা আনিলেন ; বলি-
লেন,—

‘জহাঁপনা! ‘আলমগীর’ নাম সা-
র্থক করিবেন। সমস্ত হিন্দুস্থান আপনার
পদতলে রহিয়াছে, এক্ষণে দাক্ষিণাত্য
জয় করিতেও বড় বিলম্ব নাই।’

ঈষৎ হাস্য করিয়া আরংজীব বলি-
লেন—

‘কেন, সে বিষয়ে আমার কি উদ্যোগ
দেখিলেন?’

দানে। ‘দক্ষিণদেশের প্রধান শত্রু
আপনার পদতলে।’

আরং। ‘শিবজীর কথা বলিতে-
ছেন? হাঁ ইন্দুর কলে পড়িয়াছে!’
তৎক্ষণাৎ আপন মন্ত্রণা গোপনার্থে বলি-
লেন, ‘দানেশমন্দ্ আপনি আমাদের উ-
দ্দেশ্য অবশ্যই জানেন, দেশের প্রধান প্র-
ধান ব্যক্তিকে সৰ্ব্বদাই সম্মান করা আমার
উদ্দেশ্য। শিবজী ধূর্ত বিজোহী হউক,
যোদ্ধা বটে তাহাকে সন্মানার্থেই দিল্লীতে
আনিয়াছিলাম। রাজসভায় সমুচিত স-
ন্মান করিয়া তাহাকে বিদায় দেওয়াই আ-
মাদের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সে এরূপ মুৰ্খ
যে রাজসভায় অসদাচরণ করিয়াছিল।

আমি তাহাকে বন্দী করিতে বা তাহার
প্রাণ লইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, সুতরাং
অন্য শাস্তি না দিয়া কেবল রাজসভায়
আসিতে নিবেদন করিয়াছিলাম। এখন
শুনিতেছি, যে দিল্লীর মধ্যেই সে অনেক
সন্মানার্থী ও বিজোহীর সহিত পরামর্শ করে
সুতরাং কোনও রূপ অনিষ্ট করিতে
না পারে এই জন্যই কোতওয়ালকে দৃষ্টি
রাখিতে কহিয়াছি। কয়েকদিন পর স-
ন্মান পূৰ্ব্বক বিদায় দিব।’

দানে। ‘সত্ৰাটের এ আদেশ শুনিয়া
অতিশয় আত্মদিত হইলাম।’

আরং। ‘কেন?’ আরংজীবের মুখে
সেইরূপ হাস্য,—কিন্তু তীক্ষ্ণ নয়নে দানে-
শমন্দের মুখের দিকে চাহিতেছিলেন, তা-
হার অস্তরের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতে
ছিলেন।

উদারচেতা দানেশমন্দ্ বলিলেন, ‘স-
ত্ৰাটকে পরামর্শ দি আমার কি সাধ্য,
কিন্তু জহাঁপনা! যদি শিবজীর প্রতি দয়াশু
আচরণ না করিতেন, তাহা হইলে মন্দ্
লোকে নানারূপ অশ্রুতি করিত, বলিত,
যে শিবজীকে আহ্বান করিয়া বন্ধ করা
ন্যায়সম্মত নহে।’

আরংজীব ঈষৎ কোপ সঙ্কোপন ক-
রিয়া সেইরূপ হাস্যবদনে বলিলেন,—

‘দানেশমন্দ্, মন্দ্ লোকের কথায়
দিল্লীস্থরের ক্ষতি নুহি নাই, তবে সুরিচার
ও দয়া সিংহাসনের শোভন, সুরিচার ক-
রিয়া শিবজীর দোষের জন্য তাহাকে স-

তর্ক করিয়া দিব, পরে দয়াপ্রকাশে তা-
হাকে সম্মানে বিদায় দিব ।'

দানে । 'এরূপ সদাচরণেই জহাঁপ-
নার প্রাপিতামহ আকবর দেশ শাসন ক-
রিয়াছিলেন, এরূপ সদাচরণে আপনারও
খ্যাতি ও ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে ।'

আরং । 'সে কিরূপ ?'

দানে । 'সম্রাটের অগোচর কিছুই
নাই । দেখুন, আকবরগাহ যখন দিল্লীর
সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন সমস্ত
সাম্রাজ্য শত্রু-সমূহ ছিল ; রাজস্থানে, বি-
হারে, দাক্ষিণাত্যে সর্বস্থানেই বিদ্রোহী
ছিল, দিল্লীর সন্নিকট স্থানও শত্রুশূন্য ছিল
না । তাঁহার মৃত্যুকালে, সমস্ত সাম্রাজ্য
নিঃশত্রু ও নিরীক্ষরোধ হইয়াছিল,—যা-
হার পূর্বে পরম শত্রু ছিল, সেই রাজ-
পুত্রেরাই বাদশাহের অধীনতা স্বীকার ক-
রিয়া কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত দিল্লী-
শ্বরের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করে ! এ
জয়সাধন কিরূপে হইয়াছিল ? কেবল বা-
হুবলে ? কেবল সাহসে ? তঁমুয়ের বংশে
কাহারও সাহস বা বাহুবলের অভাব
নাই,—তবে আর কেহ এরূপ জয়সাধন
করিতে পারেন নাই কি জন্ম ? না জহাঁ-
পনা ! কেবল সদাচরণেই এরূপ জয়লাভ
হইয়াছিল । তিনি শত্রুদিগের প্রতি স-
দাচরণ করিতেন, অধীন হিন্দুদিগকে বি-
শ্বাস করিতেন, হিন্দুরাও এবিধ সম্রাটের
বিশ্বাসভাজন হইবার চেষ্টা করিত, মান-
সিংহ, টোডর মল, বীরবল প্রভৃতি হিন্দু-

গণই মুসলমান সাম্রাজ্যের শুভ স্বরূপ হ-
ইয়াছিলেন । উত্তম ব্যক্তিকেও অবিশ্বাস
করিলে সে ক্রমে অধম হইয়া যায়, অধম
কাফেরের প্রতি ও সদাচরণ ও বিশ্বাস ক-
রিলে, তাহার ক্রমে বিশ্বাসযোগ্য হয় ;
মানবের এই প্রকৃতি,—শাস্ত্রের এই লি-
খন । আমাদের দক্ষিণদেশের যুদ্ধে শি-
বজী অনেক সহায়তা করিয়াছেন, জহাঁ-
পনা ! তাঁহাকে সম্মান করিলে তিনি যত
দিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন তিনি দ-
ক্ষিণদেশে মোগল সাম্রাজ্যের শুভ স্বরূপ
থাকিবেন !'

দানেশমন্দ কি জন্য সম্রাটের সহিত
সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, পাঠক,
বোধ হয়, এতক্ষণে বুঝিয়াছেন । দিল্লীশ্বর
শিবজীকে আব্বান করিয়া বন্দী করায়
জানী ও সদাচারী মুসলমান সভাসদ মা-
দ্রেই লজ্জিত হইয়াছিলেন ; দানেশমন্দকে
সম্রাট সমাদর করিতেন, তিনি কোনরূপে
কথাঙ্কলে সম্রাটের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ উ-
দ্দেশ্য তাঁহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য উৎ-
সুক হইয়াছিলেন । শিবজীর প্রতি ভ-
দ্রাচরণ করিয়া সম্রাট তাঁহাকে স্বদেশে
যাইতে দেন, দানেশমন্দ এই উদ্দেশ্যে
আসিয়াছিলেন । দানেশমন্দ জানিতেন
না যে হস্তচারী প্রকাণ্ড ভূধরকে বিচলিত
করা যায়, কিন্তু পরামর্শ দ্বারা আরঞ্জী-
বের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও গভীর উদ্দেশ্যগুলি বি-
চলিত করা যায় না ।

দানেশমন্দের উদার সারগর্ভ কথা-

গুলি কুটিল আরংজীবের নিকট অভিযা
নিকর্ষোধের কথাই মায় বোধ হইল ।
তিনি ক্রমে হাস্য করিয়া বলিলেন,—

‘ হাঁ, দানেশমন্দ্ ! আপনি যেরূপ
শাস্ত্রবিশারদ, মানব-হৃদয়ও সেইরূপ পাঠ
করিয়াছেন, দেখিতেছি । দক্ষিণদিকে শি-
বজী স্তম্ভ স্থাপিত করিবেন, রাজস্থানে ত
বিজ্রোহিগণ স্তম্ভ স্থাপন পূর্বেই করিয়াছে ;
কাশ্মীর পুনরায় স্বাধীন করিয়া দিব, ও
বঙ্গদেশে পাঠানদিগকে পুনরায় সমাদর
পূর্বক আহ্বান করিব,—এই চতুঃস্তম্ভের
উপর মোগল সাম্রাজ্য হ্রস্ব ও স্তূপ
স্থাপিত হইবে ।’

দানেশমন্দের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল,
তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, ‘ সত্রাটের
পিতা দাসকে অনুগ্রহ করিতেন, সত্রাটও
যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, সেই জন্য কখন
কখন মনের কথা বলি,—নচেৎ জহাঁপ-
নাকে পরামর্শ দি,এরূপ বিদ্যাবুদ্ধি নাই ।’

আরংজীব দানেশমন্দ্কে নির্যোধ
সরল জানিয়াও, তাঁহার সেই সরলতার
জন্য তাঁহাকে ভাল বাসিতেন,—তাঁহাকে
কষ্ট দিয়াছেন দেখিয়া বলিলেন,—

‘ দানেশমন্দ্ ! আমার কথাই দোষ
গ্রহণ করিও না । আকবরশাহ বুদ্ধিমান
ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কাফের ও মুস-
লমানকে সমান চক্ষে দেখিয়া তিনি কি
ধর্ম-সম্বন্ধে আচরণ করিয়াছিলেন ? আর
একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,—আমাদের
সামান্য দৈনিক কার্য সম্পাদনকালেও

দেখিতে পাই যে, আপনি করিলে যেরূপ
কার্য হয় পরের হস্তে সেরূপ হয় না । এ-
রূপ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন কার্যও সেই-
রূপ পরের উপর বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং
সম্পাদন করিলে কি ভাল হয় না ? নিজ
বাহুবলে যদি সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন ক-
রিতে সমর্থ হই, কি জন্য যুগিত কাফের-
দিগের সহায়তা গ্রহণ করিব ? আরং-
জীব বালাবস্থা অবদি নিজ অসির উপর
নির্ভর করিয়াছে, নিজ অসি দ্বারা সিংহা-
সনের পথ পরিষ্কার করিয়াছে, নিজ অসি-
দ্বারা দেশ শাসন করিবে, কাহারও স-
হায়তা চাহিবে না, কাহাকেও বিশ্বাস ক-
রিবে না ।’

দানে । ‘ জহাঁপনা ! স্বহস্তে দৈ-
নিক কার্য নির্যাহ করা যায়, কিন্তু এরূপ
সাম্রাজ্য শাসন কি সহায়তা ভিন্ন সম্পা-
দিত হয় ? বঙ্গদেশ, দক্ষিণদেশ প্রভৃতি
স্থানে কি সর্ব সময়ে আপনি বর্তমান থা-
কিতে পারেন ? অন্য কাহাকেও নিযুক্ত
না করিলে কার্য কিরূপে সম্পাদিত
হইবে ?’

আরং । ‘ অবশ্য ভৃত্য নিযুক্ত ক-
রিব, কিন্তু তাহারা চিরকাল ভৃত্যের ন্যায়
থাকিবে, যেন প্রভু হইতে না চাহে ।
অল্প আমি যাহাকে অধিক ক্ষমতা দিব,
কলা সে সেই ক্ষমতা আমার বিক্রমে ব্য-
বহার করিতে পারে । অল্প যাহাকে অ-
ধিক বিশ্বাস করিব, কলা সে বিশ্বাসঘাত-
কতা করিতে পারে ; এ অবস্থায় ক্ষমতা

ও বিশ্বাস অন্যে ন্যস্ত না করিয়া আপনাতে রাখাই ভাল । দানেশমন্দ ! তুমি যখন অশ্বে আরোহণ কর, অশ্বকে বলুগী ও গুণের দ্বারা সম্পূর্ণ বশীভূত কর, যেদিকে ফিরাও সেই দিকে যাইতে বাধ্য হয় । সত্রাটেরও সেইরূপে শাসন করা উচিত, কাহাকেও বিশ্বাস করিও না, কাহারও হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত করিও না, সমস্ত ক্ষমতা নিজ হস্তে রাখিবে, কর্মচারী ও সেনাপতিদিগকে সম্পূর্ণরূপে বশীকরণ পূর্বক তাহাদিগের নিকট কার্য গ্রহণ করিবে ।’

দানে । ‘প্রভু ! মনুষ্য অশ্ব নহে, তাহাদিগের মহত্ব আছে, নিজ নিজ সম্মান-জ্ঞান আছে ।’

আরং । ‘মনুষ্য অশ্ব নহে তাহা জ্ঞানি ; সেই জন্মই অশ্বকে বলুগীদ্বারা চালাই, মনুষ্যকে উন্নতির আশা ও শান্তির ভয়ের দ্বারা চালাই । যে উত্তম কার্য করিবে তাহাকে পুরস্কার দিব, যে অধম কার্য করিবে তাহাকে শাস্তি দিব । পুরস্কার-আশা ও শান্তি-ভয়ে সকলে কার্য করিবে ; ক্ষমতা, বিশ্বাস, মন্ত্রণা, আরং-জীব নিজ হৃদয়ে ও নিজ বাহুবলে ন্যস্ত রাখিবে ।’

দানে । ‘প্রভু ! পুরস্কার-আশা ও শান্তি-ভয় তিন্ন মনুষ্যহৃদয়ে ত অন্য ভারও আছে । মনুষ্যের মহত্ব আছে, উচ্চাভিলাষ আছে, নিজ সম্মান-জ্ঞান আছে । যে শান্তি-ভয়ে কার্য করে, সে কোন

রূপে কেবল কার্য সমাধা করিয়া নিরস্ত থাকে ; কিন্তু বাহ্যকে আপনি সম্মান করেন, সমাদর করেন, ক্ষমতা দিয়া বিশ্বাস করেন, সে আপনাকে সেই সমাদর ও বিশ্বাসের উপযোগী প্রমাণ করিবার জন্য প্রভুকর্তব্যে নিজেই ধন, মান, প্রাণ পর্যন্ত দান করিয়াছে, এরূপ উদাহরণ ও শাস্ত্রে দেখা যায় ।’

আরংজীব সহাস্যে বলিলেন,—

‘দানেশমন্দ ! আমি তোমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ নহি ; কবিতায় বাহা লিখে তাহা বিশ্বাস করি না । মানবপ্রকৃতি আমার শাস্ত্র ; মানবের মহত্ব আমি অস্পষ্ট দেখিয়াছি । শঠতা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা অনেক দেখিয়াছি । সেই শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমি নিজ হস্তে ক্ষমতা রাখিতে শিখিয়াছি, সেই জন্ম কাফেরদিগের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছি, বিক্রোছোম্মুখ রাজপুত্রদিগের উপর কঠোর শাসন করিব, মহারাষ্ট্রদেশ নিঃশত্রু করিব, বিজয়পুর ও গলখন্দ জয় করিব, হিমালয় হইতে সমুদ্রে পর্যন্ত আরংজীব একাকী শাসন করিবে, কাহারও সহায়তা লইবে না, আলমগীর নিজেই নাম সার্থক করিবে ।’

উৎসাহে সত্রাটের নয়ন উজ্জ্বল হইরাছিল, তিনি মনের গভীর অভীষ্ট কখন কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না, অল্প কথায় কথায় অনেকটা হঠাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন । এতদ্বিধি তিনি দা-

নেশমন্দের উদার চরিত্র জানিতেন, তাঁহার নিকট দুই একটি কথা कहিলে কোনও হানি নাই, জানিতেন।

কণেক পর ঈষৎ হাস্য করিয়া আরং-জীব বলিলেন,—‘সরলম্ভাব বন্ধু! অদ্য আমার অভীষ্ট ও মন্ত্রণা কিছু কিছু বুঝিতে পারিলে?’

তীক্ষ্ণবুদ্ধি আরংজীব যদি আপনার গভীর মন্ত্রণা কিয়দংশ ত্যাগ করিয়া সেই দিন সরল দানেশমন্দের সরল পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য বোধ হয় এত শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হইত না।

এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন এমন সময়ে সৈনিক পুনরায় আসিয়া সংবাদ দিল—

‘রামসিংহ জহাঁপানার সাক্ষাৎ অভিলাষী, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।’

সত্রাট আদেশ করিলেন,—‘আসিতে দাও।’

কণেক পর রাজা জয়সিংহের পুত্র রাজসদনে উপস্থিত হইলেন।

রামসিংহের সহিত পাঠকের পূর্বেই পরিচয় হইয়াছে। আকৃতি দীর্ঘ ও উন্নত, ললাট প্রশস্ত, নয়নযুগল উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ, সমস্ত অবয়ব যৌবনকান্তিতে শোভিত, যৌবন বলে বলিষ্ঠ। যুবক ধীরে ধীরে বলিলেন—

‘সত্রাটের সহিত এরূপ সময়ে সাক্ষাৎ করা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অবিধেয়, কিন্তু

পিতার নিকট হইতে অতিশয় গুরু সংবাদ আসিয়াছে, প্রভুকে জানাইতে আসিলাম।’

আরং। ‘আপনার পিতার নিকট হইতে আমরাও অদ্য পত্র পাইয়াছি ও সমস্ত সংবাদ অবগত আছি।’

রাম। ‘তবে সত্রাট অবগত আছেন যে পিতা সমস্ত শত্রু পরাজিত করিয়া, শত্রুদেশ বিদীর্ণ করিয়া রাজধানী বিজয়পুর আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের সৈন্যের অস্পৃহা বশতঃ সে নগর এপর্যন্ত হস্তগত করিতে পারেন নাই, বিশেষ গল-খন্দের সুলতান বিজয়পুরের সহায়ার্থ নেকনাম খাঁ নামক সেনাপতিকে বহুসংখ্যক সৈন্যসমেত প্রেরণ করিয়াছেন।’

আরং। ‘সমস্ত অবগত হইয়াছি।’

রাম। ‘চতুর্দিকে শত্রুবেষ্টিত হইয়া পিতা সম্রাটের আদেশে এখনও যুদ্ধ করিতেছেন কিন্তু এ যুদ্ধে জয় অসম্ভব, প্রভুর নিকট আর অসংখ্যক সৈন্যের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।’

আরং। ‘আপনার পিতা বীরপ্রগণ্য! তিনি নিজের সৈন্যে বিজয়পুর হস্তগত করিতে পারিবেন না?’

রাম। ‘মনুষ্যের যাহা সাধ্য, পিতা তাহা করিবেন; শিবজী পূর্বে পরাস্ত হয়েন নাই, পিতা তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছেন; বিজয়পুর পূর্বে আক্রান্ত হয় নাই, পিতা ততদূর যাইয়া সেই নগর আক্রমণ করিয়াছেন, এখন আপনার নিকট

অপ্পমাত্র সৈন্য-সহায়তা প্রার্থনা করিতে-
ছেন। তাহা হইলেই সমস্ত কার্য শেষ
হয়, দক্ষিণদেশে মোগল সাম্রাজ্য বিস্তৃত
ও দৃঢ়ীভূত হয়।'

এরূপ অবস্থায় অন্য কোন সম্রাট
সেই সহায়তা প্রেরণ করিয়া দক্ষিণাত্য-
দেশবিজয়কার্য সমাধা করিতেন। আ-
রঞ্জীব আপনাকে বহুদূরদর্শী ও ভীক্ষুবুদ্ধি
মনে করিতেন, তিনি সে সহায়তা প্রেরণ
করিলেন না—বলিলেন—

‘রামসিংহ ! আপনার পিতা আমা-
দের স্নহদুঃপ্রবর, তাঁহার বিপদের কথা শু-
নিয়া যৎপরোনাস্তি শোকাকুল হইলাম,
তাঁহাকে পত্র লিখিবেন যে, তিনি নিজের
অসাধারণ বাহুবলে জয় সাধন করিবেন,
সম্রাট দিবানিশি এইরূপ আকাঙ্ক্ষা ক-
রেন ; কিন্তু এখন দিল্লীতে সেনাসংখ্যা
অতি অল্প, আমি সহায়তা প্রেরণ করিতে
অক্ষম।’

রামসিংহ কাতরস্বরে বলিলেন, ‘জই-
পনা ! পিতা দিল্লীখরের পুরাতন দাস,
আপনার কালে, আপনার পিতার কালে
অসংখ্য যুদ্ধ সুঝিয়াছেন, অনেক কার্য সা-
ধন করিয়াছেন ; দিল্লীখরের কার্যসাধন
স্ত্রিম তাঁহার জীবনের অন্য উদ্দেশ্য নাই।
এই বোর বিপদে আপনি কিঞ্চিৎ সা-
হায্য দান না করিলে, তিনি বোধ হয়,
সসৈন্যে নিধনপ্রাপ্ত হইবেন।’ রামসিংহ-
য়ের কণ্ঠ কন্ন হইল, তাঁহার নয়নে জল-
বিন্দু উদ্ভিত হইল।

বালক ! জলবিন্দুতে আরঞ্জীবের গ-
ভীর উদ্দেশ্য, দৃঢ়মন্ত্রণা বিচলিত হয় না।

সে উদ্দেশ্য—সে মন্ত্রণা কি ? রাজা
জয়সিংহ অতিশয় ক্ষমতাশালী প্রতাপা-
ব্রিত সেনাপতি, তাঁহার অসংখ্য সৈন্য, বি-
স্তীর্ণ বশ, অনন্ত দৌর্দণ্ড প্রতাপ ! অ্য-
জীবন তিনি নিক্ষলকে দিল্লীখরের কার্য
করিয়াছেন বটে, কিন্তু এত ক্ষমতা কোন
সেনাপতির থাকি বিধেয় নহে ; সম্রাট এ-
তদূর জয়সিংহকে বিশ্বাস করিতে পারেন
না। এযুক্তি যদি জয়সিংহ সার্থকতা লাভ
করিজে না পারিয়া অবমানিত হইলেন, তবে
সে প্রতাপ ও যশের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইবে।
যদি সসৈন্যে বিজয়পুর সম্মুখে নষ্ট করেন,
দিল্লীখরের হৃদয়ের একটি কণ্টকোদ্ধার হ-
ইবে ! উর্গনাতের জালের ন্যায় আরঞ্জী-
বের উদ্দেশ্যগুলি বহুবিস্তীর্ণ ও অব্যর্থ, অদ-
জয়সিংহ-কীট তাহাতে পড়িয়াছেন, উ-
দ্ধার নাই।

জয়সিংহ বহুকালাবধি দিল্লীখরের
কার্যে জীবন পণ করিয়াছেন বটে, সে
জন্য কি সূক্ষ্ম মন্ত্রণাজাল অদ্য ব্যর্থ হইবে।
জয়সিংহের উদারচরিত্র যুবকপুঞ্জ স
ম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতেছে
বটে, বালকের রোদনের জন্য কি দূরদর্শী
সম্রাট উদ্দেশ্য ত্যাগ করিবেন ?

দয়া মায়ী প্রভৃতি নুকুমার মনোরতি-
সমূহ আরঞ্জীব বিশ্বাস করিতেন না, নিজ
হৃদয়েও স্থান দিতেন না ; আত্মপথ পরি-
ষ্কারার্থ অদ্য একটি পতঙ্গ সরাইয়া ফেলি-

লেন, কলা একজন মহোদয় জাতাকে হ-
মন করিলেন, উভয় কার্যই একই প্রকার
ধীর নিঃশব্দে হৃদয়ে করিতেন। একদিন
পিতা, জাতা, জাতপুত্র আত্মীয়বর্গ সেই
উন্নতিপথে পড়িয়াছিলেন, দীরে দীরে তাঁ-
হাদিগকে সরাইয়া দিয়াছিলেন। পিতাকে
মারাবশতঃ জীবিত রাখেন নাই, জ্যেষ্ঠ
জাতা দারাকে ক্রোধবশতঃ হত্যা করেন
নাই, সে সমস্ত বালকোচিত মনোবৃত্তি তাঁ-
হার ছিল না। পিতা জীবিত থাকিলে
তদ্বিষাতে উদ্বেগের সম্ভাবনা নাই, আপন
উদ্দেশ্যসাধনে কোন প্রতিবন্ধক হইবে না,
তিনি জীবিত থাকুন। জ্যেষ্ঠ জাতা জী-
বিত থাকিলে উদ্দেশ্যসাধনে প্রতিবন্ধক
হইতে পারে; জন্মাদ! তাহাকে সরাইয়া
সম্মুটে আলমগীরের পথ পরিষ্কার করিয়া
দাও।

মন্ত্রণাসাধনের জন্য অদ্য আবশ্যিক
যে জয়সিংহ সৈন্য হত হইবেন; তিনি
ভাল কি মন্দ, বিশ্বাসী কি বিজ্ঞোহী অনু-
সন্ধানে আবশ্যিক নাই, তিনি সৈন্যে ম-
রিবেন। এই পরিস্ফেদ-বিরতি সময়ের পর
কএক মাসের মধ্যেই দিল্লীতে সংবাদ
আসিল, অবমানিত, অকৃতার্থ জয়সিংহ
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক-
রিয়া রামসিংহ বলিলেন—

‘প্রভু আমার একটি বাচ্চো
আছে।’

আরং। , নিবেদন করুন।’

রাম। ‘শিবজী যখন দিল্লী আগমন
করিয়াছিলেন, পিতা তাঁহাকে বাক্যদান
করিয়াছিলেন যে দিল্লীতে শিবজীর কো-
নও আপদ ঘটিবে না।’

আরং। ‘আপনার পিতা সে কথা
আমাদের অবগত করাইয়াছেন।’

রাম। ‘রাজপুত্রদিগের মধ্যে বা-
ক্যদান করিয়া তাহা লজ্জন হইলে অতিশয়
নিন্দার বিষয়। পিতার প্রার্থনা ও দা-
সের প্রার্থনা যে প্রভু শিবজীর যে কোন
ও দোষ হইয়া থাকে, ক্ষমা করিয়া তাঁ-
হাকে বিদায় দিন।’

আরংজীব ক্রোধ সত্ত্বরণ করিয়া ধীরে
ধীরে বলিলেন, সম্মুটের যাহা উচিত কার্য
সম্মুটে তাহা করিবেন, সে বিষয়ে আপনি
চিন্তিত হইবেন না।’

আরও ক্ষণেক দানেশমন্দের সহিত
কথোপকথনের পর সম্মুটে বেগমমহলে
যাইলেন, দানেশমন্দ্ ও রামসিংহ ক্ষুদ্রমনে
প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

শিবজী নামে দ্বিতীয় একটি কীট স-
ম্মুটের সেই বিস্তীর্ণ মন্ত্রণাজালে পতিত
হইয়াছেন; দানেশমন্দ্ ও রামসিংহ তাঁ-
হাকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না।

জয়সিংহের যে দোষ শিবজীরও সেই
দোষ; শিবজীও সন্ধিস্থাপনাবধি প্রাণ-
পণে দিল্লীর কার্য করিয়াছেন নিজ সৈন্য
দ্বারা অনেক দুর্গ দিল্লীর অধীনে আনিয়া-
ছিলেন, কিন্তু তাঁহারও বিপুল ক্ষমতা;
আরংজীব কোনও ভৃত্যের উপর বিপুল

কমতা ন্যস্ত করিতে পারেন না, কাছাকাছেও বিশ্বাস করেন না।

বাহুকে অবিশ্বাস করা যায়, তাহার ক্ষেপে অবিশ্বাসের যোগ্য হয়। আরংজীবের জীবিতকালের মধ্যেই মহারাজীরেরা ও দিল্লীর চিরবিখ্যস্ত রাজপুত্রেরা, দিল্লীর বিকল্পে যে ভীষণ যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করিল, যোগল সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া গেল।



সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পীড়া।

“দূরে গেল জটাঙ্গুট।

মধুসূদন দত্ত।

শিবজীর অভিযান সঙ্কটজনক পীড়া হইয়াছে, সমগ্র দিল্লীনগরে এ সংবাদ প্রচারিত হইল। দিবা নিশি শিবজীর গৃহের গবাক ও দ্বার বন্ধ, দিবা নিশি চিকিৎসক আসিতেছেন। এ ভীষণ রোগের উপশম সন্দেহহীন, অন্য যেরূপ রোগ বৃদ্ধি হইয়াছে কল্যাণ জীবিত থাকি অসম্ভব। কখন কখন বা সংবাদ রাষ্ট্র হইতেছে যে শিবজী আর নাই। রাজপথ নিয়া বহুসংখ্যক লোক গমনাগমন করিত ও সেই বন্ধ গবাকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিত, অস্বারোহী সৈনিক ও সেনাপতিগণ কণেক অশ্ব থামাইয়া প্রহরীদিগের নিকট শিবজীর সংবাদ জিজ্ঞাসা

করিতেন; শিবকারোহী রাজা বা মনসুন্দার শিবজীর গৃহের সম্মুখে আসিয়া একবার উঠিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন; শিবজী কিরণ আছেন, তিনি উদ্ধার পাইবেন কি না, তিনি কল্যাণ জীবিত থাকিবেন কি না, এইরূপ নানা কথা নগরবাসী সকলেই বাজারে, পথে, ঘাটে, সর্বসময়ে আন্দোলন করিত। আরংজীব সর্বদাই শিবজীর রোগের সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, তথাপি গৃহের চারিদিকে যে প্রহরী সন্নিবেশিত ছিল তাহা পূর্বমত রাখিলেন। লোকের নিকট শিবজীর রোগের বিষয় আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, মনে মনে সর্বদাই ভাবিতেন, “যদি এই রোগেই শিবজীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার বিশেষ কোম নিন্দা না হইয়াই অনাগ্রাসে কটকোদ্ধার হইবে!”

সম্রাটকাল সমাগত, এরূপ সময়ে একজন প্রাচীন সম্রাট মুসলমান হাকিম শিবির হইতে শিবজীর গৃহদ্বারের নিকট অবতীর্ণ হইলেন। প্রহরীগণ জিজ্ঞাসা করিল, ‘কি উদ্দেশে শিবজীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।’ হাকিম উত্তর করিলেন, ‘সম্রাটের আদেশ অনুসারে রোগীর চিকিৎসা করিতে আসিয়াছি।’ সম্মানে প্রহরীগণ পথ ছাড়িয়া দিল।

শিবজী শয্যাগ শয়ন করিয়া আছেন, তাহার ভৃত্য সঘাদ দিল যে সম্রাট একজন হাকিম পাঠাইয়া দিয়াছেন। তঁহ

বুদ্ধি শিবজী তৎক্ষণাৎ বিবেচনা করিলেন, কোনরূপ বিষপ্রয়োগের জন্য সত্ৰাট এ কাণ্ড করিতেছেন; ভৃত্যকে আদেশ করিলেন,—

‘হাকিমকে আমার সেলাম জানাইও ও বলিও হিন্দু কবিরাজে আমার চিকিৎসা করিতেছে, আমি হিন্দু, অনারূপ চিকিৎসা ইচ্ছা করি না। সত্ৰাটের এই অনুগ্রহের জন্য আমার কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাইবেন।’ কিন্তু ভৃত্য এই আদেশ লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবার পূর্বেই হাকিম অনাহৃত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

শিবজীর হৃদয়ে ক্রোধ সঞ্চার হইল, কিন্তু তাহা সজ্ঞাপন করিয়া অতি ক্ষীণ মুদ্রাস্বরে হাকিমকে অভ্যর্থনা করিলেন, ও শয্যাপার্শ্বে বসিতে আদেশ দিলেন। হাকিম উপবেশন করিলেন।

আকৃতি দেখিলে এরূপ লোকের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে না। বয়স অনেক হইয়াছে, অতি শুক্ল শ্মশ্রু লব্ধিত হইয়া উরঃস্থল আৱৃত করিয়াছে; মস্তকোপরি প্রকাণ্ড উষ্ণীষ, হাকিমের স্বর ধীর ও গম্ভীর। বলিলেন—

‘মহাশয়! ভৃত্যকে যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রুত হইয়াছি, আমার চিকিৎসা ইচ্ছা করেন না; তথাপি মানবজীবন রক্ষা করা আমাদের ধর্ম, আমি স্বধর্মসাধন করিব।’

শিবজী মনে মনে আরও ক্রুদ্ধ হই-

লেন, ভাবিলেন এ বিপদ কোথা হইতে আসিল? কিছু বলিলেন না।

হাকিম। ‘আপনার পীড়া কি?’

কাতর স্বরে শিবজী বলিলেন, ‘জানি না এ কি ভীষণ পীড়া; শরীর সর্বদাই অগ্নিবৎ জ্বলিতেছে, হৃদয়ে বেদনা, সর্বস্থানে বেদনা।’

হাকিম গম্ভীরস্বরে বলিলেন, ‘পীড়া অপেক্ষা জিঘাংসার শরীর অদিক জ্বলে, হৃদয়ের বেদনা অনেক সময় মানসিকক্লেশ-সম্প্রাত; আপনার কি সেই পীড়া?’

বিস্মিত ও ভীত হইয়া শিবজী এই অপরাধ হাকিমের দিকে চাহিলেন; মুখ সেইরূপ গম্ভীর, কোনও ভাবই লক্ষিত হইল না। শিবজী নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন। হাকিম তাঁহার হস্ত ও শরীর দেখিতে চাহিলেন।

শিবজী আরও ভীত হইলেন, অগত্যা হস্ত ও শরীর দেখাইলেন।

অনেকক্ষণ অতিশয় মনোনিবেশ পূর্বক দৃষ্টি করিয়া হাকিম উত্তর করিলেন,—

‘আপনার বচন যেরূপ ক্ষীণ, নাড়ীত সেরূপ ক্ষীণ নহে, ধমনীতে শোণিত সঞ্জারের সঞ্চালিত হইতেছে, পেশীগুলি পূর্ববৎ দৃঢ়বদ্ধ। আপনার এসমস্ত কি প্রবঞ্চনা মাত্র?’

পুনরায় বিস্মিত হইয়া শিবজী এই অপূর্ব চিকিৎসকের দিকে চাহিলেন, চিকিৎসকের মুখ মণ্ডল গম্ভীর ও অকম্পিত, কোনও ভাব লক্ষিত হইল না। শিব-

জীর শরীরে ক্রমে উষ্ণ শোণিত সঞ্চালিত হইতে লাগিল, কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ করিয়া পুমরায় ক্ষীণশ্বরে বলিলেন,—

আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, অন্যান্য চিকিৎসকগণও সেইরূপ বলেন ; এ মহৎ পীড়া বাহ্যলক্ষণশূন্য, কিন্তু দিনে দিনে তিল তিল করিয়া আমার জীবন নাশ করিতেছে ।’

হাকিম ক্রমে চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

‘আলফলায়লা ও লায়লুন’ নামক আমাদের যে একাণ্ড চিকিৎসাশাস্ত্র আছে তাহাতে এক সহস্র এক পীড়ার বিষয় নির্দেশ আছে ; তাহার মধ্যে কয়েকটি বাহ্যলক্ষণশূন্য পীড়ার কথা লিখিত আছে । একটির নাম ‘আকলভু সামাকাতা হওয়ারাশি হা’ । বালকেরা এই পীড়া ভাগ করিয়া চুরি করিয়া মৎস ভক্ষণ করে, ইহার চিকিৎসা প্রহার । আর একটির নাম ‘বকুসুতনে আসিরী ইশারৎ কর্দ’, কষেদোগণ কাজ না করিবার জন্য এই পীড়া ভাগ করে, ইহার চিকিৎসা শিরচ্ছেদন । তৃতীয় এক প্রকার বাহ্যলক্ষণশূন্য পীড়া আছে, শক্রহস্ত হইতে পলাতুকাম বন্দীনিগের সেই পীড়া ঘটে, তাহারও ঔষধি নির্দেশ আছে ; আমি তাহাই আপনাকে দিতেছি ।’

শিবজী এ সমস্ত শাস্ত্রকথা বিশেষ বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু হাকিম ভীক্ৰ-বুদ্ধি ও চতুর, শিবজীর মনের ভাব বুঝি-

নাছেন তাহা শিবজী বুঝিতে পারিলেন । ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘সে ঔষধি কি ?’

হাকিম উত্তর করিলেন, ‘সে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধিও বটে, উৎকট্ বিঘও বটে রকুল আলমিনার নাম লইয়া তাহাই আপনাকে দিব, যদি রোগ যথার্থ হয়, অব্যর্থ ঔষধিতে তৎক্ষণাৎ পীড়া আরোগ্য হইবে, যদি প্রতারণা হয় অব্যর্থ বিঘে তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশ হইবে ।’ এই বলিয়া হাকিম ঔষধি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন ।

শিবজীর হৃৎকম্প হইল, ললাট হইতে শ্বেদবিন্দু পড়িতে লাগিল ! ঔষধি সেবনে অস্বীকৃত হইলে তাঁহার প্রতারণা প্রচারিত হইবে, সেবন করিলে নিশ্চয় মৃত্যু !

হাকিম ঔষধি প্রস্তুত করিয়া আনিли, শিবজী বলিলেন, ‘মুসলমানের পৃষ্ঠে পানীয় আমি পান করিব না ;’ সজ্জোরহস্ত সঞ্চালনে পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন ।

হাকিম কিছুমাত্র কষ্ট হইলেন না । ধীরে ধীরে বলিলেন, ‘এরূপ সজ্জোর হস্ত সঞ্চালন ক্ষীণতার লক্ষণ নহে !’

শিবজী অনেকগুলি অতি কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিয়াছিলেন, আর পারিলেন না । সহসা উঠিয়া বসিলেন, ‘রোগীকে উপহাস করিবার এই শাস্তি,’ বলিয়া মস্তকে চপেটাঘাত করিলেন ও হাকিমের গুরু শ্রদ্ধা সজ্জোরে আকর্ষণ করিলেন ।

বিস্মিত হইয়া দেখিলেন সেই মিথ্যা শ্রদ্ধা সমস্ত খসিয়া আসিল, চপেটাঘাতে

উকীৰ দূরে নিকিষ্ট হইল, তাঁহার বালা মুহুৰ্ত্ত তন্নজী মালজী খিল্ খিল্ করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল ।

কস্টে অনেকগণের হাস্য সম্বরণ করিয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করিলেন । পরে শিবজীর নিকটে আসিয়া উপবেশন করিয়া বলিলেন,—

‘প্রভু কি সৰ্ব্বদাই চিকিৎসককে এইরূপ পারিতোষিক দিয়া থাকেন ? তাহা হইলে রোগীর মৃত্যুর পূৰ্বে দেশের চিকিৎসক নিঃশেষিত হইবে ! বজ্রসম চপেটাঘাতে এখনও মস্তক সুৰ্ণিত হইতেছে !’

শিবজী সহাস্যে বলিলেন, ‘বন্ধু, সিংহের সহিত খেলা করিলে কখন কখন আহত হইতে হয় । যাহা হউক তোমাকে দেখিয়া কতদূর আক্লাদিত হইলাম বলিতে পারি না, এ কয়দিনই তোমাকে প্রত্যাশা করিতেছিলাম, এখন সংবাদ কি বল ।’

তন্ন । ‘প্রভুর সমস্ত আদেশ সম্পাদিত করিয়াছি, একে একে নিবেদন করিতেছি ।

‘সত্ৰাট যে অনুমতি পত্র দিয়াছিলেন তদ্বারা আপনার অনুচরবর্গ সমস্তই নিরাপদে দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে ।’

শিব । ‘সে জন্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করি । এখন আমার মন শান্ত হইল, আমি আপনার পলায়নের জন্য তত ভাবি না; গগনবিহারী গৰুড়পাকী সাংমান্য পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া থাকে না ।’

তন্ন । ‘সেই সমস্ত অনুচর দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গোশ্বামীর বেষধরিয়া মথুরা ও রুম্মাবনে অবস্থিত করিতেছে ; মথুরার অনেক দেবালয়ে পুরোহিতগণও প্রত্যহ আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছে ! আমি দিল্লী হইতে মথুরার পথ বিশেষরূপে দৃষ্টি করিয়াছি, যে যে স্থানে যেরূপ লোক সন্নিবেশিত করিবার আদেশ করিয়াছিলেন তাহাও করিয়াছি ।’

শিব । ‘চির বন্ধু ! তুমি যেরূপ কাৰ্যাদক্ষ অবশ্যই আমরা নিরাপদে স্বদেশে যাইতে পারিব ।’

তন্ন । ‘দিল্লীর প্রাচীরের বাহিরে আপনি যেরূপ একটি তীব্রগতি অশ্ব রাখিতে বলিয়াছিলেন তাহাও রাখিয়াছি, যে দিন স্থির করিবেন, সেই দিনে সমস্ত প্রস্তুত থাকিবে ।’

শিব । ‘ভাল ।’

তন্ন । ‘রাজা জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের নিকট গিয়াছিলাম, তাঁহার পিতা আপনাকে যে বাক্যদান করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম । রামসিংহ পিতার নায় সত্যপ্রিয় ও উদারচেতা, শুনিয়াছি স্বয়ং সত্ৰাটের নিকট যাইয়া আপনার জন্য সাশ্রমণরনে আবেদন করিয়াছিলেন ।’

শিব । ‘সত্ৰাট কি বলিলেন ?

তন্ন । ‘বলিলেন সত্ৰাটের যাহা কৰ্তব্য তাহা করিবেন ।’

শিব । ‘বিশ্বাসঘাতক ! কপটা-

চারী ! এখনও একদিন শিবজী ইহার প্র-
তিশোধ দিবে !’

তন্ন। ‘রামসিংহ সে বিষয়ে বিফল-
প্রযত্ন হইয়াছেন বটে, কিন্তু সুবক সরোবে
আমার নিকট বলিলেন, যে রাজপুত্রের
বাক্য অনাথা হয় না, অর্থাৎ দ্বারা সৈন্যদ্বারা
যে রূপে পাবেন, তিনি আপনার সহায়তা
করিবেন, তাহাতে যদি তাঁহার প্রাণ যায়
তাহাতেও স্বীকার আছেন ।’

শিব। ‘পিতার উপযুক্ত পুত্র !
কিন্তু আমি তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিতে
চাহি না, আমি পলায়নের যে উপায় উ-
দ্ভাবন করিয়াছি তাহা তুমি তাঁহাকে জা-
নাইয়াছ ?’

তন্ন। ‘জানাইয়াছি, তিনি জানিয়া
অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আপনার স-
ম্পূর্ণ সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন ।

শিব। ‘ভাল !’

তন্ন। ‘এতস্তির দানেশমন্দ্ প্রভৃতি
স্বাভাবিক আরংজীবের সভাসদকে দিষ্ট
কথায় বা অর্থাৎ দ্বারা, বা নজর দিয়া আপ-
নার পক্ষবর্তী করিয়াছি । দিল্লীতে হিন্দু
কি মুসলমান এরূপ বড় লোক কেহ নাই,
যিনি আপনার পক্ষবর্তী নহেন ; কিন্তু
আরংজীব কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করেন
না ।’

শিব। ‘তবে সমস্ত প্রস্তুত ! আমি
আরোগ্য লাভ করিতে পারি ?’

সহাস্যে তন্নজী বলিলেন, ‘আমার
জ্ঞান বিজ্ঞ হাকিম যখন আপনার পীড়ার

চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছে, তখন পীড়া
কি থাকিতে পারে ? কিন্তু আপনার
পানের জন্য সুন্দর মিষ্ট শরবৎ প্রস্তুত
করিয়াছিলাম, সমস্তটা নষ্ট করিলেন ?’

শিবজী বলিলেন, ‘বন্ধু, আর এক
পাত্র প্রস্তুত কর ।’ তন্নজী সেই পাত্র
লইয়া পুনরায় শরবৎ প্রস্তুত করিলেন ;
শিবজী পান করিলেন,—সহাস্যে বলি-
লেন, ‘চিকিৎসক ! আপনার ঔষধি যে-
রূপ মিষ্ট সেইরূপ ফলদারী, আমার পীড়া
একেবারে আরাম হইয়াছে ।

তন্ন। ‘তবে এখন প্রস্থান করি ।’
শিবজীকে সম্মুখে আলিঙ্গন করিয়া পুন-
রায় উকীষ ও শ্মশ্রু ধারণ করিয়া তন্নজী
গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন ।

দ্বারদেশে প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল,
‘পীড়া কিরূপ দেখিলেন ?’

হাকিম উত্তর করিলেন, ‘পীড়া অতি-
শয় সঙ্কটজনক, কিন্তু আমার অব্যর্থ ঔষ-
ধিতে অনেক উপশম হইয়াছে ; বোধ করি
অস্পাদিনের মধ্যেই শিবজী এ ক্লেশ হইতে
সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন ।’

হাকিম শিবিকাযোগে চলিয়া গৈ-
লেন ; এক প্রহরী অস্ত্রকে বলিল,—

‘এ হাকিম বড় ভাল, এত ঔষধে যে
পীড়া আরাম করিতে পারিল না,—হা-
কিম একদিনে তাহা আরাম করিল কি
রূপে ?’

দ্বিতীয় প্রহরী উত্তর করিল, ‘হবে না
কেন, এ যে রাজবাটীর হাকিম ?’

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আরোগ্য।

—:~::~~::~—

‘এত শুনি উত্তর কণেক শুদ্ধ হয়ে।
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়ে ॥
হে বীর, কমল চক্ষে কর পরিহার।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমিবা আমার ॥

কাশীরাম দাস।

উপরি উক্ত ঘটনার কএকদিন পর নগরে সংবাদ প্রচারিত হইল যে শিবজীর পীড়ার কিছু উপশম হইয়াছে। নগরে পুনরায় ধুমধাম পড়িয়া গেল; সকলেই সেই কথা কহিতে লাগিল। কেহ কেহ শিবজীর আরোগ্যে দুঃখিত হইলেন; কোন কোন মহাদাশয় মুসলমান এই সংবাদ পাইয়া সুখী হইলেন। পথে, ঘাটে, নৌকানে, মসজীদে সকলেই এই কথা কহিতে লাগিল; আরংজীব এ সংবাদ শুনিয়া যথোচিত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

নগরে ধুমধাম পড়িয়া গেল! শিবজী ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি মুজা দান করিতে লাগিলেন, দেবালয়ে পূজা পাঠাইতে লাগিলেন, চিকিৎসক সকলকে অর্থদানে সন্তুষ্ট করিলেন। বাজারে আর মিষ্টান্ন রহিল না, শিবজী রাশি রাশি মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া দিল্লীর সমস্ত বড় লোকের বাটিতে পাঠাইতে লাগিলেন। পরিচিত সমস্ত লোকের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন, এমন কি প্রতি মসজীদে ফকীরগণের সেবনার্থ প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন

পাঠাইতে লাগিলেন। সজ্ঞাটের মনে বাহাই থাকুক, অন্য সকলেই শিবজীর এই বদান্যতা ও সদাচরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ‘দিল্লীকোলাভু’র ছড়াছড়ি হইতে লাগিল, তাহাতে আর কেহ ‘পস্তাইয়া’ ছিল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু আরংজীব অতি শীঘ্রই পস্তাইয়াছিলেন!

শিবজী কেবল মিষ্টান্ন প্রেরণ করিয়া সন্তুষ্ট হইতেম না, মিষ্টান্ন ক্রয় করাইয়া নিজের গৃহে আনিতেন ও অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আধার সমস্ত নির্মাণ করাইয়া স্বয়ং মিষ্টান্ন সাজাইয়া প্রেরণ করিতেন। সে আধার কখন কখন তিন চারিহাত দীর্ঘ হইত, ৮ কি ১০ জন লোকে বহিয়া লইয়া যাইত। কএক দিন এইরূপে মিষ্টান্ন বিতরিত হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় এইরূপ দুইটি প্রকাণ্ড মিষ্টান্নের আধার শিবজীর গৃহ হইতে বাহির হইল। প্রহরীগণ জিজ্ঞাসা করিল,—

‘এ কাহার বাটিতে বাইবে?’ বাহকেরা উত্তর করিল, ‘রাজা জয়সিংহ-সদনে।’

প্রহ। ‘তোমাদের প্রভু আর কত দিন এরূপ মিষ্টান্ন পাঠাইবেন?’

বাহ। ‘এই অদ্যই শেষ!’

মিষ্টান্নের ভার লইয়া বাহকগণ চলিয়া গেল।

কতক পথ বাইয়া একটি অতি সজ্জু

স্থানে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই দুইটি আধার নামাইল । বাহুকগণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, জনমাত্র নাই, শব্দমাত্র নাই, কেবল সন্ধ্যার বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে ? বাহকেরা একটি ইঙ্গিত করিল, একটি আধার হইতে শিবজী, অপরটি হইতে শম্ভুজী বাহির হইলেন ; উভয়ে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন ।

বিলম্ব না করিয়া উভয়ে ছদ্মবেশে দিল্লীর প্রাচীরভিত্তিমুখে যাইলেন । সন্ধ্যার সময় লোক অতি অল্প, তথাপি, রাজপথে এক একজন লোক যখন নিকট দিয়া যায় শম্ভুজীর হৃদয় ভরে, উদ্বেগে, হৃত্য করিয়া উঠে । শিবজীর চিরজীবন একরূপ বিপদপূর্ণ, তাঁহার পক্ষে কিছুই নূতন নহে ; তথাপি তাঁহার ও হৃদয় উদ্বেগশূন্য ছিল না ।

কম্পিত হৃদয়ে প্রাচীর পাব হইলেন, একজন প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, ‘কে য় ?’

শিবজী উত্তর করিলেন, ‘গোস্বামী । হরেন্দ্রাম হরেন্দ্রাম হরেন্দ্রাম কেবলং ।’

‘কোথা যাইতেছ ?’

‘মথুরা তীর্থস্থানে । কলৌ নাস্ত্যাব, নাস্ত্যাব, নাস্ত্যাব গতিরন্যথা ।’

প্রাচীর পার হইলেন ।

প্রাচীরের বাহিরেও অনেক হর্ষাদি ছিল, অনেক ধনাঢ্য ও উচ্চপদাভিষিক্ত লোক বাস করিতেন । সে সকল দুই পার্শ্বে রাখিয়া শিবজী ও শম্ভুজী ঘুরিতে

পথ অভিবাহন করিতে লাগিলেন । ‘হরেন্দ্রাম হরেন্দ্রাম—ইত্যাদি !’

দূরে একটি বৃক্ষতলে একটি অশ্ব বন্ধ রহিয়াছে দেখিলেন । অতি সতর্কভাবে সেইদিকে যাইলেন, দেখিলেন, তন্নজীবিত অশ্বই বটে ।

জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ভাই, অশ্বরক্ষক ! তোমার নাম কি ?’

‘জানকীনাথ ,’

‘কোথা যাইবে ?’

‘মথুরা ,’

শিবজী বলিলেন, ‘হাঁ এই অশ্ব বটে । শিবজী অশ্বে আরোহণ করিলেন, পশ্চাতে শম্ভুজীকে উঠাইয়া লইলেন, মথুরার দিকে চলিলেন । অশ্বরক্ষক পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে চলিতে লাগিল ।

অন্ধকার নিশীথে, নিঃশব্দ পল্লী বা প্রান্ত দিগা নির্বাক হইয়া শিবজী পলায়ন করিতেছেন । আকাশে নক্ষত্রগুলি মিটমিট করিতেছে, অল্প অল্প মেঘ এক একবার গগন আচ্ছাদিত করিতেছে, বর্ষাকালে পূর্ণ কলেবরা যমুনা নদী প্রবলবেগে বহিয়া যাইতেছে, পথ ঘাট কর্দম বা জলপূর্ণ । শিবজী উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে পলায়ন করিতেছেন ।

দূর হইতে অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল ; শিবজী লুকাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে স্থানে বৃক্ষ বা কুটির নাই, অগত্যা পূর্নর্ষবৎ গমন করিতে লাগিলেন ।

তিন জন অশ্বারোহী বেগে দিল্লী

অভিমুখে আসিতেছেন; তাহাদিগের কোবে অসি, হস্তে বর্ষা। দূর হইতে শিবজীর অঙ্খ দেখিতে পাইয়া সেই দিকে অঙ্খ প্রধাবিত করিলেন। শিবজীর হৃদয় উদ্বেগে দুক দুক করিতে লাগিল।

নিকটে আসিয়া একজন অশ্বারোহী গিজামা করিলেন—‘কে বায়?’

শিব। ‘গোশ্বামী।’

অশ্বারোহী। ‘কোথা হইতে আসিতেছ?’

শিব। ‘দিল্লীনগর হইতে।’

অশ্বারোহী। ‘আমরা দিল্লীনগর যাইব; কিন্তু পথ হারাইয়াছি, আমাদিগের সঙ্গে আসিয়া পথ দেখাইয়া দাও, পরে মথুরায় যাইও।’

শিবজীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল; দিল্লী যাইতে অশ্বীকার করিলে সৈনিকেরা বল প্রকাশ করিবে, নিবাদের সময় সহসা শিবজীকে চিনিলেও চিনিতে পারে; কেননা দিল্লীতে এরূপ সৈনিক ছিল না যে শিবজীকে দেখে নাই। আর দিল্লীতে পুনর্গমন করিলে সহস্র বিপদ! ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একজন অশ্বারোহী সম্মুখে আসিয়া শিবজীর সহিত কথা কহিয়াছিল, অপর দুইজন অশ্বারোহীরে পরামর্শ করিতেছিল। কি পরামর্শ?

একজন বলিল, ‘এ স্বয়ং আমি জানি,—আমি দক্ষিণদেশে শায়েস্তার আদীনে অনেক দিন বৃষ্ণ করিয়াছি,

আমি নিশ্চয় বলিতেছি পথিক গোশ্বামী নহে।

অপর জন বলিল, ‘তবে কে?’

‘আমি সন্দেহ করি এ স্বয়ং শিবজী, দুইজন মনুষ্যের কণ্ঠস্বর ঠিক একরূপ হয় না।’

‘দূর মুখ! শিবজী দিল্লীতে বন্দী হইয়াছে।’

‘সেইরূপ আমরাও মনে করিয়াছিলাম যে শিবজী সিংহগড় দুর্গে আছে, সহসা একদিন রজনীযোগে পুনঃ ধ্বংস করিয়া গিয়াছিল।

‘ভাল, মস্তকের বস্ত্র তুলিয়া দেখিলেই সকল সন্দেহ দূর হইবে,

সহসা একজন অশ্বারোহী আসিয়া শিবজীর উক্ষীষ দূরে নিক্ষেপ করিল, শিবজী চিনিলেন শায়েস্তার অধীনস্থ একজন প্রধান সেনানী!

যদি হস্তে কোনরূপ অস্ত্র থাকিত শিবজী একাকী তিনজনকে হত করিবার চেষ্টা করিতেন। রিক্তহস্তেও একজনকে মুক্তি আঘাতে অচেতন করিলেন। এমন সময় আর দুইজন অসি হস্তে নিকটে আসিয়া শিবজীকে ধরিয়া ভূতলশায়ী করিল।

শিবজী নিৰ্ব্বাক! ইচ্ছদেবতাকে স্মরণ করিতেছিলেন। আবার বন্দী হইবেন, বিদেশে বন্ধুশূন্য হইয়া আরংজীব কর্তৃক হত হইবেন, এই চিন্তা করিতেছিলেন। শব্দজীর দিকে নয়ন পড়িল, চক্ষু

জলে আপ্ত হইল। বলিলেন, ‘দেব দেব মহাদেব, জীবনে একমনে আপনার পূজা করিয়াছি, হিন্দুধর্ম রক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়াছি, এক্ষণে আপনার বাহা উদ্দেশ্য থাকে তাহাই করুন। আশা, ভরসা, উদ্যম এক মুহূর্তের মধ্যে বিলুপ্ত হইল।

সহসা একটি শব্দ হইল, শিবজী দেখিলেন, একজন অশ্বারোহী তীরবিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। আর একটি তীর, আর একটি তীর; শিবজীর তিন জন শত্রুই ভূতলশায়ী! তিন জনই গভ-জীবন!

যে দিক হইতে তীর আসিল, শিবজী সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—দেখিলেন অশ্বরক্ষক জানকীনাথ!

অশ্বরক্ষক নিকটে আসিল;—শিবজী বিস্মিত হইয়া দেখিলেন অশ্বরক্ষকবেশে সীতাপতি গোস্বামী!

সাত্ৰপনয়নে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন ‘শিবজীর প্রকৃত বন্ধু! আপনি না হইলে এদাসকে কে রক্ষা করে? যুদ্ধদবর সীতাপতি! অশ্বরক্ষক বলিয়া যদি ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়া থাকি ক্ষমা করুন, অদ্য শিবজী আপনার রূপায় জীবন দান পাইল।

অশ্বরক্ষকবেশধারী ধীরে ধীরে শিবজীর পদতলে পতিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন।

‘প্রভু ছদ্মবেশ ক্ষমা করুন; আমি অশ্বরক্ষকও নহি, গোস্বামীও নহি,—

আপনার পুরাতন ভৃত্য রঘুনাথজী হাবেলদার! প্রভুর নিকট শত অপরাধ করিয়াছি কিন্তু প্রভু ক্ষমা না করিলে আর কে ক্ষমা করিবে?

শিবজী আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না,—বালিকার মায়ের উৰ্দ্ধঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া রঘুনাথকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন, কহিলেন ‘রঘুনাথ! রঘুনাথ! তোমার নিকট যে পাপ করিয়াছি তাহার ক্ষমা নাই, তোমার শ্লগের পরিশোধ নাই! শিবজীর জীবনের বন্ধু! আর যেন শিবজী এজীবনে তোমাকে না ছাড়াই!

অদ্য নিশীথে রঘুনাথের ব্রত উদ্যাপন হইল, শিবজীর ক্ষোভ দূর হইল,—পরম্পরের হৃদয়ে পরম্পর শান্তি লাভ করিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাসাদে।

—

‘কি দাক্ষণ বুকের ব্যথা!

সে দেশে বাইব যে দেশে না শুনি পাপ পিরিতের কথা ॥

সই! কে বলে পিরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া কাঁদিয়া
জনম গেল ॥

কুলবতী হইয়া কুলে দাঁড়াইয়া যে ধনী
পিরিতি করে।

ভুয়ের অনল যেন সাজাইয়া এমতি পুড়িয়া
মরে ॥

হাম বিনোদিনী, এ দুঃখে দুঃখিনী, প্রেমে
 *
 ছল ছল আঁখি ।
 চণ্ডীদাস কহে, সে গতি হইয়া, পরাগ
 সংশয় দেখি ॥”

চণ্ডীদাস ।

নিশীথে সীতাপতি গোস্বামীর নিকট
 বিদায় লইয়া রাজপুত্রবালা গৃহে আসি-
 লেন, কিন্তু গৃহে আসিয়া সরযু দেখিলেন
 হৃদয় শূন্য! কে না জানে প্রথম কন্ঠ
 যদিও অতিশয় ভীষণ ও দুর্লভনীর, কিন্তু
 তাহার পর সেই কথা স্মরণ করিলে হৃ-
 দয়ে যে দুঃখ উছলিতে থাকে, নীরবে নয়ন
 হইতে যে অশ্রু বহির্গত হইতে থাকে সেই
 শোক অধিক মর্শ্বভেদী। জগতের মধ্যে
 প্রিয়জনের প্রথম বিচ্ছেদ ঘটিলে আমরা
 বালকের স্নায় উঠেছে স্বরে রোদন করিয়া
 উঠি, জ্ঞানশূন্যের ন্যায় ভূমিতে গড়াগড়ি
 দি,—সে প্রথম শোক-উল্লাস সেই আ-
 র্ত্তনাদেই নিবারণিত হয়। কিন্তু দিবস যা-
 ইলে, মাস গত হইলে, বৎসর অতিবাহিত
 হইলে, সেই প্রিয়জনের কথা যখন স্মরণ
 হয়, নীরবে রজনীর অঙ্গকারে যখন হৃদয়
 আপনি শোকপারাবারে ভাসিতে থাকে,
 নয়নের দ্বার যখন উদঘাটিত হয়, নীরবে
 অশ্রুবিন্দু পড়িতে থাকে,—উঃ মনুষ্য-
 জীবনে সেই যাতনাই অসহ্য! প্রিয়জ-
 নের মুখ মনে পড়ে, তাহার বাক্যগুলি,
 কার্য্যপরম্পরা, স্নেহ, ভালবাসা, একে
 একে হৃদয়ে জাগরিত হইতে থাকে, নি-
 স্তক্স রজনীতে সেই পূর্ব্ব কথা একে একে

উদয় হইতে থাকে, তখনই হৃদয় শূন্য হয়,
 আমরা বালিকার ন্যায় নিরাশ্রয় হইয়া
 নীরবে রোদন করিতে থাকি !

দিন গেল, সপ্তাহ গত হইল, মাস অ-
 তিবাহিত হইল, সরযুর চিন্তা দিনে দিনে
 মর্শ্বভেদী হইতে লাগিল। অঙ্গকার নি-
 শীথে কখন কখন বালিকা একাকী গবা-
 ক্ষপার্শ্বে উপবেশন করিয়া সজ্জা হইতে
 দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, ত্রিপ্রহর হইতে প্রাতঃকাল
 পর্য্যন্ত কত চিন্তা করিত কে বলিবে? কত
 কথ্য একে একে স্মরণ হইত, কতবার নী-
 রবে নয়ন হইতে ধীরে ধীরে অশ্রুবিন্দু প্র-
 বাহিত হইত। নীরবে সেই গবাক্ষ দিয়া
 পথপানে চাহিয়া থাকিতেন, সে পথ
 দিয়া হৃদয়বল্লভ আর আসিলেন না !

কখন বা সেই পূর্ব্বতস্কুল কক্ষদেশ
 মনে জাগরিত হইত, সেই তোরণ-দুর্গ
 মনে উদয় হইত। সরযু একাকী ছাদে
 আসীন রহিয়াছেন, সজ্জার ছায়া ক্রমে
 গগন ও জগৎ আৱৃত করিতেছে, সজ্জার
 বায়ু বহিয়া বহিয়া সরযুর কেশ লইয়া
 ক্রীড়া করিতেছে;—এমত সময় সেই দী-
 পাকার উদার মূর্ত্তি যুবক যেন আকাশ-
 পটে দেবচিত্রের ন্যায় দৃষ্ট হইল। সর-
 যুর হৃদয় শিহরিয়া উঠিল, বালিকার হৃদয়
 নব নব ভাবে উৎফুল্ল হইতে লাগিল।
 অদ্য তিন বৎসর অতীত হইয়াছে কিন্তু
 যে মূর্ত্তি সরযুর হৃদয় হইতে অপনীত হয়
 নাই।

তাহার পরদিন সেই পুঙ্খমসিৎহ যে

স্নেহগদ্যাদ্বয়ে সরযুর নিকট বিদায় লইয়াছিলেন, সভয়ে ধীরে ধীরে সরযুর কণ্ঠে যে কণ্ঠমালা দোলাইয়া দিয়াছিলেন, জীবন থাকিতে সরযু কি তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন ? পুনরায় কি সে বীর সরযুর কণ্ঠে কণ্ঠমালা পরাইয়া দিবেন, পুনরায় কি সরযু সেই হৃদয়বল্লভকে দেখিতে পাইবেন ?—নীরবে সরযু দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, নীরবে গণ্ডস্থল দিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল ।

কখন বা অপরাহ্নে একাকী সরযু অত্রকাননে ভ্রমণ করিতেন, ভ্রমণ করিতে করিতে কত কথা হৃদয়ে জাগরিত হইত । রুক্মের উপর হইতে কপোত কপোতী যুদ্ধস্বরে প্রেমগীত গাইতেছে, সেই গীত শুনিয়া একদিন রঘুনাথ কাণে কাণে সরযুকে কি কথা বলিয়াছিলেন স্মরণ হইল ; সরযুর মুখে বিষাদের ছানি আছিল । আর এক দিন ঐ বিশাল আত্র রুক্মতলে বসিয়া রঘুনাথ ও সরযু একত্রে একটি স্মৃতিষ্ট আত্ম তদন্ত করিয়াছিলেন, খাইতেছিলেন আর পরস্পরে পরস্পরের দিকে সন্মুখে চাহিতে ছিলেন, সে কথা হৃদয়ে জাগরিত হইল । ঐ কণ্ঠক বনের ভিতর দিয়া আর এক দিন রঘুনাথ অরণ্য ক্ষতবিক্ষত হইয়াও একটি স্মৃতির বন্যপুষ্প চয়ন করিয়া সরযুর কৈশে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, পরে কি স্মৃতিস্বরে বলিয়াছিলেন, 'সরযু ! কি অপরাধ বনদেবীর রূপ ধারণ করিয়াছ !' তাহা ! সে স্মৃতির স্বর কি

সরযু আর শুনিবেন, পুনরায় কি রঘুনাথ হুঃখিনীর জন্য পুষ্প চয়ন করিবেন, হতভাগিনীর ভাগ্যে কি এরূপ স্নেহ আছে ? সরযু শোকে বিবশা হইলেন, নয়ন হইতে দুই চারি বিদু জল টম্ টম্ করিয়া জ্বলিতে পতিত হইল, নীরবে আপনায় অঞ্চল দিয়া নয়ন মুছিলেন । রূপা চেষ্টা, আবার চিন্তা আসিল, আবার নয়ন পূর্ণ হইল ।

কখন কখন রজনী দ্বিপ্রহরের সময় সহসা হৃদয়ের দ্বার উদ্বাটিত হইত, তাত্র মাসের মদীর ন্যায় শোকপারাবার উৎলিয়া উঠিত । তখন কেহ দেখিবার নাই, সরযু প্রাণভরে কাঁদিতেন, আবণ মাসের ধারার ন্যায় নয়ন হইতে অজস্র বারিধারা বহিতে থাকিত । রঘুনাথের মধুময় মুখ, মধুময় কথা মনে পড়িত, একটি কথার পর অন্য কথা মনে উদয় হইত, শোকতরঙ্গের পর শোকতরঙ্গ হৃদয়ের উপর বহিয়া যাইত,—উপাধানে মুখমণ্ডল আনত করিয়া বালিকা বিবশা ব্যাকুলহৃদয়া হইয়া দরবিগলিত ধারায় উপাধান সিস্ক করিত । রজনী প্রভাত হইত, প্রাতঃকালের রক্তিমচ্ছটা পূর্বদিকে দেখা দিত ; বালিকা তখনও চিন্তাবিদম্বা, অথবা শোকে বিবশা হইয়া স্তম্ভিত রহিয়াছেন ।

প্রাতঃকালে পুষ্প চয়ন করিতে উদ্ভানে যাইতেন, প্রফুল পুষ্পগুলি একে একে চয়ন করিতেন, হৃদয়ে স্থাপন করিতেন, আর কি চিন্তা করিতেন কে বলিবে ? চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় পুষ্পের

দিকে চাহিতেন, পুষ্পদলগত প্রাতঃশি-
শিরবিন্দুর সহিত দুই একটি পরিষ্কার স্বচ্ছ
অক্ষয়বিন্দু মিশাইয়া যাইত। সায়ংকালে
নীলা হস্তে করিয়া কখন কখন গীত গাইতেন;
—আহা সে যে শোকের গীত, শ্রোতৃ-
দিগের নয়নেও জল আসিত। বালাকালে
রাজপুত্র চরণদিগের নিকট যত শোকের
গীত শিখিয়াছিলেন তাহাই গাইতেন,
ভিক্ষাধিনীর গীত গাইতেন, দুঃখিনীর
গীত গাইতেন, অনাধিনীর গীত গাই-
তেন, সায়ংকালের নিস্তরঙ্গতায় সেই গীত
ছাদ হইতে ধীরে ধীরে নৈশ আকাশে
উদ্ভিত হইত, ধীরে ধীরে বায়ুমাৰ্গে বি-
স্তৃত হইত, গীতের সহিত গায়কীর নয়ন
হইতে বিন্দু বিন্দু জল নির্গত হইত, অথবা
শোকপারাবার সহসা উথলিয়া উঠিত,
গায়কীর কণ্ঠকন্ড হইত, গীত সহসা লীন
হইয়া যাইত।

দিবরাত্রি শোকচিন্তা শেষ হইত না,
দিবরাত্রি সেই পথেরদিকে সরসুবালা
চাহিয়া থাকিতেন, সে পথ দিয়া হৃদয়ব-
স্ত্র আর আসিলেন না।

বসন্তকালে হৃদয়নাথ বিদায় হইয়া-
ছেন, সে বসন্তকাল অতিবাহিত হইল,
সুকণ্ঠ পক্ষীগুলি একে একে কুলায় হ-
ইতে উড়িয়া গেল। বৃক্ষসমূহে সুন্দর
পুষ্পগুলি একে একে অদৃশ্য হইল, গ্রীষ্ম
কাল নানারূপ পুস্পাঙ্ক ফল আনিয়া মানব
হৃদয় আনন্দিত করিল, জগৎকে সুশো-
ভিত করিল। সরসুবালা সেই পথ চা-

হিয়া রহিয়াছেন,—সে পথে হৃদয়নাথ
দর্শন দিলেন না।

আকাশে মেঘাভ্রমর হইল, ক্রমে বর্ষার
ধারা আরম্ভ হইল, নব নদী জলাশয় পূর্ণ-
কলেবর হইল, ক্ষেত্রে সুন্দর শস্য শোভা
পাইতে লাগিল, জলে মাঠ, বিল, প্রান্তর
প্লাবিত হইল। সেই প্রান্তরের উপর সরসু
একদুকিতে চাহিয়া রহিয়াছেন, হৃদয়েশ
কি এখনও কার্যসিদ্ধি লাভ করেন নাই,
হৃদয়েশের কি এখনও সরসুক্রে মনে
আছে? হৃদয়েশ কি কুশলে আছেন?
জলে নয়ন প্লাবিত হইল,—আর দেখিতে
পাইলেন না।

ক্রমে ক্রমে বর্ষার জল অপসৃত হইল,
আকাশ পরিষ্কার হইল, শিশীথে শরচ্ছত্র
উদয় হইয়া গগণে ও জগতে জ্যোতিঃ বি-
স্তার করিতে লাগিল। সরসুর হৃদয়াকাশ
কবে পরিষ্কার হইবে, হৃদয়নাথ কবে নি-
শানাথের ন্যায় উদয় হইয়া সরসুর মনে
আনন্দজ্যোতিঃ বিস্তার করিবেন? সরসু
পথ চাহিয়া রহিলেন, হৃদয়নাথ আসি-
লেন না!

এরূপ ভীষণ চিন্তায় ক্রমে সরসুর শ-
রীর শুষ্ক হইতে লাগিল, মুখমণ্ডল পাণ্ডু-
বর্ণধারণ করিল, গগন কালিমাবেষ্টিত হ-
ইল। সরলস্বভাব জনার্দন এখনও সরসুর
হৃদয়ের কথা কিছু জানেন না, কিন্তু সর-
সুর শরীরের অবস্থা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি
চিন্তিত হইলেন, কারণ অসুসঙ্কান করিতে
লাগিলেন।

নারীর নিকট নারীর মনের কথা শুণ্ড থাকে না, সরযু অনেক যত্নে শোক স-
জ্ঞোপন করিলেও তাঁহার সখী ও দাসী-
গণ তাঁহার কথুকথা কিছু কিছু অনুমান
করিয়াছিল, ক্রমে সেই কথা রুক্ম জনার্দ-
নের কণে উঠিল ।

দিন সন্ধ্যা ও নির্মলচরিত্র, ত-
থাপি জনার্দন রাজপুত্র, সকল রাজপুত্র
ক্রোধের ন্যায় অতিশয় বংশমর্যাদাগর্ব্বী ।
বংশমুণ্ডিলেন, আপনার একমাত্র দুহিতা
কেও সামান্য মহারাষ্ট্র সৈনিককে বি-
বাহ করিতে চাহে, বিদ্রোহীর সহিত বি-
বাহ করিয়া কুলে কলঙ্ক আনিতে চাহে ;
তখন জনার্দনের নয়ন আরক্ত হইল, রু-
ক্মের শরীর কম্পিত হইতে লাগিল ।

গৃহভাঙ্গুরে আসিয়া বালিকাকে
'পাপীয়াসী' 'পীশাচী' বলিয়া গালি-
দিলেন, সরযু পিতার তিরস্কার নীরবে
সহ্য করিলেন, জগতে একুপ কি যাতনা
আছে হৃদয়বল্লভের জন্য নারী যে যাতনা
সহ্য করিতে পরাস্থ ?

রুক্ম, বাতুলের ন্যায় একমাত্র দুহি-
তাকে শোকাক্ত নীরব দেখিয়া ক্রোধ স-
ম্বরণ করিলেন, সরযুকে ক্রোড়ে লইয়া
সামান্যনয়নে বলিলেন—

'দেখ দেখি মা ! আমার মস্তকে
একটি কেশও কৃষ্ণ নাই, এই রুক্ম বয়সে
কি তুমি আমাকে যাতনা দিবে ?' উঃ !
সে সন্মুহ ভেদ সনা সরযু সহ্য করিতে
পারিলেন না, পিতার কণ্ঠ ধরিয়া উঠিল :-

স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, পিতাও
রোদন করিলেন ।

রুক্ম সরযুর সখীদিগের দ্বারা সরযুকে
অনেক বুঝাইলেন, অন্য যুবকের সহিত
সরযুর বিবাহ স্থির করিতে চাহিলেন, নি-
জের কুল-গৌরবের কথা অনেক বলি-
লেন ।

সরযুর একই উত্তর 'পিতাকে বলিও
আমার বিবাহে কচি নাই, চিরকাল অবি-
বাহিত থাকিয়া তাঁহারই পদসেবা করিব ।'

রুক্ম ক্ষণেক ক্ষণেক শোকাক্ত হইতেন,
ক্ষণে ক্ষণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইতেন । এক
দিন ক্রোধপরিবশ হইয়া সরযুকে বলি-
লেন—

'সরযু ! আমি রাজপুত্র, রাজপুত্রেরা
কন্যার অবমাননা দেখিবার পূর্বে কন্যার
হৃদয়ে ছুরিকা স্থাপন করে, চরণদিগের
গীতে একুপ শুনিয়া থাকিবে ।'

ধীরে ধীরে সরযু উত্তর করিলেন—

'পিতা, সেইরূপ জনকই যথার্থ দ-
য়ালু ! পিতা আপনিও যদি সেইরূপ আ-
চরণে আমার হৃদয়ের অসহ্য বেদনা শাস্ত
করেন, আমি জগে জগে আপনার দয়ার
কীর্তন করিব ।'—রুক্ম অশ্রুস্রবনে গৃহত্যাগ
করিলেন ।

ক্রমে চারিদিকে এ কথা বিস্তার হ-
ইতে লাগিল, মন্দ লোকে আরও দুই এ-
কটি কথা বাড়াইল,—কেহ কেহ বলিতে
লাগিল, জনার্দনের কন্যা ব্যাভিচারিণী ;
তাঁহার বিবাহ হইতেছে না ।

যেদিন জনার্দন এই কথা শুনিলেন, তাঁ-
হার কলেবর ক্রোধে কম্পিত হইতে লা-
গিল; গৃহে আসিয়া কন্যাকে যথোচিত
তিরস্কার করিয়া বলিলেন—

‘পাপীগণি, তোর জন্ম কি আমি
এই বৃদ্ধ বয়সে অবমানিত হইব? তুই আ-
মার নিকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক দিবি? আমার
বাটি হইতে দূর হ।’

ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণনয়নে সরসু উত্তর
করিলেন—

‘পিতা! আমি অবাদ্য, যদি আ-
পনার নিকট কখন কোনও দোষ করিয়া
থাকি মার্জনা করুন, কিন্তু জগদীশ্বর আ-
মার সহায় হউন, আমাহইতে আপনার
অবমাননা হইবে না।’

এ কথার অর্থ তখন জনার্দন বুঝিলেন
না, এ কথার অর্থ তাহার পর দিন বৃদ্ধ
বুঝিতে পারিলেন।

সেই দিন অন্ধকার নিশীথে সপ্তদশব-
র্ষীয়া বালিকা একাকিনী পিতৃগৃহে তাগ
করিলেন, একাকিনী সংসারের বিস্তীর্ণ
সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

কুটীরে।

হুংখে হুংখে খুলনা শরৎকাল ভানে।
আস্থানে আসিবেন প্রভু দেবীর উৎসবে।।
কার্তিক মাসেতে হইল হিমের প্রকাশ।
গৃহে নাহি প্রাণনাথ করি বনবাস।।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

শরৎকালের প্রাতের কমলীর আলোকে
বেগাবতী নীরা নদী বহিয়া যাইতেছে, স্ব-
র্গ্যকিরণে জলের হিমোল ^{কম}সাঁ করিতে
করিতে যাইতেছে। সেই সুন্দর নদীর উ-
ত্তর পাশে সুন্দর শ্যামলক্ষেত্র বহুদূর পর্যন্ত
বিস্তৃত রহিয়াছে, কৃষকের পুঞ্জের
সঙ্কট হইয়া মেদিনী সেই ক্ষেত্র পরিষ্কদে
হাস্য করিতেছে। উত্তর ও পূর্বাধিকে সেই
ইরূপ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র অথবা ^{দুই}এ-
কটি গ্রাম দৃষ্ট হইতেছে, দক্ষিণে ও প-
শ্চিমে পার্বতরাশির উপর পার্বতরাশি বা-
লস্ব্যাকিরণে অপরূপ শোভা ধারণ করি-
তেছে।

সেই নদীকূলে শ্যামলক্ষেত্রবেষ্টিত এ-
কটি সুন্দর গ্রাম সন্নিবেশিত ছিল, গ্রা-
মের এক প্রান্তে একটি কৃষকের কুটীরের
নিকট একটি বালিকা নদীকূলে খেলা ক-
রিতেছে, নিকটে একজন দাসী দণ্ডায়মান
রহিয়াছে। কৃষকপত্নী গৃহকার্যে ব্যস্ত
রহিয়াছে।

গৃহ দেখিলে কৃষককে সস্ত্রাস্ত বলিয়াই
বোধ হয়। প্রাঙ্গণে দুই একটি গোলাঘর
রহিয়াছে, পাশে চারি পাঁচটি গাছ বাঁধা
রহিয়াছে, বাটির ভিতর তিন চারিখানি
ঘর, বাহিরে একখানি বড় ঘর। দেখিলেই
বোধ হয় গৃহস্থানী কৃষক হইলেও গ্রামের
মধ্যে একজন ‘মাতঙ্গর’ লোক,—ব্য-
বসা ও মহাজনী কার্যে কিছু কিছু করিয়া
থাকে।

বালিকা সপ্তমবর্ষীয়া, শ্যামবর্ণ, চঞ্চল,

বালিকা। ‘না দিদি, তখনও তোকে ভুলিব না, বরের চেয়ে তোকে অধিক ভাল বাসব। আর তুই দিদি,—তোর যখন বর আসবে তখন আমাকে ভুলবিনি?’

দাসীর চক্ষে পুনরায় জল আসিল, তাহা মোচন করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল,—

‘না তখনও ভুলব না।’

বালিকা। ‘বরের চেয়ে আমাকে অধিক ভাল বাসবি?’

দাসী হাস্য করিয়া বলিল ‘সমান সমান।’

বালিকা। ‘তোর বর কেবে আসবে দিদি?’

দাসী। ‘ভগবান্ জানেন! ছাড়, রান্নার বেলা হইয়াছে, আমি যাই।’
দাসী অন্ন প্রস্তুত করিতে গেল।

পাঠক বলা অনাবশ্যক যে, অনাধিনী সরযুবালা জগতে আর স্থান না পাইয়া একজন কৃষকের বাটীতে দাস্যবৃত্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। কৃষকের কিছু সম্পত্তি ছিল, মহাজনি ছিল, নাম গোকর্ণনাথ। গোকর্ণের অন্তঃকরণ সরল ও স্নেহযুক্ত, নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণকন্যাকে নিজের বাটীতে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন। গোকর্ণের গৃহিণীও স্বামীর উপযুক্ত; নিরাশ্রয় ভদ্র ব্রাহ্মণকন্যাকে দেখিয়া অবধি নিজের কন্যার ন্যায় লালন পালন করিতেন। সরযুও কৃতজ্ঞ হইয়া গোকর্ণ ও তাঁহার স্ত্রীর যথোচিত সমাদর করিতেন, নিজে দুই-

বেলা অন্ন প্রস্তুত করিতেন, বালিকার ভ্রূবধারণ করিতেন, সুত্তরী কৃষক ও কৃষক-পত্নীর কার্যের অনেক লাভ হইল, তাঁহারাও দিন দিন সরযুর উপর আর্থিক প্রসন্ন হইতে লাগিলেন।

সরযুনাথের অবর্তমানে যদি সরযুর কোথাও সুরথের সম্ভাবনা থাকিত, তবে উদারস্বভাব গোকর্ণনাথ ও তাঁহার স্ত্রী গৃহিণীর বাটীতে থাকিয়া সরযু পরম সুরথ লাভ করিতে পারিতেন। গোকর্ণের বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসর হইবে কিন্তু চিরকাল নিয়মিত পরিশ্রম করিতেন বলিয়া এখনও শরীর সুবদ্ধ ও বলিষ্ঠ। গোকর্ণের একটি পুত্র শিবজীর সৈনিক, বহুদিন অবধি বাটী ত্যাগ করিয়াছে; শেষে যে একটি কন্যা হইয়াছিল, পিতামাতা উভয়েই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। প্রাতঃকালে গোকর্ণ কৃষিকার্যে বা অন্য কার্যে বাহির হইয়া যাইতেন, সরযু গৃহের সমস্ত কার্য নিৰ্ব্বাহ করিতেন। গৃহিণী অনেক সময় বলিতেন, ‘বাছা, তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, এরূপ পরিশ্রম করিলে তোমার শরীর থাকিবে কেন? তোমার করিতে হইবে না, আমিই করিব।’ সরযু স্নেহে উত্তর করিতেন, ‘না, তুমি আমাকে যেরূপ যত্ন কর, তোমার কাজ করিতে পরিশ্রম হয় না, আমি জন্ম জন্ম তোমার সেবা করিব, তুমি আমাকে এইরূপ স্নেহ করিও।’ স্নেহবাক্যে সরলস্বভাব বৃদ্ধ গৃহিণীর নয়নে জল আসিত, চক্ষুর জল মুছিয়া বলিতেন,

‘সরযু! বাছা তোর মত মেয়ে কখনও দেখি নাই, তোমার মত আমাদের জাতির একটি মেয়ে পাই, তবে আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দি।’ পুত্র অনেক দিন গৃহ ত্যাগ করিয়াছে, সে কথা স্মরণ করিয়া প্রাচীনা ক্ষণেক রোদম করিতেন।

ত্রিপ্রহরের সময় যখন গোকর্ণ ও তাঁহার গৃহিণী গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া বিজ্ঞান করিতেন, সরযু বালিকাকে ঘুম পাড়াইতেন, পরে ধীরে ধীরে স্বয়ং গৃহের পার্শ্ববর্তী স্নানদিশাল একটি আত্মকাননের তলে বসিয়া কখন বা স্ত্রী কাটিতেন, অনেক ক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিতেন। বিশাল আত্মকাননের ছায়া অনেক দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকিত, ত্রিপ্রহরের সূর বায়ু পত্র হইতে স্নানদিশাল শব্দ আকর্ষণ করিত, দুই একটি কপোত বা ঘুসু সেই ছায়ার ডালে উপবেশন করিয়া সূর্য্যের নীত গাইতে থাকিত, সেই স্নানদিশাল পাদপাশ্চাত্য সরযু একাকিনী বসিয়া অনন্ত চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। ছয় মাস অতীত হইয়াছে হৃদয়বল্লভ স্বার্থাসাধনে গিয়াছেন, রঘুনাথ কেব আশিবেন, অনাধিনী কত দিন পথ চাহিয়া থাকিবেন? এত দিন কি সরযুকে স্মরণ আছে? যুদ্ধকালে, বিজয়ের কালে কি একবার স্মরণ করেন যে, দূর মহারাষ্ট্র দেশে একজন অভাগিনী তাঁহার পথ চাহিয়া আছেন, তাঁহার আশায় জীবনা ধারণ করিয়া আ-

ছেন? দিল্লীর অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত সুখ! সে সুখে রত হইয়া কি হৃদয়ে স্মরণ বাল্যকালের প্রতিজ্ঞা ভুলিলেন?

তৎকরণং বিদায়ের কথা স্মরণ হইল, বিদায়ের সময় সরযুর হস্ত ধরিয়া রঘুনাথ যে সন্মুখের কথা গুলি বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইল। না, রঘুনাথ দাসীকে ভুলিবেন না, তাঁহার প্রাণ অবিচলিত! কার্য্যসিদ্ধ হইলেই আসিবেন।

ঐ বৃদ্ধের পক্ষীর মত সরযু যদি একবার পক্ষ পায়, তাহা হইলে এই ক্ষণেই সেই দূর দিল্লীতে উড়িয়া যায়, যথায় হৃদয়ে বসিয়া আছেন তথায় যায়, তাঁহার হৃদয়ে মস্তকখানি রাখিয়া সরযু একবার প্রাণতরে ক্রন্দন করে।

এই রূপ নানা চিন্তার দিবস অতিবাহিত হইত, বৈকালে পুনরায় গৃহকার্য্য করিতেন, সায়াংকালে যখন গোকর্ণ পরিবারের মধ্যে বসিয়া পুত্রের কথা, যুদ্ধের কথা কহিতেন, অবগুণ্ঠনবতী সরযু বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া মনোনিবেশ করিয়া সেই কথা শুনিতেন।

এইরূপে এক মাস, দুই মাস অতিবাহিত হইল। এক দিন সায়াংকালে গোকর্ণনাথ গৃহিণীর নিকট বসিয়াছেন, এক প্রান্তে সরযু বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, এরূপ সময়ে গোকর্ণ বলিলেন,—

‘গৃহিণী, শান্ত হও, আজ স্মরণ আছে।’

গৃহিণী। ‘আহা! তোমার মুখে কুল চন্দন পড়ুক, বাছা ভীমজীর কোন সংবাদ পাইয়াছ?’

গোক। ‘শীত্ৰই পাইব, পুত্র শিবজীর সহিত দিল্লী গিয়াছিল,—অন্য শুনিলাম দুই বাদশাহের হস্ত হইতে পলাইয়াছেন, দেশে আসিতেছেন, আমাদের ভীমজী অবশ্য তাঁহার সঙ্গে আসিবেন।’

গৃহিণী। ‘আহা ভগবান্ তাহাই কখন, প্রায় একবৎসর হইল বাছাকে মা দেখিয়া যে মন কি অবস্থায় আছে তাহা ভগবানই জ্ঞামেন।’

গোক। ‘ভীমজী অবশ্যই আসিবে, সে রঘুনাথজী ছাবেলদারের অধীনে কার্য্য করিত, রঘুনাথজীর সবাদ পাইয়াছি।’

সরযুর হৃদয় মৃত্যু করিয়া উঠিল, উৎসেগে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া তিনি গোকর্ণের কথা শুনিতো লাগিলেন। গোকর্ণ বলিতে লাগিলেন,—

‘যে দিন রঘুনাথকে বিদ্রোহী বলিয়া শিবজী দূর করিয়া দেম সে দিন পুত্র আমাদের কি বলিয়াছিল মনে আছে?’

গৃহিণী। ‘আমি মেয়ে মানুষ আমার কি অত মনে থাকে?’

গোক। ‘পুত্র বলিয়াছিল ‘পিতা, রঘুনাথজী যদি বিদ্রোহী হয়েন তাহা হইলে আমি যেন কখনও খজা ধারণ করিতে না পারি। আমি ছাবেলদারকে চিনি, তাঁহার নাগ বীর শিবজীর ঠৈন্যে

আগ্ন নাই, কি জমে পতিত হইয়া রাজা তাঁহার অবমাননা করিলেন,—পশ্চাৎ জানিবেন, তখন রঘুনাথের গুণ জানিতে পারিবেন’ পুত্রের কথা এত দিনে সত্য হইল।’

সরযুর হৃদয় উল্লাসে উৎসেগে দুক দুক করিতে লাগিল, তিনি ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, তাঁহার মস্তক হইতে শ্বেদবিন্দু বহির্গত হইতে লাগিল। এ উৎসেগ অসহ্য।

গোকর্ণনাথ বলিতে লাগিলেন—

‘রঘুনাথজী ছদ্মবেশে রাজার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী গিয়াছিলেম, আপন কোশলে রাজাকে উদ্ধার করিয়াছেন, আপন সম্পূর্ণ নির্দোষিতা প্রমাণ করিয়াছেন; শুনিয়াছি শিবজী সাক্ষাৎমনে আপন দোষের ক্ষমা চাহিয়াছেন, রঘুনাথকে জাতি বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন, ছাবেলদারের পদ হইতে একেবারে ‘পাঁচ হাজারী’ করিয়া দিয়াছেন। সত্বরে অন্য কথা নাই, হাতে বাজারে অন্য কথা নাই, গ্রামে অন্য কথা নাই, কেবল রঘুনাথের বীরত্ব কথা শুনিয়া সকলে জয় জয় নাদে ধন্যবাদ দিতেছে।’

আনন্দে, উল্লাসে সরযুর হৃদয় একেবারে উৎকণ্ঠ হইয়া উঠিল,—রমণী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, চীৎকার শব্দ করিয়া মুজ্বিতা হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

অগ্নি দর্শন ।

“ ঝুঁ কি আর বলিব আমি ।

মরণে জীবনে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ
হইও তুমি ॥

তোমার চরণে আমার পরাণে ঝাঁপিল
প্রেমের ফাঁসি ।

সব সমপিয়া এক মন লইয়া নিশ্চয় হ-
ইলাম দাসী ॥

ভাবিয়া দেখিলাম এ তিন ভুবনে আর
কেহ মোর কাছে ।

রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই, দাঁড়াব
কাহার কাছে ॥

একূলে ওকূলে গোকূলে দুকূলে,
আপনা বলিব কাগ ।

শীতল বলিয়া শরণ লইলাম ও দুটি
কমল পায় ? ”

চণ্ডীদাম ।

অনেক শুক্রবার সরযু চেতনা প্রাপ্ত
হইলেন, হৃদয়ে সহসা বেদনা পাইয়াছি-
লেন বলিয়া গোকর্ণও তাঁহার স্রোতে ভু-
লাইলেন কিন্তু সেই অবধি উদ্বেগে সরযুর
আহার নিদ্রা নিয়মানুসারে হইত না, দিন
গণিতেন, প্রহর গণিতেন, দণ্ড গণিতেন,
সময়ে সময়ে পদ শব্দে চকিত হইতেন ।
চিন্তায় ও অতিশয় উদ্বেগে শরীরে রো-
গের সঞ্চার হইতে লাগিল ।

এক দিন, দুই দিন, দশ দিন, একমাস
অতিবাহিত হইল, রঘুনাথ আসিলেন না ।

তখন সরযু আর সহ্য করিতে পারিলেন
না ; চিন্তায় শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, মধ্যে
মধ্যে শরীর জ্বালা করিত, মধ্যে মধ্যে
মূর্ছা যাইতেন ।

রঘুনাথ জীবিত আছেন সরযু তাহা
জানিলেন, রঘুনাথ তবে আসেন না কেন?
সরযুকে কি বিশ্বৃত হইয়াছেন ! বজ্রাঘা-
তের ন্যায় সরযুর হৃদয়ে এই ভীষণ চিন্তার
আঘাত হইল ।

দিন দিন এই নূতন চিন্তা প্রবলতর
হইতে লাগিল, অবশেষে সরযু স্থির বৃদ্ধি-
লেন, বিজয়ী, গৌরবাসিত রঘুনাথ অভা-
গিনী দুঃখিনীকে আর চাছেন না ! উঃ
শেলসম এ চিন্তা প্রণয়িনীর হৃদয়কে ব্য-
থিত করে ! সরযুর পক্ষে জগৎ অদ্য
শূন্য ! জীবন অদ্য অন্ধকারময় !

উষাদিনী ভূমিতে লুটাইয়া বলিতেন
— ‘ হৃদয়েশ ! কেন বাল্যকালে স্মৃষ্টি
কথায় বালিকার মন ভুলাইয়াছিল ?
কেন বিদায়কালে স্মধুর আশাবাক্যে অ-
বলাকে ভুলাইয়াছিল ? তুমি পুরুষ, অদ্য
তোমার পদোন্নতির সহিত নব নব উ-
দ্দেশ্য হইতেছে, নূতন উদ্যম, নূতন আশা
উদয় হইতেছে—জগৎ প্রসঙ্গ, তোমার
কার্য্যপন্থ্যরোগে বিস্তীর্ণ ও অব্যাহত । কিন্তু
অভাগিনী নারীর কি আছে ? হৃদয়ে হৃ-
দয়ে যে আশা তুমি স্থাপন করিয়াছ, অ-
ভাগিনী সেই আশা এখনও চিন্তা করি-
তেছে । মৃত্যুকাল অবধি সেই আশা ম-
যতনে গোপন করিবে । বালিকার প্রেম

লইয়া যোঁবনে একদিন খেলা করিয়া অ-
চিরে সে কথা বিস্মৃত হইলে, বালিকা সে
কথা বিস্মৃত হইতে পারে না; পুরুষের
খেলা,—রমণীর মৃত্যু।’

কখন বা বিপ্রহর রজনীতে শোকা-
ক্ৰম্বালা ক্রন্দন করিয়া উঠিতেন, বলিতেন—

‘হা নাথ! জগত যখন আমাকে
ভ্যাগ করিয়াছিল, লোকে যখন নিন্দা ক-
রিয়াছিল, পিতা যখন তিরস্কার করিয়াছি-
লেন, তখন আমি সহ্য করিয়াছিলাম।
হৃদয়েশ্বর! শেষে কি তুমিও অভাগিনীকে
ভ্যাগ করিলে? দুঃখিনী তোমার নিকট
কি দোষে দোষী? তুমি আমার জন্য কষ্ট
স্বীকার করিয়াছ। নাথ! আমি কি কষ্ট
স্বীকার করি নাই? পিতা গালি দিয়া-
ছেন, অন্য লোকে মন্দ বলিয়াছে, হৃদ-
য়েশ! তোমার কথা স্মরণ করিয়া সকল
সহ্য করিয়াছি। তোমার জন্য সংসার
হারাইয়াছিলাম, জগৎ তুচ্ছ করিলাম, পি-
তৃগৃহ ভ্যাগ করিলাম, দেশে দেশে দাসী-
বেশে ভিক্ষা করিয়াছি; এখন কি শেষ
আশা ছিন্ন হইল! বিধাতা, তুমিও কি অ-
ভাগিনীকে ভ্যাগ করিলে?’

পুনরায় বলিলেন, ‘বিধাতা যদি চি-
রদুঃখিনী করিতেন, কান্নিক পরিশ্রমে যদি
জীবন ধারণ করিতে হইত, ভগ্নকুটীরে যদি
বাস করিতে হইত, ভিক্ষা করিয়া যদি
দিন বাপন করিতে হইত, হৃদয়েশ! সরস্ব
তোমাকে পাইলে এ সমস্ত উন্নাসে সহ্য
করিত। পিতা দূর করিয়াছেন, মাতা বা-

ল্যকালে ভ্যাগ করিয়াছেন, হৃদয়নাথ,
তাহা সহ্য করিয়াছি! লোকে আমাকে
কলঙ্কিনী বলিয়াছে, জগতে নিন্দা করি-
য়াছে, নাথ, তাহাও সহ্য করিয়াছি, তো-
মার চিন্তা করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়াছি,
জগতে এরূপ কি আছে অভাগিনী তো-
মার জন্য বাহা সহ্য করিতে না পারে?
রোগ, শোক, পরিতাপ, বিধাতা যে
কোন ক্লেশ এ দুঃখিনীকে দিতেন, নাথ!
তোমাকে পাইলে সমস্ত সহ্য করিতে পা-
রিতাম। কিন্তু সরস্বর জীবন এখন শূন্য!
নাথ, চিরজীবী হও, তোমার যশ, তো-
মার মান, তোমার ধনের সীমা থাকিবে
না, অনেক দাসী পাইবে, কিন্তু সরস্বর
ন্যায় কেহ ভাল বাসিতে পারিবে না!
আমার আর অধিক দিন বাঁচিবার নাই,
জগদীশ্বর তোমাকে স্মরণ রাখুন।’ নগ্ন-
জলে বালিকা শরীর আর্দ্র করিল। শেষে
শ্রান্ত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ভ্যাগ করিয়া বলি-
লেন—‘বাল্যকালে মাতাকে হারাইলাম,
যোঁবনে ধর্মপরাগণ পিতা হারাইলাম।
নাথ! অদ্য তুমিও অভাগিনীকে পায়ে চে-
লিলে। তোমাকে নিন্দা করি না, জীবিত
থাকিতে সরস্ব যেন তোমার নিন্দা না
করে। অদ্য তুমি বড় লোক, অনেক
ভাগ্যবতী তোমার পার্শ্বে বসিবে, অভা-
গিনী সরস্বর বাল্যকালে মনে একদিন এ-
কটি আশার উদয় হইয়াছিল, দুঃখিনী
তাহা ভ্যাগ করিয়াছে, অচীরে জীবন
ভ্যাগ করিবে।’

এই রূপ দিবানিশি চিন্তা করিতেন,
আহার নিত্রা ভাগ্য করিয়া ভূমিতে লুটী-
ইতেন, অথবা উঠলঃশ্বরে রোদন করিয়া
উঠিতেন।

গোকৰ্ণ ও তাঁহার স্ত্রী অনেক শুভ্রবা
করিতে লাগিলেন, কিন্তু সরস্বতী হৃদয়
শান্ত হইল না; তাঁহার হৃদয়ের কথাও
কেহ জানিতে পারিল না। হৃদয়ে অতি-
শয় বেদনা, প্রায় নয় মাস হইতে এইরূপ
পীড়া হইয়াছে, বেদনা আসিলে রোদন
না করিয়া থাকিতে পারেন না. কেবল
এইমাত্র সরস্বতী বলিতেন। সরল স্বভাব
গৃহিণী তাহাই বিশ্বাস করিতেন।

এক দিন সন্ধ্যার সময় সরস্বতী নদীকূলে
একাকিনী বসিয়া রহিয়াছেন, হস্তে গণ্ড-
স্থল স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতেছেন, এ-
রূপ সময়ে গোকৰ্ণের কন্যা আসিয়া ধীরে
ধীরে সরস্বতী পাশ্বে বসিয়া বলিল,—

‘দিদি! তোর বুকে বেদনা হইয়াছে
তবে তুই অত ভাবিস্ কেন? ভাবলেই
ও বেদনা বৃদ্ধি হয়।’

সরস্বতী। ‘না দিদি, ভাবলে বেদনা
একটু কমে, সেই জন্য ভাবি।’

বালিকা। ‘তুই কি ভাবিস্ দিদি?
তোর বরের কথা বুঝি ভাবিস্?’

সরস্বতী। সজল নয়নে ঈষৎ হাসিয়া
বলিল ‘হাঁ বরের কথাই ভাবি।’

বালি। ‘বর কবে আসবে?’

সর। ‘বর আমাকে জুলিয়া গিয়াছে।’
সরস্বতী মুখে হাস্য, চক্ষে জলবিন্দু!

বালি। ‘তবে কি হবে?’

সর। ‘আর একজন বর আমাকে
বিবাহ করবে।’

বালি। ‘সে কে দিদি?’

সর। ‘যম।’

বালি। ‘সে কে?’

সর। ‘আমার মত বাহাদুরের বরে
জুলিয়া যায়, যম তাহাকে বিবাহ করে।’

বালি। ‘তাঁহার ত বড় দয়ার শ-
রীর।’

সর। ‘অতিশয় দয়ার শরীর;
আহা! কবে সে আমাকে নেবে?’

বালি। ‘সে তোকে বিবাহ করিলে
তোর পীড়া আর থাকিবে না?’

সর। ‘না; সমস্ত কষ্ট নিবারণ
হবে। হা জগদীশ্বর!’

বালি। ‘সে কবে আসিবে?’

সর। ‘আজ রাত্রিতে!’

ক্ষণেক এইরূপ কথার পর বালিকা
শয়ন করিতে গেল,—সরস্বতী একাকিনী
সেই নদীকূলে বসিয়া চিন্তা করিতে লা-
গিল।

রজনী জগতে গভীর অন্ধকার ঢালিতে
লাগিল, আকাশে তারাগুলি মিট মিট
করিতেছে, মুখে নদী কুল কুল শব্দ ক-
রিয়া বহিয়া বাইতেছে। সরস্বতী নদীর দিকে
চাহিলেন, পাশ্বে কুঞ্জবনের দিকে চাহি-
লেন। শেষে সেই নৈশ আকাশেরদিকে
চাহিলেন। অনেকক্ষণ স্থিরমেত্রে চা-
হিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—

‘জীবিতনাথ ! সরসুর লীলাখেলা শেষ হইল, সরসুরকে বিদায় দাও ! বাল্যকালে একদিন ঐ দেবমূর্তি দেখিয়া বালিকার মন ব্যাকুল হইয়াছিল, এক্ষণে সরসুর হৃদয় শান্ত । শান্ত—কিন্তু সেই অনয়ব এখনও হৃদয় ধারণ করিতেছে, যতদিন সরসু জীবিত থাকিবে সেই মূর্তি হৃদয়ে ধারণ করিবে । রঘুনাথ ! অভাগিনীর মৃত্যুর বিলম্ব নাই, কিন্তু মৃত্যুর সময়ও ঐ দেবমূর্তি সরসু নয়নে দেখিতে থাকিবে, ঐ মধুময় কথাগুলি কর্ণে শুনিতে থাকিবে, তোমার মধুময় নাম উচ্চারণ করিবে, তোমার স্মৃতির মুখচ্ছবি হৃদয়ে স্মরণ করিবে ! বাল্যকালে যে আশা দিয়াছিলে, তাহা যদি সফল হইত, জীবিতেশ্বর ! দাসী তোমার সেবার ক্রটি করিত না, দাসী বিশ্বাসঘাতিনী হইত না । কিন্তু সে কথায় কায় নাই, সে আশা দূর করিয়াছি, মৃত্যুর প্রাক্কালে জগদীশ্বরের নিকট সরসুর প্রার্থনা যেন তুমি চিরজীবী হও, যেন জগদীশ্বর তোমাকে চিরস্থখে রাখেন । আর সরসুর হৃদয়ে খেদ নাই । জীবিতনাথ ! সরসুরকে বিদায় দাও, যদি কষ্ট না হয়, তোমার মুখচ্ছবি হৃদয়ে ধারণ করিয়া যে জীবন বিসর্জন করিয়াছে, এখন কখন সে অভাগিনীকে স্মরণ করিও !’

অভাগিনী নয়ন মুদিত করিলেন ; অনেকক্ষণ সেই দেবনিদ্ভিত পুরুষের রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন । আহা ! সেই মধুময় কথাগুলি যেন এখনও সরসু শনি-

তেছেন ‘সরসু ! সরসু ! আমি তোমার রঘুনাথ !’

নয়ন উন্মীলিত করিলেন,—সহসা তারকালোকে সেই দীর্ঘাকার বীরপুরুষকে দশায়মান দেখিলেন ;—বাক্তব্য সরসুর দিকে প্রসারিত, চক্ষুর্ধর অশ্রুপূর্ণ !

এ কি রোগীর স্বপ্ন মাত্র ? বিধাতা ! এ বিভ্রমণা কি জন্ম ? সরসু নয়ন পুনরায় মুদিত করিলেন ।

এ স্বপ্ন নহে, এ বিভ্রমণা নহে ! সরসু পুনরায় চাহিলেন, কি দেখিলেন ?

দেখিলেন হৃদয়নাথ অভাগিনীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, উঃ ! সরসুর তপ্ত হৃদয় সেই প্রশান্ত হৃদয়ে শীতল হইল, সরসুর যন্থাসের সহিত রঘুনাথের নিঃশ্বাস মিশ্রিত হইল সরসুর কাম্পিত ওষ্ঠধর রঘুনাথের ওষ্ঠ স্পর্শ করিল !

উঃ ! সে স্পর্শে বালিকা শিহরিয়া উঠিল, বালিকা সংজ্ঞাহীন ! একি প্রকৃত না স্বপ্ন ? আনন্দভরে বায়ুতাড়িত পত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে সরসু মনে মনে বলিলেন ‘জগদীশ্বর ! এ যদি স্বপ্ন হয়, যেন এ সূখ নিদ্রা হইতে কখনও না জাগরিত হই !’

—o:o:—

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ ।

জীবন নির্বাণ ।

হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুনহ রাজন ।

যথা ধর্ম তথা জয় অবশ্য ঘটন ।

ধর্ম অনুসারে জয় ঈশ্বর বচন ।

কাশীরাম দাস ।

মহারাজ্রদেশে মহাসমারোহ আরম্ভ হইল ! শিবজী প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, পুনরায় আরংজীবের সহিত যুদ্ধ করিবেন, স্নেহ-দিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন, হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিবেন। নগরে আমে পথে ঘাটে এই জনরব হইতে লাগিল ।

এদিকে রাজা জয়সিংহ বিজয়পুর নগর আক্রমণ করিয়াও সে স্থান হস্তগত করিতে পারিলেন না। তিনি বার বার দিল্লীর সত্রাটের নিকট সহায়তার জন্য যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাও বিফল হইল, অবশেষে তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, যে তাঁহার সৈন্য সমেত বিনাশ ভিন্ন আরংজীবের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। তখন বিজয়পুর ত্যাগ করিয়া আরজীবাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শেখ পর্য্যন্ত আরংজীবের বিশ্বস্ত অ-রুচরের ন্যায় কার্য করিলেন। আরংজীব তাঁহার প্রতি এরূপ অভ্যস্ত আচরণ করিয়াছেন বলিয়া মুহূর্তের জন্যও সত্রাটের কার্যে উদাস্য প্রকাশ করিলেন না। যখন নিশ্চয় দেখিলেন মহারাজ্র দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে তখন পর্য্যন্ত যতদূর সাধ্য সত্রাটের ক্ষমতা রক্ষার চেষ্টা করিলেন। লৌহগড়, সিংহগড় পুরন্দর প্রভৃতি স্থানে, সত্রাটের সেনা সন্নিবেশিত করিলেন, ভক্তির যে যে ভূর্গ অধিকারে রাখিবার সম্ভাবনা ছিল না, সে সমস্ত একেবারে চূর্ণ করিয়া দিলেন যেন শত্রুরা ব্যবহার করিতে না পারে।

কিন্তু এ জগতে এরূপ বিশ্বস্ত কার্যের পুরস্কার নাই; জয়সিংহ অকৃতকার্য হইয়াছেন শুনিয়া আরংজীব বৎপরোনাল্পি সন্তুষ্ট হইলেন, আরও অবমানিত করিবার জন্ত তাঁহাকে দক্ষিণ দেশের সেনাপতিত্ব হইতে অপসৃত করিয়া দিল্লীতে ‘তলব’ করিলেন, যশোবন্ত সিংহকে তাঁহার স্থলে পাঠাইয়া দিলেন।

রুদ্ধ সেনাপতি আজীবন সাধ্যমতে দিল্লীর কার্যসাধন করিয়াছিলেন; শেখ দশায় এ অবমাননায় তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইল, তিনি পথেই মৃত্যুশয্যা শয়িত হইলেন।

অবমানিত, পীড়িত, রুদ্ধ জয়সিংহ মৃত্যুশয্যা শয়িত রহিয়াছেন, এরূপ সম্মত একজন দূত সংবাদ দিলেন—

‘মহারাজ ! একজন মহারাজ্র সেনানী আপনার দর্শনাভিলাষী। তিনি বলিলেন যে তিনি আপনার চরণোপান্তে বসিয়া এক দিন উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর এক দিন উপদেশ পাইবার আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন।’

রাজা উত্তর করিলেন—

‘সম্মানপূর্ব্বক লইয়া আইস। তিনি দিল্লীর শত্রু কিন্তু দূতরূপে আসিতেছেন, আমি তাঁহাকে নির্ভয় দিতেছি, রাজপুত্রের বাক্যের অন্যথা হয় না।’

ক্ষণেক পর একজন মহারাজ্র ছদ্মবেশে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

রাজা তাঁহার দিকে না চাহিয়াই বলিলেন—

‘সুহৃদয় শিবজী ! মৃত্যুর পূর্বে আর একবার দেখা হইল, চরিতার্থ হইলাম। উঠিয়া অভ্যর্থনা করিবার ক্ষমতা নাই, দোষ গ্রহণ করিবেন না, আসন গ্রহণ করুন।’

সম্মলনয়নে শিবজী বলিলেন, ‘পিতঃ ! যখন শেষ আপনার নিকট বিদায় লইয়াছিলাম তখন আপনাকে এত নীত্র একরূপ অবস্থায় দেখিব কখন মনে করি নাই।’

জয়। ‘রাজন্ ! মনুষ্যদেহ ক্ষণভঙ্গুর, ইহাতে বিস্ময় কি।’ ক্ষণেক পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন ‘শিবজী, আমাদের শেষ যখন সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমরা মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব দেখিয়াছিলাম ; এখন কি দেখিতেছ ?’

শিব। ‘মহারাজ সেই সাম্রাজ্যের প্রাধান্য স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন, আপনাকে যখন এ অবস্থায় দেখিতেছি, তখন মোগল সাম্রাজ্যের আর আশা নাই।’

জয়। ‘বৎস ! তাহা নহে। রাজস্থানভূমি বীরপ্রসবিনী, জয়সিংহ মরিলে অজয়সিংহ হইবে, জয়সিংহের ন্যায় মহত্ব যোদ্ধা এখনও বর্তমান আছেন। মাদৃশ একজন লোকের মৃত্যুতে সাম্রাজ্যের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।’

শিব। ‘আপনার অমঙ্গল অপেক্ষা সাম্রাজ্যের অধিক কি অনিষ্ট হইতে পারে?’

জয়। ‘শিবজী ! একজন যোদ্ধা যাইলে অন্য যোদ্ধা হয়, কিন্তু পাতকে যে ক্ষয়সাধন করে তাহার পুনঃসংস্কার হয় না। আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম যথায় পাপ ও কপটাচারিতা, তথায় অবনতি ও মৃত্যু। এক্ষণে প্রত্যক্ষ তাহা অবলোকন করুন।’

শিব। ‘নিবেদন করুন।’

জয়। ‘যখন আপনাকে আমি দিল্লী পাঠাইয়াছিলাম তখন আপনার হৃদয়ও দিল্লীশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল ; আপনার হৃদয় সঙ্কল্প ছিল, দিল্লীশ্বর যত দিন আপনাকে বিশ্বাস করিবেন, আপনি তত দিন বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। আপনার প্রতি সদাচরণ করিলে সম্রাটের দক্ষিণ দেশে একজন পরাক্রান্ত বন্ধু থাকিত, কপটাচরণ বশতঃ সেই স্থানে একজন দুর্দমনীয় শত্রু হইয়াছেন।’

শিব। ‘মহারাজ ! আপনার বুদ্ধি অসাধারণ ও বহুদূরদর্শী, জগতে যথার্থই জয়সিংহকে বিজ্ঞ বলিয়া জানে।’

জয়। ‘আরও প্রবেশ করুন। আমি আরংজীবের পিতার সময় হইতে দিল্লীর কার্য করিয়াছি। বিপদে, যুদ্ধসময়ে, যত দূর সাধ্য, দিল্লীশ্বরের উপকার করিয়াছি। স্বজাতি, বিজাতি বিবেচনা করি নাই, আত্মপার বিবেচনা করি নাই, সাঁহার কার্যে ত্রুটি হইয়াছি জীবন পণ করিয়া তাঁহার কার্যসাধন করিয়াছি। বৃদ্ধকালে সম্রাট আমার প্রতি প্রথমে অসদাচরণ করিলেন,

পরে অবমাননা করিলেন। সে জন্য আ-
মার কার্যে বৈলক্ষ্য্য নাই, আমি যে স-
মস্ত সৈন্য প্রধান প্রধান দুর্গে রাখিয়া
বাইলাম, শিবজী, তাহার বিনা যুদ্ধে
আপনাকে দুর্গ হস্তগত করিতে দিবে না।
কিন্তু এ আচরণে আরঞ্জীব স্বয়ং ক্ষতি-
প্রাপ্ত হইলেন। অমরাধিপেরা দিল্লীশ্বরের
চিরবিশ্বস্ত অনুচর ও সহায়, অধরের ভবি-
ষ্যৎ রাজগণ দিল্লীর প্রধান শত্রু হইবে।

ক্রোধে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লা-
গিল, মহাত্মা জয়সিংহ সে ক্রোধ নিবার-
ণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগি-
লেন—

‘ দুইটি উদাহরণ দিলাম, মহারাষ্ট্র দে-
শের ও অপর দেশের। সমস্ত ভারতবর্ষে
এইরূপ। শিবজী! আরঞ্জীব সমস্ত ভা-
রতবর্ষে বিশ্বস্ত অনুচরের অবমাননা করি-
তেছেন, মিত্রদিগকে শত্রু করিতেছেন,
বারাণসী মন্দির বিনষ্ট করিয়া তথায় মস্-
জীদ নির্মাণ করিয়াছেন, রাজস্থানে, সর্ব-
দেশে হিন্দুদিগের অবমাননা করিতেছেন,
হিন্দুদিগের উপর জিজ্ঞাসা করত্বাপন ক-
রিতেছেন।’ কণেক পরে নয়ন মুদিত
করিয়া অতি গভীর স্বরে পুনরায় কহিতে
লাগিলেন—যেন মৃত্যুশয্যাগ মহাত্মার
দিব্য চক্ষু উদ্বীলিত হইল, সেই চক্ষুতে ভ-
বিষ্যৎ দেখিয়াই যেন রাজর্ষি কহিতে লা-
গিলেন,—‘ শিবজী! আমি দেখিতেছি
যে, এই কপটাচারিতায় চারি দিকে যুদ্ধা-
নল প্রজ্বলিত হইল, রাজস্থানে অনল প্রজ্ব-

লিত হইল, মহারাষ্ট্রে অনল জ্বলিল, পূর্ব
দিকে অনল জ্বলিল! আরঞ্জীব বিংশতি
বৎসর যত্ন করিয়া সে অনল নির্বাণ ক-
রিতে পারিলেন না; তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি,
তাঁহার অসামান্য কৌশল, তাঁহার অসা-
ধারণ সাহস ব্যর্থ হইল; যুদ্ধ বয়সে প-
শ্চাৎ তাপ করিয়া দিল্লীশ্বর প্রাণত্যাগ
করিলেন! অনল আরও প্রবলবেগে জ্বলি-
তেছে, চারিদিক হইতে ধূ ধূ শব্দে জ্বলি-
তেছে, সেই অনলে মোগল সাম্রাজ্য দগ্ধ
হইয়া গেল! তাহার পর? তাহার পর
মহারাষ্ট্র জাতির নক্ষত্র উন্নতিশীল, মহা-
রাজীরগণ! অগ্রসর হও, দিল্লীর শূন্য
সিংহাসনে উপবেশন কর।’

রাজার বচন রোধ হইল। চিকিৎ-
সকের পাশে ছিলেন তাঁহার নান্য ঔ-
ষধি দিলেন, কিন্তু জয়সিংহ অনেকক্ষণ অ-
জ্ঞান অবস্থায় রহিলেন।

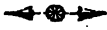
অনেকক্ষণ পর মৃৎস্বরে বলিলেন,
‘কপটাচারী আপনাকেই শান্তিদান করে;
সত্যমেব জয়তি।’

শাস রোধ হইল, শরীর হইতে প্রাণ
নির্গত হইল।

শিবজী বালিকার ন্যায় উঠেঃস্বরে
ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন; মৃত জয়সিংহের
পদদ্বয়ে মস্তক রাখিয়া অজ্ঞান অশ্রাবর্ষণ
করিতে লাগিলেন।

ত্রয়ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

জীবন প্রভাত।



‘ধর্মুর্দ্ধর আজ যত, সাজ শীঘ্র করি

চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে তুলিব এ জ্বালা—

এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে তুলিতে!,

মধুসূদন দত্ত।

রজনী এক প্রহর মাত্র আছে এরূপ সময়ে শিবজী রাজপুত্রশিবির ত্যাগ করিলেন। বাহিরে আসিয়া একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন, চিনিলেন তিনি রাজা জয়সিংহের প্রধান মন্ত্রী।

মন্ত্রী বলিলেন, ‘রাজন্! মহারাজা জয়সিংহ আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন, যে তাঁহার মৃত্যুর পর আপনার হস্তে এই সমস্ত কাগজ দিব। এত দিন এ সমস্ত সাবধানে রাখিয়াছিলাম, আপনি এক্ষণে গ্রহণ করুন।

শিবজী সে সময়ে অতিশয় শোকার্ত ছিলেন; কোন উত্তর না করিয়া সেই কাগজ লইয়া নিজ শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্রাতঃকালের পূর্বেই প্রধান প্রধান সেনানী ও অমাত্যদিগকে একত্র করিলেন। এক্ষণে পরামর্শ করিলেন, পরে শিবিরের বাহিরে আসিয়া আপনার সমস্ত সৈন্য আহ্বান করিয়া বলিলেন—

‘বন্ধুগণ! প্রায় একবৎসর হইল আমরা আরংজীবের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলাম; আরংজীবের নিজের দোষে

ও কপটচাৰিতায় সে সন্ধি খণ্ডন হইয়াছে; অদ্য আমরা সে কপট আচরণের পরিশোধ করিব,—মুসলমানদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিব।

‘যিনি আরংজীবের প্রধান সেনাপতি ছিলেন, দেশানীদেবী বাহ্য সহিত যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছিলেন; বাহ্যর নিকট শিবজী বিনা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন; অদ্য নিশীথে সেই মহাত্মা রাজা জয়সিংহ আরংজীবের অসদাচরণে ভগ্নচেতা হইয়া প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন। সৈন্যগণ! দিল্লীতে আমার কারাবরোধ, হিন্দুপ্রবর জয়সিংহের মৃত্যু, এ সমস্ত এক্ষণে আমরা পরিশোধ করিব।

‘চারিদিকে চাহিয়া দেখ, চারিদিকে হিন্দুর অবমাননা,—হিন্দুদেবের অবমাননা দেবালয়ের অবমাননা! হিন্দুগণ, অদ্য আমরা এ অবমাননা দূর করিব; এশোক, এ অবমাননার যদি পরিশোধ থাকে, বীরগণ! রণরঙ্গে আমরা ইহার পরিশোধ করিব।

‘মৃত্যুশয্যায় রাজা জয়সিংহের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল, তিনি দেখিলেন মোগলদিগের ভাগ্যানক্ষত্র অবনতিশীল,—মহারাষ্ট্রদিগের ভাগ্যানক্ষত্র উন্নতিশীল,—দিল্লীর সিংহাসন ত্বরায় শূন্য হইবে; বন্ধুগণ অগ্রসর হও, যুগিষ্ঠির ও পৃথুরায়ের সিংহাসন আমরা অপিকার করিব।

‘পূর্কদিিকে বন্ধিমাচ্ছটা দেখিতে পা-

ইতেছে, ও প্রভাতের রক্তিমাস্ফট। কিন্তু ও আমাদিগের পক্ষে সামান্য প্রভাত নহে ; মহারাষ্ট্রগণ ! হিন্দুগণ ! অদ্য আমাদের **জীবনপ্রভাত !**”

সমস্ত সেনানী ও সৈন্যগণ এই মহৎ বাক্য শুনিয়া গর্জিয়া উঠিল, ‘ অদ্য আমাদের **জীবনপ্রভাত !**’

চতুঃশ্লোক পরিচ্ছেদ

বিচার।

—•••••—

‘পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইল উচিত।’

কাশীরাম দাস।

সেই দিবস সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ একাকী নদীতীরে পদচারণা করিতেছিলেন ; আপনাদের পদোন্নতি, সরসুর সহিত পুনর্মিলন, মুসলমানদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ, হিন্দুদিগের ভাবী স্বাধীনতা, এইরূপ নব বিষয়ের চিন্তায় তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইতেছিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে একজন ডাকিলেন—

‘রঘুনাথ !’

রঘুনাথ পশ্চাৎদিকে চাহিয়া দেখিলেন চন্দ্ররায় জ্বলাদার ! রোষে তাঁহার শরীর কাঁপিতেছিল, কিন্তু সৈন্যসমূহের প্রতিজ্ঞা তিনি বিশ্বাস্ত করেন নাই।

চন্দ্ররায় বলিলেন, ‘রঘুনাথ ! এজগতে তোমার ও আমার উভয়ের স্থান নাই, একজন মরিব।’

রঘুনাথ রোষ সঘরণ করিয়া ধীরস্বরে বলিলেন, ‘চন্দ্ররায় ! কপটচাচারী, মিত্র-হত্যা চন্দ্ররায় ! তোমার উপযুক্ত শাস্তি শিরশ্ছেদন, কিন্তু রঘুনাথ তোমাকে ক্ষমা করিলেন,—জগদীশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।’

চন্দ্র। ‘বালকের ক্ষমা গ্রহণ করা আমার অভ্যাস নাই। তোমার আর অপিক জীবিত থাকিবার সময় নাই, মন দিয়া আমার কথা শুন।

‘জন্ম অবধি তুমি আমার পরম শত্রু, আমি তোমার পরম শত্রু। বাল্যকালে তোমাকে আমি দিব্যচক্ষুতে দেখিতাম, সহস্রবার প্রস্তরের উপর তোমার মস্তক আঘাত করিবার সঙ্কল্প মনে উদয় হইয়াছে ! তাহা করি নাই, কিন্তু তোমার বিষয় নাশ করিয়াছি, তোমাকে দেশত্যাগী করিয়াছি, তোমাকে বিক্রোহী বলিয়া অবমানিত ও দূরীকৃত করিয়াছি ! চন্দ্ররায়ের ভীষণ স্রিঘাৎসা তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইয়াছিল।

তোমার ভাগ্য মন্দ, পুনরায় উন্নত পদ লাভ করিয়া সৈন্যमध्ये আসিয়াছ। চন্দ্ররায়ের হির প্রতিজ্ঞা জীবনে কখনও নিষ্ফল হয় নাই, এখনও হইবে না। অন্য উপায় ভাঙ্গা করিলাম, এই অসি ঘায়া তোর হৃদয় বিদ্ধ করিব, হৃদয়ের শোণিত পান করিয়া এ ভীষণ পিপাসা নির্বাণ করিব। ভীক ! তোর অদ্য আমার হস্তে রক্ষা নাই।’

রোষে রঘুনাথের নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলিত ছিল, কম্পিতস্বরে বলিলেন ‘পামর ! সম্মুখে হইতে দূর হ, নচেৎ আমি পবিত্র প্রতিজ্ঞা বিন্যূত হইব,সহসা তোমার পাপের দণ্ড দিব।’

চন্দ্র। ‘ভীক ! এখনও যুদ্ধে পরা-
খুখ, তবে আরও শোন্। উজ্জয়িনীর যুদ্ধে যে তীরে তোমার পিতার হৃদয় বিদীর্ণ হই-
য়াছিল সে শত্রুনিষ্কিপ্ত নহে, চন্দ্ররাও
তোমার পিতৃহস্তা !’

রঘুনাথ আর নয়নে কিছু দেখিতে পা-
ইলেন না,কর্ণেশুনিতে পাইলেন না,রোষে
অসি নিষ্কোষিত করিয়া চন্দ্ররাওকে আ-
ক্রমণ করিলেন। চন্দ্ররাও ও ক্ষীণহস্তে
অসি ধারণ করেন নাই, অনেকক্ষণ যুদ্ধ
হইল, উভয়ের অসিতে উভয়ের শরীর ক্ষ-
তবিক্ষত হইয়া গেল, বর্ষার ধারার স্রায়
উভয়ের শরীর দিয়া রক্ত বহিতে লাগিল।
চন্দ্ররাও বলে স্থান নহেন, কিন্তু রঘুনাথ
দিল্লীতে চমৎকার অসিযুদ্ধ শিক্ষা করিয়া-
ছিলেন, অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর চন্দ্ররাওকে
পরাস্ত করিলেন, তাঁহাকে ভূমিতে পা-
তিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে জারু স্থা-
পিত করিলেন ; বলিলেন—

‘পামর ! অদ্য তোমার পাপরাশির শেষ
হইল, পিতা ! আপনার মৃত্যুর পরিশোধ
হইল।’

মৃত্যুর সময়েও চন্দ্ররাও নির্ভীক ; বি-
কট হাস্য হাসিয়া বলিলেন, ‘আর তোমার
ভয়ী বিধবা হইল, সে চিন্তা করিয়া স্মৃখে

প্রাণ বিসর্জন করিব।’ পুনরায় হাস্য ক-
রিয়া উঠিলেন।

বিদ্রোহের ন্যায় সমস্ত কথা তখন রঘু-
নাথের মনে উপপন্ধি হইল ! এই অন্য
লক্ষ্মী স্বামীর নাম করেন নাই, এই জনা
চন্দ্ররাওয়ের অনিষ্ট না হয়, প্রার্থনা করি-
য়াছিলেন ! পিতৃহস্তা রক্তপিশাচ চন্দ্ররাও
বলপূর্বেক প্রাণের লক্ষ্মীকে বিবাহ করি-
য়াছে ! রোষে রঘুনাথের নয়ন দিয়া অগ্নি
বহির্গত হইতে লাগিল ; দস্ত কড়মড় ক-
রিল ; কিন্তু তাঁহার উন্নত অসি চন্দ্ররাও-
য়ের হৃদয়ে স্থাপিত হইল না ; তিনি ধীরে
ধীরে চন্দ্ররাওকে ছাড়িয়া দিয়া দণ্ডায়মান
হইলেন।

কম্পিতস্বরে কহিলেন ‘পিশাচ !
তোমার পাপ অগদীশ্বর বিচার করুন, রঘু-
নাথ তোমার দণ্ড দিতে অক্ষম !

‘দোষের, বিদ্রোহিতার দণ্ড দিতে
অক্ষম নহি, বলিয়া পশ্চাৎ হইতে এক-
জন লোক নিকটে আসিলেন, রঘুনাথ
চাহিয়া দেখিলেন শিবজী !

শিবজী ইঙ্গিত করিতে অন্তরাল হইতে
চারিজন সৈনিক আসিল,চন্দ্ররাওয়ের হস্ত
বদ্ধ করিয়া তাহাকে বন্দীস্বরূপ লইয়া গেল !

পর দিন প্রাতে চন্দ্ররাওয়ের বিচার।
রঘুনাথের পিতাকে হনন করিয়াছিলেন,
সে দোষের বিচার নহে ; রঘুনাথকে কল্যা
অন্যায় আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে দো-
ষের বিচার নহে ; রঘুনাথের হৃৎ আক্রম-
ণের পূর্বে শত্রু রহমৎখাঁকে গুপ্ত সংবাদ

দিয়াছিলেন, পরে সে দোষে রঘুনাথকে দোষী প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, অন্য তাহারই বিচার!

পূর্বে বলা হইয়াছে—আফগাণ সেনাপতি রহমৎখাঁ কত্মগুলে বন্দী হইলে পর শিবজী তাঁহাকে ভদ্রাচরণ পূর্বক ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, রহমৎখাঁও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া আপন প্রভু বিজয়পুরের সুলতানের নিকট গমন করিয়াছিলেন। জয়সিংহ যখন বিজয়পুর আক্রমণ করেন তখন রহমৎখাঁ আপন নৈসর্গিক সাহসের সহিত যুদ্ধ করেন, একটি যুদ্ধে অতিশয় আহত হইয়া জয়সিংহের বন্দী হইলেন। জয়সিংহ তাঁহাকে আপন শিবিরে আনাইয়া অনেক যত্ন ও শুশ্রূষা করাইয়াছিলেন, কিন্তু সে রোগ আরাম হইল না, তাহাতেই রহমৎখাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পূর্বদিন জয়সিংহ রহমৎখাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘খাঁ সাহেব! আপনার আর অধিক পরমায়ু নাই, আমার সমস্ত যত্ন ও চিকিৎসা বৃথা হইল। এক্ষণে যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।’

রহমৎখাঁ বলিলেন—‘আমার মরণের জন্য আক্ষেপ নাই, কিন্তু শত্রু হইয়া আমার প্রতি যেরূপ সদাচরণ করিয়াছেন তাহার পরিশোধ করিতে পারিলাম না এই আক্ষেপ রহিল। কি জিজ্ঞাসা করিবেন ককন, আপনার নিকট আমার অবস্তু কিছই নাই।’

রাজা জয়সিংহ বলিলেন, ‘কত্মগুল আক্রমণের পূর্বে একজন শিবজীর সেনানী আপনাকে সংবাদ দিয়াছিল; সে কে আমরা জানি না, আমার বোধ হয় একজন অন্যান্য দণ্ডিত হইয়াছে।’

রহমৎ। ‘আমি জীবিত থাকিতে সে নাম প্রকাশ করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। রাজপুত্র! আপনার ভদ্রাচরণে আমি অতিশয় সম্মানিত হইয়াছি কিন্তু পাঠানপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে অপারক।’

জয়সিংহ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, ‘বোদ্ধা! আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে আমি বলিতেছি না, কিন্তু যদি কোনও নিদর্শন থাকে তাহা আমাকে দিতে আপত্তি আছে?’

রহমৎ। ‘প্রতিজ্ঞা কখন সে নিদর্শন আমার মৃত্যুর পূর্বে পাঠ করিবেন না।’

জয়সিংহ তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন; তখন রহমৎখাঁ তাঁহাকে কতকগুলি কাগজ দিলেন।

রহমতের মৃত্যুর পরে রাজা জয়সিংহ সেই সমস্ত পত্রাদি পাঠ করিয়া দেখিলেন, বিদ্রোহী চন্দ্ররাত্ত!

চন্দ্ররাত্ত রহমৎখাঁকে বহুস্ত লিখিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা রাজা পড়িলেন, সে সম্বন্ধে অন্যান্য যে যে কাগজ ছিল তাহাও পাঠ করিলেন, চন্দ্ররাত্ত পাঠানদিগের নিকট যে পারিতোষিক পা-

ইয়াছিলেন তাহার প্রাপ্তি স্বীকার পর্য্যন্ত রাজা জরসিংহ দেখিলেন।

জরসিংহের মৃত্যুর দিনে তাঁহার মন্ত্রী সেই সমস্ত কাগজ শিবজীকে দিয়াছিলেন।

বিচার কার্যে অধিক সময় আবশ্যক হইল না। শিবজীর চিরদিব্বন্ত মন্ত্রী রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী একে একে সেই পত্রগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন, যখন পাঠ সমাধা হইল তখন রোষে সমস্ত সেনানীগণ গর্জন করিয়া উঠিলেন। চন্দ্ররাও বিদ্রোহী, স্বয়ং শত্রুদিগকে সংবাদ দিয়া পারিতোষিক গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দোষে নির্দোষী নিফলক বীর রঘুনাথের প্রাণদণ্ডের প্রয়াস পাইয়াছিলেন একথা সকলে জানিতে পারিয়া রোষে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন।

তখন শিবজী বলিলেন—‘পাপাচারী বিদ্রোহি তোর মৃত্যু সন্নিকট, তোর কিছু বলিবার আছে।’

মৃত্যুর সময়ও চন্দ্ররাও নির্ভীক, তাঁহার হৃদমনীয়া দর্প ও অভিমান এখনও পূর্নবৎ। বলিলেন—

‘আমি আর কি বলিব? আপনার বিচার ক্ষমতা প্রসিদ্ধ! এক দিন এই দোষে রঘুনাথকে দণ্ড দিয়াছিলেন, অন্য আমাকে দণ্ড দিতেছেন, আমার মৃত্যুর পর আর এক দিন আর এক জনকে দণ্ড দিবেন, তখন জানিবেন চন্দ্ররাও এ বিষয়ের বিম্বু বিসর্গও জানেন না, এসমস্ত প্রমাণ মিথ্যা।’

এই বিজ্ঞপ্তি শিবজী মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করিলেন—

‘জলাদ, চন্দ্ররাওয়ের দুই হস্ত ছেদন কর; তাহা হইলে আর ঘৃণ লইতে পারিবে না, তাহার পর তপ্ত লৌহদ্বারা ললাটে ‘বিখ্যাসঘাতক’ অঙ্কিত করিয়া দাও, তাহা হইলে আর কেহ বিশ্বাস করিবে না।

জলাদ এই হৃশংস আদেশ পালন করিতে যাইতেছিল, একুণ সময় রঘুনাথ দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, ‘মহারাজ! আমার একটি নিবেদন আছে।

শিব। ‘রঘুনাথ! এ বিষয়ে তোমার নিবেদন আমরা অবশ্য শুনিব, কেন না এই পামর তোমারই প্রাণনাশের যত্ন করিয়াছিল; তাহার কি প্রতিহিংসাল-ইতে ইচ্ছা কর, নিবেদন কর।

রঘুনাথ। ‘মহারাজের অস্বীকার অসম্ভব্য, আমি এই প্রতিহিংসা যাজ্ঞা করি, যে চন্দ্ররাওয়ের কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ না করে;—অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বিনা দণ্ডে মুক্ত দিন!’

সভাস্থ সকলে বিস্মিত ও শুদ্ধ!

শিবজী ক্রোধ সপ্তরণ করিয়া কহিলেন—

‘তোমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিল,—তোমার অনুরোধে সে জন্য চন্দ্ররাওকে রক্ষা করিলাম। রাজ-বিদ্রোহাচরণের শাস্তি দিবার অধিকারী রাজা। সে শাস্তির আদেশ করিয়াছি। জলাদ আপন কার্য কর।’

রঘু। 'মহারাজের বিচার অনিন্দ-
নীয়, কিন্তু দাস প্রভুর নিকট ভিক্ষা
চাহিতেছে, চন্দ্ররাওকে বিনা দণ্ডে মুক্তি
দান করুন।

শিব। 'এ ভিক্ষা দানে আমি অসমর্থ,
রঘুনাথ তোমাকে এবার ক্ষমা করিলাম,—
অন্যকে এতদূর ক্ষমা করিভাম না। শিব-
জীর নয়ন! প্রজ্বলিত হইতেছিল।

• রঘু। 'প্রভু হুই একটি যুদ্ধে এ
দাস প্রভুর কার্য করিতে সমর্থ হইয়া-
ছিল, প্রভুও দাসকে অভিলষিত পুরস্কার
দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, অত্ন সেই পুর-
স্কার চাহিতেছি, চন্দ্ররাওকে বিনা দণ্ডে
মুক্ত করুন।

রোষে শিবজীর নয়ন হইতে অগ্নি-
কণ! বাহির হইতেছিল; গর্জন করিয়া
বলিলেন 'রঘুনাথ! রঘুনাথ! কখন ক-
খন আমাদের উপকার করিয়াছিলে ব-
লিয়া অন্য আমাদিগের বিচার অন্যথা
করিতে চাহ? রাজ-আদেশ অন্যথা হয়
না; তুমিও আপনার বীরদের কথা
আপনি বলিতে ক্ষান্ত হও।

এ তিরস্কার বাক্যে রঘুনাথের মুখ
আরক্ত হইয়া উঠিল; ধীরে ধীরে কম্পিত
শ্বরে উত্তর করিলেন,—

'প্রভু! পুরস্কার চাহা দাসের অ-
ভ্যাস নাই। অন্য জীবনের মধ্যে প্রথম-
বার পুরস্কার চাহিয়াছি, প্রভু যদি এ
পুরস্কার দানে অসম্মত হইয়েন, দাস স্বি-
ভীতবার চাহিবে না। দাসের কেবল

এইমাত্র ভিক্ষা, প্রভু সদয় হইয়া তাহাকে
বিদায় দিন, রঘুনাথ ঠৈসনিকের ত্রুত ভাগ
করিবে, পুনরায় গোশ্বামী হইয়া দেশে
দেশে ভিক্ষা করিতে থাকিবে।'

শিবজী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহি-
লেন, রঘুনাথের নিকট কত উপকার প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন স্মরণ করিলেন,—রঘুনাথের
চক্ষুতে জল দেখিয়া কাতর হইলেন, ক্রোধ
বিলুপ্ত হইল, ধীরে ধীরে বলিলেন,—

'রঘুনাথ! তোমার যাজ্ঞা দান করি-
লাম; চন্দ্ররাওকে মুক্ত করিলাম; রঘু-
নাথ! যে ত্রুত ধারণ করিয়াছ তাহা-
তেই অবস্থিতি কর,—চিরকাল শিবজীর
দক্ষিণ হস্তের ন্যায় হইয়া থাকিও!'

স্বভাসদ্ সকলে নিস্তব্ধ! সকলে
স্বর্ণার সহিত চন্দ্ররাওয়ের দিকে চাহি-
লেন,—

ধোর অভিমানী চন্দ্ররাও সাধারণের
এ স্বর্ণা ও নিন্দাবাক্য সহ্য করিতে পারি-
লেন না, রঘুনাথের দয়াতে তাঁহার রক্ষা
হইল এ কথা সহ্য করিতে পারিলেন না।

চন্দ্ররাও ভীক নহেন। ধীরে ধীরে
ক্রোধ-জর্জরিত শরীরে রঘুনাথের নিকট
যাইয়া বলিলেন—

'বালক! তোর দয়া আমি চাহি
না, তোর দেওয়া জীবন আমি তুচ্ছ করি,
তোর অনুগ্রহে আমি এইরূপে পদাঘাত
করি, বলিতে বলিতে রঘুনাথের বক্ষঃস্থলে
পদাঘাত করিলেন। পরে ক্রমে আপন
ছুরিকা নিজ বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া অ-

তিমানী ভীষণপ্রতিজ্ঞ চন্দ্রাণ্ড জুমলাদার সাধারণের স্বর্ণা হইতে আপনার চিরনিষ্কৃতি সাধন করিলেন। জীবনশূন্য দেখে সভা-স্থলে পতিত হইল!

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

জাতা ভগিনী।

‘সুত পরিবার,
কেবা বল কার,
ষেষত স্বপ্নের ছায়া।
জলবিষ প্রায়,
সকল মিছাময়,
কেবল ভবের মায়া ॥

কীৰ্ত্তিবাস ওঝা।

আমাদের আধ্যাত্মিক শোণ হইয়াছে; এক্ষণে মায়ক নাগিকাদিগের বিষয় দুই একটি কথা বলিয়া পাঠক মহাশয়ের নিকট বিদায় লইব।

রক্ত জন্মার্জন কন্যাকে হারাইয়া বাতুলের ন্যায় হইয়াছিলেন, পুনরায় সরস্বতীকে পাইয়া আনন্দাত্ত বর্ষণ করিতে লাগিলেন, ‘সরস্ব! সরস্ব! তোমার ন্যায় রক্ত আমি ত্যাগ করিয়াছিলাম? তোমাকে ত্যাগ করিয়া কি একদিনও জীবন ধারণ করিতে পারি?’ সরস্বও পিতার গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া বলিলেন,—‘পিতঃ, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, জীবন থাকিতে আর কখনও আপনার ছাড়া হইব না।’

পুলকিত হৃদয়ে রক্ত শুনিলেন যে রঘুনাথ রাজপুত্র-সন্তান, অতি উন্নত ব্রাহ্মণ-বংশীয় বীরপ্রবর গজপতি সিংহের পুত্র; মানন্দহৃদয়ে শুভদিনে কত দান করিলেন। সরস্বতী স্বথ কে বর্ণনা করিবে? চারি-বৎসর যে দেবকান্তির জপ করিয়া ছিলেন, সেই পুরুষ-দেবকে যখন আপন কোমলহৃদয়ে ধারণ করিলেন, তাঁহার ওষ্ঠে যখন উষ্ণ ওষ্ঠ স্থাপন করিলেন, তখন সরস্বতী স্বথে উদ্ভ্রাদিনী হইলেন। যাহারা সে স্বথ ভোগ করিয়াছে, অনুভব কর, লেখক বর্ণনার অক্ষম।

আর রঘুনাথ?—রঘুনাথ তোরণদূর্গে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা কি অল্প সার্থক হইল? সেই প্রিয় কণ্ঠমালা বার বার সরস্বতী হৃদয়ে দোলাইয়া দিলেন, সেই পুষ্পবিনিমিত্ত দেখে হৃদয়ে ধারণ করিলেন, সেই বিশাল স্নেহপূর্ণনয়নের দিকে চাহিয়া চাহিয়া উন্মত্ত প্রায় হইলেন!

সরস্ব তাঁহার সপ্তমবর্ষীয়া ‘দিদি’ কে বিন্মৃত হইলেন না। রঘুনাথের অনু-রোধে শিবজী গোকর্ণকে একটি জায়গীর দান করিলেন ও গোকর্ণের পুত্র ভীম-জীকে উন্নতি দান করিয়া ছাবেলদার পদে নিযুক্ত করিলেন।

সরস্ব দিদির সর্বদাই আপন গৃহে রাখিতেন, ও বরের সহিত ‘সামন সমান’ ভাল বাসিতেন,—কয়েক বৎসর পরে একটি মধ্যশীর্ণ সুরচরিত্র পাত্র দেখিয়া দিদির বিবাহ দিলেন। বিবাহ দিবসে স-

রঘু ও রঘুনাথ স্বয়ং উপস্থিত রছিলেন ; সরযু কস্তুর কাণে কাণে বলিলেন,—
'দেখিও দিদি! যাহা বলিয়াছিলে সে কথা যেন রাখিও,—বরের চেয়ে আমাকে ভাল বাসিবে!'

রঘুনাথ আখ্যানিকাবিরত সময়ের পর ত্রয়োদশ বৎসর পর্যন্ত পুথ্যাতি ও সম্মানের সহিত শিবজীর অধীনে কার্য করিতে লাগিলেন। যশোবন্ত সিংহ যখন জানিতে পারিলেন রঘুনাথ তাঁহারই প্রিয় অমুচর গজপতি সিংহের পুত্র, তখন রঘুনাথকে পৈতৃক ভূমি সমস্ত ছাড়িয়া দিলেন, তাহা ভিন্ন অনেক জায়গীর দান করিলেন। কিন্তু শিবজী রঘুনাথকে দেশে বাইতে দিলেন না, যতদিন জীবিত ছিলেন রঘুনাথকে নিকটে রাখিলেন। পরে যখন ১৬৮০ খৃঃ অব্দে চৈত্র মাসে শিবজীর মৃত্যু হয়, যখন অযোগ্য পুত্র শজুজী পিতার পুরাতন ভৃত্যাদিগকে একে একে অবমানিত বা কারারুদ্ধ করিতে লাগিলেন; রঘুনাথ আর মহারাষ্ট্রে থাকিলে উপকার নাই দেখিয়া সরযু ও জনার্দনের সহিত স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিলেন, পৈতৃক জায়গীর অধিকার করিলেন, পৈতৃক প্রশস্ত গৃহ রঘুনাথ ও সরযুর বালকবালিকাদিগের ক্রীড়াশয় ও হাস্যহাসিতে শক্তি হইতে লাগিল।

পাঠক! ইচ্ছা এই স্থানেই আপনাদের নিকট বিদায় লই, কিন্তু আর এক জনের কথা বলিতে বাকি আছে; শাস্ত চির-সহিষ্ণু লক্ষ্মীরপিনী লক্ষ্মীর কি হইল?

বেদিন চন্দ্ররাত্রে আশ্রয়ত্যা করিয়াছিলেন, রঘুনাথ অনতিবিলম্বে ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাইলেন; বাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল। দেখিলেন, শবের পার্শ্বে লক্ষ্মী আলুলাঙ্গিত বেশে গড়াগড়ি দিতেছেন, ঘন ঘন মোহ বাইতেছেন, সময়ে সময়ে হৃদয়বিদায়ক আৰ্ত্তনাদে ঘর পরিপূরিত করিতেছেন। হিন্দুরমণীর পতির মৃত্যুতে যে ভীষণ যাতনা হয়, কে বর্ণনা করিতে পারে? অল্প লক্ষ্মীর নয়নের আলোক নিৰ্ব্বাণ হইয়াছে, হৃদয় শূন্য হইয়াছে, জঘৎ অন্ধকারময় হইয়াছে! শোক, বিষাদে, মৈত্রাশে, নব ঠৈদব্যের অসহ্য যাতনায়, বিধবা ঘন ঘন আৰ্ত্তনাদ করিতেছে।

রঘুনাথ সাস্থনা করিবার চেষ্টা করিলেন, সাস্থনা দূরে থাকুক লক্ষ্মী প্রাণের ভাতাকে চিনিতেও পারিলেন না। স্বর স্বর করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে রঘুনাথ গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন।

সন্ধ্যার সময় পুনরায় ভগিনীকে দেখিতে আসিলেন, লক্ষ্মীর ভাব পরিবর্তন দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন লক্ষ্মীর মননে জল নাই, ধীরে ধীরে স্বামীর মৃতদেহ স্বন্দর শুভ্র সুগন্ধ পুষ্প দিয়া সাজাইতেছেন। বালিকা বেরপ মনোনিবেশ করিয়া পুতলি সাজায়, লক্ষ্মী সেইরূপ মনোনিবেশ পূর্বক মৃতদেহ সাজাইতেছেন।

রঘুনাথ গৃহে আসিলে লক্ষ্মী ধীরে ধীরে রঘুনাথের নিকটে আসিলেন, অতি মৃদুপাদবিক্ষেপে আসিলেন, যেন শব্দ হইলে স্বামীর নিদ্রাতজ্জ হইবে! অতি মৃদু-স্বরে বলিলেন—

‘ভাই রঘুনাথ! তোমার সঙ্গে যে আর একবার দেখা হইল আমার পরম ভাগ্যা, এখন আর আমার মনে কোনও কষ্ট থাকিল না।’

মাশ্রমণনে রঘুনাথ বলিলেন—‘প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মী, আমি তোমার সঙ্গে এ সময়ে দেখা না করিয়া কি থাকিতে পারি?’,

লক্ষ্মী অঞ্চল দিয়া রঘুনাথের চক্ষের জল মোচন করিয়া বলিলেন—

‘সত্য ভাই, তোমার দয়ার শরীর, তুমি হৃদয়েশ্বরের জন্ম রাজার নিকটে যে আবেদন করিয়াছিলে শুনিয়াছি! আমার ভাগ্যে যাঁহা ছিল তাঁহা হইয়াছে, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন।’ নিজের চক্ষু হইতে এক বিন্দু জল মোচন করিলেন।

রঘু। ‘লক্ষ্মী! তুমি বুদ্ধিমতী আমি চিরকাল জানি, অমহ্য শোক কথঞ্চিৎ স্মরণ করিয়াছ দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। মনুষ্যের জীবন শোকময়, তোমার কপালে যাঁহা ছিল ঘটিয়াছে, সে শোক সতিষ্ণু হইয়া বহন কর, আইস আমার গৃহে আইস, ত্রাতার ভালবাসার ত্রাতার গৃহে যদি সন্তোষ দান করিতে পারে, লক্ষ্মী, আমি ক্রটি করিব না।’

লক্ষ্মী একটু হাসিলেন, সে হাস্য দেখিয়া রঘুনাথের প্রাণ শুকাইয়া গেল। ঈশ্বর হাসিয়া লক্ষ্মী বলিলেন,—

‘ভাতা, তোমার দয়ার শরীর, কিন্তু লক্ষ্মীকে জগদীশ্বরই স্বয়ং সান্ত্বনা করিয়াছেন, শান্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। হৃদয়েশ্বরের চির নিদ্রার নিদ্রিত রহিয়াছেন, তিনি জীবনদশায় দাসীকে অতিশয় ভালবাসিতেন, দাসী জীবনে তাঁহার প্রণয়িনী ছিল, মরণে তাঁহার সঙ্গিনী হইবে।’

রঘুনাথের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তখন তিনি লক্ষ্মীর ডাব পরিবর্তনের কারণ বুঝিতে পারিলেন, লক্ষ্মীর শান্ত ভাবের হেতু বুঝিতে পারিলেন, লক্ষ্মী সহমরণে স্থির সঙ্কল্প হইয়াছেন।

তখন অনেককণ অবদি লক্ষ্মীর প্রতিজ্ঞাভঙ্গের চেষ্টা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, অনেক ক্রন্দন করিলেন, এক প্রহর রজনী পর্যন্ত লক্ষ্মীর সহিত তর্ক করিলেন; ধীর শাস্ত লক্ষ্মীর একই উত্তর ‘হৃদয়েশ্বর আমাকে বড় ভাল বাসিতেন, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।’

অবশেষে রঘুনাথ সজ্জলময়নে বলিলেন,—

‘লক্ষ্মী, একদিন আমার জীবন নৈরাশে পূর্ণ হইয়াছিল, আমি জীবনত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। ভগিনী তোমার প্রবেশে, তোমার স্নেহময় কথায় সে সঙ্কল্প ছাড়িলাম, পুনরায় কার্যাজগতে প্রবেশ করিলাম। লক্ষ্মী, তুমি কি ত্রা-

তার কথা রাখিবে না? তুমি কি ডাডাকে ভালবাস না?'

লক্ষ্মী পূর্ববৎ শান্তভাবে উত্তর করিলেন—

‘ভাই সে কথা আমি বিশ্বাস্ত হই নাই, তুমি লক্ষ্মীকে ভালবাস, লক্ষ্মীর কথা শুনিয়াছিলে, তাহা বিশ্বাস্ত হই নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখ পুরুষের অনেক আশা, অনেক উদ্যম, অনেক অবলম্বন, একটি বাইলে অন্যটি থাকে, একটি চেষ্টা নিষ্ফল হইলে দ্বিতীয়টি সফল হয়। ভাই তুমি সেদিন ভগিনীর কথাটি রাখিয়াছিলে, অন্য ভোমার কলঙ্ক ধুইয়াছ হইয়াছে, ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে, স্মরণ দেশদেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু অভাগিনী নারীর কি আছে? অন্য আমি যে নয়নের মণিটি হারাইয়াছি তাহা কি জীবনে আর পাইব? যে মহাত্মা দাসীকে এত ভালবাসিতেন, এত অনুগ্রহ করিতেন, জীবিত থাকিলে তাঁহাকে কি আর পাইব? ভাই! তুমি লক্ষ্মীকে বাল্যকাল হইতে বড় ভালবাসিয়াছ, অন্য সদয় হও, লক্ষ্মীর একমাত্র সুরখের পথে কাঁটা দিও না, যিনি দাসীকে এত ভালবাসিতেন তাঁহার সহিত যাইতে দাও!’

রঘুনাথ নিরস্ত হইলেন; স্নেহময়ী ভগিনীর অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া বালিকার ন্যায় বর বরে অশ্রুপূর্ণ করিতে লাগিলেন। এ অসার কপট সংসারে ডাডা ভগিনীর অশ্রুণীর প্রণয়ের ন্যায় পবিত্র

স্বিক্ত প্রণয় আর কি আছে? স্নেহময়ী ভাড়া বা স্নেহময়ী ভগিনীর ন্যায় অমূল্য রত্ন এ বিস্তীর্ণ জগতে আর কোথায় বাইলে পাইব?

রজনী বিপ্রহরের সময় চিতা প্রস্তুত হইল, চন্দ্ররাগের শব তাহার উপর স্থাপিত হইল, হাঙ্গামদনা লক্ষ্মী সুন্দর পট-বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া একে একে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। চিতা পার্শ্বে আসিলেন, দাসীদিগকে অলঙ্কার, রত্ন, মুক্তা বিতরণ করিতে লাগিলেন, স্বহস্তে তাহাদিগের নয়নের জল মোচন করিয়া মধুর বাক্যে সাহসনা করিতে লাগিলেন, জ্ঞাতি কুটুম্বিনীদিগের নিকট বিদায় লইলেন, গুণদিগের পদধূলি লইলেন, মপত্নীদিগের আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন, সকলের নয়নের জল অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিলেন, মধুময় বাক্য দ্বারা সকলকে প্রবেদ্য দিলেন।

শেষে রঘুনাথের নিকট আসিলেন—

বলিলেন ‘ভাই! বাল্যকাল অবধি তোমার লক্ষ্মীকে তুমি বড় ভালবাসিতে, অন্য লক্ষ্মী ভাগ্যবতী, অন্য চিরসুখিনী হইবে, একবার ভালবাসার কাজ কর— সম্মেহে কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিদায় দাও, তোমার লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।’

রঘুনাথ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, লক্ষ্মীর হুটি হাত ধরিয়া উঠিলে: স্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। লক্ষ্মীরও চক্ষুতে জল আসিল।

সন্মুখে ত্রাতার চক্ষুর জল মুছাইয়া
লক্ষ্মী বলিতে লাগিলেন—

‘ছি ভাই শুভকার্যে চক্ষুর জল ফেল
কি জন্য ? পিতার ন্যায় তোমার সাহস,
পিতার ন্যায় তোমার মহৎ অন্তঃকরণ, জ-
গদীশ্বর তোমার আরও সম্মান রক্ষি করি-
বেন; জগৎ তোমার যশে পূর্ণ হইবে ! ল-
ক্ষ্মীর শেষ বাসনা এই, জগদীশ্বর যেন রঘু-
নাথকে স্মৃতে রাখেন ! ভাই, বিদায় দাও,
দাসীর জন্য স্বামী অপেক্ষা করিতেছেন।’

কাতরস্বরে রঘুনাথ বলিলেন—

‘লক্ষ্মী, তোমা বিনা জগৎ ভুচ্ছজ্ঞান
হইতেছে, জগতে আর রঘুনাথের কি
আছে ? প্রাণের লক্ষ্মী ! তাকে কিরূপে
বিদায় দিব, তাকে ছাড়িয়া আমি কি-
রূপে জীবন ধারণ করিব ?’ আর্তনাদ ক-
রিয়া রঘুনাথ ভূমিতে পতিত হইলেন।

অনেক যত্ন করিয়া লক্ষ্মী রঘুনাথকে
উঠাইলেন, পুনরায় চক্ষুর জল মুছিয়া দি-
লেন, অনেক সাস্থনা করিলেন, অনেক
বুঝাইলেন, বলিলেন, ‘ভাতঃ ভূমি বীর-
শ্রেষ্ঠ ! পুরুষের বাহা ধর্ম তাহা ভূমি পা-
লন করিতেছে, তোমার লক্ষ্মীকে নারীর
ধর্ম পালন করিতে দাও। আর বিলম্ব ক-
রিও না, বাধা দিও না ; ঐ দেখ পূর্ব-
দিকে আকাশ রক্তবর্ণ হইয়াছে, তোমার
লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।’

গদ্ গদ স্বরে রঘুনাথ বলিলেন—

‘লক্ষ্মী, প্রাণের লক্ষ্মী, এজগতে তো-

মাকে বিদায় দিলাম, ঐ আকাশে ঐ পু-
ণাধামে আর একবার তোমাকে পাইব।
সে পর্যন্ত জীবগৃহ হইয়া রহিলাম।’

ত্রাতার চরণধূলি লইয়া লক্ষ্মী চিতা-
পার্শ্বে যাইলেন, স্বামীর পদদ্বয়ে মস্তক স্খা-
পন করিয়া বলিলেন ‘হৃদয়েশ্বর ! জীবনে
তুমি দাসীকে বড় ভাল বাসিতে, এখন অ-
নুগ্রহ কর, যেন তোমার পদপ্রান্তে বসিয়া
তোমার সঙ্গ যাইতে পারি। জয় জয় যেন
তোমাকে স্বামী পাই,—জয় জয় যেন
লক্ষ্মী তোমার পদসেবা করিতে পায়।
জগদীশ্বর ! লক্ষ্মীর অন্য কামনা নাই।’

ধীরে ধীরে চিতা অঃরোহণ করিলেন,
স্বামীর পদপ্রান্তে বসিলেন, পদদ্বয় ভক্তি-
ভাবে অঙ্কের উপর উঠাইয়া লইলেন। নয়ন
মুদ্রিত করিলেন,—বোধ হইল যেনসেই মু-
হূর্ত্তেই লক্ষ্মীর আত্মা স্বর্গে প্রবেশ করিল।

অগ্নি জ্বলিল, অতিশয় হ্রত থাকায়
শীঘ্র অগ্নি ধূ ধূ শব্দে জ্বলিয়া উঠিল। প্র-
থমে অগ্নিজিহ্বা লক্ষ্মীর পবিত্র শরীর লে-
হন করিতে লাগিল, শীঘ্রই সতেজে চারি
দিক বেষ্টিত করিয়া লক্ষ্মীর মস্তকের উপর
উঠিল, নৈশ গগনের দিকে মহাশব্দে ধা-
বমান হইল। লক্ষ্মীর একটি অঙ্গ নড়িল
না, একটি কেশ কম্পিত হইল না !

এক প্রহরের মধ্যে অগ্নি নির্কারণ হ-
ইল ; কিন্তু সেই ভীষণ দৃশ্য, চিতার সেই
নৈরাশজনক ধূ ধূ শব্দ রঘুনাথ জীবনে
বিস্মৃত হইলেন না।

আর্যায়ুর্বেদ ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর ।)

এ দেশের আর্য সমস্ত আয়ুর্কারই
 ' কবিচিত্ত কুলবনমধু কল্পনার ' মাধুর্ঘ্যে
 মোহিত হইয়াছিলেন । কেবল স্মৃতিশা-
 স্ত্রকারগণই এই কল্পনা সম্পূর্ণ কিংবা পরি-
 মাণে সংযত করিতে পারিয়াছিলেন ; ত-
 থাপিতা ছাড়াও অগ্নিহোতা প্রকরণাদিতে
 অসামান্য কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়া-
 ছেন । যাহা হটক অপরাপর সামাজিক
 ও ব্যবহারিক বিষয়ে স্মৃতিকারগণ বড়
 একটা উপন্যাস বা অলঙ্কারের ছটা প্র-
 কাশ করিয়া কবিভঙ্গি প্রদর্শন করিতে
 ব্যাকুল হন নাই । দেখা যাউক অমৃত-
 চার্ধ্য ধ্বস্তুরির সম্বন্ধে ইহার কি বলেন ।
 ব্রাহ্মণ-বৈদ্যাকন্যাগ্রামযুতো নাম জাগতে ।
 নিষাদঃ শূত্রকন্যাগ্নাং যঃ পরাশর উচ্যতে ।
 মনুঃ ।
 বিশ্রায়ুর্জীবমিক্তোহি কত্রিগ্নাং বিশ-
 স্ত্রিগাম্
 অঘর্ষঃ শূত্রোনিষাদোজাতঃ পারশরো-
 পিবা ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ।
 বৈশ্যগ্নাং ব্রাহ্মণজ্ঞাতোহঘর্ষোহি মুনি
 সত্তমঃ ।
 ব্রাহ্মণঃ চিকিৎসার্থং নির্দিষ্টো মুনি-
 পুজবৈঃ ॥ পরাশরঃ ।

বেদাজ্ঞাতোহি বৈদ্যঃ স্যাদঘর্ষো ব্রহ্মপু-
 জকঃ ॥ শঙ্খঃ ।
 এখানে দেখা যাইতেছে যে মনু যাজ্ঞ-
 বল্ক্যাদি সকল স্মৃতিকারই একবাক্যে
 অঘর্ষবংশপ্রবর্তককে ব্রাহ্মণবিনাহিতা বৈ-
 শ্যার সন্তান বলিয়াছেন । পুত্রগ্নাং প্রা-
 গুক্ত পৌরাণিক ইতিহাস হইতে আমরা
 যে ঐতিহাসিক সারসঙ্কলন করিলাম তা-
 হার সহিত আর্য সমস্ত স্মৃতিকারদিগের
 ঐকমত্য দেখা যায় অতএব প্রাগুক্ত বিব-
 রণই আমরা ধ্বস্তুরির প্রকৃত জন্মবিবরণ
 বলিয়া গ্রহণ করিলাম । পুরাণ কবি-
 আরও বলেন যে ধ্বস্তুরি স্বর্গবৈদ্য অশ্বিন-
 ধরের মানবীকন্যাত্নরের পাণিগ্রহণ ক-
 রেন । অশ্বিনদিগের অপার নাম সন্-
 কুমার । সিদ্ধবিদ্যাাদি এই তিন স্ত্রীর গর্ভে
 ধ্বস্তুরির সেন দাসাদি চতুর্দশ পুত্র জন্মে ।
 অশ্বিনধর মানসপুত্র, চিরকুমার ছিলেন ব-
 লিয়াই, বোধ হয়, পুরাণ কবি ইহাদের
 মানসী কন্যার কল্পনা করিয়াছেন । যাহা-
 হটক, উপন্যাস ভাঙ্গ করিয়া প্রকৃত প্র-
 স্তাব গ্রহণ করিলে ধ্বস্তুরির তিন পাণি-
 গ্রহের সন্দেহ করিবার কোনও কারণ
 নাই । মহোজা গালব-পুত্র স্বকীর প্রতি-

ভাবলে বয়োবৃদ্ধি সহকারে যুনি সমাজে অতীব খ্যাতিলাভ করিতে লাগিলেন। পুত্রগণও পিতার অনুবর্তন করিয়া উত্তরোত্তর বংশোচ্ছল করিতে লাগিলেন। আমরা পাঠকগণকে বিনীত ভাবে অনু-রোধ করি যে তাঁহারা যেন বর্তমান কালের বৈদ্যকুলকুঠার নিরক্ষর ভিষকুণাম-ধারীদিগের আদর্শ গ্রহণ করিয়া প্রাচীন ভিষকুণেশের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত না করেন। বর্তমান কালের ব্রাহ্মণবৈদ্য দেখিয়া পুরা-কালের ব্রাহ্মণ বৈদ্যের ছায়া অঙ্কনপ্রারম্ভ বিরম্বনা মাত্র। স্মৃতিকারগণ বলেন যে আনুলৌমিক জাতির মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ ঔরসে ও বৈশ্যাগর্ভে জন্মিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বেদ বেদাঙ্গ পারগ ও যুনি বলিয়া খ্যাত।*

ধনুস্তরিসস্তান ব্যতীত মহামতী অগ্নিবেশ অপার একপ্রকার অশ্বষ্ঠের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিপ্রপুত্র অশ্বষ্ঠের ঔরসে ও বিপ্রকন্যা অশ্বষ্ঠার গর্ভে যে সস্তান জন্মে সেও অশ্বষ্ঠ ঋত্বিকের সহিত তাহার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ডুৎ। তিনি

* উত্র বৈশ্য সূতরাং যে জ-জ্বিরে তনয়া অমীঃ সর্বেতে যুনয়ঃখ্যাতা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ॥

† একমেকস্য বিপ্রস্যাস্বষ্ঠজাত্যা স্ত্রজ্ঞাৎসুতঃ। সোহন্যবিপ্রস্য কন্যারামশ ঠানাস্থথাবসো। ব্রাহ্মণেন সপিণ্ডুৎ ভেষাৎ তৈপুরুষাবধিঃ। দারপ্রাপ্তিশ্চ বিপ্রস্য ধর্ম-শাস্ত্রানুসারতঃ ॥ অগ্নিবেশঃ।

ব্যবহারশাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণতাক্ত ধনাদির ও অধিকারী। যাহা হউক বর্তমানকালে এবদ্বিধ অশ্বষ্ঠগস্তানদিগকে ধনুস্তরিসস্তান হইতে নির্দেশ করা সূকঠিন; প্রকৃত অ-গস্তব ব্যাপার। বিশেষতঃ যখন উভয়েই একজাতিভুক্ত, তখন তদর্থে যত্নের প্রয়ো-জনীয়তা দৃষ্ট হয় না। হারীত স্বপ্রণীত সংহিতায় বলিয়াছেন 'ব্রাহ্মণ, মুর্দ্ধাভি-বিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইহারা ই বিজ্ঞ এবং ইহাদের যথাপূর্ব্ব গৌরব। * অগ্নিবেশও পদমর্ধ্যাদানিবন্ধনকালে ব-লিয়াছেন, ইহারা সত্যে পিতৃভূলা, ত্রে-তাতে তজপ, স্বাপরে ক্ষত্রিয়বৎ, কলিতে বৈশ্যোপম † এই সমস্ত প্রাচীন সং-হিতাবচনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে অমু-তাচার্যের বংশপরম্পরা অনেকেই সেই দেবতুল্য মহাপ্রভাববান্ পিতৃপুরুষের কুলের অলঙ্কার ছিলেন। কিন্তু, বিচার-মানে বলিয়া কে বলিতে পারে যে এই বৈদ্যানামধারী অদৃষ্টাসূৰ্বেদ বৈদ্যকুলকণ্টক কবিরাজ মহাশয়ের তাহাদেরই বংশধর এবং তাদৃশ সম্মান ও ভক্তির পাত্র ?

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ধনুস্তরি ইষ্ট হইতে আশ্বর্বেদ লাভ করেন এবং ব্রাহ্ম-

* ব্রহ্মা মুর্দ্ধাভিবিক্তশ্চ বৈদ্যাঃক্ষত্র-বিশাবপি। অমীপঞ্চবিজ্ঞা এষাৎ যথাপূ-র্ব্বঞ্চ গৌরবম্। হারীতঃ।

† সত্যে বৈদ্যাঃ পিতৃভূলা ত্রেতা-নাঞ্চতথানুতা। স্বাপরে ক্ষত্রবৎপ্রোক্তাঃ কদৌবৈশ্যোপমশূতাঃ। অগ্নিবেশঃ।

গগণ বৈদ্যাদিগকে আয়ুর্কেন্দ্রব্যবসার সম-
 স্প্রদান করেন। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত
 গ্রন্থাদি পাঠ করিলে এরূপ প্রতীত হয়
 যে, ব্রাহ্মণাদিও তৎকালে এই ব্যবসায়ের
 লিপ্ত হইতেন। কারণ, যে কাল পর্য্যন্ত
 সমাজস্থ সকলের চিকিৎসোপযোগী বৈ-
 দ্যের সংখ্যাধিক্য হয় নাই সেই পর্য্যন্ত
 বৈদ্যোত্তরজাতিকেও বাধ্য হইয়া তদ্ব্যবসার
 অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক
 এবিধ প্রয়োজনপ্রণোদিত বৈদ্যব্যবসায়ী
 ব্রাহ্মণ কদাচ অনুযোগ্যই নহেন। কিন্তু
 এতদ্দেশীয় অনেক ব্রাহ্মণ বৈদ্যবাহুল্য
 হইলেও লোভপরায়ণ হইয়া বৈদ্যব্যব-
 সায় অবলম্বন করিতেন। যৎকালে চরক
 অমিবেশতন্ত্র প্রতिसংস্কার করেন, অথবা
 যে সময়ে অমিবেশ স্মরণ আয়ুর্কেন্দ্রসং-
 হিতা প্রণয়ন করেন সেই সময়েও ব্রাহ্মণের
 বৈদ্যবেশ ধারণ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়
 অবলম্বন করিবার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।
 তিনি দীর্ঘজীবিত নামাধ্যায়ে বলিয়াছেন
 যে পীড়িত ব্যক্তি বৈদ্যবেশধারী ব্রাহ্মণের
 শরণাপন্ন হইবেক না * সুতরাং তৎসময়ে
 এরূপ প্রথা প্রচলিত থাকার কোনও সন্দেহ
 নাই। ব্যবহারশাস্ত্রকারগণও এবিধ প্র-
 তারণা নিবারণোপায়ে স্বপ্রণীত সংহিতায়
 বিবিধ অনুশাসনবাক্য নিবন্ধ করিয়াছেন।
 বৈদ্যবেশধারী ব্রাহ্মণ দেখিবামাত্র সবত্র
 স্থান করিবেক, এইবাক্য আশ্রম আশ্রমের
 * নচশ্রুতবতাং বেশবিভ্রতাং শরণং
 গতাঃ ॥ চরকে।

দেশে সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় *।
 যে ব্রাহ্মণ চিকিৎসক তাহার অন্ন পূরণও,
 যিনি কুসীদপ্রহণকারী, তাহার অন্ন বিষ্ঠা
 ইত্যাদি *। অনুশাসনবাক্যে স্পষ্ট প্রতীত
 হয় যে বহুকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেরা লোভ
 সংবরণ করিতে না পারিয়া অন্য জাতির
 ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু
 এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে ব্রাহ্মণগণ
 বৈদ্যাদিগকে চিকিৎসা ব্যবসায়ের সঙ্গে
 আয়ুর্কেন্দ্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এক চে-
 টিয়া রূপে দান করেন নাই। স্মৃতি পুরা-
 ণাদিতে এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়
 না। পক্ষান্তরে এরূপ হইলে আত্মের ভ-
 রত্বাজাদির আয়ুর্কেন্দ্রাধ্যাপন ধর্মবিগর্হিত
 হইয়া উঠে। ইহাও অনুসন্ধান যে তৎ-
 কালে তাহাদের চিকিৎসা ব্যবসায়ও
 বিচার করিতে গেলে অসঙ্গত প্রতীয়মান
 হয় না। কারণ ধর্মস্তরির আয়ুর্কেন্দ্র ব্য-
 বসায় লাভ ভরত্বাজের সময়ে ঘটে। সু-
 তরাং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আত্মের চিকিৎসা-
 ব্যবসায় দত্তাপহারীষদোষসকুল নহে।

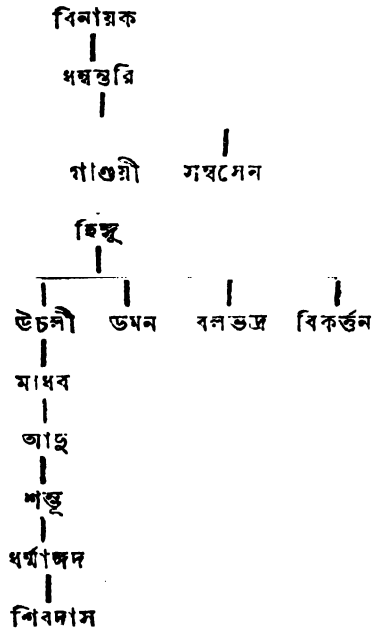
পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ভগবান ধনু-
 স্তরির ইঞ্জ হইতে আয়ুর্কেন্দ্র লাভ করিয়া
 ভরত্বাজ ও গালব প্রভৃতি ব্রাহ্মণবর্গের
 * ব্রাহ্মণং তিব্রজং দৃষ্ট্বা সচেসং
 জলমাবিশেৎ।
 † পূরণং চিকিৎসকস্যায়ং পুশ্চল্যা-
 স্তরমিস্তিরম।
 বিষ্ঠা বার্দু বিকস্যায়ং শত্রুবিক্রমিণো-
 মলদ।

সম্মতি অনুসারে আপন সম্ভানদিগকে ত-
 বাবসারে অধিকারী করেন। এবং উত্তর-
 কালের শিক্ষাসৌকর্যার্থে স্বয়ং একখানা
 সংহিতা প্রণয়ন করেন। আয়ুর্বেদের
 যত সংহিতা প্রণীত হইয়াছে তন্মধ্যে আ-
 ত্রেয় ও ধনুস্তরিকৃত সংহিতাই সর্বাপেক্ষা
 প্রাচীন। অমিতপ্রতিভ ধনুস্তরি অতীব
 অধ্যবসায়বলে মানবশরীরতত্ত্ব, লতা, গু-
 ল্মাদি, ওষধি ও ইতর প্রাণীর সহিত মান-
 বদেহের সম্বন্ধপরম্পরা অতি সংক্ষেপে
 স্বপ্রণীত সংহিতায় নিবদ্ধ করিয়াছিলেন।
 নানাবিধ রোগের নিদান, চিকিৎসা ও
 রোগহেতু নির্ণয় করিয়া মানবজাতির
 পরম বাহুবল কার্য্য করিয়াছেন। আজ
 কাল ধনুস্তরিসংহিতা এতদ্দেশে প্রচলিত
 আছে কিনা সন্দেহস্থল; প্রস্তাবলেখক
 যে পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছেন
 তাহাতে তিনি সফলকাম হইতে পারেন
 নাই। যদিও কেহ কিয়ৎপরিমাণে প্রচ-
 লিত আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু
 সেই সকল খণ্ডিত অংশ একত্র করিলেও
 মূলগ্রন্থের ছায়ামাত্রও পাওয়া যায় কিনা
 সন্দেহ। স্তত্রাং আদিসংহিতা সম্প্রতি যে
 একেবারে অপ্রাপ্য না হইলেও দুপ্রাপ্য
 হইয়াছে তদ্বিশয়ে কোনও সংশয় নাই।

কতকাল হইল ধনুস্তরিসংহিতা দু-
 প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে তাহা স্থিরসিদ্ধান্ত
 করা সুরকঠিন। আয়ুর্বেদীয় অনেক গ্র-
 ন্থের ব্যাখ্যানকালে কোন কোন অস্বর্ভরত্ব
 ধনুস্তরিসংহিতার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া-

ছেন বলিয়া আমরা এতদ্বিশয়ের কথঞ্চিৎ
 অনুসন্ধানে প্ররত হইলাম।

বল্লালসেনসংস্থাপিত আটজন অ-
 স্বর্ভকুলতিলকেরই একতমের অধস্তন স-
 ভ্তান পাণ্ডিতবর শিবদাস মহামতি চক্র-
 পানিদত্তকৃতসংগ্রহের টীকা ও ব্যাখ্যান-
 কালে ধনুস্তরিসংহিতার অনেক শ্লোক গ্র-
 হণ করিয়া প্রমাণ ও মতান্তর সমর্থন ক-
 রিয়াছেন। বিনায়ক সেন বল্লাল সংস্থা-
 পিত বৈদ্যরত্নের একতম ব্যক্তি। *
 নিম্নলিখিত বংশপরম্পরায় দৃষ্ট হয় যে
 শিবদাস বিনায়ক হইতে দশম পুরুষ।



* দুহির্বিনায়কশ্যায়ুঃ কায়ুঃ পাম্বু ত্রি

পুরকঃ।

শিন্নালো গরিরিছাচৌর্টো রাঢ়েবঙ্গে প্রতি-
 ঠিতাঃ। কবিকঠহার।

ইহাদের প্রত্যেক পুরুষের স্থিতিকাল গড়ে ৩০ বৎসর ধরিলে বিনায়ক হইতে শিবদাস পর্য্যন্ত ৩০০ বৎসর গত হইয়াছিল। বঙ্গদেশ ১১শ শতাব্দির প্রারম্ভে নর্ত্তমান থাকার সম্ভব। এই গণনানুসারে শিবদাস খৃঃ ১৪শ শতাব্দির লোক বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং ধ্বংসসংহিতা অনুমান ৪০০০ বৎসর পূর্বে এদেশে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। বিশেষতঃ শিবদাস-রূত ঢীকাতে বহুল পরিমাণে ধ্বংসের ধ্বনি থাকতে এরূপ অনুমান করাও অসম্ভব নহে যে উক্ত সংহিতা তৎকালে সাধারণের মধ্যে বিশেষ মান্য ছিল। এবৎবিধ প্রম্ভের বিহীনপ্রচার হইতে ও অন্ততঃ শতবৎসর কাল গত হওয়ার সম্ভব। সুতরাং যখন পাঠানকরতলস্থ বঙ্গদেশে মোগলদের আক্রমণে উপস্থাপি বাস্তবায়িত হইয়াছিল, যে সময়ে বঙ্গদেশী এক দিকে স্বদেশীয় পাঠান কর্তৃক উপক্রম, অপরদিকে দিল্লীর সত্রাটদিগের প্রেরিত সেনা দ্বারা ভূয়োভূয়ঃ লুণ্ঠিত, সেই অস্বাভাবিকের সময়ই অপ্পে ২ আয়ুর্বেদের এই প্রাচীন গ্রন্থও অপরাধর শাস্ত্রের সঙ্গে ২ বিলুপ্ত হইতে থাকে।

ধ্বংসের অমৃতচার্য্য ও গালবওরয়ে জ্ঞানপ্রাপ্ত করিয়া শৈশবকাল হইতেই কঠোর তপশ্চর্যাতে ও আয়ুর্বেদানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন; বিশেষতঃ তাহার জন্মবৈচিত্র্য ও আয়ুর্বেদীয় অসামান্য প্রতিভা তাহাকে সহজেই মৌনব্রতে প্রণোদিত করিয়াছিল।

গৃহী হইয়াও তিনি সংসারে নিতান্ত বীভৎস্পৃহ ছিলেন। তাহার এইরূপ সহজ বৈরাগ্য অপময়মানসে ব্রহ্মার অনু-রোধে ভরদ্বাজ গালব প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিবর্গ তাঁহাকে কাশীরাজ্যে অভিবিক্ত করেন। কিন্তু তাহার জীবন মানবজাতির মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল, তিনি রোগ-সন্তপ্ত ধনুধোর নিদাক্ষণ যন্ত্রণায় মর্ষবেদনা অনুভব করিতেন, তাহার জীবন কার্য্যান্তরে ব্যস্ত হইবার নহে। তিনি নামে মাত্র কাশীপতি রহিলেন, তাহার সমস্ত সময় আয়ুর্বেদ অনুশীলনেই পর্য্যবসিত হইত। কাশীর আশ্রমে বসিয়া তিনি বহু শিষ্যকে আয়ুর্বেদ উপদেশ দিতে লাগিলেন। সমাগত শিষ্যমণ্ডলীকে তিনি শরীরবিজ্ঞানে বক্তৃতাদ্বারা উপদেশ দিতেন। শিষ্যগণ যথোচিত যত্নসহকারে তত্ত্বপদেশ সংক্ষেপে নিবন্ধ করিয়া স্মরণ-সৌকর্য্যার্থে এক এক খানা সংহিতার প্রণয়ন করেন। বারাণশীর আশ্রমে তিনি ১০০ শিষ্যকে উপনীত করেন। তিনিই প্রথমতঃ মানবশরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া শরীরস্থানের ব্যাখ্যা করেন ও শিষ্যদিগকে তদর্থে যত্নবান্ হইতে আদেশ করেন। (১)

(১) উদ্ভাসিঃ সংশয়ং জ্ঞানং হত্র । শাল্যস্য
বাক্সতা ।

শৌধরিঃ। মৃতদেহং ব্রহ্মব্যোম্বিনি-
শচয়ঃ ॥

প্রত্যক্ষতো হি যদৃকং শাস্ত্রদৃকং যন্তবেৎ ।
সমাসত শুভ্রতয়ং ভূয়োজ্ঞানবিবর্জনম্ ॥

তিনি প্রকৃষ্ট যুক্তিসহকারে শল্য তন্ত্রের মুখ্য প্রয়োজনীয়তা ও অপরাপর ঋদের অপেক্ষা ইহার প্রাধান্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। * বাহ্য হটক, যে মহাস্মার সংহিতায় আমরা এক্ষণ ধ্বস্তুরির উপদেশ পাঠ করি, তাহার কৃতিবিররণকালেই আমরা অমৃতচার্ঘ্যের অন্যান্য উপদেশ সংক্ষেপে বিবৃত করিব। সম্প্রতি আদি বৈদ্যের সময়সম্পর্কে কএকটি কথা বলিয়া এই অংশের উপসংহার করিতে চাই।

ধ্বস্তুরি কোন সময়ে প্রাহ্লুত হইয়াছিলেন, তাহার নিরাকরণ করা বড় সুকঠিন। প্রাচীন সংস্কৃতের বহু গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় তন্মধ্যে বেদসংহিতার পরই মনুর প্রাচীন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বীকৃত্যাজ্ঞমন্তুগীত্রমনিবেশিত মদির্গ্যাধিপীড়িতমবর্ষ শতিকং নিঃসৃষ্টোস্ত্রপুরীষপুৰুষমহন্ত্যামাপাগীয়াং নিবন্ধংপঞ্জরস্থং মুঞ্জবল্কলকুশশাদীনামনাতমেনাবেষ্টিতাজম প্রকাশে দেশে কোথয়েৎ। সম্যক্ প্রকৃষিতকোদ্ধৃতা ততোদেহং সপ্তরাজ্রাহ্নীর বালরেণুগল্কলকূচানামনাতমেন শনৈঃ শনৈরবধর্ষয়ং স্তগাদিন্ সর্কানিব লক্রে চকুযা।

* শল্যাজমৈরপটৈর কপেতং প্রাপ্তোহস্মি গাংভূর ইছোপদেষ্টম্ সর্কেষু আয়ুর্কৈদত্তজ্যেযু এতদেবামিকমতিমতং যজ্ঞশত্রুকারাধিপ্রশিধানং আশু ক্রিয়াকরণং সর্কতন্ত্র সামান্যাত। সৌক্ষতে।

কার করেন। তাঁহার বনেন, মনু ঋঃ জ্যেথের ১০০ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও তিনি ধ্বস্তুরির নামোদ্ভেগ করেন নাও, কিন্তু তিনি অম্বষ্ঠের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক, পরে দৃষ্ট হইবে যে, ধ্বস্তুরি কোন শরীরীমনুষ্যের নাম নহে, পুরাণকর্তারা কল্পিতস্বর্গঈবদ্যের ধ্বস্তুরি-উপাধিই অম্বষ্ঠকে প্রদান করেন। সূত্রাং আদিবৈদ্য মনুরও পূর্ববর্তী। মনু যে বংশের নামোদ্ভেগ করিয়াছেন, সেই বংশ অন্ততঃ ৩০০ বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল। অন্যথা ব্যবহারশাস্ত্রকার ধর্মশাস্ত্রে তাহার নামোদ্ভেগ করিতেন না। একটি লোকের বংশপরম্পরা যেপরিমাণে অধিকসংখ্যক হইলে তাহা সমাজের একটি অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, সেপরিমাণ হইতে অন্যান ২০০। ৩০০ বৎসর গত হওয়া আবশ্যক। সূত্রাং অম্বষ্ঠবংশের আদি পুরুষ অন্ততঃ ঋঃ জ্যেথের ১২০০ বৎসর পূর্বে প্রাহ্লুত হইয়াছিলেন। ধ্বস্তুরির এই সময় আমরা ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতানুসরণ করিয়া নির্বাচন করিলাম। কিন্তু এলফিন্‌স্টোন প্রভৃতি যে যুক্তিমার্গে গমন করিয়া মনুর সময় নির্বাচন করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়। তিনি স্বগ্রহই বলেন কৃষ্ণঐশ্যপায়ন ঋঃ জ্যেথের ১৪০০ বৎসর পূর্বে প্রাহ্লুত হইলেন। পরাশর তাহার পিতা; সূত্রাং তিনিও অবশ্য ঐ কালের পূর্বে জন্মিয়াছিলেন। সূত্রাং যে মনুর প্রাধান্য, প-

রাশর,যাজবল্কা প্রভৃতি সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সেই মনু যে কেমন করিয়া ৯০০ খৃঃ পূঃ আবির্ভূত হইবেন,তাঁহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। স্মৃতরাং বেদের সংগ্রহকাল হইতে গণনা করিলে অশ্বত্থের কাল ১৪০০ বৎসরেরও পূর্বে আদিয়া পড়ে।

এস্থলে এলফিনষ্টোন ও মার্শমেন প্রভৃতি ভারতইতিহাসলেখকদের বেদের সংগ্রহকাল নির্বাচনসম্পর্কেও দুই একটি কথা না বলিয়া পারিলাম না। বড় লোকের তুল অনুসন্ধান আমাদের ধ্বংসতা; পাঠক মাপ করিবেন।

ইহারা বলেন যে 'প্রত্যেক বেদেই জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি অংশ আছে। ইহাতে Solstitial বিন্দুর যে অবস্থান আছে, খৃঃ জন্মের ১০০০ বৎসর পূর্বেও তাহাদের ঐ অবস্থান ছিল। * স্মৃতরাং বেদ বিভাগ ঐ সময়ে ঘটনাছিল। এই গণনার বল কত, পাঠক একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। ইহা অন্ততঃ দুটি স্থাপনার উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবেক যে, বেদের ঐ গণনা ঠিকপায়নের সমকালবর্তী কোন ব্যক্তি

* But the decisive argument is that the place assigned to the Solstitial points in the treatises is that in which those Points were situated in the 14th Century before Christ. Elphinstone's History of India. Append

করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়তঃ সূর্যের কর্কট রাশিতে গমন (Solstitial Point) একাধিক সময়ে ঘটিতে পারে না। অনেকেই জানেন যে ঐ চক্রেরও গতি আছে। স্মৃতরাং খ্রীঃ জন্মের ১৪০০ বৎসর পূর্বে যেখানে (Solstitial) বিন্দু ছিল, ঐ চক্রের সম্পূর্ণ একবার আবর্তনে যত সময় লাগে, তৎপূর্বেও তাহাদের সেই অবস্থান ছিল। তিনি কেন যে এরূপ কষ্টকল্পনার বশবর্তী হইলেন, অথচ রাজতরঙ্গিনীর নির্দিষ্ট কুৰুপাণ্ডবদের সময় হইতে ঠিকপায়নের সময় নির্বাচিত করিলেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ রাজতরঙ্গিনীর নির্বাচিত কুৰুপাণ্ডবের সময়ের সহিত কালিদাসকৃত জ্যোতির্বিদ্যাতন্ত্রণ গ্রন্থের সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়। তদনুসারে বেদবিভাগ অন্ততঃ বর্তমান সময়ের ৫০০০ বৎসর পূর্বে ঘটনাছিল।

ধ্বংসুরিসম্পর্কে পুরাণ ও ভাবপ্রকাশের মতর্ষেপ আছে। ভাবপ্রকাশ একখানা পরবর্তী সংগ্রহ; গ্রন্থকর্তাকে আমরা জানি না, কেহ কেহ বলেন ভাবমিজ ইহার প্রণেতা। যাহা হউক, ভাবপ্রকাশ বলেন ধ্বংসুরি বাজ্র গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, এবং স্মৃতরাং প্রভৃতি শত শিষ্যকে আনুবেদ শিক্ষাদেন। তিনি দিবোদাস ও কাশীরাজ নায়ে খ্যাত। * এমত

* অধীতঃচানুর্বো বেদ মিস্রাধ্বংসুরিঃ পুরা। আগত্য পৃথিবীং কাশ্যা জাতো বাজ্রবেশ্বনী। নাম্নাতু সোহিতবৎ খ্যাতো

অবস্থায় আমরা কোন্ কথা সভ্য বলিয়া গ্রহণ করিব। যদি হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিচার করিতে যাই তবে অবিচলিত চিত্তে পুরাণই মানিতে হইবেক, কারণ আদৌ জ্ঞাতি, তৎপর স্মৃতি, ও তৎপর পুরাণই প্রামাণ্য। যাহা হউক এবং বিধ অষ্টনৈক্যের কারণ অনুসন্ধান করিয়া আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই দেখা যাউক।

বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত আছে কাশী-রাজগোত্রে ধন্বন্তরি নামে একজন রাজা ছিলেন। ভাবপ্রকাশকার বোধ হয় তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এবং পুরাণোন্নিখিত ধন্বন্তরির অলৌকিক জন্মর-ক্তান্তে অনাস্থা হওয়াতেই তাদৃশ বিবরণ লিখিয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণোক্ত ক্ষত্রিয় ধন্বন্তরিকে ঠৈম্যধন্বন্তরি গ্রহণ করিলে কতকগুলি গোলযোগ আসিয়া পড়ে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণানুসারে আত্রেয়, ভরদ্বাজ ও চরক ঐ ধন্বন্তরির পূর্ববর্তী। সূতরাং অমৃতার্চা ধন্বন্তরি, ক্ষত্রিয়রাজা ধন্বন্তরি হইলে চরক কোন মতেই স্ব-পুনঃসংস্কৃত অগ্নিবেশসংহিতাতে ধন্বন্তরির মতগ্রহণ

দিবোদাস ইতি ক্ষিতৌ। বালএব বির-
ক্রোহভুলচাচর স্মমহতপং। যত্নেন মহতা
ব্রহ্মা তং কাশ্যামকরোম্প্। * * *

বিশ্বামিত্র মুনিশ্বেষু পুত্রং স্রষ্টামুল্ল-
বান্। তব্রনান্না দিবোদাসঃ কাশীরা-
জোন্তি বাহুজঃ। সহিধন্বন্তরিঃ সাক্ষাদা-
য়ুর্বেদবিদাংবরঃ। * * * ভাবপ্রকাশঃ।

করিতে পারেন না। কিন্তু চরকসংহি-
তাতে ধন্বন্তরির মত গ্রহণ দৃষ্ট হয়। *
বিশেষতঃ যদি বিষ্ণুপুরাণোক্ত বংশাবলী
গ্রহণ করা যায়, তবে ধন্বন্তরির দিবোদাস
নাম অসঙ্গত হইয়া উঠে। কাশীরাজের
পৌত্র ধন্বন্তরি নামে এক রাজা ছিলেন ;
বিষ্ণুপুরাণে তাহার নামান্তর দিবোদাস
উল্লিখিত নাই। কিন্তু ধন্বন্তরি-প্রপৌত্র
দিবোদাস নামে একরাজা ছিলেন। সূ-
তরাং স্রষ্টাতত্ত্বক ধন্বন্তরিকে ক্ষত্রিয় ধন্ব-
ন্তরি গ্রহণ করিলে এও আর একটি অস-
ঙ্গত হইয়া উঠে। কারণ, ইহার কাশী-
রাজ আখ্যা সঙ্গত হইলেও দিবোদাস
নাম সঙ্গত হইয়া উঠে না। অপিচ,
যদি আর্যুর্বেদে ধন্বন্তরি ক্ষত্রিয়সন্তান হই-
তেন, তবে সৌশ্রুতায়ুর্বেদে তাহাকে
নিমিত্তান্তর ভূমিপ বলিয়া কীর্তিত †
হইত না। রাজত্বই ক্ষত্রিয়ের সহজ ব্যব-
সায় ; বিশেষতঃ কাশীরাজ পৌত্রজা-
তীয় ব্যবসায় ও উত্তাধিকারীত্ব উভয় স্ত্রেই
রাজা। সূতরাং, এ আর একটি তৃতীয়
দোষ আসিয়া পড়ে।

* সর্কাজনিবৃত্তি যুগপদিতি ধন্ব-
ন্তরিস্ত তদ্রূপপন্নং সর্কাজানাং তুল্যকাল-
নিবর্ত্তিভিত্তাং * * *। চরকে।

† সর্কামরগুণকঃ স্রীমান্ নিমিত্তা-
ন্তরভূমিপঃ।
শিষ্যায়োবাচ নিখিলমিদং বিজ্ঞখিলক্ষণম্।
সৌশ্রুতে।

নিশীথ-চিন্তা ।

আশার ছলনা ।

“ আশার ছলনে তুলি, কি ফল লভিবু,

হায় ! তাই ভাবি মনে । ”

এই তৃত্বিত মেদিনী যেমন আজি
আশামাত্র অবলম্বনে আকাশের পানে
চাহিয়া রহিয়াছে, এবং আশা করিয়া
সহস্রগুণে অধিকতর ক্রেশ পাইতেছে ;
আমার এই মকময় দক্ষ হৃদয়ও সেইরূপ
আশাপথপানে উর্দ্ধনয়নে চাহিয়া আছে,
এবং হায় ! আশার আশ্বাসপ্রদ মধুরকণ্ঠে
বিশ্বাস করিয়াই জীবনে এত যত্নগা ও এত
লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে । এ আশা কি
মৃগতৃষ্ণিকা ?

আশা ছিল জ্ঞানার্ণবে স্নাতার দিয়া
স্বখী হইব,—জ্ঞানের অন্ততুল পর্য্যন্ত দর্শন
করিবার জন্য এপ্রাণ মন বিসর্জন করিব ।
কিন্তু আমার সে আশা কি আর সফল
হইবে ? যে জ্ঞানে এতদিন আমার এত
অমুরাগ ছিল, সেই জ্ঞানে এইক্ষণ আমার
বিরাগ । বুদ্ধি আরও কি জ্ঞানের অনুসরণ
করিয়া বিভ্রান্ত হইতে চাহিবে ?—জ্ঞান
আর অজ্ঞান সমান কথা, অন্ধকার আর
আলোক এক । হে জ্ঞানাত্তিম্যানি ধীর !
তুমি কি ইহা অস্বীকার করিতে পার ?
তোমার জ্ঞানে তুমি কি পাইয়াছ ?—না

নৈরাশোর অন্ধতম অবিশ্বাস,—অন্ধকা-
রের শূন্যতা । তুমি এই শূন্যময় অন্ধকারে
কোন্ প্রাণে আর কিরূপে নিরালব অব-
স্থান করিবে ?—তোমার ঐ জ্ঞান সমু-
দ্রের অতলজলে ডুবাইয়া দেও । জ্ঞানী
সে, হে অজ্ঞান ;—জ্ঞানে সে, যে জানিতে
চাহে না । তুমি জানিতে যাইয়াই, জা-
নিতে পাইলে না । আমিও এই জনাই
আর জানিতে চাহি না । আমার মন
বহুদিনের চিন্তাশ্রমে হতাশ ও অবসন্ন
হইয়া এইক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, জ্ঞান
আর অজ্ঞান সমান কথা, অন্ধকার আর
আলোক এক । ঐ যে বায়ু, কখনও মৃদু
হিমোলে, কখনও ঝঞ্ঝাবেগে, প্রবাহিত
হইতেছে, জ্ঞান আর উছার প্রভাবণ কো-
থায় ?—এই যে আলোক, চক্ষুর সম্মুখীন
হইয়া গতিপথ প্রদর্শন করিতেছে জ্ঞান
উহা কি ? কোন্ সময় হইতে কালের
আরম্ভ, আর কোথায় গিয়া দেশের শেষ
সীমা ? সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখিয়া তুলিয়া
যাই । কিন্তু সৌন্দর্য্য এমন সুন্দর কেন ?
এবং চিন্তাই বা কেন উছার জন্য লালায়িত

হয়? জগতে অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য প্রাণ লইয়া, ভোগ্যবস্তুর জন্য চতুর্দিকে প্রধাবিত রহিয়াছে, এবং ভোগতৃষ্ণার পরিভূষিতে স্রুখে উৎফুল্ল, অথবা অভাব-জন্য দুঃখে ত্রিয়মাণ হইতেছে। এই প্রাণ আর স্রুখ দুঃখ, সমস্তই কি স্বপ্নলীলা নহে? হায়! এই সকল সামান্যত্বের অন্ত পাই না; যাহা অসামান্য, তাহা আমি কিরূপে জানিব?

তবে কি জানে স্রুখ? শৈশবের সরলা বুদ্ধি একথাই মানিয়া লইত। কিন্তু প্রভারণার, পর প্রভারণার, বিড়ম্বনার পর বিড়ম্বনার, বুদ্ধির সে সরলমতি বিনষ্ট হইয়াছে। উহা এইকণ আর এ সকল কথায় ভুলিয়া যায় না। জানে যদি স্রুখ তবে সংসারে অস্রুখ আর কি? কোন জানী এই অবনীমণ্ডলে স্রুখী হইয়াছে?

যাহার চক্ষু ফোটে নাই, যে সংসারে আজ্ঞাও কিছু দেখে নাই, কিংবা দেখিবার জন্য উৎসুক হয় নাই, সেই দুঃখের হলা-হলকে স্রুখের অমৃতদারা বলিয়া পান করে, কালকূটময়ী ভূজঙ্গীকে চন্দন-লতা-জ্ঞানে কণ্ঠহারি করিয়া লয়, বিপদকে সম্পদ বলিয়া আলিঙ্গন দেয়, এবং বাকদ-গৃহে শয়ান হইয়াও স্রুখে নিদ্রা যায়। কি নিশ্চিন্ত নির্ভরের ভাব! কি অনির্ব-চনীয় শাস্তি! কিন্তু যাহার চক্ষু, পূর্ণ দৃষ্টিতে বঞ্চিত রহিয়াও, একটুকু একটুকু দেখিতে শিখিয়াছে, আলোক কি তাহা না জানিয়াও আলোকের আভাষাত্র দর্শ-

নেই অতৃষ্ণির অন্তর্দাহে উদ্ভাসিত হইয়াছে, ঐ শাস্তি আর ঐ নির্ভরের ভাব আর কি তাহার অন্তরে অবস্থান করিতে পারে? জানেই বেদনা এবং বেদনাই সমস্ত দুঃখের বীজ। যে দুঃখ হইতে দূরে রহিতে চাহে, সে যেন প্রেরোচিত পাতঙ্গের মত জ্ঞানের শোভাময়ী বন্ধি-শিখার ঝাঁপ দিয়া গিয়া না পড়ে! মনুষ্যের হৃদয় নিভৃত নির্জনে এবং স্বপ্নে ও জাগরণে, সর্বদাই অতি গোপনে বিলাপ করে। কিন্তু সেই বিলাপের সার কথা কি?—না, হায়! কেন দেখিলাম, হায়! কেন জানিলাম, হায়! কেন অন্ধকার ছাড়িয়া আলোর জ্ঞান প্রধাবিত হইলাম! কি যোগী, কি ভোগী, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলেরই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ঐ অপরিষ্কৃত বিলাপ-ধ্বনি। আমরা যে সকল সময়ে উহা শুনিতে পাই না, সে কেবল সংসার-চক্রের আবর্তকেলাহলে। ইহার পরও কি আশা করিব যে, জানে আমার স্রুখ হইবে, এবং সেই আশায় আমি অদীর রহিব? স্রুখী আমার ঐ অজ্ঞান মনু। উহার হাতে ভোমরা জ্ঞানের নিষিক্ত ফল তুলিয়া দিও না। ঐ যে অবোধ, পৃথিবীর কোন ভাবনা না ভাবিয়া, কোন তত্ত্ব না জানিয়া, ধূলার পড়িয়া নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছে, উহাকে ক্ষণকাল ঐ নিদ্রা-স্রুখ ভোগ করিতে দেও। যদি আশার ছলনার আত্মবিস্মৃত হইয়া, মনুষ্য বুদ্ধির দ্রুতধিগম্য অজ্ঞের জ্ঞান-তত্ত্বের জন্য

উজাদপ্রাপ্ত না হইতাম, তাহা হইলে হয়ত আমিও আজি উহার মত ধূলি শয্যার পড়িয়া থাকিয়াই কুম্ভমাস্তীর্ণ দেবশয্যার সুখানুভব করিতাম, এবং আশাভঙ্গের অকস্মদ বেদনা হইতে মুক্ত রহিয়া, আপনাকে আপনি সুখী বলিতাম। কখনও ইহা কহিয়া পরিতাপ করিতাম না,—

“ কেন আশা ছিলিলাম আমায় ? ”—

আশাছিল, গৃহবাসে থাকিয়া হৃদয়ের সকল তৃষ্ণা পূর্ণ করিব,—মনুষ্যকে ভাল বাসিব এবং মনুষ্যের ভালবাসা আকণ্ঠ পান করিয়া, তৃপ্তির পরিপূর্ণতার ক্তার্থ হইব। এ আশা বাল্যে প্রথম বিকশিত হইয়াছে, যৌবনে প্রমত্ত ক্ষু-তিতে জীড়া করিয়াছে, এবং আজি বার্দ্ধক্যের শীতসমাগমে সঙ্কচিত হইয়া, আমাকে দূর হইতে অতি ক্ষীণ স্বরে যেন ‘না না’ বলিয়া হতাশ করিতেছে। হৃদয়! পৃথিবীর গৃহবাস যে নিরয়নিবাসের পূর্ব-চ্ছবি, তাহা কি তুমি এখনও অনুভব করিতে সমর্থ হও নাই? যেখানে মনুষ্য সপের মত মনুষ্যকে দংশন করে, জলো-কার মত মনুষ্যের শোণিত শোষণ করে, এবং শক্তি থাকিলে বস্ত্রের মত মনুষ্যকে আক্রমণ করে, তুমি কি এখনও সেই গৃহ-বাসের জন্য লালায়িত? যেখানে প্রাতঃ-সময়ের ফুল প্রীতি, প্রাতঃকালীন পদ্ম-কান্তির ন্যায়, ক্ষণকালমাত্র নয়ন বিনো-দন করিয়া, সন্ধ্যা না হইতেই শুষ্ক ও ম-লিন হয়,—অদ্যকার অকৃত্রিম সৌহার্দ

কলাই অকৃত্রিম শত্রুতাতে পরিণতি পায়, ক্লিওপেট্রা কৈশোরের গ্রোসে এটনৌকে বলিস্বরূপ উপহার দিয়া আপনার প্রাণ লইয়া আপনি পলায়ন করে এবং অরজ-জীবের মত পুত্রও পুত্রের প্রতিমূর্তি ব-লিয়া সকলের পূজা পাইয়া থাকে, তুমি কি সেই গৃহবাসের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত? যেখানে স্বার্থসেবার নাম সংসার-হি-তৈষণা, ধর্ম লইয়া বাণিজ্যের নাম ধর্ম-প্রচার, যশঃস্পৃহার কণ্ডূয়নের নাম অ-ধ্যাত্ম-উদ্দীপনা এবং পরপীড়নের নাম পৃথিবীর মঙ্গল-সাধন, তুমি কি অদ্যপি সেই গৃহবাসের জন্য আকুলিত?

গৃহবাস কি? পার্থিব গৃহবাস প্রায় সকলের পক্ষেই বনবাস। বনে ব্যাত্ত ভ-ল্লুক; গৃহে হিংসা ঘেব। হায়! যখন দেখিয়াছি যে, পুত্রশোকাভুরা জননী, এই মুহূর্ত্তে পুত্রের জন্য আর্তনাদ করিয়া, পর মুহূর্ত্তেই পুত্রের ত্যজ্য সম্পত্তির জন্য প্রতিবেশী কি বিধবা পুত্রবধুর সহিত ঘোরতর বিবাদে প্ররুক্তা হইয়াছে, আমি তখনই বলিয়াছি পৃথিবীর এ গৃহবাসে কথের আশা রূপা। যখন দেখিয়াছি যে, ভ্রাতা ভ্রাতার বক্ষে আঘাত করিয়া আ-পনার অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় দেখিয়াছে, ভগিনী বিষয়-বাসনার তৃপ্তির নিমিত্ত ভ্রাতৃ-বিয়োগের দিন গণনা করিয়াছে এবং প্রা-ণাদিক প্রিয়তমা প্রেম-বিহ্বলা ভার্ঘ্যা প্র-ভুত্বের নুতন মদিরা পানেই নববৈধব্যের স-কল দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছে, আমি তখনই

বলিয়াছি, পৃথিবীর এ গৃহবাসে স্রুথের আশা রূপা। যখন দেখিরাছি যে, মনুষ্য যে তরুর ছায়া অবলম্বন করিয়া দগ্ধদেহ শীতল করিয়াছে, সেই তরুরই মূলোচ্ছেদে যত পাইয়াছে, যে হস্ত রোগ, শোক কি বিপদের সময়ে তাহার মুখে অন্ন তুলিয়া দিয়াছে, সেই হস্তই সে বিবদস্তে দংশন করিয়াছে এবং ক্লতজ্ঞতা, এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে মৰ্মাহত হইয়া, মনুষ্যনিবাস হইতে উদ্ধৃষ্টাশে ও ত্রাহিরবে পলাইয়া যাইতেছে, আমি তখনই বলিয়াছি, পৃথিবীর এ গৃহবাসে স্রুথের আশা রূপা। যখন দেখিরাছি যে, লোকে দেবতার অঙ্গে ধূলি কর্দম দিয়া, পিশাচের পদধূলি লইয়া অঙ্গে মাখিতেছে, বিপন্ন মহত্ত্বের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, পাপপঙ্কে নিমগ্ন পাপজ সম্পদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভক্তের মত দলবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে, এবং দিনকে রাত্রি, সত্যকে অসত্য এবং আলোককে অন্ধকারে পরিণত করিয়া কুটিলবুদ্ধির কুট অভিসন্ধি সম্পূরণ করিতেছে, আমি তখনই বলিয়াছি, পৃথিবীর এ গৃহবাসে স্রুথের আশা রূপা। যখন দেখিরাছি যে, যাহার জন্য বিরলে বসিয়া অশ্রুপাত করিয়াছি, সে বিরলে বসিয়া অভিসম্পাত করিয়াছে, যাহাকে দেখিবার জন্য আকুল হইয়া নিকটে গিয়াছি, সে দেখা দিতে না হয় এজন্য বিরাগভরে দূরে গিয়াছে, এবং যাহাদিগের জন্য ভিকারী বনিয়াছি, করে মুক্তিমিত ভিক্ষার তুলিয়া দিতেও পরি-

শেষে তাহার রূপণ ও কাতর হইয়াছে, আমি তখনই সহস্রজিহ্বায় বলিয়াছি যে, পৃথিবীর এ গৃহবাসে স্রুথের আশা রূপা।

তবে কেন পড়িয়া রহিয়াছি?—আশা তুমিই এই প্রশ্নের উত্তর দাও। মনুষ্যকে ভাগ করিয়াও তুমি ভাগ কর না এবং মনুষ্যের প্রলুক্ক প্রাণ পুনঃ পুনঃ তোমায় পরিত্যাগ করিয়াও একেবারে তোমায় পরিত্যাগ করিতে পারে না। দীপ নিৰ্কাণ হইয়া যায়, তথাপি আশা আছে, আবার উহা জ্বলিয়া উঠিবে,—হৃদয় তুবানলে ভস্ম হইয়া যায়, তথাপি আশা করি, আবার উহা অমৃতরসে সিক্ত হইবে। আশার কণ্ঠধনি এমনই উন্মাদিনী!

ঐ শূন আশার মোহন মুরলী এই গভীর নিশীথে কি অপূৰ্ব্ব মাধুরীতে নিনাদিত হইতেছে এবং সেই মূহুমোহনমধুরলহরী, নিদ্রা-মৃত মনুষ্য-হৃদয়ের রন্ধে রন্ধে প্রবিষ্ট হইয়া, মনুষ্যকে কিরূপ আকুল, উৎফুল্ল এবং উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। ঐ বিরহবিধুরা দুঃখিনী, অতৃপ্ত প্রেমতৃষ্ণায় অন্তরে জর্জরিত হইয়া, নিদ্রার আবেশে দীনবেশে পড়িয়া রহিয়াছে, আশা তাহার কর্ণকুহরে ধীরে ধীরে কহিতেছে, 'নিদ্রার পর বারিধারা, দুঃখের পর স্রুথ'। ঐ যে ক্ষীণকলেবর সুন্দর যুবা, জীবনসংগ্রামে অবসন্ন এবং জীবনের সমস্ত উদ্যমে ব্যর্থ হইয়া, আছে কি নাই এইভাবে নিপতিত দূক্ট হইতেছে, আশা তাহার কর্ণকুহরে ধীরে ধীরে কহিতেছে, 'অন্ধকারের পর

জ্যোৎস্না, হুঃখের পর সুখ ? ঐ যে অ-
নীনশব্দ অভিমানী পুরুষ, পৃথিবীতে পৌ-
কষ ও প্রতিভার বিড়ম্বনা এবং নীচতা ও
ক্ষুদ্রতারই পরিপুষ্টি দেখিরা, অপমানের
বিষদাছে নিজার মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রতপ্ত
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে, আশা তাহার
কর্ণকুহরে ধীরে ধীরে কহিতেছে,—‘শী-
তের পর বসন্তস্রী, হুঃখের পর সুখ ? আর
ঐ যে জগদপ্রগণা, জগদ্বান্য ‘মলিমমূ-
রতি’ ভারতলক্ষ্মী, অযোধ্যার রামলক্ষ্মণকে
সরসুর জলে ভাসাইয়া দিরা, হস্তিনার তীক্ষ্ণ
দ্রোণ ও কর্ণার্জুন এবং তাহাদের পৃষ্ঠপূ-
রক অক্ষৌহিণী কুরুক্ষেত্রের শ্মশানানে

ভস্ম করিরা, রাজপথের কাঙ্গালিনীর মত
আজি এই বোর বামিনীতে ভারত-শ্মশানে
পরিভ্রমণ করিতেছেন,—সেই শোভা
নাই, সেই মহিমা নাই—তথাপি সেই পু-
রাতন গৌরবের ছটায় গম্বিত রহিরা, অ-
ন্ধকারে পাগলিনীর মায় কি যেন খুঁজিরা
বেড়াইতেছেন, আশা, ভয়ে ভয়ে, ভীত-
পদবিক্ষেপে, তাঁহারও স্নানীপবস্তিনী হইয়া,
ভীতি-কন্ধ অক্ষুটস্বরে কহিতেছে,—

‘রাত্রির পর প্রভাতসূর্য,

হুঃখের পর সুখ।’

(উদাসীন)

বিজ্ঞাপনী

১।

চাই

একখানি পরশ পাথর,—

যাহা ছুইলে তাহা, কাঁসা, পিতল
প্রভৃতি সমস্ত বস্তু যোগা হয়,—বিষয় মন
প্রমত্ত হইয়া উঠে, জরাজীর্ণ ভয়দেহে
চির-যৌবন ও চির-বসন্ত বিরাজ করে,
এইরূপ একখানি অমূল্য পাথর। বিলা
মূল্যে পাইলে ক্রয় করিতে ইচ্ছা আছে।

২।

চাই

একটি উত্তম স্ত্রী চাই।

একজন অস্পায়ক অরসিক রুদ্ধের জন্য এতি
বড় ভাল একটি ভার্য্যা চাই।

কথায় অকথায় ঝঙ্কার না দেন, বর্ষা-
কালীন মেঘের মত সর্বদাই মুখ জোর ক-
রিয়া বসিরা না থাকেন, কল্পছন্দরা পিতা-
মহীর মত আঘোদ প্রমোদে সকল সম-
য়েই তারমুখে তিরস্কার না করেন, ছোট

খাট একটি মুরস্কি অথবা আধুনিক পাদ-
ন্থীদিগের মত সামুদায়িক স্বরে লেখচার
দিতে অগ্রসর না হন, এবং গোবিন্দপু-
রের গোবিন্দমিনীদিগের মত আলতামাখা
পা হুখানি সম্মুখে প্রসারণ করিয়া তা-
হাতে পুষ্পাঞ্জলি দিতে না বলেন, এইরূপ
একটি যারপার নাই ভাল, অমৃতময়ী অবলা
চাই।

উঁহার কণ্ঠস্বর, কোকিল কণ্ঠের মত
উদ্ভদ, ভ্রমরগুঞ্জনের মত নিত্রোপ্রদ, এবং
জিতস্ত্রীর মৃদুলহরীর মত সুললিত না হই-
লেও, স্নেহরসমিক্ত মধুর হইবে,—অর্থাৎ
তিনি যখন বালক বালিকাদিগের উপর
গর্জিয়া উঠিবেন, তখন যেন আমার কণ্ঠ-
লব্ধ নিত্রোটুকু তান্ত্রিয়া না যায়, এবং
তিনি যখন প্রতিবেশিনীদিগের সহিত
ভৈরবীর মত বাহুতাড়নসহকারে বিবাদ
করিতে প্ররতা হইবেন, আমার এই চি-
ন্তাকাতর প্রাণ যেন তখন ভয়ে না চম-
কিয়া উঠে।

উঁহার হৃদয় ধৃতুরার মত ধবল, নব-
নীতের মত কোমল এবং পারিজাত পু-
স্পের মত পৃথীভ্রুর্ভ না হইলেও উঁহাতে
অন্ততঃ গোলাপের সৌন্দর্য্য ও গোলাপের
সৌরভ থাকা নিতান্ত আবশ্যিক। অর্থাৎ
আমি যেন সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর
গৃহে আসিয়া হিংসার তুম্বানলে জ্বল-
য়িত এবং নীচতার অসহ্য দুর্গন্ধে ক্লিষ্ট
না হই;—আর লোকে যে স্বর্ণলাভের
জন্য এত তপস্যা ও এত সাধনা করে,

আমার এই অলস আত্মা যেন বিনা তপ-
স্যায় ও বিনা সাধনায় স্বগৃহে বসিয়াই
সেই সুদূর স্বর্গের পূর্বস্বাদ প্রাপ্ত হয়।

অশিচ, উঁহাতে অভিমানের মোহন
মাধুরী থাকিবে, কিন্তু অহঙ্কারের মদগর্ভ
থাকিবে না;—সংসারের উপলক্ষ্যমিনী
সুতীক্ষ্ণ বিষয় বুঝি থাকিবে, কিন্তু বিষয়ীর
জঘন্য সংসার-লিপ্সা কোন মতে স্থান
পাইতে পারিবে না। তিনি কবি না হ-
ইলেও কল্পনার লীলাঙ্গরী সহচরীর স্তায়
চিত্তবিনোদিনী হইবেন; ভাগীরথী গঙ্গার
ন্যায় গভীরমলিনা না হইলেও, নিত্য
যুতন তরঙ্গে তরঙ্গময়ী রহিবেন; এবং
স্বখে সোহাগ, দুঃখে শান্তি, জ্ঞানে শিষ্য,
প্রেমে গুরু, এবং সম্পাদে শোভা ও বি-
পদে বল স্বরূপ হইয়া, জ্যোৎস্না ও অন্ধ-
কার সকল সময়েই—হৃদয়ের সান্নিধ্যে,
হৃদয়ের হৃদয় মধ্যে অবস্থান করিবেন।

পৃথিবীর ধন মান বৈভবে,—অর্থাৎ
কাচ কাঞ্চন তাত্র রজতে উঁহার অনুরাগ
থাকিলে পোষাইবে না। কারণ, আমি
পোন্ধর কি দোকানদার নহি। এবং
তিনি ক্ষুদ্র-পুথ-লোলুপা বিড়ালাকী ব-
ণিগুধু অর্থাৎ কটাচক্ষুশালিনী বেগে বৌ
হইলেও আমার চলিবে না। কারণ, আমি
একমাত্র মহত্ত্বেরই উপাসক। উঁহাকে
লইয়া মুদী কি বেগের ব্যবসায় অবলম্বন
করা আমার অভিপ্রেত নহে।

পরন্তু উঁহাতে ধার্মিকার ভাণ ও
ক্রটি থাকিবে না, কিন্তু দর্ম থাকিবে;—

প্রেমিকার আবিলতা থাকিবে না, কিন্তু প্রেমের প্রমত্ত প্রবাহ থাকিবে;—এবং পাণ্ডিত্যের ঘনঘটা থাকিবে না, কিন্তু বিদ্যার বিনোদ কান্তিতে প্রকৃত অনুরাগ থাকিবে।

যদি কেহ এইরূপ একটি অবলারত্নের সংবাদ পাইয়া থাকেন, তিনি অমুগ্রহ পূর্বক জ্ঞানানন্দ সরস্বতীর নিকট সারস্ব-তাশ্রমের ঠিকানায় ব্যারিং পত্র লিখিবেন। মূল্য,—চিরজীবনের জন্য একজন সরলপ্রাণ মনুষ্যের মনঃপ্রাণ,—সর্বস্ব।

৩

অর্থপুস্তক ! !

অর্থপুস্তক ! অর্থপুস্তক ! অর্থপুস্তক !
প্রথমভাগ বর্ণপরিচয়ের প্রথম পরিচ্ছেদের
অর্থপুস্তক।

ইহাতে স্বরের অ আ, এবং ক খ প্রভৃতি ব্যঞ্জন বর্ণের এবং কট মট খট ঘট প্রভৃতি কঠিন শব্দ সমূহের অর্থ অতি বিশদ ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে।—সুকুমারমতি শিশুদিগের বিশেষ উপযোগি,—বঙ্গবিদ্যালয় সমূহে বিশেষ ব্যবহারের উপযুক্ত এবং বিজ্ঞ বিজ্ঞ ডিপুটীইন্স্পেক্টর বাবুদিগের দ্বারা বিশেষ রূপে প্রশংসিত। মূল্য চারিআনা মাত্র। যাহার প্রয়োজন হয়, তিনি ঢাকা, বাবুর বাজার ছি ছি আই আই বানরজী এণ্ড কোর শিশুগ্রামিনী নামক স্প্রিংসিদ্ধ লাইব্রেরীতে পত্র লিখিবেন।

বেন। কেহ এক সঙ্গে ২৫ খণ্ডের অধিক ক্রয় করিলে, শতকরা সোয়াশত টাকা হিসাবে কমিসন পাইবেন।

প্রমুকারণ।

৪।

কুন্তলবৃষ্য বৃকভানুনন্দিনী।

আশ্চর্য্য তৈল ! আশ্চর্য্য তৈল !

প্রতিশিশী একটাকা। পেকেট খরচ পাঁচসিকা। ইহা একমাসকাল মস্তকে ব্যবহার করিলে চলিশের অনধিক বয়স্ক অকালপক রক্তের খেঁত কেশ 'নিবিড় কৃষ্ণ' কালো হয়, এবং আধ-রুক্ষা আধ-যুবতী, অক্ষুটিময়ী ভামিনীদিগের 'ভ্রমর-কৃষ্ণ' চূর্ণকুন্তল শঙ্খ কি তুষারেরমত শাদা হইয়া যায়। কলিকাতা, পাটুয়াটুলী জাতীয় স্বাধীনতার মেডিকেল ডিপার্টমেন্টে প্রাপ্তব্য।

৫।

প্রেম-স্বর-হর-গজেন্দ্র- কেশরী বটিকা।

সন্ন্যাসী প্রদত্ত মহা মহৌষধ।

ইহার ৩টি মাত্র বটিকা সেবনে একা-ধিক, ষাটিক, ত্র্যাটিক ও সাপ্তাহিক প্রভৃতি সর্ববিধ প্রেমস্বর একবারে বিনষ্ট হয়। বহুদিনের পুরাতন পৈত্রিক প্রেম এবং ভৎসংক্রান্ত জ্বালা ও গাত্র দাহ

প্রকৃতি উপসর্গ সকল সম্পূর্ণরূপে বিলোপ
পায়,—আর অতি বড় কঠিন ও সাধারণতঃ
চিকিৎসার অসাধ্য মেলেরিয়ার প্রেমও
এই বটিকা সেবনে উন্মূলিত হইয়া যায়।
কলিকাতা, বটতলা, গোবিন্দচন্দ্র কবি-
ভূষণ কিংবা কবিরাজ চূড়ামণি দাশরথি
রায়ের আনুর্ভবদীয় চিকিৎসালয়ে প্রা-
প্তব্য। মূল্য প্রত্যেক বটিকা পাঁচপয়সা
মাত্র।

৬।

সাহিত্য বিকাশিনী লাইব্রেরী।

ঢাকা, তাঁতিবাজার, ১২ নং বাটী।

মুখরঙ্গী এবং কোঁ কর্তৃক সংস্থাপিত।

আমাদিগের দোকানে নিম্নলিখিত
নূতন পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ আগত হই-
য়াছে।

রাই-রঙ্গ-তরঙ্গ-ভঙ্গি-বিলাসিনী নাটক।

ব্রজেন্দ্র-চন্দ্র-জীমূত-মন্দ্র-গর্জিনী নাটক।

প্রভুকান্ত নন্দিনী।

স্পেলিঙের কি (?)

ফাউবুকের কি (?)

বার্ডবুকের অর্থপুস্তকে কি (?)

দুরন্ত-বসন্ত-কৃতান্ত-শাস্তকারিনী নাটক।

—

ঘুমের ঔষধ।

অব্যর্থ! অব্যর্থ! অব্যর্থ!

আবু গওহরের আবিষ্কৃত,—

পারস্যের শৈলাধিপতি কর্তৃক,

প্রথম ব্যবহৃত,

মণ্টিকুস্টের পরীক্ষিত,

কমলাকান্তের চির-বাঞ্ছিত, চিরসেবিত।

বিনামূল্যে বিতরিত হইয়া থাকে।

অনুমস্যের ঘুম হয়,

অলস্যের আলস্য যায়,

অকবি কবিত্ব লাভ করে,

আকাশের চাঁদ হাতে আসে,

আঁধার ঘরে তারা ফোটে।

যিনি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়া সকলকে উ-
দ্ভাসিত করিতে চান, এই ঔষধ তাঁহার
জন্য। যিনি ভাষার শ্রোতে তরঙ্গ তুলিয়া,
পাল উড়াইয়া, চলিয়া যাইতে চাহেন, এই
ঔষধ তাঁহার জন্য। যিনি ঝিনুক দিয়া
সমুদ্র সেচিতে ইচ্ছা করেন, এই ঔষধ তাঁ-
হার জন্য। যিনি নীরবজগতে ঝিল্লিরব
শুনিতে অভিলাষী হন, এই ঔষধ তাঁহার
জন্য। যিনি কমলাকান্ত শর্ম্মার মত ঝি-
মিয়া ঝিমিয়া রসের কথা লিখিতে ভাল
বাসেন, এই ঔষধ তাঁহার জন্য। আর,
যিনি বয়সে বৃদ্ধ হইলেও ক্ষম্যে চিরযৌবন

পুথিয়া রাখিতে আকাঙ্ক্ষী, এই অমোঘ
অমূল্য ঔষধ তাঁহার জন্য ।

শ্রীমমৃতকান্ত বসু

উদয়পুর পোস্টঅফিশ হইয়া,

বিনোদগঞ্জের বঙ্গবিদ্যালয় ।

৮

নূতন নাটক ।

রসের চটক ।

না মিষ্টি নাটক ।

অতি চমৎকার রচনা ।

একজন অত্যভিখ্যাত কবিকর্তৃক বিরচিত ।

ইহাতে

ভ্রমরের গুন্ গুন্, ভোমরার ভন্ ভন্,
কোকিলের কুহু কুহু, উকীলের আহা উহু,
বিরহীর দশ দশা, বসন্তের মাছি মশা,
মারামারি কাটাকাটি, ধরাধরি ঝাঁটা ঝাঁটি,

জাতি যুতি ফুল

পাপিরা বুল বুল

প্রভৃতি ।

উৎকৃষ্ট নাটকের সমস্ত উপকরণ আছে ।

মূল্য অল্প, মূল্য নগদ, মূল্য এক টাকা ।

কলিকাতা, ভবানীপুর, রামদাস শ-
খার ভারত উদ্ধার নামক ভারতবিখ্যাত
ডাক্তরখানার প্রাপ্তব্য ।

৯।

কর্মখালি ।

কুণ্ডলপুরস্থ রাজবাটীর প্রধান চাটুক-
রের পদ অল্প দিন হইল খালি হইয়াছে ।

বেতন দায়িক ১২৫ টাকা । যিনি এই পদে
নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাকে নিম্নলিখিত কার্য
সকল সুরচাকরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে।—

১। কর্তার একটি ত্রিলোক বাছা
অলোক-সামান্য ছেলে আছে । উহার
আকৃতি ছোট একটি ভল্লকের মত । প্র-
কৃতি মর্কটের মত, এবং কণ্ঠস্বর ঠিক একটি
দীর্ঘশ্বশ্রু অঞ্জের মত । প্রধান চাটুকীর ঐ
বালককে দশে দশবার সজ্জননয়নে ও গদ-
গদ বচনে দশরথের রামচন্দ্র এবং নন্দ্রের
গোপাল হইতেও উৎকৃষ্ট বালক বলিয়া
সকলের কাছে ব্যাখ্যা করিবেন ; যখন ঐ
কম-কান্তি কার্তিকের স্কুলের ছেলেদের
কাগজ কি কেতাব চুরি করে, হালুই দো-
কানের মিঠাই লইয়া দৌড় দেয়, অথবা
প্রতিবেশী কোন বালকের উপর অকারণ
অত্যাচার করে, তখন তিনি যাহার কেতাব
কি কাগজ চুরি গেল, দৌড়িয়া তাহাকে
মারিতে যাইবেন,—যাহার মিঠাই অপহৃত
হইল, তাহাকে দণ্ড করিবার জন্য দেওয়ান-
নকে অরূোধ করিতে থাকিবেন, এবং
পাড়ার যে বালক বিনাকারণে লাধী কীল
খাইল, তাহার চৌদ্দ পুরুষকে উঁচঃশ্বরে
তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ।

২। কর্তার একখানি অতি কদর্য
পুরাণ গাড়ি আছে, সে খানিকে তিনি
নাট সাছেবের আট ঘোড়ার গাড়ি অ-
পেক্ষা সুন্দর বলিবেন ;—কর্তা মধ্যে মধ্যে
কপিলবসু ভালে, খষভ রাগে বিরহের
টপ্পা গাইয়া থাকেন, তখন তিনি নয়ন মু-

দিয়া ফোটা ফোটা অশ্রুজল ফেলিবেন,—
আর কর্তার একটি যুৎপ্রতিষ্ঠিতা পিশাচী
আছে, সেটিকে তিনি ধর্মের ভগিনী ব-
লিয়া সম্ভাষণ করিবেন।

৩। কর্তা আপনার বিদ্যা প্রকা-
শের জন্য মধ্যে মধ্যে বেদ বেদাঙ্গ প্রকৃতি
বিবিধ শাস্ত্র লইয়া সম্ভাষ অভ্যাগত বা-
ক্তিদিগের সহিত তর্ক করিয়া থাকেন।
যিনি হুঃসাহসে ভর করিয়া তর্কে কর্তাকে
পরাস্তব করেন, প্রধান চাটুকর, সমক্ষে
তঁাহার প্রতি আরক্ত লোচনে চাহিয়া থাকি-
য়া, পরোক্ষে তঁাহাকে খ্রিস্টান ও মূর্খ
বলিয়া গালি দিবেন ;—এবং কর্তা যদি
প্রীত্যাতিশয়োও একটু শিরঃপীড়া অনু-
ভব করেন, তাহা হইলে তিনি, ডাক্তার ও
কবিরাজ মহলে এক হট্গোল ঘটাইয়া,
সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া, মাথার হাত দিয়া
বসিয়া থাকিবেন। তঁাহার উপদেশ মতে
সে দিন স্কল, আফিশ, ডাক্তার খানা, ও
হাট বাজার বন্ধ থাকিবে।

যদি বাজলা যে, যিনি এইরূপ প্রথম
শ্রেণীর কর্তাভজ্ঞা নছেন, তঁাহার আবেদন
গ্রাহ্য হইবে না। জীবিলাসরঞ্জন রায়।

১০

নিবেদন।

যিনি একঘণ্টার মধ্যে স্বকীর মনোম-
ন্দিরে জীবাস্ত্রার আবির্ভাব অনুভব ক-
রিয়া, দুইঘণ্টার মধ্যে আশ্রয়লাভ ক-
রিতে চাহেন, তিনি আমার নিকট পেইড

পত্রদ্বারা সবিশেষ লিখিবেন, এবং সেই
পত্রের সহিত আধাআনা মুলোর একটাকার
ডাকের টিকিট পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীমিরিঙ্গাকান্ত গুহ।

সাং জ্ঞানকীপুর।

১১।

কোন্দলের বীজ।

আশ্চর্য্য চীজ।

তন্ত্রমতে মন্ত্রপুত তামার তাবিজ।

হিংস্রকের কটা চক্ষু, কেউটে মাপের দাঁত,
নিম্বুকের জিহ্বা আর ইহুরের আঁত ;—
সাত সতিনের শাদা চুল, শেঁউতি ফুলের
কাঁটা,
সাত পুকুরের পচা জল, খেতকরবীর আঁটা,
শকুনের নখ আর বোলতার হল ;
অমাবস্যার রাত্রে তোলা রক্তদ্রব্য ফুল।

এই সমস্ত বস্তু মন্ত্রসংস্কৃত হইয়া উক্ত তা-
বিজে আছে। যে সকল গৃহলক্ষ্মীরা ইহা
ব্যবহার করিতে চাহেন, তঁাহারা, কৃষ্ণপ-
ক্ষের অষ্টমীতে রাত্রি ঠিক দুই প্রহরের স-
ময়, পের্চার ডাকে শয্যা ত্যাগ করিয়া উ-
ঠিবেন ;—এবং অষ্টাট আঁদি পুকুরের জলে,
এলোচুসে একতুবে স্নান করিয়া, আর্দ্র আঁ-
চলের স্ত্রতাদিয়া ইহা কণ্ঠে ধারণ করিবেন।
এই তাবিজ কুমিল্লার জেলায় মেহাতের কা-
লীবাড়ী, শ্রীমদ্ভৈরবগিরি মোহন ঠাকুরের
নিকট মন্ত্রশোধনের জন্য একবোতল সা-
মগ্রী মাত্র পাঠাইয়া দিলেই পাওরা যায়।

১২

খট্টাপুরাণ ত্রয়োদশ স্কন্ধ বিনামূল্যে বিতরণ।

ডাকমামুলও দিতে হইবে না।

ঈহা হার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি পাকট খরচ প্রকৃতি অপরিহার্য ব্যয় নি-
র্কাহের জন্য মাত্র ১০, টাকার একখানি
বেক নোট পাঠাইয়া দিবেন।

ঐঅনুভূতচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

— সাং পঞ্চকরণ।

১৩

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পুনঃ পুনঃ পঠিতব্য, শতবার দেখিতব্য,

অতি নূতন উপন্যাস।

অতি পুরাতন গীত।

“ কাব্য কথা। ”

মূল্য বার্ষিক ৩৯/ অনান্য মাত্র।

ইহার বিজ্ঞাপনে লেখা আছে “ ঈ-

হাদিগের নিকট বাহুবের ছাল ব-
করা মূল্য বাকি, তাঁহারা দয়ার অনু-
রোধে, দাক্ষিণ্যের অনুরোধে, এবং দয়া
ধর্ম না থাকিলে তদ্রতর অনুরোধে,
তাঁহা পাঠাইয়া দিবেন। ইহাতে কোন-
মতে,—লৌকিক কি অলৌকিক কোন
ছেতুতে বিলম্ব না হয়।—ঈহারা এতদিন
বাহুবের মিত্র ছিলেন, তাঁহারা প্রেমের
অনুরোধে ইহার গাঢ়তর মিত্র হইবেন ;—
ঈহারা এতদিন বাহুবের শত্রু ছিলেন,
তাঁহারা আমাদিগের মিনতি বিনতি প্র-
ণতি অথবা বাস্তালির একতা এবং বা-
জলার উন্নতির অনুরোধে, এইক্ষণ ইহার
মিত্র হইয়া দাঁড়াইবেন। আর ঈহারা
বাহুবের ঐহক নহেন, তাঁহারা নূতন
বৎসরে নূতন ঐহক হইয়া নিজেয়া কু-
তার্থ হইবেন, এবং আমাদিগকেও চরি-
তার্থ করিবেন। ”

—

✓ সমালোচনা।

১। “ কবি-কাছিনী। জিরবীন্দ্রনাথ
ঠাকুর প্রণীত। ” শব্দে কবিতার শরীর গ-
ঠন, ছন্দে উহার ভঙ্গি কিংবা গতির ঠাম,
কিন্তু ভাবগত রসই উহার প্রাণ। নিম্ন-
লিখিত পদাবলীতে কবিতার শব্দ আছে
ও ছন্দ আছে, কিন্তু প্রকৃত কবিতা নাই।
যথা—

“ আরলো আলি, সবার মিলি
কুমুম তুলি, মনের স্মখে । ”

অথবা—

“ বকুল বনে, আকুল মনে
দুকুল উড়ায় গোকুল চোরে ।
বাজলো বাঁশী, গলায় কাঁসি,
ধরে আসি কেমন কোঁরে । ”

এইরূপ ললিত পদাবলীতে ক্ষতিরঞ্জন হয়, কিন্তু মানব হৃদয়ের অন্তস্তম কখনও স্পৃষ্ট কিংবা আলোড়িত হয় না। বাঙ্গালি, হুর্ভাগ্যবশতঃ, তরলমতি বালিকা-দিগের মত, এইরূপ পদাবলীরই ডক্ত এবং এই নিমিত্তই এদেশে দৈর্ঘ্যরঞ্জ ও হরিশ মিত্র প্রভৃতি ললিতপদ-ব্যবসায়িদিগের এত আদর ছিল। আর এক শ্রেণীর পাঠক ললিত পদ অপেক্ষা পদ-বিন্যাসের মুষ্টিমানা লইয়া ব্যতিবাস্ত। তাঁহারা “আয়লো আলি কুসুম তুলি” শুনিবার জন্য অসীর হন না, এবং বকুল বনেও হুকুল উড়াইতে ভাল বাসেন না। তাঁহাদের কচি ‘নিপট কপট শঠ লম্পট ঝম্পটে।’ দাসুরায় তাঁহাদিগের কালিদাস, গোবিন্দ অধিকারী তাঁহাদিগের জয়দেব এবং বর্তমান কালের যাত্রাওয়ালাবর্গ তাঁহাদিগের কবিসম্প্রদায়। এই তিন শ্রেণীর পাঠক রবীন্দ্রনাথের কবি-কাহিনীতে অগ্রযাত্রাও সূখানুভব করিবেন না। কিন্তু বাঁহারা শব্দ ও ছন্দ অপেক্ষা কাব্যগত ভাবেরই সমধিক আদর করেন, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে বাঙ্গালা ভাষার হৃদন একখানি আভরণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন। ইহাতে যথার্থই কবিতা আছে। যে কবিতা যনাঙ্ক নতোমণ্ডলে দামিনীর মত রূপের ছটায় নয়ন খাঁদা দেয়, রবীন্দ্রনাথের লেখায় সে কবিতা দৃষ্ট হইবে না। যে কবিতা প্রাণলতা রসিকার মত আপনার ভারে আপনি হু-

লিয়া পড়ে, ইহাতে তাহার কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হইবে না। কিন্তু যে কবিতা, শিশির-সিক্ত কমল-কলির মত কথা না কহিয়াও মনুষ্য-হৃদয়ের সহিত নীরবে কথোপকথন করে;—যে কবিতা ফোটে ফোটে হইয়াও ফোটে না, অথচ অপরি-স্কৃত সৌন্দর্য্যে মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লয়, এই কবি-কাহিনীর প্রায় সর্বত্রই সেইরূপ প্রীতিময়ী পবিত্র কবিতা সূক্টিসম্পন্ন পাঠকের চিত্তবিনোদন করিবে। এদেশের কত সহস্র কবিই ভালবাসা প্রসঙ্গে কত সহস্র কথা লিখিয়াছেন; কিন্তু কবি-কাহিনীতে অতি অল্প কএকটি পংক্তিতে ভালবাসা কিরূপ বর্ণিত ও সূচাকরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, পাঠক তাহার বিচার করুন।)

একি দেবি কল্পনা, এতমুখ প্রণয়ে যে
আগে তাহা জানিতাম না ত!
কি এক অমৃতধারা ঢেলেছ প্রাণের পরে
হে প্রণয় কহিব কেমনে?)
অন্য এক হৃদয়েরে হৃদয় করা গৌ দান,
সে কি এক স্বর্গায় আমোদ।
এক গান গায় যদি, দুইটি হৃদয়ে মিলি
দেখে যদি একই স্বপন,
এক চিন্তা এক আশা, এক ইচ্ছা হৃদয়নার
একভাবে হৃদয়ে পাগল,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছয়, সে কি গৌ স্নেহের মিল,
এজনমে ভাঙ্গিবেনা তাহা।
আমাদের হৃদয়েরে হৃদয়ে দেবি,
তেমনি মিশিয়া যায় যদি—

একসাথে এক স্বপ্ন দেখি যদি দুইজনে
তা হইলে কি হয় সুন্দর !
নরকে বা স্বর্গে থাকি, অরণ্যে বা কারাগারে
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা হইবে—
কিছুভয় করি নাকো—বিহ্বল প্রণয়ঘোরে
থাকি সদা মরমে মজিয়া !
তাই হোক—হোক দেবি আমাদের দুইজনে
সেই প্রেম এক কোরে দিক্ ।
মজি স্বপনের ঘোরে, হৃদয়ের খেলা খেলি
যেন যায় জীবন কাটিয়া । ”

পুনশ্চ,

✓ নিশীথে একেলা হোলে, এইরূপ কতগান
বিরলে গাইত কবি বসিয়া বসিয়া ।)
সুখ বা দুখের কথা, বুকের ভিতরে বাহা
দিন রাত্রি করিতেছে আলোড়িত প্রায়,
প্রকাশ না হোলে তাহা, মরমের গুণ্ডভারে,
জীবন হইয়া পড়ে দাকণ বাণিত ।
কবি তার মরমের প্রণয় উচ্ছ্বাস কথা
কি করি যে প্রকাশিবে পেত না ভাবিয়া ।
পৃথিবীতে হেন ভাবা নাইক, মনের কথা
পারে যাহা পূর্ণভাবে করিতে প্রকাশ ।
ভাব যত গাঢ় হয়, প্রকাশ করিতে গিয়া,
কথা তত নাহি পায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া,
বিবাদ যতই হয়, দাকণ অস্ত্র ভেদী
অক্ষয়জল তত যায় শুকায়ে যেমন ! ”
✓ বাবু রবীন্দ্র নাথ প্রকৃতির শোভা ব-
র্ণমেও প্রশংসনীর । প্রস্ফুর্ত্তে মহা প্রকৃ-
তির যে একটি স্তোত্র রহিয়াছে, তাহা
উচ্চ শ্রেণীর কবিস্বাভা না হইলেও মনো-
হর ; কিন্তু আমরা সেটি উচ্চ না করিয়া,

হিমালয় বর্ণনার আরম্ভভাগ নিয়ে জুজির
দিলাম । বাহাদিগের কল্প আছে, এবং
হৃদয়ে প্রকৃতির প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতি
আছে, তাঁহারা এই বর্ণনা পাঠ করিয়া
মোহিত হইবেন ।

“কি সুন্দর সাজিয়াছে ওগো হিমালয়,
তোমার বিশালতম শিখরের গিরে
একটি সন্ধ্যার তারা ।) সুদীল গগন
ভেদিয়া, তুম্বার শুভ মন্তক তোমার !
সরল পাদপরাঞ্জি আঁধার করিয়া
উঠেছে তাহার পরে ; সে ঘোর অরণ্য
ঘেরিয়া হুহু করি তীক্ষ্ণ শীত বায়ু
দিবানিশি কেলিতেছে বিবর নিশ্বাস !
শিখরে শিখরে ক্রমে নিভিয়া আসিল
অস্ত্রধান তপনের আরক্ত কিরণে
প্রদীপ্ত জলদ-চূর্ণ । শিখরে শিখরে
মলিন হইয়া এল উজ্জ্বল তুম্বার,
শিখরে শিখরে ক্রমে নামিয়া আসিল
আঁধারের যবনিকা ধীরে ধীরে ধীরে !
পর্ষভের বনে বনে গাঢ়তর হোল
সুময় অন্ধকার । গভীর নীরব !
সাড়া শব্দ নাই মুখে অতি ধীরে ধীরে
অতি ভয়ে ভয়ে যেন চলেছে তটিনী
সুগভীর পর্ষভের পদতল দিয়া !
কি মহান ! কি প্রশান্ত ! কি গভীর ভাব
ধরার সকল হোতে উপরে উঠিয়া
স্বর্গের সীমান রাখি খবল জটায়
জড়িত মন্তক তব, ওগো হিমালয়,
নীরব তাহার তুমি কি যেন একটি
গভীর আদেশ যেন করিছ প্রচার !

সমস্ত পৃথিবী তাই নীরব হইয়া
 শুনিছে অনন্য মনে সতরে বিন্ময়ে।
 আমিও একাকী হেথা রয়েছি পড়িয়া,
 আঁধার মহা-সমুদ্রে গিরাছে মিশায়ে,
 ক্ষুদ্রছোঁতে ক্ষুদ্র নর আমি, ঠৈলরাজ !
 অকুল সমুদ্রে ক্ষুদ্র তৃণটির মত
 হারাইয়া দিগ্বিদিক্, হারাইয়া পথ,
 সতরে বিন্ময়ে হোয়ে হত জ্ঞান প্রায়
 তোমার চরণ তলে রয়েছি পড়িয়া।
 উর্দ্ধমুখে চেয়ে দেখি ভেদিয়া আঁধার
 শূন্যে শূন্যে শত শত উজ্জ্বল তারকা,
 অনিমিষ নেত্রগুলি মেলিয়া যেন রে
 আমারি মুখের পানে রয়েছ চাহিয়া।
 ওগো হিমালয়, ভূমি কি গভীর ভাবে
 দাঁড়ায়ে রয়েছ হেথা অচল অটল,
 দেখিছ কালের লীলা, করিছ গণনা,
 কালচক্র কতবার আইল ফিরিয়া।
 সিক্কুর বেলার বন্ধে গড়ায় যেমন
 অযুত তরঙ্গ, কিছু লক্ষ্য না করিয়া,
 কতকাল আইলরে, গেল কতকাল
 হিমাত্রি, তোমার ওই চক্ষের উপরি।
 মাথার উপর দিয়া কত দিবাফর
 উলটি কালের পৃষ্ঠা গিয়াছে চলিয়া।
 গভীর আঁধারে ঢাকি তোমার ও দেহ
 কতরাত্রি আসিরাছে গিরাছে পোহায়ে
 কিন্তু বল দেখি ওগো হিমালয় গিরি,
 মানুষ-সৃষ্টির অতি আরম্ভ হইতে
 কি দেখিছ এই খানে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে ?
 বা'দেখিছ বা'দেখেছ, তাতে কি এখনো
 সর্বাঙ্গ তোমার গিরি, উঠেনি শিহরি ?

✓। কবি-কবিতার পক্ষিল জলে এইরূপ
 নির্মল পুষ্প কি প্রীতি-প্রদ। ইহাতে সৌ-
 ন্দর্য আছে, অথচ সে সৌন্দর্যে কোন অংশে
 ও কচির নিকার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে
 সৌরভ আছে, অথচ সে সৌরভে কোন
 অংশেও মানসিক স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা
 নাই। ভাবা ইহার কোথাও শোভা বর্জ-
 নের জন্য কৃত্রিম কাব্যকাব্যে বিভূষিতা হয়
 নাই; এবং ভাব-লহরী ক্ষীণসলিলা পয়-
 স্নিনীর ক্ষীণলহরীর মত, যার পর নাই মৃ-
 হ্মন্দ গতিতে প্রবাহিত হইলেও, কোন স্থানে
 প্রাণ-শূন্য হইয়া পড়ে নাই। এইরূপ নির্মল
 কবিতায় অনুরাগ জন্মিলে বঙ্গীয় কাব্যশা-
 স্ত্রের অদোগতি না হইয়া উপকার হইবে,
 এবং বাঁহারা কবিতায় ইদানীং বীত-স্পৃহ,
 তাঁহাদিগের শূক মনেও কাব্যে পুনরায়
 প্রীতির সঞ্চার হইতে থাকিবে।

কবি-কাহিনী-রচয়িতা অমিত্রাক্ষর পদ্য
 রচনায় মাইকেলের ন্যায় সর্কত্র মিল্টনের
 অনুসরণ এবং হেম বাবুর ন্যায় সংস্কৃত
 কবিদিগের ছন্দানুবর্তন না করিয়া, কোন
 কোন স্থানে কিয়ৎপরিমাণে এক নূতন পথ
 অবলম্বন করিয়াছেন। যদি তাঁহার কবিতা
 সুন্দর না হইত, তাহা হইলে এইরূপ পদ্য
 কাহারও নিকট ভাল লাগিত না। কিন্তু
 তাঁহার পদ্য যেমনই কেন না হউক, উহা
 কবিতার গুণে উদ্ধার পাইয়া গিয়াছে।)

✓। “নিশীথচিন্তা। জীরাঙ্গকৃষ্ণ রায়
 বিরচিত।” কবির রাসকৃষ্ণ বাবু এই
 ক্ষুদ্র কাব্যখানি বাঙ্গালসম্পাদককে উপ-

হার দিরা, বাস্তবের সহিত আমরা কে-
বে ব্যক্তি সংস্কৃত আছি, আমাদের সঙ্ক-
লকেই নিভান্ত বাধিত করিয়াছেন। ইহার
লেখা নিন্দনীর হইলেও সামাজিকতার
অনুরোধে প্রশংসা করাই আমাদের ক-
র্তব্য হইত। কিন্তু বড়ই আত্মাদেয় বিষয়
যে, আমাদেরকে এইরূপ ক্ষয়শূন্য সামা-
জিকতা করিতে হইবে না। সুরযোগ্য সা-
ধারণীসম্পাদক বরুণ বলিয়াছেন যে,
“এখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে” আম-
রাও সেইরূপ নির্মুক্তচিত্তে বলিতে পারি
যে, বস্তুতঃই এখানি অতি উৎকৃষ্ট হই-
য়াছে। ইহার রচনা রাজকৃষ্ণ বাবুর অ-
ন্যান্য রচনা অপেক্ষা অধিকতর গাঢ় এবং
অলঙ্কারবিন্যাসে স্থানে স্থানে দোষ ল-
ক্ষিত হইলেও ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব নিভান্ত
সুন্দর। আমরা নিম্নে ষষ্ঠ ও সপ্তম এই
দুইটিমাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। বোধ
হয় অনেকেই এই দুইটি কবিতায় মাধুর্য
ও গাভীর্যের মিশ্রণ দেখিয়া পুলকিত হ-
ইবেন। কিন্তু নিশীথচিত্তার প্রায় সমস্ত
কবিতাই এইরূপ মধুর ও গভীর।)

৩—“পরিভ্রান্ত বিশ্ব এবে যুগে অচেতন
চলে না সংসার-চক্র—অনড়—অচল।
অঙ্গকার-জলে সবি হ’য়েছে মগন ;
মারাবলে স্বর্গ যেন যোর রসাতল।
কিংবা হেন বোধ হয়, এ-ভাবে দেখিরা,
জগত-স্বপ্নন-পূর্ব-কম্পিত-সময় ;
ছিল না এ বিশ্ব-মুষ্টি ; কেবল ভুবিরী
আছিল শূন্যতা-তমে যোর তমোময়।

হইলেও হ’তে পারে—কেনই না হ’বে,
কম্পনাই যেইকালে সকলি প্রসবে ?
৭—অহো, কি অচিন্ত্য দৃশ্য নিশীথ সময়ে,
সাগর, ভূধর, আর মকড়, কামন
একাকার একভাবে ; বসুধা-স্বপ্নে
নিপুণ নটের কি এ পট-আবর্তন ?
কোথায় সে দিবসের যোর কোলাহল ?
কোথায় সে তক-শাখে বিহঙ্গের ধনি ?
কোথায় সে বিভ্রাম্য নীল নভস্তল ?
কোথায় সে তমোহর দীপ্ত দিনমণি ?
দিবসে উজ্জ্বল আলো—নিশীথে আঁধার,
স্বপ্নের পরেতে ঠিক-দুঃখের সঞ্চারণ।”

৩। “নাট্যসম্ভব। উপরূপক। বঙ্গ
রঙ্গভূমিতে অভিনয়জন্য জীরাঙ্গকৃষ্ণ রায়
বিরচিত।”—সত্য কথা বলিতে কি, নি-
শীথচিত্তার উচ্চতার পর এই সাড়ে সাই-
ত্রিশ পংক্তির নাট্যসম্ভব আমাদের নি-
কট ভাল লাগে নাই। ইহার লেখা প্রা-
ঞ্জল বটে, কিন্তু ঐ প্রাঞ্জলতা মাত্রই উহার
গুণ। এই নাট্যসম্ভবে শটীবিরহ-কাতর
ইন্দ্রের দুঃখে কাহারও দুঃখ বোধ হয় না,
এবং নাটক রচনার আদিমুক বাণীশুণ-
গায়ক ভরতমুনি ইন্দ্রকে যে ভাবে সাহসনা
দিতেছেন, তাহাতেও কাহারও চিত্তে কো-
নরূপ মহানুভূতির সঞ্চারণ হয় না। “ভরত
ইন্দ্রকে দেখিরা বিস্মিতচিত্তেবলিতেছেন”—
“দেবরাজ, কেন আজ হেন সাজ দেখি-
রে ?
মুখ তুলে, কণ্ড খুলে, কেন এত দুখী হে ?”
এইরূপ কবিতা বাসর ঘরের বিলা-
সিনীদিগের মুখেই শোভা পায়। ভরত

মুনির মুখে, অমরাধিপতি দেবাদিদেব ইন্দ্রের প্রতি সম্ভাষণে এইরূপ কবিতা বিড়ম্বনা যাত্র। বিশেষতঃ অমরাধিপত্য শতীর বিরহে ইন্দ্র তখন হৃদয়ে যেমন জর্জরিত, তেমনই আবার অপমানের অকল্পদ যজ্ঞগার অন্তরের অন্তস্তলে আহত। এদিকে ভরত মুনিও নাকি “বিস্মিতচিত্ত।”

ইহার পর অমরাবতীর ইন্দ্রসভা। সেই ইন্দ্রসভায় নাটকাতিনয়ের কি হইল?—না—কতকগুলি নর্তকী আসিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ভেবা গজারাম ইন্দ্র তাহাতেই শতীর বিরহ এবং শত্রুর পদাঘাত ভুলিয়া গেলেন এবং ভরত যেমন জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“কহ সুর! হৃদয় দূর হইল কি না হইল?”

ইন্দ্রও তেমনই ছাড়া ছেলের মত উত্তর করিলেন,—

“অবশ্য মানিব মুখ—হৃদয়মনে প্রবাহিল।”

৪। “বীণা।—নানা বিষয়িণী কবিতাপ্রসবিনী মাসিক পত্রিকা। জীরা-জকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত।” বীণা বিবিধ-সুরে, বিবিধ ভালে এক বৎসর কাল নানাবিধ গীত গাইয়া আর এক বৎসরে প্রবেশ করিল। নিরন্তর কবিতা বর্ষণ করিতে গেলে নিরন্তর পুষ্প বর্ষণ হয় না। কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে যে, ‘অবসর সরোজিনী’ প্রভৃতি কাব্য রচনা দ্বারা রাজকৃষ্ণ বাবু যে প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা উপার্জন করিয়াছেন, বীণায় তাহার অপচয় হয় নাই। বীণা নিত্যন্ত ধর্ম্মায়তন

হইয়াছে। ইহার আকার পরিবর্ত্ত হইলে ভাল হয়।

৫। “কৌমুদী।—বিবিধ সঙ্গীত ও নানা বিষয়িণী কবিতা বিকাশিনী মাসিক পত্রিকা। জীককিণী কান্ত ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত।” কৌমুদী উপেক্ষার বস্ত্র নহে। ইহাতে যে সকল কবিতা প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই প্রশংসাহী। বীণা অপেক্ষা কৌমুদীর লেখা সাধারণতঃ অধিকতর গভীর, কিন্তু কৌমুদীতে পরকীর লেখার যে পরিমাণ অযুক্ত করণ দৃষ্ট হয়, বীণায় তাহা হয় না। বিগত ফাল্গুণের কৌমুদীতে কম্পার্ণিয়ার নামক কবিতার আরম্ভ এইরূপ,—

“দ্বিতীয় প্রহর নিশি; নীরব অবনী;

নিবিড় জলদ পূর্ণ গগন মণ্ডল;

বিকাশি জুবন-দীপ্তি—হাস্য-বিমোহিনী

খেলিছে জলদ প্রান্তে বিজলী চঞ্চল!

যেন রোম-লক্ষ্মী পশি ভবিতবা গেছে,

দেখিলি বিষাদবর্ণে ভবিষ্য চিত্তিত।”

এই বর্ণনাটির প্রথম চারি পংক্তি নিত্যান্ত সুন্দর। কিন্তু সুন্দর হইলেও উহা পড়িবার সময়ে লেখকের কপা ভুলিয়া গিয়া আমরা প্রিয়তম নবীন চন্দ্রকে স্মরণ করিয়াছি। শেষ দুই পংক্তিতে অলঙ্কার ও অর্থের কিরূপ অযয় হইল, তাহা আমরা বুঝি নাই।

কৌমুদীও বীণার মত বর্ষ কাল অতিক্রম করিয়া বর্ষান্তরে প্রবেশ করিতেছে; কিন্তু হৃৎকের বিষয় এই, গুণ-প্রাণী (?)

প্রাচ্যদিগের দয়ার জটিলে ইহার তিষ্ঠি-
বার স্থান এখন পর্য্যন্তও দৃঢ় হইতেছে
না। সাঁহার বাঙ্গালা ভাষার অনুরাগী,
উঁহার কোমুদীতে আর কোন উপকার
লাভ না করুন, ইহার সরস মধুর পদাব-
নীতে অবশ্যই শ্রীতি লাভ করিবেন ;—
এবং সাঁহার ভূতপূর্ব্ব রবিনসনের আইন
কানুন ও হাইকোর্টের মজীর মাত্র পড়িয়া
বাঙ্গালার ‘মুর্তিমান’ হইয়াছেন, উঁ-
হার কোমুদীর কবিতা পড়িলে ভাষা-
শিক্ষা-বিষয়ে ‘নিশ্চয় উপকৃত হইবেন।
ভাবে কোমুদী অনেক স্থলে অনুকারিণী
হইলেও, ভাষার অনুকরণীয়া।

আমরা নিদর্শনের জন্য আশ্বিনের
কোমুদী হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত
করিলাম। বোধহয় এরূপ রচনা বহুলো-
কের হৃদয়-প্রাণিণী হইবে।

“এস বঙ্গ-গৃহ লক্ষ্মিনী।—কুসুম্বু-বদনা !

নিসর্গপুঙ্করজাত হৈম মৃগালিনি !

কঙ্কল চর্চিত চাক—বিলোললোচনা !

বহু হৃদি-পিঞ্জরের স্বর্ণ বিহঙ্গিনী !”

“ কেন ভূমি-তলে আই সুটাও অক্ষয় !

উঠাও উঠাও দেবি ! উঠাও উঁহার !

আই মাত্র বাঙ্গালির জীবন সম্বল ;

যাতনা নিশ্চয়-অক্ষয় মার্জন উপায় !”

অন্যত্র,

“প্রকৃতি-বিনোদ-চিত্র !—নিসর্গের খেলা”

দেখিতে দেখিতে প্রাণ হইল অবশ ;

চিত্তার বিদ্রাৎ বেগ—কথির কুটিরে

হৃদয়ের প্রতি রক্তে,—হইল চঞ্চল !

মরমের ভ্রুঞ্জন, একতানে হ’ল লয়,

গভীর সঙ্গীত ধনি সহসা জাগিল,

“কে আমি?”—এ মহাধনি ধনিত হইল !

৬। “ কামিনী কুঞ্জ । গীতিকাব্য ।

জাতীয় নাট্যশালার নিমিত্ত,—জিগো-

পালচন্দ্র মুখপাখ্যার প্রণীত।” এই কা-

মিনী কুঞ্জের বিষয় ব্রজবিলাসিনী রাধার

মানভঞ্জন, গোপাল বাবু ব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়া

কেন শেষটায় এই মানভঞ্জনের পালা

গাইতে গেলেন, তাহা আমাদের বোধ-

গম্য হইতেছে না। ইহার কাহিনী সেই

সতরণ ভিন্নবধই সনের চিরস্থায়ী বন্দো-

বস্তুর বহু পূর্ব্বের ব্রজের কাহিনী ;—ই-

হার কথা, সেই যাত্রাওয়ালাদিগের চির-

চর্চিত পুরাণ কথা ; এবং ইহার রসও

সেই বটতলার অতি পুরাতন আদিরস,

একদিকে রাধা, আর একদিকে চন্দ্রা-

বলী,—মধ্যে আমাদের পীতবাসু জিনি-

বাস। আশার যামিনী যখন প্রভাত হইয়া

আইসে, তখন জীরাধা গাইতেছেন,—

“ টেক এল সেই !

আমার শ্যাম গুণমণি ?

অস্তাচলে চলে শশী পোহাল রজনী !

শঠ কালার্চাদ, পাতি প্রেমফাঁদ,

বিষম প্রেমান, হরিষে বিষাদ, ঘটলে

সজনী ।”

এই গীতের সহিত পাঠক গোবিন্দ-

অধিকারীর নিম্নোদ্ধৃত গীত তুলনা করিয়া

দেখিতে পারেন।—

“ বৃন্দে ! টকলো টেক

কুঞ্জ এলো ছিহরি।

চেয়ে দেখলো, পোহাইল শর্করী। ইত্যাদি
রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীতে কৃষ্ণকমল গো-
স্বামীই এইকণ বঙ্গে অধিতীয়। তাঁহার
'নিপট কপট' এবং 'আটি পাঁচি শাটি
বাঁচিতে' মধ্যে মধ্যে প্রাণান্ত হইলেও,
সাধারণতঃ তাঁহার গীত গুলি রসভারে
পরিপূর্ণ। কৃষ্ণকমলের বিচিত্রবিলাসে বাহা
আছে, হুংখের বিষয় এই যে, কামিনী-
কুঞ্জ তাহাও আমরা পাইলাম না। যিনি
"বোবনে যোগিনী" ও "পাষণ প্রতিমা"র
রচয়িতা, তাঁহার কেন এই বুদ্ধি, এই মতি?
অথবা করকণ্ঠে যনই বর্তমান বঙ্গীয় যুবার
প্রধান রোগ'।

১/১ "নবাব সেরাজুদ্দৌলা। ঐতি-
হাসিক নাটক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী
প্রণীত।" বাঙ্গালা ভাষায় অনেক প্রকা-
রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিত হইয়া থাকিলেও,
আজি পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালি একখানি
প্রকৃত নাটক লিখিয়া জাতীয় ভাষার গোঁ-
রববর্জনে সমর্থ ছন নাই। এদেশে অনেক-
েরই এইরূপ ধারণা যে, কথার সহিত
কথা গাঁথিয়া কথোপকথনচ্ছলে উপন্যাস
লিখিলেই তাহার নাম নাটক, এবং যিনি
তাহা লিখিলেন, তাঁহার নাম কালিদাস।
হুঁত্যাগ্যবশতঃ এইরূপ কালিদাসের সংখ্যা
ত্রয়োদশের সকল স্থান ছাড়িয়া বঙ্গে দিন
দিন এত বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং সেই স-
কল কালিদাসেরা অছোয়াজ্ঞ এত নাটক
লিখিতেছেন যে, আমরা হতভাগ্য মল্লি-

মাথেরা এইকণ আর টীকা করিব কি—
মূলগ্রন্থ পড়িয়া উঠাই আমাদের অসাধ্য
হইয়াছে। বাবু লক্ষ্মীনারায়ণের ইহাই
যার পর নাই প্রশংসার কথা। যে, তিনি
বঙ্গের কালিদাস নছেন। বাঙ্গালায় ভাল
নাটক না থাকুক, সাহিত্য সমাজ মন্দের
ভাল বলিয়া যে কল্পনানি নাটককে আদর
করিয়াছেন, "সেরাজুদ্দৌলা, সর্ষণা ত-
মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য;—এবং বাবু
দীনবন্ধু মিত্র ও উপেন্দ্রনাথ দাস যে শ্রে-
ণীর নাটককার বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন,
শক্তি ও ক্ষমতার বহুতরতম্য থাকিলেও,
বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী সেই শ্রেণীরই
অনতিদূরে আসন পাইবার উপযুক্ত। য-
দিও আমরা তাঁহার আর কোন নাটক
পড়ি নাই; কিন্তু এই একখানি মাত্র পড়ি-
য়াই বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পাইয়াছি যে,
তিনি একজন সুলেখক ও সহৃদয় কবি।
এইরূপ লোকের আদর হওয়া উচিত।

সেরাজুদ্দৌলার কাহিনী এদেশে প্রায়
সকলেরই একপ্রকার কণ্ঠস্থ আছে। মার্শ-
মের ইংরেজী ইতিহাস, বিদ্যাসাগরের
বাঙ্গালা ইতিহাস, রাজকৃষ্ণ বাবুর নূতন
ইতিহাস এবং আরও অনেকের নামাবধি
ইতিহাসের প্রাসাদাৎ সকলেই কিঙ্কিঙ্ক্যা-
কাণ্ডের কথার মত ক্লাইব ও সিরাজুদ্দৌ-
লার কথা অবগত আছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ
বাবু সেই পুনঃ পুনঃ চর্চিত পুরাতন কথা-
তেও যে নূতনরস ঢালিতে পারিয়াছেন,
এবং গ্রন্থখানিকে সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের

পাঠযোগ্য করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার গুণগতির প্রচুর-প্রমাণ। তাঁহার লেখা পড়িতে কাহারও বিরক্তি জন্মিবে না, এবং ক্রমশঃ তাঁহাদের স্বাস্থ্য হইবে, এবং ইতিহাসের সেরাজ্জন্দোলাকে নাটকের নিপুণ তুলিকার চিত্রিত দেখিয়া সকলেই নিরতিশয় প্রীতিলভ করিবে।

কিন্তু চিত্রে বহুদোষ আছে এবং চিত্র অপেক্ষাও পটে সকলগুলি চিত্রের বিন্যাস বিষয়ে প্রস্তুকারের অধিকতর দোষ প্রকাশ পাইয়াছে! সেরাজ্জন্দোলার পতন এবং সেই পতনের সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রথম প্রতিষ্ঠা একটি সামান্য ঘটনা নহে। সমগ্র ইতিহাসে না হউক, বোধ হয় আধুনিক ইতিহাসে এইরূপ আর একটি ঘটনার উল্লেখ নাই। আমরাদিগের নাটককার সেই অসামান্য ঘটনাকে একটি সামান্য ঘটনার ন্যায় করিয়া তুলিয়াছেন, এবং যে অভিনয়ে ভারতের বর্তমান বিপ্লব, যে অভিনয়ে এশিয়ার বর্তমান পরিবর্ত, গৌসাইদাস নামক একটি অপমানিত ব্রাহ্মণ এবং সত্যবতী নামী একটি অপহৃত ব্রাহ্মণ কন্যার হস্তে তাহার মূলমন্ত্র বাঁধিয়া দিয়া, আর সকলকে অন্ধকারে ফেলিয়াছেন। রাজনগরের মহারাজা রাজবল্লভ, তাঁহার পুত্র কুমার কৃষ্ণদাস, মন্ত্রিস্থা মহারাজ মহেন্দ্র রায়ভদ্রভ, মাতার রায়, জগতশেঠ, পাটনার প্রতিনিধি রাজা রামনারায়ণ, এবং অবলা বলিয়া নগণ্য হই-

লেও প্রকৃত প্রস্তাবে অগ্রগণ্য অন্নপূর্ণা রাণী ভবানী প্রভৃতি তদানীন্তন প্রধান ব্যক্তির যে তমোময় বড়বস্ত্র করেন, তাহাতেই সেরাজ্জন্দোল রাজ্যভ্রষ্ট হয়। তাঁহাদিগের অভিমানে আঘাত করিয়া বাঙ্গালার স্ববেদার ধনে প্রাণে বিনাশ পায়। কিন্তু আমরা এইনাটকে তাঁহাদিগের কাহাকেও উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত দেখি না। তাঁহারা সকলেই অজ্ঞাত নাম গৌসাইদাসের করম্মত ক্রীড়া পুতুল এবং গৌসাইদাসের কৃত্রিম জ্যাতিতে লজ্জায় ছীন-প্রভ। গৌসাইদাস যাহা বলায় তাহা তাঁহারা বলেন, গৌসাইদাস যাহা করায় তাহা তাঁহারা করেন। নাটকের আদি, মধ্য, অন্ত সর্বত্রই সেই গৌসাইদাস, অথচ গৌসাইদাস যে একটা কেমনতর কি, তাহাও নাটকে আমরা ভাল করিয়া দেখিতে পাই না, এবং যে গৌসাইদাস সমুদ্র লঙ্ঘন, লঙ্কাদাহন এবং সীতা উদ্ধার প্রভৃতি এতকাণ্ড করিল, প্রস্তুকার তাহাকেও একবার ভাল করিয়া দেখিতে ও চিনিতে দিলেন না।

এদিকে মবাবের অন্তঃপুরে গৌসাইদাসের রূপাভিমানিনী অথচ পতিপ্রেমানুরাগিনী ভার্যা, ধর্ম্মশীলা সত্যবতী। সত্যবতীর জন্য মীরণ, মীরণের জন্য মিরজাকর, এবং মিরজাকরের জন্য ক্লাইব। সত্যবতীর ছবিটি অতি সুন্দর হইয়াছে, সত্যবতী যে সকল কথা কহিয়াছেন, তাহা যেন মাথুর্যাগুণে আমরাদিগের কর্ণে একে-

বারে লাগিয়া রহিয়াছে। অমন শ্রীতি-মধুর প্রিয়কণ্ঠ একবার শুনিলে, শীত্র কেহ ভুলিতে পারে না। কিন্তু হায়! সেখানেনও আবার কতিমা। আর সেই কতিমাকে? না, প্রচ্ছন্নরূপী গোসাইদাস। বস্তুতঃ গ্রন্থকার এক গোসাইদাসের কথা ও কাণ্ড লইয়াই গ্রন্থের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, এবং গোসাইদাসকে ভাবিতে ভাবিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া ক্রাইবের ছবি চিত্র করিতেও ভুলিয়া গিয়াছেন। যেমন কৃষ্ণকথাশূন্য শিশুপালবধ, তেমনই ক্রাইবের কথাশূন্য সেরাজবধ। ক্রাইবের চিত্র খুচাকরূপে ফলিত না হইবার গ্রন্থের এক অংশই যেন অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। এইরূপ-অপূর্ণতা ও দোষ আরও অনেক আছে।

কিন্তু অপূর্ণতা ও দোষ সত্ত্বেও এই নাটকখানি প্রশংসায়োগ্য;—রচনা শব্দভাষ্যশূন্য অগত মধুর, বর্ণনা মনোহারিণী, এবং প্রায় সমস্ত অংশই ভাবুকতার পরিচায়ক। শব্দবিন্যাসে অনেক স্থলে জয়প্রমাদ আছে। যথা;—“সে আপনাকে সমূহ মান্য করে”—“বাজালির সহায়গণ” ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু গুণের ভাগ অধিক হইলে এ সমস্ত সামান্য দোষ প্রায়শঃ গণনায় আইসে না। পূর্বেই বলিয়াছি, বাজালায় ভাল নাটক নাই। যে সকল নাটক একদিনে কল্পিত, দুই দিনে লিখিত এবং তিন দিনে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া সমালোচনার জন্য সর্ব্বত্র প্রেরিত হইয়া থাকে, যদি সে গুলি

অস্বতঃ এই শ্রেণীর নাটক হইত, তাহা হইলে আমাদের ক্রেশের তার বিস্তার লম্বু হইয়া পড়িত। আমরা গ্রন্থগুলি পড়িতে পারিতাম, পড়িলে সমালোচনা করিতেও সক্ষম হইতাম। যে সকল গ্রন্থ পড়িয়া উঠাই এক বিষম যন্ত্রণা, তাহার সমালোচনা করা কিরূপ ব্যাপার তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। সমালোচ্য নাটকখানি সম্বন্ধে এ কথা আমরা পুনরপি বলা কর্তব্য জ্ঞান করিতেছি যে, নাটকংশে ইহার যাহাই দোষ গুণ থাকুক, ইহা একখানি সুপাঠ্য ও মুখপাঠ্য গ্রন্থ।

৮। “ব্যবস্থা বিজ্ঞান। প্রথমভাগ। জীগোবিন্দচন্দ্র বসাক, বিএ বিএল প্রণীত।”—এই পুস্তক খানি আকারে অতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে ব্যবস্থাশাস্ত্রের ইতিহাস ও মূলমন্ত্রসম্পর্কিত অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা আছে। ব্যবস্থাশাস্ত্রের ইংরেজী গ্রন্থ পড়া যঁাহাদিগের অসাধা, তাঁহারা ইহা পড়িলে উপকৃত হইবেন। যঁাহারা ইংরেজী না শিখিয়া ওকালতি করিতেছেন, এই উনপঞ্চাশৎ পৃষ্ঠাস্থক পুস্তক খানিকে তাঁহাদিগের অবশ্যই একবার পড়িয়া ফেলা উচিত।

৯। “গৃহ-চিকিৎসা। প্রথমভাগ। সচিত্র চিকিৎসা সূত্র। জীবসন্তকুমার দত্ত প্রণীত।”—পূর্বেও ব্যবস্থাবিজ্ঞানের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এখানির সম্বন্ধেও আমাদের প্রায় তাহাই বক্তব্য। অ-

খাঁ বাঁহারা ইংরেজীতে ছোমিওপেথিক কোন পুস্তক পড়েন নাই, এখানিতে তাঁহাদিগের বিশ্বর উপকার দর্শিবে, এবং একটি ঔষধের বাস্তব ঘরে থাকিলে গৃহস্থের পক্ষেও এই প্রস্তু উপকারে আসিবে।

আমরা বঙ্গ বাবুর অধ্যবসায়কে ধন্যবাদ দি। ছোমিওপেথিতে যদি কিছু সত্য থাকে, তবে তাহা বঙ্গদেশে প্রচার করা কর্তব্য, এবং এইরূপ প্রস্তু প্রকাশ সেই প্রচারের অন্যতম পথ।

বিবিধ

আলসোর পৌষকতা।

যে অলস, সে সমাজের গলগ্রাহ। তবে তাহার পৌষকতা কর কেন? যে অলস, সে পাপের প্রিয়নিকেতন,—পৃথিবীর ভগ্নদ্রব্য, দুষ্কৃতির মুক্তিমান অবতার, পথের কটক, উন্নতির অন্তরায় এবং অনন্ত দোষের আবাসস্থল; তবে তাহাকে প্রশ্রয় দাও কেন?—যখন অকার্য্যই তাহার এক মাত্র কার্য্য, তখন তাহার কার্য্যে আবার অমুরাগ ও উৎসাহ কেন?

জড়পিণ্ড প্রকৃত প্রস্তাবে অলস নহে। কারণ জড়পিণ্ড জড়পিণ্ডের উপর কার্য্য করে, জড়জগতের স্থিতি ও গতি রক্ষা রূপ চিন্তার অগম্য মহান ব্যাপারে ব্যাপ্ত রহে। উহাকে কে অলস বলিবে? হিমাচল হইতে বালুকণা, অতলবারিধি হইতে বারিবিষ্ণু,—জড়জগতের এই সমস্ত বস্তুই প্রকৃতির অভিষিক্ত কোন না কোন কার্য্য করিতেছে। উহারা না থাকিলে জগদ্ব্যস্ত্র থাকে না,—জগদ্ব্যস্ত্র চলে না। স্তুরায় উহাদিগের নিন্দা নাই।

পশু পক্ষীও অলস নহে। কবির প্রিয় এবং কাব্যের চির আদরের ধন মধুকর যেমন ফুলে ফুলে বিচরণ করিয়া ফুলের মধু সঞ্চয়ন করে, প্রাণিজগতের ক্ষুদ্র ও রহৎ সমস্ত জীবই সেইরূপ আত্মদেহ রক্ষার নিমিত্ত অছোরাত্র নানাবিধ চেষ্টায় রহে। কেহই বসিয়া থাকে না। কেহই বসিয়া বসিয়া, কথা মাত্র কহিয়া, আঁপনার ও পরের সময় হ্রাস করিবার জন্য সমুদ্রের চেট গণে না। তাহাদিগের নাম ব্যাজ হউক, আর তলুক হউক, রূপা কেন তাহাদিগকে অপবাদ দিবে?

জগতে আলসোর অপবাদ যদি কাহাতেও প্রযুক্ত হইতে পারে, তবে তাহা কেবল এক অকৃতী ও অক্রিয়ান্বিত মনুষ্যে। জানি না সমাজ কেন ইহাদিগের ভার বহন করেন।

বঙ্গদেশ ছয়কোটি লোকের বাসভূমি। এই ছয়কোটির মধ্যে অন্ততঃ দুই কোটি লোক আলস্য মাত্র ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বাজারের রক্তশোষণ করি-

ভেছে। ব্রিটিশশাসনামূলক ভারতবর্ষে হান
কম্পে আটকোটি লোক আলস্যে ডুবিয়া,
মনুষ্যাগণনার বাহিরে গিয়াছে। যদি ই-
হারা প্রত্যেকে আপনার আহাৰ্য্যসমেত
দশটি টাকা উপার্জন করে, তাহা হইলে
বাহ্যিক সাধারণসম্পত্তিতে বৎসরে বিংশ
কোটি, এবং ভারতবর্ষের সম্পত্তিতে বৎ-
সরে আশী কোটি টাকা সমাগত হয়।
যাঁহারা এদেশের দারিদ্র্যদূঃখ, অন্নক্লেশ
এবং দুর্ভিক্ষের হাহাকারে আকুল হইয়া
স্বজাতির জন্য অশ্রুপাত করিতেছেন,
তঁাহারা কি এই গণনার প্রতি দৃষ্টিপাত
করেন?—যাঁহারা ভারতের উদ্ধার-সাধ-
নের জন্য নবরসের নাটক লিখেন, অথবা
কবিতার কোমলকুম্ভমে মালা গাঁথিয়া
ভারতবাসীকে বীর-বেশে বিভূষিত করেন,
তঁাহারা কি এই সামান্য কথাটিকে ক্ষণ-
কালের জন্যও মনে আনেন?—ভারতের
অকর্ম্ম আট কোটি যদি আশী কোটি
টাকা বৎসরে ঘরে আনে, তাহা হইলে
বোধ হয়, বিনা নাটক, বিনা নবনাস, এবং
বিনা কবিতার রসের উচ্ছ্বাসেও
ভারতভূমি উদ্ধার পাইয়া যায়,—এবং ভা-
রতভূমি উদ্ধার না পাউক, অন্ততঃ ভারত-
বাসী উদরে অন্ন এবং অঙ্গে বস্ত্র দিয়া
পৃথিবীতে দাঁড়াইবার স্থান পায়। ভারতে
কেহই কি যোগতত্ত্ব ছাড়িয়া বিয়োগত-
ত্ত্বের এসকল কথা লইয়া আলোচনা ক-
রিতে না?

যে ভারতভূমি রক্তেরখণি এবং কুব-
ের ভারতের বলিয়া ইউরোপে পরিচিত
ছিল, এবার সেই ভারতভূমি বিলাতীয়
বিজ্ঞলোক ও বণিকৃদিগের নিকট অন্ন
কাজালিনী বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।
আমরা যদি আলস্যকেই আমাদিগের পুষ্-
ণয়া জ্ঞান করি,—অলস ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া
পরিচিত হইতে লজ্জায় ত্রিয়মাণ না হই,
এবং দেশের সমস্ত ব্যক্তিকে সমাজের
স্বদৃঢ় শাসনে বাধ্য করিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে
পাঠাইয়া না দি, তাহা হইলে বোধ হয়
ঐ পুষ্ণয়্যাই অচিরে আমাদিগের শব-
শয়া হইবে। ভারতবাসী, সাবধান!

পিপিলিকা রাজ্য।

সার জে লাবক নামে একজন প-
ণ্ডিত তাঁহার জীবতত্ত্ব নামক গ্রন্থে লি-
খিয়াছেন যে, পিপিলিকাগণের অবস্থা
এবং সামাজিক ব্যবহারের প্রতি অভি-
নিবেশপূর্ব্বক অনুধ্যান করিলে বোধ হয়,
উহারা কোন অংশে সভ্যতার অতিমানী
মানবসন্তানগণ হইতে নিরূক্ষণ নহে। পি-
পিলিকার ক্ষুদ্র সংসার স্নেহ দয়া, আশ্রয়-
দান, সুরক্ষা প্রভৃতি সদাঙ্গের আধার।
উহারা একে অন্যকে সাহায্য করে, পীড়া
হইলে আহাৰ্য্য বিধান করে, এবং পৃষ্ঠে ক-
রিয়া লইয়া বেড়ায়। লক্ষ্যাদিক পিপি-
লিকার এক একটি উপনিবেশ সংস্থাপন
করিয়া বাস করে, উহারা পরস্পর সকল-
কেই চিনিতে পারে। অথচ মুহূর্ত্তের জন্য
বিবাদ করে না। শিশুগণ এবং স্ত্রী ও

রক্ষণ গৃহে থাকে, বাহারা বলবান্ তা-
 ছারা আহারাশ্বেষণ করিয়া আনে । যদি দূর
 হইতে অপর একটি বাসার শিপিলিকাকে
 আর এক নূতন শিপিলিকার দলে ছাড়িয়া
 দেওয়া যায়, তাহা হইলে, উহারা ঐ বি-
 দেশীকে আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে
 এবং আপন করিয়া লয় । এক বাসা হ-
 ইতে একটি শিপিলিকাভিত্ত, আর এক
 বাসায় রাখিলে, ঐ বাসার শিপিলিকা
 আপন ডিম্বের ন্যায় নিম্বার্থ স্নেহ ও যত্নের
 সহিত প্রাণ পণে উহাকে রক্ষণাবেক্ষণ
 করে । লাবক সাহেব বলেন তিনি প-
 রীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, শিপিলিকাগণ
 পাঁচ বৎসর অপেক্ষাও অধিক কাল জী-
 বিত থাকিতে পারে । তিনি একাদশটি
 শিপিলিকা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হ-
 ইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত পালন
 করিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে নয়টির মৃত্যু হইয়া
 ছিল, দুইটি জীবিতছিল, কিন্তু তাহারা বি-
 বর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পরে তাহাদিগকে
 তিনি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন ।

উদ্ধৃট ।

যত দুখ আছে বিধি

দাও তাহা সহিব,

মরমে পুড়িব তনু

মুখে নাহি কহিব ;—

অরসিকে রসালাপ,

এষে এক যাতনা,

ললাটে লিখ'না মোর

ললাটেতে লিখ'না ।

বনের বিহঙ্গ আমি

বনে বনে উড়িব,

বন-বিটপীতে বসি

প্রিয়-নাম গাইব ;—

বনফুল, বনফল

বন্য এই পরিমল,

ইহাই সম্পদ মম,

ইহা লয়ে রহিব ;—

প্রিয়-বিশ্বেদের দুঃখ

বনবাসে ফুলিব ।

হার! কেন না হইনু

মেঘের মতন,

পারার্থ ঢালিয়া দিতে

নিজের জীবন ।

দামিনী হুলিত অঙ্গে

থাকিতাম সুখ সঙ্গে

খেলিতাম সঙ্গে লয়ে

মত্ত প্রভঞ্জন ।

তুহিতে পরের প্রাণ,

করিতাম প্রাণ দান,

বজ্রাঘাতে নিজ দেহ

করি বিদারণ ।

লজ্জাবতীলতা ।

লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ কর, বঙ্গী
 নব বধুর ন্যাগ লাজে উছা মৃগমাণী হইবে ।

এই জনাই কবিগণ ইহার নাম লজ্জাবতী-
গণের উপমাৱ স্থলে ব্যবহার করেন যথা,
“কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী
যথা, মৃতপ্রায় পর-পরশনে”—যাহা হ-
উক বধুগণের লজ্জার কারণ আছে, তাই-
বলিয়া বনের লতা লজ্জার মাথা লুকাইবে
কেন? ছেদ্দে এবং মাষ্টারস প্রভৃতি
উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞেরা তাহার কারণ নির্দেশ
করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, লজ্জাবতীর
পত্র-দণ্ডের অভ্যন্তরে ছিদ্র আছে, ঐ সকল
ছিদ্রের মধ্যে প্রতি পত্রের নিম্নদেশে ক্র-
শের ন্যায় আকারবিশিষ্ট এক একটি
অতি মৃদুপ্রাণ স্প্রিঞ্জ আছে, অতএব উক্ত
লতাকে স্পর্শ করিলেই ঐ স্প্রিঞ্জ কুঞ্চিত
হইয়া যায়, সুতরাং উহার পত্র নিচয় ট-
লিয়া পড়ে ॥

শিক্ষিত শুক পাখী।

সুপ্রসিদ্ধ জুলিয়স্ সিজরের আনন্দ
বিধানার্থ কয়েক জন রোমক, তাঁহাকে
শিক্ষিত শুক পক্ষী উপঢৌকন দিয়া
ছিলেন। পাখিগণ সিজরকে দেখিলেই
“মহাবীর সিজর তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ
কর” এইরূপ বলিত।—সিজর সম্বন্ধে হইয়া
এক একটি পাখীর জন্য এক এক সহস্র
মুদ্রা পারিতোষিক দেন। ইহা দেখিয়া
আর এক ব্যক্তি একটি শিক্ষিত শুক পক্ষী
উক্ত মহাস্বাক্ষকে উপহার দান করেন, কিন্তু
জুলিয়স তাহা গ্রহণ করিলেন না। ইহাতে
ঐ ব্যক্তি দুঃখিত হইয়া পক্ষীটিকে ছাড়িয়া

দিলেন, এবং ছাড়িয়া দিবার সময় এই ব-
লিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন, যে, “হায়,
দুঃখী দেখিয়া সিজর আমার উপেক্ষা ক-
রিলেন!”—এই ঘটনার দুইদিন পরে
সিজর একদিন তাঁহার বিলাসকাননে
বেড়াইতে যান, যেই প্রবেশ করিয়াছেন,
অমনি শুনিতে পাইলেন কে যেন বলি-
তেছে, “হায়, দুঃখী দেখিয়া সিজর আ-
মায় উপেক্ষা করিলেন!” তিনি বিস্মিত
হইয়া চাহিয়া দেখেন, নিকটে তকশাখায়
বসিয়া একটি ক্ষুদ্র শুক-শিশু মধুর স্বরে অ-
নবরতঃ ঐ কথা বলিতেছে। ইহাতে তিনি
অত্যন্ত সম্বুদ্ধ হইয়া শুক-শিক্ষককে ডা-
কিয়া দুই সহস্র টাকা পুরস্কার দান করি-
লেন। তৃতীয় (লুই) নিপলিয়নের উদ্যান
সমূহেও এইরূপ অনেক শিক্ষিত পক্ষী
ছিল। ইহারা ফরাসী বিজয়-গীতি প-
র্যাস্ত গান করিয়া সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট
করিত। আশাদিগের দেশে পাখিগণকে
রাধাকৃষ্ণ নাম শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্বদেশ বৎসল কপোত।

গত ফ্রান্স প্রেশিয়ান যুদ্ধের সময়
জর্মানগণ প্যারে নগর অবরোধ ক-
রিলে, স্ক্রমবুদ্ধি ফরাসীরা, শিক্ষিত ক-
পোত দ্বারা, নগরের বাহিরে আত্মীয়গ-
ণের নিকট সংবাদ পাঠাইতেন। জর্মানগ-
ণ, শিক্ষিত বাজ পক্ষী দ্বারা ঐ সকল
কপোতগণকে ধৃত করিয়া, বিপদের গুণ্ত
সংবাদ পাঠ করিতেন।—এই সময়ে একটি

কপোত বেরূপ অসাধারণ প্রভুভক্তি এবং
বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা মনে
করিলে মানবগণকেও শিক্ষার দিতে
ইচ্ছা হয়। একদা একটি কপোত দুর্গ
হইতে এক খানী পত্র * মুখে করিয়া
বাহিরে লইয়া যাইতেছিল, ইতিমধ্যে বি-
পক্ষের বাজপক্ষী আসিয়া তাহাকে ধরিয়া
লইয়া গেল। কপোত বিপক্ষের হস্তগত
হইলে, তাহার উহার চক্ষু হইতে পত্র লই-
বার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল।
কিন্তু কিছুতেই কপোত তাহা দিল না।
অবশেষে সে যখন দেখিল, চৌটে করিয়া
দীর্ঘকাল উহা রাখা অসম্ভব এবং বিপক্ষে
উহা লইবে, তখন বুদ্ধিমান কপোত উহা
গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল। জর্জাণেরা
কপোতের কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া পত্র বাহির
করিয়া পাঠ করিল। ফরাসী নগরে এ-
কটি রমণী একটি কবিতা লিখিয়া এই স্ব-
দেশবৎসল মহাত্মা কপোতবরকে চিরস্ম-
রণীয় করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে
নব্বাধম ব্যক্তিরও দেশামুরাগ হৃদয়ে প্রজ্ব-
লিত হয়। যে কুলাঙ্গারগণের দেশের জন্য
মায়া মমতা নাই, তাহারাই এই সাধু ক-
পোতের নিকট নীতি শিক্ষা করুক।

* চারি বর্গইঞ্চি পরিমিত অতি সূক্ষ্ম
কাগজে প্রায় ২০০০ হাজার শব্দ থাকিত,
এবং তাহা কেবল যজ্ঞের সাহায্যে পাঠ-
করা যাইত।

বিনাকুলে ফল।

আমাদিগের দেশে একটি প্রহেলিকা
প্রচলিত আছে,—তাহার তাৎপর্য এই
“ বিনাকুলে ফল ধরে, কোন্ কোন্
রূকে ? ” এই প্রহেলিকা বাঁহাকেই ছড়ক
না কেন জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি সীমাংসা
করিয়া দিবেন যে—‘ডুমুর প্রভৃতি।’ ফ-
লতঃ এ সিদ্ধান্ত ভুল, এবং এ প্রহেলিকা-
গত প্রমাণটিও বিষম ভ্রান্তক। ডুমুর প্র-
ভৃতি বাস্তব ফল নহে উহার ফল,। এই
জাতীয় ফল হইবার উপক্রম হইতেই ইহা-
দিগের ষোটার ডক এবং মাংস রত পুষ্টি
এবং বৃষ্টি হইয়া থাকে যে, উহাতে ফুলকে
একবারে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই সকল
ফলাকৃতি ফল ভিখণ্ড করিয়া কাটিয়া দে-
খিলেই ফল কি ফুল ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান
হইবে। ডুমুর প্রভৃতিকে কর্তন করিলে
উহাদের অভ্যন্তর প্রদেশে পরাগকেশর
দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বুদ্ধিমান দরিদ্র।

এক দরিদ্র ব্যক্তির কোনও প্রকারেই
দিনপাত হইত না। তিনি একদা কোমর স-
ত্রাস্ত ব্যক্তির নিকট একঘণ্টাকালের জন্ত
একখানি উৎকৃষ্টশাল এবং তদনুরূপ অ-
ন্যান্য বস্ত্রাদি চাহিলেন, তাহাতে সত্রাস্ত
ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি ইহা
একঘণ্টা কালের জন্য পরিধান করিয়া কি
উপকার পাইবে?—দরিদ্র ব্যক্তি বলি-
লেন, গরিব অবস্থা দেখিলে সকলেই হুণা

করে। অতএব বড় মানুষ সাজিয়া গেলে ধনিগণ আহ্লাদসহকারে আমার উপকার করিতে যত্নশীল হইবেন, সংসারের এই রীতি।

আশ্চর্য-যান।

এক ব্যক্তি আর এক বিদেশী ব্যক্তির সহিত কোন দূরস্থানে যাইতেছেন, যাইতে যাইতে সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল মহাশয়, কার্তিক, গণেশ, মারায়ণ প্রভৃতি, পাৰ্বী এবং কুসুম জন্তুর পূৰ্ণারোহণ পূৰ্বক কিরূপে বেড়াইতেন? বিদেশী বলিলেন, তাঁহার ত দেবতা ছিলেন, ইচ্ছা করিলে যানযাতীত শূন্যেও যাইতে পারিতেন। আমাদিগের দেশের রাজারা গাধায় চাপিরা বেড়ান। তৎপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কেন, তাঁহাদের কি হয়, হস্তী প্রভৃতি কিছুই নাই। বিদেশী ব্যক্তি হাসিয়া বলিলেন, পূৰ্বে ছিল, রাজা হইয়া অবধি আর নাই। তাঁহার সঙ্গী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? বিদেশী ব্যক্তি বলিলেন, “আরে এখন যে তাঁহার আহার কমাইয়াছেন—সুতরাং শরীরও কমিয়াছে, এখন গাধাই অনায়াসে তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠে বহন করিতে পারে।” তাঁহার বন্ধু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আহার কমানই বা কেন? বিদেশী বলিলেন, শুনিয়াছি আহার কমাইলে নাকি স্বপ্নমুক্তি হয়।

চতুরঙ্গ।

এতদেশে ভদ্রে শ্রেণীর মধ্যে বিশেষতঃ পল্লীগ্রামস্থ জমীদার বর্গের মধ্যে আবার রুদ্ধ প্রায় সকলেই কিছু না কিছু চতুরঙ্গ খেলায় অভ্যস্ত আছেন। আজি কালি এমন কোন সভ্যদেশ নাই যেখানে চতুরঙ্গ খেলা একবারে অজ্ঞাত অথবা অনাদৃত। আমাদের দেশে কিংবদন্তী আছে যে, রাবণ স্বর্গ বিজয়ের পর যখন সংগ্রাম করিতে আর প্রতিদ্বন্দ্বী খুজিয়া পাইলেন না, তখন এই অবসর সময়ের অলসতা পদ্বিহার এবং সময়লিপ্সুচিত্তের অসহ্য কণ্ডুয়ন নিবারণ করিবার জন্য তিনি এই অপূৰ্ণ চতুরঙ্গ খেলার স্বষ্টি করেন। গ্রীকদিগের মধ্যেও এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, লিডো এবং টাইরিনো নামক বীর-প্রাত্যহর দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়া তজ্জনিত দাক্ষণ যত্নগা বিস্মৃত হইবার জন্য এই খেলার উদ্ভাবন করিয়াছিল। কিন্তু ইহা অবিসংবাদিত যে, হিন্দুরাই এই খেলার প্রথম পথ-প্রদর্শক। সর উইলিয়ম জোন্স তাঁহার গভীর গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, চতুরঙ্গ খেলা হিন্দুদিগের দ্বারা প্রথম উদ্ভাবিত হইয়া ভারত বিজয়ের পর আফগানজাতি কর্তৃক তাহাদের দেশে নীত হয়, এবং সেইখান হইতেই মুসলমানজাতির শিক্ষা করিয়া সমস্ত ইউরোপে ইহা বিস্তৃত করে। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চারি অঙ্গে বি-

ভক্ত বলিয়া এই খেলার নাম চতুরঙ্গ, আকগামগণ এই শব্দটির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া ইহার নাম সেংক্জ রাখিয়াছেন। পরিবর্তনের পর পরিবর্তন হইয়া অবশেষে এই শব্দ হইতে ইংলণ্ডীয় Check এবং Exchequer শব্দ বহির্গত হইয়াছে।

আমাদের দেশে ভাস পাশা প্রভৃতি যে সকল ঠৈচকী খেলা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে চতুরঙ্গ খেলাই সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি-সাপেক্ষ। পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাজ পুরুষেরা ইহাতে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। এখন কি অনেকের এই খেলার সর্বনাশ হইয়া যাইত, তথাপি তাঁহারা অক্ষিপণ্ড করিতেন না। মহাভারতে পাণ্ডবগণের রাজ্য নিক্সাসন, বিরাট সভায় সুশিষ্টিত্বের অক্ষাঘাতে রক্তপাত প্রভৃতি পাশক্রীড়ার অনেক গর্হিত দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই চতুরঙ্গ খেলাস্বত্বকে পুরাণাদিতে কোন বিশেষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়না। কিন্তু ইউরোপে এই খেলার রাজ্যবিপ্লব পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। টাইমুরলেন যখন তুর্কক আক্রমণ করেন, তখন তুর্ককেরসত্রাট বাজেনাত এই খেলার

এইরূপ মন্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার দেশ বিলুপ্ত হইল, তথাপি তিনি নিজের অথবা প্রজাপুঞ্জের রক্ষার্থে কোন চেষ্টাবলম্বন করিতে পারিলেন না। পেনন যখন মুরদিগের অধিকৃত ছিল, তখন উক্তবংশীয় কোন রাজপুরুষ অনেক হত্যাকাণ্ডের পর সিংহাসন অধিকার করিয়াও দেখিলেন যে, তাঁহার জাত বর্তমান থাকি সত্ত্বে উহা তাঁহার বংশধরের উপভোগ্য হইবে না। তখন তিনি তাহারও বধসাধনে ক্রতসঙ্কল্প হইয়া তদর্থ এক দূত প্রেরণ করেন। এই সময়ে তিনি কোন বন্ধুর সহিত চতুরঙ্গ খেলার প্রবৃত্ত ছিলেন। দূত যাইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, তৎকালে এই আদেশ কার্যে পরিণত করিতে হইবে। তিনি অনেক মিনতি করিয়া আরক্ খেলার পরিসমাণের কালটুকু পর্য্যন্ত বাঁচিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। খেলার অবসান হইলে যখন তাঁহাকে বধভূমিতে নেওয়ার উপক্রম হইতেছিল, তখন আর এক দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, সত্রাটের মৃত্যু হইয়াছে এবং তিনি প্রজাপুঞ্জের সম্মতি অনুসারে সিংহাসনপ্রাপ্ত হইয়াছেন।



বঙ্গভাষার উচ্চারণের অভিধান

মনে বড় সাধ মাতৃভাষার সেবা করি। কিন্তু একে শক্তি অল্প, তাহাতে আবার অবকাশ কম। আজ একটু অবসর সৃষ্টি করিয়া দুটা কথা লিখিতে সংকল্প করিলাম। সম্মুখে অনতিদূরে একখানি ইংরেজী ভাষার উচ্চারণের অভিধান পড়িয়া আছে। ভাবিলাম, বঙ্গভাষার কি কোন দিন উচ্চারণের অভিধানের প্রয়োজন হইবে?

উচ্চারণের অভিধান বর্ণমালার অভাবের উপরেই সংস্থাপিত। যে ভাষার বর্ণমালা পূর্ণাবয়ব সে ভাষার উচ্চারণের অভিধান প্রয়োজনীয় নহে। বঙ্গভাষার বর্ণমালার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বঙ্গভাষা রাণীর কন্যা; স্রীধনে সম্পংশালিনী ও গৌরবাসিতা। দেখিলাম বর্ণমালা সমগ্রই জননী সংস্কৃত হইতে পাইয়াছেন। অতি স্নন্দর বর্ণমালা, বৈজ্ঞানিকমূত্রে শ্রেণীবদ্ধ। ক্রমনির্ণয়ে কত না পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। রাস্তানে প্রথমেই উচ্চারণে বায়ুর প্রাধান্য অপ্রাধান্য লইয়া বর্ণবিভাগ। সর্বাঙ্গী স্পর্শ বর্ণ, পরে অন্তঃস্থ বর্ণ, ও শেষে উষ্মবর্ণ। স্পর্শবর্ণে জিহ্বাস্পর্শে বায়ু কদ্ধ ও উচ্চারণ স্থগিত

না হইয়া অপ্রতিহতভাবে বাহির হইয়া যায়। এবং উষ্মবর্ণে বায়ু অর্ধকদ্ধ হইয়া শিথ দেওয়ার ন্যায় বহিয়া যায়। স্পর্শবর্ণ পর্যালোচনা করিলাম, দেখিলাম উচ্চারণ স্থানভেদে কেমন বর্ণে বর্ণে বিভক্ত রাখিয়াছে। অন্তর্দেশ হইতে ক্রমশঃ বহির্দেশে আসিলে প্রথমেই কণ্ঠ, পরে ক্রমশঃ তালু, মূর্ধা ও দন্ত, ও শেষে ওষ্ঠ। বর্ণমালারও প্রথমে কণ্ঠ্য কবর্ণ, পরে তালব্য চবর্ণ, মূর্ধন্য টবর্ণ, দন্ত্য তবর্ণ ও শেষে ঠষ্ঠ্য পবর্ণ। সর্বশেষে একটি বর্ণের আলোচনা করিলাম। দেখি প্রথমে উষ্ণ ক ব, পরে শুল্ল গ ঘ, ও শেষে নাসিক ঙ। ক, খ এবং গ, ঘর মধ্যেও প্রথম কোমল ক ও গ, ও পরে কর্ষণ খ ও ঘ।

স্বরবর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখি প্রথমে কণ্ঠ্য অ আ, পরে তালব্য ই ঐ এবং তৎপরে ঠষ্ঠ্য উ ঊ। শেষে দিশ্র উচ্চারিত কণ্ঠ্য তালব্য এ এবং কণ্ঠ্য ঠ ও ঙ। ঙ ঙ্গ ঙ্গ ঙ্গ এই পাঁচবর্ণের কথা পরে কহিব।

যে কএকটি ভাষার বর্ণমালা জানি তাহাদের সহিত বঙ্গভাষার তুলনা করিলাম। দেখিলাম তাহাদিগের বর্ণমালা বালকের ক্রীড়া কন্দুকের ছায় ইত্যন্তঃ বিশৃঙ্খলভাবে

বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। স্বরের মধ্যে ব্যঞ্জন ও ব্যঞ্জনের মধ্যে স্বর, ঔষ্ঠ্যবর্ণের পরে কঠ্যবর্ণ এবং স্পর্শবর্ণের মধ্যে অন্তঃস্থ বা ঔষ্যবর্ণ। লাতিন ও গ্রীক এবং তন্ত্রিত্ত ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষা, আরবী ও পারসী সকল ভাষার বর্ণমালাই এরূপ বিশৃঙ্খল ও যথেষ্ট অসুস্থ।

বঙ্গভাষার বর্ণমালায় যে কেবল ক্রম-বিস্তারের অতুল বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্য্য রহিয়াছে তাহা নহে, উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিও অতিশয় পারিপূর্ণ। উহা পূর্ণাবয়ব নহে কিন্তু প্রায় পূর্ণাবয়ব। দুই চারিটি দোষ ও অভাব বাহা দেখিলাম তাহা বলিতেছি।

১। দেখিলাম ঋ ঌ ৯ ঐ ও এই পাঁচটি বর্ণ অনাবশ্যক। স্বরব্যঞ্জনে কিছা দুইটি স্বরে উহাদের কার্য্য অনায়াসে চলিতে পারে। তন্ত্রিত্ত উহাদের উচ্চারণ যৌগিক। যৌগিক উচ্চারণের জন্ত অসংযুক্ত বর্ণ থাকিলে তাহাকে কিরূপে নির্দোষ কহিব ?

২। দেখিলাম অবহেলার অন্তঃস্থ ব ও মুর্দ্ধগ্য ণ ও ষ এবং দন্ত্য স মৃতপ্রায় হইয়াছে। হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের আর তারতম্য নাই। দুই একটি সংস্কৃত ধরণে রচিত শ্লোক পাঠের সময় তন্ত্রিত্ত অন্য সময়ে প্রায় হ্রস্ব দীর্ঘের পার্থক্য থাকে না। মাতঃ বঙ্গভাষা, নিজে উপার্জন করা দূরে থাকুক, গ্রীধনে প্রাপ্ত সম্পত্তিও যে খোয়া-

ইতে বসিয়াছে? বাঙ্গালীরা হ্রস্বের মর্ধ-স্পৃক্ বেদনাতেও একতাবন্ধ হয় না। তোমার সম্পত্তি রক্ষার জন্য কি একতাবন্ধ হইবে? আশা করিতে পারি না। তবে সরম্বতীর রূপা।

৩। দেখিলাম পদাস্ত্র অকার অনেক স্থলে উচ্চারিত হয় না। একারের উচ্চারণ দুইটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এত, মেথর, কেন, দেও, নেও ইত্যাদি শব্দে একারের উচ্চারণ সাধারণ উচ্চারণ হইতে বিভিন্ন।

প্রথম ও দ্বিতীয় দোষের সহিত আমার চিন্তার বিষয়ের সম্বন্ধ অল্প, কিন্তু যদি অকার কোথায় উচ্চারিত, কোথায় বা অনুচ্চারিত হয়, এবং একারের যদি দুইটি বিভিন্ন উচ্চারণ হয়, তাহা হইলে ক্রমেই উচ্চারণের অভিধানের উপকরণ সংগৃহীত হইতে থাকিবে। ইংরেজী উচ্চারণ পুঙ্কমে পুঙ্কমে যুগে যুগে এমন কি বৎসরে বৎসরে পরিবর্তিত হইতেছে। আর পারি না। সেই উৎপাত কি বঙ্গভাষায় প্রবেশ লাভ করিবে? আগে শনিয়াছি ডাইভোর্স, এজুকেশন, নেচার, মাইনরিটি, বেক, এখন শনি ডিভোর্স, এজুকেশন, নেটিয়র্, মিনরিটি, বেন্শ। উদাহরণ যথেষ্ট রুদ্ধি করা যায়। মৃতন কলেজের ছাত্রের নিকট ইংরাজী কহিতে ভয় হয়, পাছে আমার বিনা সম্মতিতে ও অজ্ঞাতে পরিবর্তিত কোন উচ্চারণের জন্য পুরাতন মূর্ধ মধ্যে পরিগণিত হই।

ভবিষ্যতে বঙ্গভাষার উচ্চারণের অ-

‘অভিধান আবশ্যিক না হয় তাহার কি কোন চেষ্টা করা যাইতে পারে? এত, মেথর, কেন, দেও ইত্যাদি শব্দের প্রচলিত উচ্চারণ পরিবর্তন করিয়া সাধারণ একারের উচ্চারণ স্থিরতর রাখা সম্ভব নহে। ভাষা ব্যবহারের দাসী। ব্যবহারকে ভাষার দাসী করা সম্ভবও নহে এবং সম্ভবও নহে। সম্ভব হইলে একার একারই থাকিত হ্রস্ব (ঐ) হইত না। তবে ইহার একটি উপায় আছে। উর্দু ভাষায় আবশ্যিক মত পারস্য বর্ণমালার অভিরিক্ত টে, ডাল প্রভৃতি কএকটি বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছিল। বাঙ্গলায় সেইরূপ একটি নূতন অক্ষর সৃষ্টি করা আবশ্যিক হইয়া পড়িয়াছে। অকারের উপক্রম আর ও ডয়ানক। লুপ্ত অকারের পুনরুদ্ধার অসম্ভব ও তাহার চেষ্টা স্থগী। * উচ্চারণের অনুকরণে পদান্ত বর্ণ হ্রস্ব লিখিলে কি চলিবে? না, তাহা হইলে সমুদয় সন্ধি সূত্র পরিবর্তন করিতে হয়। কএকটি সাধারণ সূত্রে কি পদান্ত অকারের উচ্চারণ অনুচ্চারণ স্মরণীয় করা যায়? নিয়ম বদ্ধ করা সম্ভব হইলেও সাধারণ বিধি হইতে বর্জিত বিধি অধিক হইবে; এবং সমুদায়গুলি একত্র বহু

* যদি কেহ ‘অতএব এক্ষণ তোমার নাম কহ’ (৫ সূ মেথ) এই কথাটির সমুদয় পদান্ত অকারের উচ্চারণ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে উড়িয়াবাদী বলিয়া ভ্রম হইবার একান্ত সম্ভাবনা।

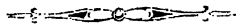
সংখ্যক হইয়া পড়িবে। সূত্র বহুসংখ্যক হইলে উচ্চারণের অভিধানের প্রায় সমুদয় দোষ ও অসুবিধা রহিল। অতএব ইহাতে বিশেষ কোন লাভ দৃষ্ট হয় না।

কতগুলি কথা আছে বাহার অন্ত্য অকার কখন বা উচ্চারিত হয় কখন বা অনুচ্চারিত থাকে। যেখানে উচ্চারিত হয় সেই সমস্ত স্থল কোন কোন পুস্তকে ‘ও’ বর্ণ সন্নিবেশ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া থাকে; যথা, কোন, কোনও। অকারকে বিদায় দিয়া ওকারের আশ্রয় গ্রহণ করা কতদূর সম্ভব তাহার বিচারে লেখনীকে ব্যায়াম ক্রিষ্ট না করিয়া ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে উক্ত প্রণালীতে আমাদিগের প্রদর্শিত অসুবিধার অতি অস্পষ্ট মাত্র সাহায্য হয়। আমাদিগের বিবেচনায় ইহার একটি মাত্র সহজ উপায় আছে। পদান্ত অকারের অধিকাংশই অনুচ্চারিত থাকে, অল্প সংখ্যক মাত্র উচ্চারিত হয়। উচ্চারিত পদান্ত অকারের একটি চিহ্ন সৃষ্টি করিলে উচ্চারণের অভিধানের দুঃসহ জ্বালা হইতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি। কমা, কোলন, সেমিকোলন, প্রথের চিহ্ন, বিস্ময়ের চিহ্ন, ইত্যাদি ভৌ অতি অস্পষ্ট হইল বঙ্গভাষার গৃহীত ও প্রচলিত হইয়াছে, উচ্চারিত অকারের একটি চিহ্ন করিলে তাহাও যে অতি অস্পষ্ট কাল মধ্যে প্রচলিত হইবে সন্দেহ নাই।

প্রথমেই বলিয়াছি যে বর্ণমালা পূর্ণ হইলে উচ্চারণের অভিধানের প্রয়োজন

হয় না। বঙ্গভাষায় যে দুইটি অভাব প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহা উপরে নির্দেশ করিলাম। ভবিষ্যতে আরও অভাব হইতে পারে। অভাব মোচনের জন্য যদি বর্ণমালা বর্দ্ধিত না হয় তাহা হইলে ক্রমশঃ উচ্চারণের অভিজ্ঞান আবশ্যক হইবে। উপরে যে একটি বর্ণের ও একটি চিহ্নের সৃষ্টির কথা কহিলাম তাহা এক জনের কার্য্য নহে, সমস্ত সাহিত্য সমাজের কার্য্য। এক ব্যক্তি প্রথম পথ প্রদর্শন করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাকে অনুসরণ না করিলে সাহিত্য সমাজ ভবিষ্যৎ বংশের নিকট বিশেষ ধন্য খাদ্য হইবেন না। ইংলণ্ডে কতকগুলি লোক ইংরেজী শব্দের উচ্চারণ

গানুসারে বর্ণবিন্যাস করিতে চেফ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের বর্ণবিন্যাসের প্রণালীর নাম ফনেটিক সিস্টেম্। এই সিস্টেমের চেফ্টা যে ফল হইবে তাহার সম্ভাবনা অল্প। তাঁহারা বিফলপ্রযত্ন হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেফ্টা ও উদ্যমে প্রমাণিত হইতেছে বর্ণমালার অভাবে ভাষায় কি অকথ্য বিশৃঙ্খলা প্রবেশ করে। বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ যদি বর্ণমালা পরিবর্দ্ধিত না করেন তাহা হইলে আধুনিক ইংরেজেরা উচ্চারণ লইয়া যে গোলযোগে পড়িয়াছেন ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীরা ততদূর না হটুক কিন্তু তজপ এক গোলযোগে যে পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীবি—



প্রেততত্ত্ব।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

আমরা এই প্রস্তাবে মধ্যস্থ এবং আরোজনের কথা বলিব। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, মধ্যস্থ না থাকিলে প্রেতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ইংরেজী অনভিজ্ঞ পাঠককে 'মধ্যস্থ' কথা বুঝান বড় দুঃস্থ। মূল কথা যাহার অনুপস্থিতিতে প্রেতাগমের ব্যাঘাত জন্মে, তিনিই মধ্যস্থ (Medium)। যেখানে দশজন মিলিয়া প্রেতাহ্বান করিতে থাকেন, সেস্থলে যে সকলকেই মধ্যস্থ হইতে হইবে, তাহার

কোন অর্থ নাই। তবে স্মরণার্থে একজনকে ঐ শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে হইবে। তাহার অভাবে প্রেতাভির্ভাব হইবে না। সাধারণতঃ যাহারা দুর্বল, বা অধিক চিন্তাশীল, বা যাহাদের প্রেতে অন্ধবিশ্বাস, বা যাহাদের স্বাভাবিক বা ধর্ম্মনী সকল শীঘ্র উত্তেজিত হয় (Nervous) তাহারা মধ্যস্থ হইয়া থাকেন। এই মধ্যস্থের সহিত প্রেতের কিছু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যদি দশজন বাজে লোক প্রেতের জন্য গলবস্ত্র হইয়া

ধ্যান করিতে থাকেন, তথাপি তাহার দেখা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু তিন জনের মধ্যে যদি একজন মধ্যস্থ থাকেন, তাহা হইলে পূর্বোক্ত দশজনে যাহা করিতে না পারিয়াছে এই তিনজনে তদনুকূল করিতে পারিবে। সুতরাং যখন বেক্রম আয়োজন করিয়া প্রেতাহ্বান করিতে থাকি না কেন, সকল সময়েই নূন কল্পে একজন মধ্যস্থ চাই। তাহার উপস্থিতি অপরিহার্য।

এক্ষণে আয়োজনের কথা—আমরা পূর্বে বলিয়াছি যেমন তেমন করিয়া ডাকিলে প্রেতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এই কারণে প্রেতাহ্বানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আয়োজনের প্রচলন আছে। আমরা তাহার কতকগুলি উল্লেখ করিতেছি।

১ম। তিন চারিজন একটি চৌপায়ার চতুর্দিকে বসিয়া তল্পপরে একপভাবে হস্ত রক্ষা করে যেন পরস্পরের হস্তের সহিত যোগ থাকে, এবং সকলেই কোন বিশেষ প্রেতের কথা মনে মনে স্মরণ করিতে থাকে। আর একজন হস্ত প্রেতাহ্বানকারীদিগের মনের ঐশ্বর্য সম্পাদনার্থ হুঃখ-রসাত্মক কোন পুস্তক পড়িতে থাকে বা কোন গান গাহিতে থাকে। অক্ষয়পরেই একজনের অঙ্গ শীতল হইতে থাকে এবং সে ক্রমে অজ্ঞানাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে প্রেত আসিয়াছে স্থির করিতে হইবে। এবং এই অজ্ঞানাবস্থাকে যাহা প্রসন্ন করা যায় প্রায় তাহার সকলগুলিরই সে যথাবিধি উত্তর দিয়া থাকে। প্রেতত-

ত্ত্ববাদীমতে ইহাই প্রেতের উত্তর। কিয়ৎকাল পরে তাহার জ্ঞান জগ্নে এবং সে স্বাভাবিকাবস্থা প্রাপ্ত হয়; চেতনা হইলে তখন আর অজ্ঞানাবস্থার কথা কিছুই স্মরণ থাকেনা।

আমি স্মরণ একবার এইরূপ প্রেতাহ্বান দেখিতে গিয়াছিলাম। যথাসময়ে একজন অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তাহাকে এইরূপ প্রশ্ন করা হয়।

প্র। তুমি কাহার আত্মা?

উত্তর নাই।

প্র। আপনি যদি কাহারও আত্মা হন, অনুগ্রহ করিয়া উত্তর দেন, আমরা আপনার অপেক্ষা করিতেছি।

উ। মহাত্মা রামমোহন রায়ের।

কিয়ৎকাল পরে সেই অজ্ঞান ব্যক্তি এক উপদেশপূর্ণ বাচনিক বক্তৃতা দিল; তাহাতে বাস্তবিক আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। এইরূপ বক্তৃতা শিক্ষিতব্যক্তিও আয়োজন ব্যতীত দিতে পারে কিনা সন্দেহহীন। এতদ্ব্যতীত আমরা জীবনে তাহার নিকট কোনরূপ বক্তৃতা শুনি নাই।

আর একবার এইরূপ সভায় গিয়া দেখিলাম, যে অজ্ঞানব্যক্তি একজনকে ক্রমাগত প্রহার করিতেছে, দশ বার জনে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। অবশেষে সে ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহ হইতে এক খানা পালক বাহিরে আনিয়া ফেলিল। পর দিবস সে পালক গৃহে লইয়া যাইতে পাঁচজন লোকের আয়োজন হইয়াছিল।

২। প্রেতাঙ্কানের আরও একরূপ আয়োজন হইয়া থাকে; তাহাতে সকলই পূৰ্ণমত; কেবল প্রেতমহাশয় স্বল্পে চাপিয়া কাহাকেও অজ্ঞান করেন না; চৌপায়ার পদাঘাতে উত্তর দিয়া থাকেন। পূৰ্বোক্তরূপ কিয়ৎক্ষণ বসিলেই টুল নড়িতে থাকে। তখন প্রশ্ন করা হয় 'আপনি যদি কোন প্রেত আসিয়া থাকেন, কাষ্ঠপাদ একবার আঘাত করুন'। কাষ্ঠপাদে একবার আঘাত পড়িল। তখন প্রেতের উপস্থিতি স্থির হইল। তৎপরে কিরূপে কথোপকথন চলিবে তাহারই উপায় স্থির হইতে থাকে। হয়ত আস্থানকারীরা বলেন 'হাঁ হইলে যেন একবার শব্দ হয়, না হইলে দুইবার, এবং সংশয়যুক্ত হইলে তিন বার' তার পর প্রশ্ন হইতে থাকে, এবং এই নিয়মমতে প্রেত মহাশয় উত্তর দেন। তখন বলা হয় যে, 'আপনার যে অক্ষরে লিখিবার ইচ্ছা, আমরা অক্ষর পড়িয়া যাইব, আপনি আপনার মনস্থ অক্ষরে আঘাত দিবেন, আমরা আবার গোড়া হইতে আরম্ভ করিব, আপনি আবার বক্তব্য অক্ষরে আঘাত দিবেন' এই রূপ। ইহাতে উত্তমরূপ কথোপকথন চলিতে পারে। আস্থানকারীরা জিজ্ঞাসা করিবেন, রাম শ্যামের কত টাকা ধারে? এই বলিয়া অ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণাবর পড়িতে আরম্ভ করিল, 'শ'এ এক আঘাত পড়িল। আবার গোড়া হইতে পড়িতে আরম্ভ ক-

রিল 'ও'এ এক আঘাত পড়িল,—হইল শত টাকা।

৩য়। আর একরূপ কথোপকথনের উপায় প্লাঞ্জেট (Planchette)। এই অভিনব জব্য কি তাহা সাধারণকে বুঝান অনাবশ্যক। কিছু দিবস হইল একজন সাহেব এই অদ্ভুত জিনিষ কলিকাতায় আমদানী করিয়া বড় মন্দ লাভ করিয়া যান নাই। ইহা একখানি ছোট তক্তা। তিনটি পায়া আছে। পায়াতে স্ক্রফ চক্র দেওয়া আছে। তাহা এত মন্থণ যে হাত দিলেই সে চাকাগুলি ঘুরিতে থাকে এবং তক্তা গড়াইয়া যায়। এই তক্তার মধ্যস্থলে একটি পেন্সিল বসান আছে। যেমন চাকা ঘুরিয়া এই তক্তাকে সরাইতে থাকে সেই সঙ্গে সঙ্গে এই পেন্সিলও সরে এবং কাগজের উপর হইলে সেই পেন্সিলে প্রশ্নের উত্তর অতি সুন্দর অক্ষরে লিখিত হয়। এই প্লাঞ্জেটে একবার আমি কএকটি বন্ধু * লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই প্লাঞ্জেট ঘুরিতে আরম্ভ হইল। তখন তাহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। যে সকল উত্তর পাইলাম তাহার প্রায় সকল গুলিই ঠিক। পাঠকগণকে তাহার নমুনা দেখাইতেছি।

প্র। মহারাণী কোন্বর্ষে সিংহাসনে আরোহণ করেন?

প্লাঞ্জেট প্রশ্ন শুনিয়াই ঘুরিয়া ঘুরিয়া

* তাহাদিগের অন্যতম বাবু রাজকৃষ্ণ রায়। (অবসর সরোজিনী রচয়িতা)।

কিয়ৎকণ পরে '১' অক্ষরটি লিখিয়া পরে ৮; ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার দুইটি অক্ষর বাহির হইল, পড়িলাম ১৮৩৭। পুনর্বার প্রাণ করিলাম।

কোন বৎসরে বায়রণের মৃত্যু হয়? উত্তর। ১৮২৪।

প্র। বায়রণ বড় কবি না সেলী?

উ। দুইজন দুই প্রকার কবি; তুলনা অসম্ভব।

পাঠকগণকে বলা বাস্তব্য, যে আমাদিগের কেহই উত্তর সকল ইচ্ছাপূর্বক লিখি নাই। এমন কি যে সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা জানিতাম সেরূপ একটি প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই; অথচ প্রায় অধিকাংশ উত্তর গুনিই ঠিকই লিখিত হইয়াছিল।

একটি বৈঠক উত্তরের কথাও বলি। সেই স্থানে আমাদিগের আর একটি বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আমি মরিব কবে?

প্ল্যাঞ্চেট্ স্বভাব মত ঘুরিতে লাগিল। অনেককণ ঘুরিয়া—প্রায় আমাদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময়ে একটি ১ অক্ষর লিখিত হইল। আবার পূর্বমত ঘুরিতে লাগিল; কিন্তু আমরা নাছোড়বন্দা, প্ল্যাঞ্চেট্ ধরিয়াই আছি। বহুকণ পরে '৮' অক্ষর লিখিত হইল। পুনর্বার ঐ রূপ উৎপাত। চারিটি অক্ষর শেষে সমাপ্ত হইলে পড়িলাম ১৮৭৫। আমরা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এই পত্রিকা করিতে ছিলাম।

পাঠকগণকে ইহাও জানান আবশ্যিক যে আমাদিগের বন্ধু এখনও জীবিত আছেন।

আমাদিগের একটি শ্রেততত্ত্ববাদী বন্ধু এইরূপ প্ল্যাঞ্চেট্ ধরিয়া শ্রেতাঙ্কান করিতে ছিলেন। তিনি প্ল্যাঞ্চেট্কে জিজ্ঞাসা করিলেন।

তুমি কি পরকালের সমস্ত কথা জান? যে হেতু তুমি শ্রেত।

উ। জানি।

প্র। আমাদিগকে বলিয়া দেওনা কেন?

উ। তাহাইলে সব গোল মিটিয়া যাইবে।

এই শেষ উত্তরটিতে আমাদিগের উক্ত বন্ধু একেবারে গলিয়া গেলেন। তিনি বলেন শ্রেত বাতীত এরূপ উত্তর দেওয়া আর কাহারও কি সম্ভবে? ফল কথা কথাটি তাহাকে বড় মধুর লাগিয়াছে কাজেই শ্রেতে তাঁহার বিশ্বাস এক ডিগ্রী উঁচু হইয়াছে।

৪র্থ। তৃতীয় আয়োজনে যে যে উপকরণ আবশ্যিক, ইহাতেও তাই, কেবল প্ল্যাঞ্চেটের মধ্যস্থলে পেন্সিল না থাকিয়া একটি দণ্ড প্রোথিত থাকে। এবং টেবিলের উপর ক, খ, প্রভৃতি অক্ষর লিখিয়া প্ল্যাঞ্চেট ধরিলে, ঐ দণ্ডটি এক অক্ষরের পর আর এক অক্ষরের নিরূপিত গিয়া আপন অতিমত প্রকাশ করিয়া দেয়।

উপযুক্ত আয়োজন ও মধ্যস্থ বাতীত অনেকরূপে শ্রেতাগম জানিতে পারা যায়। কখন কখন শ্রেতাঙ্কান মধ্যস্থ ছবি আঁকে। কখন কখন বা পীড়িতের জন্য

ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দেয় । ওরূপ চিকিৎসার অনেকেই আরোগ্যলাভ করিয়াছে ।

প্রেতাহ্বান সম্বন্ধে কতকগুলি মাধারণ আয়োজনের কথাও বলিয়া রাখি ।

যে গৃহে প্রেতাহ্বানের জন্ম আয়োজন করা হইবে, সেটি নির্জন হওয়া চাই । অধিক উষ্ণ হইবে না, কারণ তাহাতে মনের ঠৈর্ঘ্য রক্ষিত হয় না । তীক্ষ্ণ শীত বায়ুও বহিবে না । চারি পাঁচ ছয় যত জনে ইচ্ছা চৌপায়ের (টুল বা টেবিলের) চতুর্দিকে বসিয়া পূর্বোক্ত নিয়মমতে একমন হইয়া ধ্যানলগ্ন হইবে যেন মাঝে কেহ বিরক্ত না করে । দুই শত্রুতে একত্রে আহ্বান করিবেনা । প্রেতে বাঁহারি অবিশ্বাসী গৃহ মধ্যে তাহাদের উপস্থিতিও প্রেতাগমের ব্যাঘাতকারী । *

এক্ষণে দেশীয় ও বিদেশীয় প্রেত সম্বন্ধীয় কএকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা এ প্রস্তাব শেষ করিব ।

১। প্রায় দশ বার বৎসর হইল, হুসেন খাঁ নামক জর্নৈক মুসলমান দৈবশক্তি বিশিষ্ট বলিয়া পরিচিত ছিলেন ।

* এই কথাটিতে প্রেততত্ত্ববাদীরা সাধারণকে অত্যন্ত কারদাগ রাখিয়াছেন । কেহ প্রেত সম্বন্ধীয় কার্যকলাপের পরীক্ষা করিতে যাইলেই প্রায় সেবারে প্রেত মহাশয় নিরমমত দেখা দেন না । প্রেততত্ত্ববাদীরা অমনি বলেন, আপনি প্রেতে বিশ্বাস করেন না, আপনার উপস্থিতিই আদিগের সফলতার প্রতিরোধক ।

যিনি যাঁহা চাহিতেন তিনি তাঁহাকে তাহাই দিতে পারিতেন * । তাঁহাকে অনেকেই দেখিয়াছেন । তন্মুখো একজনের নিকট আমরা শুনিয়াছি যে, তিনি একবার হুঁসেনখাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । এবং হুঁসেনখাঁ আসিলে তিনি আঙ্গুরের রস খাইতে প্রার্থনা করেন । কিছু পরেই হুঁসেনখাঁ সত্য সত্যই আঙ্গুরের রস আনিয়াছিলেন । এজন্য তিনি একবার বাহিরেও যান নাই । আমাদেরিগের বন্ধুটি সেবন করিয়া দেখিলেন যে, উহা বাস্তবিকই আঙ্গুরের রস । বন্ধুটিকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না ।

২। আর একটি ঘটনা পাঠকগণের সমীপে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম । এটিও প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় । একবার জিবাঙ্গুররাজ্যের কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হয়, উক্ত রাজবংশের এইরূপ বিশ্বাস যে, মৃত ব্যক্তি দক্ষ হইলে তাহার কিয়দংশ তন্ময় কোন পবিজ (হিন্দুতে) নদীজলে ভাষাইয়া দিলে উক্ত মৃত ব্যক্তির পরকালে স্বর্গ প্রাপ্তি হয় । তদনুসারে জিবাঙ্গুররাজ জর্নৈক সন্ন্যাসী দিরা তাঁহার মৃত আত্মীয়ের তন্ময় গঙ্গাজলে নিক্ষেপ জন্য পাঠান । সন্ন্যাসী যথাসময়ে কাশীধামে উপস্থিত হন এবং জিবাঙ্গুর-রাজদত্তপত্রসহায়ে কাশীরাজের বাটীতেই আশ্রয় গ্রহণ করেন । সেই সময়ে একজন ফরাসীও কাশীরাজের

* দুঃখের বিষয় এই, প্রস্তাবলেখক তাঁহাকে দেখেন নাই ।

বাঁচীতে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। কাজেই উক্ত সন্ন্যাসীর (ফকির) সহিত ফরাসীর কিষ্কিৎসে সৌহার্দ জন্মে। ক্রমে ফরাসী শুনিলেন যে, ফকির দৈব-শক্তি-বিশিষ্ট।

তখন তাহার ক্ষমতার কিছু নিদর্শন দেখিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ফকির স্বীকার পাইলেন। নির্দিষ্ট দিবসে একটি জল-পূর্ণ রুহৎ ধাতু-নির্মিত পাত্রাধারের পাশ্বে উভয়ে দাঁড়াইয়াছিলেন, ফকির জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট কি আছে? ফরাসীর হস্তে একটি উডেন্ পেঙ্গিল ছিল, তিনি তাহাই ফকিরকে দিলেন। 'ফকির পেঙ্গিল লইয়া অপরকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'বলুন দেখি এ পেঙ্গিল জলে ফেলিলে ভাসিবে না ডুবিবে?' ফরাসী বলিলেন—ভাসিবে।

পেঙ্গিল জলে ফেলিবা মাত্র ডুবিয়া গেল।

ফকির পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,

এবারে ভাসিবে না ডুবিবে?

ফ। ডুবিবে।

এবারে পেঙ্গিল ভাসিল।

ফরাসী দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তৎপরে সন্ন্যাসী সেই পেঙ্গিল দিয়া উক্ত জলধার স্পর্শ করিলেন, অমনি তাহার একদিক উর্দ্ধে উঠিয়া, অপরদিক পূর্বমত রছিল। পাত্র ঠিক থাকিল, জলের এক দিক উঠিয়া রছিল অপর দিক নিচু রছিল। এইরূপে সেই জল লইয়া অনেক-রূপ রহস্য দেখাইতে লাগিলেন।

ফরাসী বলিলেন "আপনি যখন প্রেত সহায়ে এত অদ্ভুত অদ্ভুত কৰ্ম সমাধা করিতে পারেন, তখন প্রেত আপনার একান্ত বাধ্য বলিতে হইবে। যদিপি প্রেতকে আমাকে দেখাইতে পারেন, তাহাই হইলে আমার প্রেতে বিশ্বাস হয়। ফকির উত্তর করিলেন, প্রেতের দেখা পাওয়া না পাওয়া প্রেতের ইচ্ছাধীন। কিন্তু আপনি তাহার উপস্থিতি অনুভব করিতে পারিবেন।

ফরাসী। কিরূপে?

ফকির। তাহার কার্যকলাপে; এরূপ অমানুষিক কার্য দেখিবেন যে প্রেত ব্যতীত অন্য কাহার দ্বারা সে কৰ্ম অসম্ভব। প্রেত দেখাইবার নির্দিষ্ট দিবস স্থির হইল।

সেই দিবস ফরাসী এক চতুস্তল বা টির উর্দ্ধতম গৃহে গিয়া রাত্রি কাটাইবেন স্থির করিলেন। যাহারা কাশীধামে গিয়াছেন তাঁহারা হয়ত জানেন যে তথাকার উর্দ্ধতম গৃহের যে দ্বার, তাহা নামাইয়া দিলেই ত্রিতলের সহিত সিঁড়ির কার্য করে। আবার উঠাইয়া লইলেই দ্বার হইয়া যায়, এবং নিম্নের সহিত সকল সম্বন্ধ ও যোগাযোগ বন্ধ হয়। ফরাসী যে গৃহে আশ্রয় লইলেন, তাহা এইরূপ। প্রথমতঃ বাঁচীতে প্রবেশ করিয়াই তিনি চারিদিকের দ্বার বন্ধ করিলেন। তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, কেহ কোথাও লুকাইয়া নাই। পরিশেষে সর্বো-

পরিষ্কৃত গৃহে উঠিলেন এবং সিঁড়ি তুলিয়া লইয়া দ্বার কন্ধ করিলেন। গৃহে পিস্তল বন্দুক প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল বখাকালে রক্ষিত হইল।

সন্ধ্যা হইল। ফরাসী শয্যার উপর বসিয়া রহিলেন, রাত্রি গাঢ় না হইতে হইতেই ছাদের উপরে মনুষ্যের পদশব্দ হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে তিনি ছাদ ও উত্তমরূপ পূর্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। পরে জানালায় আঘাত হইতে লাগিল। ফরাসীর বন্দুক প্রস্তুত ছিল। সহসা জানালা খুলিয়াই বন্দুক ছুঁড়িলেন, কিন্তু কোথাও কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে সকল জানালাতেই ‘ধূপ’ ‘ধাপ’ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। বন্দুক পিস্তল সকলই ছুঁড়িলেন, কাছাকাছেও দেখিলেন না। অবশেষে দ্বার খুলিয়া ছাদে উঠিলেন। সেখানেও কাছাকাছে দেখিতে পাইলেন না। কেবল দূরে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন, সেই ফকির গাঙ্গাভীরে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন *।

* এই ঘটনাটি ‘The Spiritualist’ নামক পত্র দৃষ্ট হয়। এক্ষণে উহা নিকটে না থাকায় যথাযথ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। এবং কোন সংখ্যায় আছে তাহাও বলিতে পারিলাম না। যাহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা উক্ত পত্রের ১৮৭৩ হইতে ১৮৭৫ সনের সংখ্যাগুলির সূচিপত্র দেখিয়া বাহির করিয়া লইবেন।

একটি বিদেশীয় ঐশ্রবিক ঘটনারও উল্লেখ করিতেছি। সেটিও বড় কম বিশ্বাসজনক নহে।

কমিয়ার কাউন্টেস্ ব্যাভাস্কী (Countess Blavatsky) সাধারণতঃ একজন ক্ষমতাশালিনী মধ্যস্থ বসিয়া পরিচিতা। তাহার সম্পাদিত হুইট ঐশ্রবিক কার্য বড় বিশ্বাস্যবহ। প্রথম, কমালের সূচিকার্যে লিখিত একটি নামের পরিবর্তে আর একটি নাম স্থাপন। ঘটনাটি অতি অল্প সময় মধ্যে এবং অনেকগুলি পণ্ডিত লোকের সমক্ষে সম্পাদিত হয়। তন্মধ্যে উক্ত পশ্চিমাঞ্চলের কালেক্টর সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয়টি এইরূপ। যখন উক্ত মধ্যস্থ লগুন হইতে বোম্বাই নগরে আসিতেছিলেন, তখন একজন ব্যারিস্টার তাহার পিতার (স্বপরিচিত পার্লিয়ামেন্টের মেম্বার) অঙ্গুষ্ঠ আরোগ্য করিতে অনুরোধ করেন। ব্যাভাস্কী তাহাতে স্বীকৃতা হইলেন, এবং বলিলেন যে, ‘ভারতবর্ষে গিয়া আমি এ বিষয়ে চেষ্টা করিব। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশে থাকিয়া উভয়ের কথোপকথনের জন্য একটি উপায় আবশ্যক। রোগীর কোন দ্রব্য পাইলেই আমি সংবাদ চালাইতে পারি।’ ইহাতে রোগীর হস্তাবরণ (Gloves) দেওয়া হইবে। ব্যাভাস্কী দস্তানা লইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কর্ণেল অলকট্ (Col. Olcott) সাহেবের সমক্ষে

তিনি উক্ত দুইটি দস্তানাই একটি গৃহ মধ্যে
টেবিলে রাখিয়া গৃহে বারি দিলেন । কিছু
দিনস পরে বিলাত হইতে ১৮ই ফেব্রুয়া-
রির এক পত্র আসিয়াছে, তাহাতে পু-

কৌল্য ব্যারিফটার লিখিয়াছেন, যে তিনি
একটি হস্তাবরণ পাইয়াছেন । ইহাতে যে
সকল স্বাকীর উল্লেখ আছে তাহা কোন
ক্রমেই অবিস্থান করিতে পারা যায় না ।

আর্য্যায়ুর্বেদ ।

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

বোধ হয় ভাবপ্রকাশরচয়িতা একদিকে
ধনুস্তরিকে কাশীরাজগোত্রী ও অপারত
বিষ্ণুপুরাণে কাশীপুত্র ধনুস্তরির উল্লেখ দ-
র্শনে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন ; এবং ক-
ত্রিয়, বৈশা, ব্রাহ্মণ ভিন্নজাতীয় হইয়াও
যে সূর্য্য চন্দ্রাদি বংশীয় ও শাণ্ডিল্য ভর-
দ্বাজ প্রভৃতি গোত্রান্তর্ভূত হইতে পারেন,
তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন । বিশেষতঃ
ধনুস্তরি ক্ষত্রিয় হইলে, ব্রাহ্মণি বিশ্বাসিত্রের
বৈশাগর্ভজাত পুল সূশ্রুত তাঁহার পাদ-
গ্রাহণ করিয়া প্রণাম করিতেন না । যদি
আমরা এরূপ কল্পনা করি যে ধনুস্তরি দুই
বার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আদৌ
বৈদ্যবংশ প্রবর্তকরূপে, দ্বিতীয়তঃ ক্ষত্রিয়-
রূপতিরূপে আর্য্যর্বেদে উপদেশ দিয়াছেন,
এরূপ হইলে ভাবপ্রকাশ ও পুরাণের মি-
মাংসা হইতে পারে । কিন্তু তাহাতে আ-
পত্তি উপস্থিত হয় । কৃত্রাপিও ধনুস্তরির
দ্বিতীয় অবতারের উল্লেখ নাই । সূশ্রুতে ও
পুরাণে একবাক্যে স্বর্গবৈদ্য ধনুস্তরিরই উ-

ল্লেখ আছে । সূশ্রুতের নানা স্থান হইতে
আমরা নিম্নলিখিত বাক্য সংগ্রহ করি-
লাম ।

ধনুস্তরির ধর্ম্মভূত্বং বরিষ্ঠং অসূতোস্তবং
চণ্ডারূপসংযূহা সূশ্রুতঃ পরিপূচ্ছতি ॥

নিদানস্থান

চিকিৎসিতাং পুণ্যতমং ন কিঞ্চিদপি সু-
শ্রুতঃ

ঋবেরিঙ্গপ্রভাবম্যামৃতবোনের্ভিবৃক্ষুরোঃ ॥

কল্পস্থান ।

যেনামৃতমপাং মধ্যাহ্নভূতং পূর্বাঙ্গমনি ।
যতোহমরত্বং সংপ্রাপ্তান্ত্রিদশান্ত্রিদেবেশ্ব-
রাং ॥ উত্তরতন্ত্র ।

সুতরাং সূশ্রুত, চরক, গাঙ্গর ও মার্ক-
ণ্ডের একই ধনুস্তরির উল্লেখ করিতেছেন ।
ভাবপ্রকাশকার অন্যান্য সমুদয় বিবরণই
প্রাণ্ডক্য প্রমুকারদিগের অরূপ লিখি-
য়াছেন, কেবল মাত্র কাশীরাজ পুল ধনু-
স্তরির সহিত যোল করিয়া তাঁহাকে বা-
হুজ মনে করিয়াছেন । বোধ হয় পুরা-

গোল্লিখিত অলৌকিকাংশে অনাস্থা হওয়াতেই এরূপ গৌলে পতিত হইয়াছিলেন ।

এই সমস্ত অনুসন্ধানের পর আমরা এই মহাত্মার জীবনী সম্পর্কে এই মাত্র জানিলাম যে তিনি মহর্ষি গালবের পুত্র, বৈশ্যবংশ ললামভূত) বীরভদ্রা ইহার জননী । ইনি অশ্বর্ষ বংশের আদি পুরুষ । অলৌকিক প্রতিভাবলে শরীর বিজ্ঞানের বহুবিধ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া মানব জাতির মহোপকার সাধন করিয়াছেন । ইহার তিন পরিগ্রহ; একের নাম সিদ্ধবিদ্যা, দ্বিতীয়া সাধ্যবিদ্যা ও তৃতীয়া কঠসাধ্য বিদ্যা; ইহাদের গর্ভে সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, ধর, কর, দেব, রক্ষিত, প্রভৃতি চতুর্দশ পুত্র জন্মে । ভরঘাজ, গালব, আত্রেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণবর্গ তৎপ্রতি অতীব ভক্তিমান হইয়া তাঁহাকে আনুর্বেদ ব্যবসায় সম্প্রদান করেন । তাঁহার সহজ বৈরাগ্য সন্দর্শন করিয়া মুনিসমাজ তাঁহাকে কাশীরাজ্যে অভিষিক্ত করেন; তদবধি তাহার বিষয়বৈরাগ্য কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল হইয়াছিল । তথাপি তিনি নামতঃ রাজা থাকিয়া সমস্ত জীবন কার্য্যতঃ আনুর্বেদানুশীলনে অতিবাহিত করেন । তিনি বারাণসীর আশ্রমে বসিয়া উপধেনব, পৌঙ্কলবত, করবীর্ষা, গোপুররক্ষিত ও শূর্য্য প্রভৃতি ১০০ শিবাকে আনুর্বেদ উপদেশ দেন । যদিচ তৎপ্রণীত সংহিতা আজ কাল দুঃপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, ত-

থাচ চতুর্দশ খৃঃাব্দে তাহা বহুদেশে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল ।

আত্রেয় ও ভরঘাজ ।

বর্তমান কালে আনুর্বেদীয় যত সংহিতা বর্তমান আছে তন্মধ্যে আত্রেয় সংহিতাই প্রাচীনতম । আত্রেয়, ভরঘাজ, গালব ও ধর্ম্মস্মি প্রায় সমসাময়িক । স্মৃতরাং ধর্ম্মস্মিসংহিতা ও আত্রেয়সংহিতা এক সময়ের গ্রন্থ । এই প্রস্তাবে আমরা এই প্রাচীনতম সংহিতার বিষয়সকল সংক্ষেপে উল্লেখ করিব । কিন্তু তৎপূর্বে ভরঘাজ ও আত্রেয়সংহিতা একটি সাধারণ প্রচলিত সন্দেহের আলোচনা করিতে চাই । পাঠক কিয়ৎকাল অবহিত চিত্তে দেখিবেন যে মুদ্রায়ত্রাভাবে এদেশের কত অনিষ্ট ঘটয়াছে ।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে পশুতবর শিবদাস নানাবিধ গ্রন্থের টিকাকার । তৎপ্রণীত চক্রপাণিকৃত সংগ্রহের টিকা অতীব উপাদেয় গ্রন্থ; এবং বিধ ব্যাখ্যান মূল পুস্তক হইতে ও অধিক মূল্যবান, পাঠকের সমধিক উপকারী । তৎপ্রণীত চরকসংহিতার টিকাতে দৃষ্ট হয় যে পুনর্ক্স ও ভরঘাজ একই* ব্যক্তি । চরকসংহিতাতে উল্লিখিত আছে যে পুনর্ক্স অগ্নিবেশ প্রভৃতির উপদেশটা, এবং কোন কোন পশুত বলেন যে পুনর্ক্স

* পুনর্ক্স: ভরঘাজ: অনেক শিষ্যতারা পুনর্বিস্তার কারিতবা দস্য পুনর্ক্সসংজ্ঞা । ইতি শিবদাস গুপ্ত: ।

আত্রেয় মুনির উপাধি মাত্র। আমাদের
-ধিবেচনায় পরোক্ত মতই সম্ভবপর বলিয়া
বোধ হয়। কারণ, চরকসংহিতায় স্প-
ষ্টই উল্লেখ আছে যে ভগবান্ ভরদ্বাজই
আর্দৌ ইন্দ্রসমীপে গমন করেন ও ত্রিষ্ক
আসুর্বেদ শিক্ষা করিয়া আত্রেয়প্রমুখ ঋ-
ষিদিগকে উপদেশ দেন। তদনন্তর আ-
ত্রেয়, অগ্নিবেশ, ভোগ জাতুকর্ণ, পরাশর,
হাদ্রীত ও ক্ষারপাণি নামক ছয়জন শি-
ষ্যকে আসুর্বেদে উপনীত করেন। সূত্ররূপে
আত্রেয়কেই অনেক শিষ্যদ্বারা পুনর্বিস্তারক
বলা যাইতে পারে। অতএব পুনর্বিস্তা-
রক হেতু পুনর্কর্ষ সংজ্ঞা ভরদ্বাজ অপেক্ষা
আত্রেয় প্রতিই সমধিক প্রয়োজ্য। পুন-
র্কর্ষ ও ভরদ্বাজ যদি একই ব্যক্তি হইবেন,
তবে চরকসংহিতাতে ‘হেতুগর্ভস্য নি-
র্ভৃতৌ রক্ষৌ জন্মানি চৈনয়ঃ। পুনর্কর্ষ ম-
তির্বাচ ভরদ্বাজমতিশ্চ য।’ এরূপ শ্লোক
কোন মতেই সম্ভবিত্তে পারে না। পক্ষা-
ন্তরে পুনর্কর্ষ ও ভগবান্ আত্রেয় যে একই
ব্যক্তির উপাধি ও নাম তাহা চরকের নামা
শ্লোকে প্রতিপন্ন হইতেছে। চরক প্রথ-
মতঃই ‘ইতিহাস্যাহ ভগবান্নাত্রেয়ঃ’ বলিয়া
প্রশংসিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নিম্নো-
ক্ত বাক্যাংশলি পাঠ করিলে কোনরূপেই
পুনর্কর্ষ সংজ্ঞা আত্রেয়তে প্রয়োজ্য ব-
লিয়া স্বীকার না করিয়া পারা যায় না;
‘তমেবমুক্তবস্তমগ্নিবেশং ভগবান্ পুনর্কর্ষ
রাত্রেয় উবাচ।’ চরকে—শারীরস্থানে
‘ইত্যগ্নিবেশস্য বচঃশ্রুত্বা মতিমতাংবরঃ।

সর্ষং যথাবৎ প্রোবাচ প্রশান্তাস্মা পুন-
র্কর্ষঃ।’

‘যাবন্তঃ পুরুমান্তাবন্তৌ লোকা ইতি এবং
বাদিনং ভগবন্তং আত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ।’

‘সর্কশরীর সংখ্যানপ্রমাণজ্ঞান হেতো-
র্ভগবন্তমাত্রেয়ং অগ্নিবেশঃ পপ্রচ্ছ। তসু-
বাচ ভগবান্নাত্রেয়ঃ শৃণুমন্তৌহগ্নিবেশ **’

চরকে।

এবংবিধ বহুপ্রয়োগ চরকসংহিতায় ইত-
স্ততোবিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সূত্ররূপে পুন-
র্কর্ষ ও আত্রেয়ের একত্ব ও ভরদ্বাজের বি-
ভিন্নত্ব সম্বন্ধে কোনও সংশয় তির্য্যিক্তে পা-
রেনা। তবে আসুর্বেদপারদৃষ্টা শিবদাস
যে কেন প্রাগুক্তরূপ ভ্রমাত্মক টীকা লি-
খিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় বড় ক-
ঠিন হইবে না। যিনি আমাদের দেশের
হস্তলিখিত প্রাচীনগ্রন্থ পাঁচ সাত খানা
পড়িয়াছেন তাঁহাকে এবিষয়ে আর বোধ
হয় বলিয়া দিতে হইবেকনা। ‘তিন নকলে
আসল খাস্তা’ একথা বোধ হয় অনেকের
শুনিয়া থাকিবেন; আমাদের বোধ হয়
কোন প্রাচীন লেখক লিখিতে লিখিতে
তান্ত্র বা উন্নয়ন হইয়া ‘পুনর্কর্ষরাত্রেয়ঃ’
স্থানে ‘পুনর্কর্ষঃ ভরদ্বাজ’ লিখিয়া ফে-
লিয়াছেন; অথবা যিনি বক্তা তিনিই আ-
ত্রেয় স্থলে ভরদ্বাজ বলিয়া লেখককে ভ্রম-
প্রণোদিত করিয়াছেন। কেহ মনে করিতে
পারেন যে ইহা শিবদাসের ভুল না বলিয়া
কেন আমরা এরূপ কষ্টকল্পনা করি-
তেছি; তদ্বত্তরে এইমাত্র বলিতে পারি যে

সত্য বটে 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ'; তথাপি এস্থলে শিবদাসের ভ্রম হওয়া অপেক্ষা লিপিকরদিগের ভ্রম হওয়াই অধিক সম্ভবপর।

ভগবান্ আত্রেয় ও শ্বশুরির ন্যায় একখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। কিন্তু বাঙ্গালাতে এই গ্রন্থ অতীব দুস্থাপ্য। পশ্চিম ভারতবর্ষে বোম্বাই অঞ্চলের সেনেউ * দিগের এই পুস্তকই চিকিৎসা ব্যবসায়ের প্রধান অবলম্বন। এই গ্রন্থ ছয় পুস্তকে বিভক্ত ও পনের শত শ্লোকায়ক। প্রত্যেক পুস্তক আবার কএক অধ্যায়ে বিভক্ত; অধ্যায়সংখ্যা সকলপুস্তকে সমান নহে। ভগবান্ আত্রেয়, এই গ্রন্থে জল, বায়ু, ঋতু, বয়স ও প্রকৃতির সহিত মানব শরীরের সম্বন্ধ ও ক্রিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। জল, দুগ্ধ, ইক্ষুরগ প্রভৃতি দ্রব্যদ্রব্যের গুণাগুণ ও নানা প্রকার ঔষধিতত্ত্ব

* 'সেনেউ বোম্বাই অঞ্চলের বৈদ্যদিগের উপাধি আচার ব্যবহার প্রায়ই ব্রাহ্মণবৎ'। কিন্তু তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ ইহাদের সহিত আদান প্রদান করেন না, অথচ এক পাকিতে আহারাদি করেন। বোধ হয়, ইহার! সেনবংশীয় বৈদ্য হইবেন।

ধর্ম ও বহুবিধ অরিফের ক্রিয়া ও উপযোগিতা অভিসংক্ষেপে অথচ সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপরে চিকিৎসা প্রণালীর উপদেশ দিয়া সর্বশেষে ঔষধি বিশেষের প্রতিক্রিয়ার উপায় (Antidotes) নির্দেশ করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। বাস্তবিক ইহাকে 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' নাম দেওয়া বাইতে পারে।

ভরদ্বাজরূত কোন সংহিতা ছিল কি না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, থাকিলেও সম্ভ্রান্তি লুপ্ত হইয়াছে। ভরদ্বাজ ইন্দ্র হইতে আয়ুর্বেদ লাভ করেন এরূপ প্রথিত আছে। তিনিই আত্রেয়কে এই শাস্ত্রে উপদেশ দিয়া ব্রাহ্মণসমাজে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের মূল কারণ হইলেন। এই ভরদ্বাজ এবং কাব্য ও নাট্যশাস্ত্রসংহিতাকার ভরদ্বাজ, একই ব্যক্তি কি না নিশ্চয় করিবার কোনও উপকরণ নাই। যদি নাট্যকাভিনয়ের উপদেষ্টা ভরদ্বাজ বাল্মীকির সমসাময়িক হন, তবে ইহাদিগকে পৃথক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ আয়ুর্বেদোপদেষ্টা ভরদ্বাজ মনুর স্মৃতিরও বাল্মীকির অনেক পূর্ববর্তী।

ভালমানুষ।

(পূর্ন প্রকাশিতের পর)

গতবারে দেখান হইয়াছে যে, স্বার্থ-
তাগি ও প্রলোভন-জয় যে 'ভাল-মানু-
ষের' ব্রত, সেরূপ ভাল-মানুষ সংসারে
থাকিয়া হওয়া যায় না। কিন্তু ইহা স্বী-
কার করিলেই একরূপ বলা হইল না যে সং-
সার-ত্যাগে ভাল-মানুষ হওয়া যায়। সং-
সার-ত্যাগে ভাল-মানুষ হওয়া যায় কিনা
তাঁহা একটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন। আমরা নিম্নে
এই প্রশ্নের যথাসাধ্য মীমাংসা করিব।

এই প্রশ্নের মীমাংসা কালে, আমরা
শুদ্ধ যুক্তির উপর নির্ভর না করিয়া প্রধা-
নতঃ ইতিহাসের সাহায্য অর্থাৎ লক্ষন করিব।
পৃথিবীর অতি আদিম কাল হইতে আরম্ভ
করিয়া অন্য পর্য্যন্ত মনুষ্যেরা 'ভাল-মানুষ'
হইবার আশায় কখন বা একক, কখন বা
দলে দলে সংসার-ত্যাগ করিয়াছে। গ্রী-
সের সিনিক (Cynics) রোমের স্টোইক্
(Stoics) ইউরোপের ভিক্কু পাঞ্জী এবং
সর্বশেষে ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী, যতী, ভিক্কু
প্রভৃতি এইরূপ সংসারত্যাগীর দৃষ্টান্ত।
ইহাদের সংসার-ত্যাগে কি ফল হইয়াছিল
বা হইতেছে আমরা নিম্নে তাঁহার আলো-
চনা করিব।

১ মতঃ ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের
হর্ষা কর্তা বিধাতা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। এই
ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় একরূপ সংসার-ত্যাগী।
ইহকালের সুখ দুঃখ ক্ষণস্থায়ী। এস-
কল বিস্মৃত হইয়া পরকালের উপায় কর,
ইহাই ভারতবর্ষের প্রধানতম শিক্ষা।
আজি যে এই পাশ্চাত্য শ্রোত এত প্রবল
হইয়া বহমান হইতেছে, আজি যে এই ধর্ম-
সংস্কার নব-বাজলার এক প্রকার বিলুপ্ত
প্রায় হইয়া উঠিতেছে, ইহার মধ্যেও সাংসা-
রিক সুখ দুঃখে অবহেলা দেখিতে পাওয়া
যায়। সাংসারিক সুখ দুঃখ ক্ষণ-বিধ্বংশী।
এই উপদেশ ভারত-বর্ষের আবার স্বদেশের
হাড়ে হাড়ে বিধিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং
সংসার-ত্যাগীর অনুসন্ধান করিতে হইলে
সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি পড়ে।
কিন্তু ভারত-বর্ষের ইতিহাস নাই। সু-
তরাং ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত কেহ শুনিবে না।
নতুবা দেখাইতাম যে, তপশ্চরণশীল, গ-
লিতপত্রভোজী, গ্রীষ্মে 'পঞ্চতপকারী'
শীতে তরাগ-বাসী মুনি ঋষিরাও স্বর্গবে-
শ্যার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত তপ যপ
ত্যাগ করিতেন। নতুবা দেখাইতাম যে,

ভরত-রাজা রাজ্যশ্রদ্ধা ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিতে করিতে এক যুগ-শিশুতে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। নতুবা দেখাইতাম যে দুর্কীর্মা, বিশ্বামিত্র, অষ্টাবক্র প্রভৃতি ঋষিরা সর্বভ্যাগী হইয়াও রিপুঞ্জয়ে অসমর্থ ছিলেন। নতুবা দেখাইতাম যে, 'রক্তমাংসের' শরীর বনে গেলেও অল্প বা অধিক পরিমাণে 'রক্তমাংসের' প্রত্যাব দেখাইয়া থাকে।

কিন্তু আমরা ইউরোপের দাস। ইউরোপের পোষাক না হইলে পরিধান করিতে ইচ্ছা করে না, ইউরোপের খাদ্য না হইলে খাইতে ইচ্ছা করে না, লেখার যথোপকরণের চহ্ (Idioms) না থাকিলে পড়িতে ইচ্ছা করে না। আর, ইউরোপ সভ্যতার আকর, জ্ঞান বুদ্ধির রত্নভূমি। ইউরোপ উন্নতি-শ্রোতের নিয়ন্ত্রা। ইউরোপ ছাড়িয়া দরিদ্র, পদানত, অর্ধসভ্য ভারতবর্ষের কথা শুনিবে কে ?

ইউরোপে সর্ব প্রথম গ্রীসদেশে সভ্যতার আলোক প্রভাসিত হয়। বহুদিন ধরিয়া জগতের আদি অন্ত প্রভৃতি তত্ত্ব গ্রীসে পর্য্যালোচিত হয়। পরে সক্রোতিসের সময় হইতেই গ্রীসের অবনতির ও সূত্রপাত আরম্ভ হয়। গ্রীস ক্রমশঃই হতবল হইয়া এক শত্রুর পর অন্য শত্রুদ্বারা পদদলিত হইতে থাকে। গ্রীসের বলহানির সঙ্গে সঙ্গেই মানসিক ও নৈতিক অবনতি দেখিতে পাওয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে আলেকজান্ডারের আবির্ভাবের

প্রায় বিংশতি বর্ষের পূর্বে গ্রীসের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠে। ধর্ম বিশ্বাস গুণানুলোচনার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের মন হইতে দূরীভূত হইতেছিল ; নৈতিক শাসন প্রায় কিছুই ছিল না। এই সময়েই আবার এপিকিউরিয়ানেরা (Epicureans) শিক্ষা দিল 'Eat, drink & be merry' 'হেসে খেলে কাল কাটাও, মন, মনের সুখে। বহুদিন হইতেই গ্রীসবাসীরা ভোগবিলাসী হইতেছিল। এপিকিউরিয়ানদের নীতি-উপদেশে ভোগ-বিলাসের শিক্ষা আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। গ্রীসবাসীরা বিমুক্তরজ্জু বলীবর্দ্ধের ন্যায় পাপের পথে অপ্রতীহত বেগে চলিতে লাগিল।

এই সময়ে জিনো (Zeno) নামে এক মহাত্মা গ্রীসে আবির্ভূত হইলেন। তিনি গ্রীসকে পুনরায় নীতির পথে ও ধর্মের পথে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সংসারে থাকিয়া নীতি-শিক্ষা হয় না; স্তরাতঃ জিনো শিক্ষা দিলেন—'সাংসারিক বিপদে অভিবৃত্ত হইও না; সাংসারিক সম্পদে অভিমান করিও না; এই যে সমস্ত সাংসারিক ঐশ্বর্য দেখিতেছ এ সমস্ত বাজিকরের খেলা, সমস্ত নাট্যশালায় অভিনয়। এ সমস্তে চিত্ত নিয়োজিত করিও না। নৈতিক উন্নতি মনুষ্য জীবনের প্রধান লক্ষ্য। বাহ্যতে সেই লক্ষ্য সূচকরূপে সংসাধিত হয় সেই চেষ্টা কর; সংসারে থাকিতে চাও থাক কিন্তু সংসারী হইও না; কারণ

সংসারী হইলে রিপু-জয় করিতে পারিবে না।' খ্রীস এ উপদেশ শুনিল। (কারণ উপদেশ-দাতার অভাব কোথায়? এই যে ভারতবর্ষ এত অবনত, ইহাতেই কি উপদেশ-দাতার অভাব আছে? শ্রীশ্রী গ্রেগোরি নং-ক্ষিপ্ত সমালোচক জানেন যে এ অভাব ভারতবর্ষে—বাল্যকাল—অতি অল্প) কিন্তু খ্রীসের তখন উদ্বেগ-দশা উপস্থিত। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' গোবিন্দলালের ন্যায় খ্রীসবাসীরা ক্রমশঃই পাপের পথে অগ্রসর হইতেছিল। পাপী কবে ধর্মের কাহিনী শুনিয়াছে? স্ত্রীনাথ জিনোর মত খ্রীস ছাড়িয়া রোমে বাইরা আসিয়া লইল। তখন রোম উন্নতির অভিমুখে নব অনুরাগের সহিত ধাবমান। রোম শনিবা মাত্রই, জিনোর মতকে আদরের সহিত স্বদেশে স্থান দিল। ক্রমে রোমীয় প্রধান লোকেরা সকলেই জিনোর মত অবলম্বন করিল।

জিনোর মত রোমে কিছুকাল রাজত্ব করিল বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা মনুষ্যের উন্নতি অতি অল্পমাত্রই সংসাধিত হইল। মনুষ্য তাহার মনুষ্য ছাড়িতে পারিল না। দেবতা হইবার আশয়ে কিছুকাল অসাধারণ পরিশ্রম ও মনঃকষ্ট স্বীকার করিয়া মনুষ্য পূর্বের ন্যায় রিপুর অধীন হইতে লাগিল। সন্ন্যাস ও তাঁহার চির-বিশ্বস্ত পরিচারকেরা পুনরায় মনুষ্য-মনে স্বরাজ্য সংস্থাপন করিল। বামন কিছুকাল শ্রীশ্রীশক্তা ফলের আশয়ে বস্ত্র ও পরিশ্রম করিয়া পুনরায় যক্তি অবলম্বনে সা-

ধারণ ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল। মনুষ্য ভাল মানুষ হইতে পারিল না বটে, কিন্তু ভাল মানুষ হইবার আশা তাহার হৃদয় হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইল না। মনুষ্য বুঝিল যে শুদ্ধ সংসার-তাগে ভাল মানুষ হওয়া যায় না। ভাল মানুষ হইবার আশায় মনুষ্য আর একবার সংসার ত্যাগ করিল। কিন্তু এবার শুদ্ধ সংসার ত্যাগের উপর নির্ভর না করিয়া মনুষ্য জগদীশ্বরের সাহায্য অবলম্বন করিল। সংসার ত্যাগ করিব এবং সংসার ত্যাগ করিয়া মহান প্রেমপূর্ণ ঈশ্বরের পদাবলুণ্ঠিত হইব, ভাল-মানুষ-লোভীরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইল।

ইউরোপে যাঁহারা পূর্বোক্তরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসার হইতে বিদায় লন, খ্রীষ্টিয় ভিক্কু পাত্রী (Pater) তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। সাংসারিক চিন্তা-সমূহের মধ্যে দুইটি প্রধান। প্রথম অন্নচিন্তা, দ্বিতীয় পরিবার-প্রতিপালন। খ্রীষ্টিয় পাত্রী, পরিশ্রমের দোহাই দিয়া, সমাজ হইতে অন্নের যোগাড় করিয়া লইলেন। দ্বিতীয় চিন্তাও খ্রীষ্টিয় পাত্রীর ছিল না। কারণ খ্রীষ্টিয় পাত্রী দারস্থন্য। বিষয় স্পৃহা একবারে ত্যাগ করিবার জন্য খ্রীষ্টিয় পাত্রী আর এক উপায় অবলম্বন করিল। সে শিক্ষা দিল যে একজনকে পাপ অন্তঃকরণে হরণ করিতে পারে। কিন্তু এইরূপ পাপ হরণের ক্ষমতা সকলের নাই। যাঁহারা সংসারত্যাগী ও অলোভী, শুদ্ধ তাঁহারা

এই ক্ষমতা লইতে পারিতেন। সুতরাং সংসারভ্যাগী খ্রীষ্টীয় পাদ্রীর হই মহৎ উদ্দেশ্য ছিল।

এম। ভাল মানুষ হইয়া নিজের মুক্তি সাধন। অলোভী হইবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা আমাদের উচিত, খ্রীষ্টীয় পাদ্রীর সে সমস্ত ছিল। তিনি অন্যের অর্থে প্রতিপালিত। তিনি গৃহ-শূন্য, জাতিশূন্য ও সমাজশূন্য। সংসার-ভ্যাগে বিতৃষ্ণতা উৎপাদন করিবার জন্য খ্রীষ্টীয় পাদ্রী অন্য অন্য অনেক উপায় অবলম্বন করিয়াছিল।

কিন্তু এ সকল করিয়াও খ্রীষ্টীয় পাদ্রী ভাল মানুষ হইতে পারিয়াছিল কি? উদ্দেশ্য মহৎ, উপায় অমোঘ, কিন্তু কার্য উদ্দেশ্য ও উপায়ের অনুযায়ী হইয়াছিল কি? ষাঁহার Froude's History of England পড়িয়াছেন, তাঁহার জানেন যে অনেক-স্থলেই খ্রীষ্টীয়পাদ্রীর নৈতিক উন্নতি অতি যৎসামান্য হইয়াছিল। ষাঁহার Confessions of Maria Monk পড়িয়াছেন, তাঁহার জানেন মঠধারী খ্রীষ্টীয় পাদ্রীর তাড়কেশ্বরের মোহন্ত ও তাঁহার অনুচরবর্গ হইতে পাপাচরণে অধিক বড় ছিলেন না।

যদি সংসার ভ্যাগ করিয়া কাহারও ভাল-মানুষ হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে তাহা এ পাদ্রীদের ছিল। বাহির হইতে দেখিতে খ্রীষ্টীয় পাদ্রীর জীবন অ-তীব 'রমণীর। মাসে মাসে, দিনে দিনে, ক্রমে ক্রমে, খ্রীষ্টীয় পাদ্রীরা নব নব ধর্মা-

লোচনা আবিষ্কার করিত। জন্ম, মৃত্যু, সমাধি প্রভৃতি নিত্য কার্য সমূহে নব নব ধর্মপ্রণালী প্রদর্শিত হইত। এতস্ত্রিম, রো-গীর শুক্রাধা, আর্জের সহায়তা, দরিদ্রের অর্থানুকূল্য, যুযুর্ষুর সাস্থনা, পীড়িতের সেবা প্রভৃতি কার্য কাথলিক পাদ্রীর নি-তাত্রত ছিল। কিন্তু এ সকল উদ্দেশ্য, এবং এ সকল উপায় এত মহৎ ও এত প্রবল হইলেও পাদ্রীরা নৈতিক উন্নতির পথে অতি অস্পন্দ্র মাত্রই অগ্রসর হইয়াছিল। Burns(বার্নস) এক প্রকার আল্লাদের সহিত বলিয়াছেন 'A man is a man for all that' আমরা আক্ষেপের সহিত বলি—'A man is a man for all that'*.

পূর্বে এক প্রকার দেখান হইল যে সংসার ছাড়িলেও ভাল-মানুষ হওয়া যায় না। তবে কি স্থির করিতে হইবে যে মনুষ্য কোন অবস্থাতেই ভাল-মানুষ হইতে পারে না। এই মহামুলা তত্ত্ব দেখাইবার জন্যই কি হাবড়ছাটি লিখিয়া নিজের ও পাঠকের শিরঃপীড়া উৎপাদন করিতে ছিলাম? যদি শুদ্ধ এই মাত্রই আমার উদ্দেশ্য হয়, যদি বীভৎস মানব-চরিত্রে আর একটি কলঙ্ক দেখান আমার অভি-প্রেত হয়, তাহা হইলে এ প্রস্তাব না লি-খিলেই ভাল হইত। 'আমরা কখন ভাল মানুষ হইতে পারি না,' ইহা সত্য হ-ইলে হইতে পারে। কিন্তু ইহা কাহাকেও

* সমস্ত (সম্পদ, বুদ্ধি, সৌন্দর্য্য) স-
ভেও মনুষ্য মনুষ্য-মাত্র

যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া শিখাইবার প্রয়ো-
জন নাই। তবে আমার উদ্দেশ্য এই
যমুযা যদি ভাল-মানুষ্য রূপ আকাশকু-
সুমের অনুসন্ধান না করিয়া যত্ন ও পরি-
শ্রম সহকারে মানসিক প্রকৃতি, ও তদ-
নুযায়ী চরিত্র গঠনের আলোচনার চিত্ত

নিয়োজিত করে, যদি সকলেই এক প্রকা-
রের ভাল-মানুষ হইবার চেষ্টা না করিয়া
নিজই প্রকৃতি অনুসারে ভাল-মানুষ্য অ-
র্জন করিতে ইচ্ছা করে, তাহাই হলেও অনেক
মনস্তাপ, অনেক মর্খভেদী যাতনা, অনেক
সাংসারিক অকুশল পৃথিবীহইতে দূরীভূত হয়।

প্রাণিজগতের ইতিহাস ।

প্রাণিরাস্ত্র প্রকৃতি জগতের এক
অত্যশ্চর্য উপন্যাস, এবং বিজ্ঞান-
ভাণ্ডারের এক অতুল সম্পত্তি। প্রকৃ-
তির আদি নাই, অন্ত নাই, এবং চিন্তার
অতি প্রশস্ত ক্ষেত্রেও ইহার যথেষ্ট স্থান
নাই। এই যে অনন্ত সমুদ্র, অনন্তের তু-
লনার জন্য কবি-কল্পনার এক মাত্র উপ-
মান, ইহাও প্রকৃতি-জগতের একটি যৎ-
সামান্য অংশ মাত্র; কে তবে ইহার ইয়ত্তা
করিবে, অথচ এই বিশাল দৃশ্য সম্মুখে
রাখিয়া কেই বা অজ্ঞের ন্যায় চক্ষু মুদ্রিয়া
রহিবে? মনুষ্যের গবেষণার জন্য ইহা
হইতে প্রশস্ততর ক্ষেত্র আর নাই—মনুষ্যের
তৃপ্তির জন্য ইহা হইতে অধিকতর উপা-
দের সামগ্ৰীও কল্পাপি সম্ভবে না। যা-
হারা নিভৃতকক্ষের অপবিত্র বায়ু সেবনে
ছৎপীড়ায় কাতর হইয়া নৈসর্গিক বায়ু
সেবন করিতে অভিলষী হয়েন, যাহারা
নিরবচ্ছিন্ন শাস্তিনিকুঞ্জে ভ্রমণ করিতে ক-
রিতে স্মৃষ্কিষ্ট হইয়া স্বভাবের বৈচিত্র্য দে-
খিতে চাহেন, এবং যাহারা কবিকল্পনার

তরল আমোদে পরিভূপ্তি উপভোগ না
করিয়া প্রকৃতির রমা উপবনে ভ্রমণ ক-
রিতে সুখানুভব করেন, উল্লিখিত প্রকৃতি-
তত্ত্বের পর্যালোচনা অপেক্ষা তাঁহাদের সু-
খের ও আশার মহত্তর কোন সামগ্ৰী থা-
কিতে পারেনা। এ তত্ত্ব সহজ নহে ও সা-
মান্য নহে এবং মনুষ্যের ক্ষণব্যাপি জীব-
নও ইহার গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত নহে।
সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতির বিভাগানু-
সারে আপনাদের কার্যেরও বিভাগ ক-
রিয়া নিয়াছেন। প্রকৃতি দুইভাগে বিভক্ত,
চেতন ও অচেতন। এই চেতন আবার
প্রাণী ও উদ্ভিদ এই শ্রেণীরয়ে অংশীকৃত।
পূর্বেকৃত শ্রেণীর সৃষ্টি ও স্থিতির মূলানু-
সন্ধানের নামই প্রাণিতত্ত্ব। যাহারা জড়
জগতের নির্জীবতায় কোনরূপ আমোদ
অনুভব করেন না, উচ্চীরমান ও উৎসব-
মান প্রাণিরূপের প্রকৃতি অবগত হইতে
তাঁহাদেরও কোঁতুহল জন্মে। এই বিস্তীর্ণ
জগত অসংখ্য প্রাণিমণ্ডলের আवास-স্থল।
এমন স্রচাণে পরিমিত ভূমি স্পর্শ করিতে

পাইবে না, এমন জলবিন্দু দৃষ্টিগোচর হইবে না, বাহাতে রুহৎ কি ক্ষুদ্র কোমরূপ প্রাণী বিদ্যমান নাই। আবার ইহার প্রত্যেকটি প্রাণী এক একটি স্বতন্ত্র প্রাণী-জগত,—প্রত্যেক প্রাণীর শরীরে শত শত প্রাণী, আবার তাহার শরীরে অসংখ্য প্রাণী, এবং এই অভ্যন্তরের অভ্যন্তরস্থিত প্রাণীর শরীরে আবার প্রাণী! অনুবীক্ষণ দ্বারা তোমার লোমকূপ পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে, শত শত প্রাণী উহাতে বিচরণ করিতেছে। অগ্নি যে সর্ব্বভুক, এবং প্রাণিসংহারের সাক্ষাৎ অবতার, তথাচ ইহা প্রাণিষ্ঠান্য নহে। পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, জল ও স্থলের জন্য যেরূপ বিশেষ বিশেষ জাতির প্রাণী রহিয়াছে, অগ্নির জন্যও সেইরূপ এক বিশেষ জাতীয় প্রাণী আছে। কোন স্থানে অধিকক্ষণ অগ্নি জ্বালিয়া রাখিলেই এই প্রাণীর সৃষ্টি হয়, এবং ইতস্ততঃ ইহাদিগকে বিচরণ করিতে দেখা যায়। স্থূলাদপি স্থূ স হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এই অসংখ্য জীবমণ্ডলের শ্রেণী-বিভাগপূর্ব্বক ইহাদিগকে বৈজ্ঞানিকমূহুরে প্রণিত করাই প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এইক্ষণে পাঠকবর্গের সমীপে যাহা উপহার প্রেরণ করিতেছি, তৎসম্পর্কে কএকটি কথা বলিয়া আমরা এই অনুক্রম-ণিকার উপসংহার করিব। বাজালা ডা-

য়ার বিজ্ঞান লিখিতে যাওয়া এক দুর্কহ ব্যাপার। আত্মতত্ত্বদর্শী এবং অধ্যাত্মসুখবিলাসী আধ্যাত্মবিগণ অন্তর্জগতের অভ্যন্তর নিহিত নিগূঢ়তত্ত্ব ছাড়িয়া বহির্জগতের রঙ্গভূমিতে কখনও প্রবেশ করেন নাই; সুতরাং ভারতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রচলন ছিল না। এবং ভারতে ছিলনা বলিয়াই বাজালায়ও এপর্যন্ত ইহার অভ্যাস হয় নাই। অন্যান্য বিজ্ঞান সম্পর্কে যে কথা, প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধেও সেই কথা। যদিও এই বিষয়ে দুই এক খানি সামান্য আকারের গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সকলই ইংরাজি হইতে অনুবাদিত এবং আমরাদিগের বিবেচনায় পাঠশালার বালকদিগের জন্য লিখিত। বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ লিখিতে হইলে, বিশেষ কোন পুস্তক অধ্যয়ন না করিয়া বিজ্ঞানের মূল প্রভবণ অধ্যয়ন করিতে হয়। আমি যথাসাধ্য এই পন্থা অবলম্বন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। কিন্তু প্রাণিতত্ত্ব যেরূপ অমস্ত সমুদ্র, তাহাতে ইহা সত্তরণ করিতে যাইয়া কতদূর কৃতকার্য হই বলিতে পারি না। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকমূহুর অবলম্বন না করিয়া কেবল কতকগুলি প্রাণীর ইতিহাস সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশা সফল হইলে, ইহাদের শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিবেশিত করিয়া, বিজ্ঞানের শৃঙ্খলার সহিত ইহাদিগকে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল



ভূমণ্ডলে হস্তীই সর্বাধিক বৃহৎ জন্তু, এবং বহুকাল হইতে মানবজগতে বিশিষ্ট-রূপে পরিচিত। যদি ষতসহস্র বৎসরের পুরাতন হিন্দুশাস্ত্র পাঠ কর, তবে সেখানেও প্রমাণ পাইবে যে এই জন্তু দীর্ঘকাল হইতেই মানুষের ব্যবহারে আনীত হইয়াছে। ষাণ্ময়ুগে কুকপাণ্ডবদিগের যুদ্ধাদির সময়ও হস্তীর ব্যবহারের সবিশেষ প্রমাণ পরিলক্ষিত হইবে। ব্রেতাযুগের রামায়ণাদি গ্রন্থেও অনেক স্থানে হস্তীর বিবরণ উল্লিখিত রহিয়াছে। এবং এতদপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদাদিতেও হস্তী সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। অতএব আমরা এই সমস্ত কারণে, এই প্রাচীন এবং প্রকাণ্ড জন্তুর ইতিহাস সর্বপ্রথমে লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

ইহাদের বন্যস্বভাব, গৃহাগত হইলে স্বভাবের বৈপরীত্য এবং আধুনিক যে যে প্রণালীতে উহাদিগকে আবদ্ধ করা যায়, তাহার সমস্ত বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইল।

হস্তী-শরীরের উচ্চতা সাধারণতঃ ৭ ফিট হইতে ১২ ফিট পর্যন্ত, কিন্তু ৯।১০ ফিটের অধিক উচ্চ হস্তী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদিগের ৪টি পাই

পাই হইতে পাছের পাগুলি কিছু খর্ব। সম্মুখের পায়ে পাঁচ পাঁচটি করিয়া দশটি নখ এবং পাছের দুই পায়ে ৪টি করিয়া ৮টি নখ। কিন্তু সমুদয় নখগুলি সমান অবয়ববিশিষ্ট নহে। মধ্যের গুলি কিছু বড় এবং অন্যান্যগুলি ক্রমশঃ ছোট হইয়া গিয়াছে।

ইংরাজী বহুবিধ প্রাণিবৃত্তান্তে দেখা যায় হস্তীর চারিটি পায়ের প্রত্যেক পায়ে পাঁচটি করিয়া অঙ্গুলি থাকে। বাঙ্গলাভাষায় যে কএকখানি সামান্য আকারের প্রাণি-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও ঐরূপ লিখিত। কিন্তু আমরা বহু হস্তী পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কোন হস্তীরই ১৮টি নখের অধিক পাইলাম না। সুতরাং অনোর কথার উপর নির্ভর না করিয়া স্বেচ্ছক বাহা দেখিয়াছি, তাহাই স্বাধিক বিবৃত করিলাম। আমি শুনিয়াছি, কদাচিত কোন হস্তীর বিশটি নখ দেখা যায়।

হস্তীর শরীরের বর্ণ গাঢ় ধূসর ; যতই ইহাদিগের বয়োরুদ্ধি হইতে থাকে, ততই কপালের এবং কর্ণের অপর পৃষ্ঠের চর্খগুলি বিন্দু বিন্দু করিয়া শুভ্র বর্ণ হইয়া যায়। এবং কোন কোন হস্তীর এই সমস্ত

স্থান এত অধিক ধ্বলবর্ণ হয় যে, যখন তাহার উপর কোমরূপ ময়লা পড়িয়া থাকে, তখন সেই চৰ্ম হস্তীর এক শরীরের চৰ্ম বলিয়াই অস্বীকৃত হয় না । দূর হইতে এইরূপ হস্তীগুলিকে বড় স্তম্ভের দেখায় ।

হস্তীর লাজুল প্রায় ৩ফিট দীর্ঘ ও নিম্ন-গামী; উহার অগ্রভাগে একগোছা মোটা চুল সন্নিবিষ্ট আছে, কিন্তু তাহা লাজুলের চতুর্দিক জড়াইয়া নহে, দুই পাশেই । এই কারণেই স্থলদৃষ্টিতে লাজুলের অগ্রভাগটি চেপ্টা বলিয়া বোধ হয় । শরীরের অন্যান্য স্থানও মোটা মোটা লোম দ্বারা আবৃত । কিন্তু সেইগুলি এত দূর-সন্নিবিষ্ট যে, নিকট হইতে না দেখিলে ভাল করিয়া দেখা যায় না । ইহাদের শরীরের বর্ণের সঙ্গে চুলের বর্ণ একেবারে মিলিয়া গিয়াছে, সুতরাং বোধ করি চুলগুলি লক্ষিত না হইবার ইহাও একটি কারণ । মাথার উপরে যে সমস্ত চুল আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত ঘন ও দীর্ঘ এবং স্থল-দৃষ্টিতেই দৃশ্যমান ।

হস্তীর মস্তকের গঠন অতি আশ্চর্য্য । ইহা দুই ভাগে বিভক্ত । দুইটি কুন্ত একত্র করিয়া উল্টাইয়া রাখিলে উহাদের উপরিভাগ বেরূপ দেখা যায়, হস্তীর মাথার উপরও ঠিক সেইরূপ । এইজন্য প্রাচীন কবিরা উহাদিগকে করিকুন্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন । প্রকৃত পক্ষে দুইটি স্নগোল বস্তুর উপরে কাপড় দিয়া কসিয়া ধরিলে, উহার উপরিভাগ বেরূপ দেখায়, হস্তীর মাথার উপরিভাগও ঠিক সেইরূপ ।

কপালের মধ্যস্থানে গোল একটি উচ্চ স্থান আছে, উহাকে ইন্দোনীস্ট্রন হস্তীরক্ষকেরা ' পিতোয়ান ' কহে । (বাঙ্গালার ইহার আর কোম প্রতিশব্দ নাই, এই শব্দটিই বেশ প্রচলিত) । এই স্থান হইতে শুণু নামক হস্তীশরীরের একটি আশ্চর্য্য প্রত্যঙ্গ বাহির হইয়াছে । হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেম উহা হস্তীর অন্তর্ভাবিক অতিরিক্ত একটি প্রত্যঙ্গ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে । স্বল্পরূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ শুণু মুখের উপরিস্থ ঠোঁট এবং নাসিকার অত্যশ্চর্য্য অপরিমিত বর্জিতাংশ । হস্তীর স্বল্পদেশ অত্যন্ত ধর্ম্ম; সুতরাং সম্মুখ ব্যতিরেকে অন্য কোম দিকে একেবারে সর্বশরীর না ফিরাইয়া কিছুই অবলোকন করিতে পারে না । এবং ঐ কারণে অন্যান্য পশুর ন্যায় ঘাড় নোয়াইয়া মৃত্তিকা হইতে আহাৰ্য্য বস্তু তুলিয়া লইতেও ইহার ক্ষম । কিন্তু এই সমস্ত অনুবিধা উহার একমাত্র শুণুই নিবারণ করিতেছে । হস্তী যখন লক্ষভাবে শুণু ছাড়িয়া দেয়, তখন শুণুর অগ্রভাগ মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াও অর্ধ হস্ত পরিমাণ ভূমিতে গড়াইয়া রহে, কিন্তু আবার বক্র করিয়া সংকোচন করিলে মৃত্তিকা হইতে প্রায় দুই হস্ত থাকে ।

শুণু ইহাদের পক্ষে যে কত উপকারী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, এমন কি উহা না থাকিলে কোম প্রকারে উহার

যে জীবনধারণ করিতে পারিত এমন স-
জীবনা ছিল না। হস্তী ইচ্ছামত শুণ্ডকে
এদিক সেদিক ঘুরাইতে পারে। এবং ইছা
ঘারা রক্তাদির শাখা ভাঙিতে, মৃত্তিকা
হইতে বাস তুলিয়া খাইতে এবং প্রয়োজন
হইলে শত্রু বিভাঙিত করিতে অক্লেশে স-
মর্থ হয়। শুণ্ডের অগ্রভাগে বাহিরের
দিকের মধ্যস্থলে, অঙ্গুলির ন্যায় প্রয়ো-
জনসাধক একটি সূক্ষ্মাগ্রভাগবিশিষ্ট
বর্দ্ধিত চর্ম আছে। উহা ঘারা অতি সূক্ষ্ম
বস্ত, এমন কি সিকি আধুলি প্রভৃতি ও
অতি সহজে উঠাইয়া লইতে পারে। শুণ্ড
যখন নাসিকা ও উপরিস্থ ওষ্ঠের বর্দ্ধিতাংশ
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তখন নাসারন্ধ্র
ও যে উহার মধ্য দিয়া মস্তিষ্ক স্পর্শ করি-
য়াছে, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে
না। জলপান করিবার সময়েও ইছারা
শুণ্ডঘারা জলপান করিয়া থাকে। জলের
মধ্যে শুণ্ডের অগ্রভাগ প্রবেশ করাইয়া
দিয়া জল আকর্ষণ পূর্ব্বক শুণ্ডকে বাঁকা-
ইয়া নিম্না মুখের মধ্যে জল ছাড়িয়া দেয়,
এবং যে পর্য্যন্ত পিপাসার নিবৃত্তি না হয়,
সেই পর্য্যন্ত এইরূপে জল আকর্ষণ করিয়া
নিম্না মুখের মধ্যে ছাড়িয়া দিতে থাকে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্যবীজ (ধান চিনা প্রভৃতি)
খাইতে হইলেও ঐরূপ শুণ্ডঘারা আকর্ষণ
করিয়া মুখের ভিতরে ছাড়িয়া দেয়। শ-
রীরের কোন স্থান চুলকাইলেও শুণ্ড ঘারা
একখণ্ড কাষ্ঠধরিয়া শরীর চুলকাইয়া লয়।
বলিতে কি মনুষ্যোরা শরীর সম্পর্কে যে যে

কার্য্য হস্তঘারা সম্পাদন করে, হস্তী শুণ্ড
ঘারাই সেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া
থাকে। প্রাচীন কালের শব্দস্রষ্টা পণ্ডিত
মহাশয়েরা বোধ হয় করিশুণ্ডের এইরূপ
ব্যবহার দেখিয়াই উহার নাম 'কর' রা-
খিয়াছিলেন; ইদানীং ও মাতৃতেরা শুণ্ড-
কে হস্তীর হাত বলিয়া থাকে। হস্তীর শ-
রীরের আকার যেরূপ প্রকাণ্ড, চক্ষুর অব-
য়ব তেমনি আবার ক্ষুদ্র। ইছারা সর্বদাই
চক্ষুর জন্য ব্যতিব্যস্ত। কোনপ্রকারে চক্ষুর
মধ্যে ক্ষুদ্র কাটাাদি প্রবেশ করিতে না
পারে এজন্য ইছারা সর্বদা কর্ণকে বি-
লোড়ন করিয়া চক্ষু রক্ষা করিয়া থাকে।

হস্তীর কর্ণদ্বয় অত্যন্ত বৃহৎ, আকারে
প্রায় আমাদের দেশীয় শূর্পের ন্যায়।
ইছারা ইচ্ছামত ইছাকে সম্মুখে ও পশ্চা-
দিকে সঞ্চালন করিতে পারে।

হস্তীর নিম্নের ঠোঁট অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ইছা
শুণ্ডের শতাংশের একাংশ ও কার্য্যোপ-
যোগী নহে। উহার আকৃতি ইংরাজী,
V অক্ষরের ন্যায়। অর্থাৎ মাটির অর্ধহস্ত
পরিমিত প্রশস্ত স্থান হইতে দীর্ঘেও অর্ধ-
হস্ত পর্য্যন্ত ক্রমশঃ লক্ষ হইয়া নামিয়াছে।
আহার্য্য বস্ত্র মৃত্তিকার পাড়িতে না দেও-
রাই নিম্নঠোঁটের প্রধান কার্য্য। হস্তীর
জিহ্বা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও জুল। মুখহইতে
উছা বাহির হইতে পারে না এবং অন্যান্য
পশুর ন্যায় কোন বস্ত্র লেহন করিতে স-
ক্ষম হয় না। হস্তীর সম্মুখের কোন
পাটিতেই দন্ত নাই, কেবল মাত্র মাটীতে

দুই দিকের উপরে ও नीচে ছয়টা করিয়া পেশক দস্ত আছে। এই দস্ত বাতীতও পুং হস্তী গুলির শুণ্ডের দুইপাখি দিয়া অতি প্রকাণ্ড দুইটি দস্তের ন্যায় দুইটি বোল অস্থি নির্গত হয়। কোন কোন হস্তীর এই অস্থিগুলি ৭।৮ ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘ ও দেড় ফিট পর্য্যন্ত পরিধি বিশিষ্ট দেখা গিয়াছে। এই দুইটি হাড়কেই আমরা গজদস্ত বলিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই দুইটির সঙ্গে হস্তীর যথার্থ দস্তের কোন সম্পর্কই নাই। ইহা দস্ত হইলে অবশ্য মাটি হইতে নির্গত হইত, কিন্তু ইহার নির্গমন স্থল মাটি নহে। হস্তীর কপালের হাড় হইতে চক্ষুর নিম্নে এই অস্থি উৎপন্ন হয়; এবং শুণ্ডের ভিতর দিয়া একটি ছিত্র দ্বারা উহা বাহির হইয়া পড়ে। যদি কেহ ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে চাহেন, তবে একটি হাতীকে মুখ ব্যাদন করিয়া দেখিলেই সকল সন্দেহ দূর হইবে। এই বার আমরা হস্তীর করোটির আকৃতি প্রকাশ করিতে পারিলাম না, সম্ভবতঃ পাঠকসমীপে উপস্থিত হইলে, তখন হস্তীর দস্ত সম্বন্ধে স বিশেষ আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব। যাহা হউক এক্ষণে আমরা উহাকে গজদস্ত বলিয়াই উল্লেখ করিব। এই গজদস্তের বহির্ভাগ নিরেট এবং যে খানি চর্ম ও মাংসারত সেই খানিই শূন্যগত।

হস্তিনী গুলিরও মধ্যে মধ্যে এইরূপ দস্ত নির্গত হইয়া থাকে, কিন্তু উহা হস্তীর

দস্তের এক দশমাংশও স্থূল ও দীর্ঘ নহে। এবং সর্বদাই নিম্নমুখী।

হস্তিনী আঠার মাস গত ধারণ করিয়া এক কালে একটি মাত্র সন্তান প্রসব করে। হস্তিনীর বক্ষস্থলে দুইটি স্তন আছে, যে পর্য্যন্ত উহারা গর্তবতী না হয়, সেই পর্য্যন্ত উহাদের স্তনধর ভালরূপে দেখা যায় না। প্রসবকাল যতই নিকটবর্তী হয় স্তন-স্থূল ততই ক্ষীত হইতে থাকে। হাতীর দুই অতিশয় পাতল; কলেবরের সহিত তুলনায় স্তন স্থূলও অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

আমাদের আর্ষ্য ভাষায় হস্তিশাবকে করভ কহে। করভের শরীরের বর্ণ—ধূসরের উপরে একটুকু রক্তিমাত; মুখের মধ্যে এবং শুণ্ডের অগ্রভাগে জন্মকালের কিছুদিন পর পর্য্যন্ত মেটে সিন্দুরের ন্যায় লাল থাকে। প্রসবের অব্যবহিত পরেই করভেরা উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে, এবং মুখ দিয়া মাতৃদুগ্ধ চুষিয়া খায়। পূর্ণায়তন হস্তী যেমন শুণ্ডদ্বারা পানীয় আকর্ষণ করিয়া লয়, করভেরা সেইরূপ করে না; তাহারা তাহাদের মাতৃদুগ্ধ পান করিবার সময় শুণ্ডটি উর্দ্ধে উঠাইয়া অন্যান্য পশুর মত মাতৃস্তন মুখে লয়, এবং চুষিয়া চুষিয়া দুগ্ধ পান করে। করভগুলি সর্বদা উহাদের মাতার নিকটে নিকটে থাকে, মুহূর্তের জন্যও অনাত্র গমন করে না। রক্ত-গুলি জলে নামিবার সময়ও উহারা সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া সন্তরণ করে, এবং পরিপ্লাস্তু হইলে মাতৃপৃষ্ঠে ডর করিয়া বিজ্ঞান করে।

হস্তিজাতি অপরিগৌষ বলশালী। ব-
র্ত্তর লোক একত্র হইয়া যে বস্তু একটুকুও
নাড়িতে না পারে, হস্তী অবলীলাক্রমে
সেই বস্তু লইয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে এই
জগতে হস্তীর ন্যায় বলশালী অন্য কোন
জন্তু নাই বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। কিন্তু
ইহারা অত্যন্ত বলশালী হইলেও স্বভাবতঃ
ভীক এবং মৃদুল। এমন কি, কোন ক্ষুদ্র
প্রাণীর শব্দ শুনিলেই অমনি ভয়ে জড়সড়
হইয়া পলায়ন করে, এবং পলাইবার
সময়ে সম্মুখে প্রকাণ্ড বৃক্ষাদি থাকিলেও
ভালিয়া পথ করিয়া যায়।

হস্তী সর্বদা দলবদ্ধ থাকিতে ভাল-
বাসে। হস্তীর দলের মধ্যে কখন কখন
একশত হস্তীর অধিক ও দেখিতে পা-
ওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে একটির অ-
ধিক দুইটি পুংহস্তী সচরাচর দেখা যায়না।
পুংহস্তীগুলিকে সাধারণ ভাষায় 'গুণ্ডা'
বলিয়া থাকে। যদি অকস্মাৎ সেই দলে
অন্য একটি গুণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হয়,
তখন উভয়ের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধাঙ্গু হইয়া
থাকে, এবং সেই যুদ্ধে যে জয়লাভ করে,
সেই ঐ দলের দলপতি হইয়া পড়ে, এবং
অপরটি পলাইয়া যায়। দলের মধ্যে আরও
অপ্পবয়স্ক পুংহস্তী থাকে বটে, কিন্তু সেই
গুলির সঙ্গে বড়টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না।
এইরূপ অপ্পবয়স্ক পুংহস্তীগুলিকে, ইদানীং
মাজুতেরা পাঠাঠা কহে। গুণ্ডাগুলির প্র-
কাণ্ড দুইটি দস্ত আছে বলিয়াই হস্তীর ত-
থাবিধ বৃহৎ দল হইতে, প্রথম দৃষ্টিতেই

উহাদিগকে হস্তিনী হইতে পৃথক করিয়া
লওয়া যাইতে পারে। যদি উহাদিগের
এইরূপ দস্ত না থাকিত, তবে স্থূলদৃষ্টিতে
গুণ্ডাগুলিকে পৃথক করিয়া লওয়া যাইতনা।
পুংহস্তীর মধ্যে কোন কোন গুলির ঐরূপ
বৃহৎ দস্ত নির্গত হয় না, এই প্রকার পুং-
হস্তীগুলিকে 'মখনা' কহে। যে কা-
রণে কোন কোন পুরুষের দাড়ি গোপ
হয় না, সেই কারণে কোন কোন পুংহ-
স্তীরও দস্ত বাহিরে আইসে না। এই প্র-
কার পুংহস্তীগুলিও পূর্বোক্ত দলের মধ্যেই
যাতায়াত করে।

কোনরূপ ভয়ের কারণ হইলে অপ্পব-
য়স্ক এবং দুর্বল হস্তীগুলিকে মধ্যে রাখিয়া
সবলগুলি চতুর্দিক বেষ্টিত করিয়া থাকে।
স্থানান্তরে যাইবার সময়ও সবল গুলি
অগ্রপশ্চাৎ থাকিয়া দুর্বলগুলিকে মধ্যে
রাখে। হস্তীর গতি অতি মনোহর এবং
মৃদু। যখন স্বাধীনভাবে নিশ্চিন্তমনে গ-
মন করিতে থাকে, তখন প্রকৃতই বড় সুর-
ন্দর দেখায়। প্রাচীন কবিরী হস্তীর মন্থর
গমনের সঙ্গে রূপসী কুলকামিনীগণের
পাদচালনার তুলনা করিতেও কৃষ্ণিত
হন নাই। হস্তীর গমনের দুই তিনটি বড়
আশ্চর্য্য ব্রীতি আছে। প্রথমতঃ, একদল
একস্থান দিয়া চলিয়া গেলেও পায়ের বি-
শেষ কোন শব্দ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অগ্র-
বর্তী হস্তীটি যেখানে পদ নিক্ষেপ করিয়া
চলিয়া যাইবে, পশ্চাৎবর্তীগুলিও ঠিক সেই
স্থানে পাকেলিয়া চলিবে। স্তবরাং

বহুসংখ্যক হস্তী এক স্থান দিয়া চলিয়া গেলেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না দেখিলে একটি হস্তী ভিন্ন দুইটি হস্তীর পদচিহ্ন বলিয়া অনুমান করা যায় না। তৃতীয়তঃ, ইছারা কোন জঙ্গলান্তর স্থান দিয়া চলিয়া যাইবার সময় শূণ্ডের অগ্রভাগ দ্বারা পদ-নিষ্ক্ষেপোপযোগী স্থান স্পর্শ করিয়া লয়; যদি জানিতে পারে যে এই স্থানে পান ফেলিলে, পায়ে কোনরূপ আঘাত লাগিবে, কিংবা স্থান অত্যন্ত কৰ্দমাক্ত হইলে পান গাড়িয়া পড়িবে, তাহা হইলে আর কোন ক্রমেই সেই পথ দিয়া যাইবে না। হস্তী গুলি যখন স্বাভাবিক গতিতে চলিয়া যায় তখন তাহাদের সম্মুখের পান যেখানে পড়ে, পাছের পান ঠিক সেই স্থানেই নিক্ষেপ হয়।

হস্তীর ভীকতার কথা পূর্বে বলিয়াছি, এবং উছারানামান্যভয়েই যে পলাইয়া যায়, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি; আর একান্তই যদি পলাইবার কোন পথ না দেখে, তবে তাহারা সেই ভয়দর্শকের বিকক্ষে দণ্ডায়মান হয়। উছাদিগের আঘাত করিবার প্রধানতম অস্ত্রই দন্ত, এবং দন্তীগুলিই প্রথমে আসিয়া আক্রমণ করে। যদিও পান এবং শূঁড়ের দ্বারা হস্তিনীগুলি আঘাত করে, কিন্তু তাহা গুণ্ডাস্থের আঘাতের ন্যায় তত ভয়ানক নহে। দুইটি গুণ্ডার যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন দন্তই উছাদের প্রধান শস্ত্র। এতদ্ব্যতিত অন্য কোন সময়ে উছাদিগকে দন্ত ব্যবহার করিতে দেখা যায় না।

হস্তী-জাতির শরীরভাঙ্গুরে স্বভাবতঃ অধিক যাত্রায় বস। আছে, এই জন্যই উছারা অধিক কণ রৌদ্রের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। একটু উত্তপ্ত হইলেই জলে গিয়া সর্কশরীর ডুবাইয়া রাখে। হস্তি-জাতি অত্যন্ত মস্তুরণ-পটু। ক্রমাগত ২।৩ প্রহর কাল তেমন শ্রোতশব্দী নদীতে ও মস্তুরণ করিতে পারে। মস্তুরণের সময় উছাদের প্রায় সমস্ত শরীরই জলে ডুবিয়া রহে। কেবল পৃষ্ঠের উচ্চভাগ ও মস্তকের একটু অংশ জলের উপরে থাকে। আবার কখন কখন তাহাও দৃষ্টি-গোচর হয় না। শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়িতে হইলে এক এক বার শূণ্ডটিকে জলের উপর উঠাইয়া লয়।

হস্তীর সর্বাঙ্গে কখনও শ্বেদ জল নির্গত হয় না, যদি কখনও অতিরিক্ত যাত্রায় পরিশ্রম করে, ও জলে নামিতে না পায়, তাহা হইলে উছাদিগের পায়ের নখের গোড়া হইতে এক প্রকার জল নির্গত হইতে থাকে। হস্তী-শরীরের স্বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিতে হইলে উছাকেই বলা উচিত।

উদ্ভিদই হস্তিদিগের একমাত্র আহাৰ্য। এবং ইছারা প্রত্যেকেই প্রতিদিন ৪।৫ মণ করিয়া আহাৰ করিতে পারে। যে কোন স্থানে যাইয়া আহাৰ করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই স্থানেই উদরপূরণ অপেক্ষা পদমর্দনাদি হইতে অধিকতর অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। ইছারা কিছুই না দেখিয়া খায় না। আ-

হার্ঘ্য বস্তু কোনরূপ দুর্গন্ধ বৃদ্ধ হইলে, তাহা জর্মনি ফেলিয়া দেয়। শুণ্ডের দ্বারা আহাদের জন্য এক বোঝা ঘাস ধরিয়া লইলে তাহা পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে পায়ের মধ্যে এমন করিয়া বাড়িতে থাকে যে, উহার অর্ধেক ঘাসও মুখে তুলিয়া দিতে পারে না, সকল গুলিই পড়িয়া যায়। কিন্তু তথাপিও অপরিষ্কার থাকে না। কদলী বৃক্ষ, ঘাস, বাঁশপাতা, এবং ধানাই ইত্যাদিগের প্রধান খাদ্য। শীতকালে যখন ঘাস ইত্যাদি অন্যান্য দ্রব্য খাইতে না পায়, তখন কেবল কদলীবৃক্ষ আহার করিয়া থাকে। কখন কখন বট অশ্বথ ও ডুমুর গাছের ডাল ও আহার করিয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে যে কি সুখ তাহা আমরা বুঝিতে পারিমা। আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যদি ইহার কেহ কিছু জানেন, তবে জানাইলে বাখিত হইব।

হস্তীর শরীরভাঙ্গুরে পানীয় জল সংকীর্ণ রাখিবার জন্য, পাকস্থলী ভিন্ন অন্য একটি স্বতন্ত্র মস্ত্র আছে। শুণ্ড দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া ঐ মস্ত্রটি পরিপূর্ণ করিয়া রাখে, এবং আবশ্যিক মত তথা হইতে আবার শুণ্ড দ্বারাই জল বাহির করিয়া লইতে পারে। যদি উহার রোজের উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া জলে নামিতে না পায়, অথবা পালিত হস্তীকে কার্যানুরোধে যথাসময়ে স্থান করিতে না দেওয়া হয়, তবে সেই মস্ত্র হইতে জল আনিয়া সর্ব শরীরে সিঞ্জন করিয়া দিতে থাকে।

হস্তিজাতির অত্যাশ্চর্য্য অপত্যস্নেহ। উহাদের বংশপরম্পরা অবচ্ছিন্ন ভাবে একত্র থাকিলে একে অন্যকে চিনিতে পারে।

হস্তীর বয়ঃকাল ১০০ শত বৎসর। কিন্তু এত দীর্ঘকাল বাচিয়া থাকিতে আমরা স্বচক্ষে দেখি নাই। শুনিতে পাই ইহা অপেক্ষাও নাকি আরও অধিক দিন ইহারা বাচিয়া থাকে। পৃথিবীর দুইটি মাত্র মহাদেশ ইহাদের বাসস্থান, এমিয়া এবং আফ্রিকা। প্রবন্ধের প্রারম্ভে যে হস্তীর প্রতীমূর্ত্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমাদের এমিয়ার হস্তী। ভবিষ্যতে আফ্রিকার হস্তীর প্রতীমূর্ত্তি সহ উহাদের বিবরণ যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা বিবৃত করিতে যত্ববান থাকিব।

হস্তীর সাধারণ স্বভাব সম্বন্ধে আমরা যে সমস্ত কথা অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা এক প্রকার পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে জীবস্বার্থ মনুষ্যের অপরিণীত বুদ্ধিকৌশলে ও অসাধারণ চাতুর্য্যে যে কি প্রকারে এই ভয়ঙ্কর বলশালী প্রকাণ্ডগতন জন্তু ধৃত হইয়া মহত প্রকারের কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার বিস্তীর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল। কি প্রণালীতে এই জন্তু অতি প্রথমে মনুষ্যের করায়ত্ত হইয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আজি পর্য্যন্তও জানিতে পারি নাই। আমরা অনুসন্ধানে থাকিলাম, যখনই জানিতে পারিব তখনই সাধারণ সমীপে প্র-

কাশ করিব। ইদানীং ইহাদিগকে যে প্রণালীতে আবদ্ধ করা হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

হস্তী পরিবার নিমিত্ত এক্ষণ তিনটি প্রণালী প্রচলিত আছে। ইহার একটির নাম পরতালা শিকার, অন্যটির নাম ফাঁসি এবং তৃতীয়টির নাম খেদা শিকার।

১ম। পরতালা শিকার—এই শিকারে কেবল গুণ্ডা হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। ইহাতে কেবল ৩ টি পালিতা কুন্কীর আবশ্যিক। কুন্কী দেখিলে বন্যগুণ্ডা হস্তী দৌড়িয়া পলায়ন করে না, বরং দাঁড়াইয়া থাকে। এই সময় মাহুতেরা দুইটি কুন্কীকে গুণ্ডার দুই পার্শ্বে এমন ভাবে চাপাইয়া রাখে, যেন গুণ্ডা কোন মতেই মাহুতদিগকে দেখিতে না পারে; অর্থাৎ পার্শ্ব কুন্কী দুইটির মুখ, গুণ্ডার মুখের বিপরীতদিক করিয়া রাখে। গুণ্ডা যদি কিছু কিছু করিয়া অগ্রসর হয়, তবে পার্শ্ব কুন্কী দুইটির মুখ না ফিরাইয়া উহাদিগকে পিছেরদিকে হটাইয়া নিয়া যায়। কিন্তু কোন মতেই পার্শ্বের চাপা ছাড়িয়া দেয় না। এই সময়ে তৃতীয় পালিতা হস্তিনীটি একেবারে গুণ্ডার পিছনে আনিয়া রাখে, এবং উহার উপরেই দাঁড়ানার (হস্তী বন্ধনকারী) দড়ি কাছি প্রভৃতি লইয়া প্রস্তুত রহে, গুণ্ডাটি একটুকু স্থির হইয়া দাঁড়াইলে, অমনি সে হস্তী হইতে নামিয়া গুণ্ডার পাছের দুই পা একত্র

করিয়া কাছি জড়াইতে থাকে। হস্ততাগা গুণ্ডা ঐ কুন্কী দেখিয়া এমনি মোহিত হইয়া যায় যে, উহার পাদদেশে কি ঘটনা হইতেছে তাহার অণুমাত্রও অনুসন্ধান করে না। পায়ের নীচ হইতে উপর পর্যন্ত কাছি জড়াইয়া ফেলিতে পারিলেই উহাকে আবদ্ধ করা হইল। ইহার পরে যেরূপে ইচ্ছা সেইরূপে উহার গলা ও বক্ষ জড়াইয়া দড়ী লাগাইতে থাকে ও একটি বৃহৎ ব্লকের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে।

২য়। ফাঁসি শিকার—এই শিকারে কেবল কুন্কী হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। বন্য কুন্কীগুলি পালিতা কুন্কীর পৃষ্ঠদেশে লোক দেখিতে পাইলেই প্রাণপণ করিয়া দৌড়িতে থাকে, তখন মাহুতেরাও উহার পিছে পিছে পালিতা কুন্কী ধাবিত করিয়া দেয়; এবং পালিতা কুন্কীটি দৌড়িয়া গিয়া বন্য কুন্কীর পাশাপাশি হইলে, অমনি একজন মাহুত বন্য হস্তিনীটির মস্তক এবং শুণ্ডের উপর দিয়া মোটা রজ্জু নির্মিত ফাঁসি ফেলিয়া দেয়। আর ফাঁসিটি ক্রমশঃ টান লাগিয়া গলায় কসিয়া ধরে। ফাঁসি গলায় লাগাইবার সময়ে যদি বন্যহস্তিনীটি উহা শুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, তবে অন্যায়সেই রক্ষা পাইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিহীনা হস্তিনী তাহা না করিয়া ভয়ে শুণ্ড সংকোচন করে, আর অমনি ফাঁসিও গলায় লাগিয়া যায়। এই প্রকার শিকারে প্রত্যেক হাতিতে দুইটি লোকের আবশ্যিক। একটি চালক ও এ-

কটি বন্ধনকারী। যদি বন্য হস্তিনীটি দুর্বল হয়, তবে একটি পালিতা হস্তিনী দিয়াই উদ্ধাকে ধরা যায়, কিন্তু বলিষ্ঠ হইলে দুইটি পালিতা হস্তিনীর আবশ্যক।

এই প্রকারে গলায় ফাঁসি লাগাইয়া পূর্বোক্ত শিকারের ন্যায় ইহাদিগকেও বড় বড় গাছের সঙ্গে আনিয়া বাঁধিয়া রাখে।

পরতালী এবং ফাঁসি শিকারে একবারে একটি হস্তীর অধিক আবদ্ধ করা যায় না। বোধ হয় পাঁচক মহাশয়েরা এই শিকারের প্রণালী পাঠ করিয়াই ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন।

৩য়। খেদা শিকার;—এই শিকার পূর্বোক্ত শিকারেরই হইতে একবারে স্বতন্ত্র, এবং ইহাতে এক সময়ে অনেকগুলি হস্তী ধরা যাইতে পারে। যে স্থানে হস্তীগুলিকে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে দেখা যায়, শিকারীরা সেই স্থানের চতুর্দিকে বহু পরিমাণ ভূমি বেস্টন করিয়া অন্তঃ ৭।৮ হাত অন্তর এক একজন প্রহরী রাখিয়া দেয়, ঐ প্রহরীরা প্রত্যেকে স্ব স্ব নিকটবর্তী স্থানে দুই একখানা করিয়া খাম গাড়িয়া রাখে, এবং সেই খামে লতা পাতা জড়াইয়া একটা বেড়া প্রস্তুত করে। এই বেড়াকে পাতবেড় কহে। হস্তীগুলি 'আবদ্ধ হইতেছি' ইহা যেন বুঝিতে না পারে, তজ্জন্য প্রহরীরা এই সময় নির্ঝাঁক ও নিশ্চর হইয়া স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। যদি কোন হস্তী

এই সময় এই বেড়ার বাহির হইতে চায়, তবে যাহার নিকট দিয়া বাহির হওয়ার চেষ্টা করে, সে হয় বন্দুকের শব্দ করিয়া, না হয় অন্য কোন প্রকারে ভয় দেখাইয়া হস্তীটিকে বেড়ার কেন্দ্রাভিমুখে তাড়াইয়া দেয়। ইহার পরে এই পাতবেড়ের মধ্যে কোন স্থানে একটি স্বদৃঢ় খোঁয়াড় প্রস্তুত করা হয়, এই খোঁয়াড় হস্তী শীঘ্র ভাঙিতে পারে না। খোঁয়াড়ের একদিকে একটি দরজা থাকে, এবং একটি কবাট উহার উপরে এমন কৌশলে স্থাপিত করা হয়, যেন উহা ছাড়িয়া দিবামাত্র দরজা একবারে বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর কৌশলে আবার ঐ পাতবেড় হইতে সমগ্র হস্তীগুলি এই খোঁয়াড়ে আনিতে হয় এবং আনিয়াই কবাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পরে পালিতা কুনকী ঐ খোঁয়ারে নিয়া বন্য হস্তীগুলিকে ইচ্ছামত পারে কি গলায় দড়ী লাগাইয়া বড় বড় গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হয়।

বন হইতে ধরিয়া আনিলে ইহার সহজেই মনুষ্যের বশ্যতা স্বীকার করে, কখনও বা সম্ভাবহারে এবং কখনও বা কঠিন শাসনে উহাদিগকে সম্ভুক্ত এবং অসম্ভুক্ত করিতে হয়। প্রথমতঃ, ধৃত হস্তীর গলায় সঙ্গে পালিত হস্তীর বন্ধ একত্র বন্ধন পূর্বক মনুষ্যালয়ে আনয়ন করা হয় এবং কিছুদিন কেবল উহাদিগের আহার ষো-গাইয়া পরে একটি বংশধরের অগ্রভাগ ৯।১০ ভাগে চিরিয়া দূর হইতে উহাদের

গা ঘর্ষণ পূর্বক শুড়শুড়ি নিবারণ করা আবশ্যিক। এইরূপে শুড়শুড়ি কিছু ভাগিলে পালিতা কুন্কীর পৃষ্ঠে বসিয়া ক্রমে ক্রমে উহার পৃষ্ঠে চড়িতে যত্ন করিতে হয়, এবং পালিতা কুন্কীর সঙ্গে বাঁধিয়া উহার সহিত এদিক ওদিক ফিরাইতে হয়। এইরূপ ফিরাইবার সময় উহার অগ্রে অগ্রে একজন মানুষ দৌড়াইয়া যায় ও উহার পৃষ্ঠদেশেও একজন মানুষ উপবিষ্ট থাকে। এই সময় মানুষের চোঁচার বহির্ভূত কোনরূপ আচরণ করিতে চাহিলে উহাদিগকে অক্লুশ বা বলম ঘারা আঘাত করিতে হয়। এইরূপ কয়েক দিন অভ্যাস করিলেই বন্য হস্তীরা মানুষের সঙ্গে বিশেষরূপে পরিচিত হইয়া পড়ে। পরিচিত হইবার কিছুকাল পরে উহাদিগকে বসিবার প্রথা শিক্ষা দিতে হয়। কএক দিন ভাল করিয়া স্নানাদি না করাইয়া প্রায়শঃই রোত্রে বাঁধিয়া রাখিতে হয়, পরে একদিন জলে লইয়া গেলে, উহার আঁপনা হইতেই জলে বসিবার উপক্রম করে, আর অমনি মাছভেরা 'বট, বট,' করিতে থাকে। এবং কিছু দিন এইরূপ করিলে উহার জলে ও শুকনানে 'বট্' বলিলেই বসিয়া পড়ে। যদি কোন হস্তী বসিতে না চায়, তবে বলমঘারা উহার পৃষ্ঠে এক জোরে জাঁতিয়া ধরিতে হয়, যে উহার আঁর না বসিয়া থাকিতে পারে না। কোন কোন হস্তীর স্বভাব আবার এমনি দুট যে উহার আঁনাহারে মরিয়া বাইবে, ত-

থাপি মানুষের বশ্যতা স্বীকার করিবে না। এবং কোনটি বশ্যতা স্বীকার করিলেও মনের কুটিলতা ছাড়িবে না। কিন্তু এই প্রকার অসয়ল এবং দুর্ভমতি হস্তী একশতের মধ্যে একটি হয় কিনা সন্দেহ। যাহা হউক, হস্তী বসিবার সময় সম্মুখের পা সম্মুখের দিকে ও পিছনের পা পিছের দিকে প্রসারণ করিয়া দেয়। এবং ভালরূপ বসিলে উহাদের উদরের চর্ম মৃত্তিকা স্পর্শ করে।

হস্তীকে ক্রমে ক্রমে শিক্ষা দিলে উহার প্রয়োজনোপযোগী বহুবিধ কার্য করিতে পারে। রুক্ষাদি ভাঙ্গা, ঘোরোস্বাটন করা ও শুণুঘারা মশাল ধরা প্রভৃতি কার্য ইহার অমার্যাসে করিতে পারে।

কুন্কী এবং গুণ্ডা এতদুভয়ের মধ্যে কুন্কীগুলি পালিতেই অভ্যস্ত সুবিধা। ইহার শীত্রেই বশ্যতা স্বীকার করে ও নানা রূপ কার্য করিতে পারা হয়, এবং একবার বাধ্য করিতে পারিলে আর আবাধ্য হয় না, বরং ক্রমশঃ অধিকতর বশীভূত হইতে থাকে। গুণ্ডাগুলি যদিও মনুষ্যের কঠোর শাসনে বাধ্য না থাকিয়া পারে না, তথাপি বৎসরের মধ্যে বিশেষতঃ শীতকালে উহাদিগের শরীরের এতদূর তেজ রুদ্ধ হয় যে, তখন আর কোনরূপেই শাসনের অধীনে আসিতে চাহে না। যাহাকে সম্মুখে দেখে তাহাকেই মারিতে উদ্যত হয়।

হস্তীর কপাটির উভয় পাশে দুইটি

ছিন্ন আছে। গুণাগুলি যখন তথাবিন উত্তেজিত হয়, তখন সেই ছিন্নদ্বারা অনবরত এক প্রকার তরল পদার্থ নির্গত হইতে থাকে * ; কিন্তু উত্তেজিত না হইলে উহা হইতে কিছুই নির্গত হয় না। কেবল ছিন্নের চিহ্নমাত্র থাকে। কুনকী হস্তীরও কপাটিতে এইরূপ দুইটি ছিন্ন আছে বটে, কিন্তু উহাদিগকে কখনও উত্তেজিত হইতে দেখা যায় না। পুত্ররং ঐ ছিন্ন দ্বারা কোনরূপ পদার্থেরও নির্গমন দৃষ্টিগোচর হয় না। গুণাগুলি যখন মনুষ্যালয়ে এই রূপ ভীষণ আকার ধারণ করে, তখন উহাদিগকে ‘কেতিলা’ প্রভৃতি শীতল দ্রব্যাদি আহার করিতে দেওয়া আবশ্যিক ; শরীর শীতল হইলেই যুহুভাবে আবার মনুষ্যের বশ্যতা স্বীকার করে।

প্রাচীন শাস্ত্রকর্তারাও উত্তেজিত হস্তীতে আরোহণ করা নিবেদন লিখিয়াছেন, যথা—

‘নারোহেৎ কামুকোঽশ্বতম্ গজং রাজা
কদাচন,
আকহ্য কামুকং তন্তু পরজেহ বিবিদতি।’
মখনা জাতীয় অর্থাৎ একপ্রকার পুংহস্তীর কথা যে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, উহারও উত্তেজিত হইলে ভয়ানক রূপধারণ করে। উহার দন্ত না থাকা প্রযুক্ত যদিও গুণা

* আমাদের প্রাচীন কালের কবিরাও ইহা বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন,—
“ভাস্কং মন্তকরীশ্র গণ্ডুগলং ভূম-
শ্চলং কর্ণয়োঃ বিদ্বৈবান্নিকটেপি—”

অপেক্ষা অমেকাংশে হীনপ্রভ, তথাপি মনুষ্যাদি বিনাশ করিবার জন্য করপদমঞ্চালনে বিশেষ পটু। আমরা দেখিয়াছি, একটি উত্তেজিত মখনা হাতী পৃষ্ঠস্থিত মাত্তকে বাড়িয়া ফেলিয়া পদাঘাতে উহার ষাড় ভাঙ্গিয়া দিল।

অন্যান্য পশুর ন্যায় হস্তীর মুক্ বাহ্যিক দৃষ্টিগোচর হয় না, উহা পিছের পায়ের উভয় পাশে মাংসের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট।

মনুষ্যেরা হস্তীর শরীরের গঠনকে ত্রিবিধরূপে বর্ণন করিয়াছেন। উহাদিগের নাম—‘কুমারিয়া’ ‘মৃগা’ ‘দোনসলা’। ইহার প্রথম নামটি বোধ হয় ‘কুস্তীর’ হইতে নেওয়া হইয়াছে। কুস্তীরের চর্ম যেমন বন্ধুর, ‘কুমারিয়া’ জাতীয় হস্তীরও শরীর সেইরূপ দৃঢ় ও বন্ধুর। হস্ত পাদাদির গঠনও অতি বলিষ্ঠ ও স্থূল। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলেই এই জাতীয় হস্তীকে অসাধারণ বলশালী বলিয়া অনুমিত হইবে।

‘মৃগা’—আমরা অনুমান করি মৃগ শরীরের গঠনাদি দেখিয়াই এই জাতীয় হস্তীর ‘মৃগা’ নাম দেওয়া হইয়াছে। ‘মৃগা’ হস্তীর শরীরের চর্ম অপেক্ষাকৃত পাতল; পাগু লি দীর্ঘ ও তত মাংসল নহে, শরীরের বর্ণ ক্রিম্বৎ রক্তিমাবিশিষ্ট, কিন্তু উহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া উঠিতে পারা যায় না। এইগুলির সামর্থ্যও অনেক কম এবং ইহার তত ভয়সংকীর্ণও নহে।

‘দোনসলা’,—ইহাদের শরীরের গঠন পূর্বেই দুইজাতীয় হস্তীগঠনের মি-

জাণে উৎপন্ন। ইহার 'মৃগা' জাতি হইতে অধিকতর বলশালী ও ভয়সহিষ্ণু। হস্তী ধরিবার কালে 'কুমারিয়া' ও 'দোনগ্লাই' অধিক কার্য্য করিতে সক্ষম ও মনুষ্যালয়ে ইহারাই দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। ইদানীং মাস্তভেরা হস্তীর কোন কোন লক্ষণকে নিত্যস্থ দূষিত বলিয়া মনে করে। এবং উহাদের মনের এই ধারণা যে এবং-বিধ লক্ষণাক্রান্ত হস্তী পোষণ করিলে পোষ্টার কোন না কোনরূপ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। এইগুলি কোন অংশেও যে পূর্ণলক্ষণাক্রান্ত হস্তী হইতে বলবিক্রমাদিতে হুন, এমত নহে। তবে কেন যে এই সংস্কার তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। নিম্নে উক্ত লক্ষণগুলির নাম লিখিত হইল।

১ সতর্খাম, ২ বোলনখী, ৩ সেহাতালু, ৪ ঝাকদোম, ৫ বালখণ্ডী।

১। যে গুলির মেরুদণ্ডস্থি অস্বাভাবিক উচ্চ ও বক্র, সেইগুলিকে 'সতর্খাম' কহে।

২। যে হস্তীর পায়ে ১৮টি নখ না থাকিয়া ১৩টি নখ থাকে, তাহাকে বোলনখী বলে।

৩। যে গুলির তালুতে কাল কাল দাগ কিংবা তালু একেবারে কাল সেই গুলিকে 'সেহাতালু' কহে।

৪। যে হস্তীর লাজুল চলিবার সময় মৃত্তিকা স্পর্শ করে, এবং বোধ হয় যেন এদিক এদিক হুলিয়া ঝাড়ু দিতেছে সেই গুলিকে 'ঝাকদোম' কহে।

৫। যে গুলির লাজুলের উভয়পার্শ্বে লোম না থাকিয়া কেবলমাত্র একপার্শ্বেই লোম থাকে, সেইগুলিকে 'বালখণ্ডী' কহে।

হস্তীর মূল্য অত্যন্ত অধিক। অত্যাৎকৃষ্ট একটি হস্তী পঁচিশ, ত্রিশ হাজার টাকার পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া থাকে। আর পূর্নোক্ত লক্ষণাক্রান্ত হস্তী অতি সূত্রী হইলেও তাহাদের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। হস্তীর দন্ত এবং অগ্নিও বহুমূল্যে বিক্রীত হয়, এবং উহা দ্বারা মনুষ্যের বহুবিধ কার্য্যোপযোগী বস্তু নির্মিত হইয়া থাকে। হস্তীদন্তে অত্যাৎকৃষ্ট সিংহাসন, পাটী, কৌটা, হেণ্ডল, চিকণী, খেলনা প্রভৃতি অতি সুন্দর সুন্দর বস্তু প্রস্তুত হয়। পূর্বকালে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধাদি করা হইত, কিন্তু এখন ইহাদিগকে কেবল যুদ্ধসামগ্রী বহন কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। কোন হিংস্র জন্তু হত্যা করিতে যা-ইতে হইলে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাওয়াই কর্তব্য। হস্তী আরোহণ করিতে হইলে উহার পৃষ্ঠে গদি কিংবা চারজামা অথবা হাওদা বাঁদিয়া লইতে হয়। ব্যাঘ্রাদি শিকার করিবার সময় হাওদাতেই কিছু কম বিপদের সম্ভাবনা। হস্তিজাতি অত্যন্ত ভীক, স্তবরাং কোন বন্য পশুর সম্মুখে পড়িলে ভয়ে এত জড়সড় হয় যে, কোন দিকে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে পারিলেই নিত্যস্থ শ্লাঘা মনে করে। কিন্তু মাছের অক্ষুণ্ণ তাড়নে তাহা করিতে পারে না, অবশেষে ফোস ফোস করিয়া শুও-

ভারা ভূমিতে এমন জোরে আঘাত করিয়া থাকে যে সেখানকার মাটি একেবারে উঠিয়া যায়। কোন কোন হস্তী উপযুক্ত রূপে শিক্ষা পাইলে একেবারে নির্ভয় হয়। যদি প্রথম প্রথম শিকারের সময় পলাইবার উপক্রম করিলে মাল্হ-তেরা কোন রূপেই পলাইতে যাঁইতে না দিয়া দৃঢ়শাসনে শিকারের সম্মুখেই দাঁড় করাইয়া রাখে, তবে দুই চারি বার এইরূপ করিলেই পরে অন্য পশু দেখিয়া আর ভয় পায় না।

হস্তীর স্বর অত্যন্ত কর্কশ, কিন্তু সচ-রাচর উহার শব্দ করে না। কোন রূপে ভয় পাইলে অথবা ভাছাদের দল হইতে বিচ্যুত হইলে, ভয়ানক এক প্রকার চীৎকার করিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া লয়। আবার অঙ্লাদের সময়ও গুড় গুড় করিয়া এক অব্যক্ত শব্দ দ্বারা উছাদিগের আনন্দ প্রকাশ করে। আর মনুষ্যের নি-জ্ঞের কার্যসাধনের জন্য ডাকাইতে হইলে মাল্হতেরা উছাদের কর্ণের মধ্যে একটু অল্প জোরে অঙ্কুশ দ্বারা আঘাত করি-লেই চীৎকার করিয়া উঠে। হস্তীর বু-দ্ধিশক্তি অত্যন্ত প্রবল; প্রতিপালককে (মাল্হতকে) বিপদের সময় রক্ষা ক-রিবার জন্য অনেক হস্তীকে অনেক প্র-কার যত্ন করিতে দেখা গিয়াছে। আমরা নিম্নে উছার একটি অত্যাশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত উ-ল্লেখ করিতেছি।

পূর্ব্ববদে কোন এক সত্রাস্ত ভূম্য-

ধিকারীর বাটিতে পবন নামক * এ-কটি ব্রহ্মদাকারের হস্তিনী আছে, উছা এক সময়ে বনা হস্তী ধরিবার জন্য প্রে-রিত হইয়াছিল। মাল্হত যেমনি শি-কারের সময় ঐ হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে না-মিয়া একটি বনা হস্তীর পায়ে দড়ী বাঁ-ধিতেছিল, অমনি পশ্চাৎ হইতে আর একটি বনা হস্তী আসিয়া উছাকে মারি-বার উপক্রম করে, মাল্হত ইছা দেখিতে পাইয়া ছিলনা,—কিন্তু পালিতা হস্তিনী এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া মাল্হতকে শুণ্ডের অগ্রভাগ দ্বারা আপন পৃষ্ঠে আ-রোহন করাইয়া লইল। পালিতা হস্তি-নীটি এইরূপ না করিলে মাল্হতের আর বা-চিবার সম্ভাবনা ছিলনা।

হস্তী মনুষ্যালয়ে গর্ভবতী হইয়া সচ-রাচর সম্ভান প্রসব করে না। আমরা একটি মাত্র হস্তিনীর মনুষ্যালয়ে গর্ভ-বতী হইয়া সম্ভান প্রসবের বিষয় অবগত হই-য়াছি। কিন্তু উছাদের শু বন্দী অবস্থায় সম্ভান হয় নাই। পালিতা হস্তিনীর স-

* এই স্থানে উল্লেখ করিয়া রাখা আবশ্যিক যে বন্যহস্তী ধরিয়া মনুষ্যালয়ে আনিলে প্রত্যেকটির এক একটি নাম রাখা হয়। উছাদের নাম রাখিবার প-দ্ধতি এইরূপ, কুন্কীর নাম,—যথা মহে-শ্বরী, দৌলভরি, রতনহার, আনর মালা, মনমতী, নাচভরি, ইত্যাদি। শুশা হস্তীর নাম যথা—জজ্বাহাদুর, গোলকুমার, রূপসুন্দর, ইত্যাদি।

স্তান হয় কিনা উহা পরীক্ষা করিবার জন্য একটি হস্তী ও একটি হস্তিনী দেশীয় সামান্য বনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং সেই অবস্থায় উহাদের গর্ভসঞ্চার হইলে, পরে মনুষ্যালয়ে আনিলে সম্ভাব্য প্রসব হয়। গর্ভবতী হস্তিনী বন হইতে ধরিয়া আনিলে উহাদের প্রসবক্রিয়া নিশ্চিন্তে মনুষ্যালয়ে সম্পাদিত হয়। প্রসবের সময় উহার দাড়াইয়া প্রসব করিয়া থাকে।

লোকালয়ে হস্তিনীর যে সম্ভাব্য হয়, তাহার কখনও বনা বুদ্ধি হয় না, শিশুকাল হইতেই নিঃশব্দ চিত্তে মনুষ্যের সঙ্গে খেলা করিয়া থাকে। শিশুকাল হইতে মনুষ্য দেখিতে দেখিতে কোন কোনটী এমনি বেআদব হয়, যে সময় সময় কাহারও কথা না শুনিয়া মনুষ্যের অনেক অনিষ্ট করে। রাস্তাদিয়া যাইবার সময় কদলী প্রভৃতি উহাদের কোন খাদ্য বস্তু পাঠিলে অলক্ষিত ভাবে উহা চুরি করিয়া লইয়া আসিবে এবং মাতার বক্ষতলে আসিয়া অতি আস্থাদে উহার একটী করিয়া থাকিতে থাকিবে; আবার মনে কখন, একটী

মনুষ্য যেন নিঃশব্দ চিত্তে ছাটিয়া যাইতেছে, এমন সময় হস্তিনাবকটী চুপেই উহার পিছের দিকে যাইয়া মস্তক দ্বারা উহাকে এমন আঘাত করিবে, যে তৎকণাৎ সে ভূতলশায়ী হইবে। কিন্তু দ্রুতগতি করত ইহাতে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া মায়ের বক্ষতলে গিয়া লুকাইয়া রাখিবে। করভেরা যে ক্রুদ্ধ কিংবা কুটিল হইয়া মনুষ্যের এই রূপ অনিষ্ট করে এমনত নহে, উহার মনে করে মনুষ্যালয়েই উহাদের আশ্রয় এবং শিশুরা যে রূপ অশ্রু আশ্রয়ে আবদার করিয়া কখন কখন পরিবারস্থ সকলকেই বিরক্ত করিয়া তুলে, ইহারও সেইরূপ আপন গৃহ ভাবিয়া লোকের সঙ্গে খেলিতে যাইয়া অনিষ্ট করিয়া বসে। এইরূপ অনিষ্টকারীদের হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। ছয় বৎসর পরেই ইহাদিগকে মনুষ্যের প্রয়োজনোপযোগী কার্যাদি করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, ইহার অপেক্ষাকৃত সহজেই কার্যাদি শিখিতে পারে। (ক্রমশঃ)



প্রতি সমালোচনা ।

নুপ্রসিদ্ধ এডিসন সাহেব লিখিয়াছেন যে, পাঠকদিগের হাতে কোন গ্রন্থ পড়িলেই লেখক কক্ষ কি শুভ্রবর্ণ, শান্ত কি উজ্জ্বল, অমৃত কি বিবাহিত ইত্যাদি অনেক

বিষয় তাঁহার জানিতে ইচ্ছুক হন, এবং যে পর্যন্ত জানিতে না পান, সে পর্যন্ত ঐ গ্রন্থ পড়িতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মে না। পাছে বা তীরে আসিয়া ভরী ডুবিয়া

বায়, এই ভয়ে প্রেমের ভূমিকাতেই তিনি তাঁহার আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন। বাঙ্গালী অনুকরণপ্রিয়, আমি তাহার অনুকরণ করিয়া পূর্বেই সাহিত্যসমাজে আমার পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু প্রথমতঃ এতিসন তাঁহার প্রকৃত নামটি গোপন রাখিয়াছিলেন, অনাবশ্যক বিবেচনায় আমি আমার নামটি পর্য্যন্ত সাধারণে প্রচার করিয়াছি। যাহা হউক এই গুরুতর বিষয়টি অন্যত্র বিস্তৃতরূপে সমালোচিত হইবে। সম্ভ্রতি যে প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে কিছু আত্মপরিচয় দেওয়া কর্তব্য হইতেছে। প্রবন্ধলেখক মহাশয়েরা মাপ করিবেন, কিন্তু আপনাদের একটি গুরুতর অপরাধ, অথচ একটি সাধারণ রোগ আছে। আপনারা পত্রিকা প্রভৃতিতে যে সকল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেন, তাহার অধিকাংশেরই নিম্নে বিঃ ক্রীঃ, ছাঃ, ইঃ, মঃ, টিঃ প্রভৃতি লিখিয়া আত্মনাম গোপন করিয়া রাখেন; আমি যদি সাহিত্যডিপার্টমেন্টের পোলিশ দারোগা হইতাম, তাহা হইলে আপনাদিগকে এই উদারতার উচিত শিক্ষা দিতে পারিতাম; অর্থাৎ এই সমুদয় প্রবন্ধ নিজের নামে ছাপাইয়া স্বতন্ত্র প্রমুখ্যাকারে পুস্তক বাহির করিতাম। যাহা হউক আপনারা ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন।

আমি সাহিত্যসমাজে বিশেষ পরিচিত, অর্থাৎ অনেকগুলি প্রমুখ লিখিয়াছি। আমি প্রথম কতগুলি পুস্তক লিখিয়া স-

মালোচনার জন্য তদানীন্তন প্রায় প্রত্যেক সম্পাদকের নিকট এক একখানা পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু কেহই তাহার সমাদর করিল না। যাহা হউক তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি নাই; বঙ্গভাষা আজিও পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই, সুতরাং সমুদয় রস আশ্রিও ইহাতে প্রবেশশ্যাত করিতে পার্য নাই এবং লোকের কচিও এক্ষণ পর্য্যন্ত সম্যক্ পরিপক হইতে পারে নাই। দেশেরও দোষ বলি না; কারণ ইংলণ্ডেরও এক সময় এইরূপ অবস্থা ছিল; কনিষ্ঠক সেক্ষপিয়র যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন তাহার মহীয়সী শক্তির কেহই অবধারণা করিতে সক্ষম হইল না, এমন কি তাহাকে কপি বলিয়াই কেহ প্রোছ্য করিল না। আমারও ভরসা ভবিষ্যৎ বংশীয়েয়, অন্ততঃ আমার উত্তরাধিকারীগণের হস্তে।

যাহা হউক, সম্পাদকদিগের এইরূপ উদাসীন্য দেখিয়া দুঃখিত, বিরক্ত ও আংশিক ক্রুদ্ধ হইলাম, এবং তাঁহারি কোন মতে নিরস্ত থাকিতে না পারেন, ইহা মনে করিয়া পুনরায় প্রমুখ লিখিতে বসিলাম। এবার আমার উদ্দেশ্য সফল হইল, প্রায় প্রত্যেক পত্রিকাতেই উহার সমালোচনা বাহির হইল; সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি একব্যক্যে ইহার প্রশংসাস্বনি করিয়াছিল বটে, কিন্তু বঙ্গদর্শন, আর্ষাদর্শন, ভারতী, বাঙ্গু এবং ঐখরণের কএকখানা মাসিক পত্রিকাতে উহার বেরূপ নিকৃষ্টরূপে সমালোচনা হইয়াছিল, তা-

হার প্রতিসমালোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ।

বান্ধব সম্পাদক মহাশয়, উল্লিখিত পত্রিকাচতুর্ভুজের সর্বশেষে বান্ধব নাম উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না । ইহার কারণ আছে । প্রথমতঃ আপনার পত্রিকাতেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি ছাপাইবার মনস্থ করিয়া উহাকেই সর্বপ্রথমে উল্লেখ করা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলাম না । দ্বিতীয়তঃ আপনি আমার অত্যন্ত অনিচ্ছা করিয়াছেন, স্তরাতঃ আপনাকে সঙ্ঘর্ষ করাও আমার ইচ্ছা নহে । তথাপি আপনার বান্ধব নামে আক্রমণ হইয়া এই সামান্য পত্রখানিকে প্রকাশ করিতে আপনাকে অনুরোধ করি ।

পূর্বে যে আত্মপরিচয়ের কথা বলিয়াছি, তৎসম্পর্কে এক সম্পাদক লিখিয়াছেন “গ্রন্থকার তাঁহার নাম গোপন রাখিলেই ভাল হইত ।” নাম প্রকাশ করিবার ভয় লোকসমাজে তিরস্কৃত হওয়া । কিন্তু যখন লোকে অপদস্থ হইয়াও সমাজে খ্যাতিলাভ করিতেছে, তখন নাম গোপন করিবার প্রয়োজন কি ? কিন্তু খুলিয়া বলিতে গেলে আমার বশোলাভের আর এক সুপ্রশস্ত পথ আছে । আমি গ্রন্থ লিখিয়াছি বলিয়া জগতের শত্রু হই নাই, আমার অনেক মিত্র রহিয়াছে ; বাঁহারা আমার মিত্র, স্নেহবশতঃই হউক, কিলঙ্কার পড়িয়াই হউক, তাঁহারা আমাকে অবশ্য প্রশংসা করিবেন, আমি যদি শত্রু-

দিগের ঢকানিনাদ বন্ধুগণের প্রশংসান্বিতিতে ডুগাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলেই আমার কার্যসিদ্ধি হইল, তাহা হইলেই আমার নাম সাহিত্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল । আমাদের দেশে এ পদ্ধতি ত নূতন নহে, তবে আমার একার মিন্দা কেন?

আর এক কথা, মনে কখন দেশে যেন আমি এত করিয়াও সম্মান লাভ করিতে পারিলাম না । কিন্তু বিদেশীয়দিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সাধারণতঃ উদারপ্রকৃতি, এবং যাহারা স্বদেশে ভাষাতত্ত্ববিৎ বলিয়া পরিগণিত হইতে ইচ্ছুক, স্তরাতঃ যাহারা বঙ্গভাষার কোন পুস্তক পাইলে ষৎপারোনাস্তি কৃতজ্ঞ হন, অথচ বঙ্গভাষা শুনেন না, এইরূপ ব্যক্তি আমার এই যথাস্বীকৃতিপ্রসূত গ্রন্থও মহাসমাদরে গ্রহণ করিবেন সন্দেহ নাই । যদি ছলে কৌশলে, ইহাদের নিকট কোন সম্মানিত উপাখিলাভ করিতে পারি, তবে জন্মকস্বভাব এই বঙ্গবাসীকে কে ভয় করে ? আমার যখন এতগুলি আশা সম্মুখে বর্তমান, তখন আত্মপরিচয় দিতে ভয় করিব কেন ?

আর এক সম্পাদক লিখিয়াছেন ‘গ্রন্থখানি ইংরাজির অনুকরণ, এবং ইহার ভাষা অতি কদর্য্য ।’ আমি এইরূপ সমালোচনা শুনিয়া অবাক হইয়াছি । বান্ধব সম্পাদক মহাশয় শেবোক্ত বাকাটি প্রয়োগ করিলে কতক খাটিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উহা অপরের মুখে শুনিতে

হইল। যাঁহারা কর্তৃক ঠিক করিয়া লিখিতে জ্ঞানেন না, এবং বাঙ্গালাভাষার অধরের সহিত ইংরাজির অধর মিলাইয়া দিতে চান, তাঁহাদের ভাষাবিষয়ে কাহারও নিন্দা না করিয়া আপনাদিগের কলমের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি থাকিলেই ভাল হয়। আর অনুকরণের কথা, যে দেশের লোকেরা ভাষা ছাড়িয়া কচি, কচি ছাড়িয়া প্রকৃতি, এবং প্রকৃতি ছাড়িয়া অঙ্গের গঠন পর্যন্ত বিলাতি ছাচে ঢালিয়া লইয়াছেন, সেদেশে একে আবার অন্যকে অনুকরণপ্রিয় বলিয়া নিন্দা করে কেন? বঙ্গভাষার অক্ষরের সহিত সংস্কৃত অক্ষরের যে সংঘর্ষ, বঙ্গভাষার ভাবের সহিত ইংরাজি ভাবের সেই সম্পর্ক। কিন্তু উল্লিখিত দোবারোপটি আপাতবিষাক্ত হইলেও পরিণামমধুর। ইংরাজির অনুকরণ করিয়াছি, এ কথাতে অবমাননা না বুঝাইয়া প্রশংসা বুঝায়, অর্থাৎ যাঁহারা কালিকার বঙ্গভাষার দুই তিন খানা বহি পড়িয়াই পুস্তক ও সংবাদপত্র ছাপাইতে বসেন, তাহাদের হইতে অন্ততঃ উচ্চতর আসন লাভ করা হইল।

কিন্তু আমি এক সমালোচকের নিকট প্রকৃত প্রস্তাবে জন্ম হইয়াছি। অর্থাৎ আমার স্বকপোল কল্পিত একটি মতের সত্যতা প্রতিপাদন করিবার জন্য নিচে এক ইংরাজি গ্রন্থকারের নামে একটি টীকা লিখিয়া দিয়াছিলাম, মনে ভরসা ছিল যে, ইনি সাহিত্যসমাজে বড়

পরিচিত নহেন, এবং বিশ্বাস ছিল তারতবার্বে বোধ হয় ইহার অন্যতর পুস্তক আর নাই, সুতরাং অল্প লোকেই উহা পড়িয়াছে, অতএব তাঁহার নামে কিছু একটা লিখিয়া দিলে লোকে না পড়িয়াই প্রত্যয় করিবে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ উল্লিখিত সমালোচক ঐ পুস্তক খানি সমস্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সুতরাং আমার চাতুরি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। আমি এবিষয়ে ইংরাজি পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া বঙ্গীয় নব্যলেখকদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিলাম।

এক সম্পাদক বলেন গ্রন্থকার অস্পৃশ্য। মহাশয়, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আমার বয়স এই বিংশতি বৎসর, আমি ইহার দুই বৎসর পূর্বে গ্রন্থ লিখিতে প্ররত্ত হই। জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গ কয়জন লেখক খুঁজিয়া পাওয়া যায় যাঁহারা ষোড়শবৎসর বয়সে বঙ্গীয় সাহিত্যরঙ্গভূমিতে অভিনয় করিতে আরম্ভ করে নাই?

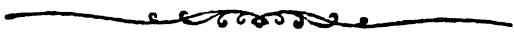
আর এক আপত্তি এই যে, বঙ্গ আজ কালি অনেকেই কেবল নাটক ও উপন্যাস লিখিয়া বেড়ান। বিজ্ঞান প্রভৃতি কঠোর বিষয়ে কেহই সাহস করিয়া হস্তক্ষেপ করেন না। ইহা হইতে অধিকতর প্রলাপোক্তি আর শুনি নাই। সাহসের কথা বুঝি না; কিন্তু বিজ্ঞান লিখিতে যাওয়া এক ভণ্ড পরিভ্রম। বোধ হয় যাঁহারা এবিষয়ে মনোযোগ করেন না, তাঁহারা ইহাকে বিফলপ্রয়াস এবং সময়ের অপব্যয় বলি-

য়াই চেষ্টায় বিরত রহেন। উজ্জানের একটি পুস্তক দেখিয়া উহাতে কয়টি পাণ্ডি আছে, গণিরা সকলেই বলিতে পারেন, কিন্তু কয়জন লোক যুবতী কামিনীর আবেশময়ী মোহন মুরতির সহিত জ্যোৎস্নাবির্পোত রজনীর ফুলকুমুমদামের তুলনা কল্পনায় আনিতে পারিয়াছেন। আর পৃথিবীতে কাহার সমধিক আদর; কবির না বৈজ্ঞানিকের; কয়জন কালিদাস ও সেক্ষপিয়র অধ্যয়ন করে, আর কত জনেই বা শঙ্করাচার্যের অধ্যায়তত্ত্ব ও নিউটনের আবিষ্কৃতি লইয়া মস্তিষ্ক বিলোড়িত করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ধিত করিতে কবি যত পটু, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অপহরণ করিতে বৈজ্ঞানিক তত নিপুণ। কবি যাহা গড়ে, বৈজ্ঞানিক তাহা ভাঙ্গে, কবি যাহার প্রশংসা করে বৈজ্ঞানিক তাহার নিন্দা করে, এবং কবি যাহা ভালবাসে, বৈজ্ঞানিক তাহা ঘৃণা করে। কবি স্মৃতিবাদক বৈজ্ঞানিক নিস্কুক; কবি বাগ্মী, বৈজ্ঞানিক মুক; কবি সহৃদয়, বৈজ্ঞানিক পামর।

আর আমাদের দেশে বিজ্ঞান আলোচনার প্রয়োজন কি? বিজ্ঞানের যেটুকু আবশ্যিকতা, ইংরাজদ্বারা তাহা সম্পাদিত হ-

ইতেছে। সে সকল জঞ্জালের কার্য্য আনোর দ্বারা সম্পন্ন হইতে পীরে, স্বাস্থ্য-রক্ষণপ্রিয় ভ্রমলোকের তাহাতে যোগদান করা কোনরূপই সম্ভব নহে। একব্যক্তি কৃষিকার্য্য করিবে সহস্রলোকে তাহার ফলভোগ করিবে, এক ব্যক্তি বস্ত্র-বয়ন করিবে, শতলোকে সেই বস্ত্র পরিধান করিবে, ইহাই সমাজের নিয়ম; সেইরূপ, কতিপয় জাতি বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া জগতে তাহার উপকার বিকীর্ণ করুক, অবশিষ্ট জাতি সমূহ কাবানিকুলে প্রবেশ করিয়া মধুসংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদিগের ক্রান্ত দেহের আশ্রি বিদূরিত করিতে থাকুক। ফলতঃ, যাহারা কাব্য ও কবিতা লিখাকে সময়ের অপব্যয় মনে করিয়া বিজ্ঞানকে প্রত্যাশ্রয় দিতে চাহেন, আমাদের বিবেচনার তাঁহারা দেশের মর্কথা শুভ-বিদেষ্টা, প্রবঞ্চক এবং মিথ্যাপবাদী।

উপসংহারে বক্তব্য এই সম্পাদকগণ মনে রাখিবেন যে গ্রন্থ সমালোচনা করা যত সহজ, গ্রন্থ রচনা করা তত সহজ নহে, এবং মুখের বাস্তু দ্বারা নিমেষে যাহা উড়াইয়া দেওয়া যায়, হস্তের লেখনীদ্বারা তাহা শীত্র গঠিত করা যায় না।



মহম্মদের উত্তরাধিকারীগণ

~~১২৮৫~~

সাঁহারা ইতিহাসশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে ভাল বাসেন, মুসলমানদিগের ইতিহাস তাঁহাদের অতিশয় আদরের বস্তু। পৃথিবীতে অন্য কোন জাতি মুসলমানদিগের ন্যায় এত অল্প সময়ে অধিকার, ধর্ম ও প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে নাই। মহম্মদের জন্ম হইতে আজি পর্য্যন্ত ১৩০৮ বৎসরের অধিক হয় নাই, কিন্তু এই কাল মধ্যে মুসলমানদিগের উন্নতি, অবনতি এবং পরিবর্তন কত একবার ভাবিয়া দেখ। বা-লুকাময় প্রদেশের মদী অপেক্ষা অধিক পরিবর্তনশীল মুসলমান জাতির ইতিহাস এক্ষণে সভ্যসমাজের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। ৬২২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের তিরোভাব হইতে ৭১০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে মাত্র ৮৮ বৎসর সময়; একজন দীর্ঘজীবী মানুষকেও এই সময় অপেক্ষা অধিককাল জীবিত থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু এই অল্প সময় মধ্যেই মহম্মদের বংশধরগণ ইত্রো হইতে গঙ্গা নদী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন; পরাক্রান্ত খসকদিগের সূদৃঢ় সিংহাসন মুসলমানের পদাঘাতে রেণু রেণু হইয়া উড়িয়া গিয়াছিল; আ-সিয়া ও আফ্রিকায় বিস্তীর্ণ অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল; ভূমধ্যসাগর মুসলমান-

দিগের সুসজ্জিত অর্নবযানে শ্রুশোভিত হইয়াছিল; ফলতঃ ইশমেলগণের বলবীর্ষ্য সমস্ত মেদিনী প্রকল্পিত ছিল। যে সময় এইরূপ অভাবনীয় পরাক্রম প্রদর্শিত হয়, তখন বিজ্ঞানের নিত্যন্ত শৈশব সময়। আরবীয়গণ শারীরিক বল এবং মানসিক অধ্যবসায় ব্যতীত কোন বাহ্যিক শক্তির উপর নির্ভর করিতে অথবা তদ্বারা পরিশ্রমের লাঘব সম্পাদন করিতে পারে এরূপ তাহাদের কিছুই ছিল না। তখন কামানাদি আগ্নেয় অস্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই, ভল্লতরবারী প্রভৃতিই যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ছিল। তখন তাহারা একমাত্র ধর্মের নামে পতাকা উড্ডীন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করিত। ধর্ম রক্ষার যুদ্ধ, ধর্ম-বিস্তারে 'কাফের' বিনাশ ও ধর্মসাহায্যে পরকালে ঈশ্বরসমীপে সমাদর এবং কঙ্কলনয়ন অপসারীগণের সহবাসলাভ মুশলমানগণের মোহমন্ত্র ও জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাহারা প্রাণের জন্ত ম-মতা করিত না; তাহারা ধর্মের জন্ত উ-যত ছিল, এবং ধর্মার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীম-বেগে ধাবিত হইত। এই ধর্মপ্রাণ ভী-ষণজাতি কিরূপে অভূষিত হইয়া আপ-নাদের শক্তি, সাহস ও প্রতাপবদে সমস্ত

পৃথিবীতে কিরূপ মহাবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা বিশদরূপে প্রদর্শন করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু সম্প্রতি কএকটি প্রবন্ধে মহম্মদের পরবর্তী প্রধান পদস্থ কএক জনের জীবনরত্ন সঙ্কলন পূর্বক আমরা এই সুদীর্ঘ প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

প্রথম অধ্যায়।

মহম্মদের তিরোভাব হইলে নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্মপ্রবর্তক এবং প্রজাগণের রাজ্য উভয়েরই অভাব হইল। মুশলমান-রাজ্য নিতান্ত বিশৃঙ্খল, সূতরাং অচিরে বিনাশ প্রাপ্তির উপক্রম হইয়া উঠিল। আরবরাজ্যে শান্তি রহিল না। মহম্মদের প্রিয়নিকেতন মদিনা নগরীতে ভয়ঙ্কর গোলযোগ হইবার উপক্রম হইলে ওসামাই-বিনুয়েইদ মহম্মদের গৃহসমক্ষে জাতীয় পতাকা স্থাপন করিলেন, এবং স্থানে স্থানে সৈন্যসংস্থাপনপূর্বক প্রজাগণের বিজ্রোহ ও কোলাহল নিরারণে রুতকার্য হইলেন। কে রাজা হইবে এই প্রথম প্রশ্ন। মহম্মদের স্বগণমধ্যে চারি ব্যক্তি কমতাপন্ন ছিলেন। আবুবেকার, ওমার, ওখমান্ এবং আলী এই চারিজনের স্বত্ব সর্বপ্রাধান্য বোধ হইল। মহম্মদের প্রিয়তমা পত্নী অয়েশার পিতা আবুবেকার, সূতরাং সেই সম্বন্ধে তাঁহার অনেক সহায় হইল। হাফসা নারী মহম্মদের অন্য এক স্ত্রীর পিতা ওমারের হস্তে মহম্মদ পবিত্র প্রস্থ কোরাণ

বিস্বাস করিয়া রাখিয়াছিলেন, সূতরাং অনেকে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। ওখমান্ মহম্মদের দুইটি তনয়ার পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উভয় এবং তাঁহাদের সন্তানগণ পরলোক গমন করাতে ওখমানের স্বত্ব অনেক লঘু হইলেও কেহ কেহ তাঁহার পক্ষে দাঁড়াইল। মহম্মদের খুল্লতাত-পুত্র আলী মহম্মদের একমাত্র তনয়া কতোমাকে বিবাহ করেন; সম্পর্ক বিবেচনা করিলে আলীর স্বত্ব সর্বপ্রাধান্য হয় সংশয় নাই; সূতরাং বহুসংখ্যক লোক তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। এইরূপে চারিজন সৈন্যধাক্ষ চারি বিভিন্ন স্বত্ব মুসলমানদিগের প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক রাজ্যাশাসন করিতে লোলুপ হইলেন। একেত সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা নিকট, তাহাতে আবার ধর্মবুদ্ধি, ন্যায়পরতা এবং মনঃপ্রাণে মহম্মদের সাহায্য করা প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিলে আলীকেই মনোনীত করা কর্তব্য হয়। যখন মুশলমানধর্ম ধর্মপ্রচারকের উন্নতির প্রত্যাশসময়ে নিতান্ত অবজিত এবং অনাদৃত হইতেছিল, যখন অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদিগের উপদ্রবে মহম্মদ নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, তখন আলী তাঁহার সহায় হন। মহম্মদ সঙ্কষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার প্রতিনিধি এবং জোতা বলিয়া ঘোষণা করেন। আলী কথায় এবং কার্যে যে পর্য্যন্ত মহম্মদ প্রদর্শন করিতেন, তদবধি হস্তে রণভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া তাহার উপযুক্ত পরাক্রমই দেখাই-

ভেন। তিনি অভিশর মিষ্টভাষী, সদা-
গাঁপী এবং সর্বসাধারণের উপকারী ছি-
লেন। তাঁহার সহধর্মিণী মহম্মদ-তনয়া
ফতেমার সঙ্গলনয়ন নিরীক্ষণে অনেকের
হৃদয় আলীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। স্তুরাং
কিরূপে নির্দিষ্টবাদের আলী সিংহাসনে আ-
রোহণ করিতে পারেন, তাহা অবধারণার্থ
ফতেমার গৃহে আলীর হিতৈষী এবং বন্ধু-
বর্গ সমবেত হইলেন।

অন্যান্য পক্ষও নীরবে বসিয়াছিলেন
না। আবুবেকার আয়েশার পিতা ছি-
লেন। মহম্মদের শিষ্যগণমধ্যে তিনি সর্ব-
প্রধান ও অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন। মহম্মদ
তাঁহার ভক্তি ও বন্ধুতাতে যৎপরোনাস্তি
সঙ্কষ্ট হইয়া, মৃত্যুকালীন তাঁহার ধর্মাবল-
ম্বীদিগের ক্ষম্য দেখরের নিকট প্রার্থনা ক-
রিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া যান। এ-
ক্ষণে আয়েশা আপন পিতার সাহায্যার্থ
সকলকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।
এই অনুরোধের আরও অর্থ ছিল। যা-
হাতে আলী মহম্মদের উত্তরাধিকারী না-
হন আয়েশার এই প্রধান কামনা ছিল।
মহম্মদের প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি অবিশ্বাস
উৎপাদনের আলীই প্রধান কারণ ছিলেন।
রূপবতী আয়েশা মহম্মদের পবিত্র প্রণয়ের
অবমাননা করিয়া অন্যের প্রেমে আবদ্ধ হ
ইয়াছেন এইরূপ অপবাদ আলীই প্রথমতঃ
মহম্মদের কর্ণগোচর করেন। তদবধি
আলীর প্রতি আয়েশার নিদাক্ষণ বিঘেষ
জন্মে। এক্ষণে সেই বিঘেষ-পরতা প্রযুক্ত

যাহাতে আলী সিংহাসন নাপান তদ্বিঘ্নে
প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

জনসাধারণ মধ্যে অনেকে ওমারের
পক্ষপাতী ছিল তাঁহার যৌরবপূর্ণ মুখশ্রী,
সিংহের ন্যায় পরাক্রম, অসাধারণ রণ-
কৌশল, বালকের ন্যায় সারল্য এবং অপ-
রিসীম সাহসাদি দৃষ্টে সকলে তাঁহাকে
দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাঁহার
কন্যা হাফসা ও তাঁহার হিত সাধনে চে-
ফার ক্রটি করেন নাই।

একদিকে ফতেমার গৃহে আলী ও
তাঁহার বন্ধুগণ সমবেত হইয়া মন্ত্রণা-নিরত
ছিলেন; অন্যদিকে প্রধানপদস্থ মুসল-
মানগণ আবুবেকার এবং ওমারের জন্য
বিশেষরূপে চেষ্টা আরম্ভ করিল। তাহারা
প্রথমতঃ উত্তরাধিকারের নিয়মমত সিংহা-
সনে অধিরূঢ় না হইয়া জনসাধারণ কর্তৃক
শাসনকর্তা মনোনীত হইবেন এইরূপ বি-
ধান করিলেন। এতদ্বারা আলীর স্বপ্ন এ-
কদা স্মরণ করা হইল। এক বংশ অন্য
বংশ হইতে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিবে, এই ভয়ে
অনেকে আলীর বিপক্ষ হইয়াছিল, তা-
হাতে আবার মূর্ত-প্রকৃতি আয়েশার ম-
হুগা ও চাতুর্য্য আলীর বিপক্ষে যুগপৎ
কার্য্য করিতে লাগিল।

অনন্তর যাহারা মক্কা হইতে মহম্মদের
সপক্ষ হইয়া পলায়ন করে এবং যাহারা
মদীনার তাঁহার সাহায্য করে এই দুই
দলের মধ্যে কোন দল শাসন কর্তা মনো-
নীত করিবে এবিষয়ে বিষমবিতর্ক উপস্থিত

হইল । প্রথমোক্তগণ বলিতে লাগিল মক্কা মহম্মদের জন্মস্থান, মক্কাতে প্রথমতঃ তাঁহার মত প্রচার হয় ; বিশেষতঃ তাহার মহম্মদের স্বর্গণ, প্রতিবেশী এবং তাহার মহম্মদের নির্বাসন সময়ে সজে সজে সমস্ত ক্লেম সহ্য করিয়াছে, সুতরাং তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্বাচনে তাঁহাদেরই অধিকার । শেষোক্তগণ বলিতে লাগিল, মদীনী মহম্মদের আগ্রসস্থান এবং মনোনীত বাসস্থান ; তাহার তাঁহার পলায়ন সময়ে সাহায্যদান করিয়াছে, প্রতিপক্ষগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া সেই সকল অত্যাচারী শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়াছে এবং তাহাদের সাহায্যে সনাতন ধর্ম বিস্তার হইয়াছে । সুতরাং রাজানির্বাচনে তাহাদেরই অধিকার ।

এই বিবাদ ভীষণাকার ধারণ করিল । উভয়পক্ষ অসি নিক্ষেপ করিয়া স্বপক্ষের প্রতি পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিল । মদীনাবাসীগণ বলিল রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইজন শাসনকর্তা মনোনীত করা হইবে । ওয়ার এই প্রস্তাব হাস্য করিয়া উড়াইলেন, এবং বলিলেন “ এক কোষে দুইখানা অসির স্থান হয় না । ” আবুবেকারও রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত করার বিকল্পে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন “ রাজ্যের এখন নিতান্ত শৈশব কাল, দুইভাগে বিভক্ত হইলে নিতান্ত দুর্বল হইয়া পড়িবে । ” তিনি বলিলেন একজন শাসনকর্তা মনোনীত করা কর্তব্য,

ওয়ার এবং আবু অবিদা এই দুই জনের মধ্যে বাহাকে ইচ্ছা নির্বাচন করা হউক । প্রথমতঃ যে করজন মহম্মদের শিষ্য হয় আবু অবিদা তাহার মধ্যে একজন ছিলেন । মক্কা হইতে পলায়ন সময়ে তিনি মহম্মদের সঙ্গে ছিলেন, এবং চিরদিন নিতান্ত অনুগত ও বিশ্বস্তভাবে কার্য নির্বাহ করেন ।

জানবুদ্ব এবং বয়োরুদ্ব আবুবেকারের উপদেশে কিয়ৎকাল শান্তিরক্ষা হইল । কিন্তু আরবজাতি স্থির থাকিতে পারে না, আরব সাগরের ন্যায় সর্বদা টলমল করে, পুনরায় দুইদল ক্ষেপিয়া উঠিল । তখন ওয়ার সহসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি বলিলেন ‘ আবুবেকার সর্বাধিকার বয়োরুদ্ব এবং জানী ; মহম্মদের অনুচরগণ মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিকারানুগত ছিলেন, সুতরাং সর্বাধিকার তাঁহাকেই মনোনীত করা কর্তব্য । ’ এই বলিয়া আবুবেকারের আনুগত্য স্বীকারের চিহ্নরূপে হস্ত চুম্বন করিলেন এবং তাঁহাকে রাজা বলিয়া আজ্ঞা পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন ।

ওয়ার আপন স্বার্থ প্রতিপক্ষের অনুকূলে উৎসর্গ করিলেন দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হইল, এবং প্রকৃত পক্ষে আবুবেকার সর্বশ্রেষ্ঠ ইহা তাহার স্মৃতি দেন্ধিতে পাইল । আবুবেকার কিরূপ সর্বদা মহম্মদের সঙ্গে সজে সজে থাকিতেন, তাঁহার উপদেশে কিরূপে মুসলমানদিগের

শাসনপ্রণালী সংস্থাপিত হয়; তাঁহার স্বার্থোৎসর্গ, জ্ঞান, শুরূকেশ সকল বিষয় একবার মনে হইল। সুতরাং তিনি যে শাসনভার গ্রহণে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ভবিষ্যে আর অণুমানও সম্প্রদেহ রহিল না। সকলে ওমারের দৃষ্টিশ্রুত অনুসরণ করিল। আবুবেকার শাসনকর্তা হইলেন। তখন ওমার দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন 'অতঃপর যে ব্যক্তি সাধারণের সম্মতি ব্যতিরিক্ত রাজা হইতে লোলুপ হইবে তাহার শিরশ্ছেদ হইবে, এবং যাহারা তাহাকে মনোনীত অথবা তাহাকে সাহায্য করিবে তাহাদিগের ও প্রাণদণ্ড হইবে।' একথা সকলে এক বাক্যে স্বীকার করিল; সুতরাং অন্যান্য রাজপদাধিকারীগণের পক্ষে কোন গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনা রহিল না।

উল্লিখিত কার্যপ্রণালী দৃষ্টিে ওমারকে নিতান্ত নিঃস্বার্থ ও সদাশয় বোধ হইতে পারে, কিন্তু স্থির নয়নে নিরীক্ষণ করিলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যাইবে। এইরূপ কোন কোন মুসলমান-গ্রন্থকার বলিয়া গিয়াছেন। উহাদের মত এই যে, আবুবেকার অত্যন্ত বুদ্ধ হইয়া ছিলেন, তাঁহার বয়স মহম্মদের সমান ছিল। আবুবেকার অনেকদিন বাঁচিয়া থাকিবেন তাহার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং অল্পদিন মধ্যে তিনি স্বয়ং সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন ওমারের এই আশা ছিল। তাঁহার শেষোক্ত কার্যে আলীর আশা

সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আলী কতেমার গৃহে বন্ধুগণ সহ অবস্থান করিতে ছিলেন, এই সমস্ত ঘটনাবলী যুগাকরে জানিতে পান নাই। কিন্তু তাঁহার আশা চিরদিনের জন্য উচ্ছিন্ন হইল। ইতিহাস-পাঠে যে পর্যন্ত জাত হওয়া যায় তাহাতে ঐ সকল গ্রন্থকারগণের লিখিত গ্রন্থে ও ওমারের চরিত্রে স্বার্থপরতার চিহ্ন মাত্রও লক্ষিত হয় না। তিনি অতিশয় ন্যায়পরায়ণ সরল-প্রকৃতি মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি মুসলমানধর্ম রক্ষা এবং নিস্তারের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে ভ্রমেও কোনরূপ কৌটিল্য বা কপটতা প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার প্রকৃতি আরবীর অনেকের প্রকৃতি অপেক্ষা উন্নত ও শ্রেষ্ঠ ছিল। সুতরাং তাঁহার উদার চরিত্রে দোষারোপ করা সহদয় লেখকের কর্তব্য হয় না।

আলী এবং তাঁহার বন্ধুগণ আবুবেকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া কোন প্রকার গোলযোগ ঘটাইবেন, এই ভয়ে আবুবেকার অতিশয় ভীত ছিলেন। তিনি একদল সৈন্যসহ আলীর বাসস্থানে পৌঁছিয়া সমস্ত নিরাকরণ করিতে ওমারকে অনুরোধ করিলেন। ওমার তাঁহার দলবল সহ কতেমার বাটী অবরোধ করিয়া আবুবেকারের অভিষেকরূতান্ত আলীকে জ্ঞাপন করেন, আলী আপনায় স্বয়ং প্রদর্শন পূর্বক আপত্তি করিলে ওমার তাঁহাকে বলেন যে আপত্তি পরিত্যাগ না করিলে তাঁ-

হার প্রাণদণ্ড হইবে, তাঁহার অনুচর বর্গের ও সেই দশা ঘটিবে, এবং জনসাধারণের ক্রোধবল্লিতে তাঁহাদের গৃহ ভস্মসাৎ হইবে। তখন ফতেমা নিতান্ত আর্তস্বরে মিষ্ট ভৎসনার সহিত বলিলেন ‘আপনি কি এইরূপ কার্য্য করিবেন? আমার বিশ্বাস হয় না।’ তখন ওমর বলিলেন যদি আপনারা জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত না হন এবং তাঁহাদের মতের প্রতিপক্ষতা করেন, তবে আমি সত্য সত্যই ঐরূপ করিব সন্দেহ নাই।’ আলীর বন্ধুগণ অগত্যা নত হইল এবং আবুবেকারকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিল। আলী নিতান্ত মর্গাহত হইয়া বিরলে ফতেমার গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইলে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী ফতেমার মৃত্যু হইল। অনন্তর নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত আবুবেকারের প্রতি রাজসম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি আবুবেকারকে এই বলিয়া মিষ্টভৎসনা করিতেন যে তাঁহাকে না জানাইয়া নিতান্ত কপট এবং অসরলভাবে রাজপদ গ্রহণ করা কদাচ কর্তব্য ছিল না। এই ভৎসনা অমূলক নহে। আলীর সম্মতি লইয়া কার্য্য করিলে তিনি এত দুঃখিত হইতেন না। তাঁহার যেরূপ মহৎ অন্তঃকরণ ছিল তিনি স্বকল্পে সম্মতি দিতেন। আবুবেকার বলিলেন, তিনি কেবল জনসাধারণের যৌলযোগ নিবারণার্থ সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছেন,

তাঁহার চক্রান্ত কিছুই নাই, কোন উপযুক্ত এবং ক্ষমতামণ্ডলী ব্যক্তি জনসাধারণের বাসনামুখারী কার্য্য করিতে স্বীকার করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছেন।

আলী এইরূপ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইলেন, এইরূপ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বাস্তবিক এরূপ ব্যাখ্যা হৃদয়ের সহিত স্মরণ করিলেন, এবং আপন পুত্র মহম্মদের দৌহিত্র-ধর হোসেন ও হোসেনকে সঙ্গে লইয়া আরবদেশের মধ্যস্থলবর্তী কোন নিভৃত প্রদেশে গমন করিলেন। হোসেন এবং হোসেন হইতে অনেক বংশ উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত বর্তমান আছেন। বংশমর্যাদার চিহ্নস্বরূপ তাঁহারা সবুজ বর্ণের শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া থাকেন।

আবুবেকার শাসনভার গ্রহণ করিলে সকলে তাঁহাকে রাজা উপাধি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল, তাহাতে তিনি অসম্মত হইলেন। অনেকে তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া আহ্বান করিত, কিন্তু তাহাও তিনি স্বীকার করিলেন না। তিনি বলিতেন তিনি ঈশ্বরের প্রতিভূ নহেন, মহম্মদের প্রতিভূ মাত্র। “আমি মহম্মদের উপদেশামুখবর্তী হইয়া কার্য্য করিব, তাহাতে সকল কুসংস্কার এবং পক্ষপাত হইতে বিরত থাকিব। যতদিন আমি ঈশ্বর ও তাঁহার মহম্মদের আজ্ঞা পালন করিব, ততদিন তোমরা আমাকে মান্য করিও, যখন তাহা না করি কেহ আমার

কথাটিও শুনিও না! যদি আমি ভ্রমে পতিত হই আমাকে সংশোধন করিও, তাহাতে সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হইব না।”

তিনি খলিফা উপাধি (উত্তরাধিকারী) গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরবর্তীগণ এই উপাধির সহিত ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং পৃথিবীতে তাঁহার ছায়াস্বরূপ ইত্যাদি গর্ভদ্যোতক উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহম্মদ যেমন বিষয় এবং ধর্ম উভয়ের রাজা ছিলেন, খলিফাগণও সেইরূপ রহিলেন।

আবুবেকারের অনেক নাম ছিল। কেহ সত্যধর্মপ্রচারক, কেহ অন্যান্য অধিধানও প্রদান করিত। আবুবেকার শব্দের অর্থ কুমারীর জনক। মহম্মদের স্ত্রীগণমধ্যে মাত্র আরেশাকে কুমারী অবস্থায় বিবাহ করেন, অন্যান্য সকল বিধবাবিবাহমাত্র। অন্যান্য হইতে প্রভেদ করার জন্য সকলে আরেশার পিতাকে আবুবেকার বলিত, এই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন।

আবুবেকারের বয়স সিংহাসন গ্রহণসময়ে ষষষ্টি বৎসর ছিল। তিনি দোষকায় এবং ক্ষীণজ ছিলেন। তাঁহার মুখত্রি উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল ছিল। পূর্বদেশীয় অনেক মুসলমান যেমন আশ্চর্যপ্রস্তুত করে, তিনিও সেইরূপ করিতেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন। প্রত্যেক কার্য সম্পাদন সময়ে এতদূর সতর্ক হইতেন যে, সহসা তাঁহার কার্যপ্রণালী দৃষ্টে কেহ তাঁহাকে খুঁজ মনে করিতে পারিত

না। কিন্তু তাঁহার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ নিঃস্বার্থ সাধুপ্রকৃতি শাসনকর্তা মুসলমানদিগের মধ্যে অতি বিরল ছিল। নীচপ্রকৃতি সংসারীর ন্যায় তাঁহার একটি কার্যও ছিল না। তিনি ঐশ্বর্য্য, জাঁকজমক, বিলাসবাসনা প্রভৃতি কিছুই জন্য ব্যস্ত ছিলেন না, কার্য্য করিয়া কোন অর্থও সাধারণের ধনাগার হইতে গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার একটি ক্রীতদাস এবং একটি উষ্ট্রমাত্র ছিল। তাহাতে যে কিঞ্চিৎ ব্যয় লাগিত এবং নিজের যৎসামান্যরূপ ভরণপোষণে যাহা আবশ্যক হইত, মাত্র তাহাই রাজকোষ হইতে গ্রহণ করিতেন। রাজকোষে যে অর্থ সঞ্চিত হইত তাহা পশুিত, গুণবানব্যক্তি এবং দরিদ্রদিগকে প্রতি শুক্রবার বিতরণ করিতেন। তন্ত্রিত স্বকীয় পরিশ্রমে যে কিছু আয় হইত তাহা সর্বদা দুঃখীগণকে দিতেন। যাহাতে দরিদ্রদিগকে যথানিয়মে দান করা হয়, অনর্থক তাঁহার শাসন সময়ে কোন অর্থ ধনাগারে বসিয়া না থাকে, তাহা অবহিত হইয়া দেখিবার জন্য আপন দুহিতা আরেশাকে উপদেশ করিলেন।

উল্লিখিত গুণগ্রাম সত্ত্বেও আরবীয়দিগকে শাসনাধীন রাখা আবুবেকারের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। যাহাদিগকে তরবারির সাহায্যে মুসলমান করা হইয়াছিল, জরীসেনাপতির শাণিত খজা এবং ভবিষ্যৎকাল মহম্মদের ধর্মোপদেশ ব্যতীত তাহারাই স্থির থাকিবে কেন? মহম্মদের

তিরোতাবের পর তাঁহার স্থলবর্তীকে কে-
হই ধর্মরাজ বলিয়া মানিল না, চারিদিকে
বিরোধোৎসাহনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল । অব-
শেষে মক্কা, মদিনা এবং তায়েফ্ ব্যতীত
অন্য সকল স্থান শ্রাবীম হইল ।

মালেকইবিন্ নাওইরা নামক একব্যক্তি
আপন দলবলসহ মদীনা নগরীর বিকক্ষে
ধাবমান হইলেন । তিনি যেমন উৎকৃষ্ট
অশ্বারোহী, সৎশজাত এবং বীরপুরুষ
ছিলেন, তেমনই শুরকবি এবং শুরপুরুষ ব-
লিয়া আরববাসীগণ তাঁহাকে অতিশয়
ভাল বাসিত । তাঁহার স্ত্রী সমস্ত আরব-
ললনা অপেক্ষা রূপবতী ছিলেন ।

আবুবেকার এই বিষয় অবগত হইয়া
দুর্জীল, রুদ্ধ এবং রমণীগণকে হুরাক্রমা
পার্কর্তব্য প্রদেশে প্রেরণ করিলেন, এবং ন-
গরী দুর্গপরিবেষ্টিত করিতে লাগিলেন ।
মহম্মদ বর্তমান ছিলেন না সভা, কিন্তু মু-
সলমানতরবারি তাঁহার সহিত অন্তর্মিত
হইয়াছিল না । ওয়ালেদ নামক বীরপু-
রুষ পূর্বপরাক্রমের পুনরভিনয় করিতে
প্রবৃত্ত হইলেন । তিনসার্ক্ চারিসহস্র
সৈন্যসহ বিপক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে
লাগিলেন । রাজাও নিশ্চেষ্টে রহিলেন
না । তিনি কোঁশলপূর্বক বিপক্ষকে হস্ত-
গত করিয়া জয়লাভ করিবেন সঙ্কল্প ক-
রিলেন । খালেদইবিন্ ওয়াজেদকে বলি-
য়াছিলেন, মালেককে কোন প্রকারে হ-
স্তগত করিতে পারিলে তাঁহার প্রতি যেন
যথাসম্ভব সন্মানসম্বোধন করা হয় ; কিন্তু খা-

লেদ সে প্রকৃতির ছিলেন না । তিনি বি-
পক্ষকে পরাজয় করিয়া তাহাদের দেশ
লুণ্ঠনার্থ সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন ।
মালেক এবং তাঁহার স্ত্রীর পত্নী অন্যান্য
অমেকের সঙ্গে বন্দী হইলেন ।

খালেদ ইবিন্ ওয়ালেদ মালেক পত্নীর
সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছিলেন, কোন
প্রকার মালেককে বিনাশ করা তাঁহার স-
ঙ্কল্প হইল । মালেক অতিশয় তেজস্বী ছি-
লেন, কথাবার্তার রাজার ক্ষমতা স্বীকার
করিলেন না, খালেদের আদেশে তাঁহার
প্রাণদণ্ড হইল ।

আবুবেকার এই কার্য্যে অত্যন্ত বিরক্ত
হইলেন । তিনি বলিলেন, ওয়াকন নামক
ঐথিয়োপীয়ো বাসী এক ব্যক্তি মহম্মদের
পিতৃব্যকে হত্যা করে কিন্তু মহম্মদ তা-
হাকে মুসলমান ধর্ম্ গ্রহণ করিলে ক্ষমা
করিয়াছিলেন । কোরাণের উপদেশানু-
সারে এক্ষণে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া ব্য-
ভিচার জন্য অথবা একজন মুসলমানের
জীবন হনন জন্য অপরাধীর প্রাণদণ্ড করা
কর্তব্য । কিন্তু এব্যক্তি ত্রয়াক্রান্ত প্রযুক্ত
এই পাপ কার্য্য করিয়াছে । অতএব দৈ-
ব্বরের কার্য্যে যে তরবারি নিষ্কোষিত
হইয়াছে তাহা বন্ধ করা কর্তব্য হয় না ।

মহম্মদ যখন পীড়িত ছিলেন তখন
মোসিলমা নামক এক ব্যক্তি আপনাকে
ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া ঘোষণা করে । অনেক
শিষ্য সংগ্রহ করিয়া লোহিত সাগর হ-
ইতে পারস্য সাগর পর্য্যন্ত সকল ভূভাগ

অধিকার করিয়া লয়। এক্ষণে এই ব্যক্তির দমনার্থ তরবারির প্রয়োগ হইল।

কথিত আছে যে মোসিলমার শিষ্যগণ মধ্যে আবুকাদলার রূপবতী ও গুণবতী পত্নী সেজ্জা প্রধানা ছিলেন। তিনি কবিত্ব সম্পন্ন এবং তামিমজাতীয় লোক মধ্যে অতিশয় প্রিয় ছিলেন। হিব্রুদিগের রাজা সালমনের তাঁহার জ্ঞান গৌরবে বিমুগ্ধ হইয়া শিবির রাজ্য তাহাকে দেখিবার জন্য যেমন গমন করিয়াছিলেন, সেজ্জাও মোসিলমাকে সেইরূপ দেখিতে গেলেন। ধর্মের পবিত্র আকর্ষণে না হইলেও রূপজ্ঞান্নেই উভয়ের নয়ন ও মন উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরস্পর পরস্পরের সহবাস ভাল বোধ করিল; অধিকাংশ সময় একত্র অতিবাহিত হয়। সেজ্জা তাঁহার নবীন প্রণয়ীর নিকট ভবিষ্যৎকালী ক্রমতা লাভ করেন, মোসিলমা ও প্রণয়িনী হইতে কবিত্ব শক্তি প্রাপ্ত হন।

ধর্মের পবিত্র আবরণে আবৃত থাকিয়া প্রণয়ী যুগল যখন কবিতা ও ভবিষ্যৎকালী স্মরণ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন খালেদ ও তাঁহার অগণ্য সৈন্য সেই স্থানের অবিরাম স্রোতে প্রতিরোধ জন্মাইল। মোসিলমা ততোধিক সৈন্যসহ প্রত্যাগমন করিলেন। যামামার রাজধানীর সমীপে আক্রমণের একটি যোরতর যুদ্ধ হইল। প্রথমতঃ বিক্রোহীর পক্ষেই বিজয়-চিহ্ন লক্ষিত হইল, বার শত মুসলমান ভূতলে শয়ন করিল। কিন্তু খালেদ তাঁহার সৈন্যগণকে পুনরায়

জয়ীকর করিলেন, বিপক্ষগণ সম্পূর্ণ পরাজিত হইল, তাহাদের দশ সহস্র সৈন্য ধও ধও হইয়া গেল। মোসিলমা প্রাণপণ যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু অন্ত্রাঘাতে অবসন্ন হইয়া ভূতলে পড়িলেন। কথিত আছে ইথিওপিয়াবাসী ওয়ায়ী মহম্মদের পিতৃত্বকে ওহদের যুদ্ধে যে অন্ত্রে নিপাত করে, ঠিক সেই অন্ত্রদ্বারা মোসিলমাকে হত্যা করিল। মহম্মদের পিতৃত্ব হামজাকে বধ করা সত্ত্বেও মহম্মদ ওয়াক্‌সাকে ক্ষমা করেন, ওয়াক্‌সা গুদবধি গোঁড়া মুসলমান হয়।

মোসিলমার অবশিষ্ট সৈন্যগণ ও শিষ্য সমুদয় আগ্রহের সহিত মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল। খালেদের নির্ভুর প্রকৃতিতে ও অসত্যভাবে মালেককে হত্যা করাতে তাঁহার প্রতি সাধারণের যে ঘৃণারতাব হইয়াছিল, এক্ষণে এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলে সেকথা সকলে ভুলিয়া গেল। তিনি আরও অনেক জয়লাভ করিলেন। যখন যেখানে যাহাকে সৈন্যদ্বারা স্বরূপ প্রেরণ করা হইত, খালেদ হয় তাহার সহিত মিলিত হইতেন না হয় সৈন্য দ্বারা বা অন্য প্রকার সাহায্য প্রদান পূর্বক জয়লাভ করিতেন। এইরূপে খলিকাদিগের রাজ্য স্থাপনাবধি এক বৎসর কাল মধ্যে যেখানে যে উচ্চ স্থানতাব ছিল সে সমস্ত প্রশমিত হইয়া সমস্ত আরবদেশে খলিকাক্রমতা অব্যাহতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল।

মোসিলমাকে পরাজয় করার অব্য-

বহিত পরেই আবুবেকার বাচনিক, লিখিত উপদেশ এবং দৈববাণী প্রভৃতি হইতে কোরাণের মূলভঙ্গু সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন । তৎপূর্বে কোরাণের কতকাংশ খণ্ড খণ্ড কাগজে লিখিত এবং অপরাংশ মহম্মদের শিষ্য ও সঙ্গীগণের স্মৃতিফলকে অঙ্কিত ছিল । পরমধ্যমিক ওমার এই কার্য সাধনে তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করেন । আফ্রিকার বৃদ্ধ মহম্মদের প্রাচীন সঙ্গীগণ মধ্যে অনেকে হত হইয়া দেখিয়া ওমার নিতান্ত ভীত ও দুঃখিত হন । অনন্তর তিনি বলেন “ এক্ষণে বাঁহারা জীবিত আছেন, বাঁহাদের স্মৃতিক্ষেত্রে মহম্মদের দৈবাদেশ, কার্যকলাপ এবং উপদেশ সকল লিখিত রহিয়াছে, সেই সকল

সনাতন ধর্মের সারতত্ত্বের সাক্ষীগণ মুহূর্ত মধ্যে চলিয়া যাইতে পারে এবং তৎসঙ্গে ইসলাম ধর্মের মূলগ্রন্থ বিলোপ হইতে পারে । ” সুতরাং ওমার নির্বন্ধাভিষয় সহকারে আবুবেকারকে অনুরোধ করেন, যে সকল জ্ঞাতসার ব্যক্তি জীবিত আছেন তাহাদিগহইতে এবং যে সকল অংশ লিখিত আছে তাহা হইতে কোরাণ সংগ্রহ হউক । তদনুসারে কোরাণ সংগ্রহ আরম্ভ হয় । বৃদ্ধ আবুবেকার এই কার্য সমাপন করিতে পারেন না । তাঁহার উত্তরাধিকারী খলিফা এই আরম্ভ সাধু কার্য সমাধা করিয়াছিলেন ।

(ক্রমশঃ ।)



শিশুশিক্ষা।*

বাস্তবিক প্রাধান্য দেবে এই যে তাহারা শিখিতে জানেন না এবং শিখাইতে জানেন না। কিরূপ শিখিলে সংসারে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা হওয়া যায়, এবং সূত্রে দিন নিরীহ করিয়া থাকিতে পারা যায়, তাহা তাহাদিগের বুদ্ধির অগম্য। এক অনুকরণে তাহাদিগের সর্বনাশ হইল। মহাপুরুষেরা যে পন্থা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, আমাদের ও সেই পন্থানুবর্তী হওয়া বিধেয়, এই মূলমন্ত্র তাহাদিগের হৃদয়ের চালক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং ইহারই বশবর্তী হইয়া তাহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে “যাহা হইয়াছে তাহা হইবেই, কিন্তু বাহা হয় নাই তাহা ভইবারও নহে।”

মহাপুরুষদিগের অনুবর্তী হওয়াকে আমরা নিন্দা করিতেছি না। বরং অনেক সময়ে ইহাই একমাত্র লক্ষণীয় কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তাই বলিয়া সকল সময়েই তাহাদিগের উচ্ছিন্ন উচ্চারণ করিয়া আপনাদিগের পক্ষ সমর্থন করা কোন প্রকারে যুক্তি সংগত নয়। দেশকাল, পাত্রভেদে নিয়মের এবং কার্যের প্রভেদ হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন কালে

কন্যাধরণই বিবাহের উৎকৃষ্ট আদর্শ স্থল ছিল। কিন্তু সেই কন্যাধরণ এক্ষণে দণ্ডবিধি অনুসারে গর্হিত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যাহারা ভারতচন্দ্রের অপূর্ব কবিতালহরী পাঠ করিয়া নাসিকায় বজ্রদিয়া ‘অল্লীল’ ‘অল্লীল’ বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকেন, তাহারা বুঝেন না যে, ভারতচন্দ্রের সময় আমাদের সময় নহে। এবং এই কথা নাবুঝিয়া অল্লীলতানিবারিণী সভায় কবিরয়ের অতুল্য বশস্তম্বরূপ বিন্যাস্তম্বর দক্ষ করিবার প্রস্তাব করেন। ধনা কুশাগ্রা বুদ্ধি! যাহারা আবার ভাবেন, যে মৎসামাংস ভোগ করিয়া প্রাচীন যোগীশ্বরিদিগের অনুকরণ করা আমাদের কর্তব্য। প্রাণিহিংসা পরম অপর্য এই মহামন্ত্রের বশবর্তী হইয়া যে সকল মহাপুরুষেরা পরকালের জন্ম ধ্যান নিমগ্ন ছিলেন তাহাদিগের কার্যের উপর বাক্য ব্যয় করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত ধ্বংসকার্য। যাহারা এরূপ বিবেচনা করেন তাহারা নগ্নদেশের আধুনিক অবস্থা এক বার ভাবিয়া দেখেন না। বাঙ্গালী দুর্বল, বাঙ্গালী কীর্ণ, বাঙ্গালী ভয়শীল পুত্ররাং এ অবস্থায় বঙ্গ মাংস

* এই প্রবন্ধের সারাংশ, দৃষ্টান্ত সমেত, হবর্টস্কেম্পলার প্রণীত ‘Education’

নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইল।

ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজনীয়। এইজন্যই আমরা বলিয়াছি যে, সকল কার্যে মহাপুরুষদিগের অনুকরণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

এই অনুকরণের বশবর্তী হইয়া বাঙ্গালী আপন অবস্থাকে উন্নত করিতে শিখে নাই। আদালত উকীলে পরিপূর্ণ, তথাপি বাঙ্গালী উকীল হইবে; কেননা তাহাদিগের পিতা মহাশয়েরা ওকালতী করিয়া দিন কাটাইয়াছেন। বিলাতে থাকিলেই যেম সিবিলিয়ান ও বারিস্টার হওয়া বাঙ্গালীর প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু আজি কালি ইংরাজপ্রিয় বাবুরা এরূপ ব্যবসায়ের যেরূপ নিন্দা করিয়া থাকেন এবং বাঙ্গালী অধঃপাতে গেল বলিয়া সংবাদপত্রে ঘোর গর্জন করিতে থাকেন, আমরা ইহাতে সে পরিমাণে দোষ দেখি না। বাঙ্গালীর আধুনিক অবস্থা অনেকটা রাজপ্রসাদাৎ। কার্যকরী বিদ্যালয় রাজ্যের দৃষ্টি নাই। যিনি সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া শিল্পি বা কৃষি শিখিলেন, তিনি হয়ত পরে মানসন্ত্রম রাখিয়া দিনপাত করিতে অক্ষম হইবেন, এবং কাজেই এখন ভাবেন যে তিনি আপনার পূর্বরূপে পাওয়ার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। যেখানে এত বিপদ এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্খের করতালি, সেখানে কে অগ্রসর হইবে? * কিন্তু কথাটা

* এস্থলে বক্তব্য যে কৃষি বিদ্যা পারদর্শী বাবু জীনাথ দত্ত (যিনি তিন বৎসর কবিয়াতে কৃষিবিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছেন। তৎকর্তৃক সম্পাদিত একখানি ক্ষুদ্র মাসিক

এই যে এমনি পোড়া দেশ যে বাঙ্গালী ক্রোড়পতির অর্থের স্রায় এখনও শিখিল না?

মুত্তরাং বাঙ্গালী যে শিখিতে জানেন না তাহা একপ্রকার স্থির। যাহারা শিখিতে জানেন না তাহারা অন্যকে কিরূপে শিখাইবে? বাঙ্গালী নিজে যেরূপ শিখে পুত্র পৌত্রকেও সেইরূপ শিখাইতে যত্ন করে। মুত্তরাং পিপীলিকাজেগীর মত তাহারা সংসারের লীলা খেলা করিয়া চলিয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত যুগক বা বৃদ্ধ হইতে বাঙ্গালার যে কোন উপকার হইবে না তাহা একপ্রকার আশাদিগের বিশ্বাস। যদি বাঙ্গালার কিছুমাত্র উন্নতি হয় তবে সে ভবিষ্যৎ বংশ হইতো। আমরা ত নিজ দেশের কিছুই করিলাম না, যদি পুত্র পৌত্রাদি হইতে কিছু হয় তবে উজ্জ্বল কেন চেষ্টা না করিব? কিন্তু এউন্নতি শিক্ষা সাপেক্ষ। প্রত্যেক বাঙ্গালীর কর্তব্য যে তাহার শিশুদিগকে যত্নপূর্বক শিক্ষা দেয়। এই শিশুশিক্ষা সম্বন্ধেই আমরা দিগের দুই চারিটা বক্তব্য আছে।

প্রথমতঃ কিরূপ শিক্ষা বঞ্চে আবশ্যিক? সর্বপ্রথমে বঞ্চে শিশুদিগকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক। এইটি বাপতের ব্যয় নির্বাহার্থ গবর্নমেন্টের মুখ চাহিতে হয়। কি আশ্চর্য বাঙ্গালী ভাবার এত উন্নতি হইতেছে তথাপি প্রয়োজনীয় একখানি সাময়িক পত্রের গ্রাহক জুটে না।

জাতির কোথাও দুৰ্ভেদ হয় না। শিশু চারি পাঁচবৎসর বয়সের হইলেই তাহাকে অমনি গুরুমহাশয়ের পাঠশালে বা স্কুল পণ্ডিতের অধীনে সমর্পণ করা হয়। গুরুমহাশয়ের এবং পণ্ডিত মহাশয়ের অধীনে থাকিয়া তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সফুটিত হইয়া যায়, স্মরণশক্তি জ্ঞান হয় এবং এই কোমল বয়সে গুরুতর মানসিকপরিভ্রমে শরীর দুৰ্বল হয় এবং আনুসঙ্গিক যত অকল্যান আসিয়া জুটে। সেই অল্পবয়সে তাহাদিগের শিক্ষিত বিষয়ে রসবোধ হয় না। শিখিলে আনন্দ বোধ হয় না। স্মৃতরাং তাহার পণ্ডিত মহাশয়দিগকে ফাঁকি দিতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়া থাকে। পণ্ডিত মহাশয় জানিতে পারিলে আর রক্ষা রাখেন না। বেত্রধারীরূপী হইয়া সেই কোমল পৃষ্ঠে নির্দয় রূপে প্রহার আরম্ভ করেন। শিশুদিগের কাজেই বিদ্যায় অগ্রছা জন্মে, শিক্ষকের প্রতি অভক্তি জন্মে। এবং যে পিতা মাতারা সন্তানের এইরূপ কষ্টের কারণ হন, তাহাদের উপরেই বা অভক্তি না জন্মিবে কেন? এই সকল শিশুরা বয়প্রাপ্ত হইলে মুর্থ, ধূর্ত, এবং অকর্মণ্য হইয়া বংশে কালি দিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদিগের পিতা মাতারা বুঝেনা যে, তাহাদিগের দোষেই সন্তান ধনুর্ধর হইয়া দাড়াইয়াছে। একজন ডাক্তার বলিয়াছেন যে, সাত আট বৎসরের পূর্বে সন্তানকে কখন স্কুলে পাঠান উচিত নয়, কারণ ইহার পূর্বে

মানসিক পরিভ্রম করিলে সন্তান ক্ষীণ, দুৰ্বল এবং অস্পঞ্জীবি হয়।

কেবল তাহাই নয়। বঞ্চে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিশেষতঃ শিশুদিগের কোন উপায় অবলম্বিত হয় না। শৈশবে স্বাস্থ্য রক্ষার যে রূপ প্রয়োজন এরূপ আর কখন নহে। মৃত্যু সংখ্যার তালিকা লইলে দেখা যায় যে, তাহাদিগের অধিকাংশই শৈশবে এবং বার্দ্ধক্যে ঘটিয়াছে। পিতা মাতারা শিশুদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন না, ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নয়। শিশু প্রাতঃকালেই শয্যা হইতে উঠিলে হিম লাগিবে বলিয়া তাহাদিগের পিতা মাতা পুনরায় শয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। এবং সেকথা প্রতিপালিত না হইলে প্রহার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। স্মৃতরাং শিশু আর প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করে না। শিশু পরিভ্রমজনক ক্রোড়া করিতেছে দেখিলে হয়ত বহুীয় পিতা বলিবেন “বসিয়া খেলা নাই কেবল উৎপাত”, এবং সঙ্গে সঙ্গে হয়ত দুই চারি চপটাঘাত পড়িল, অমনি শিশু পরিভ্রম হইতে ক্ষান্ত হইল। এইরূপে তাহাদিগের মনের স্মৃথ এবং শরীরের স্মৃথ একবারে নষ্ট করা হয়। যদি তাহার জীবিত থাকে তাহা হইলে অত্যন্ত দুৰ্বল হওয়ারই সম্ভাবনা। নহিলে পিতা মাতাকে কন্দাইবার হইলে ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

কেবল তাহাই নয়। খাদ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। শিশুরা প্রায় অ-

পরিমিত ভোজন করে না, কিন্তু তাহাদিগকে নিয়মিত ভোজনে বাধা দিলেই তাহারা সুবিধা পাইলে অপরিমিত ভোজন করিয়া থাকে। এইজন্য শিশুদিগের খাদ্য সম্বন্ধে কোন বাধা দেওয়া উচিত নহে। এতদ্ব্যতীত বহুদেশে মাংস ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে বলিবেন বঙ্গদেশে উত্তাপ প্রধান; এখানে মাংস ব্যবহারে বিপন্ন ফল ফলিবার সম্ভাবনা। যাহারা এরূপ ভাবিবেন, তাহারা ডাক্তারদিগের পরামর্শ লইলেই তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। তবে সকল প্রকার মাংস এখানে উপকারী না হইতে পারে। কিন্তু দাগ প্রভৃতি লঘুমাংস বর্জের যে উপযোগী তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মাংস যে সর্বাংশে পুষ্টিকারক তাহা বুদ্ধিমানকে বুঝান নিম্নপ্রয়োজনীয় ইহা বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে, জগতে দ্বিতীয় জাতিরা প্রায় সকলেই মাংসভোজী। ইংলণ্ডীয় কসিয় প্রভৃতি অন্যান্য জাতিরা ইহার শত শত দৃষ্টান্ত স্থল। মাংসে যে কেবল শারিরিক বল বৃদ্ধি করে তাহাই নহে, ইহাতে শরীরের আরও বৃদ্ধিকরে এবং সঙ্গত সঙ্গ অস্থি ও ধমনীগণকে পরিপুষ্ট করে। ডার্বিন একজাতির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে তাহাদিগের আরও শরীরের উচ্চতা সাধারণ মানুষের অর্ধেক। তাহারা নিরামিষাশী। অনেকে দেখিবেন যে, ইংরাজ এবং কাবেলীর তুলনায় বাঙ্গালীর

শরীরে আরও অনেক কম। দেশভেদে এবং ঋতুভেদে শরীরের অনেক পার্থক্য জন্মে, স্বীকার করি। কিন্তু খাদ্যমুসারেও যে পার্থক্য জন্মে তাহাও নিশ্চয়। এতদ্ব্যতীত মাংস ভোজনে সাহস ও বুদ্ধিবৃত্তি তেজস্বী হয়। লক্ষ্মণকুমার বাবু লিখিয়াছেন যে * কোন ব্যক্তিকে শিশুকালেই আনিয়া তৃণভোজন করিতে শিক্ষান গিয়াছিল, তাহাতে দেখা গেল যে, সে বড় হইলে আর কাহাকেও দংশন করিতনা এবং তাহার সাহস একেবারে নষ্ট হইয়া গৃহপালিত পশুর মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মাংসে যে বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ হয় তাহা মাংস ভোজীমাত্রকেই পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবেন। একবার বিলাতে কোন ব্যক্তিকে ছয়মাস কাল কল মূল তণ্ডুল খাইয়া রাখা গিয়াছিল। তাহাতে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষীণ, ও স্মরণ শক্তি ম্লান হয়। পরে আবার মাংস ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়া ছয়মাস মধ্যেই আপনার সেই পূর্ব শক্তিগুলিকে পূর্নাবস্থায় পাইল। স্মরণশক্তি ইহা স্পষ্ট দেখা বাইতেছে যে, বঙ্গ মাংস ব্যবহার একান্ত আবশ্যিক। কিন্তু শৈশবে সেই মাংস ব্যবহার করিলে যে পরিমাণে উপকার হইবার সম্ভাবনা, এমত আর কোন সময়ে নহে। কারণ শারিরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বল, মানসিক বুদ্ধিচয়ের কথা বল, প্রথম হইতে যত্ন করিলে

* বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার।

যে রূপ উৎকর্ষ লাভ করিবার সম্ভাবনা
এমত আর কোন রূপে নহে। অনেকে জা-
নেম, যে সম্ভান শিশুকালে দুর্বল থাকে,
সে আর কখন বলবান হইতে পারে না।
কিন্তু যে শৈশবে বলবান থাকে সে মাঝে
দুর্বল হইলেও যত্ন করিলে পুনরায় আপ-
নার স্বাভাবিক বললাভ করিতে পারে।
ইহাও অনেকে জানেন যে, একবার রোগ
হইলে শরীর কখন ঠিক পূর্বের মত
হয় না। এইজন্য শৈশবাবস্থা হইতেই স-
ন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

এই সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা আ-
বশ্যক। এই কথা শিশুদিগের সম্বন্ধে এবং
লক্ষ্যবস্তু: সুবক সম্বন্ধেও প্রযোয্য। অতি
রিক্ত মানসিকপরিশ্রমে আধুনিক ছাত্রেরা
শরীরকে দুর্বল করিয়া ফেলে। পরীক্ষা
উত্তীর্ণ হইবার জন্য তাহারা শরীরকে
এরূপ কষ্ট দিয়া থাকে যে, হয় পরীক্ষার
সময়েই নয় পরীক্ষার পরেই তাহাদিগকে
গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।
'সম্ভ্রং বা সাধয়েম শরীরং বা পাতয়েম' এই
ক্রমের বশবর্তী হইয়া তাহারা সমাজের
কি পরিমাণ অনিষ্ট করে তাহা একবার
চাছিয়াও দেখে না। শিশুদিগের সম্বন্ধে
এতদ্বিষয়ে পিতা মাতার দৃষ্টি থাকা
কর্তব্য। (*)

* এই দোষের কিয়দংশ শিক্ষাবিতা-
গের কর্তৃপক্ষীয়দের উপর অর্শে না কি?
তাহারা একটু অনুগ্রহ করিলেই ত ছা-
ত্রেরা এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পায়।

বিভীতঃ বদ্রে একগণে কিরূপ শিক্ষা
হওয়া আবশ্যক। বিলাতেও এই বিষয়ে
উর্ক হইতেছে। তাহারা বলিতেছে যে
বিলাতে একগণে কাব্যের কিছু উন্নতি আ-
বশ্যক। আমরা বলিতেছি কাব্যে আমা-
দিগের হাড় জ্বালাতন হইয়াছে, আমরা
কাব্য আর চাহি না। মূল কথায় সকলে-
রই সীমা আছে। কাব্যের যতদূর সীমা,
বিলাতে ততদূর যায় নাই। আমাদিগের
কাব্য সীমা ছাড়াইয়া এতদূর চলিয়া গি-
য়াছে যে কাব্যের জ্বালায় আমরা অস্থির।
সেই যে জয়দেব 'ললিত লবঙ্গলতা' বলিয়া
প্রেমের বাঁশরী বাজাইয়াছিলেন অমনি
রসিক বাঙ্গালী কবি 'প্রেম' 'প্রেম' 'প্রেম'
করিয়া পাগল। বিরহ বর্ণনা বসন্ত বর্ণনা
বাঙ্গালীর লেখনীর অগ্রে বর্তমান (*)
কিছু দিনের জন্য আমাদিগের উচিত গ-
ভীর বিষয় আলোচনা করা। বদ্রে বিজ্ঞা-
নের উন্নতি চাই। সেই উপস্যায় একগণে
নিমগ্ন হওয়া কর্তব্য। কেবল যে আমরা
কবিদিগের জ্বালায় জ্বালাতন ভাছা নহে,
কাব্যপাঠকদিগের জ্বালায়ও কিয়ৎ পরি-
মাণে অস্থির। চতুর্দশবর্ষীয় রসিক নাটক
হাতে করিয়া ভারকল্প করতঃ 'হা প্রেমসী'
'হা প্রেমসী' বলিয়া ভবিষ্যৎ প্রণয়ি-
নীর সহিত আলাপ করে এবং তাহার বি-
য়ে কান্দিতে থাকে, ইহা কি কম হাস্য-

* হুববিয়া কম্য করিবেন। তাঁহা-
দের কথা আমরা বলিতেছি না। তাঁহারা
বদ্রে কুলভিলক।

জনক এবং শোচনীয় ব্যাপার ? সুতরাং বাহাতে শিশুরা কাব্য পড়িয়া এইরূপ 'কবিত্ব' না পান তদ্বিষয়ে পিতা মাতার দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । শৈশব হইতেই তাহাদিগকে বিজ্ঞানে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে সাত আট বৎসরের পূর্বে সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠান কর্তব্য নয় । ইহাতে অনেকে বলিবেন, যে 'ক' 'খ' শিখিবার উপ-যুক্ত নয় সে বিজ্ঞান শিখিবে কিরূপে ? আমরা তাহাদিগকে উপায় বলিয়া দিতেছি । বিদ্যালয়ে পাঠাইবার পূর্বে যে শিশুর কোনরূপ শিক্ষা হইবে না তাহা নহে । মুখে মুখে সন্তানকে যত শিখান যায় ততই ভাল । মুখে মুখে শিখিতে মস্তিষ্কের পরিষ্কার হয় না এবং শিখিতেও আয়োদ হয় । সুতরাং সে সময়ে বাহা শিখে তাহা আর জন্মে ভুলেনা । শিশু চাকুরমার নিকট কত আশ্রয়ের সহিত রাজা ও রাণীর গম্প শুনে । বাহার শিখাইতে জানেন, তাহাদিগের শিশুরাও তাহাদিগের নিকট হইতে অত্যন্ত আশ্রয়ের সহিত শিক্ষা গ্রহণ করে । আমরা উদাহরণ দিতেছি । মনে কর তোমার শিশুকে তুমি বাগানে লইয়া গিয়াছ । একটি ব্লকের পত্র ছিড়িয়া তাহার হাতে দিয়া বলিবে এইরূপ পাতা বাগানে যদি আর থাকে লইয়া আইস । শিশু অত্যন্ত আনন্দের সহিত একাধিক করিবে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই পাতার সহিত অন্য

পাতার সাদৃশ্য পাইলেই তুলিয়া আনিবে । অতি সামান্য মাত্র বিভিন্নতা থাকিলে সে বুঝিতে পারিবে না । তখন দুইটি পাতার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিবে । প্রথমে হয়ত সে বলিবে কিছুই নাই । পুনরায় তুমি ভাল করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিবে, তখন সে বহুকষ্টে একটি বিভিন্নতা দেখাইতে সমর্থ হইবে । তখন তুমি বলিবে আর কিছু আছে কি না ? এইরূপে শিশু যতক্ষণ আপনি বলিতে পারে ততক্ষণ বলাইবে, পরে বলিয়া দিবে । এইরূপে শিশুর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা জন্মিবে । একপ্রকার পাতার বিষয় শিখাইলে অন্যরূপ পত্রের বিষয় শিখাইবে । এইরূপে সে শীঘ্রই উদ্ভিজ্জ বিদ্যার মূলমন্ত্র হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া ফেলিতে পারিবে । এইরূপে তাহাকে ক্ষেত্রতত্ত্ব, রসায়নবিদ্যা, মঙ্গীত বিদ্যা প্রভৃতি সকলেরই কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক ।

তৃতীয়তঃ নীতিশিক্ষা । এসম্বন্ধেও শিশুদিগের উপর পিতা মাতার দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । সন্তান বড় হইলে বাহাতে গুরুজনের অবাধ্য না হয়, সেইজন্য শৈশব হইতেই কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক । কিন্তু সে শিক্ষা কিরূপ ? স্পেসার বলেন স্বভাবের শিক্ষা । অনেক পিতা মনে করেন যে, প্রহারে সকল শাসন হয় । যে সন্তান পিতার অবাধ্য তাহাকে প্রহার কর, ইহাই তাহাদিগের উপদেশ । এটি যে ষোরতর ভ্রম তাহা বলা বাহুল্য । সন্তানকে কখন

প্রহার করিবে না। স্বভাবের শিক্ষার শিশুকে শাসন করিবে। আমরা একটি উদাহরণ দিতেছি। মনেকর তোনার শিশু-সন্তান প্রদীপের নিকটগিয়া কাগজ পুড়িতেছে। যদি সে সময়ে তুমি তাহাকে প্রহার কর, তাহা হইলে সে ভাবিবে যে আমি কোন দোষ করিনাই তথাপি মার খাইলাম। কাজেই পিতার উপর তাহার অভক্তি জন্মিবে। এরূপ আর দুই চারিটি ঘটনা হইলেই পিতার উপর ক্রমেই অশ্রদ্ধা দৃঢ় হইয়া যাইবে। এবং তখন পিতার একান্ত অবাধ্য হইয়া উঠিবে। এবং সেই অবাধ্যতা শাসন করা পিতার সাধ্যাতীত। সুতরাং সন্তান যখন এইরূপ প্রদীপ লইয়া ক্রীড়া করিতে থাকিবে, তখন পিতার উচিত যে তাহাকে মুখে বারণ করিয়া দেয়। পিতা বলিবে, 'দেখ এরূপ করিও না হাত পুড়িয়া যাইবে' শিশু হয়ত শুনিবে না। কিছু পরেই হাত পুড়িবে, এবং তখন পিতা যে ঠিক কথাটি বলিয়াছিল, এই জন্য পিতার প্রতি ভক্তি হইবে। এবং পিতার কেন অবাধ্য হইয়াছিল তজ্জন্য দুঃখ করিবে। এবং সেই স্বভাবের শিক্ষা পাইয়া সে আর কখন অগ্নির নিকট যাইবে না। এইরূপে তিন চারি বার পিতার কথার বাথার্থ্য বুঝিতে পারিয়া, এবং যখনই পিতার কথা অমান্য করিয়াছে তখনই বিপদ ঘটনাছে, এটি দেখিয়া পিতার প্রতি তাহার অচলা ভক্তি জন্মিবে।

মানসিক শিক্ষা ও নীতি শিক্ষা পর-

স্পর দুইটি ভাগিনী। যেখানে মানসিক শিক্ষা সেইখানেই নীতি শিক্ষার আবির্ভাব, এবং যেখানে নীতি শিক্ষা সেইখানেই মানসিক শিক্ষার উন্নতি। জানী হইলেই সং হয় এবং সং হইলেই জানী হয়। সুতরাং পিতা মাতাদিগের কর্তব্য যে, যাহাতে তাহাদিগের সন্তান দিগের মানসিক ও নৈতিকবৃত্তি সকল যুগপৎ উন্নতিলাভ করে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন লওয়া। নৈতিক বৃত্তি বাতিত মানসিক বৃত্তির স্ফূরণ হয় না। মানসিক বৃত্তি বাতিত নৈতিক বৃত্তির স্ফূরণ হয় না।

কিরূপে শিশুদিগকে শিক্ষাদান করিতে হয় আমরা সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিলাম। বাহারী ইংরেজী জানেন না তাহাদিগের জন্যই এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। বাহারী ইংরেজী জানেন, তাহাদিগের প্রতি আমাদের অনুরোধ যেন তাঁহার একবার স্পেন্সর কৃত মূলপুস্তক পাঠ করেন।

উপসংহার কালে আমরা দিগের এইমাত্র বক্তব্য যে এতদূর আসিয়া চিত্রটি উপন্যাসিক হইয়াছে বলিয়া অনেক আক্ষেপ করিবেন। তাঁহার বলিবেন যে, শিশুকে এইরূপ সর্ব্বাঙ্গস্বন্দর শিক্ষা দেওয়া মানুষের অসাধ্য। ইহাতে যে যে উপকরণ আবশ্যিক করে তাহার সকলগুলি একজনের ভাগ্যে ঘটা অসম্ভব। যে পিতার অর্থ আছে, তাহার হয়ত নিজের ভাল শিক্ষা দাই সে সন্তানকে কিরূপে

শিখাইবে? বাহার শিক্ষা আছে তাহার সময় নাই ইত্যাদি শত শত বিয় যে ঘটে তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু যতদূর সম্ভব ততদূর শিক্ষা কেন না দেই? বাহাদেবের উপর বজের সমস্ত আশা তরসা

নির্ভর করিতেছে, তাহাদিগের উন্নতির জন্য যে যত্ন না করিল সে কি মানুষ? শিক্ষা শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলিবার রহিল।

ক্রীম, ৪—

জয়পুর।

৪র্থ খণ্ডের ৭ম সংখ্যার ৩৩৯ পৃষ্ঠার পর।

কুন্তলদেবের পরলোক গমনের পর তদীয় পুত্র পূজন সিংহাসনে অধিরোধন করিলেন। রাজপুত্র-কবিহুল-চূড়ামণি চাঁদ পূজন-চরিত্র যেরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে পূজনকে বীরকুলপুত্রনীর বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। পূজনের সমগ্র বীরকীর্তির অবতারণা করিতে হইলে সাময়িক পত্রের পত্র পৃষ্ঠার অবলম্বন পরিভাষা পূর্বক এক খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রচার আবশ্যিক হইয়া উঠে। সুতরাং তাহাতে আমাদের নিরন্তর হইতে হইয়াছে, অতএব পূজনের পরিচর সংক্ষেপে বর্ণন করিতে হইল বলিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইলাম।

চোলরাজ হইতে পূজন বর্ষ পুরুষ। এই অসাধারণ বীরপুরুষের বীরকীর্তির প্রতিভা এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে রাজকুলমাননীর দিলীপের চোহান বংশীয় বিখ্যাতনামা পৃথীরাজ পূজনের সহিত স্বীয় সছোদরার বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং স-

তাহা একশত আটজন প্রধান কুলীন সেনানায়েকের মধ্যে তাঁহাকে প্রধান পদ প্রদান করিয়াছিলেন। পূজন এবং প্রকার গোঁরবাল্পদ পদের যথার্থ যোগ্য পাত্র ছিলেন। তিনি হুইবার মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-সীমা-সংলগ্ন পার্শ্বভাগ প্রদেশের খাইবার নামক বিখ্যাত গিরি-সঙ্কটে পূজন এক যোঁরতর যুদ্ধে যখন সেনাপতি প্রসিদ্ধ সাহাবুদ্দিনকে পরাভূত করিয়া গিজনী নগর পর্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ খাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই অশিক্ষা প্রভাবে চণালাদিকৃত মাহোবা দেশ পৃথী রাজের করতলস্থ হয়। পৃথীরাজ যে কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্রের পরম রূপ লাভগ্যবতী হুহিতাকে হরণ করেন, তদন্তিনয়ে পূজন শৌর্যবীর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। জয়চন্দ্র পৃথীরাজের এই অবস্থা ব্যবহারে কোপাঘিত হইয়া তাঁহার সহিত পাঁচদিন যোঁরতর যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধব্যাপারে

চতুঃষষ্টি বীরপুস্তক স্বাগনসমভিব্যাহারে পু-
থ্বীরায়ের সহকারিতার জন্ত নিযুক্ত থাকেন।
পূজন এই যুদ্ধেই প্রাণ পরিত্যাগ করেন।
রাজকবি চাঁদ এই যুদ্ধের যেরূপ লোমহ-
র্ষণ ব্যাপার বর্ণনা করিয়াছেন, এস্থলে তা-
হার কিয়দংশের অনুবাদ প্রকাশ করা গেল;

“ মিরার বংশীয় গোবিন্দ গোহলোট
পূজনসহ সমবেত হইয়া শত্রুগণের সহিত
যুদ্ধ করিতেছিলেন। গোবিন্দের পতনে
শত্রুদল আনন্দে হৃত্য করিতেছে দেখিয়া
বীরপ্রাণ্য পূজন কুলিশপাতের স্নায় যুদ্ধ
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। উভয় করে
ভীষণ খজা ধারণ করিয়া অবিরত শত্রুগুণ
নিপাত করিতে লাগিলেন। চারি শত
যোদ্ধা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাঁ-
হার সাহায্যার্থে কেবলমাত্র কেহরি, পীপা,
বোহো, নরসিংহ এবং কচরা এই ভ্রাতৃ-
পঞ্চ সশস্ত্রে উপস্থিত ছিলেন। নিরন্তর
বল্লম ও খজা চালিত হইতে লাগিল, অন-
বরত নরগুণ বর্ষণ হইতে লাগিল এবং ন-
রশোণিতে রণভূমি প্লাবিত হইয়া গেল।
এমন সময়ে পূজন জয়চন্দ্রের বন সেনা-
পতি ইতিমাদকে আক্রমণ করিয়া তাহার
মস্তকচ্ছেদন করিলেন, কিন্তু তাহার মস্তক
ভূমিতে পতিত হইতে না হইতেই তাহারই
পরিভ্রাত কালরূপী বল্লম পূজনের বক্ষঃ-
স্থল বিদ্ধ করিল। কুর্ম * বীরশয্যায় শয়ন

* পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে,
কল্পে হইতে কচবহ বংশের নাম হওয়ার
পূজনকে কুর্ম বলা হইয়াছে।

করিলেন। অপসরাগণ তাঁহার দেহ লইয়া
বিবাদ করিতে লাগিল। রণভূমি মৃতদেহে
আচ্ছাদিত হইল, মহাদেবের মাল্য অ-
নেক নরগুণ সংযোজিত হইল। পূজন ও
গোবিন্দের পতন সময়ে দিবা এক প্রহর
মাত্র অবশিষ্ট ছিল। ভ্রাতৃশবের উদ্ধার
সাধনার্থ পলহন কুপিত কেশরীর স্নায় শ-
ক্রমণে প্রবেশ করিলেন। কনৌজশ্রেণী
সুস্তিত হইল, জয়চন্দ্রের ধোরখনঘটা সদৃশ
নিবিড় সৈন্য পশ্চাদভিমুখ হইল। পূজ-
নের ভ্রাতা ও পুত্র বীরকুলগৌরব কর্ণের
ন্যায় বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু
উভয়েই রণশয্যায় শয়ন করিলেন। সূর্য্য-
দেব আপনার রথ প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহাদি-
গকে স্বলোকে লইয়া গেলেন।

“ এই মহাযুদ্ধের ভীমগর্জনে গজা
ভয়ে সঙ্কুচিত হইলেন, চন্দ্রদেব কম্পিত
হইলেন, দিকপালগণ হাহাকার করিতে
লাগিলেন, কনৌজ সম্প্রদায় প্রতিনিবৃত্ত
হইল এবং এই অবকাশে পূজনাত্মজ পি-
তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন।
পূজন পৃথ্বীরায়ের বর্ষ্মস্বরূপ ছিলেন। কা-
ন্যকুঞ্জের বীরগণকে তিনি অতি ভীততর
অস্ত্রসকল দান করিয়াছিলেন। তাঁহার
বীরকীর্তি বর্ণন করা কবিরও সাধ্য নহে।
তিনি শেষ নাগোপরি পদস্থাপন করিয়া
নরবন নিমূল করিয়াছিলেন। বীরসন্তান
কেহই তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে নাই।
পূজন রণশয্যায় শয়ন করিয়া কহিয়াছি-
লেন,—“ মনুষ্যের একশত বৎসর মাত্র

পরমায়ু, তাহার অর্ধেক রজনীর ঈশ্বরকারে
বিনষ্ট, তাহারও অর্ধেক বাল্যক্রীড়ার সুখা
অতিবাহিত হয়, কিন্তু জগদীশ্বর আমাকে
খুশী ধরিতে ক্ষমবান করিয়াছিলেন ।”
তিনি এই কথা বলিতে বলিতে যখন হস্তা-
স্তের করকবলিত হন, সেই সময়ে স্বীয়
পুত্রের হস্ত শত্রুদগ্ধে নিকসিত দেখিতে
পান । তাহাতে তাঁহার আত্মা পরিতৃপ্ত
হয় । মালসী সাতবার অক্রোহিত হন, তাঁ-
হার ঘোটক অক্রোহাতে জর্জরিত হয় । পু-
ত্রপুত্র অত্যন্ত বীর্ষ প্রকাশ করিয়াছি-
লেন ।”

পুত্রের কনিষ্ঠ পুত্র মালসী অধ্ব-
রাজ্যে পিতৃসিংহাসনে অধিরোধন ক-
রেন, রাজকবি চাঁদ “ পুথুরায় রায় ”
নামক উদীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থে মালসীর ভূ-
রোসী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন । মালসী
কত্রাহি মাধক স্থানে এক ঘোরতর যুদ্ধে
যাও রাজকে পরাভূত করেন । মালসী
হইতে দশম পুরুষ পর্যন্ত রাজগণ কেহই
কোন বিশেষ কার্যে প্রতিষ্ঠা লাভ ক-
রিতে পারেন নাই । যথাক্রমে তাঁহাদের
নাম নির্দেশ করা বাইতেছে ।—বিজল,
রাজদেব, কীলন, কুন্তল, জুসী, উদয়কর্ণ,
নরসিংহ, বনবীর, উদ্বারণ, ও চন্দ্রসেন ।
এতদ্ব্যতীত উদয়কর্ণের এক পুত্র বালোজী
কোন কারণ বলতঃ পিতৃ গৃহ পরিভ্যাগ
পূর্বক অযুক্তশীর নগর অধিকার করিয়া
তথায় বাস করেন । তাঁহার পৌত্র শি-
খজী ঐ ক্ষুদ্র রাজ্য ক্রমে বিস্তার করিয়া

স্বীয় নামানুসারে উহার শিখাবতী নাম
প্রদান করেন ।

চন্দ্রসেনের পুত্র পৃথীরাজ । পৃথীর
সপ্তদশ পুত্র, তদ্ব্যতীত ষাটদশজন মাত্র বয়ঃ
প্রাপ্ত হন । তিনি জীবদ্দশাতেই ঐ ষা-
টদশ পুত্রকে আপন রাজ্য বিভাগ করিয়া
দিয়া যান । তাঁহাদিগের ষারাই কচ্ছব-
বংশের ষাটদশ শাখা সংস্থাপিত হয় । ঐ
ষাটদশ শাখার নাম কচ্ছব বংশের “ ষা-
টদশ কোটরী ” বলিয়া বিখ্যাত আছে ।
পৃথীরাজ পুত্রগণের মঙ্গল সাধনে বিশিষ্ট
রূপে যত্নবান ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার এক
কালরূপী পুত্র ভীমসিংহ তাঁহার বধ সা-
ধন করিয়া সিংহাসন অপহরণ করে । কা-
লের কি কিচিত্র গতি ! হরুত্ত পিতৃহস্তা
ভীমসিংহ এই দুহুতিলক্ক রাজ্য অধিক
কাল ভোগ করিতে পারে নাই । হাতে
হাতেই ইহার ফলভোগ করিয়াছিল ।
উদীয় হুরাচার পুত্র ঐশকর্ণ স্বয়ংগণের
পরামর্শানুসারে পিতৃহস্তা পিতার বধ সা-
ধন করে । * এই হুরাচার পিতৃবধের

* বোধ হয় ঐশকর্ণের এই হুরাচা-
রিতা সম্বন্ধে তৎকালীন সত্রাট বাবর সা-
হের কিছু পরামর্শ ছিল, কারণ, রাজপুত
ইতিহাস বেত্তারা কহেন, ঐশকর্ণ তীর্ষ-
যাত্রা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সত্রাট স-
ম্মিধানে উপস্থিত হইলে বাবারসাহ তাঁহাকে
‘ নরবারের রাজা ’ এই উপাধি প্রদান
করিলেন । এই নরবার রাজ্যের বংশ
কচ্ছব বংশের শাখাস্বরূপ গণনীয় হয় ।

PACHYDERMATA OR THICK SKINNED ANIMAL

স্থূলত্বক পশু—শূকর।



Though the animal does not display any very great amount of literature, it exhibits a capacity of observation and obedience, which would hardly have been expected from so maligned an animal.—WOOD

পাপ হইতে মুক্তি লাভের জন্য তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। অপর রাজ্যের কোন কোন রাজাবলীর মধ্যে এই দুই ছদ্মস্বার নামোন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় স্বর্ণপাত্র বলিয়াই পরিভ্যক্ত হইয়াছে।

ঐশকর্ণের পুত্র বাহার মল্ল সর্ব প্রথমেই মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করেন। তিনি বাবর সাহের অনেক সহায়তা করেন এবং হুমায়ুন বাদসাহ কর্তৃক “পঞ্চ হাজারী মন্ সর্ব” অর্থাৎ কখন রাজ্যের অপুত্রতা নিবন্ধন কচুবহ সিংহাসন শূন্য হইলে এই বংশ হইতে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হয়। যখন অশ্বরের শেষ রাজা জগৎসিংহ গভার হন, তখন তাঁহার অপুত্রতা নিবন্ধন নববার বংশ হইতে এক পুত্র আসিয়া উত্তরাধিকারী হয়।

পাঁচ হাজার অশ্ব সৈন্যের অধিনায়ক এই উপাধি প্রাপ্ত হন। বাহার মলের পুত্র ভগবান দাস যোগল সম্রাটদিগের সহিত অত্যন্ত সম্প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আকবর অত্যন্ত কৌশলী ছিলেন। প্রতাপশালী ব্যক্তিগণের সহিত সম্প্রীতি করিতে তাঁহার কোন চেষ্টারই ক্রটি হইত না। জানি না, তিনি ভগবান দাসকে কি কুহকে ভুলাইয়া ছিলেন। কচুবহ রাজ যোগল রাজবংশের একুশ অমুরাগী হইয়াছিলেন যে, আকবর পুত্র জাহাঙ্গীরের সহিত আপন হৃদিতার বিবাহ দিয়া স্বর্ধাকুল কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। এই পরিণয়ের ফল স্বরূপ রঘুবংশীয় কুলকামিনীর গর্ভে খস্ক নামা ছর্ভাগী রাজকুমারের জন্ম হয়।

(ক্রমশঃ।)

শুকর

বিগত বারের বাঙ্গবে আসিয়া এবং আফ্রিকা এই উভয় ভূখণ্ডের হস্তীর বিষয় উল্লেখ করিয়া কেবল আসিয়ার হস্তীরই বিবরণ লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আফ্রিকার হস্তীর জীবনরতান্ত উপযুক্তরূপে সংগ্রহ করিতে না পারিয়া মনে করিয়াছিলাম, এই বারের বাঙ্গবে তাহা প্রকাশ করিব। কিন্তু এবারও আফ্রিকার হস্তীর বিবরণ উপযুক্তরূপে সংগৃহীত হয় নাই, সুতরাং

স্কুলচর্মা জাতীয় আর একটি পশুর জীবনরতান্ত লিখিয়া পাঠকের সমীপে উপস্থিত করিলাম, ইহার শীর্ষক দেখিলেই পাঠক ইহাকে চিনিতে পারিবেন; এই জন্তকে বিশেষরূপে চিনিবার কারণ এই, আমাদের দেশে মনুষ্যানিবাসের নিকটে এই জাতীয় ভিন্ন অন্য কোন স্কুলচর্মা জাতীয় জন্ত বাস করিতে দেখা যায় না। ইহারা যেমন বলশালী তেমনি ভ-

শরীর যেমন বলিষ্ঠ, স্বভাবও তেমনি কর্কশ এবং আকৃতিও তদনুরূপই হাঙ্গাম্পদ । অন্যান্য জন্তুর যেমন দূর হইতেই শরীর ও মস্তক পৃথকরূপে দেখা গিয়া থাকে, শুকরের সেসরূপ নহে । ইহাদিগের মস্তক ও শরীরের সংলগ্ন স্থান অতি ধর্ম ও স্থূল । শরীরের অন্যান্য স্থান কর্ণিন এবং মাংসল । শূকরের সর্বাঙ্গ মোটা মোটা রোমাবলী দ্বারা আবৃত, কিন্তু উহা ঘনসন্নিবিষ্ট নহে । ঘাড়ের রোমগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, মোটা ও দৃঢ় । সাধারণ ভাষায় এই রোমগুলিকে ‘কুঁচি’ বলে, আমরাও এখানে উহাকে শূকরের রোম না বলিয়া কুঁচি বলিব । এই কুঁচি গুলি মানুষের অনেক কার্যে ব্যবহৃত হয়, এদেশীয় প্রাচীনা স্ত্রীলোকদিগকে ইহা দ্বারা শাঁখা ও গহনা পরিস্কার করিতে দেখিয়াছি ।

যখন শূকরের ক্ষোদ হয়, তখন ঘাড়ের কুঁচিগুলি খাড়া হয়, কিন্তু শরীরের অন্যান্য স্থানের রোম ঐরূপ খাড়া হইতে পারে না । ইহাদের চক্ষু নিতান্ত ক্ষুদ্র ও নিস্তেজ । মাথা হইতে নাসিকার অগ্রভাগ পর্যন্ত ১৬।১৭ ইঞ্চি দীর্ঘ । শরীর এবং মাথার সংলগ্ন স্থল অর্থাৎ গলা প্রায় মুখের সমানই পরিসর ; এই স্থান হইতে মুখের অগ্রভাগ এমন সূক্ষ হইয়া আসিয়াছে যে, উহা দুই ইঞ্চির অধিক হইবে না । উপরের ওষ্ঠের মধ্য দিয়াই ইহাদের নাসারন্ধ্র মস্তিষ্ক পর্যন্ত বি-

স্তৃত । এই ওষ্ঠের অগ্রভাগটি চেপ্টা, দৃঢ় এবং কার্যোপযোগী । শূকরের মাথা হইতে লাঙ্গুল পর্যন্ত এমন সমভাবে মাংসপেশীসকল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে যে, এক দিক হইতে অন্যদিকে হাত বুলাইয়া নিলে অস্থির অনুসন্ধান পাওয়া যায় ।

উহাদের তারি পায়ে প্রত্যেকটিতে দ্বিখণ্ডিত সুর । এবং সুরের বিপরীতদিগের উপরিভাগে প্রত্যেক পায়ে দুইটি করিয়া উপসুর আছে । এই উভয় প্রকার সুরই একই উপকরণে নির্মিত, এবং বেশ একটুকু ধারাল । উহাদের শরীরের সহিত তুলনা করিলে সুরগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয় । তথাপি চলিবার কিংবা দৌড়িবার সময় কোনরূপ অসুবিধা হয় বলিয়া অনুমিত হয় না ।

শূকরের দৈর্ঘ্য নাসিকার অগ্রভাগ হইতে লাঙ্গুলের শেষ পর্যন্ত ৪ হাতের বড় বেশী হইতে দেখা যায় না । উচ্চতাও ২।২১ ফিটের অধিক নহে । সচরাচর ইহাদিগের দৈর্ঘ্যতা ও উচ্চতা ইহা অপেক্ষা কিছু কম আজি তিন বৎসর হইল, আমরা যে একটি শূকর শিকার করিয়াছিলাম, উহা হইতে রহৎ শূকর অনেকেরই দেখে নাই বলিয়াছিল । উহারই শরীরের মাপ প্রথমে লিখিত হইয়াছে ।

ইহাদের লাঙ্গুল অত্যন্ত ক্ষুদ্র । লাঙ্গুলের অগ্রভাগটি অল্প কএক গাছি কুঁচি সন্নিবিষ্ট । উহার সর্বাঙ্গই ঐ ক্ষুদ্র লাঙ্গুলটি এদিক ওদিক ঘুরায়, কিন্তু আমরা

বুঝিতে পারি না যে উহা দ্বারা শূকরের কি উপকার হয়। এদেশীয় পূর্ণায়তন বনা শূকরের বর্ণ গাঢ় ধূসর। কিন্তু শিশুগুলির বর্ণ রক্ত গুলির বর্ণের সহিত যার পর নাই অনৈক্য। শিশু গুলির লোম কোমল ও ঘন সন্নিবিষ্ট। এবং লোমের বর্ণ পিঙ্গল ও তাহার উপরে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ পরিসর ব্যাপিয়া ছরিত্রা রঞ্জের ডোরা দৈর্ঘ্য ভাবে শরীরের সমস্ত অঙ্গেই বিস্তৃত থাকে। উহারা যতই বড় হইতে থাকে, ততই শরীরের বর্ণ ধূসরে পরিণত হইয়া যায়। জন্মবার ২।৩ মাস পরে উহাদের গর্ভ পশমগুলি পড়িয়া গিয়া ধূসর কুঁচি দ্বারা আবৃত হয়।

পূর্ণবয়ঃপ্রাপ্ত শূকর অনেক গুলি একত্র থাকিতে পারে না; যদিও কখন কখন একদলে ২০। ২৫টা শূকর একত্র দেখিতে পাওয়া যায়, উহারা একটিরই সমস্তান সম্ভবিত। শূকরী ৬ মাস গর্ভ ধারণ করিয়া এক কালে কতকগুলি সমস্তান প্রসব করে। এমন কি আমি নিত্য বিশ্বস্ত্রেরে অবগত হইয়াছি, একটি মৃত্যু শূকরীর গর্ভ হইতে ২০টি সমস্তান বাহির করা হইয়াছিল। কোন কোন শূকরীর প্রসব কালের কিছুদিন পূর্বে উদর এবং শুন এমন ঝুলিয়া পড়ে যে, উহা ২।৩ ইঞ্চির জন্য মৃত্তিকা স্পর্শ করে না। রক্ত শূকরী গুলিরই এইরূপ উদর ঝুলিয়া পড়ে। গিলবার্ট হোয়াইট নামক জনৈক ব্যক্তি একটি শূকরের বিষয় এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন

যে, ঐ শূকরীটি মৃত্যু হইবার পূর্বে অস্থান ৩০০শত সমস্তানের গর্ভধারিণী হইয়াছিল। শূকরী প্রসব কালের অপর্যবহিত পূর্বে শুক পত্র, ঘাস ও অন্যান্য ডাল পাল্প দিয়া একটি কুটির নির্মাণ করিয়া লয়, এবং উহা এইরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে প্রস্তুত যে রক্তির জল কিম্বা রৌদ্রের তেজ উহাতে কোন মতেই প্রবেশ করিতে পায় না। এতদ্দেশীয় ছোট লোকেরা এই প্রকার কুটিরকে 'শূকরের ডেরা' কহে। এই কুটির দেখিলে বোধ হয় যেন মনুষ্যে কতগুলি ঘাস পাতা একত্র রাখিয়াছে, প্রকৃত কুটিরের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। এদেশীয় শূকরেরা প্রায়ই বর্ষাকালে হৈমন্তিক ধান্য ক্ষেত্রের পার্শ্বস্থ জঙ্গলে এবং শীত ঋতুতে কাঁটা ঝোপার নীচে এইরূপ ডেরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। প্রসব কালে উহারা দাড়াইয়া ঐ কুটিরের নিকটে প্রসব করে, প্রসব বেদনার সময় কোন ভয় পাইয়া যদি শূকরীকে স্থানান্তর যাইতে হয়, তবে তাহাতেও শূকরীর প্রসব কার্যের কোন প্রতিবন্ধক জন্মান না। উহারা যেমনি অগ্রসর হইতে থাকে, অমনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমস্তান গুলি ভূমিতে নিপতিত হয়। আবার সমস্তান গুলি এমন সবল যে, মাটিতে পড়িয়া দুই মিনিট কাল নড়িয়া চড়িয়াই তাহাদের প্রস্থতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে থাকে। এই রূপ আশ্চর্য্য কথা শুনিলে, সহসা যে পাঠক ইহাকে প্রকৃতিবিকল্প বলিয়া হাসিয়া উড়া-

ইবেন, ইহাতে অসুস্বাদুও সন্দেহ নাই, কিন্তু এই অনন্ত প্রকৃতির অনন্ত কার্যকলাপ যতই পর্য্যালোচনা করিতে থাকিবেন, ততই ইহা হইতে অনেক নূতন ও আশ্চর্য্য বিষয়ের আবিষ্কার হইতে থাকিবেন । সুতরাং সামান্য বিষয়ের একটি আশ্চর্য্য বিষয়ের কথা শুনিয়া কেহই ইহাকে প্রকৃতি বিকল্প বলিয়া উপহাস করিবেন না । শূকরীর বুক হইতে পেট পর্য্যন্ত ২ পংক্তিতে ৬টি করিয়া ১২টি স্তন । পশ্চাৎ দিকস্থ শেষ দুইটি স্তনে একেবারেই দুগ্ধ হয় না । অন্য গুলিতে সমভাবেই দুগ্ধ সঞ্চার হইয়া থাকে ।

শূকর শাবকেরা ৩ । ৪মাসের অধিক মাতৃস্তন্য পান করে না । কিন্তু বহু সন্তানবতী বলিয়া শূকরী এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন ক্রিষ্ট হইয়া পড়ে ।

শূকরীর সন্তানের জন্য অত্যন্ত মমতা । যদি অন্য কোন রুহন্তর জন্ত শূকরীর শাবক দিগকে আক্রমণ করিতে যায়, তখন সে অবশ্যই তাহাকে প্রত্যাক্রমণ করিবে । শূকরীর সামান্য দস্ত তির যদিও আর কোনরূপ প্রতিযোগিতা করিবার অঙ্গ নাই, কিন্তু তথাপি সেই অঙ্গই উহার। এমন ক্ষতগতিতে চালাইতে পারে যে, মুহূর্তের মধ্যে একজনকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় ।

যে পর্য্যন্ত শূকরীর পুনরায় গর্ভসঞ্চার না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ ছাওলি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে । এই ছাওলি বড় হইলে একদলে অনেকটি শূকর বলিয়া বোধ হয় ।

কিন্তু ইহাদের যাতা পুনরায় প্রসব করিলে ইহাদের সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখে না । তখন উহার। আপন।রাই সন্তানের মা বাপ হইতে আরম্ভ করে ।

মৃত্তিকা খনন করিবার জন্য শূকরজাতি নিত্যন্তই উৎসুক । ইহাদের আহার্য্য বস্তুর অন্বেষণ করিতে অনেক সময় মৃত্তিকা খননের আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু ইহার। অনর্থকও ঐরূপ মৃত্তিকা খনন করিয়া রাখে । ইহাদের মৃত্তিকা খননের অঙ্গ উপরের ওষ্ঠ বা নাসিকার অগ্রভাগ । তেমন কঠিন মৃত্তিকায় মধ্যেও উহা প্রবেশ করাইয়া বল প্রয়োগ করিলে উহা উঠিয়া আইসে । নাসিক ফুৎকারও এমনি প্রবল যে, খোদিত মৃত্তিকা একবার ফুৎকার করিলেই উহা দূরে সরিয়া যায় । শূকরের নিম্ন ওষ্ঠ অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব এবং উপরি ওষ্ঠের মধ্যেই উহা সঞ্চিত হয়, সুতরাং মৃত্তিকা খনন করিবার সময় উহাতে কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হয় না ।

পূর্বে আমরা বাছা বলিয়া আসিয়াছি, তাহাতে পুংশূকরের কোনরূপ কথাই উল্লেখ করি নাই, নিম্নে উহাদের স্বভাবে এবং আকৃতিতে শূকরী হইতে বাছা কিছু অর্নেক্য আছে, তাহা লিখিত হইল ।

পুংশূকরের উপরের এবং নীচের মাটির উভয় পার্শ্ব হইতে প্রত্যেক দিকে দুইটি অতি বৃহৎ দস্ত নির্গত হইয়া উপরের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে । ঐ দস্তগুলি সম্পূর্ণ গোলা নহে, ত্রিকোণ এবং উহার

প্রত্যেকটি কোণ অত্যন্ত ধারাল। দন্তের যে ডাগ বাতির থাকে, উহা নিরেট এবং বাহা মাংস ও মাট্যান্ডির মধ্যে থাকে, তাহা শূন্যগর্ত। হস্তীদন্তের ন্যায় এগুলিও উৎকৃষ্ট রস *। উহাদের আত্মরক্ষার জন্য এই দন্ত চারিটি প্রধানতম অস্ত্র। এই চারিটির মধ্যে নীচের দুইটি অধিক কার্যকারী। যে কোন পশুই কেন হউক না, যদি একবার উহার শরীরে দন্তবিক্রম করিতে পারে, তবে উহার শরীর ৮।১০ অঙ্গুলি পর্যন্ত চিরিয়া ফেলিতে পারে। পরে উহার যে দুই একটি দৃষ্টান্ত লিখিত হইবে, পাঠক তাহা পড়িয়া বিস্মিত হইবেন। এদেশীয় ছোট লোকেরা এইরূপ দন্ত-বিশিষ্ট বড় বড় শূকরগুলিকে “বয়রা” কহে। ইহাদিগের বিশ্বাস যে এই মর শূকর গুলির জীবন শক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প। কিন্তু ইহা নিতান্তই একটি ভ্রম মূলক সংস্কার। এইরূপ সংস্কার হইবার একটি কারণ আছে, তাহা এই,—আমি দেখিয়াছি অত্যন্ত বলবান শূকর গুলি কোন প্রকার শব্দ পাইলেও

* ইংরাজিতে আইভরি শব্দে যে প্রকার অস্থিকে বুঝা যায়, বাজলাতে সেইরূপ অস্থিবোধক কোন শব্দ নাই; আমি বঙ্গসাহিত্যজগতের একটি সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করিতে, তিনি আমাকে আইভরি শব্দের অর্থ রস লিখিতে বলিলেন। আমি ভয়সা করি, উহার এই উপদেশ বাজলাতে উপেক্ষিত হইবে না।

বড় কিছু একটা মনে করে না। যখন উহার ক্ষেত্র চাষ করিতে আসে, তখন কোন রূপ সামান্য শব্দে উহার ভয় পায় না, বরং অহঙ্কার করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আমার বোধ হয়, এজন্য কৃষকেরা মনে করে উহার কানে শোনে না।

শূকরের যুদ্ধ বড় ভয়ানক। ইহাদিগের দুইটি পুং শূকরের অন্য কোন সময়ে যুদ্ধ হউক আর না হউক, যখন একটি শূকরীর গর্ত সঞ্চারের সময় উপস্থিত হয়, তখন দুইটি সমবলশালী শূকর একত্রে উপস্থিত হইলে আর রক্ষা থাকে না। যুদ্ধের অপরিহার্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া উহার একটি না একটি হত হয় বটে, কিন্তু অক্ষত শরীরে বিজয়ী হইবার সাধ্য নাই। এতদ্ব্যতীত যখনই ইহার কাহারও উপরে জুধ হয়, তখনই ইহার ভয়ানক রূপ ধারণ করে। নিজ হইতে দশগুণ বড় জন্ত হইলেও আক্রমণ করিতে অনুমান কুণ্ঠিত হইবে না। আমি অত্যন্ত বিশ্বস্ত হইতে শুনিয়াছি যে, একটি চিতা ব্যাজ আহারের জন্য একটি শূকরকে ধরিয়াছিল, এবং শূকর ও ব্যাজকে ফিরিয়া এমন ভয়ানক আঘাত করে যে উভয়েরই এক স্থানে মৃত্যু হয়।

শূকরেরা সময় সময় এমনি কুৎসিত শব্দ করে, যে তাহা শুনিলে কর্ণ কপাটি ধরিয়া যায়। ষটনাক্রমে যদি কোন শূকরের সম্মুখে ছোট ছোট বাঘ উপস্থিত হয়, তবে শূকরের চীৎকারে দৌড়িয়া পলায়, অথবা নিকটস্থ বৃক্ষে আরোহণ করে।

পুংশুকরের শরীরের গঠনে অধিক কিছু প্রভেদ নাই বটে, কিন্তু তথাপি প্রকৃতিতে, পুরুষ এবং স্ত্রীর গঠনে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা ইহাদিগের মধ্যেও পরিপূর্ণিত হয়। পুংশুকরের বক্ষ অধিকতর প্রশস্ত এবং কটিদেশ একটুকু সৰ্ব। ইহাদের মুক্ত অতি বিচিত্রভাবে গুহাঘরের নিম্নে মাংসের সহিত লাগিয়া রহিয়াছে, স্বকৃৎস্বিকৃতিতে না দেখিলে হঠাৎ ঐ স্থানের অত্যাশ্চর্য উচ্চতা অনুভব করা যায় না। শুকরের মুক্ত, শূনিয়াছি হ্রস্বল গোকর অতি বলকারক ঔষধ। আমি উহা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই, যাছারা পরীক্ষা করিয়াছে, তাহাদের নিকটে শূনিয়াছি।

শুকরের শরীরে স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ অধিক বসা আছে। ভাত ও আশ্বিন মাসে যখন শস্য পরিপক হয় এবং উহার উপযুক্তরূপে আহার পায়, তখন ইহাদিগের বসা আরও অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মাংসও নাকি অপেক্ষাকৃত তখন সুস্বাদু হয়। এদেশীয় চণ্ডাল এবং ফিরিজিরা আমাকে এবিষয় অবগত করাইয়াছে। উহারাই ইহাও বলে যে, যখন পেরারা পাকিয়া উঠিলে শুকর উহা ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে, তখন উহাদের বসা কমিয়া যায়, মাংসও সুস্বাদু রহেন।

এদেশীয় শস্যের পক্ষে বন্যশুকর এক ভয়ানক শত্রু। ইহারাই বহুসংখ্যক এক সময়ে একত্র হইয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, এবং বত না আহার করে, তাহার দশগুণ

অনিষ্ট করিয়া যায়। শুকরেরা সচরাচর যাত্রিতেই আহারাদি করে, দিবসে কাঁটা ঝোপার নীচে শুইয়া থাকে।

শস্য রোপণের পূর্বে শুকরগুলি কোন কোন ক্ষেত্র এমনভাবে খুঁড়িয়া রাখে যে প্রথম দৃষ্টিতে উহা কর্ণিত ভূমি বলিয়া বোধ হয়। এদেশীয় কৃষকেরা শুকরের দৌরাত্ম্য হইতে ক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য সূক্ষ্মর একটি উপায় অবলম্বন করে। ক্ষেত্রের কোন এক স্থানে উচ্চ করিয়া একটি ক্ষুদ্র কুটার বাঁধিয়া লয়। কৃষকেরা উহাকে “টং” বলে। সমস্ত যাত্রি ‘টং’ এ বসিয়া বন্দুক কি অন্য কিছুদ্বারা ভয় দেখাইয়া শুকরদিগকে ক্ষেত্রে আসিতে দেয় না। যদি একটি যাত্রি কৃষকেরা এইরূপ সতর্কতার সহিত না থাকে, তবে পরদিবস জমীদারের নিকটে বৎসরের খাজানা মাপ পাওয়ার জন্য তাহাদিগকে করজোড় করিয়া কাঁদিতে হয়। কোন কোন দাঁতাল শুকর এমন ভয়ানক ক্রোধী যে, যে দিক হইতে উহাদিগের প্রতি বন্দুক ছোড়া যায়, খুঁয়া দেখিয়া সেই দিকেই আক্রমণ করিতে দৌড়িয়া আইসে। শিকারীরা যদি শুকরের এই প্রকার স্বভাব অবগত না থাকে, তবে তাহাদের পক্ষে ইহা নিতান্ত বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়। পদত্বজে শিকার করিতে হইলে, শুকরের নিকট হইতে অব্যাহতি পাইবার একটিমাত্র সামান্য উপায় আছে;—শুকর যখন সোজাতাবে শিকারীকে আক্রমণ করিতে

দৌড়িয়া আইসে, তখন যদি শিকারীও কেবল সোজাভাবে না দৌড়াইয়া একবার এদিক ওদিক বক্রগমনে দৌড়িতে থাকে, তবে অনেকটা রক্ষা পাইবার আশা থাকে। শূকর সোজা দৌড়িয়া মনুষ্যকে ধরিতে পারে বটে, কিন্তু মনুষ্য বক্রগমনে একদিকে সরিয়া গেলে, শূকর তাহার প্রকাণ্ড শরীরের সম্মুখগতি রোধ করিয়া হঠাৎ মনুষ্যের দিকে ফিরিতে পারে না। সুতরাং এই নিয়ম জামা থাকিলে সময় সময় অনেকটা উপকারের সম্ভব। প্রকৃত পক্ষে মাটিতে দাঁড়াইয়া শূকর শিকার করা নিতান্তই অনায়াস। হস্তীর উপরে থাকিলে শূকর শিকারে একেবারেই আশঙ্কা নাই। শূকরীরা মনুষ্যদিগকে এরূপ ভয়ানকভাবে আক্রমণ করে না; কোন রূপ শঙ্ক শুনিলেই দৌড়িয়া পলায়।

ইদামীং সাহেবেরা অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া বল্লমদ্বারা শূকর হত্যা করিয়া থাকে, (শূকর শিকারের বল্লমগুলি যুদ্ধের প্রদেশে প্রস্তুত হয়, উহার ফলকের সহিত ৪।৫ ফিট একটি বংশদণ্ড লাগান থাকে। এই দণ্ডের অপর প্রান্তে কতকগুলি সীসক গালাইয়া ভারি করিয়া দেয়।) হস্তী দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে বন হইতে শূকর গুলিকে ভাড়াইলে যেমন উহার মাঠে বাহির হয়, অমনি উহার পিছে পিছে অশ্ব চালাইয়া পৃষ্ঠে বল্লম বসাইয়া দেয় এবং সময় সময় এইরূপ শিকারীরা এমন বিপদে পড়ে যে, তাহার গণ্ডা শুনিলে

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যে সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না।

এদেশের একজন যুগ্মাধির প্রসিদ্ধ ভূস্বামীর বল্লমশিকার করিবার অভ্যাস ছিল। তিনি এক দিবস এইরূপে একটি শূকরকে আহত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে শূকরও মরিল না, দুর্নির্দোষ বশতঃ হাত হইতে বল্লমও পড়িয়া গেল। এমন সময় শূকর ভয়ানকরূপে আক্রমণ করাতে তিনি ষোড়া লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, শূকরও তাঁহার পিছে পিছে ছুটিল। তিনি যাইতে যাইতে একটি কর্দময় স্থানে ষোড়া সহিত একেবারে গাড়িয়া পড়িলেন, শূকরও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া সেই কর্দময় স্থানে গাড়িয়া পড়িল। সুতরাং শূকর আর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিল না, ইত্যবসরে সজীর একটি লোক গিয়া শূকরকে সংহার করিল।

১৮৭৬ সনে শিকার সময়ে একটি আহত শূকরকে ক্রমাগত ৭।৮টি হস্তীকে পরাস্ত করে। শূকরটি আহত হইয়া একটি জঙ্গলে ছিল, উহাকে বাহির করিবার জন্য যেমন একটি হস্তী ঐ জঙ্গলে প্রবেশ করে, অমনি উহার পায়ে দাঁত বিধাইয়া উহাকে তাড়াইয়া দেয়। অতঃপর সকল গুলি হস্তী একেবারে জঙ্গলে প্রবেশ করাইয়া উহাকে বাহির করিয়া হত্যা করা হয়।

শূকরের প্রধান আহাৰ্য্য কচু, ধান,

কেশর ইত্যাদি। কখন কখন বা মৃতদেহ পর্বাঙ্ক ইহাদিগকে আহার করিতে দেখা গিয়াছে। পালিত শূকরেরা এতদ্ভিন্ন এত অপরিষ্কার বস্তু আহার করে যে, তাহা মনে হইলেও হুণা উপস্থিত হয়।

শূকরের প্রাণ অত্যন্ত কঠিন। ফুস ফুস ভিন্ন শরীরের অন্য স্থানে ৭।৮ টি গুলি লাগিলেও শীঘ্র প্রাণে বিনষ্ট হয় না। আমি একটি শূকরকে বায়ুটি গুলি মারিয়া ছিলাম। শূকরের শিশুগুলিও অত্যন্ত কঠিনপ্রাণ। একটি অস্পবয়স্ক শূকর-শিশুকে গুলি মারিলে উহার সমস্ত নীচের ওষ্ঠ ও গলার কতক অংশ ছিঁড়িয়া গেল; তবুও প্রাণে মরিল না। আমার সঙ্গে বেড্-ফোর্ড নামে বলশাসী জর্নৈক ইংরেজ ছিল, তিনি বলিলেন, “যখন শূকরটি বাঁচিবে না, তখন শীঘ্র মারিয়া ফেলাই ভাল।” এই বলিয়া তিনি একটি লাঠী দ্বারা উহার মস্তকে সজোরে ১০।১২ টা আঘাত করিলেন, ওথাপি উহার প্রাণ বিরোধ হইল না।

শূকরকে শিশুকাল হইতে যত্ন করিয়া পুখিলে বেশ পোষ মানে। এদেশে মাঝে মাঝে অনেককেই শূকর পুখিতে দেখা যায় এবং উহাদের মধ্যে শূকরের বর্ণেরও নানা বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ শূকরের রঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার এবং ইহাদের শরীর জাতিরও বিভিন্ন প্রকার বর্ণ হইয়া যায়। এই শরীর শাবক গুলির বর্ণ পূর্ণোন্মিষিত শূকর শাবকের বর্ণের ন্যায়

নহে। উহাদিগের শরীরের বর্ণ (সাদা কালা প্রভৃতি) জন্মবার সময়ই তাহা পরিদৃষ্ট হয়, অর্থাৎ উহারা বড় হইলেও বর্ণের আর পরিবর্তন হয় না। এতদ্দেশে এই জাতীয় শূকর গুলিই অনেকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। একদলে ৫০০ শূকরের অধিক প্রতিপালিত হইতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এইরূপ বৃহৎ পালের মধ্যে যে শূকরী গুলির শাবক নিতান্ত শিশু, তাহারা রাত্রিতে শয়নের সময় পাল হইতে ১০।১২ হাত দূরে গিয়া সমস্ত গুলিকে শুণ্য পান করায়। রক্তগুলি খুঁইয়া রছে, ও ছা গুলি তাহার দুধ খায়। সময় সময় শাবকগুলি উহাদের মাতাকে তুলিয়া অন্য শূকরীরও শুণ্য পান করে, কিন্তু ইহাতে সেই শূকরী শাবককে কিছু বলে না।

বন্য শূকরের ন্যায় ইহারা প্রসবের জন্য ডেরা প্রস্তুত করে না। রাখালের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়ার সময়, যেখানে প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, সেইখানেই প্রসব করে।

প্রাসিকু প্রাণিতবুবিং পণ্ডিতেরা বলেন যে, শূকরের বিলক্ষণ বুদ্ধি আছে; কেবল ইহাদের দিক্শী আকৃতি দেখিয়া, এবং আহারাদি সম্বন্ধে ইহাদের নিতান্ত জঘন্য প্রবৃত্তি অবলোকন করিয়া, মনুষ্যেরা ইহাদের মানসিক বৃত্তির পরিমার্জনপূর্বক ইহাকে নানারূপ কার্যশিক্ষা দিতে আশ্রয় করে, কিন্তু চেষ্টা করিলে ইহাদের দ্বারা অনেক প্রকার কার্য সংসাধিত করা যাইতে

পারে। কখন কখন ইহাদের পৃষ্ঠে জিন্ কসিরা উপরে আরোহণ করা যায়, কখন কখন বা শকটাদিতে ২টী বা ৪টী যোজনা করিয়া শকট চালান যায়।

একটি কৃষক তাহার শকটে ৪ টী শূকর মুড়িয়া, সেটে এলুবিন্‌সের বাজারে বাইত, এবং ২।৩ বার সেই বাজারে পরিভ্রমণ করিয়া, শূকরদিগকে কিছুকাল বিক্রাম করাইত। এবং পুনরায় সমস্ত দিনিস পত্র পূর্ণ শকটে উহাদিগকে যোজনা করিয়া, অবলীলাক্রমে ২।৩ মাইলের পথ উহার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিত।

নর্কোক দেশীয় আর একটী কৃষক, ৪ চারিক্রোশ দূরবর্তী উইচ্‌বেইচ স্থানে এক ঘণ্টায় উপস্থিত হইবে এই বাজি রাখিয়া, তাহার শূকরে আরোহণ করিত, কিন্তু তাহার শূকর নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্বে তাহাকে তথায় পৌঁছাইয়া বাজি জিতাইয়া দিত। শিক্ষা দিলে শূকরেরা অশ্বের ন্যায় ৪ চারি ফিট উচ্চ দেয়াল লাফাইয়া পার হইতে পারে।

শূকরের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। কোন কোন শূকরকে শিক্ষা দিলে কুকুরের ন্যায় বন হইতে বিবিধ শিকার বাহির করিতে পারে। এক ব্যক্তির স্নাট্‌ নামে একটি শূকরী ছিল, সে শিকারে নিতান্ত পারদর্শিতা দেখাইত। ৪০ গজ দূরে কোন রূপ শিকার থাকিলে তাহা যাইয়া বাহির করিয়া দিত, কিন্তু উহার একুপ আচ্ছন্ন স্বভাব ছিল যে, সম্মুখে কোন শ-

ক থাকিলে তাহার সে ভয়ানক নিতনা।

শূকরের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। কিন্তু গীহুদি ও মুসলমানেরা ইহাকে অশুদ্ধ বলিয়া স্পর্শও করে না। এতদেশীয় আদিম অসভ্য জাতিদিগের ইহা একটি প্রধান জীবিকা। মুসভ্য ইংরেজেরাও শূকরের মাংস নিতান্ত সুখাদ্য বলিয়া মনে করেন। ইহারা বন্যশূকর কিংবা সাধারণ পালিত শূকর ভক্ষণ করেন না। তাহাদের জন্য যে শূকরের মাংস মনোনীত করা হয়, সেই গুলিকে শিশুকাল হইতে ছোট কামরাতে বদ্ধ রাখিয়া অন্য কোনরূপে অপরিষ্কার বস্তু খাইতে দেওয়া হয় না। সিদ্ধ আলু ও সিদ্ধ যব খাওয়াইতে খাওয়াইতে উহাদিগের শরীরে যখন ২ইঞ্চ পরিমাণ বসী সঞ্চার হইয়া থাকে, এবং আপন শরীরের ভায়ে যখন উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে না, তখন উহাদিগকে হত্যা করিয়া সেই মাংস সাহেবদের ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করা হয়।

শূকরেরা সম্ভরণে বিলক্ষণ পটু। সম্ভানবতী শূকরী সাঁতার দিলে ছা গুলিও পিছে পিছে সাঁতারিয়া যায় এবং ক্রান্ত হইলে সম্মুখের পা দিয়া উহাদের মায়ের পৃষ্ঠে ভর দিয়া রহে।

শূকরের ঠেল অনেক প্রকারে ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের কুঁচিতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিলাতী ভ্রাস প্রস্তুত হয় এবং চর্ম্মে অধারোহণের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট জিন্ নির্মাণ করা যাইতে পারে। সাধারণ জিন্ হইতে এই জিনের মূল্য ও স্থায়িত্ব উভয়ই অধিক।

শুকর সম্বন্ধে আমরা আজি পর্যন্ত যে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি, তাহা পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম, আমার শুকরে যদি তাঁহাকে মুহূর্তের জন্য একটু

স্বধী করিতে পারে, তবে উবিধাতে ইহা অপেক্ষা একটি ভাল পশু আমরা সম্মুখে উপস্থিত করিব ।

স্প্যানিস সত্যতা ।

আজি কালি ইউরোপের সকল জাতিই জীমান্ । ফ্রান্স বর্ষণোন্মুখ মেঘরাশির ন্যায় নিকম্পাতানে নিজ সময় প্রতীক্ষা করিতেছে । ইংলণ্ড ও কসিরা ধীরে ধীরে নিকটবর্তী দেশ সকল স্বায়ত্ত করিতেছে । জর্মানেরা প্রভূতবল যথেষ্টাচার রাজ্যগণের নিকট হইতে আপনাদের স্বত্ব সমর্থন করিবার চেষ্টা করিতেছে । কিন্তু স্পেন, হতবল, নিকপায়, নির্জীব ; স্পেন, ধীরে ধীরে ইতিহাস ও মনুষ্য হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইতেছে ।

কিন্তু স্পেন কি চিরকাল এইরূপ ছিল ? না এমন একসময় ছিল, যখন স্পেনের জয়পাতাকা দেশে বিদেশে উড্ডীন হইত, যখন হলণ্ড, আমেরিকা, জর্মানি প্রভৃতি দেশ হইতে স্পেনের মনাগার পরিপূরিত হইত, যখন স্পেনের নামে মহারাষ্ট্রী এলিজাবেথও কম্পিতা হইতেন ? কি কারণে স্পেনের আধুনিক উচ্ছেদদশা উপস্থিত হইল, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ।

প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে স্পেনের সহিত ভারতবর্ষের অনেক মৌসামদৃশ্য আছে । ইহার উত্তরে হিমালয়ের ন্যায় পিরিনিস পর্বতঃ পৃথিব্যা ইন মেকদণ্ডঃ ” রূপে অবস্থিত । দেশের মধ্যভাগ বিস্তৃত প্রভৃতির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন পর্বতমালায় বিভক্ত । ভারতবর্ষে যেমন গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি দীর্ঘব্যাপিনী নদী, স্পেনেও সেইরূপ ইব্রো, টেগাস প্রভৃতি বিশাল স্রোত-স্বতী । স্পেনের তিন দিক্ ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত । প্রাকৃতিক দৃশ্য মহান্ ও বিন্ময়কর হইলে মনুষ্যের মনে যে সকল ভাব সঞ্চারিত হয়, স্পেনীয়দের মনেও সেই সকল ভাব আধিপত্য লাভ করিয়াছিল । যে দেশের লোকেরা নিত্য নিত্য অত্রতেদী পর্বত ও বিশাল সমুদ্র দেখিতে পায়, তাহাদের মনে স্বভাবতঃই পর্বত ও সমুদ্রের স্মৃতি কর্তার সত্ত্বা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয় । তাহারাই এই সকল দৃশ্য দেখিয়া আপনাদের অসারত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব বু-

খ্রিতে পারে এবং একান্ত মনে অবসন্ন-
চিত্তে সেই রূহৎ হইতেও রূহৎ দেবাদিদেব
পরমেশ্বরের নিকট আশ্রয় লয়। ঈশ্বর-
ভক্তি ও নিজের প্রতি অনাদর তাহাদের
ক্ষমার প্রধান শ্রুতি হইয়া উঠে। প্রথম
হইতেই ভারতবর্ষীয় ও স্পেনীয়দের মনে
এই দুইটি প্রকৃতির আধিপত্য দেখিতে পা-
ওয়া যায়।

মনুষা আপনায় প্রতি হত্যার হইলে,
অন্য একজন প্রভুর আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী হয়।
সুতরাং প্রভুভক্তি ঐরূপ মনুষ্যের পক্ষে
একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে; এবং
নিজে প্রভূত ক্ষমতামালী হইলেও তিনি
অন্যের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই
সকল কারণে, স্পেনীয়দের মনে তিনটি
প্রকৃতি সংরোপিত হয়—ঈশ্বর ভক্তি, নি-
জের প্রতি অনাদর, এবং প্রভু ভক্তি।
ঐহারা ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা পাঠ
করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, যে প্রাচীন
কালে ভারতবাসীদের মনেও এই তিনটি
প্রকৃতি প্রবল ছিল। ভারতে তেত্রিশকোটি
দেবতার সৃষ্টি, ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য
এবং দুর্বল ভারতবাসীদের ভূত্যোচিত
সন্তোষ এই কয়টি প্রকৃতির পরিচায়ক।

নানা কারণে স্পেনীয়দের মনে এই
কয়টি প্রকৃতি ক্রমশঃ পরিপুষ্টই হইয়া-
ছিল। স্পেনীয়েরা প্রথমতঃ রোম কর্তৃক
বিজিত হয়। বহুকাল পর্যন্ত দেশের স্বা-
ধীনতা ও ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য তাহাদি-
গকে রোমের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়া-

ছিল। যুদ্ধের পূর্বে তাহারা প্রতিদিন
ঈশ্বরের নিকটে জয় প্রার্থনা করিয়া যা-
ইত। যুদ্ধে জয়লাভ হইলে ঈশ্বরের ধনা-
বাদ করিত, এবং যুদ্ধে পরাজিত হইলে
হত ব্যক্তিদের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নি-
কট প্রার্থনা করিত। যুদ্ধ কালে, তাহারা
প্রভুভক্তি, পরাকর্ষা প্রদর্শন করিত,
কারণ প্রভুর শাসনাধীন হওয়াই যুদ্ধে জয়
লাভ করার প্রধান উপায়। এই রূপে
স্পেনীয়দের মনে প্রভুভক্তি ও ঈশ্বর ভক্তি
অধিকতর রূপে বহুমূল হইয়াছিল।

রোমের ক্ষমতার কিঞ্চিৎ হ্রাস হ-
ইলে ভিসিগথেরা স্পেন অধিকার করে।
স্পেনীয়দিগকে পুনরায় দেশ রক্ষার জন্য
বহুপরিকর হইতে হয়। সুতরাং তাহা-
দের মনে, পূর্বের ন্যায়, ঈশ্বর ভক্তি ও
প্রভুভক্তি আরও অধিকতর বহুমূল হইয়া
গেল।

ভিসিগথেরা (Visigoth) দেশে ল-
ব্ধাদিকার না হইতে হইতেই আরবীয় মু-
সলমানেরা স্পেন অধিকার করিল। সু-
তরাং স্বদেশ ও স্বধর্ম রক্ষা করিবার জন্য
স্পেনীয়দিগকে পুনরায় বহুপরিকর হইতে
হইল। রোমীয় ও ভিসিগথদিগের সহিত
যুদ্ধে স্পেনীয়দের প্রভুভক্তি ও ঈশ্বর ভক্তি
পূর্বেরই অতিশয় বর্ধিত হইয়াছিল। একগণে
বিধর্মী, ভিন্ন বর্ণধারী, অসভ্য আসিয়া-
বাসী মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে ঐ দুই
প্রকৃতি আরও অধিকতর রূপে প্রজ্জ্বলিত
হইয়া উঠিল।

যুদ্ধ কালে অন্য অন্য অনেকগুলি হু-দয় রুক্তি পরিপোষিত হয়, তথায়ে সাহস ও কর্তব্যমতী সর্বপ্রধান। প্রভু তন্ত্রির সহিত এই শেষোক্ত দুইটি গুণ যোগ দেওয়াতে স্পেনীয়েরা তাত্কাণিক জাতিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধবিন্দ। বিশারদ হইয়া উঠিল। এক দেশের পর অন্য দেশ তাহাদের করকবলিত হইতে লাগিল। ইউরোপীয় সমস্ত জাতিগণের মধ্যে স্পেন সর্ব প্রধান বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল।

কিন্তু একদোষে স্পেনের এই সম্পদ চিরস্থায়ী হইল না। স্পেনীয়েরা অস্ত্র অন্য অনেক গুণে বিভূষিত হইল বটে, কিন্তু পূর্বে তাহারা যেরূপ অনেক মুখাপেক্ষী ছিল এখন ও সেইরূপ রহিল। সাংসারিক উন্নতি সম্বন্ধে স্পেনীয়েরা রাজার মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিত। রাজা তাহাদিগকে যে পথে চালাইতেন, তাহারা সেই পথে অকুতোভয়ে অমিত সাহসের সহিত চলিত, কখন ঘিক্তি করিত না। আবার পারলৌকিক উন্নতি সম্বন্ধে স্পেনীয়েরা স্বদেশস্থ ধর্ম যাত্রকের সম্পূর্ণ অনুবর্তী হইয়া চলিত। ধর্ম যাত্রক যে কিছু উপদেশ দিতেন, স্পেনীয়েরা অকুণ্ঠ চিত্তে তন্ত্রি ও স্কাধ সহিত সেই সকল প্রতিপালন করিত। এই রূপে, স্পেনীয়েরা কখন বা রাজার কখন বা ধর্মযাত্রকের অনুবর্তী হইয়া নানা রূপ সংকর্ষ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা স্বাধীন চিন্তা বা স্বানুবর্তিতা একেবারে পরিভ্যাগ করিল।

যতদিন স্পেনের রাজা ও ধর্মযাত্রক নিজের কর্তব্য কার্যে অবহিত ছিলেন, ততদিন স্পেনের উন্নতিও অপ্রতিহত ছিল। কিন্তু যখন রাশি রাশি অর্থদ্বারা স্পেনের দনাগার ক্ষীত হইতে লাগিল, যখন ইতঃস্তুত রাজ্যবিস্তার দ্বারা স্পেনের ক্ষমতা চতুর্দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল, তখন রাজা ও ধর্মযাত্রক উভয়েই গর্হিত, স্বার্থপর ও সূখবিলাসী হইয়া উঠিলেন। সেই দিন হইতে স্পেনের অদঃপাতন আরম্ভ হইল। যতক্ষণ সেনাপতি জীবিত ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার অধীস্থ সৈন্যেরা বলবিক্রম প্রকাশ করিয়া বিপক্ষ দলের ভীতি বিধান করিতেছিল। কিন্তু যে দণ্ডে সেনাপতি হত হইলেন, অমনি সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া, যে যেদিকে পারিল সে সেইদিকে পলায়ন করিয়া নিজের প্রাণরক্ষা করিতে লাগিল।

এহুলে ইংলণ্ডের সহিত স্পেনের তুলনা করিলে, স্পেনের অবস্থা আরও পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। ইংলণ্ডে যখন কোন গর্হিত অত্যাচারী, বা স্বার্থপর রাজা সিংহাসনারোহণ করিতেন, তখন ইংলণ্ডের প্রজারা স্পেনীয়দের ন্যায় সমস্ত আশা তরসা ত্যাগ করিয়া, নিকটস্থ নিজীব ভাবে আপনাদের অদঃপাতের পথে অগ্রসর হইত না। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া যাহাতে সেই রাজা সিংহাসন হইতে দূরীকৃত হন সেই চেষ্টা করিত। প্রয়োজন পড়িলে তাহারা ঐরূপ রাজার

প্রাণবিনাশে পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত হইত না। প্রথম চার্লস্, এইরূপে প্রজাদের কর্তৃক বিনষ্ট হন। দ্বিতীয় জেম্‌স্ যদি সময়ে ইংলণ্ড হইতে পলায়ন না করিতেন, তাহা হইলে ভয়ত তিনিও প্রথম চার্লস্‌য়ের "রক্তশ্রোত * রক্তি করাইতেন।" ইংলণ্ডীয়েরা শুদ্ধ এইরূপ রাজাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করাইয়া সঙ্কুচিত হইতেন না। যাহাতে ঐ সকল অত্যাচারী রাজার পরিবর্তে দেশহিতৈষী, প্রজাবৎসল, সত্যপ্রিয় রাজা সিংহাসনারূঢ় হয়েন তাঁহারা সেই চেষ্টা করিতেন। এক্ষণে ইংলণ্ড ও স্পেনের অবস্থাগত বৈষম্য বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। ইংলণ্ড স্বাভাবিকী। সুতরাং ইংলণ্ডের রাজার অধঃপতন হইলে ইংলণ্ডের সর্বসামারণের বিশেষ ক্ষতি হইত না। কিছুকাল নিরোহ বিপ্লব সহ্য করিয়া ইংলণ্ড শান্তির পাথে, উন্নতির পাথে পুনরায় ধাবমান হইত। স্পেন পরানুবর্তী সুতরাং রাজার অধঃপতন হইলে সমস্ত দেশ বিশৃঙ্খল হইয়া যাইত।

এইরূপে স্পেনীয়দের অধঃপতন আরম্ভ হইলে, তাহারা সহজেই অন্য জাতি কর্তৃক বিজিত হইতে লাগিল। সন্ধিহিত ফ্রান্সরাজ্য সহজেই স্পেন অধিকার করিলেম। যত দিন অন্য কোন ইউরোপীয় জাতি স্পেনের সহিত যোগ দিত ততদিন

* জগৎসিংহ ওসমানকে বলিয়াছিলেম, "না হয় বীরেন্দ্রসিংহের রক্তশ্রোত রক্তি করাইব।"

স্পেন অমিত সাহসের সহিত ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ করিত। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ সেই জাতি স্পেন হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেই স্পেন পূর্বের স্থায় শত্রুর পাদ দলিত হইত। কিছু কাল এইরূপে অতি-বাহিত হইলে ফ্রান্সরাজ্য দৃঢ়রূপে স্বকীয় ক্ষমতা স্পেনে সংস্থাপিত করিলেন।

তখন বিজিত জাতিদের যে সকল দোষ ঘটে, এক একটি করিয়া সেই সকল গুণি স্পেনীয়দের মনে অধিকার লাভ করিতে লাগিল। সে দিকে ফেঞ্চরাও যাহাতে স্পেনীয়দের সকল দিকে উন্নতি হয় সর্বান্তঃকরণে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুতরাং এক্ষণে ভারতবর্ষের যে অবস্থা স্পেনের অবস্থাও তৎকালে অধিকল সেইরূপ হইয়া উঠিল। জেতারী উভয়েই ভিন্ন দেশী। উভয় স্থলেই জেতারী বিজিতদের মঙ্গল প্রার্থী। উভয় স্থলেই জেতারী স্বদেশস্থ মঙ্গলকর নিয়মাবলী বিজিতদের মধ্যে প্রবর্তিত করিবার জন্য সচেষ্ট। উভয়েরই একদল লোক জেতাদের পক্ষপাতী; তাঁহাদের পক্ষে জেতাদের সমস্তই (ভাষা, পরিচ্ছদ, প্রভৃতি) সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। উভয় এই অন্য একদল লোক স্বদেশ প্রচলিত পূর্ব্ব প্রথা ও পূর্ব্ব নিয়মের পক্ষপাতী; তাঁহাদের চক্ষে দেশে পূর্ব্ব বাহ্য কিছু ছিল তৎ সমস্তই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। উভয় এই জেতাদের পক্ষই, সকল প্রকার বিিন্ন বিপত্তি সন্তেও বহুসংখ্য ও ক্রমশঃ লক্ষ্যপ্রসার।

তখন স্পেনে ফ্রান্সের কাপড় না হইলে বস্ত্র পরিধান করা হইত না, ফ্রান্সের রাজমন্ত্রী না হইলে গৃহ প্রস্তুত হইত না। ফ্রান্সের রীতিতে না হইলে গৃহ সজ্জায় মনস্তৃষ্টি হইত না। অস্প কথায় এখন যেমন ইংরাজ ভারতবাসীদের প্রধান অবলম্বন, ফেঞ্চেরাও স্পেনীয়দের পক্ষে প্রায় সেইরূপ ছিল।

যতদিন ফ্রান্সীকমতালী রছিল, ততদিন স্পেনের অবস্থা একরূপ চলিল। কিন্তু যখন ফ্রান্স নিজে হতবল হইল, যখন ওয়েলিংটন স্পেনে তাহাদের কমতা ধর্কীকৃত করিলেন তখন স্পেনে আবার এক ভয়ানক বিপ্লবের সৃষ্টি হইল। যে সকল ক্ষেত্র প্রথা স্পেনে রোপিত হইয়াছিল, স্পেনীয়েরা, একেই সেই গুলিকে সমূলে উন্মূলিত করিতে লাগিল, এবং তৎপরিবর্তে ও তৎস্থলে স্বদেশের প্রাচীন প্রথা সমস্ত প্রচলিত করিতে লাগিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক শাসন, গৃহ কর্তৃ প্রকৃতি যেখানে যে টুকু ফেঞ্চদের অনুযায়ী ছিল, স্পেনীয়েরা সেইখানে সেই টুকু পরিবর্তিত করিয়া দিয়া ত্বিপরীতে স্বদেশ প্রথা প্রবর্তিত করিয়া দিলেন। আজি ও স্পেন এইরূপ পরিবর্তন ও প্রবর্তন চলিতেছে। ফেঞ্চেরা যে গৃহটি অতি যত্নে, অতি পরি-

অমে পরিপাটী রূপে নির্মান করিয়াছিল, স্পেনীয়েরা আজি তাহার ছাদটি, কালি তাহার কড়িটি পরিদিন তাহার দরজাটি একেই ভাজিয়া ফেলিতেছে। সুরতায় পুরাতন বাটির সংস্কার কালে যেরূপ দৃশ্য হয়, আজি কালি স্পেনের দৃশ্যও অবিকল সেইরূপ। এখানে কতক গুলি লোক সুরকি প্রস্তুত করিতেছে। এখানে কতক গুলি লোক ইটের বোঝা লইয়া গোলমাল করিতেই উপরে উঠিতেছে। এখানে ভগ্ন ইটক পতনের শব্দ, এখানে ভূতাদের কলরব, এখানে মিস্ত্রীদের কলরব, এখানে ইঞ্জিনিয়ারের তাড়না প্রকৃতি মানা বিরক্তিকর দৃশ্যে দেশ পরিপূরিত হইতেছে। স্পেন আপন লইয়া ব্যস্ত, সুরতায় পৃথিবীর কোণায় কি হইতেছে, তাহা তাহার দেখিবার অবকাশ নাই।

শুদ্ধ ইতিহাসে বিদ্যার পরিচয় দিবার জন্য এ প্রস্তাব লিখিত হইল না। স্পেনের এই অবস্থা ভারতবর্ষের পক্ষে অবশ্যস্তাবী কি না, এবং ইংরেজেরা এদেশ হইতে বিদ্যায় লইলে ভারতীয়েরা স্পেনবাসীদের ন্যায় আকুল হইবে কিনা এই তত্ত্বটি প্রশ্নাকারে পাঠকের নিকট উপস্থিত করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

লুক্ৰিসিয়া ।

“অইত দিবসমাখ, উঠিল পুরবে,
ছড়াইয়া কণকের তরল কিরণ,—
“এনিওর” শ্যাম জলে; মেহারি উষায়
অইত মধুরে মরি! কুঞ্জনিল বনে
বিহঙ্গম বিহঙ্গীর চুষ্টিয়া অধর;
অইত ফুটিল ফুল, ফুটিল সেরোজি
সেরোবরে হস্তাসনে জলজ পুন্দরী;
অইত প্রকৃতি দেবী ধরিল। সোহাগে
বিশ্ববিনোদিনী বেশ নয়নরঞ্জিনী;
কেন আজি কোন মুখে কেমনে বলিব,
প্রত্যন্তের চাকবেশ সচেহা নয়নে,
তরণ অরণ অই তরল অধরে,
এনিও-লছরী লীলা, অমিল চঞ্চল,
বিহঙ্গের কলকণ্ঠ, কুসুম কানন;
কিবা অই পুহাসিনি সেরোজীর পাশে,
সদীরের ত্রমরের প্রণয় মিনতি,
হলাহলে মাখা বেন, নয়নে আমার,
ইচ্ছাকরে এইকণে, কি বলিব আর
অনন্ত তিমিরজালে লুক্কাই বদন।
এখনো এল না কেন প্রাণেশ আমার!
রাখিতে পারি না আর, কলঙ্কিত প্রাণ,
তাজিব কি কলঙ্কিত জীবন একণে?
তাজিব না তাজিব না আশুক প্রাণেশ
চরণকমলে তাঁর করি নিবেদন।
অকলঙ্ক মরবের অসহ্য বেদনা।

তার পরে জন্মশোধ, দেখি একবার,
মিটায়ে মনের সাধ, ভরিয়ে নয়ন
প্রাণেশের প্রেমময় বদন মণ্ডল!।
অবশেষে, অরণিয়া নাথের চরণে,
কলুবিভ কলেবর, প্রকৃত হৃদয়ে,
ছিড়িব প্রাণের লতা, জীবন কাননে!
আর কেন প্রাণমাখ, এম একবার!
কণ বিকল কণ্ঠে ডাকে অভাগিনী;
কত দিন, যদি নাথ ডাকিত কিছরী,
শিবিরে, প্রান্তরে, কিবা আহব অজনে,
যথায় থাকিতে তুমি, মুহূর্ত্ত ভিতরে,
কি বলিব, প্রণয়ের বিজলী সঞ্চারে,
অমনি হৃদয়-তার, বাজিত তোমার,
অমনি প্রাণেশ তুমি, আসিতে সহরে,
তুষ্টিতে, বদন মম করিয়া চুষন!
আজি কেন, ডাকি নাথ, ডাকি শতবার,
নাহি পাই দরশন, অভাগীর প্রতি
কেন এত অকরণ, জীবন জীবন!
এম নাথ তরা করি, আর কতকণ,
বহিবেন বশুভতী, পাণীণীর ভার!
যত উঠিছেন রবি, তরঙ্গ অধর,
ততই বাড়িছে মম হৃদয়বেদনা;
ও কি ও তুরঙ্গ অই হেসিল দুয়াতে,
অই লুক্কাই আসিলেন হৃদয়রঞ্জন!
এই যে প্রাণেশ মম, নয়ন উপরে,

নিরখি নাথের মুখ, শোক-পারাবার
 উচ্ছ্বাসিত হল প্রাণে, জ্বলিল অনল,
 রাখিতে পারি না আর নয়নের নীর !
 নয়নের বারি আজি, অদৃশ্য যতনে,
 অভাগিনী সঞ্চার করিতে অক্ষয় !
 ঝকক ঝকক তবে, নয়নদারার
 প্রফালিব প্রাণেশের যুগল চরণ !
 এস নাথ হুঃখিনীর নয়নের তারা !
 দূরে থাক, স্পর্শিও না মিনতি আমার !
 স্পর্শিও না কলঙ্কিত কলেবর মম !
 এস তুমি স্নেহময়, জনক আমার !
 আজি তাত ! অভাগিনী নন্দিনী তোমার,
 অনন্ত বিদায় চায় চরণকমলে ;
 দাঁড়াও দাঁড়াও তাত ! নয়ন উপরে,
 বিদীর্ণ হৃদয়ে আজি, সককণ স্বরে,
 নিবেদিয়ে অভাগিনী, হৃদয়বেদনা,
 শুন নাথ দয়া করি, অনন্যপ্রবণে !
 কালি সেই আছারাঙে, কক্ষে আপনার,
 সঙ্গিনী সমাজে বসি, নীরব বদনে,
 তুলিতেছিলাম হার ! চাক 'কার্পেট'
 চম্পকের কলি, যথা মন্দ সমীরণে,
 নিরবে নাচিতে ছিল, অজুলি মিচর ;
 ভাবিতেছিলাম কতু, প্রাণেশমুরতি,
 সাজিয়া গেলেন যবে, আর্টিস্ট সমরে,
 সজ্জিত সময়সাজে, কক্ষে অভাগীর !
 হেনকালে দেখিলাম, জীবন জীবনে,
 দেখিলাম হার ! সেই নিষ্কর বর্ষরে,
 দেখিলাম আর কত, সঙ্গী প্রাণেশের !
 পুঞ্জিলাম প্রেম ভরে, নাথের চরণ,
 পুঞ্জিলাম সঙ্গীগণে, কতই বতনে,

কতক্ষণ পরে নাথ । সহ সঙ্গীগণ,
 গেলা চলি পুনরায়, 'আর্টিস্ট' নগরে !
 সজল নয়নে আমি, উদ্ভাদিনী প্রাণ,
 দাঁড়াইনু একাকিনী অলিন্দ উপরে,
 চা'ছিলাম একমনে, রাজপথপানে,
 দেখিলাম আশুগতি তুরঙ্গমগণ
 মিলাইল ক্রমে ক্রমে, মুহূর্ত্ত ভিতরে,
 অভাগি নয়ন পথ অতিক্রম করি
 অমনি নিষাদবিদ্ধ কপোতিনী প্রায়,
 কিরিনু মনের হুঃখে, আপন মন্দিরে !
 সঙ্গিনী কুলের সেই আমোদ সাগরে,
 চালিয়া ছিলাম প্রাণ, জুড়াতে হৃদয়,
 অলিন্দ উপরে বসি নিরানন্দ মনে !
 দেখিলাম ক্রমে ক্রমে, দিবস রতন,
 নীরবে পল্লভল খসি, পশ্চিম গগণে,
 দেখিলাম ব্রহ্মদিনমণি, ক্রমে পুনরায়,
 লুকাইল স্মরণিয়া, সহস্র কিরণ !
 দেখিনু হাঁসিল সঙ্ঘা, কুসুমবদনে,
 তুলিয়া বিনোদহাসি, চিরসৌরভিনী,
 শুনিবু গা'ছিল দূর নিকুঞ্জ কামনে,
 বিহাজিনী-মালা মিলি সঙ্ঘার সংগীত ।
 দেখিলাম স্থির নেত্রে, ক্রমে পুনরায়,
 আলোকমালিনি মনো, তিমির বসনে,
 আবিরল শ্যাম তনু, সঙ্ঘার মিলনে ;
 তারাময়ী পুছাগিনী যামিনী পুন্দরী !
 ক্রমে ক্রমে দেখা'দিল, কুসুম সান্দনে,
 নবমীর চাকশনী, হাঁসিল অধরে,
 চক্কলিল চাকশনী, 'এনিওর' জলে !
 তাজিয়া অলিন্দ পুনঃ, কক্ষে বসিলাম !
 শুইলাম পুরঞ্জিত কোমল শযায়,

গাউলাম মূদ্রণের, বাধিত হৃদয়ে,
 খুলিয়া কুম্ব কণ্ঠে, সজীত লহরী ।
 দেখিনু মর্গর মঞ্চে, বিনোদ মন্দিরে,
 জ্বলিছে মূহলে দীপ, স্ফটিক আধারে,
 প্রদীপ হইতে ঝরি, আলোক ভরণ,
 দেখিলাম ধরে ধরে নাচিছে চঞ্চলে !
 শুনিলাম সমীরণ, মধুর নিঃশ্বাস,
 বিকচিত্ত মধুময়, কোমল কপোলে,
 নাচাইছে ধীরে, নব অলকার দাম ।
 শুনিলাম দূরে কল সম্বীত কোমল,
 কামিনীর কলকণ্ঠে ঝরছে মধুরে,
 কোমল শয্যায় শুয়ে, দেখিনু উল্লাসে,
 কাদম্বিনী ঝাবে শশী, সূদূরগগণে ।
 দেখিনু কাপেট পরে কক্ষের ছয়ারে,
 অচঞ্চলা চন্দ্রমার, কোমল মালতী,
 মিলিয়া পলকহীন ; অচল নয়ন,
 দেখিতেছি সেই জ্যোতি, কতই ভাবনা,
 ভাবিতেছি একমনে ; হেনকালে হয় !
 সহসা চরণধনি, শুনিনু সোপানে ।
 শুনি সে চরণধনি, ফুটিল অমনি,
 শত সাধে অভাগীর হৃদয় কমল ;
 উজ্জ্বল হইল পদ্ম, নয়নের তারা !
 চঞ্চলে বাঁহল রক্ত, ধমনী ভিতরে,
 তাজিয়ে শয়ন আমি, উঠিনু সত্বরে,
 চমকিয়া চলিলাম চঞ্চল চরণে,
 ভাবিনা অন্তরে বুঝি, প্রাণেশ আমার,
 আসিলেন তুধিবারে এই অভাগীরে ।
 কিন্তু কি বলিব হাঁয় ! মুহূর্ত্ত ভিতরে,
 শুকাইল আশালতা হৃদয় কাননে,
 দেখিলাম ক্ষীণলোকে, সোপান উপরে,

সজ্জিত সমর মাজে প্রাণেশ বাজবে !
 তখন জানিনি মনে, অমৃত জলদ
 বরশিবে হল্যহল ; কোমল মূর্ত্তি,
 কে জানে কটকময় ; জানে কি কখনো,
 কুরঙ্গিনী, মরীচিকা, তরঙ্গিনীরূপে
 শোভে ববে মকতুম, জানিনা অন্তরে !
 দেববেশে এল সেই, কৃতান্ত আমার ।
 প্রবেশিয়া নিজ কক্ষে ছায় ! তার মনে,
 বসাইলু সমাদরে. কাষ্ঠাসনপরে,
 আপনি বসিনু পাশে, পবিত্র অন্তরে !
 শনিবারে প্রাণেশের ! মঙ্গল বারতা,
 শনিবারে সময়ের অপূর্ব্ব কাহিনী,
 কটকিত কলেবরে শুনিনু শিহরী,
 মনোহরা শোভাময়ী আর্ডিয়া নগরী
 বেক্ষিয়াছে চারিদিকে, রোম অনীকিনী ।
 কহিলা বর্ষর পুনঃ, কতক্ষণ পরে,
 “সময়ের পরিচয়ে ক্রান্ত কলেবর,
 তোমার মন্দিরে আমি, অতিথি সূন্দরি,
 বক্ষিব যামিনী দেবি, মন্দিরে তোমার !
 অনুমতি দাও তুমি, ভুবনমোহিনী ।”
 কি বলিব পতিপ্রাণা, সতী সাধী প্রায়,
 ওখনি সম্মতি দিনু, কহিনু আবার
 ভাগ্যবতী আজি আমি, ধরণী মণ্ডলে !
 রাখিলাম অতিথিরে, অমৃত প্রদানে
 পোষিলাম আশীর্ষিবে ; কিছুক্ষণ পরে,
 আই কক্ষে নিদাকণ করিল শয়ন ।
 বলিলাম গিয়ে আমি, অলিন্দ উপরে,
 দেখিলাম সূৰ্যময়ী নিত্রা পরশনে,
 অচল জীবনস্রোত, কণেকের ওরে
 সুমাইছে জীবকুল, কেবল কাননে

নিঃশ্বনিছে সমীরণ, আর নীলাবরে
 ছুটিতেছে কাদস্থিনী, আবরি-সমাজে,
 গলজ্জ চন্দ্রমা ছবি, নয়ন মন্দন !
 দেখিছু অলিন্দে বসি, নয়ন অদূরে,
 ভুবন সূন্দরী রোম নিদ্রায় বিহ্বলা ।
 ক্রমে নবমীর শশী চলিল পাশ্চিমে,
 সঘরি মধুরময় কোঁয়ুদী কোমল ।
 বসিয়াছি, হেনকালে কতক্ষণ পরে,
 ডাকিল 'জুলিয়া' আসি, ভাঙ্গিল চেতন,
 চলিলাম ক্রুত পাদে শয়ন মন্দিরে,
 পশিয়া শয়ন কক্ষে, 'জুলিয়ার' সনে,
 খুলিলাম চাকবেশ, রাজেশ্রমোহিনী,
 পরিচু শয়ন বাস, পর্যাক উপরে,
 রাখিলাম কলেবর, কোমল শয্যা
 ভুবার শীতল জল, স্ফটিক আধারে,
 রাখিয়া নিশীথ-মঞ্চে, 'জুলিয়া' সূন্দরী
 আবরিল চাক দীপ, নীল বসনের
 স্নকোমল আবরণে, বাঁধিল আবার,
 প্রফুল্ল কুসুম দাম, মুক্ত বাতায়নে ;
 বিদায়িছু 'জুলিয়ার' কতক্ষণ পরে ।
 তার পরে আসিলেন, বিশ্ববিনোদিনী
 চিরসুখময়ী নিদ্রা নিকটে আমার,
 পরশিলা কলেবর, চিরমোহময়ী,
 মুদিয়া নয়ন দুটি হনু অচেতন
 সময়ের চল চক্রে মধুরা বামিনী
 নীরবে গন্তীরা ; ক্রমে কোমল শয্যা
 নিদ্রায় বিহ্বলা প্রাণ, হেনকালে হায় !
 বোধ হল কলেবরে কর-পরশন ;
 অমনি ভাঙ্গিল নিদ্রা উঠিছু শিহরী
 হৃদয়ের প্রতিঘাত, হইল চঞ্চল,

সভয় হইল হিরা, সৌদামিনী সম ।
 উঠিয়া বসিছু সেই পর্যাক উপরে,
 দেখিছু শয়ন কক্ষ পূর্ণিত আলোকে !
 খুচিয়াছে প্রদীপের, নীল আবরণ,
 চঞ্চল প্রদীপালোকে, দেখিছু আবার,
 পর্যাকের পাশে সেই দুরাভা বর্করে !
 নিষ্ক্রোষিত অসি করে, মুহূর্তেক তরে,
 ঘুরিলা, নয়ন মম, চমকিল প্রাণ !
 সঞ্চারিল সৌদামিনী ধমনী ভিতরে,
 তরল অনল স্রোত, বহিল শরীরে,
 * * * * *
 মুহূর্ত ভিতরে পুনঃ, পর্যাক ত্যজিয়া,
 ব্যাধ শরে বিদ্ধ মত্তা সিংহিনী যেমতি
 পড়িলাম হর্ষাতলে, আকুল অন্তরে ;
 ভিজানু স্নয়নাসারে, চরণ তাহার,
 করিছু বিকল কণ্ঠে, সহস্র মিনতি,
 ভাগ্যদোষে, কি বলিব, নয়নের জলে,
 স্রবীভূত হইল না, নির্ঘম পাষণ !
 কি বলিব প্রাণনাথ ! সেট দণ্ডে হায় !
 আলিঙ্গন করিতাম উলঙ্গ রূপাণে,
 ত্যজিতাম এই প্রাণ, অস্নান বদনে !
 কিন্তু স্রধু ভাবিলাম, কলঙ্ক বেদনা,
 বাথিবে প্রাণেশ প্রাণ, ভাবিতে ভাবিতে
 অবশ হইল প্রাণ, ঘুরিল আবার,
 নয়ন মশুক মম, চেতনা প্রবাহ,
 অচল হইল ক্রমে ধীরে ধীরে হায় !
 খসিল ভূতলে নব বসন্ত বলরী
 অচেতন হর্ষাতলে রহিছু পড়িয়া ।
 * * * * *
 বল তবে প্রাণনাথ ! ধরিবে কেমনে,

কলঙ্কিত তনু পুনঃ হৃদয়ে তোমার !
 সতীত্ব বিহনে নাথ ! যুবতী জীবন,
 রাখিয়া কি ফল আর সমক্ষে সবার !
 এখনি তাজিব প্রাণ, অমান বদনে ;
 প্রাণেশ্বর প্রাণনাথ ! জনক আমার,
 অনন্ত বিদায় দাও, চিরঅভাগীরে,
 ধরিতে পারি না আর, কলঙ্কিত প্রাণ ।
 আর কি বলিব নাথ ! শিরায় তোমার,
 প্রবাহিত হয় যদি, রক্তের লহরী,
 স্রুতিফল পায় যেন, পাবণ্ড বর্ষর,
 বিদায়ের কালে এই, মিনতি আমার !
 এই দেখ, করে নাথ ! রূপাণ উজ্জ্বল,
 পবিত্র অন্তর মম, পবিত্র হৃদয়,
 কলঙ্কিত কলেবর, গুধু অভাগীর
 বর্ষরের পরশনে, সেই কলেবর
 প্রক্ষালিত করি এই, পবিত্র শোণিতে !
 বিদায় মা বন্দুমতী ! দাও অভাগীরে.

বহিতে ছবে না আর পাপিনীর ভার ।
 যাই তবে প্রাণনাথ ;--ওকি ? প্রাণেশ্বর !
 স্পর্শওনা কলঙ্কিত কলেবর মম !
 বিদায় বিদায় তাও ! প্রাণেশ বিদায়,
 এই বিদায়িনু বন্ধ ! এই দেখ নাথ !
 উছলিল বন্ধঃস্থলে, লৌহ-নির্ঝরিণী,
 সঙ্গরিয়া মর লীলা, নারীকুলেশ্বরী,
 পশিলা পবিত্রপুরে, নবীন যৌবনে,
 রূপের আকাশে মরি, বাসন্তি পূর্ণিমা,
 আঁবরিল অন্ধকারে, অনন্ত জলদে,
 শুকাল বসন্ত ফুল, প্রফুল্ল কাননে,
 মিলাইল ক্ষণপ্রভা, অনন্ত অশ্বরে,
 গম্বুরিয়া চলজ্যোতি, চির অন্ধকারে ;
 উষার চূষনে চাক, নব প্রমোদিনী,
 সৌরভিনী কমলিনী জলজ বৃন্দরী
 ডুবিল অতল জলে, ফুটিবে না আর ।

স্রীঃ—

স্ত্রীকবি ও তদনুযায়ী উপদেশ।

পীঠিকা।

সম্প্রতি স্ত্রীশিক্ষার ধরণ অবস্থা তা-
 হাতে যাহা পুরুষের শিক্ষণীয়, স্ত্রীলো-
 কেরা প্রায় তাহাই শিক্ষা করিতেছেন ।
 স্ত্রী পুরুষ উভয়ের উভয়জাতীয় শিক্ষা
 না হইলে সংসারের কখনই উন্নতি হইবে
 না। গৃহস্থালি, গার্হস্থ্যশিল্প, পাকবিদ্যা,
 এই সকলই স্ত্রীলোকদিগের প্রধান ও অ-

বশ্য শিক্ষিতব্য। বর্তমান স্ত্রীশিক্ষাতে
 এ সকলের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হই-
 তেছে।

পূর্বকালের স্ত্রীলোকেরা পুস্তক
 পড়িতে পারিতেন না, অক্ষর আঁকিতেও
 জানিতেন না, কিন্তু তাঁহারা গৃহস্থালি,
 গার্হস্থ্যধর্মোপযোগী শিল্প, বিনয়, সদা-
 চার, ধর্মপ্রবলতা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয়

শিক্ষিতব্য বিষয়ে বিশেষণ নিপুণা ছিলেন। তাঁহারা বালিকাদিগকে যে সকল খেলা রচনা করিয়া নিশ্চিন্ত রাখিতেন, তদ্বারা বালিকাদিগের বালিকা অবস্থাতেই গৃহ-স্তালি শিক্ষার অনুরাগ সঞ্চার হইত। রীতিবাহিত খেলায় রক্ষণ বিষয়ে অনুরাগ উৎপাদন করিত, পুতুল খেলায় পুত্র কন্যার লালন ও তাহাদের বিবাহ, আত্মীয় কুটুম্বের আদর আহ্বান, দাম্পত্য ধর্মের মর্যাদা, লৌকিকতা রক্ষা, প্রতিবেশীপ্রেম, পুত্রবধু ও কন্যাদিগকে শিক্ষা প্রদান, তাহাদের কলহ ভঞ্জন ইত্যাদি সমস্ত গৃহ-স্তালীর ব্যাপার অভ্যাস পাইত। এই সকল ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ও অমৃতস্বরূপ লজ্জা, ভয়, বিনয়, কোমলতা প্রভৃতি জন্মিত। এক্ষণ ক্রমে সে সকল উঠিয়া বাইতেছে, কেবল অক্ষর শিক্ষাই এখন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রাচীনকালের গৃহিনীরা কি প্রকারে শিক্ষা দিতেন, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত এই ক্ষুদ্র প্রস্তাব লিখিত হইল। প্রাচীন স্ত্রীগণের যে সকল সারগর্ভ উপদেশাঙ্ক বাক্য আছে, তাহাকে আমরা স্ত্রী কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। পুরুষেরা ভাবায় পণ্ডিত, তাহাদের ভাবা স্রাবা, স্ত্রীদিগের ভাবায় তত অধিকার ছিল না, এজন্য তাহাদের কবিতা তত স্রাবা নহে; স্ত্রীভাবা স্রব্র। স্ত্রীভাবায় প্রথিত ষণ্ডণ কবিতার মত বাক্যকে আমরা স্ত্রীকবি বলিলাম। ইহার ভাবা

এখন অবগ-সুখকর না হইলেও সারগর্ভ বলিয়া প্রমাণস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শিক্ষার আবশ্যিকতা ও সময়।

বিধাতা স্ত্রী পুরুষ সৃজন করিয়া আপন সৃষ্টির সৌন্দর্য্য রক্ষি করিয়াছেন। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, সংসারে স্ত্রী পুরুষ পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া চলিবে এবং পরস্পরকে স্রুখী করিবে ইহাই তাঁহার অভিপ্রের্ত। স্ত্রী পুরুষ যদি যথা-যোগ্য রূপে স্রুশিক্ষিত হইয়া একযোগে সংসারসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া সামঞ্জস্যে জীবনান্টিপাত করেন, তাহা হইলে এই মানব ধাম স্বর্গভূমি স্রুখধাম হয়।

প্রধানতঃ পুরুষেরা গৃহস্থ জাতি, নারীগণ গৃহিণীজাতি। স্ত্রী পুরুষের শিক্ষাবিভাগ এই যে, পুরুষেরা অর্জন শিক্ষা করিবেন এবং গৃহিণীরা গৃহস্তালী শিক্ষা করিবেন; ধর্ম, জ্ঞান, নীতি সাধারণে থাকিবেন। উহা পুরুষেরাও শিক্ষা করিবেন, স্ত্রীরাও করিবেন। যেমন এক যোগে গৃহস্তালি করিলে তাহা স্রুচাক ও স্রুখের হয়, তদ্রূপে ধর্মও একযোগে করিলে ফল হয়। নারীজাতি ধর্মানুষ্ঠান, গার্হস্থ্যবিদ্যা, শিক্ষা প্রভৃতি স্রুতস্রু হইয়া ককণ, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু এই সকলের অনুষ্ঠান একযোগে হওয়া উচিত, একযোগে হইলে বিলাসলেশে ও স্রুচাকরণে স্রুস্পাদিত হয়।

কি প্রকারে গৃহস্থালি করিতে হয়, কি উপায়ে ধর্মোপার্জন হয়, নারী-এ সকল শিক্ষা করিবেন এবং শুল্কিতা ইইয়া ধর্ম ও ন্যায় পথে থাকিয়া সংসারযাত্রা নিরীহ করিবেন। পুরুষদিগের প্রতি এইরূপ নিয়ম যে, গৃহস্থালি ও ধর্মোপার্জন এই দুইটি সংসার রক্ষের শাখা; ধর্মমুখ সম্ভোগ ভাহার ফল। স্ত্রীজাতির গৃহস্থালি না জানা বিড়ম্বনার বিষয়, পুরুষেরও ধনোপার্জনের অক্ষমতা অসীম দুঃখের কারণ। ধর্মমতির অভাব উভয়েরই অনিষ্টকর। যিনি যাছাই শিক্ষা করুন, তদানুযায়ীক ধর্ম ও নীতিশিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয়। অনুষ্ঠানকালেও ধর্ম ও নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্যাকরা কর্তব্য; যিনি ভাছা না করিয়া বদৃচ্ছাক্রমে কার্য করেন, তিনিই বিপদগ্রস্ত হইবেন।

বিনা শিক্ষায় কিছুই হয় না, ইহা স্থির-সিদ্ধান্ত। অতএব কি গৃহস্থালি, কি ধনোপার্জন সমস্তই শিক্ষা করিতে হয়। যাছা শিক্ষিতব্য, তাছা শৈশবাবস্থায়ই শিক্ষা করা কর্তব্য। কেন না বাল্যকালে যাছা শিক্ষা করা যায়, তাছাতেই উত্তম বৃৎপত্তি জন্মে। বয়োবৃদ্ধিসহকারে নানা বিষয়ে বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হওয়ার স্মরণশক্তির হ্রাস হয়, সুতরাং কোন বিষয়ই ভাল শিক্ষা হয় না। তখন ভোগের সময়, মুখভোগে মন ইতস্ততঃ সঞ্চার করে, সুতরাং কষ্টসাধ্য শিক্ষাসকল ঘটিয়া উঠে না। তখন বুদ্ধি প্রশস্ত হয় বটে, কিন্তু সংসারের চি-

ন্তায় ব্যাকুল হইতে হয় ও ঈদৃশ কষ্ট সহ্য হয় না। এই সকল কারণে শিশুকালেই শিক্ষা আরম্ভ করা কর্তব্য। এবিষয়ে প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরা বলিয়া থাকেন—

“কচিতে না নোয়া'লে বাঁশ।

পাক্লে করে ট্যাশ ট্যাশ” (স্ত্রীকবি) পূর্বে বাঁশের ছ'ড় ব্যবহৃত হইত, ‘চৌপালী’ নামক এক প্রকার তুল ছিল; তাহার ডাণ্ডি বাঁশের দ্বারা নির্মিত হইত, ঐ বাঁশ কচি অবস্থায় চৌপালীর উপযুক্ত করিবার জন্য বাঁকাইয়া দিতে হইত। কেন না পাকা বাঁশ নোয়াইতে গেলে ডাঙ্গিয়া য'য়। উপরোক্ত শ্লোকটি উদ্দৃষ্টে কোন গৃহিনী কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। পল্লী-বাসিনী বৃদ্ধা গৃহিনীরা কোন বুদ্ধিমতী বালিকা দেখিলে আশ্চর্যচিত্তে তাহার মাতাকে উপদেশ দিতেন ‘তোমার এই মেয়েটিকে এই বেলা গৃহস্থালি শিক্ষা ও মচেন ইহার পর আর শিখিতে পারিবেনা’ এবং আপনার কথা সপ্রমাণ জন্য উপরোক্ত পুরাতন স্ত্রী-কবিরূত শ্লোকটির আ-বৃত্তি করিতেন। অতএব যাছা শিক্ষিতব্য তাছা সংসারতার স্বন্ধে না পড়িতে পড়িতে বাল্যকালেই শিখিতে হইবে। যাছারা প্রথমকালে শিক্ষা না করেন, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সংসারী হইলে তাঁহাদিগের দুর্গতির সীমা থাকে না।

অশিক্ষিতা নারী কোন ক্রমেই গৃহস্থালির পুব্যবস্থা করিতে পারেন না। সোণার সংসারও অশিক্ষিতার হস্তে প-

ড়িলে ছাড়বার হয়। কি করিলে সকল দিক রক্ষা পাইবে, কিরূপ করিলে সংসারিক কার্য সহজ সাধ্য হইবে, কি কার্য করিলে সংসারের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে, কি উপায় অবলম্বন করিলে সংসারের অনিষ্টতা বা অপ্রভুল ঘৃচিবে এবং জীৱিকি হইবে, অশিক্ষিতা রমণীরা এ সকল বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অজ্ঞতা ও অনভ্যাস নিবন্ধন তাহারা সংসারকে ভার জ্ঞান করে এবং কার্য কালে তাহাদের ক্লেশ বোধ হয়, ক্রমে আলস্য প্রশ্রয় পাওয়াতে সংসার জীৱীন হইতে থাকে; সুতরাং তাহারা জীবনের সারমর্থ্য ও মুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হয়। দুরবস্থা ও ক্লেশসংহিতা বশতঃ ক্রমে তাহাদের কৃতি কলুষিত হয়। অমর্থ স্পর্শ করে, সুতরাং তাহাদিগের পারলৌকিক মুখেও জলাঞ্জলি দিতে হয়।

পুরুষদিগের সম্বন্ধেও ঐরূপ জ্ঞানিবে। পুরুষেরাও যদি প্রথম বয়সে উপার্জন, নীতি ও ধর্ম্মানুষ্ঠান শিক্ষা না করেন, তাঁহারাও সংসার-দশায় অশেষবিধ ক্লেশ পান। সংসার তাঁহাদিগের ভার বোধ হয় এবং তাঁহারা সংসার চালাইতে ব্যাকুল হন। অবশেষে হয় ত অমর্থ্য ও অন্যায় উপায়ে ধনাৰ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ইহপূর্ব উত্তর কালই নষ্ট করেন।

বাহির হইতে আনয়ন করা বা উপার্জন করা আর গৃহস্থালি কার্য করা এই উত্তর ভার যদি এক ব্যক্তির শ্রমে পণ্ডিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে তাহার ব্যপ-

রোনাশ্রু কষ্ট হয় এবং কার্যও সুরচা করণে নির্মাহ হয় না। একজন গৃহস্থ ও গৃহিণীর উহা অংশ করিয়া লওয়া কর্তব্য। গৃহস্থ বাহির হইতে ধনাদি আহরণ করিবেন এবং গৃহিণীরা তাহা গায়ত্রীয়া করিয়া ব্যয় ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তাহা হইলে উভয়েরই ভারের লাঘব হয় এবং উভয়েই মুখী হইতে পারেন। যদি গৃহিণীর আহরণের চিন্তা না থাকিল এবং যদি রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তাও গৃহস্থের না থাকে, তাহা হইলে উভয়েই আপনাপন কর্তব্যের উন্নতি করিতে পারেন ও মুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হইবেন। এইরূপ হইলে অতি সুন্দররূপে সংসার নির্বাহ হয়। নচেৎ একজন দাস হইয়া সমস্ত করিবেন, আর একজন যোদীর ন্যায়, উদাসীনের ন্যায়, পরের ন্যায়, নিঃসম্পর্কিত থাকিবেন ইহা অতীব অশাস্য। ইহাতে উভয়েরই অত্যন্ত কষ্টের বিষয় তাহা প্রাচীন কালের স্ত্রী কবিরা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

‘গাছে পাড়া তলার কুড়ান এ

সামান্য নয়।

নাকের জলে চোকের জলে একাকার
হয় ॥’ (স্ত্রীকবি)

কোন রহৎ রক্ষের ফল পাড়িতে হইলে দুই জনের আবশ্যিক হয়। একজন পাড়িবে ও একজন কুড়াইবে। এরূপ না হইলে কষ্ট এবং ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। আত্ম পাড়িয়া তলার ফেলিলে যদি রক্ষক না থাকে, তাহা হইলে অন্য-

স্বার্থে তাহা দুর্ফলোক কর্তৃক অপকৃত অথবা বন্যপশু দ্বারা ভক্ষিত হইতে পারে। অতএব পাণ্ডিতে গেলে কুড়ান এবং কুড়াইতে গেলে পাড়া হয় না। এই দৃষ্টান্ত শিক্ষা ও অভ্যাস করিলে সংসারকে ভারজ্ঞান হয় না এবং অনার্যাসে সংসার-কার্য-নিচয় সুরচাকরণে নিৰ্বাহ করা যায়। যু-টেয়া শিক্ষা কৌশল ও অভ্যাস বলে লোকের কত বজ্জার জেবা বহন করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

সংসারের অঙ্গ ও তাহার প্রণালী ।

সংসারে সকলেই অজ্ঞানাবস্থায় জন্ম-প্রাপ্ত করিয়া থাকে। ক্রমে বয়োরুদ্ধি সহকারে নানা প্রকার শিক্ষালাভ হয়। কিছু না কিছু শিক্ষা মনুষ্যের স্বাভাবিক। জ্ঞানসঞ্চার আরম্ভ হইলে কিছু না কিছু শিক্ষা হইবেই হইবে। যখন কোন প্রকার ঘটনা আপনা হইতেই হইবে, তখন ভাল বিষয় শিক্ষা করাই কর্তব্য। যে শিক্ষা দ্বারা ইহকালে সুখসচ্ছন্দ্য ও পরকালে শুভ হয়, তাহা শিক্ষা করাই সৰ্ব্বতোভাবে কর্তব্য। সে বিষয়ে আলস্যা করিলে মন্দ শিক্ষার ফল—কষ্টভোগ করিতে হয়। মনুষ্য যদি ধর্ম, নীতি, সংসার-নির্ব্বাহন-প্রণালী প্রভৃতি শিক্ষা না করে, এবং কেবল আহার ভয় ও ইন্দ্রিয়বলিংশ লইয়া থাকে তাহা হইলে সে পশু হইতেও অপকৃষ্ট হয়। পশুরা কোন ভাল বিষয় অর্থাৎ জ্ঞান, ধর্ম, নীতি, গৃহস্থালী ইত্যাদি শিখে

না। মনুষ্যেরা ইহা শিখে বলিয়া পশু অপেক্ষা সুখী ও শ্রেষ্ঠ। যে মনুষ্য এস-কল শিক্ষা না করে সে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়া থাকে, কারণ পশুদের কোন বিশেষ প্রকার পাপ শিক্ষা ঘটে না। মনুষ্য অশিক্ষিত হইলে সে দুর্নিবার ইন্দ্রিয়দির বশীভূত হইয়া কেবল পাপ শিক্ষা করে, সুরতঃ অধঃপাতে যায়। এবিষয়ে পুরাতন একটি স্রীগাথা এই—

“ বসে বসে খুটি নুটি ।

আভাগী যেন পাপের কুটি ॥ ”

যে নারী কোন আত্মহিতকর কার্য করিতে ভাল বাসেন না, তাঁহাকে ‘খুটি নুটি’ অর্থাৎ বৃথা বা নিষ্ফল কার্য করিতে হয়; যেহেতু কাহারও চুপ করিয়া থাকিবার যো নাই। একজন বজ্জদর্শী পণ্ডিত বলিয়াছেন, ‘মনুষ্য কার্যের অভাবে অকার্য্য করে’ অর্থাৎ কোন ভাল কার্যে নিযুক্ত না থাকিলে মন্দ কার্য্য আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। বৃথা কার্যে আশক্ত হইলে-তাঁহাকে ক্রমে পাপ আশ্রয় করে, সুরতঃ অভাগাবতী হইতে হয়।

অনেকে মনে করেন, পুস্তক পড়িতে পারিলেই জীবনের সমস্ত শিক্ষা সমাধা হইল। এটি বড় ভ্রম। পুস্তক পড়িতে শিক্ষা আর ঐটি কত অক্ষর পড়িতে শিক্ষা একই কথা। কএকটা অক্ষর জানা কোন ক্রমেই জীবনের প্রধান শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অনেক বালক বালিকা কেবল অক্ষর পড়িয়া বাবু অর্থাৎ অক-

ধূর্ণা ছইয়া পড়েন ; অলস, দুর্বল, অহ-
কারী, বিদ্যাভিমাত্রী, কার্যাক্রম, বিলাস-
প্রিয় হন। নিরবচ্ছিন্ন অক্ষর-শিক্ষা অন-
র্থের হেতু ; অতএব অক্ষর-শিক্ষা অপেক্ষা
কার্য শিক্ষাই ভাল। এমন অনেক লোক
দেখা যায়, বাহারা লিখিতে বা পড়িতে
পারে না অথচ তাহাদের হৃদয় লেখা-প-
ড়ার পরিণাম-ফলস্বরূপ—ধর্ম, জ্ঞান, নীতি,
কার্যদক্ষতা, সদাচার প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।
এই সকল গুণই লেখা পড়ার ফল, নচেৎ
উহা পাখীর মতন পড়া ও আঙোড়নের
মায় লিখা।

লেখা পড়ার এত সম্মান কেন এবং
তাহার স্বক্তি কেন ছইয়াছে, ইহা যিনি অ-
মুখাবন করেন তিনিই উহার যথার্থ মাহাত্ম্য
বুঝেন এবং শিক্ষার উন্নতি করিতে পা-
রেন। যেমন কার্খের সুবিধা ও প্রযো-
গ্যার্থ নানা প্রকার যন্ত্রের স্বক্তি ছইয়াছে,
সেইরূপ সহজে শিক্ষার নিমিত্ত লেখা-প-
ড়ার স্বক্তি ছইয়াছে। অতএব লেখা, জ্ঞান,
ধর্ম, নীতি প্রভৃতি শিক্ষার যন্ত্র স্বরূপ।
অভিজ্ঞদিগের উপদেশই শিক্ষণীয় ; লেখা
পড়া উপকরণ মাত্র।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে বাঙ্গল বালিকারা
অনেক প্রকার শিক্ষা করিয়া থাকে তৎ-

সমস্তই যে দিলি অবলম্বন করিয়া লাভ
হয়, তাহা নহে। গুরুপদেশ ও অন্যান্য
নানাবিধ উপায়েই অধিক শিক্ষা হয়। এ-
সময়ে একটি স্ত্রী-গাথা আছে—

“ যে শেখে সে শেখে

ঠেকে শেখে আর দেখে শেখে ॥ ”

যাহার শিখিবার ইচ্ছা থাকে, সে
কোননা কোন প্রকার শিখিবেই শিখিবে।
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বজন, গুরু এই স-
কলের উপদেশ অনুসারে শিক্ষালাভ হয়।
কখন কখন এবং কোন কোন বিষয় বিনা
উপদেশেও শিক্ষা ছইয়া থাকে। বিনা
উপদেশে যাহা শিক্ষা হয়, তাহার দুই
প্রণালী আছে ; এক চেকিয়া শিক্ষা আর
দেখিয়া শিক্ষা। বুদ্ধিমতী বালিকারা অ-
ন্যের মুস্তান্ত দেখিয়া অনেক কার্য শি-
খিয়া থাকে। ইহসংসারে সময়ে সময়ে
নানাবিধ আপদপ্রাপ্ত হইতে হয়। বিপৎ-
পাতে সর্বদাই ক্রেশ ও ক্ষতি ঘটে, তৎ-
কালে অজ্ঞাতপূর্ব ও অপ্রতপূর্ব বহুবিষয়
শিক্ষা করা যায়। অন্যান্য কার্খের ফল
উপাস্থিত হইলে অনুতাপ জন্মে, তাহা হ-
ইতে শিক্ষা হয়, ইহাই চেকিয়া শিক্ষা।

(ক্রমশঃ ।)

রসিকতা ও রসের কথা।

—

এই বঙ্গদেশ রসিকতার সমুদ্রবিশেষ। পৌরাণিকেরা ক্ষীরলবণ প্রভৃতি সপ্তসমুদ্রের বিবরণ লিখিয়াছেন। যদি তাঁহারা বঙ্গভূমির আধুনিক ইতিহাস দিয়া-মাত্র পাঠ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ইহাকে রস-সমুদ্র নাম দিয়া পুরাণ-প্রসিদ্ধ ভূগোল-শাস্ত্রে সমুদ্রের সংখ্যা সাত না লিখিয়া আট লিখিতেন। জ্ঞানানন্দ্রের অভিধানে বজ্রের এক নাম দাস-নিবাস, আর এক নাম রস-বিভাস। কেন না, এদেশের সকলেরই ললাটপটে দাস-ব্দের ধ্রুবরজ্জ্বল-রেখা এবং অধরে ও নয়ন-প্রান্তে রসিকতার মধুরলাঞ্ছন, সকল সময়ে সমানরূপে পরিলাকিত হইয়া থাকে।

পুস্তকন্যা কি জাতাতগিনীর নাম রাখিতে হইবে,—বাজালি শুখনও রসিক। কারণ, পুস্তকের নাম রসিকচন্দ্র, কন্যার নাম রসময়ী চৌধুরানী। জাতার নাম প্রাণনাথ দত্ত, কি রতিকান্ত রায়; ভগিনীর নাম অনঙ্গমঞ্জরী। নামে এইরূপ অসাধারণ রসিকতা পৃথিবীর আর কোন্ দেশে দৃষ্ট হইয়াছে?

দেশবিশেষের নামাবলী পাঠ এক হিসাবে সেই দেশের প্রকৃতি-পাঠ। বৃট্টেমেরা জানেন শুণে, বৈজ্ঞানিকবলে এবং রাজনীতির কৌশলে আজি কালি সমস্ত

মতাজগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়া থাকিলেও তাঁহারা কোন এক দিন যে গর্তে বাস করিতেন ও আঁম-মাংস ভাল বাসিতেন, এবং এইক্ষণে তাঁহাদিগের বাস্তুরাজ্যে ভারত-ইন্ডের জীড়াময়ী কম্পনা যে বিরাজ করিতে পারিতেছে, তাঁহাদিগের নামেই তাহার নিদর্শন। কারণ, যদিও তাঁহাদিগের মিল মেকলে প্রভৃতি ঐতিহাসিক-বর্গ, পরকীর জাতি-চরিত ও সাহিত্যাদির সমালোচনার ক্ষুরধারতীক্ষ্ণতা অবলম্বন করিয়া, পৃথিবীর পুরাণতম জাতিকেও অকুণ্ঠিতকণ্ঠে অসভ্য বলিয়া গালি দিতেছেন, এবং ভাষাতত্ত্বের ভাষাধরূপ দেবজনস্পৃহনীয় সংস্কৃত ভাষাকেও বিকটবুলি জ্ঞান করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে Fox (শৃগাল), Wolf (হুক), Savage (বন্যবর্কর), Hogg (শূকর) ও Badcock (মন্দকুকুট) প্রকৃতি অপ্রতিমধুর ও মধুরার্থক নামসমূহ সাহিত্যে প্রথিত ও সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে এবং লোকে অদ্যাপি এই সকল নাম সাদরে গ্রহণ ও সম্মানে ব্যবহার করিতেছে। স্বামী, দিবসের পরিজ্ঞমের পর ক্লাস্তকলেবরে গৃহে আসিতেছেন, গৃহলক্ষ্মী প্রেমভরে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতেছেন,—‘হে শৃগাল, হে শৃগাল!’ অথবা—‘হে হুক

হে স্বক ! ' পুনরপি বলিতেছি, কি মো-
হনধনি, কি মধুর ! বঙ্গীয় কুলকামিনীরা
ক্লাস্তকলেবর কান্তকে ' হে শূগাল', অ-
থবা 'হে স্বক' বলিয়া সম্ভাষণ করেন না
বটে, কেন না বঙ্গালি রসিক । কিন্তু
রসিকতার অনুরোধে বঙ্গালির নামাবলী
যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহা পুরুষের
শোভা পায় কি না এবং পুরুষের তা-
হাতে তৃপ্তিলাভ সম্ভব কি না, ইহা গভীর
সন্দেহের বিষয় । অথবা ইহাতে সংশয়
ও বিস্ময়ের কথা কি ? ষাঁহার ভারতউ-
দ্ধারের জন্ত আন্ধার তালে গীত গাইতে
পারেন, তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া না-
চনিচ্ছন্দের অশ্রাব্যকবিতায় জাতীয় হৃদ-
য়ের মর্ম্মনিহিত শোকবহি উদ্গীরণ ক-
রিতে সমর্থ হন, তাদৃশ বীরেন্দ্র-কেশরী,
সুরসিক ধুরন্ধর পুরুষদিগের নাম কামি-
নীকান্ত, বামিনীকান্ত, কুমুদিনীকান্ত ও বি-
নোদিনীকান্ত এবং রমণীমোহন ও ' দ-
লিতাঞ্জন পুঞ্জগঞ্জন ' ভামিনীরঞ্জন ভিন্ন
আর কি হইতে পারে ?

কবিসমাজের কীর্ত্তিস্তম্ভ শেখপীর ক-
হিয়াছেন—

'নামে কি করে;

গোলাপ, যে নামে ডাক, মধু বিতরে ।'

আমরা অকবি, স্তত্রাৎ একথা আমরা
মানিতে পারি না । আমরাদিগের এই বি-
শ্বাস যে, নামে আর কিছু না ককক, উহা
দেশীয় কচি এবং সাময়িক প্রকৃতির অন্ত-
স্তল পর্য্যন্ত প্রদর্শন করে । প্রাচীন আৰ্য্য-

বীরদিগের নাম, ভরত, শক্রয়, ভীষ্মাৰ্জ্জুন,
বলদেব, বাগুদেব, ব্রহ্মোদন, ভীম ;—ঋ-
ষিদিগের নাম ব্যাস, বাস্মিকি, বিশ্বামিত্র,
বশিষ্ঠ;—শাস্ত্রকারদিগের নাম, পাণিনি,
পতঞ্জল, কাভায়ন, কণাদ;—এবং দে-
শস্থ সাধারণ ভ্রলোকদিগের নাম শতা-
নন্দ, শাকটায়ন । যখন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ
প্রভৃতি মাননীয় আৰ্য্যগণ, বঙ্গ প্রথম স-
মায়ত ও উপনিবিষ্ট হইলেন, তখন এই
বঙ্গেরই বঙ্গালিদিগের নাম শুরসেন ও
বীরসেন, বিজয় ও বল্লাল, এবং সেই সমা-
য়ত মহানুভাবদিগের নাম দক্ষ, বেদগর্ভ,
মকরন্দ ও ধিরাট । তাহার পর, যখন অ-
ত্যাচারের প্রারম্ভের সময়ে বঙ্গভূমি যখন
অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন এবং সর্দেখা অ-
ধোগতিপ্রাপ্ত হইল, শিক্ষা ও সভ্যতার
শ্রোতে ভাটা লাগিল, বিদ্যাবুদ্ধি ও মহ-
ত্বের গৌরব পর-পাদ্রকা-লেহন জন্য নূতন
গৌরবের নিকট হীনপ্রভ হইয়া পড়িল,
তখন তাঁহাদিগের নাম হইল, আই, চাই,
কচু, ঘেচু, বিক, কোক ইত্যাদি । এইক্ষণ
বঙদিগের পর, বঙযুগের তপস্যার পর,
বিলাসসময়ে ভাসমান, অশিক্ষিত অসভা,
অকচিসম্পন্ন বঙ্গালি-বীরদিগের নাম হ-
ইয়াছে,—রমণী, কামিনী, মানিনী, ভা-
মিনী, কুমুদিনী, বিনোদিনী, রাই, কি-
শোরী । ইহার পর, কোন দিন হরত,
কোন এক সুরসিক বঙ্গালি, ব্রজবিলাস
যাত্রায় জয়দেবের গীত শুনিয়া, আত্মজের
নাম রাখিবেন,—“ললিতলবঙ্গলতাবল্লভ”

—এবং অভূজের নাম রাখিবেন, ‘প্রে-মময়ী-পদ-পঙ্কজ’। তিনকালের ত্রিবিধ কচি, স্তুরাং ত্রিবিধ নাম ।

নামে যেমন বাঙ্গালির রসিকতা, সা-হিত্য এবং সামাজিকতাতেও বাঙ্গালির সে-ইরূপ কি ততোদিক রসিকতা, ‘দেদীপা-মান, দোহুলামান ও চলচমাংমান’ রহি-য়াছে। আদৌ প্রামাণ্যসিক। প্রামাণ্যসি-কদিগের মধ্যে ষাঁহার প্রাচীন, তাঁহাদি-গের বেদ দার্শনিকের পাঁচালী, ভাষা আ-ধুনিক কবিগোলাদিগের টপ্পা এবং টকা গোনিন্দের দুই একটি গীত । তাঁহার স-ভাঙ্গলে ইহার কোন না কোন ব্যক্তির নাম লইতে পারিলেই, আপনাদিগকে যাননাচার্য্য কি কল্পকভট্টের অতিরিক্ত প্র-র্ণোজ্ঞ জ্ঞান করিয়া অভিমানে ফুলিয়া উ-ঠেন ; এবং আলাপে কাহারও মাতা, স্ব-শ্রমমাতা, দুহিতা কি ভগিনীকে যদি ভ-জিক্রমে কুলকলঙ্কিনী, অথবা সন্তানতুল্য ঘনিষ্ঠ-জন-সম্পর্কে কলুবচারিণী বলিতে পারেন। তাহা হইলে, কি রসিকতা প্রদ-র্শন করিলেন, আর কি রসের কথাই না বলিলেন, ইহা ভাবিয়া আঙ্লাদে অবশ হন ।

প্রামাণ্যদিগের মধ্যে ষাঁহার নব্য র-সিক,—হয়ত কোন দিন কোন এক প্রামা-পাঠশালার, বাঙ্গালার দুচারি পংক্তি পা-ড়িয়াছেন,—হয়ত কোন দিন কোন এক ভদ্র লোকের মুখে বায়রণের নাম শুনি-য়াছেন,—ষাঁহার এইরূপ রসিক, তাঁহার

সাধারণতঃ বাসর ঘরের দিনোদচন্দ্র,— নাটক নবেল রূপ কমলবনের নবীন জ-মর, এবং প্রেমসমরোৎসবের ভেক। দুই একটি কদম্ব কবিতা কণ্ঠস্থ আছে,—বি-দ্যার এই পর্য্যন্তই দৌড়—আসর পাইলেই সেই কবিতা পড়িতে হইবে। শিখুর এ-কটি গীত কোনকালে শিখিয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ মতে গাইতে হইবে। আর, মধ্যে মধ্যে মাটিকেল নামক কাব্য-রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্রের কথা, এবং বিষ্ণু-রক্ষ নামক উদ্ভিদ-তত্ত্ব রচয়িতা বিদ্যাপতির কথা উল্লেখ করিয়া প্রমুকারের নিন্দা কি প্রশংসা করিতে হইবে। নহিলে, লোকে তাঁহাদিগকে রসিক বলিবে কেন ? যদি বেশে এইরূপ রসিকতারই আদর না থাকিত,— তাহা হইলে কবির আসরের এক পার্শ্বে পিতা আর এক পার্শ্বে দুহিতা যুগ-পৎ উপবিষ্ট থাকিয়া কাব্য-রস-পিপাসার চরিতার্থতা সাধনে সমর্থ হইতেন না,— যাত্রার আসরে কোঁশল্যা রাম-শৌকে খেমটা নাচিতেন না,—এবং অর্ধ শিক্ত কুল কামিনীরা, অর্ধ শিক্ত নব্য রসিক দিগের নাগ, শিকার নামে অবলার স্ব-ভাব-সুন্দর শালীনতায় জলাঞ্জলি দিতে উৎসাহ পাইতেন না।

নগরবাসী রসিকদিগকে পুরাকালে নাগর কহিত ;—এখনও তাঁহার সেই নাগরই রহিয়াছেন ;—বেশে নাগর, বি-ভূষণে নাগর, এবং রসিকতা ও রসের ক-থাতেও ষোড়শ কলার সুরশোভিত হ্রদ্বিনার

নাগর। মুখে সতত অর্পশূন্য অট্টহাস্য, মনুষ্যের মর্মান্তিক দুঃখ এবং শোকের অন্তর্ভেদি আর্তনাদ লইয়াও হাস্য পরিহাস, সকল কপায়ই মুখভঙ্গি এবং মুখভঙ্গিতেই বিশ্ব বিজয়;—ভগবানের চিরিয়া খামায় এই এক শ্রেণীর জীব। যেমন আগমবাদী তান্ত্রিকের নিকট মদিরা-গন্ধ-শূন্য মনুষ্য মাত্রই পশু; ইহাদিগের নিকটও দীর্ঘ, গভীর, চিন্তাপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রই ভগ্নতাপস ও অকর্মণ্য লোক। ইহাদিগের রসিকতার প্রথম লক্ষণ পরিনিম্ন। যিনি মুক্তকণ্ঠে ও মুক্ত হৃদয়ে, প্রাণের সহিত পরিনিম্না করিতে কৃষ্টিত হইবেন,—সহৃৎসাহসীল কৃতী পুরুষকে পাগল কি পাষণ্ড বলিয়া করতালি দিতে এবং কি দেশের হিতকর, কি সমাজের মঙ্গলকর সমস্ত প্রকারের সংকর্ষকেই সময়ের অপব্যয় অথবা বাল-চাপলা বলিয়া ক্রমক্ৰমে উড়াইয়া দিতে লজ্জা অনুভব করিবেন, ইহাদিগের নিকট তাঁহার আগমন লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। ইহাদিগের রসিকতার দ্বিতীয় লক্ষণ ইতর-ক্রম-সেবা অঙ্গীল ডায়া। যে সকল শব্দ, অভিধান কর্তৃক স্থায় পরিভ্রান্ত হইয়াছে এবং সমাজের ভ্রম বিভাগ কর্তৃক দূরীকৃত হইয়া পাপনিবাসের গঙ্কিল ভ্রমে লুকাইয়া রহিয়াছে, সেই সকল অকথা শব্দই ইহাদিগের কথা ভাষা এবং আদরের ধন। যিনি জিহ্বাকে তাদৃশ শব্দের দ্বারা কলুষিত করিতে সঙ্কচিত হন, ইহাদিগের নি-

কট তাঁহার আগমন লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। ইহাদিগের রসিকতার তৃতীয় লক্ষণ নিজ নিজ ভাষ্যা প্রমত্তে প্রমালাপ। যিনি পৃথ-দুঃখের সঙ্কীর্ণ, জীবনের সহ-ধর্মণী, ধর্মপরিগৃহীতা ভাষ্যাকে গণিকা হইতেও স্থগিত রূপে বর্ণনা করিতে শ্লান ও পরিশ্রান রহেন, ইহাদিগের নিকট তাঁহারও আগমন লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। হায়! এইরূপ রসিকদিগের হস্তেই বঙ্গভূমির ভবিষ্যৎ ন্যস্ত রহিয়াছে।

যখন ঋণ-জন্মা মধুসূদন মনোমদ-মধুর নিঃশ্বনে কবিতায় বঙ্গ-ভারতীর স্ততি-গীত গাইতে প্ররুত হইলেন, এবং বঙ্গের কতিপয় উচ্চ শিক্ষাশ্রিত ও প্রতিভা সম-শ্রিত কামতালী পুরুষ বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিশোধন ও পরিবর্ধন এবং উন্নতি ও বিকাশের জন্য প্রথম লেখনী ধারণ করিলেন, তখন লোকের এইরূপ আশা হইয়াছিল যে, এতদিনে বাঙ্গালি, পক্ষ পরিভাগ করিয়া, পদ্ম-মধুর জন্য মানস গরলবরে সম্মরণ করিতে শিক্ষা করিবে। কিন্তু এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, লোকের সে আশাও যুগ-তৃতিকায় পরিণতি পাইতেছে। কারণ, অনুকরণের পর অনুকরণে, তার আবার অনুকরণে, বাঙ্গালার ইদানীৎ বাহা কিছু লিখিত হইতেছে, তাহার সাধারণ নাম—রসের কথা; এবং যে কেহ বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁহার সাধারণ নাম,—রসিক।

পূর্বে যেমন আমরা বাঙ্গালার ভারত-

উদ্ধার-রত দীরভদ্রদিগের নামানলী পাঠ করিয়াছি, যে সকল অমূল্য গ্রন্থের দ্বারা সেই ভীরত-উদ্ধার লাভ করিলে, পাঠক-বর্গের কৌতুহল নিরন্তর জ্ঞান আমরা এ-স্থলে তাহারও দুচারিটি নাম উল্লেখ করিতে পারি। বাঙ্গালির মল্লিকসম্বৃত বঙ্গাকরে লিখিত প্রাচীন গ্রন্থমালার নাম অনুমানদীপ্তি, শঙ্কশক্তিপ্রকাশিকা, শঙ্কতত্ত্বকৌমুদী। এইসকলকার গ্রন্থ সমূহের নাম,—‘তুমি কি আমার’, ‘আমি কি তোমার’, ‘হায় কি মজার শনি-বার’, ‘হায় কি রসের সূতম বাহার’ ইত্যাদি। বঙ্গদেশ কাব্যের প্রিয়নিবাস, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই রস-সমুহের আকালিক উচ্চাঙ্গে এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই একবারে এক সঙ্গে কবি হইয়া বসিয়াছে, এবং দুর্ভিক্ষ-দুঃখ-কাতরা ক্ষীণকলেবরা বঙ্গভূমি কাব্যের তটভিষাতি তরঙ্গ-তাড়নে এবং রসের কথার উৎপীড়নে অছোরাত্র ধর ধর কাঁপিতেছে। গ্রন্থকার চতুর্দশ বৎসরের বালক, শিক্ষকের গল-গর্জনে বিদ্যালয়ে তাঁহার স্থান হইল না—গৃহিণী একাদশবর্ষীয়া বালিকা, ঋশ্রাজ্ঞ-নের নির্ভূর গঞ্জনার গার্হস্থ্যজীবনে তাঁহার চিত্ত রহিল না। অতএব উভয়ে মিলিয়া কবিতা লিখিলেন, ‘হায় বৃথা আছি’—অথবা ‘হায় বৃথা কাঁদি’। অনুসন্ধান করিলে সপ্রমাণ হইবে যে, আধুনিক কবিতাপুঞ্জের অনেক কবিতাই এইরূপ রস-

লিপ্সু বালক বালিকার রসিকতার বিজুল্লগ।

কেবল বালক বালিকারাই যে এই দোষে দোষী, এমন নহে। বৃদ্ধ এবং পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত তরুণদিগের মধ্যেও অনেকে এই রস-বিকারের প্রবলশ্রেণিতে পড়িয়া ইদানীং ছাবু ছুবু খাইতেছেন। এদেশের একজন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন নবীন কবি আদিরসের কবিতা লিখিতে বড় ডাল বাসেন। আদিরসের কবিতা লিখিতে তাঁহার ক্ষমতাও আছে। ঐ প্রকার আদিরসের কবিতা নীতিবিগর্হিত বলিয়া অনেক সময়ে ঘর পর নাই অনিষ্টকর হইলেও, তাবের আবেগে এবং ভাষার পারিপাট্যে প্রায়শই পাঠকসমাজের একান্ত প্রীতিকর হইয়া থাকে। তিনি কবিতা লিখিয়াছেন,—‘কেন দেখিলাম’। কবিতাটি সুন্দর ও সুখপাঠ্য। তাঁহার ছন্দানুবর্তনে স্থানতঃ একশত মন্তিকশূন্য এবং শতাধিক রস-পরিচয়শূন্য অকর্মণ্য সুবা কবিতা লিখিয়াছেন,—‘কেন চাছিলাম’, ‘কেন চাছিলে’, ‘কেন নাচিল নয়ন’, ‘কেন কাঁপিলে বদন’। এইভাবে, যেন তেন প্রকারে অদ্যাপি অনন্তকোটি ‘কেন’ বাঙ্গালার লিখিত, মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচলিত হইতেছে। এই ‘কেন’ এইরূপ রসিকতার রাজ্য ছাড়িয়া আর যে যায়, এমন ভরসা কি ?

যে সময়ে সুবরাজ এদেশে পদার্পণ করিলেন,—প্রকৃত শরচ্ছত্রের ন্যায়, আ-

নন্দলহরী বিকীরণ করিয়া ভারতভারত-সাম্রাজ্য সংস্থাপনের জন্য উপনীত হইলেন, তখন এদেশের কবাকণ্ঠে উন্নয়ন এক কল্পন উপস্থিত হইল । যেই দুই তিনটি প্রকৃত কবি জাতীয়-সম্মান রক্ষার অভিলাষে কবিতায় যুগরাজকে সম্বাষণ করিলেন, অমনি কবিতার ককার-বোধ-বিরহিত মনস্ত্র যুগা, যেন কি এক রসাবেশে আবিষ্ট হইয়া, যুগরাজকে কবিতায় অঞ্চলের ধন, স্বেচ্ছতঃ বলিয়া চতুর্দিক হইতে সমস্তর চীৎকার করিতে লাগিলেন । লোকের বিশ্বাস-বিমুগ্ধ হইয়া এক অন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল,—ইহা কি ? বঙ্গভূমির বাৎসল্যরস সহসা এইরূপ উচ্ছলিয়া উঠিল কেন ?—কিন্তু যেহেতু শুধু এক বাৎসল্য-রসেই কবিতার পরাকর্ষ্য প্রদর্শন হয় না, এই নিমিত্ত বঙ্গের এক বয়োবৃদ্ধ পরিচিত কবি বঙ্গভূমিতে দর্পসহকারে প্রবেশ করিয়া, কবিতায় বর্ণনা করিলেন যে, ভারতমাতা জগতী হইলেও অ'জি রস-ভাবের উচ্ছলিত প্রবাহে পুনরায় যুবতী হইয়াছেন, এবং যৌবনের শোভা দেখাইয়া, কেশে ফুল, কর্ণে ছল এবং কপোলে চূর্ণকুম্বল হুলাইয়া, মদনমোহন নৃপনন্দনকে প্রেমভরে আকর্ষণ করিতেছেন,—অতএব যুগরাজ সানন্দে আসিয়া সমাগত হউন । এই কবিতা আমাদের কল্পিত প্রলাপ নহে । ইহা লিখিত, মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল-এবং সফল পাঠকবর্গ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া বলি-

রাছিলেন যে,—ইহা রসের কথা । পঞ্চ-বিংশতি কোটি মানুষের দৃষ্টিপ্রাণ ভারতমাতা বলিয়া যাহার নাম করিতেছে—দেশে বিদেশে শাস্ত্রার্থদর্শী স্মৃতিপুঙ্খেরা ইহাকে সভ্যতা ও সামাজিক নীতির আদি জননী, পরমার্থতত্ত্বের রত্ন-খনি এবং সকল ভাষার ভাষাপ্রসবিনী বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে, সেই আর্থাশ্রয়প্রবাহ-রূপা নর্মান্দা ও ভাগীরথীর পবিত্রবারি-ধোতা ভারতভূমিকে চটুলনয়না নবীননা-য়িকা সজাইয়া, তাঁহাকে রাজবেশে বিভূষিত নবীননারকের সঙ্গে সম্মিলিত করা সামান্য কবিত্ব-শক্তি এবং সামান্য রসিকতার পরিচায়ক নহে ।

আর একজন অভিনব কবি রূপজীবিনী পণ্যাবলাসিনীদিগের রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি নিপুট তত্ত্ব লইয়া কবিতা লিখিতেই বড় লুপী হইয়া থাকেন । মানুষ্য মানুষ্যের নিকট যাঁহা বলিতে পারে না, মানুষ্য মানুষ্যের নিকট যাঁহা শুনিতে চাহে না,—শুনিতে পারে না, তিনি কবিতায় সেই সকল অশ্রাব্য কথা অতি মনোহর ভাষায় প্রকটন করিতেছেন এবং সংপ্রতি রূপ একখানি কাব্য লিখিয়া তাঁহার ভাষ্যার নামে তাঁহা উৎসর্গ করিয়াছেন । এই কাব্য তাঁহার ইতিহাস, এই কাব্য তাঁহার উপন্যাস । ইহার অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার আত্মকথা । তিনি কোম একটি সরলছন্দয়া ফুলবালাকে কিরূপ কৌশলে ও কুহকে বশ করিয়া ফুলপিঞ্জরের বাহিরে আনিয়া-

|| ছেঁদ, আর একটিকে বাহিরে আনিয়া প-
 বিশেষে কেন ভাগ করিয়াছেন, তৃতীয়
 একটিকে প্রণয়কলহে একবার পরিত্যাগ
 করিয়া পুনরায় কি উপায়ে নগরের উপ-
 কণ্ঠে স্বকীয় উদ্যানে লইয়া গিয়াছেন,
 চতুর্থ একটিকে নর্তকী বানাইয়া মেয়ী সা-
 ম্পেন প্রকৃতি সামগ্ৰী সহকারে পাঁচ ইয়া-
 রের মজলিসে কিরূপে সভায় আনিয়া
 দেখিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয়ও উল্লিখিত
 কাব্যানিতে বিবিধ মধুরচ্ছন্দে বিন্যস্ত
 হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার হৃদয় তাঁহাকে
 ইহা বলিয়া অবশ্যই এইক্ষণ আশ্বাস দি-
 তেছে যে,—‘হে কবিবর ! হে বঙ্গীয় বী-
 ণাপাণির কাব্যবনের নূতন ভ্রমর ! তুমি
 আর অকারণ ককণস্বরে রোদন করিও না।
 তুমি বাঁহার জন্য এই কাব্য রচনা করি-
 য়াছ, রচনা করিয়া বাঁহাকে ইহা উপহার
 দিয়াছ, তিনি অতঃপর নিঃসংশয় তোমাকে
 রসিক বলিয়া সাদরে সম্ভাষণ করিবেন,
 এবং বঙ্গদেশের প্রাথমিক ও নগরস্থ উভয়
 শ্রেণীস্থ রসিক পাঠকই ইহার অভ্যন্তরীণ
 রসের স্বাদ গ্রহণ করিয়া তোমার ক্ষমতা
 ও গুণবত্তা, তোমার ভাবুকতা ও রসশাস্ত্রে
 প্রবীণতার কথা সর্বত্র ঘোষণা করিতে
 প্রস্তুত হইবেন।’

যদি উদাহরণের বাহুল্য প্রদর্শন আব-
 শ্যিক হইত, তাহা হইলে আমরা এইরূপ
 কাব্যগত রসিকতার বহু সংখ্যক উদাহরণ
 পাঠকবর্গের নিকটে অনাগ্রামে উপস্থাপন
 করিতে পারিতাম। কিন্তু বোধ হয়, আ-

মাদিগকৈ মে আশ্রয় পাইতে হইবে না।
 বাঁহারা বাঙ্গালী কাব্যের অনুশীলন কি
 সমালোচন করেন, আমাদিগের ভরসা
 আছে যে, তাঁহার সকলেই একবাঁকো
 আমাদিগের কথায় সায় দিবেন এবং উ-
 ল্লিখিতরূপ রসের লহরীতে ভাসিয়া যে
 বাঙ্গালি ও বাঙ্গলা সাহিত্য প্রাণে মরি-
 তেছে, ইহা হৃদয়ের সহিত স্বীকার
 করিবেন।

তবে কি রসিকতা ও রসের কথা
 পাপ ? প্রকৃতির এই রসপূর্ণ অমৃত-নিকে-
 তনে উপবেশন করিয়া, এমন কথা মুখে
 আনিতেও আমাদিগের সাহস হয় না।
 আমরা যখন জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর সেই
 অচিন্তনীয়, অনির্বচনীয়, উদাস্যব্যঞ্জক শো-
 ভাদর্শনে বিমোহিত হইয়া আপনাকে আ-
 পনি ভুলিয়া যাই, তখন আত্ম-স্মৃতির প্রথম-
 ক্ষুরণেই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে
 এইরূপ বলিতে থাকি যে, ইহা দেখিলেও
 বাঁহার হৃদয়ে রস-সঞ্চয় হয় না, তিনি
 চক্ষুঃস্বপ্নে অন্ধ, তিনি মনুষ্য নছেন, তিনি
 নুট। আমরা যখন সহসাকোন অটবীর
 মদ্যে প্রবেশ করিয়া, অটবীর শ্যাম-
 কান্তিতে প্রতিবিম্বিত সায়ন্তন সূর্যের অ-
 পরূপা কান্তি অবলোকন করি—সূর্যের
 আলোক বৃক্ষের পত্র পত্র ও পত্রান্ত-
 রালে এলায়িত ভাবে জড়িত হইয়া কি-
 রূপ হাসিতে থাকে ও খেলিতে থাকে,
 যখন আমরা স্তিমিত নেত্রে তাহা দর্শন
 করি, তখন ইহাই প্রথম মনে হয় যে, এই

মাধুরী, এই তবরাজি। এই লতাভিতান, এই নিস্তক্ক সোন্দর্য্যরাশি সম্মর্শনেও ঝাঁহার হৃদয়ে রস-সঞ্চার হয় না, তিনি চক্ষুঃস্বস্ত্রে অন্ধ, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি মৃত । আমরা যখন কোন প্রশস্ত-হৃদয়া ও প্রশস্ত-সলিলা স্রোতস্বিনীর পুলিনপ্রাপ্তে উপ-বিষ্ট হইয়া উহার তরঙ্গরাজির সহিত পূর্ণ-চন্দ্রের প্রভা-তরঙ্গের মীলানুভা নিরী-ক্ষণ করি, স্রোতস্বিনী চন্দ্র-কিরণ-স্পর্শে প্রমত্ত হইয়া, বক্ষে চন্দ্রহার পরিয়া, চন্দ্র-মালা পুমিয়া, কুলু কুলু ধ্বনিতে কতই কি কহিতে থাকে, আমরা যখন কর্ণ ভরিয়া তাহা শ্রবণ করি, তখন মুখে কথা না কুটি-লেও মনে ইহা বুলি যে, প্রকৃতির এই চাক দৃশ্য দর্শনে, এই অপরিষ্কৃত রসলাপ শ্র-বণেও ঝাঁহার হৃদয় রসসঞ্চারে আত্ম হস্ত না, তিনি চক্ষুঃস্বস্ত্রে অন্ধ, তিনি শ্রুতি-স্বস্ত্রে বধির, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি মৃত ।

কাব্যে নবরস, প্রকৃতির এই অনন্ত বিস্তারিত মায়াকাননে,—অনন্ত রস । তু-ষার-সমাবৃত হ্রনিরীক্ষ্য পর্কতের কাছে রসের এক কাছিনী, তকশাখাবিলম্বিত পুষ্প স্তবকের কাছে রসের আর এক কাছিনী । সমুদ্রের ফেণায়মান ধু ধু বিস্তারে রসের এক কথা, সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে রসের আর এক কথা । ঝাঁহার যথার্থ রসাল্পসু, যথার্থ রসিক. তাঁহারাই এই র-সই পান করিতেছেন এবং চিরকাল এই

রসই পান করিয়া কৃতার্থ হইবেন । বিজ্ঞা-নের গঞ্জীরা সৃষ্টি এই রসের সংস্পর্শ পা-ইয়াই সাধকের নিকট সূখাময়ী বলিয়া প্র-তিভাত হয় এবং প্রকৃত কবিতাও এই র-সের কণিকা লইয়াই, কোকিলার ন্যায় কলকণ্ঠে গাইয়া গাইয়া সর্বত্র সূখা বিত-রণ করে ।

পাঠক, তুমি কি প্রকৃতির এই রসো-পহারে উপেক্ষা করিয়া,—বিজ্ঞান ও ক-বিতা চিরঞ্জীতিবন্ধ দম্পতীর মত সম্মিলিত-স্বরে যে গভীর গীত গাইতেছে তাহাতে কর্ণ পাত লা করিয়া, শুধু ভ্রমরগুঞ্জ সদৃশ তরল রসের তরল কথা শুনিতেই ভাল-বাস ? যদি তাহাতেই তোমার হৃদয়ের তৃষ্ণা ও জ্বালা থাকে, তবে এস,—যে খানে কল্পনার কুঞ্জবনে শকুন্তলা মাধবী ও সহকারের সহিত স্নেহকঙ্ককণ্ঠে কথোপ-কথন করিতেছেন, রামচন্দ্র রমণী কুলের মুকুটমণি জনকনন্দিনীকে বাহুলতা উ-পরে রাখিয়া, চারি চক্ষে চিত্রপট দে-খিতেছেন, অথবা রোমিও জুলিয়টের গাফাতলে দণ্ডায়মান হইয়া হৃদয়ের পম্পূর্ণ প্রবাহ অপূর্ণ মানুষীভাষার ঢালিয়া দিতেছেন, সেই স্থলে গমন করি । কি গভীর, কি তরল, রসের কথা শুনিতো চাও ত কোকিল ও ভ্রমরের নিকট যাও । কাক ও ভেকের নিকট কে কবে রসের কথা শুনিয়া তৃপ্ত হইয়াছে ?

সমালোচন।

—

✓। “নিভৃত-নিবাস। কাব্য। প্রথমখণ্ড। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।” —আমরা রাজকৃষ্ণ বাবুর গুণপক্ষপাতী। তাঁহার কবিতায় সৃষ্টি নৈপুণ্য নাই, উদ্দীপনা নাই। কিন্তু আমরা তথাপি তাঁহার তরল ও প্রাঞ্জল পদাবলী পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়া থাকি। যনসম্মি-বিষ্ণু সুরবর্ণরাশি এবং সুরবর্ণের সূক্ষ্মায়ত বিত্ত পদ্মে যে প্রভেদ, প্রগাঢ় রচনার রসপূর্ণ কবিতার সহিত রাজকৃষ্ণ বাবুর কবিতারও সেই প্রভেদ। ইংলণ্ডীয় গ্রেয় শোক-গীত নামক প্রসিদ্ধ কবিতায় বনকুম্বরের অলোক-দৃষ্টি, অনাস্রাত সৌন্দর্যের একটি আশ্চর্য্য বর্ণনা আছে। সেই বর্ণনাটি অস্পাকর-প্রাথিত তত্ত্ব-সূত্রের ন্যায় যার পর নাই সংক্ষিপ্ত, সুতরাং যার পর নাই গাঢ়। পাঠ মাত্রেই সেই শব্দ কয়টি পাঠকের হৃদয়ে গিয়া চিরজীবনের জন্য মুদ্রিত হয়, এবং সেই শব্দগম্য নিগূঢ়তা থাকিয়া থাকিয়া মনে পড়ে ও মনে এই সংসার-সমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গ তুলিয়া দেয়, —এই অনন্ত জগতের অনন্ত সূক্ষ্মরূপিত্ব ও কল্পনার সারিধো অর্ধপরিচ্ছন্ন ভাবে ধীরে ধীরে প্রদর্শনের জন্য লইয়া আইসে। রাজকৃষ্ণ বাবু নিভৃত নিবাসের একটি কবিতায় সেই ভাবটিকে তরল বা-
জালায় ছড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রায়

কৌশলে এই অনুবাদও একান্ত মনোহর হইয়াছে। আমরা কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম। বাঙ্গালি কবি, বাগানের ফুলে মালা গাঁথিয়াও, তাহাতে বনফুলের শোভা কিরূপ ফলাইতে পারিয়াছেন, পাঠক তাহা দেখিয়া তৃপ্ত হইবেন।)

—“প্রিয়তমে, হৃদয়েশি ! এপোড়াকপালে তোমা হেন সুরভিত সুললিতফুল সরস থাকিবে কেন ? হায়রে, অকালে নীরস, বিশীর্ণ যোর কুম্ব অতুল ! বনের কুম্ব বনে আপনিই ফুটে, নিজে হাসে, নিজেদোলে, নিজেই খেলায়; গযত্রে মৌরভ তার আপনিই ছুটে, বনের কুম্ব বনে আপনি শুখায়। কেহ নাহি করে তারে আদর যতন, কাজেই না হয় মায়া নাহি কাঁদে মন।”

✓ যদি নিভৃত-নিবাস শুধু এইরূপ ভাবানুবাদেই পূর্ণ থাকিত, তথাপি আমরা ইহার প্রশংসা করিতাম। কারণ, কবিতায় কবিতার অনুবাদ নিতান্ত অনায়াসসাধ্য নহে। এদেশের একজন যশস্বী কবি বাঙ্গালায় সংস্কৃতের অনুবাদ করিতে গিয়াও উপহাসিত হইয়াছেন। যদি বাঙ্গালার সংস্কৃতের অনুবাদই এত কঠিন, তাহা হইলে ইংরেজীর অনুবাদ কত কঠিন, তাহা দিপি-ক্ষম ব্যক্তি মাত্রই অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু নিভৃত নিবাসের সমস্ত বা অধিকাংশ

শই যে অনুবাদ কিংবা অনুকৃতি, এমন নহে। ইহার অনেক কবিতা নূতন এবং নিতান্ত মধুর, কিন্তু কোন কবিতাই তাড়িত-তরঙ্গময়ী নহে। সাঁহার রাজকুমার বাবুকে কবি নামের অযোগ্য বলেন, তাঁহার হায় পরিহাস-রসিক না হয় ভ্রমাক্ত। অবসর সরোজিনী ও নিভৃত নিবাসের মত উপাদেয় কাব্য, উচ্চতর শক্তির পরিচায়ক না হইলেও উপেক্ষা কি অবজার বস্তু নহে।

২। “উপদেশ মঞ্জরী। জীশিচন্দ্র বিশারদ ভট্টাচার্য প্রণীত”।—গ্রন্থের কলেবর চতুর্দশ পৃষ্ঠা। গ্রন্থোক্ত বিষয় বিদ্যাশিক্ষা, খনোপার্জন, অহঙ্কার, ইত্যাদি প্রসঙ্গে চিত্তাশূন্য প্রচলিত উপদেশ। যথা “অভিমানের প্রধান সহচর ঘেঘ, অতএব যিনি অভিমানের বশবর্তী, তিনি ঘেষেরও দাস হইয়াছেন, সংশয় নাই”। সাঁহার মানবজগতের ইতিহাস শাস্ত্র পার্যালোচনা করিয়াছেন এবং মহত্বের অবতার-স্বরূপ প্রকৃত মহানুভাব পুরুষদিগের জীবনচরিত সমালোচনা করিয়া জীবনের নীতিসূত্র শিখিয়াছেন, তাঁহার এসকল অর্থশূন্য কথায় তৃপ্ত হইবেন কি না, জানিনা। গ্রন্থকার একজন প্রাচীন শ্রেণীস্থ পণ্ডিত; অতএব বাঙ্গালার অনুশীলনে তাঁহাকে উৎসাহ দেওয়া আমরা উচিত জ্ঞান করি।

৩। “শোকাঞ্জলি। ১৮৭৮ সনের ৯ই মার্চ তারিখে জিলজীযুক্ত অনরের বল এসলী ইডেন বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট গব-

র্নর কে, সি, এস, আই, সাঁহেব মহোদয়ের চট্টগ্রামে শুভাগমনোপলক্ষে শ্রীকালীকমল দত্ত প্রণীত”। ইহা একখানি ক্ষুদ্র পদ্যপ্রবন্ধ। লেখকের শব্দবোধ্য আছে, এবং শব্দের সহিত শব্দগ্রন্থনের ক্ষমতা আছে। অভ্যাস করিলে, তিনি পদ্যরচনায় পটু হইবেন বলিয়া ভরসা হয়। আমরা তাঁহার একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। গ্রন্থকার বিগত কার্তিকের সেই ভয়াবহ ঝটিকাঘর্ষণের বর্ণনার লিখিতেছেন,

“সেইদিন ডুবিলাম লবণাসু জলে,
যেন মজাইতে সৃষ্টি ভীষণ নিম্বনে
বহিল উত্তাল স্রোত কল কল কলে,
ভাগিল সকলদেশ সে ঘোর প্লাবনে।
স্মরিলে সে দুঃখরাশি ফেটোয়ার বুক
চিরতল কেন নাহি করিল সে জল?
তবে আর কে সহিত এ বিষম দুঃখ!
কে খণ্ডাবে ভবিতব্য লিখা কর্মফল!”

৪। “সাহিত্য-বিম্বু। জীজ্ঞানকী-নাথ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত”।—ইহাতে স্বভাব দর্শন, শূন্যস্বাদান, রাজ্য প্রতাপ-সিংহ ইত্যাদি শিরোনামে নীতিবিষয়ক ও ঐতিহাসিক কথাগুলক কতকগুলি গদ্য-প্রবন্ধ আছে। এই গ্রন্থখানি বালক-শিক্ষার উপযোগী। লেখা স্থানে স্থানে অপরিপক এবং কোন কোন স্থলে বাক-রণ-বিকল্প ও অশুদ্ধ হইলেও সাধারণতঃ প্রাজ্ঞল। আমরা একটি অশুদ্ধি এস্থলে দেখাইয়া দিতেছি, ভরসা করি গ্রন্থকার গ্রন্থের পুনঃসংস্করণে এইরূপ ভ্রমপ্রমাদ

পরিশুদ্ধ করিয়া দিবেন। যথা, পিরামিডের বর্ণনায় ৩২ পৃষ্ঠায়,—“ ইহা অল্প সময়ের মধ্যে বিলয় হইতে পারে।, ব্যাকরণ ও ভাষার চিরপ্রতিষ্ঠিত রীতানুসারে “ বিলয় পাইতে পারে, কি “ বিলীন হইতে পারে ” লেখা যায়, “ বিলয় হইতে পারে ” কখনই এইরূপ লেখা যায় না। কারণ লয় শব্দের অর্থ সংশ্লেষ ও বিনাশ; সংশ্লিষ্ট ও বিনষ্ট নহে।

৫। “ আক্ষেপ। কলিকাতা ভবানীপুর, গ্লরএন্টাল প্রেসে জীবরদাকান্ত বিদ্যারত্ন কর্তৃক মুদ্রিত ”। গ্রন্থকর্ত্তীর নাম কমলকামিনী। তিনি যে একটি সুশিক্ষিতা কুলকামিনী তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহার এই প্রণয়-বিস্ফোরকের কবিতাগুলি মিষ্ট ও মধুর। আমরা মিষ্টতার অনুরোধে দুই তিনটি কবিতা নিম্নে তুলিয়া দিলাম।

সখীরে !—

চেসে দেখ, দিনমণি যায়, যায়, যায় ;
প্রদোষ-অম্বরতলে, কাদঘিনী ছুটেচলে,
বলসিছে মৃদু মৃদু সরসীর গায় ;
বিবাদিনী কমলিনী সলিলশযায়।

* * *

সখীরে !—

কমল কমল-আঁখি ওই দেখ মুদিল ;
কুমুদিনী হাসি, হাসি, আনন্দ-মাগরে ভাসি,
ধীর ধীর আঁখিমেলি নাথপানে চাইল ;
রঞ্জিত-কিরণ, মরি, সে বদনে খেলিল।

সখীরে !—

কেন লো সহসা আজি হৃদিমন কাঁপিল ?

প্রাণেণ অসিবে যদি, দুঃ দুঃ কেন হৃদি
হতাশ-হতাশে কেন পোড়া দেহ পুড়িল ?
না জানি কপালে সখি আজিকিবা ঘটিল।

* * *

সখীরে !—

মনে হয় যেন মেঠে এ হৃদয়ে পশিয়া,
লইয়া হৃদয়-যন্ত্রি, সলয়ে মিশায়ে তন্ত্রি,
ডাকিছে মোহনরবে, সে যন্ত্রেতে খেলিয়া ;
রাধাকুঞ্জে বাঁকা যেন বেণু বাঁশী পরিয়া।

যদি সকলগুলি কবিতা এইরূপ হইত, তাহা হইলে আমরা শুধু প্রশংসা করিয়াই গ্রন্থখানি পরিভাগ করিতে পারিতাম। কিন্তু ‘ আক্ষেপের ’ বিষয় এই গ্রন্থকর্ত্তী আমাদেরকে এইরূপ সহজে বিদায় লইতে দিলেন না। তিনি প্রিয়-নিরহের প্রীতিকর প্রসঙ্গে হৃদয়ের উচ্ছ্বলিতবেগে কয়েকটি ভাল কবিতা লিখিয়া পরিশেষে, কি ভাবে, কি ছেতুতে জানি না, কয়েকটি অতিকন্দর্ষ্য কবিতা এই গ্রন্থে নিবিষ্ট করিয়াছেন। উহার একটি কবিতায় স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলেও ভাবতঃ তিনি ব্রজের রাধা ছইয়া বসিয়াছেন এবং তাঁহার ‘মনচোর’ মদনমোহনকে চন্দ্রাবলীর চাকবল্লভ এবং কুজার কেলিনায়করূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি অবশ্যই মনে করিয়াছেন যে, ইহাতে লোকে তাঁহাকে রসিকা বলিবে ; কিন্তু আমরা তাঁহাকে অতি কাঁতরবচনে এই কথা সহস্রবার বলিতে পারি যে, কি বঙ্গদেশের সুশিক্ষিত ভদ্রসমাজ, কি এই চিরঅযুগত বিনীত বা-

স্থব, কেহই এই কদম্ব্য রসিকতার উৎসাহ-
দাতা নহে ।

৬। “নীতিরত্নাহার। ঐকালীক-
শোর চক্রবর্তী প্রণীত”।—ইহা নীতিবি-
ষয়ক অথকানি পদ্যগ্রন্থ। ইহার দুই একটি
পদ্যরচনা অংশতঃ প্রীতিপ্রদ হইয়াছে।

৭। “স্বপ্নদর্শনে অভিজ্ঞান (দার্শ-
নিক) কাব্য। বেনারস নিবাসিনী শ্রীমতী
ভুবনমোহিনী দেবী প্রণীত ও শ্রীবিনোদ-
বিহারী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত”।
দর্শনশাস্ত্রের গৃঢ়াদপিগৃঢ় অগম্যতত্ত্ব লইয়া
কাব্য রচনা করা অনেকেরই শোভা পায়
না। দেবী ভুবনমোহিনী আমাদিগের
বিবেচনায় এইরূপ আয়াস-সাধ্য ব্যাপারে
হস্তক্ষেপ করিয়া ভাল করেন নাই। তবে
ইহা অবশ্যই বলিতে পারি যে, তাঁহার
রচনাশক্তি আছে এবং স্ত্রীলোকের রচনা
বলিয়া এই গ্রন্থ আদরযোগ্য।

৮। “মনুসংহিতা ও কুঙ্গুকভট্ট।
অর্থাৎ মহর্ষি মনুর মতের সহিত কুঙ্গুকভ-
ট্টের মতের তুলনার সমালোচন। ভূত-
পূর্ব ‘আর্য্যপ্রতিভা’ সম্পাদক শ্রীকৈলাস-
চন্দ্র ঘোষ প্রণীত”। এই প্রবন্ধটি প্রশং-
সাহ হইয়াছে;—লেখা উৎকৃষ্ট, লেখ-
কের বিজ্ঞাবত্তা ও চিন্তাশক্তিও সম্মানার্থ।
প্রাচীন তত্ত্ব লইয়া এইরূপ আন্দোলন ক-
রিলে, যেমন ইতিহাসের পথ খুলবে, বা-
ঙ্গালা ভাষারও তেমনই উপকার দর্শিবে।

৯। “সাহিত্যরত্নাবলী। শ্রীহরি-
মোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত”।—

হরিমোহন বাবুর এই পুস্তকখানি ছাত্র-
স্বত্তি পরীক্ষার বিশেষ উপযোগী। ইহাতে
উৎকৃষ্ট কবিতা আছে, উৎকৃষ্ট গদ্য প্র-
বন্ধ আছে এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের অন-
তিসংক্ষিপ্ত একটি ইতিবৃত্ত আছে।

১০। “বিশ্ব-বিষ চিকিৎসা। শ্রীহ-
রিমোহন মেনগুণ্ড প্রকাশিত”।—এই গ্রন্থ
খানি লেখকের যারপর নাই অনুসন্ধিৎসা
ও অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে।
গ্রন্থকার নকলনবিশ নহেন। পদার্থশাস্ত্র
ও চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎ-
পত্তি আছে এবং তিনি লিপিকর্ম।

১১। “জিমুতবাহন। (পূজাপদ্ধতি)
শ্রীঅনুকুল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বিরচিত ও
প্রকাশিত”।—নারায়ণ সেবার পুরাতন
পুথির মত ইহা একখানি নূতন পুথি। ই-
হার কলেবর ১৬ পৃষ্ঠা, মুদ্রণে পারিপাট্য
আছে। ইঙ্গের এক নাম জিমুতবাহন।
এই জিমুতবাহন ইঙ্গ নহেন, ইনি এক নূ-
তন দেব। গ্রন্থকারের ইচ্ছা যে, জগতে
ইহার পূজা প্রচলিত হউক।

১২। ‘মূলোচনা বিনাসম্। শ্রীশর-
চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীতম্। প্রথম সংস্করণ-
ম্।’—বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রে যেরূপ জঘন্য
আদিরসের উপকথা এবং উপকথার অব-
সানে নীতি কথা আছে, এই গ্রন্থখানি-
তেও সেইরূপ উপকথা ও নীতিকথার অ-
ভূত মিশ্রণ দৃষ্ট হইল। প্রভেদ এই, বিষ্ণু-
শর্মার সংস্কৃত যেমন পরিপক্ব ও প্রীতিপ্রদ,
ইহার সংস্কৃত সেইরূপ পরিপক্ব ও প্রীতি-

শ্রদ্ধা নহে। তবে ঐশ্বর্যকারের এই এক প্রশংসা, তিনি সংস্কৃতে ইহা রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃতে ঐশ্বর্য রচনা করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

১৩। “কবিতাবলী। লবণপুর-সংস্কৃত পাঠশালা-সংস্কৃত ভাষাপকানীতম জীহ্বীকেশ শাস্ত্রিণা বিরচিতা।”—এখানিও সংস্কৃতে রচিত, কিন্তু ইহার রচনা অপেক্ষাকৃত মধুর। পণ্ডিতবর হ্রদীকেশ শাস্ত্রী আধুনিক সংস্কৃত লেখকদিগের মধ্যে সম্মানের আসন পাইবার যোগ্য। তাঁহার রস বোধ আছে, ছন্দোবোধ আছে, এবং লিখিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে।

১৪। “কামিনী কলঙ্ক। ইদিলপুর নিবাসী জীহ্বমোহন ষোষ প্রণীত। উজ্জয়পুর নিবাসী জীহ্বানন্দচন্দ্র গুহের প্রযত্নে সংকলিত।”—এই চৌদ্দ পোমর পৃষ্ঠার চটি, কামিনী কলঙ্ক নামে অভিহিত না হইয়া, কলমের কলঙ্ক বলিয়া অভিহিত হইলেই ভাল ছিল। জল-প্লাবন-বিপন্ন একটি ভদ্র মহিলা দয়া হস্তে নিপতিতা হন, দয়ারী তাঁহার ধর্ম নাশ করে, একথা কামিনী-কলঙ্ক কিসে আসিল? লেখা পড়িয়া বোধ হইল ঐশ্বর্যকার কখনও কখনও বাঙ্গালা বই পড়িয়া থাকেন। “শোক একপ্রকার নহে” এই নীতি অবলম্বন করিয়া ঐশ্বর্যকার কএকটি পংক্তি লিখিয়াছেন। এই ঐশ্বর্যের মধ্যে সেই পংক্তি কয়টিই আমাদের নিকট ভাল লাগিল। অন্যান্য স্থান পাঠে বোধ হইল, যেন ভাষা

তাঁহার নিকট নিত্যস্থ নিপীড়িত, নিগৃহীত অবস্থায় অবস্থান করিতেছে;—তিনিও তাঁহাকে ভালবাসেন না, সেও তাঁহার নিকট পার্থক্যমানে বাইতে চাহে না।

১৫। “ভারত নলিনী। নাট্যগীতি। জীহ্বপূর্বকৃষ্ণ দত্ত বিরচিত।”—এই নাট্যগীতি অভিজ্ঞান শকুন্তলের অনুকৃতি। কিন্তু ইহাতে প্রশংসা করিবার কিছুই নাই। কালিদাসের সেই লীলাময়ী লেখা পড়িয়া তাঁহার পর ইহা পাঠ করা সময়ের অপব্যয় মাত্র। ভারতনলিনীর একটি গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল। আমাদের বিদগেয় বোধ হয়, বাঙ্গালা গীত সাধারণতঃ ইহা অপেক্ষা অধিকতর ললিত, মধুর ও মনোহর হইয়া থাকে। “কেনরে অবোধ চিত, প্রবোধ কথানাশন? জ্ঞান ত দুর্ভাষা শুধু, মিলিবে না সে রতন। ছে বিধাতঃ লওহে হরি, যদি হতে প্রাণেশ্বরী, না না না বিনয় করি যাগ দাক এদ্রোবন। এই কি কুসুম-বাগ, কহ মার। যোর স্থান, বজ্রহতে পরশাগ, বিধিছে যে এ পরাগ। এই কি সুধার অংশু, বিতর ওহে সুধাংশু তব ও সুধার অংশু দহিছে পাবক যেন।

১৬। “বিজয়া, উপহার। জীহ্বকৃষ্ণ লাল সরকার প্রণীত।”—গিরিরাজ-বাল্য উমা বিজয়া দশমীতে জনক নিবাস পরিভাগ করিয়া কৈলাসে বাইতেছেন,—এই কথা অবলম্বনে এই পদ্যময় কুত্র ঐশ্বর্যখানি বিরচিত হইয়াছে। ইহার মুদ্রণ-পারিপাট্য মনোহর, রচনাও স্থানে স্থানে সুন্দর। আমরা এখানে ইহার আটটি পংক্তি উদ্ধৃত ক-

রিল্যাম। বোধ হয়, এই আটটি পংক্তি পাঠক-
বর্গের নিকট পূর্বেকৃত গীত-কবিতা অ-
পেক্ষা অধিকতর মনো বন্দিয়া প্রভীত হইবে।

“ প্রাণের প্রতিমা পাঠাতে উমারে,
কাঁদে গিরিরাণী অদীরুবরে,
কাঁদে গিরি-রানী পাগলিনী প্রায়,
বাজে প্রতিধ্বনি গিরি গন্ধবরে ।

* * *

“ বায়ু স্তরে স্তরে, গতি শূন্য প্রায়,
শিহরি মার্ভণ্ড ছরিল কর,
যন তম্বুরত হইল জগৎ ।
মারা আবরণে ছাইল অদুর ।

১৭। “ শ্যালক বিরোগ কাব্য ।
প্রথমখণ্ড । ”— ইন্দ্রনাথ বাবুর রামদাস
শর্মা ভারত উদ্ধার নামক বাঙ্গা কাব্য নি-
খিরা বঙ্গে প্রপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । এই
বিরোগ কাব্যের রচয়িতা রামদাস শর্মার
বাঙ্গে মেহেরস্তার নকলনবিশ । রামদাসের
প্রতি ইহার অচলা ভক্তি আছে, কিন্তু রাম
দাসের লেখা নকল করিবার উপযোগিনী
কমতা আজও ইহার জন্মে নাই । ঈহারা
রামদাসের ‘জলে ফুল ভাসান ’ পড়িয়াছেন,
ঈহারা বিরোগ কাব্যের নদী-তট-দর্শন-
জন্য চিন্তার এই কবিতাটি পাঠ ককন ।
নদী তটে ।

কোথা যাও নদি, আজি ধীরি ধীরি বলনা ?

কার অঘেবণতরে

ফুলু ফুলু ফুলু স্তরে

যাইতেছ একমনে করে করে ছলনা

নদি তুমি বল না ?

আজকে তোমার তটে আসিয়াছি কাঁদিতে

কি কারা কাঁদিব বল

নয়নে বাহিক জল

গৃহিণীর ভাড়া খেয়ে আসিয়াছি কাদিতে

নদি আসিয়াছি কাদিতে ।

আমার মনের জ্বালা আর করে কহিব !

জান্তিতে বাসনা যদি

হয়ে থাকে তোর নদী

আমার মনের কথা তবে তোর বন্দিব

নদি তোর বন্দিব ।

* * *

কথা কও কথা কও

গুমরেতে কোথা যাও

তুমিও কি শিখিয়াছ মানিনী, মান ?

এবে মেকো অভিমান ।

হৃদয়ের স্তরে স্তরে অনারত অনল

নব বিধবার ন্যায়

জ্বলিতেছে হার হার

প্রাণুকারভয়ে শুধু রাখিয়াছি লুকায়ে,

মদি দিও নাকো জ্বালায়ে ।

সন্ধাম পাইলে কত অভিনব লেখক,

নববিরহিণী মনে

তুল নিয়া মনে মনে

চটিবে মধুর প্রাণু হৃদি-পিত্ত-নাশক,

অভিনব লেখক ।

তাইতে মনেব কথা মনোমাঝে রেখেছি

এক্ষণে গৃহেতে গিয়া

কেমনে বুঝাব শিখা

বলে দেও শৈবলিনি গৃহপানে যেতেছি

শৈবলিনি গৃহপানে চলেছি ।

